জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর
রহমান

জন্মশতবার্ষিকী প্রকাশনা

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

প্রথম খণ্ড

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
প্রথম খণ্ড

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা–১০০০

প্রকাশক
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

বানান সমন্বয়
সুশীল কুমার মণ্ডল

কম্পিউটার বিন্যাস
ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল

মুদ্রাকর
প্রগতি প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
২২/১ তোপখানা রোড, ঢাকা

মূল্য
৳ ৪৫০.০০

© পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

Bangabandhu in the Press, Agartala Conspiracy Case: First Part, Chief Editor: Zafar Wazed
Published by Press Institute Bangladesh (PIB), 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.
Price : 450 Taka. $ 8 Only
ISBN : 978-984-732-049-6
Phone : 9333403, 9330081-84, Fax : 880-02-8317458
E-mail : research@pib.gov.bd, Website : পিআইবি.বাংলা; http://www.pib.gov.bd
বইটি অনলাইনে পেতে হলে: www.rokomari.com

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
প্রথম খণ্ড

প্রধান সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

উপদেষ্টা পরিষদ
আবেদ খান
চেয়ারম্যান
পিআইবি পরিচালনা বোর্ড

ড. সাখাওয়াত আলী খান
অনারারি অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মফিদুল হক
লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
আকতার হোসেন
পরিচালক (গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ)

সম্পাদক
ড. কামরুল হক
গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব)

আধেয় সংগ্রহ
দিনেশ মাহাতো
হাসি খাতুন
ফারজানা আক্তার
রীপা রায়
সাহানাৎ হোসেন
আবুল কালাম আজাদ
শেওফতা আবিদ
ইয়াসিন সোহাগ
হুমায়ুন কবির
সেখ ফয়সাল আহমেদ

কম্পিউটার কম্পোজ
মো. ফরিদুল আলম
মো. আলমগীর হোসেন

মুখবন্ধ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চলছে। তারপরও এখনো অজানা তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের অনেক কথাই। এই প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের নানা ঘটনার তথ্য সংবাদপত্র থেকে তুলে এনে তা সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ। 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে গ্রন্থাকারে এই তথ্যগুলো সংরক্ষণের জন্য ধারাবাহিকভাবে সাল অনুযায়ী খণ্ড আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

১৯৬৮ সালে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় অভিযুক্ত করে বিচার শুরু করে। মামলাটিকে সরকারিভাবে নামকরণ করা হয়েছিল: 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের বিচার'। মামলায় আসামি করা হয় ৩৫ জনকে। প্রধান আসামি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৮ সালের শুরুতেই বঙ্গবন্ধুকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় অভিযুক্ত করে প্রেসনোট জারি করা হয়। মামলার শুনানি শুরু হয় ১৯ জুন। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এই শুনানি চলে প্রায় নয় মাস। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খানের সরকার বাধ্য হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তরা মুক্তি পান।

বঙ্গবন্ধুর জীবনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা মোকাবিলা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সংবাদপত্রেও এই সংক্রান্ত বিষয় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধু-সংশ্লিষ্ট তথ্যের বিশাল অংশজুড়ে রয়েছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। তাই আমরা সংবাদপত্রে প্রকাশিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদ-বিবরণীগুলো আলাদা করে 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থের দুটি খণ্ড প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি প্রথম খণ্ড। শিরোনাম: 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : প্রথম খণ্ড'। গ্রন্থটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী প্রকাশনা হিসেবে প্রকাশ করা হলো।

১৯৬৮ সালের আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান সরকারের দেশরক্ষা আইনে আটক ছিলেন। ১৯৬৮ সালের ১৯ জানুয়ারি একটি প্রেসনোটের বরাত দিয়ে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়:

> *এই ষড়যন্ত্রের (আগরতলা ষড়যন্ত্র) পরিকল্পনা ও পরিকল্পনার ব্যাপারে শেখ মুজিবর রহমানের জড়িত থাকা সম্পর্কে প্রমাণাদি পাওয়া গিয়াছে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিও একজন। (সংবাদ, ১৯ জানুয়ারি ১৯৬৮)*

১৯৬৮ সালের ৩১ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, জুনের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হবে। পরে ৬ জুন এই বিষয়ে রাওয়ালপিন্ডি থেকে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এই বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে ৭ জুন সংবাদপত্রে লেখা হয়:

> *আগামী ১৯শে জুন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হবে বলে আজ এখানে প্রকাশিত এক অতিরিক্ত গেজেট নোটিশে বলা হয়েছে। (দৈনিক পাকিস্তান, ৭ জুন ১৯৬৮)*

১৯ জুন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বিশেষ আদালতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি শুরু হয়। সংবাদপত্রে এ বিষয়ে প্রকাশিত খবরে বলা হয়:

> *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আজ বুধবার ঢাকায় শুরু হচ্ছে। তিন সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এই মামলার বিচার করবেন। সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস এ রহমানের নেতৃত্বে গঠিত উক্ত ট্রাইব্যুনালের অপর দু'জন সদস্য হচ্ছেন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম আর খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিম।*
>
> *গতকাল মঙ্গলবার এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, এই মামলায় ষড়যন্ত্র করার ও প্রতিরক্ষা সার্ভিসের ব্যক্তিদের উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মধ্যে তিনজন সিএসপি অফিসার এবং কয়েকজন সাবেক লীডিং সিম্যান ও সার্জেন্ট অভিযুক্ত হয়েছেন।*
>
> *গত ডিসেম্বর মাসে এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্রের 'পরিকল্পনা ও পরিচালনার' দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন। তিনি ও অন্যান্যরা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।*
>
> *অভিযুক্ত তিনজন সিএসপি অফিসার হচ্ছেন জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব কে এম শামসুর রহমান। বেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মিঃ ভূপতি ভুষণ চৌধুরী, মিঃ বিধান কৃষ্ণ সেন, ড. সায়েদুর রহমান ও জনাব এম আলী রাজা।*
>
> *গত ৬ই জানুয়ারী ২৮ জনের গ্রেফতারের বিষয় ঘোষণা করে স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে বলা হয় যে, তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন ভারতের আগরতলা সফর করেন।*
>
> *সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়, এ সমস্ত ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ পেয়েছে এরূপ প্রমাণও সংগ্রহ করা হয়েছে। এই অর্থ গ্রেফতারকৃত কয়েকজনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রামের মিঃ ভূপতি ভূষণ চৌধুরীও রয়েছেন।*
>
> *উক্ত ঘোষণায় আরো বলা হয় যে, উপরোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারী মিঃ ওঝার যোগাযোগ ছিল। ষড়যন্ত্র ধরা পড়ার পর*

পাকিস্তান অবিলম্বে মিঃ ওঝাকে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবী জানালে মিঃ ওঝা ঢাকা ত্যাগ করেন।

১৮ই জানুয়ারী অপর এক প্রেসনোটে এই ষড়যন্ত্রে শেখ মুজিবর রহমানের ও আরো পরে মিঃ কে এম শামসুর রহমানের সংশ্লিষ্ট থাকার বিষয় ঘোষণা করা হয়। সরকার ইতিমধ্যেই বাদীপক্ষের এডভোকেটদের নাম ঘোষণা করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন জনাব মনজুর কাদির, জনাব টি এইচ খান, গ্রুপক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আসলাম, জনাব এ আলিম ও জনাব খাকান বাবর। (দৈনিক পাকিস্তান, ১৯ জুন ১৯৬৮)

১৯৬৮ সালের ১৯ জুন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি শুরু হয়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে। তবে মাঝে কয়েকবার শুনানি মুলতবি করা হয়। প্রথম দিনের শুনানিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সিএসপি ও সামরিক অফিসারসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। ২০ জুন এ বিষয়ে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়। খবরে লেখা হয়:

গতকল্য (বুধবার) সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হইলে শেখ মুজিবর রহমান, তিনজন সিএসপি অফিসার, কতিপয় সামরিক অফিসার ও কর্মচারীসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে 'ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাইয়া পাকিস্তানকে উহার একটি অঞ্চল হইতে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রের' অভিযোগ উপস্থিত করা হয়।

ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জাষ্টিস এস এ রহমান অভিযোগপত্রটি পাঠ করিয়া শুনাইলে ট্রাইব্যুনালের অপর সদস্য ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম, আর, খান ৩৫ জন অভিযুক্তের তালিকাটি পাঠ করেন। অতঃপর ট্রাইব্যুনালের তৃতীয় সদস্য জাষ্টিস মকসুমুল হাকিম যে এগারজনকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহাদের নামগুলি পাঠ করেন।

দ্বিপ্রহর ১২টা পাঁচ মিনিটে বিচারপতি রহমান প্রত্যেকের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথকভাবে অভিযোগগুলি পাঠ শুরু করেন। বেলা একটায় কোর্টের সমাপ্তি পর্যন্ত মোট ৩৫ জন আসামীর মধ্যে ১৬ জনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পাঠ করিয়া শুনান হয়। এই ষোলজন এক এক করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া অভিযোগ শ্রবণ করেন এবং অভিযোগ শ্রবণের পর প্রত্যেকেই অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করেন।

গতকল্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন কক্ষে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। অধিকাংশ অভিযুক্তদের আত্মীয়পরিজন বিচার কক্ষে উপস্থিত ছিলেন এবং বিচারকার্যের শুরুতে এবং পরে তাহারা খোলাখুলিভাবেই মেলামেশা করেন। উপস্থিতদের মধ্যে শেখ মুজিবের বৃদ্ধ পিতা অন্যতম। পাকিস্তানী সাংবাদিক ছাড়াও রয়টার, এ-এফ-পি ও বাল্টিমোর সানের প্রতিনিধি প্রমুখ বিদেশী সাংবাদিকরাও উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগসমূহ উপস্থিত করার সময় বিচার কক্ষে বিরাজ করিতেছিল অখণ্ড নীরবতা। আগামীকল্য সকাল ৯টা পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী রাখা হইয়াছে।

গতকল্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর অভিযুক্ত হিসাবে শেখ মুজিবর রহমানকে উপস্থিত করা হয়। অভিযোগ পাঠের পর বিচারপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন 'আপনি দোষী না নির্দোষী?' প্রত্যুত্তরে শেখ মুজিব বলেন: 'আমি নির্দোষী। ইহা আমার বিরুদ্ধেই একটি ষড়যন্ত্র, কেননা আমি জেলে ছিলাম।'

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১ (ক) ধারা, ১৩৯ ধারা এবং ১৯৬৮ সালের স্পেশাল অর্ডিন্যান্সের ৩নং ধারা মোতাবেক অভিযোগ করা হইয়াছে।

অভিযুক্তদের পক্ষ হইতে অদ্য মামলা পরিচালনা করেন জনাব সালাম খান, খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল, আতাউর রহমান খান, সৈয়দ আজিজুল হক, জহীরুদ্দীন, আমিরুল ইসলাম, বদরুল হায়দার চৌধুরী, ভিখারুল ইসলাম এবং আরও অনেক আইনজীবী। সরকারপক্ষের প্রধান কৌসুলী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মনজুর কাদের। তাঁহাকে সহায়তা করেন জনাব টি এইচ খান, গ্রুপ ক্যাপটেন আসলাম, এ আলিম এবং খাকান বাবর। (সংবাদ, ২০ জুন ১৯৬৮)

১৯৬৮ সালের ১৯ থেকে ২১ জুন তিনদিন শুনানির পর তা ১৬ জুলাই পর্যন্ত মুলতবি হয়ে যায়। ২২ জুন এই সংক্রান্তে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে বলা হয়:

গতকল্য (শুক্রবার) স্বল্পকালের জন্য অধিবেশন চলার পর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অনুষ্ঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যদের মামলার শুনানী আগামী ১৬ই জুলাই পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস এ রহমানের সভাপতিত্বে এবং ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম আর খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিমকে লইয়া গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে গত বুধবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমান এবং সিএসপি ও সামরিক অফিসারসহ অপর ৩৪ জনের বিরুদ্ধে শুনানী শুরু হয়। সরকারপক্ষ কর্তৃক আনীত ষড়যন্ত্রের অভিযোগের জবাবে ৩৫ জন অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রত্যেকেই নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করেন।

পিপিআই পরিবেশিত খবরে বলা হয়: বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে সাক্ষ্য সম্পর্কে সরকার পক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির তাঁহার পূর্বদিনের অসমাপ্ত বক্তব্য সমাপ্ত করেন। সরকার পক্ষের প্রধান কৌসুলী গতকল্য সাক্ষীর নাম অন্তর্ভূক্ত করেন এবং তাহার ফলে সাক্ষীর সংখ্যা ২২৭ জন হইতে ২৩২ জনে দাঁড়ায়।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদিগকে মামলার জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য সাক্ষীর জবানবন্দী পর্যালোচনা ও অন্যান্য দলিলপত্র পরীক্ষার সুযোগদানের উদ্দেশ্যে ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন আগামী ১৬ই জুলাই পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হয়। (সংবাদ, ২২ জুন ১৯৬৮)

পরে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি ১৯৬৮ সালের ১৬ জুলাইয়ের পরিবর্তে ২৯ জুলাই পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করা হয়। বিশেষ ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার লাহোর থেকে এই ঘোষণা দেন। এই খবর ৭ জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এভাবে:

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী পুনরায় ১৬ই জুলাইর পরিবর্তে ২৯শে জুলাই শুরু হইবে বলিয়া বিশেষ ট্রাইব্যুনালের রেজিষ্ট্রার জনাব এ মীর্জ্জা অদ্য এখানে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, আসামীপক্ষের অনুরোধে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান আরও দুই সপ্তাহ উক্ত মামলার শুনানী মুলতবী রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এপিপি-রয়টার। (আজাদ, ৭ জুলাই ১৯৬৮)

৩০ জুলাই শুনানি শুরুর আগেই মামলায় বঙ্গবন্ধুসহ অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রখ্যাত ব্রিটিশ আইনজীবী টমাস উইলিয়ামস ঢাকায় এসে পৌঁছান। তাঁর ঢাকায় উপস্থিতির বিষয়ে ২৬ জুলাই সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বলা হয়:

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্যের পক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে খ্যাতনামা বৃটিশ আইনজীবী ও শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য মি: টমাস উইলিয়ামস গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিমানযোগে ঢাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

বিমান বন্দরে মিঃ উইলিয়ামসকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য বিমানবন্দরে উপস্থিত হন। মেসার্স নূরুল ইসলাম এম এন এ, শামসুল হক, শফিউল আলম, আবদুল মান্নান, ড. আহমদ আলী, আনসার আলী, আফসারউদ্দিন আকন্দ, ময়েজুদ্দিন, মতিউর রহমান, মীর্জা গোলাম হাফিজ, ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী, মওদুদ আহমেদ, কে, জেড, আলম, এ সালাম খান, আমিরুল ইসলাম, জুলমত আলী প্রমুখসহ ঢাকার বিশিষ্ট আইনজীবিগণ বিমানবন্দরে মি: উইলিয়ামসকে অভ্যর্থনা জানান। মি: উইলিয়ামসকে বিমানবন্দরে মাল্যভূষিত করা হয়।

আগামী ২৯শে জুলাই বিশেষ ট্রাইব্যুনালের দ্বিতীয় দফা অধিবেশন শুরু হইতেছে। জানা গিয়াছে যে, মি: উইলিয়ামস প্রথম দফায় এক পক্ষকাল ঢাকায় অবস্থান করিবেন, কিছুদিন পর তিনি পুনরায় এখানে আগমন করিবেন।

মি: উইলিয়ামস আজকালের মধ্যেই মামলার "ব্রীফ" সম্পর্কে স্থানীয় আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হইবেন। তিনি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থান করিতেছেন। (সংবাদ, ২৬ জুলাই ১৯৬৮)

পাঁচ সপ্তাহ বিরতির পর ১৯৬৮ সালের ২৯ জুলাই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি আবার শুরু হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের শুনানির শুরুতেই শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধান কৌসুলি টমাস উইলিয়ামস মামলার জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এবং যে অর্ডিন্যান্সবলে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে, তার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আপত্তি উত্থাপন করেন। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এস এ রহমান তা প্রত্যাখ্যান করেন। ৩০ জুলাইয়ের সংবাদপত্রে এ বিষয়ে লেখা হয়:

গতকাল সোমবার সকালে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা নামে পরিচিত রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলার শুনানী প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পর পুনরায় শুরু হয়েছে। সুপ্রীমকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস এ রহমানকে চেয়ারম্যান ও ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম আর খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকীমকে নিয়ে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এই মামলার বিচার হচ্ছে।

গতকাল শুনানী শুরুর প্রাক্কালে শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ সমর্থনের জন্য আগত বৃটিশ আইনজীবী মি. টমাস উইলিয়ামস কতিপয় আইনগত প্রশ্ন তুলে বলেন ফৌজদারী দণ্ডবিধি (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল) (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স ১৯৬৮ পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী বিধায় অবৈধ। তিনি বলেন, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বেআইনীভাবে গঠিত হয়েছে; সুতরাং ট্রাইব্যুনালকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা অসঙ্গত হবে।

মি. টমাস উইলিয়ামস বলেন, ১৯৬৫ সালের ৫নং অর্ডিন্যান্সটির ১২নং ধারায় যে আওতা নির্ধারিত রয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, এই ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে অপর কোন আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। তাই ট্রাইব্যুনাল এই আইনগত প্রশ্নের মীমাংসা না করলে এ ব্যাপারে আর সুযোগ নেই।

ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস এ রহমান বলেন যে, কৌসুলীর এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় এবং আইনগত দিক দিয়ে ইহা সঠিকও নয়। যদি অর্ডিন্যান্সের কোন ত্রুটি চ্যালেঞ্জ করতে হয় তবে সেজন্য শাসনতান্ত্রিক অন্য পন্থা গ্রহণ করতে হবে। এই ট্রাইব্যুনাল এর আওতা সংক্রান্ত কোন আপত্তি গ্রাহ্য করতে পারে না। (দৈনিক পাকিস্তান, ৩০ জুলাই ১৯৬৮)

১৯৬৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি চলার পর এক মাসের জন্য তা মুলতবি হয়ে যায়। ১৪ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে বলা হয়:

ষড়যন্ত্র মামলার ৬ষ্ঠ রাজসাক্ষী ও সপ্তম সরকারী সাক্ষী ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভুঁইয়ার সওয়াল-জবাব গতকাল (শুক্রবার) সমাপ্ত হইবার পর বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বর্তমান অধিবেশন আগামী ১৪ই অক্টোবর, সোমবার পর্যন্ত এক মাসের জন্য মুলতবী ঘোষণা করা হইয়াছে। বিশেষ ট্রাইব্যুনালের এই অধিবেশনে ষড়যন্ত্র মামলার মোট ৩৩ দিনের শুনানীকালে বাদীপক্ষের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন (হোষ্টাইল) বলিয়া ঘোষিত সরকারী সাক্ষী জনাব কামালুদ্দীন এবং লেঃ মোজাম্মেল হোসেন, প্রাক্তন করপোরাল মোহাম্মদ আমীর হোসেন মিয়া, সার্জেন্ট শামসুদ্দীন আহমদ, ডাঃ সাঈদুর রহমান, প্রাক্তন ফ্লাইট লেঃ মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ ও ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল আলীম ভুঁইয়াসহ মোট ৬ জন রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ ও জেরা সমাপ্ত হয়। (সংবাদ, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮)

এক মাস বিরতির পর ১৯৬৮ সালের ১৪ অক্টোবর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি পুনরায় শুরু হয়। ১২ দিন শুনানি চলার পর তিন দিনের জন্য মুলতবি হয়ে যায়। ২৯ অক্টোবর আবার শুনানি শুরু হয়। চলে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এরপর ১৯৬৯ সালের ২ জানুয়ারি পর্যন্ত মামলার শুনানি মুলতবি থাকে।

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ঢাকা হাইকোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চে রিট আবেদন পেশ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর প্রধান কৌসুলি টমাস উইলিয়ামস বিচারাধীন এই মামলার কার্যক্রমের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করেন। ১৯৬৮ সালের ৬ আগস্টে প্রকাশিত খবরে বলা হয়:

> *গতকাল সোমবার ঢাকা হাইকোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চ সমীপে জনাব শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ হইতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্য্যক্রমের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া এক রীট আবেদন পেশ করা হয়।*
>
> *উপরোক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি জনাব বি এ সিদ্দিকী ও বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম পাকিস্তান সরকার এবং মেজর এ বি এম নাসেরকে এই মর্ম্মে কারণ দর্শাইতে বলিয়াছেন যে, কেন বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্য্যক্রমকে এখতেয়ার বহির্ভূত বিধায় অবৈধ ও আইনের দৃষ্টিতে মূল্যহীন বলিয়া ঘোষণা, উক্ত কার্যক্রম খারিজ করার এবং আবেদনকারীকে মুক্তি দেওয়ার নির্দ্দেশ প্রদান করা হইবে না। বিচারপতিদ্বয় চলতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে প্রতিবাদীদের কারণ দর্শাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।*
>
> *উপরোক্ত আবেদনে ফৌজদারী আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অর্ডিন্যান্সের (১৯৬৮) বিধান মতে সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস এ রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সমীপে বিচারাধীন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত সরকার বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলার কার্য্যক্রমের বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে।*
>
> *আবেদনকারীর অভিযোগের যৌক্তিকতা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য উপরোক্ত বিচারপতিদ্বয় সংশ্লিষ্ট রীট আবেদনটী প্রাথমিক শুনানীর পর গ্রহণ করেন এবং ১ ও ৩নং প্রতিবাদীদের উপর কারণ দর্শাইবার জন্য উক্ত রুলটি জারী করেন। উপরোক্ত বিচারপতিদ্বয় উক্ত মামলার শুনানীর সময় পাকিস্তানের এর্টনী জেনারেল ও পূর্ব্ব পাকিস্তানের এডভোকেট জেনারেলকে উপস্থিত থাকার জন্যও এক আদেশ দিয়াছেন। আবেদনকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন মিঃ টমাস উইলিয়ামস ও জনাব আমিরুল ইসলাম এবং তাঁহাদের সাহায্য করেন জনাব মইনুল হোসেন ও জনাব মওদুদ আহমদ। (আজাদ, ৬ আগস্ট ১৯৬৮)*

১৯৬৮ সালের ৩১ অক্টোবর প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ করে পেশকৃত রিট আবেদনের শুনানির তারিখ ১০ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। এই খবরে লেখা হয়:

> *ঢাকা হাইকোর্টের এক বিশেষ বেঞ্চ গতকাল বুধবার জনাব শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ হইতে বিচারপতি জনাব এস এ রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কার্য্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ করিয়া পেশকৃত রীট আবেদনটির শুনানী আগামী ১০ই ডিসেম্বর ধার্য্য করিয়াছেন। ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বি এ সিদ্দিকী, বিচারপতি জনাব সালাহউদ্দিন আহমদ ও বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম সমবায়ে উক্ত বিশেষ বেঞ্চ গঠিত।*
>
> *প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গতকাল উক্ত রীট মামলাটি শুনানীর দিন ধার্য্যের জন্য হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ কর্তৃক শ্রবণীয় মামলার তালিকাভুক্ত হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত জনাব শেখ মুজিবর রহমানের কৌসুলী জনাব এম এ ইসলাম উক্ত মামলাটি আগামী ১০ই ডিসেম্বর তারিখে শুনানী করার প্রার্থনা জানান। উপরোক্ত প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে মামলাটির শুনানী উক্ত তারিখে ধার্য করা হয়। (আজাদ, ৩১ অক্টোবর ১৯৬৮)*

তবে ১৯৬৮ সালে এই শুনানি আর অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৬৮ সালের ৭ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে লেখা হয় এই শুনানি ১৯৬৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

> *'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের মামলা'র বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া শেখ মুজিবের কৌসুলি মিঃ টমাস উইলিয়ামস ঢাকা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে যে রীট আবেদন পেশ করেন উহার শুনানীর তারিখ পরিবর্তন করিয়া আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ধার্য করা হইয়াছে। ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বি এ সিদ্দিকী এবং বিচারপতি জনাব সালাউদ্দিন আহমদ ও বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম সমবায়ে এই ডিভিশন বেঞ্চ গঠিত।*
>
> *ডেপুটি এটর্নী জেনারেল জনাব কামালউদ্দীন হোসেন উক্ত রীট আবেদনের শুনানী পিছাইয়া দেওয়ার জন্য ডিভিশন বেঞ্চে একটি আবেদন পেশ করেন। পাকিস্তানের এটর্নী জেনারেল জনাব শরীফুদ্দিন পীরজাদা বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন মামলার ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় শুনানীকালে উপস্থিত হইতে পারিবেন না বলিয়া তিনি তারিখ পরিবর্তনের আবেদন জানান। ডিভিশন বেঞ্চ উক্ত আবেদন মঞ্জুর করিয়া শুনানীর তারিখ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ধার্য করেন। (সংবাদ, ৭ ডিসেম্বর ১৯৬৮)*

বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৬৮ সালজুড়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার খবর সংবাদপত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে। বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করার মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মুক্তিলাভ করেন।

গ্রন্থটিতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদ-বিবরণীগুলো সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কাজটি করতে গিয়ে দেখা গেছে, সেই সময়ের অনেক সংবাদপত্রই সংরক্ষিত নেই। দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও আর্কাইভে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, পুরোনো দিনের অনেক সংবাদপত্র একেবারেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। অনেক সংবাদপত্র পাওয়া গেছে আংশিক। সংরক্ষিত নেই সব কপি। অক্ষত নেই অনেক সংবাদপত্রের সব পৃষ্ঠা। যে কারণে আমাদের আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও সব খবর ও তথ্য পুরোটা তুলে আনতে পারিনি। যেখানে যতটুকু পাওয়া গেছে, যেভাবে পাওয়া গেছে, তা আমরা যত্নের সঙ্গে এই গ্রন্থে সংযুক্ত করার প্রয়াস চালিয়েছি। আমাদের সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ হয়েছে– এমন দাবি আমরা করতে পারব না।

গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে দালিলিক মূল্য বিবেচনায় রেখে আমরা সংবাদপত্রের ভাষা ও বানান অবিকল রেখেছি। বাক্যগঠন বা ব্যাকরণগত কোনো সংশোধন করা হয়নি। তথ্যের মধ্যবর্তী অংশ বা শেষে কোনো শব্দ, বাক্য বা প্যারা অস্পষ্ট থাকলে কিংবা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার কোনো অংশ না পাওয়া গেলে সেখানে আমরা ... চিহ্ন ব্যবহার করেছি। বঙ্গবন্ধুর নামের বানান একেক সংবাদপত্রে একেক রকম আছে, আমরা তা হুবহু রেখেছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য যাঁরা পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বানান সমন্বয় ও কম্পিউটার বিন্যাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া সময়মতো কাজ শেষ করা দুরূহ ছিল।

'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ গ্রন্থের এই খণ্ড প্রকাশনায় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদের সময় দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এই গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়োজনে কারও কাছে নতুন কোনো দলিল বা তথ্য থাকলে তা আমরা পরবর্তী সংস্করণে সংযুক্ত করব। সবার মূল্যবান পরামর্শও আমরা সাদরে গ্রহণ করতে চাই।

১ সেপ্টেম্বর ২০১৯

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক

সূ | চি | প | ত্র

মুখবন্ধ	৫
জুন	১৭
জুলাই	৭৪
আগস্ট	১১৫
সেপ্টেম্বর	৭১৩
নির্ঘণ্ট	৮৮৯

যেসব পত্রপত্রিকা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে

১. আজাদ
২. পাকিস্তান অবজারভার
৩. ডন
৪. মর্নিং নিউজ
৫. সংবাদ
৬. পূর্বদেশ
৭. দৈনিক পয়গাম
৮. দৈনিক পাকিস্তান

দৈনিক পাকিস্তান

১৯শে জুন ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আজ শুরু

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আজ বুধবার ঢাকায় শুরু হচ্ছে। তিন সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এই মামলার বিচার করবেন। সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমানের নেতৃত্বে গঠিত উক্ত ট্রাইব্যুনালের অপর দু'জন সদস্য হচ্ছেন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম, আর, খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিম।

গতকাল মঙ্গলবার এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, এই মামলায় ষড়যন্ত্র করার ও প্রতিরক্ষা সার্ভিসের ব্যক্তিদের উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মধ্যে তিনজন সিএসপি অফিসার এবং কয়েকজন সাবেক লীডিং সিম্যান ও সার্জেন্ট অভিযুক্ত হয়েছেন।

গত ডিসেম্বর মাসে এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্রের 'পরিকল্পনা ও পরিচালনার' দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন। তিনি ও অন্যান্যরা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

অভিযুক্ত তিনজন সিএসপি অফিসার হচ্ছেন জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব কে এম শামসুর রহমান। বেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মিঃ ভূপতি ভুষণ চৌধুরী, মিঃ বিধান কৃষ্ণ সেন, ডঃ সায়েদুর রহমান ও জনাব এম আলী রাজা।

গত ৬ই জানুয়ারী ২৮ জনের গ্রেফতারের বিষয় ঘোষণা করে স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে বলা হয় যে, তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন ভারতের আগরতলা সফর করেন।

সরকারী প্রেস নোটে বলা হয়, এ সমস্ত ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ পেয়েছে এরূপ প্রমাণও সংগ্রহ করা হয়েছে। এই অর্থ গ্রেফতারকৃত কয়েকজনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রামের মিঃ ভূপতি ভূষণ চৌধুরীও রয়েছেন।

উক্ত ঘোষণায় আরো বলা হয় যে, উপরোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারী মিঃ ওঝার যোগাযোগ ছিল। ষড়যন্ত্র ধরা পড়ার পর পাকিস্তান অবিলম্বে মিঃ ওঝাকে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবী জানালে মিঃ ওঝা ঢাকা ত্যাগ করেন।

১৮ই জানুয়ারী অপর এক প্রেস নোটে এই ষড়যন্ত্রে শেখ মুজিবর রহমানের ও আরো পরে মিঃ কে,এম, শামসুর রহমানের সংশ্লিষ্ট থাকার বিষয় ঘোষণা করা হয়।

সরকার ইতিমধ্যেই বাদীপক্ষের এডভোকেটদের নাম ঘোষণা করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন জনাব মনজুর কাদির, জনাব টি, এইচ, খান, গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আসলাম, জনাব এ, আলিম ও জনাব খাকান বাবর।

Morning News

20th June 1968

Armed revolt planned with Indian help, pleges Prosecution

(By our staff reporter)

The accused in the Agartala Conspiracy Case yesterday charged with conspiring to war against Pakistan and deprive Pakistan of sovereignty over a part of its territory, namely, Province of East Pakistan by means of criminal in an armed revolt which was to be carried out … with weapons, ammunition and funds provided india through some Indian conspirators. The Trial began in the case, State versus Sheikh Mujibur Rahman and others, yesterday, Mr. Justice S. A. Rahman, Chairman of the… Tribunal and a former Chief Justice of Pakistan, read out ... to Sheikh Mujibur Rahman and 15 others, of the 35 accused. All ... pleaded not guilty.

... to be carried out the weapons, ammunation is prouided by India through Indian co-conspirators". The other charge under section 131 of Pakistan Penal Code was that the accused had abetted the committing of mutiny by those of the co-accused and the persons who had since been pardoned who are members of the army. Navy or Air Force of Pakistan and that the accused had attempted to seduce them from their allegiance and duty.

A statement of the case read out in the beginning by the Tribunal gave details of the alleged conspiratorial activities of the accused.

The alleged plan of action of the alleged conspirators according to the prosecution statement included.

- Capturing in a surprise, commando-style action, the armouries of military units so as to paralyse them.
- Making a declaration of independence and to promulgate martial law.
- Relying on India, under a "gentlemen's agreement" to block sea and air routes against any intervention from West Pakistan.

The supply of arms and ammunition for the planned revolt was alleged to have been discussed at Agartala, in India, between a delegation sent by the alleged conspirators and representatives of India at a meeting on July 12, 1967.

The prosecution complaint listed contacts which some of the accused had allegedly made with Mr. P.N. Ojha, First Secretary, Indian High Commission, Dacca, who is alleged to have arranged the Agartala meeting.

Mr. Ojha was expelled from Pakistan in January this year shortly after the first arrests relating to the Agartala conspiracy were made.

The first accused to whom the charge was read out was Sheikh Mujibur Rahman, accused number one in the case. Asked if he was guilty or not guilty Sheikh Mujib said, Not guilty. I am innocent. This is a conspiracy against me to involve me ....

সংবাদ

২০শে জুন ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগপত্রের পূর্ণ বিবরণ

১৯৬৮ সালের ফৌজদারী আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অর্ডিন্যান্স এর ৪ ধারা অনুযায়ী, ১৯৬৮ সালের ২১শে এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তিসহ এসআর,ও, ৫৯(আ)/৬৮ বলে বিশেষ গঠিত ট্রাইব্যুনাল সমক্ষে।

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আসামী

অত্র মামলার বিবৃতি (যাহাকে অতঃপর 'অভিযোগপত্র' বলিয়া উল্লেখ করা হইবে) বাদীপক্ষের তরফ হইতে উপরোক্ত অর্ডিন্যান্সের ৫ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পেশ করা হইল।

যথাবিধ সম্মান পুরঃসর নিবেদন এই–

১। ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাইয়া, পাকিস্তানকে ইহার এক অংশ হইতে বঞ্চিত করিয়া, সেই অংশ ভারতের স্বীকৃত একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিবার ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব গোপন সূত্রে জানা যায়। এই গোপন খবরের সূত্র ধরিয়া, ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে, পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধি অনুযায়ী কিছু সংখ্যক লোককে এবং পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর জন্য প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী আরো কিছুসংখ্যক লোককে গ্রেফতার করা হয়।

২। উক্ত লোকদের দ্বারা প্রদত্ত বা তাহাদের নিকট হইতে উদ্ধারকৃত দলিলপত্রাদিতে পাওয়া যায়–কয়েকজন বিশিষ্ট ষড়যন্ত্রকারীদের সাংকেতিক নামঃ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের বর্ণনা ও পরিমাণ, 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' এর আগে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে' করণীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে উপদেশ এবং অন্যান্য স্মারকলিপিসমূহ।

৩। সংগ্রামের প্রধান পরিকল্পনা ছিল – সেনাবাহিনীর অস্ত্রাগারগুলি দখল করিয়া তাহাদের যুদ্ধক্ষমতা পঙ্গু করিয়া দেওয়া, তাহারা সামরিক কায়দায়

সংগ্রাম করিবার এবং অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা নিজেদের জনশক্তির অভাব পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। এই ব্যাপারে করণীয় কার্যভারসমূহের মধ্যে রহিয়াছে–

(ক) সশস্ত্র সেনাবাহিনীর লোক, প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী এবং বেসামরিক কর্মচারীদের দলভুক্ত করা, যাহাদের দ্বারা সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্রগামী দল গঠন করা যায়।

(খ) ভারতের নিকট হইতে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য ছাড়া দেশের মধ্য হইতে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা।

(গ) প্রচার কার্যের দ্বারা দেশের সর্বত্র রাজনৈতিক অসন্তোষ সৃষ্টি করা ।

(ঘ) সংগ্রামের পক্ষে সুবিধাজনক স্থানগুলিকে বলপূর্বক দখল করিবার জন্য 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'-এর জন্য সুযোগ মুহূর্তটি ধার্য করা।

৪। এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিনিধিগণ এবং অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সাহায্য দিতে প্রস্তুত ভারতীয় প্রতিনিধিগণ, এক সভায় মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা করে। এই সভাটি ১৯৬৭ সালের ১২ই জুলাই ভারতস্থিত আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়।

৫। এই ষড়যন্ত্রের সম্প্রসারণের জন্য আরও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এবং এই ঘটনাবলীর তাৎপর্যপূর্ণ সবিস্তার বর্ণনা ইহার পরের অনুচ্ছেদসমূহে রহিয়াছে। কোন বৈঠকের আলোচনার সারাংশ দেওয়ার সময়, প্রত্যেক বৈঠকের আলোচনায় ষড়যন্ত্রের যে সকল সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বারবার উল্লিখিত হইত, সেগুলি প্রায়ই বাদ দেওয়া হইয়াছে। চারিটি তালিকা, যথা– 'আসামীদের তালিকা', 'সাক্ষীদের তালিকা', 'দলিলপত্রের তালিকা' এবং 'জিনিসপত্রের তালিকা' যাহা অভিযোগপত্রের সাথে রহিয়াছে তাহাদের উদ্দেশ্য পরিশিষ্ট-১ এ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অভিযোগে যে নাম প্রথমবার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানে পুরা নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই নাম যখন পুনর্বার উল্লিখিত হইয়াছে সেখানে শুধু নামের ঐ অংশটুকু দেওয়া হইয়াছে যাহা দ্বারা তাহাকে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করা যায়। পূর্ণভাবে সনাক্ত করিবার জন্য অভিযোগে, যে নাম যখন উল্লিখিত হইয়াছে, সেটা নামের শেষে আসামী বা সাক্ষী এবং 'আসামীর তালিকা'র ও 'সাক্ষীর তালিকা'য় তাহাদের নামের যে ক্রমিক নম্বর, তাহা দেওয়া হইয়াছে। অনুরূপভাবে কোন স্থানের প্রথম উল্লেখে, ঐ স্থানের পুরা বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহা যখন পূনর্বার উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন শুধু বর্ণনার ঐ অংশটুকু দেওয়া হইয়াছে যাহার দ্বারা ঐ স্থানকে অন্যস্থান হইতে পৃথক করা যায়।

৬। ১৯৬৪ সালের ১৫ই থেকে ২১শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান করাচী আসিয়াছিল। পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেঃ মোয়াজ্জম হোসেন (বর্তমানে লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জম হোসেন) ২নং আসামীর আহুত

এক বৈঠকে ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমানকে যোগদানের জন্য আহ্বান করিয়াছিল। ইহার আগে ১৯৬৪ সালের প্রথমদিকে উক্ত লেঃ মোয়াজ্জম হোসেন তাহার ১নং কে,ডি,এ স্কীম এর ডি/৭৭নং বাড়ীতে ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, ৫নং আসামী প্রাক্তন লিডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ এবং ১নং সাক্ষী লেঃ মোজাম্মেল হোসেন-এর সম্মতিক্রমে পূর্ব পাকিস্তান দখল করিবার জন্যে একটি বিপ্লবী সংঘ সংগঠনের উদ্দেশ্যে ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে আলোচনার সিদ্ধান্ত করে। এই বৈঠকে ২নং সাক্ষী কামাল উদ্দিন আহমদ-এর বাড়ীতে [৩/৪৭ এম, এস,জি,পি, স্কুল টিচার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি (যাহা মোয়ালামাবাদ নামে সাধারণ্যে পরিচিত), করাচী] অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যোগদান করেঃ

(১) শেখ মুজিবর রহমান ১নং আসামী;
(২) মোয়াজ্জম, ২নং আসামী;
(৩) ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ৩নং আসামী;
(৪) সুলতান, ৪নং আসামী;
(৫) নূর মোহাম্মদ, ৫নং আসামী;
(৬) মিঃ আহমেদ ফজলুর রহমান, সি, এস, পি, ৬নং আসামী;
(৭) মোজাম্মেল ১নং সাক্ষী।

২নং আসামী মোয়াজ্জম বলে যে, পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির জন্যে সংগ্রামী শক্তি, নৌবাহিনীতে নিযুক্ত পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে রহিয়াছে এবং সামরিক ও বিমান বাহিনীতে যে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানী রহিয়াছে তাহাদিগকেও দলভুক্ত করিতে হইবে। সে ব্যাখ্যা করে যে, এই দলের সফল প্রসারণের জন্যে রাজনৈতিক নেতা এবং বেসামরিক কর্মচারীদের সমর্থন ও সহযোগিতার প্রয়োজন। সে আরো বলে যে, এই দলের তহবিলের জন্য অর্থের প্রয়োজন। ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান ইহাতে বলে যে, সে নিজেও ঐ মতে বিশ্বাসী। সে পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ৬নং আসামী এ,এফ,রহমান, ২নং আসামী মোয়াজ্জম-এর সাথে একমত হইয়া বলে যে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অসমতা দূর করিবার একমাত্র পন্থা হইতেছে সশস্ত্র বিদ্রোহ। সে আরো বলে যে, তাহাদের এই কাজের প্রতিক্রিয়া ভারতে কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে তাহার নিশ্চিত ধারণা নাই। ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান বলে যে, ইহা তাহার দায়িত্ব। সে অবশ্য আরো বলে যে, তখনকার মত তাহারা আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে পারে কারণ বিরোধীদল যদি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে তবে এই সংগ্রামের প্রয়োজন নাও হইতে পারে। প্রায় ঐ সময়েই 'প্রেসিডেন্ট নির্বাচন' অনুষ্ঠিত হইবার কথা।

৭। ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সমাপ্তির পর আবার করাচী যায় এবং সেখানে ১৫ই জানুয়ারী হইতে ২১শে

জানুয়ারী পর্যন্ত অবস্থান করে। ঐ দুই তারিখের কোন একদিন ২নং আসামী মোয়াজ্জম-এর পূর্বোক্ত বাড়ীতে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যোগদান করেঃ

(১) শেখ মুজিবর রহমান ১নং আসামী;
(২) মোয়াজ্জম ২নং আসামী;
(৩) নূর মোহাম্মদ ৫নং আসামী;
(৪) এ, এফ, রহমান ৬নং আসামী;
(৫) ফ্লাইট সারজেন্ট মফিজুল্লাহ, ৭নং আসামী;
(৬) লেঃ মোজাম্মেল হোসেন, ১নং সাক্ষী এবং আরও কয়েকজন যাহাদের সনাক্ত করা যায় নাই।

১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান বলে যে, পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্যে সম্মানজনকভাবে বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র উপায় হইতেছে, তাহাদের নিজেদেরকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আলাদা করিয়া নেওয়া। সে ইহাতে পূর্ণ সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং ২নং আসামী মোয়াজ্জমকে এই আন্দোলন ত্বরান্বিত করিবার জন্য তাহার সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে বদলী করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করে।

৮। করাচীস্থ কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দফতরে সেই সময়ে নিযুক্ত ৩নং সাক্ষী মিঃ মোহাম্মদ আমির হোসেন মিঞার সঙ্গে ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ৪নং আসামী সুলতান, ৮নং আসামী প্রাক্তন করপোরাল আবুল বাসার মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ-এর অন্তরঙ্গতা ছিল। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসের কোন এক সময়ে, ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ২নং আসামী মোয়াজ্জমের সাথে ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে পরিচয় করাইয়া দেয়। ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন ইহাতে বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হয় এবং এই সংঘের একজন সক্রিয় সদস্য বনিয়া যায়।

৯। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী এবং আগষ্ট মাসের মধ্যে, ২নং আসামী মোয়াজ্জমের বাড়ীতে কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকগুলিতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছিলঃ

১) মোয়াজ্জম, ২নং আসামী;
২) ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ৩নং আসামী;
৩) সুলতান, ৪নং আসামী;
৪) নূর মোহাম্মদ, ৫নং আসামী;
৫) হাবিলদার দলিল উদ্দিন, ৯নং আসামী; এবং
৬) আমির হোসেন, ৩নং সাক্ষী।

এই সকল ব্যক্তি এই সংঘের সক্রিয় সদস্য ছিল। এই বৈঠকগুলিতে তাহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং তাহাদের সাফল্যের জন্য করণীয় কার্যপদ্ধতি আলোচিত হইয়াছিল।

১০। পূর্ব পাকিস্তানে কাজ শুরু করার জন্য কিছুসংখ্যক সক্রিয় সদস্যের সেখানে স্থায়ীভাবে থাকিবার বন্দোবস্তের প্রয়োজন হয়। তদনুসারে ২নং আসামী মোয়াজ্জমের নির্দেশক্রমে, ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ৪নং আসামী সুলতান ছুটিতে ঢাকায় যায়। তাহাদের স্থায়ীভাবে পূর্ব পাকিস্তানে বদলি করিবার চেষ্টাও করা হয়। ১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসে, ২নং আসামী মোয়াজ্জম, ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব ও ৪নং আসামী সুলতানের মারফত ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমানের সহিত আলোচনা করিয়া ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমানের ঢাকাস্থিত ধানমণ্ডির ৩২নং রোডের ৬৭৭নং বাড়ীতে একটি দলীয় বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। ৪নং আসামী সুলতান, একটি বীমাকৃত খামে ১,৫০০ টাকা, ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের নামে পাঠায় এবং আরো ৫০০ টাকা টেলিগ্রাম মনি অর্ডারযোগে ৫নং আসামী নূর মোহাম্মদের নিকট পাঠায়। এই টাকা দলীয় বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য করাচী হইতে ঢাকা যাইবার যাতায়াত খরচ হিসাবে, ২নং আসামী মোয়াজ্জমের নিকট দেওয়ার জন্য পাঠান হইয়াছিল। উক্ত টাকা যথাসময়ে পাঠানো হইয়াছিল এবং ২নং আসামী মোয়াজ্জমের নিকট দেওয়া হইয়াছিল।

১১। উপরোক্ত বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৬৫ সালের ২৯শে আগষ্ট তারিখটি ধার্য হয়। ২নং আসামী মোয়াজ্জম এবং ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন পি, আই, এ, বিমানযোগে করাচী হইতে ঢাকা রওয়ানা হয়।

১২। পূর্বোক্ত বৈঠক পূর্বনির্ধারিত স্থানে বিকাল ৩ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহাতে উপস্থিত থাকে ঃ

(১) শেখ মুজিবর রহমান, ১নং আসামী;
(২) মোয়াজ্জম, ২নং আসামী;
(৩) ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ৩নং আসামী;
(৪) সুলতান, ৪নং আসামী;
(৫) মিঃ রুহুল কুদ্দুস, সি,এস,পি, ১০নং আসামী এবং
(৬) আমির হোসেন, ৩নং সাক্ষী।

২নং আসামী মোয়াজ্জম কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করে এবং দাবী করে যে, সে ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ও আশীর্বাদে সশস্ত্রবাহিনীর বহুসংখ্যক কার্যরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে দলভুক্ত করিয়াছে। আর ঐ সকল ব্যক্তি পূর্ব পাকিস্তানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে। বৈঠকে যোগদানকারীদের সকলেই অর্জিত সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে।

২নং আসামী মোয়াজ্জম তহবিল, অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। ১নং আসামী মুজিবর রহমান ভারত হইতে প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দেয়। তখনকার মত সে ২নং আসামী মোয়াজ্জমকে এক লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব নেয়, যাহা

২,০০০ টাকা হইতে ৪,০০০ টাকার কিস্তিতে, ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৪নং আসামী সুলতান আদায় করিবে।

১৩। ১৯৬৫ সালের ১লা সেপ্‌টেম্বর তারিখে ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমানের নিকট হইতে তাহার ঢাকাস্থ ধানমণ্ডির বাড়ীতে ৭০০ টাকা গ্রহণ করে এবং তাহা ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের নিকট অর্পণ করে।

১৪। ১৯৬৫ সালের ৯ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমানের নিকট হইতে তাহার ঢাকাস্থ ধানমণ্ডির বাড়ীতে ৪,০০০ টাকা নেয় এবং তাহা ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের নিকট দেয়। ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ৩০০ টাকা ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৪নং আসামী সুলতানকে তাহাদের ব্যক্তিগত খরচের জন্য ফেরত দেয় এবং অবশিষ্টাংশ ২নং আসামী মোয়াজ্জমের নিকট দিবার জন্য তাহার নিজের কাছে রাখিয়া দেয়।

১৫। পাক-ভারত যুদ্ধ বাধিয়া গেলে ছুটির দরুন বা সাময়িকভাবে কর্তব্য ব্যাপদেশে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত সামরিক কর্মচারিগণ পশ্চিম পাকিস্তানে তাহাদের নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিতে পারে না।

তাহাদিগকে পূর্ব পাকিস্তানে কার্যে যোগ দিবার জন্য ডাকা হয়। ফলে ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৪নং আসামী সুলতানকে ১৯৬৫ সালের সেপ্‌টেম্বর মাসে চট্টগ্রাম নৌ ঘাঁটির সহিত সংযুক্ত করা হয়। উক্ত নৌ ঘাঁটির সহিত সংযুক্ত থাকাকালে তাহারা উক্ত ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত কার্যকলাপ চালাইয়া যায়।

১৬। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ৬নং আসামী এ,এফ, রহমানের করাচীর ভিক্টোরিয়া রোডস্থ 'ইলাকো হাউসের' ২১নং ফ্ল্যাট বাড়ীতে উক্ত দলের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলঃ

(১) মোয়াজ্জম, ২নং আসামী;
(২) নূর মোহাম্মদ, ৫নং আসামী;
(৩) এ, এফ, রহমান, ৬নং আসামী;
(৪) সামাদ, ৮নং আসামী; এবং
(৫) আমির হোসেন, ৩নং সাক্ষী।

এই বৈঠকে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক পালিত ভূমিকার প্রশংসা করা হয়। ৬নং আসামী এ,এফ, রহমান যুক্তরাজ্য হইতে ট্র্যানজিষ্টর সমন্বিত 'ট্র্যানসমিটার' সংগ্রহ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ২নং আসামী মোয়াজ্জমকে পূর্ব পাকিস্তানে বদলি করাইবার প্রচেষ্টা চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এই ব্যাপারে ৬নং আসামী এ,এফ, রহমানের বাড়ীতে ঐ সময় অতিথি হিসাবে অবস্থানরত ৪নং সাক্ষী মিঃ কে জি আহমদের সৌজন্যের সদ্ব্যবহার করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৭। উক্ত একই মাসে (১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর) ২নং আসামী মোয়াজ্জমের বাড়ীতে (করাচীর কারসাজস্থিত অফিসার্স কোয়ার্টার্সে)–আর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে ১৬নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ হাজির হয়। ২নং আসামী মোয়াজ্জম ব্যাখ্যা করে যে, ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৪নং আসামী সুলতান পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করিয়া যাইতেছে এবং দলের কাজ তাড়াতাড়ি সারিবার জন্য শীঘ্রই ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে ঢাকা পাঠানো হইবে। ২নং আসামী মোয়াজ্জম ৩,০০০ স্বেচ্ছাসেবী ভর্তি করিয়াছে বলিয়া দাবী করে এবং আরও দাবী করে যে, তাহাদিগকে উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা হইলে এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর কয়েকজন অফিসার ঠিকভাবে তাহাদিগকে নেতৃত্ব দান করিলে, তাহারা শীঘ্রই পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক কর্মচারীদেরকে তাড়াইয়া দিবে। ১৬নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বৈঠকে পর্যালোচিত বিষয়গুলি এ বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয়।

১৮। উক্ত একই মাসে (১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর) ৭নং আসামী মফিজুল্লাহ তাহার করাচীর কোরংগিস্থ ৩২৯/২ বাড়ীতে আর একটি বৈঠক ডাকে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলঃ

(১) সুলতান, ৪নং আসামী;
(২) মফিজুল্লাহ, ৭নং আসামী;
(৩) ফ্লাইট সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হক, ১১নং আসামী;
(৪) ওয়ারেন্ট অফিসার মোশাররফ এইচ, শেখ, ৫নং সাক্ষী;
(৫) সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমেদ, ৬নং সাক্ষী এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন যাহাদিগকে সনাক্ত করা যায় নাই।

৭নং আসামী মফিজুল্লাহ এবং ৪নং আসামী সুলতান পূনরায় ঘোষণা করে যে, কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার হইতে পৃথক করিয়াই পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করা যায়। আর তাহা সশস্ত্র বিদ্রোহ না ঘটাইয়া সফল করা সম্ভব নয়। ২নং আসামী মোয়াজ্জমের নেতৃত্বাধীনে কাজের অগ্রগতিরও উল্লেখ করা হয়।

১৯। ১৯৬৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী করাচী হইতে ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের চলিয়া যাওয়ার সময় ২নং আসামী মোয়াজ্জম তাহাকে তিনটি টেবিল ডায়েরী দেয়। ইহার কয়েকটি পৃষ্ঠায় তাহার কাজের জন্য কতগুলি উপদেশ এবং স্মারকলিপি লেখা হইয়াছিল। ২নং আসামী মোয়াজ্জম তাহাকে বলে যে,সে ঐ সকল উপদেশ তাহার নোটবুক হইতে ঐ ডায়েরীগুলিতে নকল করিয়াছে।এই সকল ডায়েরীগুলির একটিতে পরিশিষ্ট-২ এ বর্ণিত সাঙ্কেতিক নামগুলি রহিয়াছে। ইহাছাড়া সে তাহাকে একটি মানচিত্র এবং ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমানের নিকট–তাহার দাবী ক্রমে সমর্পণ করা হইবে, এইরূপ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের দুইটি তালিকা দেয়। ২নং আসামী মোয়াজ্জম ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে কোষাধ্যক্ষ হইতে অনুরোধ করে এবং দলের জন্যে অর্থসংগ্রহ ও গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে যে অর্থ খরচ

হইবে তাহা বাদ দিয়া অনুরূপভাবে নেওয়া অর্থসমূহ বাণিজ্যিক জাহাজযোগে করাচীতে তাহার (২নং আসামী মোয়াজ্জেম) নিকট পাঠাইতে বলে।

২০। ঢাকায় পৌঁছিয়া ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন চট্টগ্রাম যায়। সেখানে ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৪নং আসামী সুলতান বিদ্রোহের উদ্দেশ্য প্রচারের কাজে ব্যস্ত ছিল। ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন সেখানে যায় সে এলাকায় কাজের অগ্রগতি দেখিবার জন্য। ১৯৬৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, সে মিশকা হোটেলে তাহার কামরায় দলের একটি বৈঠক আহ্বান করে। এই বৈঠকে যোগদান করেঃ

(১) ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ৩নং আসামী;
(২) সুলতান, ৪নং আসামী;
(৩) মিঃ ভূপতিভূষণ চৌধুরী (সাধারণ্যে মানিক চৌধুরী বলিয়া পরিচিত) ১২নং আসামী;
(৪) মিঃ বিধান কৃষ্ণ সেন, ১৩নং আসামী;
(৫) সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, ই,বি আর ১৪নং আসামী;
(৬) ডাঃ সায়িদুর রহমান চৌধুরী, ৭নং সাক্ষী; এবং
(৭) প্রাক্তন লেঃ কমাণ্ডার মোহাম্মদ শহীদুল হক (পি, এন ভি, আর) ৮নং সাক্ষী।

১২নং আসামী মানিক চৌধুরী এবং ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমান, ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে বলে যে, ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান তাহাদিগকে উক্ত দলের প্রতি সংগ্রহ সমর্থন জানাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। তাহারা উহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানিত। ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে উক্ত ষড়যন্ত্রে সাহায্যকল্পে নগদ ৩,০০০ টাকা দেয়।

২১। পূর্ব পাকিস্তানে দলের নিম্নস্তরের কর্মিগণকে জোরদার করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ২নং আসামী মোয়াজ্জম, ৮নং আসামী সামাদকে ঢাকা পাঠায়। চাকুরি হইতে তাহার অবসরগ্রহণ নিশ্চিত হওয়ার পর তাহার জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তদনুসারে ২নং আসামী মোয়াজ্জম, ৮নং আসামী সামাদের জন্য একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে প্রতি মাসে ৩০০ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়া ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে একটি চিঠি লেখে। সেই চিঠিতে– চিঠিটিতে ২৫-২-৬৬নং তারিখ দেওয়া হয়–২নং আসামী আরও বলে যে, সে প্রত্যেকটি বিষয়ে পরশের (১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমানের সাংকেতিক নাম) সহিত আলোচনা করিয়াছে এবং উদ্বেগের কোন কারণ নাই।

২২। উক্ত একই মাসে ৮নং আসামী সামাদ চারজন নূতন সদস্য ভর্তি করে, যথাঃ

(১) মুজিবর রহমান, কেরানী, ই,পি,আর, টি, সি ১৫নং আসামী;
(২) প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, ১৬নং আসামী;

(৩) প্রাক্তন নায়েব সুবেদার আশরাফ আলী খান, ৯নং সাক্ষী; এবং

(৪) প্রাক্তন ল্যান্স নায়েক এ,বি,এম, ইউসুফ, ১০নং সাক্ষী।

৩নং সাক্ষী আমির হোসেন তাহাদিগকে দলের মতবাদে দীক্ষিত করে।

২৩। ১৯৬৬ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান চট্টগ্রাম সফর করে এবং লালদীঘি ময়দানে এক জনসভায় অনুষ্ঠান করে। অতঃপর সে ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমানের চট্টগ্রাম এনায়েত বাজারস্থিত ১২, রফিউদ্দিন সিদ্দিকী শাখাগুলিতে অবস্থিত বাসভবনে উক্ত দলের একটি বৈঠক আহ্বান করেঃ

(১) শেখ মুজিবর রহমান, ১নং আসামী;

(২) ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ৩নং আসামী;

(৩) মানিক চৌধুরী, ১২নং আসামী; এবং

(৪) সায়িদুর রহমান, ৭নং সাক্ষী।

১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমানকে দলের বৈঠকসমূহ অনুষ্ঠানের জন্য একটি স্থানের ব্যবস্থা করিতে বলে।

২৪। উক্ত একই মাসে (ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬) ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান দলের জন্য আর্থিক সাহায্য পাইবার আর একটি উৎস আবিষ্কার করে। ১০নং আসামী রুহুল কুদ্দুসের চাচাতো ভাই ১১ নম্বর সাক্ষী মোহাম্মদ মোহাসিন, পূর্বে ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমানকে অর্থের যোগান দিয়া আসিতেছিল। ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান তাহাকে দলের জন্য টাকা দিতে বলে। ১১নং সাক্ষী মোহসিন যখন ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমানের বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল তখন ৪নং আসামী সুলতান, ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক অনুরোদ্ধ অর্থ 'মুরাদ'কে (মুরাদ ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিবের সাংকেতিক নাম) দিতে বলে। সেই অনুসারে দুই বা তিনদিন পরে, ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব ১১নং সাক্ষী মোহসিনের নিকট হইতে দুই কিস্তিতে ৭০০ টাকা পায়।

২৫। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ২নং আসামী মোয়াজ্জমের নির্দেশক্রমে ৮নং আসামী সামাদকে ৬নং আসামী এ এফ রহমান তাহার স্ত্রীর মালিকানাধীন ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের বাড়ীর নিকট অবস্থিত পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত করে। এই পেট্রোল পাম্পের নাম গ্রীন ভিউ পেট্রোল পাম্প। উক্ত বন্দোবস্ত ছিল ৬নং আসামী এ এফ রহমানের মাধ্যমে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারীবৃন্দ এবং উক্ত দলের সদস্যগণের মধ্যে যোগাযোগ চালাইবার জন্য একটি মুখোশমাত্র। ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারিগণ বাহ্যতঃ পেট্রোল কিনিবার উদ্দেশ্যে উক্ত পেট্রোল পাম্পে যাতায়াত করিত।

২৬। ১৯৬৬ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে ২নং আসামী মোয়াজ্জম ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে ৪নং সাক্ষী কে,জি'র সহিত সাক্ষাত করিবার নির্দেশ দিয়া

একটি পত্র লেখে যাহাতে আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের ঢাকা অফিসে তাহার (২নং আসামী মোয়াজ্জমের) নিয়োগের ব্যাপারে ত্বরান্বিত করা হয়। সে ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে ভারত হইতে প্রত্যাশিত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ গুদামজাতকরণার্থ গৃহাদি ভাড়া করিবারও নির্দেশ দেয়।

২৭। উক্ত একই মাসে (১৯৬৬ সালে মার্চ মাসের প্রথম দিকে) ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন, ঢাকায় মহাখালীতে দলের একটি বৈঠক আহ্বান করে। এই বৈঠকে যোগদান করেঃ

(১) সামাদ, ৮নং আসামী;

(২) মুজিব কেরানী, ১৫নং আসামী;

(৩) এম,এ, রাজ্জাক, ১৬নং আসামী;

(৪) সার্জেন্ট জহুরুল হক, ১৭নং আসামী;

(৫) আশরাফ আলী, ৯নং সাক্ষী এবং

(৬) ইউসুফ, ১০নং সাক্ষী, এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি যাহাদের নাম নিয়ে উল্লেখ করা হইল;

(১) এল-এ-সি এম, এ, নওয়াজ;

(২) এল-এ-সি জেড, এ, চৌধুরী;

(৩) সার্জেন্ট মিয়া পি, এ, এফ (অনুসন্ধানকার্য পরিচালনাকালে এই কয়জন ব্যক্তিকে সনাক্ত করা সম্ভব হয় নাই)।

জোর দিয়া বলা হয় যে, কেবল সশস্ত্র বিদ্রোহের সাহায্যেই তাহাদের উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব। ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বলা হয় যে, ভারত সরকার তাহাদের সংগঠনকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করিবে।

২৮। ১৯৬৬ সালের ১২ই মার্চ শনিবার দিন ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান, ২নং আসামী মোয়াজ্জমের সুবিধাজনকভাবে ষড়যন্ত্রকারীদের একটি বৈঠক আহ্বান করে; কারণ কেবল সপ্তাহের শেষ দিকেই ছুটি না লইয়া মোয়াজ্জম করাচী হইতে আসিতে পারিত। বৈঠকটি সূর্যাস্তের প্রাক্কালে জনাব তাজুদ্দিনের ঢাকাস্থ ধানমণ্ডির ১৮নং সড়কস্থিত ৬১৭নং বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমানের রাজনৈতিক সহচর জনাব তাজুদ্দিন বৈঠকের জন্য তাহার বাড়ীটি ধার দিয়াছিলেন, কিন্তু নিজে ইহাতে উপস্থিত থাকেন নাই। প্রকৃতপক্ষে ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান, যাহারা কোন বাস ষ্টপ হইতে বৈঠকে হাজীর হওয়ার কথা ছিল তাহাদের অধিকাংশকেই সংগ্রহ করে এবং একটি মোটরযোগে পূর্বোক্ত বাড়ীতে লইয়া যায়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলঃ

(১) শেখ মুজিবর রহমান, ১নং আসামী;

(২) মোয়াজ্জম, ২নং আসামী;

(৩) ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ৩নং আসামী;

(৪) রুহুল কুদ্দুস, ১০ আসামী এবং

(৫) আমির হোসেন, ৩নং সাক্ষী।

২নং আসামী মোয়াজ্জম আশা প্রকাশ করে যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনগণ তাহাদের পিছনে দাঁড়াইবে। সমস্ত অংশগ্রহণকারী এই বিষয়ে একমত হয় যে, সেই পর্যায় আসিয়া গিয়াছে যে পর্যায়ে ষড়যন্ত্রের সদস্যদেরকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা এবং অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ভারতীয় কর্মচারীদের সহিত অস্ত্রশস্ত্র সংক্রান্ত লেনদেন সম্পর্কে আলোচনা চালাইবার জন্য ভারতে তাহাদের কতিপয় প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা বিবেচনা করা হয়।

২৯। কয়েকদিন পরে ৯নং সাক্ষী আশরাফ আলী, ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের নিকট একটি নক্শা অর্পণ করে, যাহাকে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সামরিক ছাউনিগুলির মধ্যে একটির পরিকল্পনার নকশা বিবেচনা করা হয়।

৩০। ১৯৬৬ সালের ১৯শে মার্চ তারিখে লিখিত একটি পত্রে ২নং আসামী মোয়াজ্জম, ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে জানায় যে, ৬নং আসামী এ, এফ, রহমান এই বলিয়া তাহাকে টেলিফোন করিয়াছে যে, ২নং আসামী মোয়াজ্জমকে ঢাকায় বদলি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে আরও জানায় যে, কয়েকদিনের মধ্যেই ৫নং আসামী নূর মোহাম্মদ ঢাকা যাইবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাহাকে জানাইবে। উক্ত একই পত্রে ছদ্ম ভাষায় আরও লিখে যে, সে তাহার চাকর শফির (এখন পর্যন্ত খুঁজিয়া বাহির করা যায় নাই) মারফত তাহার (আমীর হোসেন) নিকট ছোট ছোট অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করিবে এবং ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে অস্ত্রশস্ত্র খরিদ করিবার জন্য আরও অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে।

৩১। প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে ২নং আসামী মোয়াজ্জম, ৬নং আসামী এ, এফ, রহমানের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার এবং ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টের মাধ্যমে উক্ত টাকা তাহার নিকট পাঠাইবার নির্দেশ দান করিয়া ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে আরও একটি পত্র লেখে। তদনুসারে ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন, ৬নং আসামী এ, এফ, রহমানের নিকট হইতে নগদ ৫,৫০০ টাকা আদায় করে। সে ১৯৬৬ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ৫,৫০০ টাকা একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে ২নং আসামী মোয়াজ্জমের নিকট প্রেরণ করে এবং ৫০০ টাকা তাহার নিজের নিকট রাখিয়া দেয়।

৩২। ১৯৬৬ সালের ৩রা এপ্রিল তারিখে ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন, ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমানের ঢাকার ধানমণ্ডির বাসভবনে যায় এবং তাহাকে বলে যে, দলের জন্য ছোট ছোট অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ খরিদের জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন রহিয়াছে। ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে নগদ ৪,০০০ টাকা দেয়। ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব দলের জন্য ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমানের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিবার জন্য, ২নং আসামী

মোয়াজ্জম কর্তৃক মনোনীত হইয়াছিল। ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব উক্ত অর্থ ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের নিকট অর্পণ করে।

৩৩। পরদিন ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন, ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট হইতে ছদ্ম ভাষায় লিখিত একটি পত্র পায়। এই পত্রে অধিকতর অর্থ সংগ্রহ করিবার জরুরী প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করা হয়। তদনুসারে ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন আরও অর্থের জন্য ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মজিবকে, ১০নং আসামী রুহুল কুদ্দুসের নিকট পাঠায়। ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব ১০নং আসামী রুহুল কুদ্দুসের নিকট হইতে ২,০০০ টাকা সংগ্রহ করে এবং উক্ত অর্থ ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের নিকট অর্পণ করে।ইহার পর ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন একটি বাণিজ্যিক জাহাজের মারফতে ২নং আসামী মোয়াজ্জমের নিকট পাঠাইবার জন্য ৬,০০০ টাকা দিয়া ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে চট্টগ্রাম পাঠায়।

৩৪। প্রায় একইকালে ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন দলের খরচে ঢাকার দীননাথ সেন রোডের ১০৭নং বাড়ী ভাড়া নেয়। এই বাড়ীতে ৮২৪৫২ নম্বর একটি টেলিফোন সংযোগ করা ছিল।

৩৫। ১৯৬৬ সালের ৬ই এপ্রিল ২নং আসামী মোয়াজ্জম তাহার নিকট পূর্বে প্রেরিত ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের নিকট একখানা চিঠি লিখে। ঐ চিঠিতে সে ছদ্ম ভাষায় ষড়যন্ত্রের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করে এবং ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে একটি বাজেট তৈরী করিতে বলে। ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের অস্ত্রশস্ত্র সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব থাকায় ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমানের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত সে বাজেট তৈরী না করিতে মনস্থ করে।

৩৬। ইহার পরে পরেই ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন, ২নং আসামী মোয়াজ্জমের নিকট হইতে ১৯৬৬ সালের ৮ই এপ্রিল লিখিত একটি চিঠি পায়। ঐ চিঠিতে সে 'তুষার'কে (৬নং আসামী এ,এফ, রহমানের সাংকেতিক নাম) খবর দিতে বলে যে, সে (২নং আসামী মোয়াজ্জম) বদলি হইয়া ১৯৬৬ সালের ২২শে এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানে যাইতেছে।

৩৭। ঐ একই মাসে (এপ্রিল, ১৯৬৬) ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী, ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমানের ধানমণ্ডির বাড়ীতে যায়। সেখানে সে ৪নং আসামী সুলতানকে উপস্থিত দেখিতে পায়। ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান, ৪নং আসামী সুলতানকে টাকা দেওয়ার জন্য, ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীকে বলে। তিন-চারদিন পরে ৪নং আসামী সুলতান ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীর চট্টগ্রাম শহরস্থিত ৪১নং রামজয় মহাজন লেনের বাড়ীতে যায় এবং ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে তাহাকে ১,৫০০ টাকা দেয়।

৩৮। ঐ একই মাসে (এপ্রিল, ১৯৬৬) ১১নং সাক্ষী মহসীন, ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমানের ঢাকাস্থিত ধানমণ্ডির বাড়ীতে যায়। ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান, ১১নং সাক্ষী মহসীনকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে যে, সে একটি বিপ্লবী দল গঠন করিয়াছে, এবং ইহাতে অন্যান্যদের সাথে সশস্ত্র বাহিনীর কর্মরত এবং প্রাক্তন কর্মচারীরা রহিয়াছে। তারপর সে তাহাকে গ্রুপের কার্যকলাপের জন্যে আর্থিক সাহায্য প্রদানের অনুরোধ করে।

৩৯। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষাশেষি অথবা মে মাসের প্রথম দিকে, ২নং আসামী মোয়াজ্জম তাহার চট্টগ্রাম বদলি হওয়ার পর, ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের সাথে তাহার ঢাকাস্থিত গেণ্ডারিয়ার দীননাথ সেন রোডের ১০৭নং বাড়ীতে যাইয়া দেখা করে। সংঘের জন্য প্রাপ্ত টাকার ফিরিস্তি এবং সংঘের কাজে যে টাকা খরচ হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তাহারা আলোচনা করে। ২নং আসামী মোয়াজ্জম সংঘের নামে বিরাট খরচের ন্যায্যতা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হওয়ায়, ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন এবং ২নং আসামী মোয়াজ্জমের মধ্যে ইহার জন্য কথা কাটাকাটি হয়। ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন ২নং আসামী মোয়াজ্জমের নেতৃত্বে আস্থা হারায়। ঐদিন সন্ধ্যায় ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন, দুইখানা ক্যাশ বই ও হিসাব সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রসহ ৮,০০০ টাকা, ২নং আসামী মোয়াজ্জমকে ডাঃ খালেকের ঢাকাস্থিত ধানমণ্ডির আবাসিক এলাকার ২নং রোডের বাড়ীতে অর্পণ করে। সেই সময়ে ২নং আসামী মোয়াজ্জম ঐ বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিল। বাড়ীর নাম 'আলেয়া'। ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন দীননাথ সেনের যে বাড়ীতে বাস করিতেছিল সে বাড়ীর বাকী ভাড়া পরিশোধ করিবার জন্যে ২নং আসামী মোয়াজ্জম উক্ত ৮,০০০ টাকা হইতে ১,৫০০ টাকা ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে দেয়। ৩নং সাক্ষী ইহার পর ষড়যন্ত্রের সাথে তাহার সম্পর্ক ছিন্ন করে।

৪০। ২নং আসামী মোয়াজ্জম ১৯৬৬ সালের ১লা মে চট্টগ্রামে নৌ-ঘাঁটিতে বদলি হয়। তাহার বদলির কিছুকাল পরে সে সংঘের একটি বৈঠকের আয়োজন করে। ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমানের বাহির বাড়ীর একটি ঘরে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সে সংঘের লোকদের দেখা-সাক্ষাতের জন্য এই ঘরটি ব্যবহার করিতে সম্মতি দিয়াছিল।

এই বাহিরের ঘরটি চট্টগ্রামস্থ ইনায়েত হোসেন মার্কেটে অবস্থিত। বৈঠকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলঃ–

(১) মোয়াজ্জম, ২নং আসামী;
(২) ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ৩নং আসামী;
(৩) সুলতান, ৪নং আসামী;
(৪) মানিক চৌধুরী, ১২নং আসামী;
(৫) মিঃ মোহাম্মদ খুরশীদ, ১৮নং আসামী; এবং
(৬) সায়িদুর রহমান, ৭নং সাক্ষী।

১২নং আসামী মানিক চৌধুরী এবং ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমানকে সভার আলোচনা হইতে বাদ দেওয়া হয়।

৪১। ১৯৬৬ সালের ৬ই মে, ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমানকে তাহার কার্যকলাপের জন্য পাকিস্তান রক্ষা-বিধিবলে গ্রেপ্তার করা হয়। উক্ত কার্যকলাপের সঙ্গে এই ষড়যন্ত্রের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে গ্রেফতার হওয়ার এবং হাজতে নেওয়ার পূর্বে পর্যন্ত সে পাকিস্তান রক্ষাবিধি বলে আটক ছিল। পাকিস্তান রক্ষাবিধি বলে আটক থাকাকালে তাহার বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা চলিয়াছিল।

৪২। ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান পূর্বোক্ত গ্রেপ্তারের পর, যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিযুক্ত, সেই রাজনৈতিক দল তাহার বাড়ীতে, ১৯৬৬ সালের ২০শে মে এক জরুরী বৈঠকের অনুষ্ঠান করে। ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী এই সভায় যোগদানের জন্য চট্টগ্রাম হইতে ঢাকা যায়। বৈঠকে যোগদানের আগে ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমানকে সঙ্গে লইয়া ঢাকাস্থিত ভারতীয় ডেপুটি কমিশনার-এর অফিসে যায় এবং উক্ত ভারতীয় কূটনৈতিক দপ্তরের ফার্ষ্ট সেক্রেটারী মিঃ পি, এন, ওঝার সঙ্গে দেখা করে। মিঃ পি, এন, ওঝা ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমানের নামধাম টুকিয়া রাখে এবং পরে কোন সময় তাহার সহিত দেখা করিতে বলে ।৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমান ঐ অফিস হইতে বাহির হইয়া আসে, কিন্তু ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী আরো কিছুক্ষণের জন্য সেখানে থাকিয়া যায়।

৪৩। ১৯৬৬ সালের ২০শে মে দিবাগত রাত্রে, ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীকে কোন কার্যকলাপের জন্য পাকিস্তান রক্ষাবিধি বলে চট্টগ্রামে গ্রেফতার করা হয়। ঐ কার্যকলাপের সঙ্গে এই ষড়যন্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই।

৪৪। ঐ একই মাসে (মে, ১৯৬৬) ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীর গ্রেফতারের পর ২নং আসামী মোয়াজ্জম ষড়যন্ত্রকারীদের আরো দুইটি বৈঠক ডাকে। এই বৈঠক দুইটি পুর্বোক্ত 'বাহিরের ঘরে' অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহাতে উপস্থিত থাকেঃ–

(১) মোয়াজ্জম, ২নং আসামী;
(২) ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ৩নং আসামী;
(৩) সুলতান, ৪নং আসামী;
(৪) খুরশীদ, ১৮নং আসামী;
(৫) সায়িদুর রহমান, ৭নং সাক্ষী।

বিভিন্ন সদস্যের উপর কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা ও পরিকল্পনাকে সফলভাবে কার্যকরী করিবার জন্য যে পন্থা গ্রহণ করা হইবে সে সম্বন্ধে এই বৈঠকে আলোচনা হয়। ঢাকা, কুমিল্লা, যশোহর ও চট্টগ্রাম নৌঘাঁটির নক্শা পরীক্ষা করা হয়। আরো টাকা-পয়সা ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৪৫। ঐ একই মাসে (মে, ১৯৬৬) ১২নং সাক্ষী মিঃ এম,এম রমীজ, ২নং আসামী মোয়াজ্জমের সংস্পর্শে আসে এবং ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়। ১২নং সাক্ষী রমীজ ঐ সময়ে চট্টগ্রামস্থিত পি, আই, এ, অফিসের ডিষ্টিক্ট ম্যানেজার ছিল।

৪৬। অল্পকাল পরেই ১২নং সাক্ষী রমীজ ১৯নং আসামী মিঃ কে, এম, শামসুর রহমান, সি, এস, পিকে ষড়যন্ত্রকারীদের দলে টানে। সেই সময়ে সে চট্টগ্রামস্থিত চট্টগ্রাম উন্নয়ন সংস্থার (চিটাগং ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) চেয়ারম্যানরূপে কার্য্যত ছিল।

৪৭। ঐ একই মাসে (মে, ১৯৬৬) ৯নং সাক্ষী আশরাফ আলী এবং ৮নং আসামী সামাদ ঢাকাস্থিত আজিমপুর রোডের ১০০/৩নং বাড়ী যাহা 'সাইকী' Psyche নামে অভিহিত তাহা সংঘের খরচে ভাড়া নেয়। তারপর এই দুই ব্যক্তি ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের বাড়ী হইতে এই নূতন বাড়ীতে উঠিয়া যায়। তাহারা আগে ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের বাড়ীতে বাস করিতে ছিল।

৪৮। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে, ২নং আসামী মোয়াজ্জম তাহার নাসিরাবাদ হাউসিং সোসাইটির বাড়ীতে ১২নং সাক্ষী রমীজকে একটি ডাইরী, একটি নোটবই এবং একটি ফোল্ডার দেয়া এবং তাহাকে ঐগুলি পড়িতে বলে। প্রস্তাবিত স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ এবং উদ্দেশ্য কি হইবে তাহা উপরোক্ত দলিলপত্রাদি হইতে উদঘাটিত হয়। সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন, শিল্পসমূহ জাতীয়করণ এবং মুদ্রার পরিবর্তে কুপনের প্রচলন করার কথা ছিল। ২নং আসামী মোয়াজ্জম, তাহাকে নূতন রাষ্ট্রের জন্য প্রস্তাবিত সবুজ ও সোনালী রঙ্গের পতাকাও দেখাইয়াছিল।

৪৯। পরে ঐ মাসেই (জুন ১৯৬৬) ২নং আসামী মোয়াজ্জম, ১২নং সাক্ষী রমীজের বাসস্থানে (পি, আই, এ, হাউসনং ৬০, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম) এক বৈঠক আহ্বান করে, ইহাতে উপস্থিত ছিলঃ–

(১) মোয়াজ্জম, ২নং আসামী;
(২) ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ৩নং আসামী;
(৩) খুরশীদ, ১৮নং আসামী;
(৪) রিসালদার শামসুল হক এ-সি, ২০নং আসামী; এবং
(৫) হাবিলদার আজিজুল হক, এস-এস-পি, ২১নং আসামী এবং
(৬) রমীজ, ১২নং সাক্ষী।

রমীজকে, সংঘের পুরোভাগের কর্মীদের সাথে পরিচয় করাইয়া দেওয়াই ছিল এই বৈঠকের উদ্দেশ্য। উপরে যাহাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে ইহাদের ছাড়াও কিছুসংখ্যক কর্মী এই বৈঠকে যোগদান করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সনাক্ত করা যায় নাই।

৫০। ইহার পর ঐ একই মাসে (জুন ১৯৬৬) ২নং আসামী মোয়াজ্জম তাহার বাসস্থানে (নাছিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম) সংঘের এক বৈঠক আহ্বান করে। ইহাতে উপস্থিত ছিলঃ–

(১) মোয়াজ্জম, ২নং আসামী;
(২) ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ৩নং আসামী;
(৩) সুলতান, ৪নং আসামী;
(৪) সুবেদার রাজ্জাক, ১৪নং আসামী;
(৫) জহুরুল হক, ১৭নং আসামী;
(৬) খুরশীদ, ১৮নং আসামী;
(৭) রিসালদার শামসুল হক, ২০নং আসামী;
(৮) আশরাফ আলী, ৯নং সাক্ষী এবং
(৯) ইউসুফ, ১০নং সাক্ষী (সার্জেন্ট শফী নামধারী এক ব্যক্তিও বৈঠক উপস্থিত ছিল। কিন্তু তাহাকে সনাক্ত করা যায় নাই)।

২নং আসামী মোয়াজ্জেম, তাহার ডাইরী ও নোটবই সকলকে দেখায়। ইহাতে প্রস্তাবিত নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র যাহা 'বাংলা দেশ' নামে অভিহিত হইবে, তাহার প্রধান প্রধান রূপরেখা লিখিত ছিল। প্রস্তাবিত জাতীয় পতাকাও সেই বৈঠকে প্রদর্শিত হয়।

৫১। ১৯৬৬ সালের জুন/জুলাই মাসে, ৭নং আসামী মফিজুল্লাহ তাহার বাসস্থানে (২৫/৩, আবিসিনিয়া লাইন্স, কয়ারী) বিমান বাহিনী হইতে আগত ষড়যন্ত্রকারীদের এক বৈঠক আহ্বান করে। ইহাতে যোগদান করিয়াছিলঃ–

(১) নূর মোহাম্মদ, ৫নং আসামী;
(২) মফিজুল্লাহ, ৭নং আসামী;
(৩) এস-এ-সি মাহফুজুল বারি, ২২নং আসামী;
(৪) মোশাররফ, ৫নং সাক্ষী;
(৫) করপোরাল জামালুদ্দিন আহমদ, ১৪নং সাক্ষী; এবং
(৬) করপোরাল সিরাজুল ইসলাম, ১৫নং সাক্ষী।

এই বৈঠকে আরো কয়েকজন যোগদান করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নৌবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত বলিয়া এই বৈঠকে ৫নং আসামী নূর মোহাম্মদের গুরুত্বের উপর ব্যাপক আলোচনা হয়। ৭নং আসামী মফিজুল্লাহর অনুরোধে ঢাকা হইতে সদ্য প্রত্যাগত, ১৪নং সাক্ষী করপোরাল জামাল, পূর্ব পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রকারীদের কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে উপস্থিত শ্রোতাদের অবহিত করে। সে আরো বলে যে, ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ বেসামরিক অফিসার তাহাদের কার্যাবলী জোরদার করিয়াছেন। ১৫নং সাক্ষী সিরাজের ছুটিতে পূর্ব পাকিস্তান যাওয়ার কথা ছিল। তাহাকে ৭নং আসামী মফিজুল্লাহ্ বলে যে, সে যেন ঢাকা যাইয়া ১১নং আসামী ফজলুল হক এবং ২৩নং আসামী পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সার্জেন্ট মোহাম্মদ শামসুল হকের সাথে ঢাকায় বিমান বাহিনীর আড্ডায় যাইয়া দেখা করে এবং অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে।

৫২। ১৯৬৬ সালের জুন-জুলাই মাসের কোন এক সময়ে ব্যবস্থা করা হয় যে, ২নং আসামী মোয়াজ্জম এবং ১২নং সাক্ষী রমীজকে কুমিল্লা সফর করিতে হইবে। তদনুসারে ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মজিবকে কুমিল্লা পাঠানো হয়, ২৪নং আসামী এ, এম সি-র মেজর (তৎকালে ক্যাপ্টেন) শামসুল আলমকে সংবাদ দেওয়ার জন্য। ২নং আসামী মোয়াজ্জম এবং ১২নং সাক্ষী রমীজ ২নং আসামী মোয়াজ্জমের হিলম্যান ইম্পনং ই-বি-এ ৯৫৯১ মোটর গাড়ীযোগে চট্টগ্রাম ত্যাগ করে। তাহারা ২৪নং আসামী শামসুল আলমের কুমিল্লাস্থ বাসভবনে যায়। সেখানে ২৫নং আসামী ক্যাপটেন মোহাম্মদ আবদুল মোতালিব বেলুচ রেজিমেন্ট (ইপি আর এর সহিত যুক্ত) তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয়। ২নং আসামী মোয়াজ্জম বলে যে, ২৪নং আসামী শামসুল আলমকে কুমিল্লার সেক্টর কমাণ্ডার হিসাবে কাজ করিতে হইবে। সে ব্যাখ্যা করিয়া বলে যে, সংগ্রাম চলাকালে পরিকল্পনা হইবে সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির অস্ত্রশস্ত্র দখল করিয়া ফেলা এবং এইভাবে তাহাদের যুদ্ধ ক্ষমতা বিকল করিয়া ফেলা। সে মন্তব্য করে যে, অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা জনশক্তির অভাব পূরণ করা হইবে। সে ২৪নং আসামী শামসুল আলমকে, সামরিক এবং প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীদের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ বৃদ্ধি করিবার জন্য অনুরোধ করে। ২৫নং আসামী মোতালেব বলে যে, সে ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস এর লোকদের দলভুক্ত করিতেছে। পরে তাহাদের মধ্যে পাঁচজন একই মোটর গাড়ীতে কুমিল্লা সামরিক ছাউনিতে, ২৬নং আসামী ক্যাপটেন মোহাম্মদ শওকত আলী মিঞা, এ ও সি এর বাড়ীতে যায়। সেখানে ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিবও তাহাদের সহিত মিলিত হয়। ২৬নং আসামী শওকত ২নং আসামী মোয়াজ্জমকে জানায় যে, সে ঢাকায় ১৩নং সাক্ষী ক্যাপটেন মোহাম্মদ আবদুল আলিম ভুঞা এ ও সি এবং ২৭নং আসামী ক্যাপটেন খোন্দকার নাজমুল হুদা, এ এস সি-র সহিত যোগাযোগ করিয়াছে এবং উক্ত অফিসারদ্বয় সংগঠন সম্পর্কে অধিকতর তথ্য জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। ২নং আসামী মোয়াজ্জম ইহার পরে সত্বর একটি বৈঠক আয়োজন করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়।

৫৩। উক্ত একই মাসে (জুলাই, ১৯৬৬) ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমানের ২নং আসামী মোয়াজ্জমের সহিত মোয়াজ্জমের চট্টগ্রামস্থিত বাসভবনে সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ হয়।

সেইবার ২নং আসামী মোয়াজ্জম, ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমানের নিকট প্রকাশ করে যে, ষড়যন্ত্রের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী তাহার গ্রেফতারের পূর্বে, অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকা ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের ফার্ষ্ট সেক্রেটারী পি, এন ওঝার

নিকট অর্পণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। ২নং আসামী মোয়াজ্জম, ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করে, সে পি এন ওঝাকে জানে কিনা। ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমান হ্যাঁ-সূচক জওয়াব দেয়, যাহার ফলে ২নং আসামী মোয়াজ্জম অস্ত্রশস্ত্রের তালিকাটি পি,এন, ওঝার নিকট পৌছাইবার জন্য, ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমানকে অনুরোধ করে। ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমান অবশ্য তাহার উপর আরোপিত সতর্ক নজরের অজুহাতে উক্ত কার্য সম্পাদনে অক্ষমতা প্রকাশ করে।

৫৪। কয়েকদিন পর একদিন সকাল বেলা, চট্টগ্রাম ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমানের বাড়ীতে পি, এন, ওঝা উপস্থিত হয় এবং অভিযোগ করে যে, তাহার অনুরোধ সত্ত্বেও সে (৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমান) তাহার ঢাকা অফিসে দেখা করে নাই। সেইবার ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমান, ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী, পি, এন, ওঝার নিকট যে অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা অর্পণ করিবার কথা ছিল, সেই অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা সম্পর্কে পি, এন, ওঝার নিকট ২নং আসামী মোয়াজ্জমের বার্তা পৌছায়।

৫৫। পরদিন পি,এন, ওঝার নির্দেশক্রমে, ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমান, ২নং আসামী মোয়াজ্জমের নিকট হইতে উক্ত তালিকাটি সংগ্রহ করে এবং উহা চট্টগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনে পি,এন, ওঝার নিকট অর্পণ করে। সেই সময় পি,এন, ওঝা ঢাকাতে তাহার সহিত যোগাযোগ করিবার জন্য ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমানকে একটি সংকেত শব্দ দেয় এবং ২নং আসামী মোয়াজ্জমকে ঢাকায় পি,এন, ওঝার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলে।

৫৬। ইহার কিছুদিন পরে ২নং আসামী মোয়াজ্জম, ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমানের মাধ্যমে ঢাকার ধানমণ্ডিতে ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের সরকারী বাসভবনে পি,এন, ওঝার সহিত এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে। পি,এন, ওঝা ২নং আসামী মোয়াজ্জমকে আশ্বাস দেয় যে, সে উক্ত অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা ভারত সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠাইবে। সে অবশ্য তখনকার মত ষড়যন্ত্রকারীদের নিকট টাকা-পয়সা পৌছাইতে তাহার অক্ষমতা প্রকাশ করে।

৫৭। ১৯৬৬ সালের আগষ্ট মাসের কোন এক সময়ে ২৬নং আসামী শওকত ঢাকা সফর করে এবং ১৩নং সাক্ষী আলিমের সাথে অর্ডিন্যান্স মেসে অবস্থান করে। সেইদিন বিকালেই ২নং আসামী মোয়াজ্জম উক্ত মেসে ১৩নং সাক্ষী আলিম এবং ২৬নং আসামী শওকতের সহিত সাক্ষাৎ করে। সেই উপলক্ষে ২নং আসামী মোয়াজ্জম ঘোষণা করে যে, সে পরদিন সকালে ১২নং সাক্ষী রমীজের, ঢাকা মোহাম্মদপুর হাউজিং এষ্টেটস্থিত ফ্লাটে একটি বৈঠকের অনুষ্ঠান করিবে। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ উপরোক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলঃ–

(১) মোয়াজ্জম, ২নং আসামী;
(২) ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ৩নং আসামী;
(৩) সুলতান, ৪নং আসামী ;
(৪) নাজমুল হুদা, ২৭নং আসামী;
(৫) শওকত, ২৬নং আসামী; এবং
(৬) আলিম, ১৩নং সাক্ষী।

২নং আসামী মোয়াজ্জম ষড়যন্ত্রকারীদেরকে সংগ্রামের পরিকল্পনা সম্বলিত একটি ডায়েরী এবং একটি নোটবই দেখায়। ২নং আসামী মোয়াজ্জম দাবী করে যে, ষড়যন্ত্রের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করিবার জন্য সে ইতিমধ্যেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষগণের সহিত যোগাযোগ করিয়াছে। সে এই ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, যশোহর এবং রংপুর এলাকায় জনগণকে নেতৃত্বদান করিবার জন্য সদস্যগণকে দলে আরও কিছুসংখ্যক সামরিক অফিসার ভর্তি করিতে হইবে। সে দাবী করে যে, ২৮নং আসামী ক্যাপটেন এ এন এম নুরুজ্জামান ই বি আর এবং তাহার নিজ নৌশক্তি চট্টগ্রামে দায়িত্ব পালনের পক্ষে যথেষ্ট। ২নং আসামী মোয়াজ্জম কুমিল্লায় ২৫নং আসামী মোতালিব এবং ২৪নং আসামী শামসুল আলমের কার্যাবলীর প্রশংসা করে।

৫৮। উক্ত একই মাসে (আগষ্ট, ১৯৬৬) ২৭নং আসামী নাজমুল হুদা, ২৪নং আসামী শামসুল আলম, ১৩নং সাক্ষী আলীম এবং ২৬নং আসামী শওকত দাউদকান্দি রেষ্ট হাউসে মিলিত হয়। তাহারা উপলব্ধি করে যে, ষড়যন্ত্রকারীদের নেতৃত্বভার একজন সিনিয়র সামরিক অফিসারের হস্তে ন্যস্ত করা উচিত। তাহারা ২নং আসামী মোয়াজ্জমকে সংগঠকগণের পূর্বপরিচিতিসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবার সিদ্ধান্ত নেয়।

৫৯। উক্ত একই মাসে (আগষ্ট, ১৯৬৬) ২নং আসামী মোয়াজ্জম সংঘের কাজের জন্য একটি মোটর গাড়ী খরিদ করিবার জন্য, সংঘের তহবিল হইতে ১২নং সাক্ষী রমীজকে ৫,০০০ টাকা দেয়।

৬০। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কোন এক সময়, ২নং আসামী মোয়াজ্জম, ১২নং সাক্ষী রমীজের ঢাকার মোহাম্মপুর হাউজিং এষ্টেটস্থিত ১২/বি ৮নং ফ্লাটে এই ষড়যন্ত্রকারীদের একটি বৈঠকের অনুষ্ঠান করে।

উক্ত বৈঠকে যোগদান করেঃ–

(১) মোয়াজ্জম, ২নং আসামী;
(২) ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ৩নং আসামী;
(৩) সুলতান, ৪নং আসামী;
(৪) শামসুর রহমান, ১৯নং আসামী;

(৫) শামসুল আলম, ২৪নং আসামী;
(৬) মোতালিব, ২৫নং আসামী;
(৭) নাজমুল হুদা, ২৭নং আসামী;
(৮) রমীজ, ১২নং সাক্ষী; এবং
(৯) আলিম, ১৩নং সাক্ষী।

২নং আসামী মোয়াজ্জম ষড়যন্ত্রকারীদের নিকট এই তথ্য প্রকাশ করে যে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। সে ২৫নং আসামী মোতালিবকে, প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন দল গঠন করিবার এবং তাহাদিগকে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষাদান করিবার নির্দেশ দেয়। ২নং আসামী মোয়াজ্জম সেক্টর কমাণ্ডারগণের স্বাভাবিক আর্থিক প্রয়োজনসমূহ মিটাইবার দায়িত্ব নেয়। ২৭নং আসামী নাজমুল হুদা, ২৪নং আসামী শামসুল আলম এবং ১৩নং সাক্ষী আলিম এই প্রস্তাব করিয়া বৈঠকের কার্যধারায় ব্যাঘাত ঘটায় যে, একজন সিনিয়র সামরিক কর্মচারীর উপর নেতৃত্বভার ন্যস্ত করা উচিত। ১৯নং আসামী শামসুর রহমান অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল এম,এ, জি, ওসমানীর সহিত যোগাযোগ করিবার দায়িত্ব নিয়া উক্ত যুক্তিতর্ক সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে সে। ব্যাখ্যা করিয়া বলে যে, ভারত এবং তাহার সমর্থক জোট আগ্রহ সহকারে 'স্বাধীন বাংলা'কে স্বীকৃতিদান করিবে এবং আন্তর্জাতিক কারণে ভারত নূতন রাষ্ট্রের রাজ্য এলাকা জোরপূর্বক দখল করা হইতে বিরত থাকিবে। ২নং আসামী মোয়াজ্জম ঘোষণা করে যে, স্বাধীনতা অর্জনের পর সঙ্গে সঙ্গে দেশে সামরিক শাসন জারী করা হইবে এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবার পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। ১২নং সাক্ষী রমীজ মত প্রকাশ করে যে, সশস্ত্র বিদ্রোহকালে পি, আই এ এবং পি এ এফ বিমানসমূহ এবং রেডিও সেটসমূহ ব্যবহার করিয়া যোগাযোগ সংরক্ষণ করা হইবে। ষড়যন্ত্রকারীদের একজন প্রস্তাব করে যে, বিদ্রোহকালে পূর্ব পাকিস্তানের বন্দীকৃত পশ্চিম পাকিস্তানীদের সহিত পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত পূর্ব পাকিস্তানীদিগকে বিনিময় করা হইবে।

৬১। উক্ত একই মাসে (সেপটেম্বর ১৯৬৬) দ্বিতীয় বারের মত ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমান ২নং আসামী মোয়াজ্জম এবং মিঃ পি, এন, ওঝার মধ্যে পি এন ওঝার ঢাকাস্থিত ধানমণ্ডির বাসভবনে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে। পি, এন, ওঝা ২নং আসামী মোয়াজ্জমকে বলে যে, ভারত সরকার ষড়যন্ত্রকারীদিগকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিতে রাজি হইয়াছে এবং সে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ অর্পণ করিবার তারিখ সম্বন্ধে ২নং আসামী মোয়াজ্জমকে যথাসময়ে খবর দিবে।

৬২। ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে সংঘের আহ্বানে সিনিয়র সামরিক অফিসারগণ কি রকম সাড়া দিয়াছে তাহা যাচাই করিবার জন্য ১৯নং আসামী শামসুর রহমানের পরামর্শক্রমে ২নং আসামী মোয়াজ্জম চট্টগ্রামে তাহার বাসভবন অ্যাঙ্করেজ-এ একটি বৈঠকের আয়োজন করে। ইহাতে (অবসরপ্রাপ্ত) কর্ণেল এম, এ, জি, ওসমানীকে আমন্ত্রণ করা হয়। ইহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলঃ–

(১) মোয়াজ্জম, ২নং আসামী;
(২) শামসুর রহমান, ১৯নং আসামী;
(৩) রমীজ, ১২নং সাক্ষী।

২নং আসামী মোয়াজ্জম ষড়যন্ত্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্টগুলির উল্লেখ করে। সে আরও প্রকাশ করে যে, ভারতের সহিত এই মর্মে 'একটি অলিখিত অথচ বিশ্বাসযোগ্য চুক্তি' করা হইয়াছে যে, স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে ভারত পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্যমান সীমান্ত লংঘন করিবে না এবং ভারত পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক যে-কোন প্রকার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে, সমুদ্র এবং আকাশপথ সমর্থন করিবে। কর্ণেল এম, এ, জি ওসমানী শুধু শুনিয়া যায়।

৬৩। ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমান তৃতীয়বারের মত, ২নং আসামী মোয়াজ্জম এবং পি, এন, ওঝার মধ্যে পি,এন, ওঝার ঢাকাস্থিত ধানমণ্ডির বাসভবনে এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে। পি,এন ওঝা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলে যে, ভারতে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের দরুন অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করিবার তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। পি,এন,ওঝা ষড়যন্ত্রকারীদিগকে ভারতের সাধারণ নির্বাচন সমাপ্ত না হওয়া অবধি অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের জন্য অপেক্ষা করিবার পরামর্শ দেয়।

৬৪। উক্ত একই মাসে (অক্টোবর, ১৯৬৬) ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব আর্থিক সাহায্যের জন্য ১১নং সাক্ষী মহসীনের সহিত সাক্ষাৎ করে। মোহাম্মদ মহসীন তাহাকে ২,০০০ টাকা দেয় । ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব বলে যে, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করিবার জন্য তিন হইতে চার লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। ১১নং সাক্ষী মহসীন হকচকাইয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে তাহার ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয়।

৬৫। ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী মাসের ২৩ তারিখে বা ঐ তারিখের কাছাকাছি কোন তারিখে ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীকে হাজত হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

৬৬। ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, ৭নং আসামী মফিজুল্লাহও ঢাকায় পৌঁছে এবং ১৬নং আসামী এম,এ,রাজ্জাকের ঢাকার আওলাদ হোসেন

মার্কেটে অবস্থিত দোকানে দলভুক্ত বিমান বাহিনীর কর্মচারীগণের একটি বৈঠকের অনুষ্ঠান করে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলঃ–

(১) মফিজুল্লাহ, ৭নং আসামী;
(২) এবং এম এ রাজ্জাক, ১৬নং আসামী;
(৩) সার্জেন্ট শামসুল হক, ২৩নং আসামী এবং
(৪) সিরাজ, ১৫নং সাক্ষী।

আরও কয়েকজন এই বৈঠকে যোগদান করিয়াছিল কিন্তু তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা যায় নাই। বৈঠকে ষড়যন্ত্রের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করা হয়।

৬৭। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে ২নং আসামী মোয়াজ্জমকে পূর্ব পাকিস্তান আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থায় চাকরি দেওয়া হয় এবং বরিশালে বদলি করা হয়।

৬৮। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে ১৫নং সাক্ষী সিরাজ ও ৭নং আসামী মফিজুল্লাহ করাচীতে ফিরিয়া যায়।

৬৯। উক্ত একই মাসে (মার্চ ১৯৬৭) ২নং আসামী মোয়াজ্জম, ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীর মাধ্যমে পি এন ওঝার ঢাকাস্থ বাসভবনে পিএন ওঝার সহিত তাহার চতুর্থ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে। ১৯৬৭ সালের ১০ই মার্চ তারিখে, ২নং আসামী মোয়াজ্জম, ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী এবং ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমান পি এন ওঝার সহিত সাক্ষাৎ করে। পি এন ওঝা তাহাদিগকে জানায় যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন সমাপ্ত না হওয়া অবধি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করিবার তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। পি এন ওঝা তাহাদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। সাক্ষাৎকারের সমাপ্তিতে পি এন ওঝা তাহাদিগকে নগদ ৫,০০০ টাকা দেয়।

৭০। ১৯৬৭ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ২নং আসামী মোয়াজ্জম ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী এবং ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমানের পি এন ওঝার ঢাকাস্থ বাসভবনে পি এন ওঝার সহিত পঞ্চমবারের মত সাক্ষাৎ করে। সেই সাক্ষাতকারে পি এন ওঝা প্রকাশ করে যে, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করিবার পূর্বে ষড়যন্ত্রকারী দলের প্রতিনিধিগণ ও কিছু সংখ্যক ভারতীয় কর্মচারীর বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বলিয়া ভারত সরকার মনে করে। পি এন ওঝা পাকিস্তান সীমান্তের অদূরবর্তী আগরতলাকে (ভারত) উক্ত বৈঠকের স্থান হিসাবে প্রস্তাব করে। সে ২নং আসামী মোয়াজ্জমকে তিনজন প্রতিনিধির নাম প্রস্তাব করিতে বলে। এই উপলক্ষে পি এন ওঝা তাহাদিগকে ১০,০০০ টাকা দেয়।

৭১। উক্ত মাসে (মার্চ ১৯৬৭) ২নং আসামী মোয়াজ্জম, ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব এবং ১২নং সাক্ষী রমীজ ঢাকার মোহাম্মদপুর হাউজিং এষ্টেটে ১২নং সাক্ষী রমীজের ফ্লাটে একত্রিত হয়। ২নং আসামী মোয়াজ্জম ১২ নং সাক্ষী রমীজকে বলে যে, তাহার নিকট যথেষ্ট অর্থ রহিয়াছে এবং তাহারা পি এন ওঝার নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইতেছে। সে আরও বলে যে, তাহারা ১৩ নং আসামী রুহুল কুদ্দুস এবং ৬নং আসামী এ এ এফ রহমানের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইতেছে। ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব এই সকল তথ্য সত্য বলিয়া স্বীকার করে। উক্ত বৈঠকে ষড়যন্ত্রকারিগণ বৈঠকসমূহ অনুষ্ঠান করিবার জন্য এবং সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত কর্মীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবার জন্য আরও একটি বাড়ী ভাড়া করিবার সিদ্ধান্ত নেয়। ষড়যন্ত্রকারীদের কার্যকলাপের মুখোশ হিসাবে ব্যবহারের জন্য লোক দেখানো একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে কিছু অর্থের ব্যবস্থা করিবার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। উক্ত ব্যবসার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ১২নং সাক্ষী রমীজ তাহার বন্ধু ১৬নং সাক্ষী এ, এস, লুতফুল হুদার নাম সুপারিশ করে।

৭২। উক্ত একই মাসে (মার্চ, ১৯৬৭) পূর্বোক্ত ফ্লাটে আরও একটি দলীয় বৈঠকের অনুষ্ঠান করা হয়। এই বৈঠকে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলঃ–

(১) মোয়াজ্জম, ২নং আসামী;
(২) ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ৩নং আসামী;
(৩) সামাদ, ৮নং আসামী;
(৪) শামসুর রহমান, ১৯নং আসামী;
(৫) মোতালিব, ২৫নং আসামী;
(৬) রমীজ ,১২নং সাক্ষী; এবং
(৭) লুৎফুল হুদা, ১৬নং সাক্ষী।

উক্ত বৈঠকে ট্রান্সমিটার সেটসমূহ সংগ্রহকরণ এবং যন্ত্রচালকগণের ট্রেনিং সংক্রান্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়। আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ১৬নং সাক্ষী লুতফুল হুদার তত্ত্বাবধানে দলীয় ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ১২নং সাক্ষী রমীজের নিয়ন্ত্রণাধীনে মোটা রকম অর্থ অর্পণ করিতে হইবে।

৭৩। ইহার কিছুদিন পরে (মার্চ, ১৯৬৭) ১২নং সাক্ষী রমীজ, ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিবের মারফতে ২নং আসামী মোয়াজ্জমের নিকট হইতে ২৫,০০০ টাকা গ্রহণ করে। উক্ত টাকা হইতে ১২নং সাক্ষী রমীজ ব্যবসায়ের জন্য ১৬নং সাক্ষী লুতফুল হুদাকে নগদ ৫,০০০ টাকা দেয়। বাকি ২০,০০০ টাকা হইতে ১২নং সাক্ষী রমীজ ষড়যন্ত্রকারিগণ কর্তৃক ব্যয়কৃত বিবিধ খরচাদি মিটাইবার জন্য ১৮, ৬৮৯ টাকা খরচ করে।

৭৪। ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব তাহার পূরা সময় ষড়যন্ত্র.. কার্যে নিয়োগ করিবার জন্য ১৯৬৭ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে পাকিস্তান নৌবাহিনী হইতে পলাইয়া যায়।

৭৫। প্রায় একপক্ষ কাল পরে, উক্ত একই মাসে (মার্চ, ১৯৬৭) ১৯নং আসামী শামসুর রহমান তাহার বন্ধু মিঃ মুজিবর রহমানকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ফরিদপুরের ডেপুটি কমিশনার মিঃ সিদ্দিকুর রহমানের নিকট একটি পত্র লেখে। ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব ১৬নং সাক্ষী লূতফুল হুদাসহ ফরিদপুর যায় এবং পত্রটি মিঃ সিদ্দিকুর রহমানের নিকট অর্পণ করে।

৭৬। ১৯৬৭ সালে এপ্রিল মাসে সংঘের কাজকর্মের জন্য ঢাকাস্থিত গ্রীন স্কোয়ারের ১৩নং বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়। ইহা অবশ্য ১৯৬৭ সালের ১লা মে দখল নেওয়া হয়। ইহাতে সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত নিম্নলিখিত সঙ্ঘের কর্মীদের থাকিতে দেওয়া হয়।

(১) ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ৩নং আসামী;
(২) সামাদ, ৮নং আসামী;
(৩) দলিলুদ্দিন, ৯নং আসামী;
(৪) প্রাক্তন সুবেদার জালালুদ্দিন আহমদ, ১৭নং সাক্ষী;
(৫) মিঃ মোহাম্মদ গোলাম আহমদ, ১৮নং সাক্ষী।

২নং আসামী মোয়াজ্জম সংঘের কাজের জন্য তাহার হিলম্যান মোটর গাড়ী নম্বর ই বি এ ৯৫৯১১৩নং গ্রীন স্কোয়ারে ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিবের হেফাজতে রাখিয়া দেয়।

৭৭। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসের কোন সময়ে ৭নং আসামী মফিজুল্লাহ ১৯নং সাক্ষী করপোরাল হাই, এ,কে,এম-এর সঙ্গে তাহার বাসায় (ডোমেষ্টিক এরিয়া, পি, এ, এফ, কোরঙ্গী ক্রীক, করাচী) সাক্ষাৎ করে। ৭নং আসামী মফিজুল্লাহ সেখানে সাজাইয়া রাখা একটি মেকি হাতবোমা দেখিতে পায় ও ১৯নং সাক্ষী হাই-এর নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হয়।

৭৮। ১৯৬৭ সালের মে মাসে ৭নং আসামী মফিজুল্লাহ ২৯নং আসামী সার্জেন্ট জলিলের বাসস্থানে (১৪/৪ জি, ক্লেটন কোয়ার্টার্স, করাচী) একটি বৈঠক আহ্বান করে। নিম্নলিখিত সদস্যগণ এই বৈঠকে যোগদান করে;

১। মফিজুল্লাহ, ৭নং আসামী;
২। বারি, ২২নং আসামী;
৩। সার্জেন্ট শামসুল হক, ২৩নং আসামী;

৪। সার্জেন্ট আবদুল জলিল, ২৯নং আসামী;
৫। মোহাম্মদ মাহবুবুদ্দিন চৌধুরী, ৩০নং আসামী;
৬। শামসুদ্দিন, ৬নং সাক্ষী;
৭। করপোরাল জামাল, ১৪নং সাক্ষী এবং
৮। সিরাজ, ১৫নং সাক্ষী।

ছুটি ভোগের পর পূর্ব পাকিস্তান হইতে সদ্য প্রত্যাগত এবং দলের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম ২৩নং আসামী সার্জেন্ট শামসুল হক সভায় যোগদানকারীদের জানায় যে, ২নং আসামী মোয়াজ্জম ষড়যন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য প্রদানে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে রাজী করাইতে সক্ষম হইয়াছে। সে ষড়যন্ত্রকারীদের বুঝাইয়া বলে যে, পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনসাধারণ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে তাহাদের সশস্ত্র বিদ্রোহকে সমর্থন জানাইবে। বৈঠকের সমাপ্তির সময়, ৭নং আসামী মফিজুল্লাহ্ তাহার পকেট হইতে একটি মেকি হাতবোমা বাহির করিয়া ইহা কিভাবে নিক্ষেপ করিতে হইবে তাহা হাতে কলমে দেখাইয়া দেয়। সে দলের সদস্যদের ইহার চর্চা করিতে বলে। এই উদ্দেশ্যে হাতবোমাটি সে ২৯নং আসামী জলিলের বাড়ীতে রাখিয়া যায়। সে বলে যে, ছোট ছোট অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার পর সে ইহাদের ব্যবহার প্রণালী শিক্ষা দিতে শুরু করিবে।

৭৯। ১৯৬৭ সালের মে মাসের কোন সময়ে ৭নং আসামী মফিজুল্লাহ ১৫নং সাক্ষী সিরাজের নিকট প্রকাশ করে যে, ৬নং সাক্ষী শামসুদ্দিনও তাহাদের সংঘের একজন সদস্য এবং ৩১নং আসামী লেঃ এম এম রহমান বিমান বাহিনীর লোকদের চালনা করিতেছে। ৬নং সাক্ষী শামসুদ্দিন এবং ৩০নং আসামী মাহবুবুদ্দিনকে ৩১নং আসামী লেঃ রহমানের বাসভবনে (অফিসার্স কোয়ার্টার্স কারসাজ করাচী) অনুষ্ঠিত সংঘের বৈঠকে আনিবার জন্য ৭নং আসামী মফিজুল্লাহ ১৫নং আসামী সিরাজকে নির্দেশ দেয়।

৮০। ঐ একই মাসে (মে ১৯৬৭) ৩১নং আসামী লেঃ রহমানের বাসভবনে নির্দিষ্ট তারিখে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমবেত হয়ঃ–

(১) মফিজুল্লাহ, ৭নং আসামী;
(২) লেঃ রহমান, ৩১নং আসামী;
(৩) মাহবুবুদ্দিন, ৩০নং আসামী;
(৪) শামসুদ্দিন, ৬নং সাক্ষী;
(৫) সিরাজ, ১৫নং সাক্ষী এবং আরো কয়েকজন যাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বারবার উল্লেখ করিয়া কার্যরত এবং প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর আরও বেশী বাঙালীকে দলভুক্ত করিবার এবং উপযুক্ত

কর্মীদের পূর্ব পাকিস্তানে পাঠাইবার উপায় ও পন্থা উদ্ভাবনের জন্য ৩১নং আসামী লেঃ রহমান বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের নির্দেশ দেয়।

৮১। ১৯৬৭ সালের জুন মাসের শেষের দিকে ২নং আসামী মোয়াজ্জম দলে লোক ভর্তির উদ্দেশ্যে ১৭নং সাক্ষী জালাল এবং ৮নং আসামী সামাদকে সফরে পাঠায়। এই ব্যাপারে পূর্বোক্ত সাক্ষী এবং আসামী কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও যশোহর যায়। তাহারা ৩২নং আসামী প্রাক্তন সুবেদার এ কে এম তাজুল ইসলামের সঙ্গে খুলনায় সাক্ষাৎ করে এবং ঐ এলাকার সংঘের কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করে। ৩২নং আসামী তাজুল ইসলাম যে সকল ষড়যন্ত্রকারীকে দলভুক্ত করিয়াছে, তাহাদিগকে ঐ দুইজন সফরকারীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেয়।

৮২। ১৯৬৭ সালের জুন মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে পূর্বোক্ত সংঘের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম ৩১নং আসামী লেঃ রহমানের বাসভবনে (বাংলা নম্বর ই/১৬ অফিসার্স কোয়ার্টার্স কারসাজের নিকট অবস্থিত করাচী) এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নলিখিত ষড়যন্ত্রকারীগণ এই বৈঠকে যোগদান করে।

(১) মফিজুল্লাহ, ৭নং আসামী;
(২) বারি, ২২নং আসামী;
(৩) মাহবুবুদ্দিন, ৩০নং আসামী;
(৪) লেঃ রহমান, ৩১নং আসামী;
(৫) সার্জেন্ট শামসুদ্দিন। ৬নং সাক্ষী এবং
(৬) সিরাজ, ১৫নং সাক্ষী এবং আরো কয়েকজন যাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

৩১নং আসামী লেঃ রহমান বৈঠকে যোগদানকারীদের বলে যে, ২নং আসামী মোয়াজ্জম আরো অধিক ষড়যন্ত্রকারী দলভুক্তকরণের কাজ বন্ধ করিতে নির্দেশ দিয়াছে। ৩০নং আসামী মাহবুবুদ্দিন ও ২২নং আসামী বারির প্রস্তাবক্রমে ৩১নং আসামী লেঃ রহমান ৬নং সাক্ষী শামসুদ্দীনকে নির্দেশ দেয় যে, সে যেন ২নং আসামী মোয়াজ্জমের সাথে ঢাকায় যাইয়া যোগাযোগ করে এবং তাহার নিকট হইতে জানিয়া নেয় যে, ঢাকায় তাহার (লেঃ রহমানের) উপস্থিতির প্রয়োজন আছে কিনা এবং যদি প্রয়োজন থাকে তবে ৬নং সাক্ষী শামসুদ্দীন, 'বজুলু গুরুতররূপে রোগাক্রান্ত হইয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইয়াছে এই বলিয়া তাহাকে টেলিগ্রাম করে। উক্ত ৬নং সাক্ষী শামসুদ্দিন সেই সময়ে ঢাকায় বদলি হইয়া যাইতেছিল। ২২নং আসামী বারি এবং ৩০নং আসামী মাহবুবুদ্দিনের প্রস্তাবক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সদস্যরা তখনকার মত করাচীতে শুধু সংঘের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবে।

৮৩। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে ২নং আসামী মোয়াজ্জম ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারে কয়েকটি বৈঠক আহ্বান করে। এইগুলিতে যোগদান করেঃ–

(১) মোয়াজ্জম, ২নং আসামী;
(২) ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ৩নং আসামী;
(৩) সুলতান, ৪নং আসামী;
(৪) দলিলুদ্দিন, ৯নং আসামী;
(৫) রিসালদার সামসুল হক, ২০নং আসামী;
(৬) মিঃ এম আলী রেজা, ৩৩নং আসামী;
(৭) ক্যাপটেন খুরশীদুদ্দিন আহমদ, এ-এম-সি ৩৪নং আসামী;
(৮) রমীজ, ১২নং সাক্ষী;
(৯) জালালুদ্দিন, ১৯নং ঐ সাক্ষী; এবং
(১০) মিঃ আনোয়ার হোসেন, ২০নং সাক্ষী।

এই বৈঠকসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতে পাঠাইবার জন্য প্রতিনিধি ঠিক করা। এই পর্যায়ে ১৯নং আসামী সামসুর রহমানের নিকট জাকার্তাতে এবং ২৫নং আসামী মোতালিবের নিকট পেশোয়ারে টেলিগ্রাম পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা আসেন নাই।

৩৪নং আসামী খুরশীদ সেই সময় করাচী হইতে সদ্য ঢাকায় পৌঁছিয়াছিল। ৩৪নং আসামী খুরশীদ ভারতস্থিত আগরতলায় প্রতিনিধি পাঠাইবার পরিকল্পনা বিশদভাবে আলোচনা করে। পূর্বোক্ত বৈঠকগুলিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ঃ–

(ক) ৩৩নং আসামী রেজা, ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে সঙ্গে লইয়া সংঘের প্রতিনিধি হিসাবে, সীমান্তে আয়োজিত আসন্ন বৈঠকে ভারতের কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে;

(খ) ৩৩নং আসামী রেজা এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিবে;

(গ) ষড়যন্ত্রকারীদের নিকট প্রদর্শিত এবং ৩৩নং আসামী রেজার নিকট অর্পিত প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের তালিকা ভারতীয় কর্মচারীদের হাতে দেওয়া হইবে;

(ঘ) আগরতলার বৈঠকে অস্ত্রশস্ত্রের লেনদেন চূড়ান্তভাবে সমাধা করা হইবে এবং আর্থিক সাহায্য বাড়াইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে;

(ঙ) প্রতিনিধিরা গোপনে ফেনী সীমান্ত পার হইয়া ভারতের আগরতলায় যাইবে এবং

(চ) ১৭নং সাক্ষী জালালুদ্দিন এই সীমান্ত অতিক্রমণ তদারক করিবে এবং প্রতিনিধিদের নিরাপদে সীমান্ত অতিক্রমণের জন্য সে তাহার প্রভাব খাটাইবে এবং প্রয়োজন বোধে সীমান্ত ফাঁড়ি ই পি আর-এর লোকদের ঘুষ দিবে।

৮৪। ১৯৬৭ সালের জুন মাসের তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে ২নং আসামী মোয়াজ্জম ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীকে ঢাকায় ডাকিয়া আনে এবং পি এন ওঝার হাতে পৌঁছাইবার জন্য একটি খাম দেয়। ১২নং আসামী মানিক

চৌধুরী সেইদিন সন্ধ্যায় কাজটি সম্পন্ন করে। ঐ খামটির ভিতরে সাঙ্কেতিক শব্দ যে সমস্ত স্থানের মধ্য দিয়া সীমান্ত অতিক্রম করিবে সেই সমস্ত স্থানের নাম এবং পূর্বোক্ত প্রতিনিধিগণের নাম ছিল।

৮৫। পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬৭ সালের ১১ই জুলাই নিম্নলিখিত ষড়যন্ত্রকারীগণ ঐ দুইজন প্রতিনিধি যথাঃ ৩৩নং আসামী রেজা এবং ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে সঙ্গে লইয়া তাহাদিগকে আগরতলার পথে গোপনে সীমান্ত পার করিয়া দিবার জন্য নোয়াখালী জেলায় ফেনী পৌঁছেঃ–

(১) ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ৩নং আসামী;
(২) সামাদ, ৮নং আসামী;
(৩) দলিলুদ্দিন, ৯নং আসামী;
(৪) রেজা, ৩৩নং আসামী;
(৫) জালাল, ১৭নং সাক্ষী।

উপরোক্ত ষড়যন্ত্রকারিগণ ফেনী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটস্থ হোটেল 'ডেনোফা'য় অবস্থান করিয়াছিল। ঐদিন সন্ধ্যায় ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব ফেনী আসিবার জন্য ১২নং সাক্ষী রমীজকে টেলিফোনে খবর পাঠায়। খবর পাইয়া সে ২০নং সাক্ষী আনোয়ার হোসেনকে সঙ্গে লইয়া পি আই এ'র গাড়ীতে (ষ্টাফ কার) ঐ রাত্রেই ফেনী পৌঁছে।

৮৬। ১৯৬৭ সালে ১২ই জুলাই রাত্রি আড়াইটা ও সাড়ে চারিটার মধ্যে ১২নং সাক্ষী রমীজ ২০নং সাক্ষী আনোয়ার হোসেনসহ পি আই এ-র গাড়ী (ষ্টাফ কার) করিয়া ৯নং আসামী দলিলুদ্দিন বাদে দলের অন্যান্য সবাইকে পাক-ভারত সীমান্তের নিকট লইয়া যায়। দলটিকে প্রধান সড়কের উপর নামাইয়া দিয়া ১২নং সাক্ষী রমীজ ও ২০নং সাক্ষী আনোয়ার হোসেন–দুইজনেই ঐ রাত্রিতে চট্টগ্রাম ফিরিয়া আসে। ১৭নং সাক্ষী জালাল প্রতিনিধি দুইজনের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতের এলাকায় যাওয়ার কাজটি তদারক করে।

৮৭। ১৯৮৭ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে রাত্রে কোন এক সময়ে প্রতিনিধিদ্বয় যথাঃ ৩৩নং আসামী রেজা ও ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব আগরতলা হইতে একটি ট্রাকযোগে 'ড্যানোফা' হোটেলে ফিরিয়া আসে।

৮৮। পূর্বোক্ত বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে, ২নং আসামী মোয়াজ্জমকে অবহিত করিবার জন্য তাহারা ১৯৬৭ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে বরিশাল চলিয়া যায়।

৮৯। পরবর্তীকালে উক্ত একই মাসে অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে ২নং আসামী মানিক চৌধুরী এবং ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমানকে সঙ্গে লইয়া পি এন ওঝার ঢাকাস্থ ধানমণ্ডির বাড়ীতে পি এন ওঝার সহিত ৬ষ্ঠবারের মত সাক্ষাৎ করে। পি এন ওঝা ২নং আসামী মোয়াজ্জমের নিকট ভান করে যে, সে তখন পর্যন্ত তাহার সরকারের নিকট হইতে আগরতলা বৈঠকের ফলাফল

জানিতে পারে নাই। সে অবশ্য গোপনে ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীর নিকট বলে যে, ভারতীয় কর্মচারিগণ প্রতিনিধিগণের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

৯০। উক্ত একই মাসে (জুলাই ১৯৬৭) ৪নং আসামী সুলতান করাচী সফর করে। করাচীতে ৩০নং আসামী মাহবুবুদ্দিনের বাড়ী ১৪/৪ জি মার্টিন কোয়ার্টার্স-এ করাচীতে কার্যরত ষড়যন্ত্রকারীদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ হাজির ছিলঃ–

(১) সুলতান, ৪নং আসামী;
(২) মফিজুল্লাহ, ৭নং আসামী;
(৩) জহুরুল হক, ১৭নং আসামী;
(৪) সার্জেন্ট শামসুল হক, ২৩নং আসামী;
(৫) লেঃ রহমান, ৩১নং আসামী; এবং
(৬) সিরাজ, ১৫নং সাক্ষী আরো তিন ব্যক্তি এই বৈঠকে যোগদান করিয়াছিল; তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে– পাইলট অফিসার মির্জা; এস, এম, আলী এবং চৌধুরী জয়নুল আবেদীন। শেষোক্ত দুই ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায় নাই। প্রথমোক্ত ব্যক্তি হাসপাতালে আছে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। ৪নং আসামী সুলতান বলে যে, সে কিউবার বিপ্লব দেখিয়াছে এবং সেজন্য সে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রহিয়াছে। সে প্রধান প্রধান কর্মীদের মধ্যে বিপ্লবাত্মক প্রেরণার অভাব লক্ষ্য করিয়া হতাশা প্রকাশ করে। সে বৈঠকে যোগদানকারিগণকে উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য, প্রাণ বিসর্জনদানের শপথ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া তাহার বক্তব্য শেষ করে।

৯১। প্রায় পনর দিন পরে ১৯৬৭ সালের জুলাই/আগষ্ট মাসে ৩১নং আসামী লেফ্‌টেন্যান্ট রহমান, করাচীতে ৩০নং আসামী মাহবুবুদ্দিনের বাড়ী ১৪/৪ জি, মার্টিন কোয়ার্টার্স-এ আরও একটি বৈঠকের অনুষ্ঠান করে। এই বৈঠকে নিম্নোক্ত ষড়যন্ত্রকারিগণ উপস্থিত ছিলঃ–

(১) লেঃ রহমান, ৩১নং আসামী।
(২) লেঃ আবদুর রউফ, ৩২নং আসামী।
(৩) জহুরুল হক, ১৭নং আসামী।
(৪) সুলতান, ৪নং আসামী;
(৫) মফিজুল্লাহ, ৭নং আসামী;
(৬) বারী, ২২নং আসামী;
(৭) সিরাজ, ১৫নং সাক্ষী।

আরো দুই ব্যক্তি যাহাদের নাম চৌধুরী জয়নুল আবেদীন এবং এস, এম, আলি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল এবং আরো কয়েকজন যাহাদের নাম সঠিক নির্ণয় করা যায় নাই, এই বৈঠকে যোগদান করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগকে সনাক্ত করা যায় নাই।

উক্ত বৈঠকে ৩১নং আসামী লেঃ রহমান, সদস্যগণকে পূর্ব পাকিস্তানে ২নং আসামী মোয়াজ্জমের নেতৃত্বাধীন কার্যরত মূল বিচ্ছিন্নতাবাদী সংঘের সহিত সহযোগিতা রক্ষা করিয়া কাজ করিবার নির্দেশ দেয়। লেঃ আবদুর রউফ তখন বৈঠকে যোগদানকারিগণকে বাংলায় শপথ গ্রহণ করায়। উক্ত একই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে–

(ক) ১৫নং আসামী সিরাজুল ইসলাম, মৌরীপুর এলাকার অর্থ সংগ্রহ করিবে এবং বাঙালী সদস্যগণকে দলভুক্ত করিবে।
(খ) ৭নং আসামী মফিজুল্লাহ ড্রিগ রোড এলাকার অর্থ সংগ্রহ করিবে এবং বাঙালী সদস্যগণকে দলভুক্ত করিবে।
(গ) ১৭নং আসামী জহুরুল হক কোরঙ্গি এলাকার অর্থ সংগ্রহ করিবে এবং বাংগালী সদস্যগণকে দলভূক্ত করিবে এবং তদুপরি সেই একই উদ্দেশ্যে চাকনালা পেশোয়ার, কোহাট ও সারগোদা সফর করিবে।

৯২। ১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসে, ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী এবং ৭নং সাক্ষী সায়িদুর রহমান, ঢাকা সফর করে ও ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিবের সহিত সাক্ষাৎ করে। ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব তাহাদিগকে জানায় যে, সে এবং ৩৩নং আসামী রেজা আগরতলা গিয়াছিল।

৯৩। ১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসে ৩৫নং আসামী লেঃ রউফ, ২৯নং আসামী সার্জেন্ট জলিলের, ক্লেটন কোয়ার্টারস্থিত বাড়ীতে একটি জরুরী বৈঠক আহ্বান করে। উক্ত বৈঠকে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হয়ঃ–

(১) মফিজুল্লাহ, ৭নং আসামী;
(২) বারী, ২২নং আসামী;
(৩) জলিল, ২৯নং আসামী;
(৪) লেফট্‌ন্যান্ট রহমান, ৩১নং আসামী;
(৫) লেফট্‌ন্যান্ট রউফ, ৩৫নং আসামী;
(৬) শামসুদ্দিন, ৫নং সাক্ষী;
(৭) সিরাজ, ১৫নং সাক্ষী।

অপর আরও তিন ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায় নাই; তাহাদের নাম বলা হইয়াছিল করপোরাল আফতাব চৌধুরী, জয়নুল আবেদীন এবং সিদ্দিকুর রহমান।

৩৫নং আসামী লেফটন্যান্ট রউফ এবং ৩১নং আসামী লেফটন্যান্ট রহমানকে কিছুটা চিন্তাক্লিষ্ট দেখাইতেছিল। তাহারা সন্দেহ করে যে, তাহাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। ৩৫নং আসামী লেঃ রউফ বৈঠকে যোগদানকারিগণকে নূতন সদস্যদলভূক্তকরণ বন্ধ করিতে বলে। ৩৫নং আসামী লেঃ রউফ সদস্যগণকে ছুটি লইয়া পূর্ব পাকিস্তানে চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করে। তদনুসারে সদস্যগণ ছুটি লইয়া পূর্ব পাকিস্তানে নিজ নিজ সহরে যাওয়া শুরু করে।

৯৪। ১৯৬৭ সালের সেপটেম্বর মাসের কোন এক সময়ে ২৩নং আসামী সার্জেন্ট শামসুল হকের নির্দেশক্রমে ১৭নং আসামী জহুরুল হক পাকিস্তান বিমান বাহিনীর চাকলাল কেন্দ্রে যায়। সেখানে সে ২১নং সাক্ষী সার্জেন্ট রজব হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। ১৭নং আসামী জহুরুল হক ২১নং সাক্ষী রজবকে জানায় যে, সশস্ত্র বিদ্রোহের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আযাদী হাসিল করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে একটি দল গঠন করা হইয়াছে এবং উক্ত ষড়যন্ত্রে যোগদান করিবার জন্য সে ২১নং সাক্ষী রজবকে আমন্ত্রণ জানায়। অবশ্য ২১নং সাক্ষী রজব উক্ত কার্যকলাপে যোগ দিতে অস্বীকার করে।

৯৫। ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে ৩৩নং আসামী রেজা ১২নং সাক্ষী রমীজের নিকট হইতে ধারে একটি পি আই এ টিকিট সংগ্রহ করে এবং ২নং আসামী মোয়াজ্জম তহবিল তসরুপ করিতেছে বলিয়া সে বুঝিতে পারে– এই কথায় রুহুল কুদ্দুসকে (ইতিমধ্যে রুহুল কুদ্দুস লাহোরে বদলি হইয়াছিল) এবং ২৫নং আসামী ক্যাপটেন মোতালিবকে (মোতালিব তখন পেশোয়ার বদলি হইয়াছিল) জানাইবার জন্য সে লাহোর ও পেশোয়ার গমন করে।

৯৬। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে, ১৫নং সাক্ষী সিরাজ বিশেষ সুবিধামূলক ছুটিতে (প্রিভিলেজ লীভরোল পৌঁছে) সেই সময়ে ৩০নং আসামী মাহবুবুদ্দিন, ৩৫নং আসামী লেফ্টন্যান্ট রউফ এবং ৩১নং আসামী লেঃ রহমান ছুটিতে ঢাকা পৌঁছিয়াছিল।

৯৭। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে ২৪নং সাক্ষী প্রাক্তন স্কোয়াড্রন লীডার এম, এইচ, চৌধুরীর বাসভবনে একটি বৈঠকে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ যোগদান করেঃ–

(১) ফজলুল হক, ১১নং আসামী;
(২) এম,এ, রাজ্জাক, ১৬নং আসামী;
(৩) করপোরাল জামাল, ১৪নং সাক্ষী;
(৪) জাকির আহমদ, ২২নং সাক্ষী;

(৫) সার্জেন্ট এম আবদুল হালিম, ২৩নং সাক্ষী; এবং
(৬) চৌধুরী, ২৪নং সাক্ষী।

এই বৈঠকে ইহা অনুভব করা হয় যে, সঙ্ঘটিকে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন কেননা সঙ্ঘটি তখন ২নং আসামী মোয়াজ্জম ও তাহার করুণাপুষ্টদের স্বার্থপরতার জন্য মরণোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল।

৯৮। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে ২২নং সাক্ষী জাকির, ২৫নং সাক্ষী উই/কমাণ্ডার আশরাফ মিয়াকে খবর দেয় যে, তখন হইতে কিছুকাল পূর্বে ২৩নং সাক্ষী হালিম তাহাকে ২৪নং সাক্ষী চৌধুরীর বাড়ীতে লইয়া যায়। সেখানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের সমাবেশ দেখিতে পায়ঃ–

(১) ফজলুল হক, ১১নং আসামী;
(২) এম এ রাজ্জাক, ১৬নং আসামী;
(৩) চৌধুরী, ২৪নং সাক্ষী;
(৪) করপোরাল জামাল, ১৪নং সাক্ষী; এবং
(৫) হালিম, ২৩নং সাক্ষী।

২২নং সাক্ষী জাকির, ২৫নং সাক্ষী আশফাকের নিকট অভিযোগ করে যে, উপরোল্লিখিত ব্যক্তিগণ পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার বিষয়ে আলাপ করিতেছিল।

৯৯। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে, নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ১৫নং সাক্ষী সিরাজের বন্ধু জনৈক জনাব মালেকের ঢাকাস্থ সূত্রাবাদের বাড়ীতে মিলিত হয়ঃ–

(১) লেফ্টন্যান্ট রউফ, ৩৫নং আসামী;
(২) মাহবুব উদ্দিন, ৩০নং আসামী;
(৩) সিরাজ, ১৫নং সাক্ষী এবং অন্যান্য কয়েকজন যাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা যায় নাই। সঙ্ঘের কার্যকলাপের মুখোশ হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য ঢাকার একটি টেকনিক্যাল স্কুল খোলার একটি প্রস্তাবের উপর আলোচনা করা হয়। ৩৫নং আসামী লেফটন্যান্ট রউফ সঙ্ঘকে পুনরুজ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে ২নং আসামী মোয়াজ্জম এবং কর্ণেল এম এ জি ওসমানীর সহিত যোগাযোগ করিবার দায়িত্ব নেয়।

১০০। ইহার পরে পরেই ষড়যন্ত্রের সদস্যগণের গ্রেপ্তার শুরু হয় এবং ফলে তাহাদের কার্যকলাপ বন্ধ হইয়া যায়।

সনির্বন্ধ প্রার্থনা এই যে, আসামীগণের বিরুদ্ধে গঠিত এতদসঙ্গে পেশকৃত অভিযোগসমূহের ভিত্তিতে আসামীগণের বিচার করিবার আজ্ঞা হউক।

সংবাদ

২০শে জুন ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু

শেখ মুজিব, সিএসপি ও সামরিক অফিসারসহ ৩৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ

১১ জনের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য (বুধবার) সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হইলে শেখ মুজিবর রহমান, তিনজন সি-এস-পি অফিসার, কতিপয় সামরিক অফিসার ও কর্মচারীসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে "ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাইয়া পাকিস্তানকে উহার একটি অঞ্চল হইতে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রের" অভিযোগ উপস্থিত করা হয়।

ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জাষ্টিস এস,এ, রহমান অভিযোগপত্রটি পাঠ করিয়া শুনাইলে ট্রাইব্যুনালের অপর সদস্য ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম, আর, খান ৩৫ জন অভিযুক্তের তালিকাটি পাঠ করেন। অতঃপর ট্রাইব্যুনালের তৃতীয় সদস্য জাষ্টিস মকসুমুল হাকিম যে এগারজনকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহাদের নামগুলি পাঠ করেন।

দ্বিপ্রহর ১২টা পাঁচ মিনিটে বিচারপতি রহমান প্রত্যেকের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথকভাবে অভিযোগগুলি পাঠ শুরু করেন। বেলা একটায় কোর্টের সমাপ্তি পর্যন্ত মোট ৩৫ জন আসামীর মধ্যে ১৬ জনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পাঠ করিয়া শুনান হয়। এই ষোলজন এক এক করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া অভিযোগ শ্রবণ করেন এবং অভিযোগ শ্রবণের পর প্রত্যেকেই অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করেন।

গতকল্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন কক্ষে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। অধিকাংশ অভিযুক্তদের আত্মীয়পরিজন বিচার কক্ষে উপস্থিত ছিলেন এবং বিচারকার্যের শুরুতে এবং পরে তাহারা খোলাখুলিভাবেই মেলামেশা করেন। উপস্থিতদের মধ্যে শেখ মুজিবের বৃদ্ধ পিতা অন্যতম। পাকিস্তানী সাংবাদিক ছাড়াও রয়টার, এ-এফ-পি ও বাল্টিমোর সানের প্রতিনিধি প্রমুখ বিদেশী সাংবাদিকরাও উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগসমূহ উপস্থিত করার সময় বিচার কক্ষে বিরাজ করিতেছিল অখণ্ড নীরবতা।

আগামীকল্য সকাল ৯টা পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী রাখা হইয়াছে।

গতকল্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর অভিযুক্ত হিসাবে শেখ মুজিবর রহমানকে উপস্থিত করা হয়। অভিযোগ

পাঠের পর বিচারপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "আপনি দোষী না নির্দোষী?" প্রত্যুত্তরে শেখ মুজিব বলেনঃ "আমি নির্দোষী। ইহা আমার বিরুদ্ধেই একটি ষড়যন্ত্র, কেননা আমি জেলে ছিলাম।"

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১ (ক) ধারা, ১৩৯ ধারা এবং ১৯৬৮ সালের স্পেশাল অর্ডিন্যান্সের ৩নং ধারা মোতাবেক অভিযোগ করা হইয়াছে।

অভিযুক্তদের পক্ষ হইতে অদ্য মামলা পরিচালনা করেন জনাব সালাম খান, খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল, আতাউর রহমান খান, সৈয়দ আজিজুল হক, জহীরুদ্দীন, আমিরুল ইসলাম, বদরুল হায়দার চৌধুরী, ভিখারুল ইসলাম এবং আরও অনেক আইনজীবী। সরকারপক্ষের প্রধান কৌসুলী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মনজুর কাদের। তাঁহাকে সহায়তা করেন জনাব টি এইচ খান, গ্রুপ ক্যাপটেন আসলাম, এ আলিম এবং খাকান বাবর।

সংবাদ

২০শে জুন ১৯৬৮

অভিযুক্তদের তালিকা

ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের নামের তালিকাঃ

১। শেখ মুজিবর রহমান।
২। পিনং ৫৭৪ লেফটেন্যান্ট কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জম হোসেন।
৩। ৬নং ৬৬৫০৮ ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান।
৪। প্রাক্তন এল/এস সুলতান আহমদ।
৫। ৬নং ৬৪৬৭২ এল/এস সিডি আই নূর মোহাম্মদ।
৬। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান সি এস পি।
৭। পাক/৫১৩০১ এফ/ সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ।
৮। সাবেক কর্পোরাল আবুল বাসার আবদুস সামাদ।
৯। সাবেক হাবিলদার দলিল উদ্দীন।
১০। জনাব রুহুল কুদ্দুস সিএস পি।
১১। পাক/৭২৮৭০ এফ/ সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হক।
১২। শ্রীভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী।
১৩। শ্রী বিধান কৃষ্ণ সেন।
১৪। পিজেও-২০৬৮ সুবেদার আবদুর রাজ্জাক।
১৫। সাবেক হাবিলদার ক্লার্ক মুজিবুর রহমান।
১৬। সাবেক এফ/ সার্জেন্ট মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক।

১৭। পাক/৭২৩২৪ সার্জেন্ট জহুরুল হক।
১৮। সাবেক এ/বি মোহাম্মদ খূরশীদ।
১৯। খান এম, শামসুর রহমান, সি,এস,পি।
২০। পিজেও ৭৬৮ রিসালদার এ, কে, এম, শামসুল হক এ সি।
২১।নং ৩০৩১০১৮ হাবিলদার আজিজুল হক এস এস জি।
২২। পাক/৭৩০৪০ এসএসি মাহফুজুল বারী।
২৩। পাক/৭২৩২৪ সার্জেন্ট শামসুল হক।
২৪। পি এস এস ১০০৫২০ মেজর শামসুল আলম।
২৫। পি এস এস ৬১০০ ক্যাপটেন মোহাম্মদ আবদুল মোতালেব।
২৬। পি টি সি ৫৭২৭ ক্যাপটেন এম, শওকত আলী মিয়া।
২৭। পিএ ৬৫৬১ ক্যাপটেন খোন্দকার নজমুল হুদা।
২৮। ক্যাপটেন এ, এম, এম নুরুজ্জামান, ইবিআর।
২৯। পাক/৭০৭০৪ সার্জেন্ট আবদুল জলিল।
৩০। জনাব মোহাম্মদ মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী।
৩১। পিনং ৯৫৮ ফার্ষ্ট লেফটেন্যান্ট এম, এম, এম, রহমান।
৩২। সাবেক সুবেদার এ, কে এম, তাজুল ইসলাম।
৩৩। জনাব মোহাম্মদ আলী রেজা।
৩৪। পি এস এস ২০০৪৭১ ক্যাপটেন খুরশীদ উদ্দীন আহমদ।
৩৫। পিনং ৯৪৪ ফার্ষ্ট লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ।

সংবাদ

২০ শে জুন ১৯৬৮

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ

ঢাকা, ১৯ শে জুন (এপিপি)।– আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ নিম্নরূপঃ

শেখ মুজিবর রহমান ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে করাচীতে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রথম মূল বৈঠকে যোগদান করেন।

উক্ত বৈঠকে শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার জন্য শক্তি প্রয়োগের পরিকল্পনার সহিত একমত হন।

শেখ মুজিবর রহমান বৈঠকে এই মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ব্যাপারে ভারতের মনোভাব কি হইবে তাহা তিনি দেখিবেন।

ষড়যন্ত্রকারীদের বেশ কয়েকটি বৈঠক করাচী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকার গ্রীনভিউ পেট্রোল পাম্প, ভারতীয় হাই কমিশনের কর্মচারী ও ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে লিয়াজোঁ হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

শেখ মুজিবর রহমান ষড়যন্ত্রকারীদের সরাসরি কিম্বা শ্রীভূপতি ভূষণ চৌধুরী ও অন্যান্যদের মাধ্যমে ক্ষুদ্র অস্ত্র ক্রয় ও অন্যান্য কাজের জন্য কয়েকবার অর্থ প্রদান করেন।

১৯৬৬ সালের ৬ই মে শেখ মুজিবর রহমান দেশরক্ষা আইনে (ষড়যন্ত্রের সহিত সম্পর্কহীন অন্য কারণে) গ্রেফতার হওয়ার পরও ষড়যন্ত্রকারীদের বৈঠক চলিতে থাকে।

শ্রী পি এন ওঝা আগরতলায় বৈঠকের আয়োজন করেন। কারণ, ভারত সরকারের মতে– অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের পূর্বে ষড়যন্ত্রকারীদের সহিত তাহাদের কিছু সংখ্যক কর্মচারীদের বৈঠক হওয়া উচিত।

শ্রী পি,এন, ওঝা লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জম হোসেনের সঙ্গে ৬ বার বৈঠকে মিলিত হন ও ষড়যন্ত্রকারীদের কয়েকবার বিরাট অংকের অর্থ প্রদান করেন।

সংবাদ

২০শে জুন ১৯৬৮

ছদ্মনামের বিবরণ

ঢাকা, ১৯শে জুন (পিপিআই)।– ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বলা হয় যে, ষড়যন্ত্রে নিম্নলিখিত 'ছদ্মনাম' ব্যবহার করা হইয়াছে। ছদ্মনাম ও ছদ্মনামধারী ব্যক্তিদের নাম পাশাপাশি প্রদত্ত হইলঃ-

১। 'পরশ'– শেখ মুজিবর রহমান (এক নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি)।
২। 'উল্‌কা'– মোহাম্মদ আমির হোসেন মিয়া (তিন নম্বর সরকারী সাক্ষী)।
৩।'তুহিন'–ক্যাটারিং লেফটেন্যান্ট মোজাম্মেল হোসেন (এক নম্বর সরকারী সাক্ষী)।
৪। 'কমল'–প্রাক্তন এল এস সুলতানউদ্দিন আহমদ (৪নং অভিযুক্ত ব্যক্তি)।
৫। 'মরাদ'–ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান (তিন নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি)।
৬। 'আলো'– লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জম হোসেন (২নং অভিযুক্ত ব্যক্তি)।
৭। 'তুষার'–এ এফ রহমান সিএসপি (৬নং অভিযুক্ত ব্যক্তি)।
৮। 'সবুজ' –এল এস নূর মোহাম্মদ (৫নং অভিযুক্ত ব্যক্তি)।
৯। 'শেখর'–রুহুল কুদ্দুস সি এস পি (১০নং অভিযুক্ত ব্যক্তি)।

সংবাদ

২০শে জুন ১৯৬৮

কৌসুলীর প্রশ্ন

গতকাল্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুরুতেই বাদী পক্ষের কৌসুলী জনাব সালাম খান কোর্টের অবস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, ক্যান্টনমেন্ট শহর হইতে দুরে অবস্থিত বলিয়া বাদী পক্ষের আইনজীবীদের খুবই অসুবিধা হইতেছে এবং সেই হেতু কোর্ট কোন সুবিধা জনক স্থানে স্থানান্তরের জন্য জনাব সালাম খান আবেদন জানান। প্রত্যুত্তরে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান জাষ্টিস রহমান বলেন যে, এই বিশেষ বিচারের স্থান সরকার নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২০শে জুন ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে শুনানী শুরুঃ

ভারতের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের চক্রান্তের অভিযোগ

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র নামে পরিচিত রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে, "অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ মেস-এর দর্শক, কৌসুলী ও সাংবাদিকে ভরপুর কক্ষে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এই ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হয়েছে।

শেখ মুজিবর রহমান, তিনজন সিএসপি অফিসার যথা– জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও খান শামসুর রহমান এবং কতিপয় প্রাক্তন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিসহ মোট গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এই ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হয়েছে।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস এ রহমান অভিযোগের বিবরণী পাঠ করেন। অভিযোগের বিবরণে উল্লেখ করা হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আকস্মিকভাবে কমান্ডো পদ্ধতিতে হামলা চালিয়ে সামরিক ইউনিট করার জন্য ভারতের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

–পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারী পূর্ব পাকিস্তানীদের বিনিময়ে ফেরত না যাওয়া পর্যন্ত বিদ্রোহকালে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানীদের জিম্মি হিসেবে আটক রাখা।

–পরিকল্পিত বিদ্রোহের জন্য গোলাবারুদ ও অস্ত্র লাভকল্পে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও এর এক অংশ থেকে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন

করার জন্য ভারতীয় অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছিল।

দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১৩১ ধারাবলে আনীত চার্জে বলা হয়েছে যে, এই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পাকিস্তানের স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর লোকদের আনুগত্য ও কর্তব্য খেলাপে উৎসাহিত করে।

গতকাল ১নং অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবর রহমান হতে ১৬নং অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাক্তন এফ/সার্জেন্ট মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক পর্যন্ত চার্জশীট পাঠ করা হয়।

ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্তদের পৃথক পৃথক চার্জশীট পড়ে দোষী কি নির্দোষ প্রশ্ন করলে সকলেই নিজেদের নির্দোষ বলে দাবী করেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, "আমি নির্দোষ। এটা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। আমি জেলখানায় আটক ছিলাম।"

সিএসপি অফিসার আহমদ ফজলুর রহমান বলেন, "আমি নির্দোষ। অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা।"

তিনজন আসামী জানান যে, তারানংরাজী বোঝেন না। তখন বিচারপতি জনাব এম, আর, খান বাংলায় চার্জ পড়ে শোনান।

সংবাদ

২১শে জুন ১৯৬৮

শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থনের জন্য ৭ জন আইনজীবী নিয়োগ

ঢাকা, ২০শে জুন (পিপিআই)।– অদ্য রাত্রে আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে সমর্থনের জন্য ৭ জন এডভোকেট নিযুক্ত করা হইয়াছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এই ৭ জন এডভোকেট হইতেছেন মেসার্স আবদুস সালাম খান (ভ্রমবশতঃ) গতকল্যকার 'সংবাদ'–এ বাদীপক্ষের কৌসুলী বলিয়া উল্লিখিত, যশোরের মসিউর রহমান, জহিরুদ্দিন, মোল্লা জালালুদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান ব্যারিষ্টার এবং মইনুল হোসেন ব্যারিষ্টার। ইহা ছাড়া জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব আবু হোসেন সরকার এবং জনাব টি,আলী বিবাদীপক্ষের কৌসুলী দলের নেতা জনাব আবদুস সালাম খানকে পরামর্শ দান করিবেন বলিয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা হয়।

সংবাদ

২১শে জুন ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

শুনানীর ২য় দিনে একজন সি এস পি অফিসার, ১জন মেজর ও ৪ জন ক্যাপ্টেনসহ ১৯ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের : সরকারপক্ষের প্রধান কৌসুলী মঞ্জুর কাদির কর্তৃক ট্রাইব্যুনালে ক্ষমাপ্রাপ্ত ১১ ব্যক্তি ও ৭ জন সাক্ষীর জবানবন্দী পেশ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ৯টা ১৫ মিনিটে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল মেসে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' নামে পরিচিত রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলায় অভিযুক্ত মোট ৩৫ ব্যক্তির মধ্যে একজন সিএসপি অফিসার, একজন মেজর ও চারজন ক্যাপ্টেনসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাইয়া পাকিস্তানকে উহার একটি অংশ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান হইতে বঞ্চিত করার অভিযোগ উপস্থিত করা হয়।

অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া দাবী করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত পরশু আলোচ্য মামলার শুনানীর উদ্বোধনী দিবসে শেখ মুজিবর রহমান এবং দুজন সি-এস-পি অফিসার ও কতিপয় সামরিক অফিসারসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে উপরোক্ত ষড়যন্ত্রের অভিযোগ দায়ের করা হয়।

গতকল্য ট্রাইব্যুনালের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনও ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জাষ্টিস এস, এ, রহমান অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি পাঠ করিয়া শোনান। ট্রাইব্যুনালের আর দুইজন সদস্য বিচারপতি জনাব এম, আর খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিম তাঁহার উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন।

১৯ জনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির পাঠ সমাপ্ত হইবার পর সরকারপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মনজুর কাদির ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সহিত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জড়িত থাকার প্রমাণ হিসাবে ২২৭ জন সাক্ষীর প্রদত্ত সাক্ষ্যের বিবরণ দান করিয়া একটি বিবৃতি দেন। তিনি ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে ক্ষমাপ্রাপ্ত ১১ জন ও ৭ জন সাক্ষীর জবানবন্দীও পেশ করেন।

প্রথম দিনের অনুরূপ গতকল্য আদালত কক্ষে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। শেখ মুজিবর রহমানসহ মামলায় অভিযুক্ত সকল ব্যক্তি ও তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন এবং বিপুলসংখ্যক আইনজীবী ও দেশী-বিদেশী সাংবাদিক

আদালতে উপস্থিত ছিলেন। গতকল্য সকাল সোয়া ৯টা হইতে দুপুর একটা পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন চলার পর অদ্য সকাল ৯টা পর্যন্ত অধিবেশন পুনরায় মূলতবী রাখা হয়।

পিপিআই পরিবেশিত খবরে বলা হয়, যে ১৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়, তাহার মধ্যে সি, এস, পি অফিসার খান শামসুর রহমান অন্যতম।

অপরাপর অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ হইতেছেন সার্জেন্ট জহুরুল হক, এক্স-এবি, মুহাম্মদ খুরশীদ পি জেও ৭৬৮, রিসালদার এ, কে, এম, শামসুল হক, ৩০৩১০১৮নং, হাবিলদার আজিজুল হক, এস, এস, জি, পাক ৭৩০৪০, এস, এ, সি মাহফুজুল বারী, পাক ৭০৪১৫, সার্জেন্ট শামসুল হক, পিএসএস-১০০৫২০, মেজর শামসুল আলম, এ,এস,সি, পি এস এস-৬১০০, ক্যাপটেন মোহাম্মদ আবদুল মোতালিব, পি টি সি-৫৭২৭, ক্যাপটেন এম, সাওকাত আলী মিয়া-পি এ,৬৫৬১, ক্যাপ্টেন খোন্দকার নজমুল হুদা, এ এস সি, ক্যাপটেন এ, এন, এম, নূরুজ্জামান, ই, বি, আর, পাক-৭০৭০৪, সার্জেন্ট আবদুল জলিল, জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুদ্দীন চৌধুরী, পি,নং ৯৫৮, ফার্ষ্ট লেঃ এম, এস, এম, রহমান, এক্স সুবাদার, এ,কে,এম,তাজুল ইসলাম, জনাব মোহাম্মদ আলী রেজা, পি এস এস-২০০৪৭১, ক্যাপ্টেন খুরশীদুদ্দীন আহমদ, এ এম সি, পি,নং ৯৪৪ ফার্ষ্ট লেঃ আবদুর রউফ।

উপরোক্ত প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তিই পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১-ক এবং ১৩১ ধারামতে বিচারযোগ্য অপরাধে অপরাধী বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। এই উভয় ধারা মতেই অপরাধীর যাবজ্জীবন, দ্বীপান্তর অথবা ১০ কিম্বা অর্থদণ্ড সহ উহা অপেক্ষা কম মেয়াদের কারাদণ্ড হইতে পারে।

সরকারী কৌসুলীর বক্তব্য

সর্বমোট ৩৫ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করার পর প্রধান সরকারী কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির তাঁহার বক্তব্য পেশের জন্য উঠিয়া দাঁড়ান।

বক্তব্যের প্রথমেই তিনি সাক্ষী সম্পর্কে কতিপয় সংশোধনী পেশ করিলে ট্রাইব্যুনাল উহা সংশোধন করিয়া লয়।

জনাব মঞ্জুর কাদির ট্রাইব্যুনালকে আরও জানান যে, শীঘ্রই বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের জন্য বিমানে ১৯৬৮ সালের ফৌজদারী আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অর্ডিন্যান্সের বহুসংখ্যক কপি আসিয়া পৌঁছিবে।

ইহা ছাড়া বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদিগকে সাক্ষীদের জবানবন্দীর সাইক্লো স্টাইল করা কপিও দেওয়া হইবে বলিয়া জনাব মঞ্জুর কাদির ট্রাইব্যুনালকে

জানান। সরকারী কৌসুলী ট্রাইব্যুনালে সাক্ষীদের বিভিন্ন জবানবন্দী, স্বীকারোক্তি এবং অন্যান্য দলিলপত্র পেশ করেন।

সরকারী কৌসুলীরই সুপারিশ মোতাবেক ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস,এ,রহমান বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের জানান যে, তাঁহারা লিখিতভাবে আবেদন করিলে তাঁহাদিগকে দলিলপত্র দেখিতে ও তাহা হইতে নোট গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হইবে। ট্রাইব্যুনালের তরফ হইতে জানান হয় যে, দলিলগুলি নিরাপত্তা বিভাগের কর্মচারীদের হেফাজতে রাখা হইয়াছে।

বিবাদীপক্ষ হইতে এই সমস্ত দলিলপত্রের নকল প্রার্থনা করা হইলে ট্রাইব্যুনাল উহা অগ্রাহ্য করেন।

জনাব মঞ্জুর কাদির ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারামতে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে প্রদত্ত সাক্ষীদের ৭টি জবানবন্দী এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারামতে ক্ষমাপ্রাপ্ত ১১ জন অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক তদন্তকারী অফিসারদের সম্মুখে প্রদত্ত জবানবন্দী ছাড়াও ৪ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে পেশ করেন।

সরকারপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সহিত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জড়িত থাকার প্রমাণ হিসাবে ২২৭ জন সাক্ষীর প্রদত্ত সাক্ষ্যের বিস্তারিত বিবরণ দান করিয়া একটি বিবৃতি দান করেন। তবে, অধিবেশনে সরকার পক্ষের প্রধান কৌসুলী তাঁহার বিবৃতি সমাপ্ত করিতে কিম্বা ট্রাইব্যুনালে যে সমস্ত সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করিবে তাহাদের নামের পূর্ণ তালিকা পেশ করিতে অসমর্থ হন।

জনাব মঞ্জুর কাদির তাঁহার দীর্ঘ বক্তব্যের মধ্যে শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এই মামলায় জড়িত থাকা সম্পর্কে যে সমস্ত সাক্ষী সাক্ষ্যদান করে তাহাদের পরিচয় দান করেন।

সরকার পক্ষীয় কৌসুলী বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদিগকে তাঁহার বক্তব্যের একখানি করিয়া সাইক্লোষ্টাইল করা কপি দুই দিনের মধ্যে সরবরাহ করা হইবে বলিয়া ট্রাইব্যুনালকে প্রতিশ্রুতি দান করেন।

জনাব মঞ্জুর কাদির আসন গ্রহণ করার পূর্বেই ট্রাইব্যুনালের অদ্যকার অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস,এ,রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টের বিচারপতি জনাব এম, আর, খান এবং বিচারপতি জনাব মকসুমূল হাকিমকে লইয়া এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত।

বিবাদীপক্ষে জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব আতাউর রহমান খান, খান বাহাদুর ইসমাইল, জনাব জহিরুদ্দীন, জনাব সৈয়দ আজিজুল হক,

জনাব মীর্জা গোলাম হাফিজ, জনাব মসিউর রহমান, বদরুল হায়দার চৌধুরী, মোল্লা জহির উদ্দীন, জনাব হাবিবুর রহমান, জনাব আবুল খয়ের খান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব কে, জেড, আলম, জনাব আমিনুল হক, জনাব ভিখারুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব আমিরুল ইসলাম, জনাব জুলমত আলী খান, জনাব মওদুদ আহমদ, জনাব মইনুল হোসেনসহ প্রায় ৬০ জন আইনজীবী মামলা পরিচালনা করিতেছেন।

সরকারপক্ষে জনাব টি,এইচ,খান, জনাব এ,আলিম,জনাব খাকান বাবর এবং গ্রুপ ক্যাপটেন মোহাম্মদ আসলামের সহায়তায় প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির এই মামলা পরিচালনা করিতেছেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২১শে জুন ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

বাদীপক্ষ কর্তৃক সাক্ষ্য-প্রমাণাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান

এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অভিযোগের সপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন।

বিচারপতি জনাব এস এ রহমান (চেয়ারম্যান), বিচারপতি জনাব এম আর খান এবং বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিমকে নিয়ে এই তিন সদস্যবিশিষ্ট ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে।

এইসব সাক্ষ্য-প্রমাণের মধ্যে ছিল সাক্ষীদের মৌখিক বিবৃতি, অভিযুক্তদের মধ্যে চার ব্যক্তির আদালতে স্বীকারোক্তি এবং তদন্তকালে আটককৃত প্রামাণ্য দলিল ও দ্রব্যাদি। সাক্ষীরা তদন্তের সময় যেসব বিবৃতি দেন এবং অভিযোগে যা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সে সবের নকল অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পূর্ব থেকেই সরবরাহ করা হয়েছে।

গতকাল যে অবশিষ্ট ১৯ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা হয় তারা সকলেই নিজেদেরকে নির্দোষ বলে দাবী করে।

অন্যান্য সাক্ষীদের বিবৃতির সংক্ষিপ্তসার এবং আটককৃত প্রামাণ্য দলিল ও দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মৌখিকভাবে দেওয়া হয়। এইসব মৌখিক বিবৃতির নকল বাদীপক্ষ দু'দিনের মধ্যে অভিযুক্তদের সরবরাহ করবেন।

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বিচারপতি জনাব এস এ রহমানের নেতৃত্বে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে পুনরায় শুরু হয়।

গত বুধবার ৩৫ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা হয়। গতকাল অবশিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা হয়।

জনাব মঞ্জুর কাদির বলেন, আটককৃত প্রামাণ্য দলিলপত্র আদালতে পেশ করার আগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বা তাদের কৌশুলীগণ যদি চান তবে আদালতের অনুমতি নিয়ে তা দেখতে পারেন।

বর্ণনায় যে সমস্ত দলিলপত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তির হস্তাক্ষরে লিখিত বলে বর্ণিত তিনটি ডায়েরী, উপরোক্ত ডায়েরীগুলোতে পাওয়া সাঙ্কেতিক নাম ব্যবহার করে কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে লিখিত বলে বর্ণিত চিঠিপত্র।

জনাব মঞ্জুর কাদিরের বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শেষ হয়। আজ সকাল ৯টায় ট্রাইব্যুনাল পুনরায় বসবে।

সংবাদ

২২শে জুন ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

শুনানীর তৃতীয় দিনে আরও ৫ জন সাক্ষীর নাম তালিকাভুক্ত :

ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন ১৬ই জুলাই পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য (শুক্রবার) স্বল্পকালের জন্য অধিবেশন চলার পর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অনুষ্ঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যদের মামলার শুনানী আগামী ১৬ই জুলাই পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস,এ,রহমানের সভাপতিত্বে এবং ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম, আর খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিমকে লইয়া গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে গত বুধবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমান এবং সি এস পি ও সামরিক অফিসারসহ অপর ৩৪ জনের বিরুদ্ধে শুনানী শুরু হয়। সরকারপক্ষ কর্তৃক আনীত ষড়যন্ত্রের অভিযোগের জবাবে ৩৫ জন অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রত্যেকেই নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করেন।

গতকল্যকার বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ একসঙ্গে দাঁড়াইয়া ট্রাইব্যুনালের নিকট বন্দী অবস্থায় তাহাদের থাকা-খাওয়া ইত্যাদি ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের প্রার্থনা জানাইলে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান তাহাদিগকে নিজ নিজ কৌসুলীর মারফত আবেদনপত্র পেশ করার নির্দেশ দেন। অভিযুক্ত জনাব কামালুদ্দিন বন্দী অবস্থায় তাহাদের দুরবস্থার প্রতি ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অভিযুক্তদের পক্ষ হইতে কৌসুলী মারফত ইতিমধ্যে এতদসংক্রান্ত আবেদনপত্র পেশ করা হইলে ট্রাইব্যুন্যালের চেয়ারম্যান উহা দেখা হইবে বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন।

পি, পি, আই পরিবেশিত খবরে বলা হয় ঃ বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে সাক্ষ্য সম্পর্কে সরকার পক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির তাঁহার পূর্বদিনের অসমাপ্ত বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

সরকার পক্ষের প্রধান কৌসুলী গতকল্য সাক্ষীর নাম অন্তর্ভূক্ত করেন এবং তাহার ফলে সাক্ষীর সংখ্যা ২২৭ জন হইতে ২৩২ জনে দাঁড়ায়।

এই ৫ জন সাক্ষী হইতেছেন ইপিআর এর হাবিলদার নওয়াব আলী, ইনসাফ আলী, হারুনর রশীদ, পি আই এ'র আখলাক হোসেন এবং পেশোয়ারের অতিরিক্ত পুলিস সুপার।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদিগকে মামলার জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য সাক্ষীর জবানবন্দী পর্যালোচনা ও অন্যান্য দলিলপত্র পরীক্ষার সুযোগদানের উদ্দেশ্যে ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন আগামী ১৬ই জুলাই পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

সরকারপক্ষের প্রধান কৌসুলী ট্রাইব্যুনালকে জানান যে, তিনি মুল কপিসহ ১৯৬৮ সালের ফৌজদারী আইন সংশোধনী অর্ডিন্যান্স (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল)-এর কপি পাইয়াছেন এবং উহা বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের প্রদান করা হইবে।

তিনি আরও জানান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সমর্থনে যে সমস্ত জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে, তাহাও আগামী দুই-একদিনের মধ্যে বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের দেওয়া হইবে।

জনাব মঞ্জুর কাদির ৪২ প্রস্ত জবানবন্দীর উল্লেখ করেন এবং এক এক করিয়া উহার ৫টি তালিকা পেশ করেন।

জনাব মনজুর কাদিরের বক্তব্য সমাপ্ত হইলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান ট্রাইব্যুনালের নিকট তাঁহাদের স্ব স্ব মোয়াক্কেল ছাড়াও অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করিলে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান তাঁহাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

বিবাদীপক্ষের অন্যতম সিনিয়র কৌসুলী খান বাহাদুর ইসমাইল হোসেন অদ্য বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন যে, বিবাদীপক্ষের বিভিন্ন দলিলপত্র ও অর্ডার সীটের প্রয়োজন হইবে।

তিনি তাঁহার উক্তি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, মামলা পরিচালনার জন্য যাহাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহাদের সম্পর্কিত অর্ডারের সম্পূর্ণ সেট। ইহা ছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করার অর্ডারের সম্পূর্ণ

সেট, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পরীক্ষামূলক সনাক্তকরণ সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট এবং হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টের সম্পূর্ণ সেটের প্রয়োজন হইবে।

সরকারপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মনজুর কাদির তাঁহার সমস্ত দাবী স্বীকার করিয়া বলেন যে, তাঁহারা ট্রাইব্যুনালের অনুমতি লইয়া এই সমস্ত দলিলপত্র পাইতে পারেন।

ইহাছাড়া খান বাহাদুর ইসমাইল হোসেন অন্যতম সাক্ষী মোঃ মোহসীনকে কাহার আদেশে ও কোন আইনে আটক রাখা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৩৭ ধারার ৩ উপ-ধারার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, এই ধারামতে সাক্ষী নহে, পরন্তু রাজসাক্ষীকেই মাত্র আটক রাখা চলে।

এই প্রশ্নের উপর জনাব মনজুর কাদির জানান যে, সাক্ষীদের মধ্যে অনেকে আশ্রয় প্রার্থনা করায় তাহাদিগকে হেফাজতে রাখা হইয়াছে। তবে এই ব্যাপারে তিনি তদন্ত করিয়া দেখিবেন বলিয়া আশ্বাস দান করেন।

খান বাহাদুর ইসমাইল ট্রাইব্যুনালকে আরও জানান যে, ১৯৬৮ সালের অর্ডিন্যান্সের ৫ ধারামতে সরকারপক্ষ বিচারের যে কোন পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে সাক্ষী হাজির করিতে পারিবে। এরূপ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে সরকার পক্ষীয় কৌসুলীকে পূর্বাহ্নে এইরূপ সাক্ষীদের একটি তালিকা এবং তৎসম্পর্কিত অর্ডার বিবাদীপক্ষের কৌসুলীকে দিতে হইবে বলিয়া তিনি দাবী করেন।

এই বিষয়ে সরকার পক্ষীয় কৌসুলী তাঁহার স্বীকৃতি জানান।

সংবাদ

২২শে জুন ১৯৬৮

অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সরকার পক্ষের কৌসুলীদের তালিকা

আগরতলা ষড়যন্ত্র বলিয়া পরিচিত রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলায় যে সকল আইনজীবী অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে– জনাব আবদুস সালাম খান, সিনিয়র এডভোকেট, পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট, এডভোকেট মসিউর রহমান, এডভোকেট জহিরউদ্দিন, এডভোকেট মোল্লা জালালউদ্দিন আহমেদ, জনাব হাবিবুর রহমান, বার এট-ল' জনাব মইনুল ইসলাম বার এট-ল', ও

এডভোকেট সৈয়দ নজরুল ইসলাম। জনাব খান এম, শামসুর রহমান সি-এস-পি'র পক্ষে এডভোকেট জনাব আতাউর রহমান খান। ক্যাপ্‌টেন খুরশীদ উদ্দীন আহমদের পক্ষে–এডভোকেট সৈয়দ আজিজুল হক। ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হকের পক্ষে এডভোকেট জমিরউদ্দীন আহমেদ। আলী রেজার পক্ষে এডভোকেট মনসুর রহিম। ক্যাপ্‌টেন এ,বি,এম নুরুজ্জামান ও খোন্দকার নজমুল হুদা এ এস সি'র পক্ষে এডভোকেট মির্জা গোলাম হাফিজ। রুহুল কুদ্দুস সি এস-পি'র পক্ষে এডভোকেট খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল ও এডভোকেট আমিনুল হক।

আহমদ ফজলুর রহমান সি-এস পি'র পক্ষে জনাব ভিখারুল ইসলাম চৌধুরী বার-এট-ল', এস এ জি মফিজুল বারী ও মাহবুব উদ্দিন চৌধুরীর পক্ষে এডভোকেট এ,এম,এম,এ জলিল। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মোয়াজ্জম হোসেনের পক্ষে জনাব কে, জেড আলম বার-এট-ল'। ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের পক্ষে এডভোকেট মুজিবুর রহমান ও এডভোকেট মাহমুদ উল্লাহ (জুনিয়র)। ই এস এল/এস সুলতান উদ্দিন আহমেদের পক্ষে জনাব আমিরুল ইসলাম বার-এট-ল'। হাবিলদার দলিলউদ্দিনের পক্ষে এডভোকেট জালাল উদ্দিন আহমেদ ও এডভোকেট আবদুল হাই। প্রাক্তন কর্পোরাল এ,বি,এম,এ সামাদের পক্ষে মওদুদ আহমেদ, বার-এট-ল'। সার্জেন্ট মফিজুল্লার পক্ষে এডভোকেট জুলমত আলী, এ,বি মোহাম্মদ খুরশীদ ও ক্যাপটেন শাওকাত আলীর পক্ষে এডভোকেট জনাব এ এম, এম, এ, জলিল। এল,এস,সি,ডি,আই নূর মোহাম্মদের পক্ষে এডভোকেট এস এম, নূরুল ইসলাম। প্রাক্তন হাবিলদার মুজিবুর রহমানের পক্ষে এডভোকেট কে,এম,এ, আবদুল কাদের।

সংবাদ

২২শে জুন ১৯৬৮

ট্রাইব্যুনাল সমীপে বন্দীদের আবেদন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আনীত ষড়যন্ত্র মামলার ৩,৪,৫,৭,৮,৯,১১,১২,১৩,১৪,১৫ও ১৬ নম্বর অভিযুক্তদের পক্ষ হইতে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল সমীপে একটি আদেনপত্র পেশ করা হইয়াছে।

উহাতে (ক) আবেদনকারীদের প্রতি সম্মানজনক ও মানবিক আচরণের নিশ্চয়তা বিধান এবং সামরিক হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে তাঁহাদের কোন প্রকার শারীরিক ও মানবিক নির্যাতন ও কোন প্রকার ভীতি প্রদর্শন না করা, (খ) উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত খাদ্য এবং অন্যান্য দৈনন্দিন ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী

সরবরাহ; (গ) উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় শরীর চর্চার সুযোগদান; (ঘ) ব্যক্তিগত পছন্দমত সংবাদপত্র ও পাঠ্য বিষয় লাভের নিশ্চয়তা এবং (ঙ) আত্মীয়-স্বজনের সহিত প্রয়োজন অনুসারে সাক্ষাৎকারের সুযোগদানের নিশ্চয়তা বিধানের আবেদন জানানো হয়।

উক্ত আবেদনপত্রে বলা হয় যে,উপরোল্লেখিত ব্যক্তিগণ দীর্ঘদিন যাবৎ আটক রহিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশকে দৈহিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হইয়াছে এবং গত প্রায় ছয়মাস যাবৎ দুঃস্বপনের মধ্য দিয়া তাহারা দিন কাটাইতেছেন।

আটক থাকাকালীন সময়ে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং আইনজীবীদের সহিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ হইতে তাহাদের বঞ্চিত করা হয়।

আবেদনপত্রে আরও বলা হয় যে, শারীরিক নির্যাতন উপযুক্ত চিকিৎসার অভাব, উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাব ইত্যাদি কারণে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

উহাতে বলা হয় যে, তাহাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বিচার শুরু হইয়াছে। সুতরাং পারিবারিক কুশনবার্তা ও অন্যান্য পার্থিব বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য আত্মীয়-স্বজনের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকারের অনুমতি দানের আবেদন জানানো হয়।

দৈনিক পয়গাম

২২শে জুন ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন ১৬ই জুলাই পর্যন্ত মুলতুবী

সরকারপক্ষে সর্বমোট ২৩২ জন সাক্ষীর নাম ঘোষণা

গতকল্য সকাল ৯টায় বিচারপতি জনাব এস,এ, রহমানের নেতৃত্বে গঠিত এই বিশেষ ট্রাইব্যুনালটির মাত্র একঘনটাকাল স্থায়ী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবর রহমান ও অপর ৩৪জনের বিরুদ্ধে আনীত যুক্তদের মধ্যে একজন তাহাদের "আটককালীন অবস্থা" সম্পর্কে ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে কিছু বলিতে চাইলে বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান সংশ্লিষ্ট কৌসুলীর মাধ্যমে লিখিতভাবে উহা ট্রাইব্যুনালকে জানাইতে বলেন।

২। হাবিলদার ইনসাফ আলী, ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস

৩। জনাব হারুনুর রশিদ,

৪। জনাব আখলাক হোসেন এবং

৫। পেশোয়ারের জনৈক ডি এস পি (নাম উল্লেখ করা হয় নাই)।

এই পাঁচজন সাক্ষী লইয়া সরকার পক্ষীয় সাক্ষীদের মোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৩২।

এ পি পি পরিবেশিত সংবাদে বলা হয়, তিন দিবস স্থায়ী অধিবেশনে ট্রাইব্যুনাল সরকারের পক্ষ হইতে মামলার অভিযোগপত্র এবং অভিযুক্ত ৩৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে অভিযোগপত্র পাঠ করিয়া শুনায়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সকলেই নিজেদের নির্দোষ বলিয়া দাবী করেন। প্রধান সরকারী কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের ২৩২জন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্যপ্রমাণাদির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করেন। সরকারপক্ষ কর্তৃক উল্লিখিত এই সমস্ত সাক্ষী উপরোক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রদান করিবেন বলিয়া আশা...

সর্বশেষ তারিখ আগামী সোমবারের মধ্যে আসামীপক্ষকে পাঁচ শ্রেণীর জবানবন্দী ও দলিলপত্রের অনুলিপি সরবরাহ করা হইবে।

পাঁচ শ্রেণীর জবানবন্দী ও দলিলপত্র নিম্নরূপ ঃ-

১ম শ্রেণীঃ ক্ষমাপ্রাপ্ত ৭জন সাক্ষী কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত জবানবন্দী। সংশ্লিষ্ট ৭জন সাক্ষী হইতেছেনঃ

১। লেফটন্যান্ট মুজাম্মিল হোসেন; ২। সাবেক কর্পোরাল আমীর হোসেন মিয়া; ৩। সার্জেন্ট শমসুদীন আহমদ;। ৪। ডঃ সাঈদুর রহমান; ৫। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ; ৬। ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আলিম ভূঁইয়া; ৭। কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম।

২য় শ্রেণীঃ ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা অনুযায়ী ১১জন রাজসাক্ষীর ১২টি জবানবন্দী । ইহার মধ্যে জনাব আমীর হোসেনের দুইটি জবানবন্দী রহিয়াছে । রাজসাক্ষীঃ

১। লেফটন্যান্ট মুজাম্মিল হোসেন । ২। সাবেক কর্পোরাল আমীর হোসেন মিয়া । ৩। সার্জেন শামসুদ্দীন আহমদ । ৪। ডঃ সাইদুর রহমান । ৫। ফ্লাইট লেফটন্যান্ট মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ। ৬। ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল আলিম ভুইয়া। ৭। কর্পোরাল জামালুদ্দীন আহম্মদ । ৮। কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম । ৯। মোহাম্মদ গোলাম আহমদ । ১০। আবুল বাসার মোহাম্মদ ইউসুফ এবং সার্জেন্ট মোহাম্মদ ।

৩য় শ্রেণীঃ ষড়যন্ত্রের সংগে জড়িত না হইয়া যাঁহারা অভিযুক্তদের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রদত্ত জবানবন্দী। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা অনুযায়ী এই সমস্ত জবানবন্দী প্রদানকারী ব্যক্তিগণ হইতেছেনঃ

১। কামালুদ্দীন আহমদ। ২। কে জি আহমদ। ৩। নায়েব সুবাদার এম, আশরাফ আলী খান। ৪। মোহাম্মদ মোহসীন। ৫। আবু শামস লুৎফল হুদা। ৬। সাবেক সুবাদার জালালুদ্দীন আহমদ এবং ৭। আনোয়ার হোসেন।

৪র্থ শ্রেণীঃ ষড়যন্ত্রের সংগে জড়িত না হইয়া যাঁহারা অভিযুক্তদের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা অনুযায়ী তাঁহাদের প্রদত্ত জবানবন্দী। এই সমস্ত ব্যক্তি হইতেছেনঃ

১। কামালুদ্দীন আহমদ। ২। কে, জি, আহমদ। ৩। সমন অফিসার মোশারাফ হোসেন। ৪। লেফটন্যান্ট কম্যাণ্ডার শহীদুল হক। ৫। সুবাদার আশরাফ আলী খান। ৬। মোহাম্মদ মোহসীন। ৭। আবু শামস লুৎফল হুদা। ৮। জালালুদ্দীন আহমদ। ৯। কর্পোরাল এ, কে, এম, এ, হাই। ১০। আনোয়ার হোসেন। ১১। সমন অফিসার জাকের আহমদ এবং ১২। সাবেক স্কোয়াড্রন লীডার মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী।

৫ম শ্রেণীঃ চারজন অভিযুক্ত ব্যক্তির জুডিশিয়াল স্বীকারোক্তি।

তাঁহারা হইতেছেনঃ

১। ক্যাপ্টেন খন্দকার নজমুল হুদা

২। মেজর শামসুল আলম।

৩। ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী এবং

৪। ক্যাপ্টেন শওকত আলী খান।

জনাব মঞ্জুর কাদিরের বক্তৃতা পেশের পর আসামীপক্ষের কৌশুলী জনাব আব্দুস সালাম খান যে সমস্ত দলিলপত্র প্রদর্শিত হইবে তাহা ছাড়াও যে সমস্ত দলিলপত্র আটক করা হইয়াছে এবং যাহা প্রদর্শন করা হইবে না বলিয়া ধারণা করা হইতেছে তাহাও তাহাদিগকে দেখিবার সুযোগদানের জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করেন।

আদালত তাঁহাকে এজন্য দরখাস্ত পেশ করিতে পরামর্শ দেন।

আসামীপক্ষের অপর কৌঁসুলী জনাব এম, ইসমাইল সনাক্তকরণ প্যারেড সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট, অভিযুক্তগণ কর্তৃক ব্যবহৃত কথিত ছদ্মনাম উদঘাটন সম্পর্কিত রিপোর্ট পেশ করার এবং সাক্ষী কামালুদ্দীন আহমদ ও মোহাম্মদ মোহসীন কোন্ কর্তৃপক্ষের নির্দেশবলে আটক রহিয়াছেন জানিতে চাহেন (তাঁহারা আটক রহিয়াছেন বলিয়া তিনি জানেন)।

প্রধান কৌঁসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের বলেন যে, তিনি বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তিনি আরও জানান যে, সাক্ষীরা হয়ত নিজেদের অনুরোধেই আটক রহিয়াছেন।

গতকল্য ট্রাইব্যুনাল আসামীপক্ষের কৌঁসুলীদের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে কতদিন লাগিতে পারে জিজ্ঞাসা করিলে জনাব আবদুস সালাম খান আদালতের অধিবেশন ৬ সপ্তাহকাল মুলতবী রাখার আবেদন জানান। জনাব

মঞ্জুর কাদের তিন সপ্তাহের বেশী সময় মুলতবির বিরোধিতা করেন। পরে ২৪ দিন মুলতবি রাখার প্রশ্নে সম্মতি দেওয়া হয়।

জনাব এফ, করিমকে আসামী জনাব কাজী শামসুল হকের পক্ষ সমর্থনের জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে। আসামীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই রাষ্ট্রের খরচে তাহার জন্য কৌঁসুলী নিয়োগ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২২শে জুন ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী ১৬ই জুলাই পর্যন্ত মুলতবী

গতকাল শুক্রবার ঢাকায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী জুলাই মাসের ১৬ তারিখ পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হয়। এই মামলায় শেখ মুজিবর রহমানসহ মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পাকিস্তানকে তার একটি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করা অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ বিচারপতি জনাব এস এ রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে গত বুধবার থেকে এই ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হয়। ট্রাইব্যুনালের অন্য দু'জন সদস্য হচ্ছেন বিচারপতি জনাব এম আর খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিম।

আদালতের এই অধিবেশন কালে ট্রাইব্যুনাল বাদীপক্ষের অভিযোগ পড়ে শোনান এবং ৩৫ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিবরণ পাঠ করেন। অভিযুক্ত সকলেই নিজেদের নির্দোষ বলে দাবী করেন।

এছাড়া বাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির বাদীপক্ষের তালিকাভুক্ত মোট ২৩২ জন সাক্ষীর জবানবন্দী ও সাক্ষ্য প্রমাণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করেন।

জনাব মঞ্জুর কাদির গতকাল ট্রাইব্যুনালের সংক্ষিপ্ত অধিবেশনকালে তার বক্তব্য শেষ করেন।

গতকালকের সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে বাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির বাদীপক্ষ কর্তৃক তালিকাভুক্ত ২৩২ জন সাক্ষী যে জবানবন্দী পেশ করতে পারেন তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ-রেখা দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

জনাব মঞ্জুর কাদির ট্রাইব্যুনালকে জানান যে, আগামী সোমবারের মধ্যেই প্রতিবাদীদের পাঁচটি ক্যাটাগরির জবানবন্দী ও দলিলপত্রের নকল সরবরাহ করা হবে।

পাঁচটি ক্যাটাগরি হলোঃ ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মোতাবেক প্রদত্ত ক্ষমাপ্রাপ্ত সাতজন সাক্ষী হলেনঃ

(১) লেফটেন্যান্ট মোজাম্মেল হোসেন (২) সাবেক করপোরাল আমির হোসেন মিয়া (৩) সার্জেন্ট শামসুদ্দী আহমদ (৪) ডাঃ সাইদুর রহমান (৫) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মির্জা মোহাম্মদ রমিজ (৬) ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল আলিম ভুইয়া এবং (৭) করপোরাল সিরাজুল ইসলাম।

দ্বিতীয় ক্যাটাগরিঃ ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত এগারোজন রাজসাক্ষীর ১২টি জবানবন্দী। আমির হোসেন দু'টো জবানবন্দী দিয়েছে। রাজসাক্ষীগণ হলেন ঃ

(১) লেফটেন্যান্ট মোজাম্মেল হোসেন (২) সাবেক করপোরাল আমির হোসেন মিয়া (৩) সার্জেন্ট শামসুদ্দীন আহমদ (৪) ডাঃ সাইদুর রহমান (৫) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মির্জা মোহাম্মদ রমিজ (৬) ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল আলিম ভুঁইয়া (৭) করপোরাল জামালউদ্দীন আহমদ (৮) করপোরাল সিরাজুল ইসলাম (৯) মোহাম্মদ গোলাম আহমদ (১০) আবুল বাশার মোহাম্মদ ইউসুফ এবং (১১) সার্জেন্ট মোহাম্মদ।

তৃতীয় ক্যাটাগরিঃ ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত নয় কিন্তু আসামীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মোতাবেক এমন ব্যক্তিদের দেওয়া জবানবন্দী। এরা হলেন ঃ

(১) কামালউদ্দীন আহমদ (২) কে জি আহমদ (৩) নায়েব সুবেদার এম আশরাফ আলী খান (৪) মোহাম্মদ মহসীন (৫) আবু শামস লুতফুল হুদা (৬) সাবেক সুবেদার জালালউদ্দীন আহমদ এবং (৭) আনোয়ার।

চতুর্থ ক্যাটাগরিঃ যারা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন অথচ ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত হননি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারাবলে তাদের জবানবন্দী।

এরা হচ্ছেনঃ (১) কামালউদ্দিন আহমদ (২) কে জি আহমদ (৩) ওয়ারেন্ট অফিসার মোশাররফ হোসেন (৪) লেফটেন্যান্ট কম্যান্ডার শহীদুল হক (৫) নায়েব সুবেদার আশরাফ আলী খান (৬) মোহাম্মদ মহসীন (৭) আবু শামস লুতফুল হুদা (৮) জালালদ্দীন আহমদ (৯) করপোরাল এ কে এম এ হাই (১০) আনোয়ার হোসেন (১১) ওয়ারেন্ট অফিসার জাকের আহমদ ও (১২) প্রাক্তন স্কোয়াড্রন লীডার মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী।

পঞ্চম ক্যাটাগরীঃ চারজন অভিযুক্ত ব্যক্তির আদালতে স্বীকারোক্তি।

এরা হচ্ছেনঃ (১) ক্যাপ্টেন খোন্দকার নাজমুল হুদা (২) মেজর শামসুল আলম (৩) ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী ও (৪) ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়া।

জনাব মঞ্জুর কাদিরের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর আসামীপক্ষের কৌশুলী জনাব আবদুস সালাম খান যেসব দলীল আদালতে প্রদর্শিত হবে সেগুলো

এবং যেসব দলীল আটক করা হয়েছে কিন্তু আদালতে প্রদর্শিত হবে না সেসবও দেখার সুযোগ দেবার আবেদন জানান।

ট্রাইব্যুনাল তাঁকে এজন্য আবেদনপত্র পেশের নির্দেশ দেন।

এরপরে আসামীপক্ষের অপর কৌশুলী জনাব এম এম ইসমাইল সনাক্তকরণ প্যারেড সম্পর্কিত ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট আসামীদের ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক ভাষার ব্যাখ্যাকার সম্পর্কিত রিপোর্ট দেখতে চান এবং কোন ক্ষমতাবলে সাক্ষী কামালদ্দীন আহমদ ও মোহাম্মদ মহসিনকে আটক রাখা হয়েছে তা জানতে চান।(তাঁর জানামতে তারা দু'জন আটক রয়েছেন।)

বাদীপক্ষের প্রধান কৌশুলী জনাব মঞ্জুর কাদির তাঁকে জানান যে, তিনি বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নেবেন। তিনি আরো বলেন যে, হয়তো নিজেদের অনুরোধক্রমেই তাদের আটক রাখা হয়েছে।

আসামীপক্ষের কৌশুলীদের প্রস্তুতির জন্য কত সময় লাগবে আদালত একথা জানতে চাইলে জনাব আবদুস সালাম খান ছ'সপ্তাহের আবেদন জানান।

জনাব মঞ্জুর কাদির তিন সপ্তাহের বেশি সময় দানের বিরোধিতা করেন।

পরে ২৪ দিন সময় দেওয়া হবে বলে তারা একমত হন।

গতকাল সকালে ট্রাইব্যুনালে শুনানী শুরু হলে আসামী জনাব সুলতানউদ্দীন আহমদ তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলতে চান।

ট্রাইব্যুনালে তাকে তাদের কৌশুলীর মাধ্যমে আবেদন করার নির্দেশ দেন।

জনাব এফ করিম আসামী কাজি শামসুল হকের কৌশুলী নিযুক্ত হয়েছেন। কাজি শামসুল হকই একমাত্র আসামী যিনি রাষ্ট্রীয় খরচে তার উকিল নিয়োগের আবেদন জানান।

মঞ্জুর কাদিরের লাহোর যাত্রা

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির গতকাল শুক্রবার ঢাকা থেকে লাহোর রওয়ানা হয়ে যান।

Morning News

23rd June 1968

Tribunal takes 4-day recess: conspiracy trial

(By Our Staff Reporter)

Special Tribunal, trying the State versus Sheikh Mujibur Rahman case, he had after about an hour-long session yesterday morning to meet in July 16.

Conclusion of the Chief Prosecution Counsel, Mr.Manzur Qadir's might opening statement, the deferce Prayed for a six-week adjourn. Manzur Qadir said three weeks is what he would consider sufficience for the defence preparation.The defence preparation at this stage, ... would be mainly to examine the documents supplied by the ... They can prepare the case as it developed later.

... plea submitted ... Salam Khan and ... Rahman Khan was ... would take ... weeks. Mr. Ataur Rahman said the defence…with most of ... intended to be … by the ... would take time to ... antecedents. The witnesses Prosecution Counsel ... five more witnesses ... would depose in ... additions brought number of prosecution ... 232. On Thursday mentioned 27 new wit ... addition to the listed.

Witness number 223 ... Nawab Ali and … 229 Havilder Insaf ... will give ... fact that ex-Sube ... Ahmed (witness corporal A. B. M. A. ... No.8) and ex ... Amir Hussain (witness ... Surveyed the border ... and Jessore in June.

… Number 230 Harunur…Manzur Qadir said, ... about the hiring of Dinanath Sen Lane, Hussain, an accomplice ....

…Number 231 Akhlaque ... depose with regard ... manifesto of P/A ... M. Hussain travel … airline on August 28.

…No. 232, an Addition ... Peshawar, Whose name mentioned, would … to a hotel … accused Ali Reza stayed at the relevant.

STATEMENT

... able five categories of statements to the accused and their counsel.

In the first category of these statements are those made by seven of the eleven approvels who have since been pardoned under Section 164 Cr. P.C. before a magistrate. Those who had made statements in this category are Lt. Muzammal Hussain (witness No. 1). Ex-Corporal Air Hussain (witness No. 3), Sgt. Shamsuddin Ahmed (witness No. 6), Dr. Saeedur Rahman (witness No.7), F/Lt. Mirza Muhammad Rameez (witness No.12), Capt. Abdul Alim Bhuiya (witness No. 13) and Corporal Sirajul Islam (witness No. 15).

In the second category are 12 statements by all the eleven approvers, one having made two, under Section 161 Cr. P.C. before the investigation officer. They are Lt. Muzammal Hussain, ex-corporal Amir Hossain, Sgt. Shamsuddin Ahmed, Dr. Saeedur Rahman, F/Lt. M.M.Rareez, Capt.Abdul Alim Bhuiya, Corporal Jamaluddin Ahmad, Corporal Sirajul Islam, Muhammad Ghulam

Ahmed,Abul Bashar Mohammad Yusuf and Sgt. Mohammad Abdul Halim.

The third category of statements made under Section 164 of Cr.P.C. before a magistrate are by those who came in contact with the accused but were not accomplices. They are Kamaluddin Ahmed (witness No. 2) K.G. Ahmad (witness No.4), Naib-Sub. Ashraf Ali Khan (Witness No. 9), Md. Mohsin (witness No. 11), Abu Shams Lutful Huda (witness No. 16), Ex-Sub Jalaluddin Ahmed (witness No. 17), and Anwar Hussain (witness No.20).

The Fourth category of statements have been made under Section 161 Cr.P.C. before the investigating officer by Kamaluddin Ahmed (witness No. 2), K. G. Ahmed (witness No. 4), Warrant Officer Musharaf Hossain (witnesss No. 5), Lt. Commander Shahidul Haq (witness No. 8), Naib-Subeder Ashraf Ali Khan (witness No. 9), Mohammad Mohsin (witness No. 11), Abu Shams Lutful Huda (witness No. 16), ex-Sub. Jalaluddin Ahmed (witness No. 17), Corporal A.K.M.A. Hai (witness No. 19), Anwar Hussain (witness No.20), Warrant officer Jaker Ahmed (witness No. 22), and Squadron Leader (retired) Muazzam Husain Choudhury.

The fifth category of statements are judicial confessions by four accused: Bhupati Bhushan Choudhury alias Manik Choudhury, Major Shamsul Alam, Capt. Shawket Ali Mian and Capt. Khondker Nazmul Huda.

Mr. Manzur Qadir in the Course of his concluding statement said that the prosecution was willing to supply the photostatic copy of important documents which were offered for inspection only on Thursday by him.

The defence counsel appreciated the gesture but Mr. Abdus Salam Khan prayed that the defence be allowed to inspect all the seized documents and articles and not only those which are intended to be produced in the court.

Mr.Manzur Qadir said he was not aware if there were more seized documents and articles than were intended to be produced. But if the defence counsel could ask for them specifically, they should apply to the court.

Mr. Manzur Qadir also told the court that the amended ordinance on the constitution of the Tribunal would reach Dacca this afternoon. Copies of the original and amending ordinances were however handed over to the Court for distribution to the defence.

As. Mr. Manzur Qadir concluded Mr. Abdus Salam Khan made a plea before the court that counsels be allowed to interview all the accused besides their own clients. This was contested by Khan Bahadur Ismail who said he would not like his client to be interviewed by others. This was not permitted by law. The Honourable Court rejected Mr. Salam's plea.

At this stage Khan Bahadur Ismail prayed to the court that the completed order sheet in respect to the pardon of the approvers under Section 337 Cr. P.C. be made available to the defence. In addition he also prayed for copies of order sheets in respect to arrests of individual accused, a report on the bassi ... on which the "disguised languages" (as referred to in the complaint by the prosecution) had been decoded, and also a report of the handwriting expert who will depose in the case.

Khan Bahadur Ismail wanted information about witness No. 11, Mr. Muhammad Mohsin who has been tendered pardon. He said he had an information that Mohsin was in the custody of the Government. If true, he wanted to know under whose authority and under what law Mohsin had been kept in custody. Later a defence counsel also mentioned the name of Kamaluddin, prosecution witness No. 2.

Replying Mr. Manzur Qudir said the report of the handwriting expert would be available to the defence shortly. The report on the identification parade will also be made available to them. He said he could not make an immediate statement on the availability of the complete order sheet in respect to pardon to approvers and the order sheet on arrest.

As to whether Mohsin and Kamaluddin were in custody, Mr. Manzur Qadir said he would find out the exact position. But he had been told that some of the witnesses had approached the Government that they be protected. The court said in case the witnesses were being protected on their own accord, that would not be arrest.

Mr. Manzur Qadir said the disguised languages had been explained in the statements of the approvers. There was no question of decoding them.

Since the opening of the trial on Wednesday, the prosecutioin had made a statement of complaint which was read out by the Tribunal on the opening day. Later the 35 accused in the case were arraigned, 16 of them including Sheikh Mujibur Rahman on the first day and 19 on the second day of the trial.

All the accused have been charged on two counts, conspiracy to wage war against Pakistan with the help of some Indian citizen and abetting mutiny by some armed personnel.

As the Tribunal resumed the trial yesterday, one of the accused, Mr. Sultanuddin Ahmed, wanted to make a submission regarding their board and lodging. The Tribunal advised him to put applications through their counsels.

Mr. F. Karim has been appointed the counsel to one of the accused, Kazi Shamsul Huq, the only person who on the opening day of the session made the prayer to the court for the provision of defence counsel at the state expense.

সংবাদ

২৯শে জুন ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

বৃটিশ কৌঁসুলী কর্তৃক শেখ মুজিবের পক্ষসমর্থন

প্রেস ট্রাষ্টের ইংরেজী দৈনিক মর্ণিং নিউজে প্রকাশিত উহার লণ্ডনস্থ প্রতিনিধির এক খবরে বলা হইয়াছে যে, কুইন্স কাউন্সিলের মিঃ টম উইলিয়ামস 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলায় অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্য ৩৪ ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করিবেন। মিঃ উইলিয়ামস ওয়ারিংটন (মিডল্যাণ্ডস) হইতে নির্বাচিত শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য।

আজাদ

৩রা জুলাই ১৯৬৮

শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থনে বৃটিশ কৌঁসুলী

লণ্ডন, ২রা জুলাই।—বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য টমাস উইলিয়াম আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে ওকালতি করিতে রাজী হইয়াছেন।

তিনি শীঘ্রই পাকিস্তান যাত্রা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। বর্ত্তমানে তিনি পাকিস্তানে একজন কৌঁসুলী হিসাবে যোগদানে প্রয়োজনীয় অনুমতি লাভের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন।—এপিপি

Pakistan Observer

3rd July 1968

Mujib's defence

Thomas williams accepts brief

LONDON, July 2 :– Thomas Williams, a member of the British Parliament, has accepted the brief on behalf of Sheikh Mujibur

Rhaman, accused number one in the conspiracy case, reports APP. He is expected to fly to Pakistan shortly and is currently waiting for a work permit to enable him to apear as a counsel in Pakistan.

সংবাদ

৩রা জুলাই ১৯৬৮

শেখ মুজিবের পক্ষে বিদেশী আইনজ্ঞ নিয়োগ

লণ্ডন, ২রা জুলাই (এপিপি)।– বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মিঃ টমাস উইলিয়াম আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ হইতে মামলার নথিপত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

মিঃ টমাস শীঘ্রই পাকিস্তানে আগমন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। তিনি বর্তমানে পাকিস্তানে আইন উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

দৈনিক পয়গাম

৩রা জুলাই ১৯৬৮

আগরতলা মামলা

শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থনে বৃটিশ আইনজীবীর সম্মতি

লন্ডন, ২রা জুলাই।–বৃটিশ পার্লামেন্টের জনৈক সদস্য টমাস উইলিয়ামস আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ সমর্থনের ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

পাকিস্তানে আইনজীবী হিসাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ওয়ার্কপারমিটের জন্য এখন মিঃ উইলিয়ামস আলোচনা করিতেছেন এবং এই পারমিট পাওয়ার পরই তিনি পাকিস্তান অভিমুখে যাত্রা করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। –এ,পি,পি

আজাদ

৭ই জুলাই ১৯৬৮

আগরতলা মামলার শুনানী ২৯ শে জুলাই পর্য্যন্ত মুলতবী

লাহোর, ৬ই জুলাই।– আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী পুনরায় ১৬ই জুলাইর পরিবর্ত্তে ২৯ শে জুলাই শুরু হইবে বলিয়া বিশেষ ট্রাইব্যুনালের রেজিষ্ট্রার জনাব এ, মীর্জ্জা অদ্য এখানে ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন যে, আসামীপক্ষের অনুরোধে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান আরও দুই সপ্তাহ উক্ত মামলার শুনানী মুলতবী রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এপিপি-রয়টার

দৈনিক পয়গাম

৭ই জুলাই ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র : পাকিস্তান কর্তৃক ভারতীয় লিপি প্রত্যাখ্যান

ইসলামাবাদ, ৬ই জুলাই।– আজ এখানে সরকারীভাবে জানা যায় যে, আগরতলা ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করিয়া ভারত যে লিপি পাঠাইয়াছে পাকিস্তান তাহা সামগ্রিকভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

ভারতে নিযুক্ত পাকিস্তানী হাইকমিশনার জনাব সাজ্জাদ হায়দার গতকাল নয়াদিল্লীতে এই লিপিটি পান। কিন্তু তিনি এই যুক্তিতে উহা প্রত্যাখ্যান করেন যে, ষড়যন্ত্রে ভারতের জড়িত থাকার অভিযোগ সাক্ষ্যপ্রমাণে স্বীকৃত হইয়াছে। তিনি ভারতীয় লিপিটিকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অযাচিত হস্তক্ষেপ বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতর ভারতীয় লিপির পূর্ণ বিবরণীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রবিরোধী কার্যে ষড়যন্ত্রকারীদের সংগে যোগসাজশের অভিযোগে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের ফার্ষ্ট সেক্রেটারী মিঃ পি,এন, ওঝাকে গত জানুয়ারীতে পাকিস্তান হইতে বহিষ্কার করা হয়।

কথিত ষড়যন্ত্রের দায়ে ৩৫ ব্যক্তির বিচার চলিতেছে। –এ,পি,পি

২৯শে জুলাই ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী পুনরারম্ভ

লাহোর, ৬ই জুলাই।– বিশেষ ট্রাইব্যুনালের রেজিষ্ট্রার জনাব এ, এ, মীর্জা আজ এখানে ঘোষণা করেন যে, ২৯শে জুলাই ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী পুনরারম্ভ হইবে।

ঘোষণায় বলা হয়, ১৬ই জুলাই শুনানী পুনরারম্ভ হইবে বলিয়া ইতিপূর্বে ঘোষণা করা হইয়াছিল।

কিন্তু আসামীপক্ষের কৌসুলীর অনুরোধে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান মামলার শুনানী আরও দুই সপ্তাহের জন্য মুলতবী রাখিতে সম্মত হন। এখন ১৯৬৮ সালের ১৬ই জুলাইর স্থলে ১৯৬৮ সালের ২৯শে জুলাই ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী পুনরায় আরম্ভ হইবে।

সংবাদ

৮ই জুলাই ১৯৬৮

শেখ মুজিবরের পক্ষ সমর্থনে ভারতীয় আইনজীবীদের আগ্রহ

লণ্ডন, ৬ই জুলাই (এপিপি)।– বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মিঃ টম উইলিয়ামস ছাড়াও ভারতের কয়েকজন আইনজীবী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ সমর্থনে ইচ্ছুক বলিয়া 'লণ্ডন টাইমস' পত্রিকার লণ্ডন ডায়েরীতে প্রকাশ।

মিঃ উইলিয়ামস লণ্ডন ডায়েরীতে বলেন যে, "এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল" সংস্থা এই ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীর প্রতি নজর রাখিয়াছে।

সংবাদ

১১ই জুলাই ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়ামস্ এর শীঘ্রই ঢাকা আগমন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যের পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রখ্যাত বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়ামস শীঘ্রই এখানে আগমন করিবেন বলিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা গিয়াছে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আগামী ২৯ তারিখ মামলার পরবর্তী শুনানী শুরু হইবে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অন্য কোন বিদেশী আইনজীবী নিয়োগের ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। উহাতে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আইনগত সাহায্যদান কমিটির ভারতীয় আইনজীবীদের মামলায় অংশগ্রহণের আগ্রহ সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় নাই এবং কমিটি ভারতীয় আইনজীবী নিয়োগের কথা চিন্তাও করিতেছে না।

Pakistan Observer

19th July 1968

AROUND THE COURTS

Nomani Bagchi set at liberty

(By Our Court Correspondent)

Nomani Bagchi alias Maleka Khatun of Natore in Rajshahi was set at liberty by the Sessions Judge, Dacca on Thursday after 14 days in judicial custody.

Earlier the Sessions Judge ordered a medical test for determination of her age. Accordingly the Civil Surgeon, Dacca had the test and found her aged between 18 and 20.

Considering this medical report and the submission by her lawyer that she is an adult lady and an I.Sc.examinee, the Judge found her a sui juris competent to go anywhere she likes.

Nomani Bagchi was arrested on July 4 at the Dacca Airport along with one Sekander Ali after they got down from a plane. They came from a Natore.

Ramna police produced them before the SDO, South, Dacca he next day. The SDO sent he lady to judiciary custody ad refused the bail prayer of Sekander Ali.

On July 6 Nomani Bagchi made a judicial statement that she was a 20-year-old adult and left her house with Sekander Ali, for, she had decided to accept him asher husband four or five years ago.

On July & further petitions were made for their bail before the Sessions Judge who ordered for their ad interior bail.

Meanwhile, the police learnt of a case filed by the father of the lady at natore that she had been kidnapped by Sekander Ali.

On July 9 when bail bond was furnished for the release of Nomani Bagchi (No bond was furnished for Sekander Ali, for, he could not be released due to his arrest in the specific case of kidnapping) she refused to go out leaving Sekander in custody.

While keeping Sekander Ali in custody in the specific case of kidnapping the SDO ordered for custody of Nomani Bagchi as a victim of the kidnapping. The SDO then referred the matter to the Sessions Judge for instruction whether the alleged victim should continue to be in judicial custody or she should be released on bail.

On this, the Sessions Judge ordered for a report by the Civil Surgeon on her age. The report was ready for the court's consideration on Thursday when bail petitions were moved for both Sekander and Nomani.

On Thursday while setting Nomani at liberty, the Sessions judge also granted bail to Sekander Ali directing him to appear before the SDO, Natore, in connection with the kidnapping case.

Syed Azizul Huq with Mr.Serajul Islam and Mr. Fazlul Karim Chowdhury moved for their bail.

Pakistan Observer

19th July 1968

Mujib's counsel arriving July 25

(By A Staff Correspondent)

Mr. Tom Willams, a renowned British Lawyer, will arrive in Dacca on July 25, to defend Sheikh Mujibur Rahman the number one accused person in the case State vs. Sheikh Mujib and others which will reopen on July 29 at the Dacca Cantonment, according to Mirza Golam Hafiz, Counsel for two accused persons in the conspiracy case.

Mirza Golam Hafiz of Dacca High Court went to Paris to attend the world conference on Vietnam and met the British lawyer in London. Mirza Golam Hafiz returned to Dacca on Thursday.

সংবাদ

২৬শে জুলাই ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থনের জন্য
প্রখ্যাত বৃটিশ আইনজীবীর ঢাকা উপস্থিতি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্যের পক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে খ্যাতনামা বৃটিশ আইনজীবী ও শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য মিঃ টমাস উইলিয়ামস গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিমানযোগে ঢাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

বিমান বন্দরে মিঃ উইলিয়ামসকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। রাজনৈতিক নেতা-কর্মী,আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য বিমানবন্দরে উপস্থিত হন। মেসার্স নূরুল ইসলাম এম এন এ, শামসুল হক, শফিউল আলম, আবদুল মান্নান, ডঃ আহমদ আলী, আনসার আলী, আফসারউদ্দিন আকন্দ, ময়েজুদ্দিন, মতিউর রহমান, মীর্জা গোলাম হাফিজ, ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী, মওদুদ আহমেদ, কে, জেড, আলম, এ সালাম খান, আমিরুল ইসলাম, জুলমত আলী প্রমুখসহ ঢাকার বিশিষ্ট আইনজীবিগণ বিমানবন্দরে মিঃ উইলিয়ামসকে অভ্যর্থনা জানান। মিঃ উইলিয়ামসকে বিমানবন্দরে মাল্যভূষিত করা হয়।

আগামী ২৯শে জুলাই বিশেষ ট্রাইব্যুনালের দ্বিতীয় দফা অধিবেশন শুরু হইতেছে।

জানা গিয়াছে যে, মিঃ উইলিয়ামস প্রথম দফায় এক পক্ষকাল ঢাকায় অবস্থান করিবেন, কিছুদিন পর তিনি পুনরায় এখানে আগমন করিবেন।

মিঃ উইলিয়ামস আজকালের মধ্যেই মামলার "ব্রীফ" সম্পর্কে স্থানীয় আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হইবেন। তিনি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থান করিতেছেন।

সংবাদ

২৭শে জুলাই ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
ঢাকায় কর্মব্যস্ত টমাস উইলিয়ামস

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ সমর্থনকারী বৃটিশ কৌসুলী মিঃ টমাস উইলিয়ামস এম পি, কিউ, সি গতকল্য (শুক্রবার) সকালে ঢাকা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস,

এম মোর্শেদের বাসভবনে গমন করিয়া আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের বিষয়াদি সম্পর্কে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টাব্যাপী আলাপ-আলোচনা করেন।

মিঃ টমাস উইলিয়ামস গতকল্য (শুক্রবার) বৈকালে স্থানীয় বিশিষ্ট আইনজীবীদের সহিত এক চা-চক্রে মিলিত হন। উক্ত চা-চক্রে খান বাহাদুর নাজিরুদ্দীন, জনাব আতাউর রহমান খান, মীর্জা গোলাম হাফিজ, ডঃ কামাল হোসেন, জনাব আসাদুজ্জামান খান, জনাব ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব আমিরুল ইসলাম, জনাব মওদুদ আহমেদ, জনাব কে জেড আলম, জনাব জহিরুদ্দীন, জনাব আনোয়ারুল ইসলাম প্রমুখ বিশিষ্ট আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মিঃ উইলিয়ামস গত বৃহস্পতিবার ঢাকা আগমন করিয়াছেন। মিঃ টমাস উইলিয়ামস তাঁহার মক্কেল শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাতের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছেন এবং গতকল্য (শুক্রবার) পর্যন্ত তিনি সাক্ষাতের চেষ্টা করেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

আরও জানা গিয়াছে যে, মিঃ টমাস উইলিয়ামস পাকিস্তানে অবস্থানকালে, প্রয়োজনীয় 'ওয়ার্ক পারমিট'-এর প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন।

সংবাদ

২৯শে জুলাই ১৯৬৮

আজ ষড়যন্ত্র মামলার দ্বিতীয় দফা শুনানী

(নিজস্ব বার্ত্তা পরিবেশক)

অদ্য (সোমবার) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল মেসে সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান (ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান) এবং ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম,আর খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিম সমবায়ে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মজিবুর রহমান ও অন্যান্যের (আগরতলা ষড়যন্ত্র) মামলার দ্বিতীয় পর্যায়ের শুনানী শুরু হইবে। গত মাসের ১৯ তারিখে এই মামলার প্রথম পর্যায়ের শুনানী আরম্ভ হয় এবং তিনদিন চলার পর মামলা মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যের মামলায় তিনজন সি-এস-পি অফিসার জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব খান,এম,শামসুর রহমান এবং একজন লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার, একজন মেজর ও ৫ জন ক্যাপ্টেনসহ মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে "ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাইয়া পাকিস্তানকে উহার একটি অঞ্চল (অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান) হইতে বঞ্চিত করার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।"

আলোচ্য ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তারকৃত ১১ জনকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই মামলায় সরকার পক্ষে মোট ২ শত ৩২ জন সাক্ষী সাক্ষ্যদান করিবেন।

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্যের (আগরতলা ষড়যন্ত্র) মামলায় সরকার পক্ষের কৌসুলী হইলেন প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব মঞ্জুর কাদের, জনাব টি এইচ, খান এডভোকেট, ঢাকা; গ্রুপ ক্যাপটেন জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ আসলাম এডভোকেট, করাচী; জনাব আবদুল আলীম এডভোকেট, ঢাকা এবং জনাব খাকান বাবর এডভোকেট, লাহোর।

বিবাদী শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে প্রধান কৌসুলী হইলেন প্রখ্যাত বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়ামস। ইহাছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব মসিউর রহমান, জনাব জহির উদ্দিন, জনাব হাবিবুর বার-এট-ল', জনাব মইনুল ইসলাম বার-এট-ল', সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সৈয়দ আজিজুল হক, মীর্জা গোলাম হাফিজ, খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল, জনাব ভিখারুল ইসলাম চৌধুরী বার-এট-ল', জনাব কে,জেড,আলম বার-এট-ল', জনাব আমিরুল ইসলাম, বার-এট-ল',জনাব মওদুদ আহমেদ বার-এট-ল', জনাব জুলমত আলী,জনাব কে,এম,এ, আবদুল কাদের প্রমুখসহ প্রদেশের প্রায় ৬০ জন বিশিষ্ট আইনজীবী রহিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়' অভিযোগের বিবরণে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান কর্মপন্থাগুলি নিম্নরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। যথাঃ (ক) কমাণ্ডো ষ্টাইলে আকস্মিকভাবে সামরিক কেন্দ্রগুলির অস্ত্রাগার দখল করিয়া সেগুলিকে অচল করিয়া দেওয়া;

(খ) স্বাধীনতা ঘোষণা করা ও সামরিক আইন জারী; (গ) একটি "ভদ্রলোকের চুক্তি" অনুসারে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে জল বা আকাশ পথে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ প্রতিরোধকল্পে ভারতের উপর নির্ভর করা এবং (ঘ) পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসরত পূর্ব পাকিস্তানীদের বিনিময়ে ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত বিদ্রোহকালে পূর্ব পাকিস্তানে আটক পশ্চিম পাকিস্তানীদের 'জিম্মী', হিসাবে রাখা।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ সমর্থনের জন্য খ্যাতনামা বৃটিশ আইনজীবী এবং শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য মিঃ টমাস উইলিয়ামস গত বৃহস্পতিবার এখানে আগমন করিয়াছেন। গত শুক্রবার তিনি, ঢাকা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস,এম,মুর্শেদের বাসভবনে যাইয়া মামলার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁহার সহিত দীর্ঘ আলোচনা করেন।

টমাস উইলিয়মস-এর ব্যস্ততার মধ্যে দিনযাপন

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, গতকল্য (রবিবার) মিঃ টমাস উইলিয়মস ব্যস্ততার মধ্যে দিনযাপন করেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, গতকাল (রবিবার) তিনি "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্যের" মামলা সম্পর্কে বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব হামিদুল হক চৌধুরীর সহিত সুদীর্ঘ আলোচনা করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যের মামলায় তিনজন সি-এস-পি অফিসার জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও খান এম, শামসুর রহমান এবং একজন লেফটেন্যান্ট কম্যাণ্ডার, একজন মেজর ও ৫জন ক্যাপ্টেনসহ মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে "ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাইয়া পাকিস্তানকে উহার একটি অঞ্চল হইতে বঞ্চিত করার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।"

আজাদ

৩০শে জুলাই ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

রাজসাক্ষী লেঃ মোজাম্মেল হোসেনের জেরা :

জনৈক অভিযুক্তকেই সেনাখত করিতে অসমর্থ

ঢাকা, ২৯শে জুলাই।— বিশেষ ট্রাইব্যুনালের রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব এবং অন্যান্যদের মামলায় অদ্য সরকারপক্ষীয় প্রধান কৌসুলি জনাব মনজুর কাদের সাক্ষী লেঃ মোজাম্মেল হোসেনকে জেরা করেন। উহার জবাবে লেঃ মোজাম্মেল নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেনঃ-

আমি ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর সদস্য হিসাবে করাচীর ট্রেনিং সংস্থায় (হিমালয়) কর্ম্মরত ছিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ তথায় অন্যান্য পূর্ব্ব পাকিস্তানী সামরিক চাকুরিয়া থাকিলেও একমাত্র আমিই ছিলাম স্থায়ী অফিসার। তথায় ১৯৬০ সালে আমি পূর্ব্ব পাকিস্তানী কর্ম্মচারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান করি। এই সমস্ত পূর্ব্ব পাকিস্তানীগণ তাহাদের পারিবারিক ও অন্যান্য সমস্যা লইয়া আমার কাছে আসিতেন।

লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দিন আহমদ, এ্যাবল সীম্যান নুর মোহাম্মদ এবং ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান প্রায়শঃ প্রতিষ্ঠানটির সভায় যোগ দিতেন।

এই পর্য্যায়ে উপরোক্ত ৩ ব্যক্তির মধ্যে কাহাকেও তিনি আদালতে অভিযুক্তদের মধ্যে দেখিতে পাইতেছেন কিনা প্রশ্ন করা হয়। সাক্ষী সুলতানউদ্দিন আহমদ ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবের প্রতি সঠিকভাবে অঙ্গুলী সঙ্কেত

করিতে সক্ষম হন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ লক্ষ্য করার পরও নূর মোহাম্মদকে দেখাইয়া দিতে পারেন নাই। আদালত তখন নূর মোহাম্মদকে উঠিয়া দাঁড়াইবার নির্দ্দেশ দেন। উহার পর সাক্ষী তাঁহাকে চিনিতে সক্ষম হন এবং বলেন যে, নূর মোহাম্মদ ইতিমধ্যে দাঁড়ি রাখিয়াছে বিধায় তিনি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই।

সম্ভবতঃ ৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম এক বৈঠকে যোগদান করেন। (সাক্ষী আসামীদের কাঠগড়া হইতে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে সঠিকভাবে নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হন। ৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসের এই দিনের বৈঠকের পূর্ব্বে ষ্টুয়ার্ড মুজিব পূর্ব্ব পাকিস্তানে ছিলেন এবং তিনি আসিয়া লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম সমভিব্যাহারে এই বৈঠকে যোগ দেন। এই বৈঠকই ষ্টুয়ার্ড মুজিব পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের অবস্থার তুলনা করেন এবং প্রথমোক্তদের দরিদ্র ও শেষোক্তদের ধনী বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

ষ্টুয়ার্ড মুজিবের বক্তব্য শ্রবণের পর লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম বলেন, আমরা পূর্ব্ব পাকিস্তানের মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হই না কেন? এই সময় কতিপয় পশ্চিম পাকিস্তানী বন্ধুবান্ধব আসিয়া পড়ায় বিষয়টির উপর আর আলোচনা হয় নাই। তৎপরিবর্তে তাঁহারা প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া যান। উহার পর আমাদের এই কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানটির সভা-সমিতি যথারীতি অব্যাহত থাকে ; কিন্তু আমি লক্ষ্য করি যে, লিডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ এবং ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমাদের বৈঠকের প্রতি আগ্রহী নহেন। প্রায় ১৫ দিন পর ডিসেম্বর মাসে এই বৈঠক বসে। আমি তখন লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দিন আহমদকে প্রশ্ন করিলে জবাবে তিনি বলেন যে, লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম এক সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে সামরিক কর্ম্মচারী ও প্রাক্তন সামরিক কর্ম্মচারীদের লইয়া একটি বিপ্লবী গুরুপ গঠন করিয়াছেন। উহার কিছুদিন পর '৬৮ সালের জানুয়ারীতে লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম আমাকে ডি/৭৭, কে ডি এ স্কীম-১, করাচীস্থ তাঁহার বাসভবনে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানান।

আমি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাই যে, লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দিন, লীডিং সীম্যান নুর মোহাম্মদ এবং ষ্টুয়ার্ড মুজিবের সহিত আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত আছেন। আমিও উহাতে যোগ দিই। লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম ঐ সময় তাঁহার নয়া সংস্থার কাজ শুরু করার পূর্ব্বে কতিপয় পূর্ব্ব পাকিস্তানী রাজনীতিকের সহিত আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত উহাতে

আদালতে ১ নম্বর আসামীর আসনে সমাসীন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের পরামর্শ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

উহার পর লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম আমাকে করাচীর স্কুল টিচার্স কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটির একটি গৃহে ডাকিয়া পাঠান। লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দিন আহমদ আমাকে উহার খবর দেন এবং তিনি আমাকে তাঁহার ভগ্নিপতি কামালুদ্দিন আহমদের এই গৃহে লইয়া যান। আমরা তথায় পৌঁছার পর লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম ও লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদকে উক্ত গৃহে হাজির দেখিতে পাই। অতঃপর লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম আমাকে জানান যে, তিনি আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব ও জনাব আহমদ ফজলুর রহমান সি এস পির সহিত এক বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমার আগমনের পর উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গও তথায় আসিয়া পৌঁছেন। (সাক্ষীকে জনাব আহমদ ফজলুর রহমানকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বলা হয়। তিনি কাঠগড়ার নিকটে গিয়া বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করার পর তাহাকে দেখাইতে সক্ষম হন।) শেখ মুজিব স্পষ্টতঃ খুব ব্যস্ত ছিলেন এবং বৈঠকে তিনি লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমকে তাহার সমস্যা ব্যক্ত করিতে বলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি তখন বলেন যে, তিনি পূর্ব বাংলার মুক্তির জন্য নৌবাহিনীর কর্ম্মিদের লইয়া একটি গুরুপ গঠন করিয়াছেন। তিনি আরও বিশ্লেষণ দেন যে, তিনি উহাতে অন্যান্য বাহিনীর লোকজনদেরও ভিড়াইবেন। তিনি বলেন, এই পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য তাহার পূর্ব্ব পাকিস্তানী রাজনৈতিক ও সিএসপি অফিসারদের সহায়তার প্রয়োজন রহিয়াছে। লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম এই ব্যাপারে সংস্থার অসুবিধাসমূহের মোকাবেলার জন্য আর্থিক ব্যাপারেও আলোচনা করেন।

আজাদ

৩০শে জুলাই ১৯৬৮

প্রত্যেকেই তাহাকে চিনিতে পারে : শেখ মুজিব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

এক নম্বর রাজসাক্ষী লেঃ মোজাম্মেল হোসেন জেরার এক পর্য্যায়ে পরিচয়ের জন্য অভিযুক্ত শেখ মুজিবরকে হাত উঠাইতে বলিলে, শেখ মুজিবর রহমান তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন যে, শালীনতার অভাব।

তিনি বলেন, কোর্টই কেবলমাত্র আমাকে কোন কিছু নির্দ্দেশ করিতে পারে—সে হাত উঠাইতে বলিতে পারে না। শেখ মুজিবকে চিনাইতে হইলে হাত উঠাইবার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেকেই তাহাকে চিনিতে পারে।

রাজসাক্ষী চুপ করিয়া যান। অবশ্য তিনি শেখ মুজিবকে "স্যার" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

সংবাদ

৩০শে জুলাই ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ২য় দফা শুনানী শুরু
বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতার প্রশ্নে বিবাদীপক্ষীয় কৌসুলীর আপত্তি প্রত্যাখ্যাত
অন্যতম রাজসাক্ষী লেঃ মোজাম্মেল হোসেনের জেরা আরম্ভ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য (সোমবার) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল মেসে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দ্বিতীয় পর্যায়ের শুনানী শুরু হইতেই শেখ মুজিবর রহমানের প্রধান কৌসুলী মিঃ টমাস উইলিয়মস কিউ-সি ট্রাইব্যুনাল এবং যে অর্ডিন্যান্সবলে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছে, উহার বৈধতা চ্যালেঞ্জপূর্বক প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করিলে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান জনাব এস, এ রহমান উহা প্রত্যাখ্যান করেন।

বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী মিঃ উইলিয়মস আরও বলেন যে, তাঁহার মক্কেল শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে এমন কোন সাক্ষ্যপ্রমাণাদি নাই যাহার ভিত্তিতে তাঁহাকে আটক রাখা যায়। মিঃ উইলিয়ামস তাঁহার তিন দফা প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন প্রসংগে ট্রাইব্যুনালের নিকট বলেন ঃ

(১) এই ট্রাইব্যুনাল গঠন ও উহার ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য জারীকৃত ১৯৬৮ সালের ফৌজদারী আইন সংশোধন (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল) অর্ডিন্যান্সটি অবৈধ। এই অর্ডিন্যান্স অংশতঃ শাসনতন্ত্রের সাধারণ উদ্দেশ্যের বিরোধী, অংশতঃ শাসনতন্ত্র বহির্ভূত ও অংশতঃ শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী।

(২) এইভাবে গঠিত ট্রাইব্যুনাল অবৈধ ও উহার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালনের অযোগ্য।

(৩) বাদীপক্ষের যুক্তি অনুযায়ী শেখ মুজিবর রহমানকে যথাযথভাবে অভিযুক্ত করার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ নাই।

বিবাদীপক্ষের উপরোক্ত আপত্তিসমূহ অগ্রাহ্য করিয়া ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন যে, আলোচ্য অর্ডিন্যান্স অনুসারে আদালত পরিচালিত হইতেছে এবং সেজন্য ট্রাইব্যুনাল অর্ডিন্যান্সের বৈধতা সংক্রান্ত কোন আপত্তি বিবেচনা করিতে পারে না। অতঃপর তিনি বাদীপক্ষকে সাক্ষী জেরা শুরু করিতে নির্দেশ দেন।

এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের প্রধান কৌসুলী প্রখ্যাত বৃটিশ আইনজীবী মিঃ উইলিয়মস আদালত সমীপে আরও অভিযোগ করেন যে, তাঁহার গতিবিধির উপর সিকিউরিটি অফিসারগণ কড়া নজর রাখিতেছেন এবং তাঁহাকে সর্বক্ষণ অনুসরণ করা হইতেছে; ইহার ফলে

এই মামলায় তাঁহার মক্কেলের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইতেছে। পিপিআই জানান যে, গতকাল ১ নম্বর রাজসাক্ষী লেঃ মোজাম্মেল হোসেনকে জেরা করা হয়। প্রথমে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মনজুর কাদির লেঃ মোজাম্মেল হোসেনকে জেরা করেন। জেরাকালে তিনি বলেন, 'আমি ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত পাকিস্তান নৌবাহিনীর সদস্য হিসাবে করাচী (হিমালয়) ট্রেনিং সংস্থায় কার্যরত ছিলাম। পূর্ব পাকিস্তানী কর্মচারীদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য আমি ১৯৬০ সালে একটি "কল্যাণ সমিতি" গঠন করি। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানী কর্মচারীরা নিজেদের পারিবারিক ও অন্যান্য সমস্যা লইয়া আমার নিকট আসিতেন। লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমদ, এ্যাবল সীম্যান নূর মোহাম্মদ ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান প্রায়ই উক্ত সমিতির সভায় উপস্থিত থাকিতেন।

আদালতে উপস্থিত আসামীদের মধ্যে উক্ত তিনজনের কাহাকেও দেখা যাইতেছে কিনা, সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সাক্ষী নির্ভুলভাবে সুলতানউদ্দীন আহমদ ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে সনাক্ত করেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ পরেও তিনি নূর মোহাম্মদকে সনাক্ত করিতে ব্যর্থ হন। অবশেষে আদালত নূর মোহাম্মদকে দাঁড়াতে বলেন, তখন সাক্ষী লেঃ মোজাম্মেল হোসেন তাহাকে চিনিতে পারেন এবং বলেন যে, ইতিমধ্যে জনাব নূর মোহাম্মদের মুখে দাড়ি গজানোর ফলে তাহাকে ঠাহর করিতে পারেন নাই।

সম্ভবতঃ ১৯৬৩ সনের ডিসেম্বরে লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন সংস্থার এক বৈঠকে যোগদান করেন। (সাক্ষী আসামীর কাঠগড়ায় লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দেন)।

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে এই বৈঠকের পূর্বে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন এবং লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন সহ এই বৈঠকে যোগদান করেন। বৈঠকে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা তুলনা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানকে গরীব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে ধনী বলিয়া বর্ণনা করেন। ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের বক্তব্য শ্রবণের পর লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, কেন আমরা পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হইব না।

ঐ সময় কতিপয় পশ্চিম পাকিস্তানী বন্ধু আসিয়া পড়ায় আলোচনা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আলোচনার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা হয়। ইহার পর আমাদের প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ সংস্থার সভা যথারীতি চলে। কিন্তু এই সভায় আমি লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের কোন আগ্রহ দেখিতে পাই নাই। প্রায় ১৫ দিন পর ডিসেম্বরে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আমি লীডিং সীম্যান সুলতান উদ্দীন আহমেদকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অনুসন্ধান

করিয়া আমাকে জানান যে, লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে কেন্দ্র হইতে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সামরিক কর্মচারী ও প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীদেরকে লইয়া একটি বিপ্লবী গ্রুপ গঠন করিয়াছেন।

ইহার কিছুদিন পর ১৯৬৮ সনের জানুয়ারী মাসে লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে তাঁহার আবাসস্থল ডি/৭৭, কি-ডি-এ স্কিম নং ১ করাচীতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে গিয়া আমি লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমেদ, লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের সহিত ব্যস্তভাবে আলাপ করিতে দেখি।

আমিও আলোচনায় অংশগ্রহণ করি। লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁহার নয়া সংস্থায় কাজ শুরু করার পূর্বে কতিপয় পূর্ব পাকিস্তানীর রাজনীতিকের সহিত পরামর্শ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আদালতে ১নং অভিযুক্ত হিসাবে উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সহিত আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে স্কুল টিচার কো-অপারেটিভ হাটনিং সোসাইটি, করাচীতে পাঠান। লীডিং সীম্যান সুলতান উদ্দীন আহমেদ আমাকে এই খবর দেন এবং আমাকে তাঁহার ভগনীপতি কামালুদ্দীন আহমেদের গৃহে লইয়া যান। আমরা গিয়া দেখিতে পাই যে, লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ও লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ সেখানে আছেন। ইহার পর লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে জানান যে, প্রশ্নটি আলোচনার জন্য আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ও জনাব এ,এফ রহমান সি,এস,পি'র সহিত সেই বাড়ীতেই তিনি একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমার আগমনের পর এই ভদ্রলোকেরাও সেখানে আগমন করেন। সাক্ষীকে এ,এফ রহমানকে দেখাইয়া দিতে বলা হয়। তিনি আসামীর কাঠগড়ার নিকটে চলিয়া যান এবং জনাব এ,এফ,রহমানকে ঠিকমত দেখাইয়া দিতে তাঁহার অনেক সময় লাগে। শেখ মুজিবর রহমানকে ব্যস্ত দেখাইতে ছিল এবং তিনি বৈঠকে লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে তাঁহার সমস্যা পেশ করিতে বলেন।

ইহাতে মোয়াজ্জেম বলেন যে, পূর্ববঙ্গকে মুক্ত করার জন্য তিনি নৌসেনাদের লইয়া একটি দল গঠন করিয়াছেন।এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়া তিনি বলেন যে, তিনি অন্যান্য বাহিনীর লোকদেরও দলভুক্ত করিবেন। অতঃপর তিনি বুঝাইয়া বলেন যে, তাঁহার পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ ও সি এস পি অফিসারদের

সাহায্যের প্রয়োজন রহিয়াছে। টাকা-পয়সার ব্যাপারে সংস্থাকে যে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে, সে সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন। পরিশেষে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য তিনি তাঁহার দিকে তাকান। ইহাতে শেখ মুজিবর রহমান মৃদু হাসিয়া মন্তব্য করেন যে,তাঁহার (মোয়াজ্জেমের) এই পরিকল্পনা আসলে তাঁহারও (মুজিবর) পরিকল্পনা। শেখ মুজিব লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের সংস্থার প্রতি আর্থিক সাহায্যসহ সর্বপ্রকার সমর্থন জানান।

অতঃপর আহমদ ফজলুর রহমান পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের কথা ব্যাখ্যা করেন। একমাত্র সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমেই ইহার জবাব দেওয়া সম্ভব বলিয়া লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম যে অভিমত প্রকাশ করেন, তিনি উহার সংগে একমত হন। তবে এই কর্মসূচীর ব্যাপারে ভারতের প্রতিক্রিয়া কি হইতে পারে, সে সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন।

ইহাতে শেখ মুজিব পুনরায় মৃদু হাসিয়া বলেন যে,তিনিই ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। বিপ্লবী দলের 'ধীরে চল' নীতি গ্রহণের জন্যও শেখ মুজিব লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমকে অনুরোধ জানান। তিনি তাঁহাকে বলেন যে, তিনি (মুজিব) নির্বাচনে জয়ী হইতে পারিলে এ ধরনের তৎপরতার প্রয়োজন হইবে না। তবে তাঁহার দল যদি নির্বাচনে জয়ী হইতে না পারে, তাহা হইলে নির্বাচনের পর সম্ভবতঃ ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি বলপ্রয়োগে সংগ্রামে জয়ী হইবেন।

করাচীর 'কারসাজে' অবস্থিত তাঁহার বাসভবনে দেখা করার জন্য কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম আমাকে টেলিফোনে নির্দেশ দেন।

সেখানে পৌঁছিয়া আমি আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান এবং আহমদ ফজলুর রহমানকে কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমের পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হই। লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ এবং কয়েকজন বৈমানিক ও নাবিক ও (ইহাদের আমি চিনিতে পারি নাই) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিমান বাহিনীর লোকদের মধ্যে একমাত্র ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহকেই আমি চিনিতাম। বিমান বাহিনীর লোকদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব গড়িয়া তোলার জন্য লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমেদ তাহাকে সংস্থায় রিক্রুট করেন। (এই পর্যায়ে সাক্ষীকে ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহকে দেখাইতে বলা হইলে সে কাঠগড়া হইতে নির্ভুলভাবে তাহাকে দেখাইয়া দেয়)।

শেখ মুজিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বৈঠকে বলেন যে, পাকিস্তানে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কোন কিছু করা সম্ভব নয়। নির্বাচনে নিজের পরাজয়ের প্রতিশোধ তিনি

গ্রহণ করিবেন বলিয়া তিনি অঙ্গীকার করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পাকিস্তান সরকার কিভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ শোষণ করিতেছেন উহা তিনি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানবাসী সমৃদ্ধশালী হইয়া বসবাস করিতে চাহিলে তাহাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আলাদা হইতে হইবে। ঢাকার স্বীয় সদর দফতর স্থানান্তর করিয়া সংস্থার কাজকর্ম জোরদার করার জন্য তিনি কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমকে অনুরোধ জানান। সংস্থার সকল কাজের ক্ষেত্রে সাহায্য করা হইবে বলিয়া তিনি কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমকে আশ্বাস দেন। শেখ মুজিব সংস্থার একটি কর্মসূচী তৈরী করারও প্রতিশ্রুতি দেন। অতঃপর কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম গৃহ ত্যাগ করেন।

দৈনিক পাকিস্তান

৩০শে জুলাই ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
পাঁচ সপ্তাহ বিরতির পর শুনানী আবার শুরু
একরারী সাক্ষী মোজাম্মেল হোসেনের সাক্ষ্য গ্রহণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল সোমবার সকালে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে "আগরতলা ষড়যন্ত্র" মামলা নামে পরিচিত রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলার শুনানী প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পর পুনরায় শুরু হয়েছে।

সুপ্রীমকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস এ রহমানকে চেয়ারম্যান ও ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম আর খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকীমকে নিয়ে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এই মামলার বিচার হচ্ছে।

গতকাল শুনানী শুরুর প্রাক্কালে শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ সমর্থনের জন্য আগত বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়ামস কতিপয় আইনগত প্রশ্ন তুলে বলেন ফৌজদারী দণ্ডবিধি (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল) (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স ১৯৬৮ পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী বিধায় অবৈধ। তিনি বলেন, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বেআইনীভাবে গঠিত হয়েছে; সুতরাং ট্রাইব্যুনালকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা অসঙ্গত হবে।

মিঃ টমাস উইলিয়ামস বলেন, ১৯৬৫ সালের ৫নং অর্ডিন্যান্সটির ১২নং ধারায় যে আওতা নির্ধারিত রয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, এই ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে অপর কোন আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। তাই ট্রাইব্যুনাল এই আইনগত প্রশ্নের মীমাংসা না করলে এ ব্যাপারে আর সুযোগ নেই।

ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস এ রহমান বলেন যে, কৌঁসুলীর এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় এবং আইনগত দিক দিয়ে ইহা সঠিকও

নয়। যদি অর্ডিন্যান্সের কোন ত্রুটি চ্যালেঞ্জ করতে হয় তবে সেজন্য শাসনতান্ত্রিক অন্য পন্থা গ্রহণ করতে হবে। এই ট্রাইব্যুনাল এর আওতা সংক্রান্ত কোন আপত্তি গ্রাহ্য করতে পারে না।

অতঃপর জনাব সালাম খান ২নং অভিযুক্ত ব্যক্তি লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের ব্যক্তিগত অর্থে কেনা পারিবারিক মস্কোভিচ গাড়ীটি ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানালে সরকারপক্ষীয় প্রধান কৌঁসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের জানান যে, উপযুক্ত মুচলেকা দিয়ে গাড়ীটি ছাড়িয়ে নেয়া হলে তাঁর আপত্তি নেই। ট্রাইব্যুনাল তদনুযায়ী গাড়ীটি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই সাথে পিআইএ'র একটি গাড়ীও ছেড়ে দেওয়া হয়।

সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু

অতঃপর ১নং একরারী সাক্ষী লেঃ মোজাম্মেল হোসেনের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান জানান যে, সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে ট্রাইব্যুনাল হাইকোর্টের পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

১নং একরারী সাক্ষী মোজাম্মেল হোসেন প্রথমে আসামীরূপে গ্রেফতার হন ও একরারী সাক্ষী হয়ে ক্ষমাপ্রাপ্ত হন।

সাক্ষী বলেন, তার পিতার নাম মেনহাজউদ্দিন, গ্রাম পশ্চিম ফুলকী, থানা বাসাইল, জেলা ময়মনসিংহ, বয়স ৪৫ বছর।

সাক্ষী মোজাম্মেল হোসেন বলেন, আমি ১৯৪৭ সাল হতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত পাকিস্তানী নৌবাহিনীর ট্রেনিং এস্টাবলিশমেন্ট করাচী (হিমালয়) চাকুরী করতাম।

এই এস্টাবলিশমেন্টে আমিই একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানী পার্মানেন্ট অফিসার ছিলাম; দুর্ভাগ্যজনক হলেও অন্যান্য যারা পূর্ব পাকিস্তানী ছিল তারা অস্থায়ী পদে ছিল। পূর্ব পাকিস্তানী যেসব কর্মচারী তাদের গার্হস্থ্য ও অন্যান্য সমস্যার জন্য আমার কাছে আসত তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ১৯৬০ সালে আমি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন গঠন করি। লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমদ এবং সীম্যান নূর মোহাম্মদ ও স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এই প্রতিষ্ঠানের সভায় যোগদান করত।

আদালতকক্ষে উপস্থিত অভিযুক্তদের মধ্যে তাদের কাউকে সাক্ষী চিনে বের করতে পারে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি সঠিকভাবে সুলতানউদ্দীন আহমদ ও স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে সনাক্ত করেন। কিন্তু বহুক্ষণ সময় নিয়েও নূর মোহাম্মদকে বের করতে ব্যর্থ হন। তখন কোর্ট নূর মোহাম্মদকে দাঁড়াতে বললে সাক্ষী তাকে চিনতে পেরেছেন বলে জানান এবং বলেন যে, এখন তার দাঁড়ী গজিয়েছে বলে তিনি তাকে বের করতে পারিনি।

সাক্ষী বলেন, সম্ভবতঃ ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের একটি সভায় যোগদান

করেন। (ডকে উপবিষ্ট অভিযুক্ত লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে সাক্ষী যথার্থভাবে বের করে দেখান।) ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরের উক্ত বৈঠকের আগে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে ছিল। এ সময় সে করাচী আসে ও লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জমের সাথে ঐ বৈঠকে যোগদান করে।

এই বৈঠকে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের অবস্থার তুলনা করে পূর্ব পাকিস্তানীদের গরীব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের ধনী বলে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের বক্তব্য শুনে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, পূর্ব পাকিস্তানীদের মুক্তির জন্য কেন আমরা একতাবদ্ধ হব না? আলোচনা আর অগ্রসর হয়নি কারণ এ সময় কতিপয় পশ্চিম পাকিস্তানী বন্ধু, এসে পড়েন।

আলোচনার প্রসঙ্গ তখন পরিবর্তন করা হয়। এরপর আমাদের গঠিত ওয়েলফেরার অর্গানাইজেশন যথারীতি তার সভা চালিয়ে যায়। কিন্তু আমি দেখতে পাই যে, লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ ও স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমাদের সভায় আর আগ্রহী ছিল না। প্রায় ১৫ দিন পরে আমি লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমদকে প্রশ্ন করলে সে বলে যে, লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন সামরিক বাহিনী ও প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর লোকদের নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র হতে পৃথক করার জন্য একটি বিপ্লবী গ্রুপ গঠন করেছে। এর কিছুদিন পর ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে তার করাচীস্থ ডি/৭৭ কেডিএ স্কীম-১নং বাড়ীতে নৈশভোজে দাওয়াত করেন। সেখানে পৌঁছে আমি লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেমকে লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমদ, লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ ও স্টুয়ার্ড মুজিবরের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত দেখতে পাই, আমিও আলোচনায় অংশগ্রহণ করি। লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম তার নয়া প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরুর আগে কতিপয় পূর্ব পাকিস্তানী রাজনীতিকের সাথে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন সিদ্ধান্ত করা হয় যে, আওয়ামী লীগ নেতা ও বর্তমানে ট্রাইব্যুনালে ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমানের সাথে আলোচনা করা হবে।

লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম আমাকে করাচীর স্কুল শিক্ষক কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটির এক বাড়ীতে ডেকে পাঠান। লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন এই বার্তা নিয়ে আসেন ও আমাকে সেখানে নিয়ে যান। বাড়ীটি তাঁর ভগ্নিপতি কামালউদ্দীন আহমদের। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পাই যে, লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম ও লীডিং সীম্যান নুর মোহাম্মদ ইতিমধ্যেই সেখানে উপস্থিত হয়েছে। তখন লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম আমাকে জানান যে, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ও জনাব এ এফ রহমান সিএসপির সাথে ঐ বাড়ীতে প্রসঙ্গটি নিয়ে বৈঠকের তিনি ব্যবস্থা

করেছেন। আমার যাওয়ার পরে তারা দুজনও এসে উপস্থিত হন। (সাক্ষীকে জনাব এ এফ রহমানকে অভিযুক্তদের মধ্য হতে বের করতে বলা হয়। সাক্ষী তাকে সঠিকভাবে বের করার জন্য ডকের (কাঠগড়ার) কাছে গিয়েও দীর্ঘ সময় নেন।)

অতঃপর সাক্ষী তার সাক্ষ্যে বলেন যে, করাচীর ঐ বাড়ীতে শেখ মুজিবরকে সময়ের স্বল্পতাজনিত ব্যস্ত দেখা যায় এবং লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেমকে তার সমস্যা কি তা বলতে বলেন। তখন মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন যে, পূর্ব বঙ্গের মুক্তির জন্য তিনি নৌ বাহিনীর লোকদের নিয়ে একটি গ্রুপ গঠন করেছেন। তিনি আরো জানান যে, অন্যান্য বাহিনীর লোকদেরও এতে সংযুক্ত করবেন। অতঃপর তিনি বলেন, তার পরিকল্পনা মত কাজ চালাবার জন্য পূর্ব পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ ও সিএসপি অফিসারদের সাহায্য দরকার। এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অসুবিধার কথাও উল্লেখ করা হয়। পরিশেষে লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জম হোসেন শেখ মুজিবরের দিকে তাকান ও তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। শেখ মুজিবর রহমান সহাস্যে মন্তব্য করেন যে, এটা তারও নিজস্ব পরিকল্পনা। তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আর্থিক সমর্থনসহ পূর্ণ সমর্থন জানান।

তারপর জনাব এ এফ রহমান পাকিস্তানের দু'অংশের বৈষম্য ব্যাখ্যা করেন এবং লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেমের পরিকল্পনায় সম্মত হন। তিনি বলেন, সশস্ত্র বিপ্লব একমাত্র জওয়াব। তবে এ ব্যাপারে ভারতীয় প্রতিক্রিয়া কি হবে সে সম্পর্কে তিনি সমালোচনামুখর হন। শেখ মুজিব তখন পুনরায় সহাস্যে বলেন যে, এটা তিনি দেখবেন। শেখ মুজিবর লেঃ কমান্ডারকে তাঁর বৈপ্লবিক গ্রুপের কাজে ধীরে চলতে বলেন এবং বলেন যে, যদি নির্বাচনে তিনি জয়ী হন তবে এসব কার্যকলাপের প্রয়োজন হবে না। আর যদি তার দল নির্বাচনে হেরে যায় তবে শক্তিবলে যুদ্ধে জয়ী হতে হবে।

নির্বাচনের পর সম্ভবতঃ ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জম টেলিফোনে আমাকে তার করাচীস্থ কারসাজ বাড়ীতে দেখা করতে ডাকেন। সেখানে গিয়ে আমি আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর ও জনাব এ এফ রহমানকে লেঃ কম্যান্ডারের সাথে উপবিষ্ট দেখে উৎফুল্ল হই। সেই সাথে সেখানে লীডিং সীম্যান নুর মোহাম্মদ ও আমার পরিচিত বিমান বাহিনীর একমাত্র ব্যক্তি ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহকে দেখতে পাই। বিমান বাহিনীর লোকদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব সৃষ্টির জন্য এই প্রতিষ্ঠানে লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহকে রিক্রুট করেছে। এছাড়া তথায় অন্যান্য যেসব বিমান ও নৌবাহিনীর লোক উপস্থিত ছিলেন তাদের পরিচিতি আমার জানা নেই। (সাক্ষী মুফিজুল্লাহকে সনাক্ত করেন) সভায় শেখ মুজিব খুবই ক্রোধান্বিত ছিলেন এবং বলেন যে, পাকিস্তানে আইনানুগভাবে কিছুই

অর্জন করা সম্ভব নয়। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, নির্বাচনে পরাজয়ের তিনি প্রতিশোধ নেবেন। তারপর তিনি পশ্চিম পাকিস্তানীদের কল্যাণের জন্য পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ ব্যবহার করছে তার বিশদ ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানীদের যদি সমৃদ্ধির সাথে বাঁচতে হয় তবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তাদের পৃথক হতে হবে।

তিনি লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জমকে তার সদর দফতর ঢাকায় স্থানান্তর ও প্রতিষ্ঠানের কাজ ত্বরান্বিত করতে বলেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের সর্ব ব্যাপারে সাহায্যের আশ্বাস দেন। শেখ মুজিবর প্রতিষ্ঠানের একটি কর্মসূচী প্রণয়নেরও আশ্বাস দেন। তারপর লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জম গৃহত্যাগ করেন।

এরপর আমাদের বৈঠক প্রায় প্রতি মাসে হত। ১৯৬৫ সালের শেষভাগে প্রতিষ্ঠানের সব কাজ পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়। তবে প্রতিষ্ঠানের বৈঠক করাচীতে হলেও তথায় গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় আলোচিত হত না।

এরপর প্রতিবাদী কৌসুলী জনাব এ সালাম খানের জেরার উত্তরে একরারী এক নম্বর সাক্ষী লেঃ মোজাম্মেল হোসেন বলেন, আমি ১৯৪৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় নৌবাহিনীতে একজন সাধারণ স্টুয়ার্ড হিসেবে যোগ দেই। তখন আমার বয়স ছিল ২৪ বছর। আমি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছি।

স্টুয়ার্ড হিসেবে আমার অন্যতম দায়িত্ব ছিল টেবিলে খাওয়ার পরিবেশন করা। বাজার ও অন্যান্য স্থান হতে খাদ্য সংগ্রহ করাও আমার দায়িত্বের অঙ্গীভূত ছিল। এই ক্ষমতাবলে আমি নৌবাহিনীর অফিসারদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতাম। সকল কমিশন্ড অফিসার এদের মধ্যে ছিলেন। আমার বেতন মাসিক ৪০ টাকার কম ছিল। কিন্তু টাকার প্রকৃত অঙ্ক আমার মনে নেই। চাকরীতে থাকাকালে আমি অন্যান্যদের কথাবার্তা শুনে ও নিজে ব্যক্তিগতভাবে পড়াশুনা করে ইংরেজী শিখেছি।

এই সময় বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীর হাতে বাংলায় লিখিত এক টুকরা কাগজ দিয়ে তার ইংরেজী জ্ঞান পরীক্ষার জন্য তাকে তা তরজমা করতে বলেন।

সাক্ষী বলেন যে, তিনি তা ইংরেজীতে তরজমা করতে পারবেন না। কারণ "বিগত ২৪ বছর বাংলা ভাষার সাথে আমার কোন যোগাযোগ নেই।" সাক্ষী বলেন, আমি "সদর" ও "দফতর" শব্দের অর্থ বুঝি। "সদর" মানে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট এবং সদর দফতর মানে হচ্ছে হেড কোয়ার্টার। 'এই সপ্তাহ' অর্থ হচ্ছে দিস উইক (তিনি সদর দফতরের অর্থ নির্ভুলভাবে অনুবাদ করেন।)

এই সময় সাক্ষীকে বাংলায় লিখিত আরেক টুকরা কাগজ দিয়ে তা ইংরেজীতে অনুবাদ করতে বলা হয়। এতে সাক্ষী বলেন–আমি এটা তরজমা করতে পারব না।

একরারী সাক্ষী বলেন, ১৯৬৮ সালের ৩রা জানুয়ারী করাচীতে আমি গ্রেফতার হই। গ্রেফতারের পর আমাকে করাচীর নৌবাহিনীর সদর দফতরের ফিল্ড সিকিউরিটি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাকে নৌবাহিনীর ইনটেলিজেন্স অফিসারদের সম্মুখে হাজির করা হয়। আমার গ্রেফতারের ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এই ষড়যন্ত্রে আমার অংশগ্রহণ সম্পর্কে আমি তাদের জানাই। অফিসারগণ কর্তৃক আমার বক্তব্য রেকর্ড করা হয়নি। আমি এ সম্পর্কেও ওয়াকেফহাল যে, নৌবাহিনীর আইনে যখন একজন নৌবাহিনীর অফিসারকে কোনও অপরাধে অভিযুক্ত করা হয় তখন তার বক্তব্য রেকর্ড করা হয়।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন, আমি যেদিন যা বলেছি তার থেকে আজকের বক্তব্য ভিন্ন রকম বলে আমি আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার কথা অস্বীকার করছি, একথা সত্য নয়।

তিনি বলেন, ১৯৬৮ সালের ১৯শে জানুয়ারী আমাকে করাচী হতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তর করা হয়। আমি যতদিন ফিল্ড সিকিউরিটি অফিসে আটক ছিলাম ততদিন আমাকে একজন সেনাবাহিনীর অফিসারের সঙ্গে রাখা হয়। আমাকে ফাটকে রাখা হয়নি। আমি স্বাধীনভাবে বাইরে ঘোরাফেরা করতে পারতুম না বা ইচ্ছামত যে কোন লোকের সঙ্গে কথাও বলতে পারতুম না। একথা সত্য নয় যে, কর্তৃপক্ষ আমাকে যা বলতে বলেন তা না বললে আমাকে আসামী হিসেবে রাখা হবে বলে বলা হয়েছিল।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর জেরার জবাবে তিনি বলেন, আমার ৯টি সন্তানসন্ততি আছে। আমার স্ত্রী বেঁচে আছেন। আমার সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের বয়স প্রায় এক বছর। আমার বাড়ী ময়মনসিংহ জেলায়। চাঁদ বা চান্দু মিয়া নামেও আমি পরিচিত। আমার গ্রেফতারের পর আমি আমার পরিবার সম্পর্কে শঙ্কিত হইনি বা অনুতপ্তও হইনি। কারণ আমি যা করেছি তার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। আমি আমার কৃতকার্যের গুরুতর পরিণতি কি তাও আমি জানতাম। এর পরিণতির মোকাবেলা করার জন্য আমি অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাবাপন্ন ছিলাম।

তিনি বলেন, আমি যখন ঢাকায় আসি তখন আমি সিদ্ধান্ত করি যে, আমি আমার কাজের পরিণতির সম্মুখীন হবো। এখানে ক্যান্টনমেন্টেই আমাকে পাঞ্জাব অফিসারদের মেসে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা হচ্ছে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের মেস। মেসে একটা পৃথক কক্ষে আমাকে আলাদা করে রাখা হয়। এই কক্ষের নম্বর আমার মনে নেই। এখানে আমাকে কারুর সাথে কথা বলতে অনুমতি দেয়া হয়নি।

তিনি জেরার জবাবে আরও বলেন, ঢাকা আগমনের পর আমাকে আত্মীয়স্বজনের নিকট চিঠিপত্র লিখতে অনুমতি দেয়া হয়।

তিনি বলেন, গ্রেফতারের পর করাচী হতে আমি আমার আত্মীয়-স্বজনের নিকট পত্র লিখিনি।

তিনি বলেন, ১৯৬৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী আমার একরারনামা লিপিবদ্ধ করার জন্য আমাকে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। আমাকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। মেজর এ বি নাসের একদিন আমাকে বলেন যে, তুমি যদি একরারনামা দাও তবে ক্ষমাপ্রাপ্ত হতে পার। আমার সম্মতি জ্ঞাপনের পর তিনি আমাকে আদালতে হাজির করেন। ১৯৬৮ সালের ২২শে মে মেজর এ বি নাসের আমাকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং আমি একরারী সাক্ষী হতে সম্মতি দান করি।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আমাকে আগে নিয়ে যাওয়ার যে কথা আমি আমার বিবৃতিতে বলেছিলাম তা হচ্ছে এই একরারনামা সংক্রান্ত ব্যাপার। ১৯৬৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী যখন আমি একরার করি তখন আমি এ সম্পর্কে সচেতন ছিলাম যে, এ ধরনের একরার করার মারাত্মক পরিণতি হতে পারে।

জেরার জবাবে তিনি বলেন, আমার একরারনামায় আমাকে যা বলতে বলা হয়েছে তাই বলেছি এ কথা সত্য নয়। আমি নিজ থেকেই একরারনামা দিয়েছি। ১৯৬৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টা হতে সাড়ে ১০টার মধ্যে আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়।

একজন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত হতে আমি কখন ফিরে আসি তা আমার মনে পড়ছে না।

লেঃ শরীফ আমাকে চর্তুদশ ডিভিশনের মেস হতে সিগন্যাল মেসে অনুষ্ঠিত আদালতে নিয়ে যান। সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট একটি পৃথক কক্ষে আদালত বসান। আমি একজন রক্ষী ও এই অফিসারসহ ফিরে আসি। আমাকে জীপে করে আদালতে নিয়ে আসা হয়।

জেরার জবাবে তিনি বলেন, একথা সত্য নয় যে ম্যাজিস্ট্রেটের সমীপে প্রদত্ত একরারনামা আগেই লিখিত হয়েছিল এবং আমি তা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠ করি।

আমি আমার একরারনামায় বলেছিলাম যে, "পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল।" (এই সময় বিবাদীপক্ষের কৌসুলী বাংলায় লেখা একখণ্ড কাগজ সাক্ষীর হাতে দিয়ে তা ইংরেজীতে তরজমা করার জন্য বলেন। সাক্ষী বলেন, আমি এটা ইংরেজীতে তরজমা করতে পারব না।)

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষী "আয়রনি অব ফেটী" এর অনুবাদ করার জন্য বলেন, সাক্ষী বলেন, এর অর্থ হচ্ছে 'ইট ইজ এ ফ্যাক্ট'।

সাক্ষীকে "ব্রুট রিয়ালিটি" শব্দের বাংলা তরজমা করতে বলা হলে তিনি বলেন, এর অর্থ হচ্ছে– "ইট ইজ এ্যান এ্যাকচুয়েল ফ্যাক্ট।"

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীকে "ব্লেসিং অব প্রসপারিটি" শব্দের বাংলা তরজমা করতে বলেন, সাক্ষী বলেন, "সমৃদ্ধিশালী কিছু হবে।"

সাক্ষীকে তখন বাংলায় লেখা একটা অংশ ইংরেজীতে তরজমা করতে বলা হয়।

সাক্ষী বলেন, "ইট মীনস্ দি এবার ওয়ার্লড প্রমিজড দ্যাট দে উড এ্যাভেনজ দি ডিফিট অব ইসরায়েল।"

সাক্ষী বলেন–আমার একরারনামায় "হি ভাউড দ্যাট হি উড এ্যাভেনজ হিজ ডিফিট" বলে যদি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা আমার নিজের ভাষা এবং অন্য কেউ এই কথাগুলো আমাকে দিয়ে বলিয়ে নেয়নি। তিনি বলেন, "ভাউড মীনস –প্রমিজড বাই গড।"

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীকে "নিজস্ব সংগ্রামী শক্তি ও সংগঠন" এই শব্দ কয়টির ইংরেজী তরজমা করতে বলেন।

সাক্ষী বলেন–"ইন দি ফরমেশন অব আওয়ার ওউন মিলিট্যান্ট ফোর্স।"

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, সভায় বিভিন্ন ব্যক্তি যা আলোচনা করতেন তা লিপিবদ্ধ করার জন্য আমি কোন ডায়রী রাখিনি।

তিনি বলেন, (আমি করাচীতে সেন্ট্রাল স্টাটিসটিকস অফিসের কর্মচারী আমীর হোসেনকে চিনি। ১৯৬৫ সালে তার সাথে আমার দেখা হয় তার আগে নয়।)

আমাকে আটক রাখাকালীন কোথায় রাখা হয় আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একরারনামায় সে সমস্ত জায়গার কথা বলেছি।

আমাকে ঐ সমস্ত জায়গায় কতদিন আটক রাখা হয়েছিল সেকথা ম্যাজিস্ট্রেটকে আমি বলেছি কিনা তা আমার মনে নেই।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, আটক থাকাকালীন মিলিটারী বা পুলিশ আমাকে পীড়ন করেছে একথা সত্য নয়।

তিনি বলেন, আমি মেজর কামালকে চিনি। তিনি স্থল বাহিনীর একজন অফিসার এবং তখন নৌবাহিনীর সঙ্গে এটাচড ছিলেন। আমি ক্যাপ্টেন মোকতাদিরকেও চিনি। তিনি নৌবাহিনীর সঙ্গে এটাচড ছিলেন না। আমি লেঃ ফখরুদ্দিনকেও চিনি। তিনি একজন নৌবাহিনীর লোক। আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি একটি ডেস্ট্রয়ারে নিযুক্ত ছিলেন।

আমার ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন গঠনের ব্যাপারে আমি লেঃ ফখরুদ্দিন বা নৌবাহিনীর সঙ্গে সামরিকভাবে এটাচড কোন অফিসারের সঙ্গে

আলোচনা করিনি। আমি জানি যে, পূর্ব অনুমতি ব্যতীত একজন নৌবাহিনীর অফিসার এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করতে পারে না।

সাক্ষী বলেন, আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একথা বলিনি যে করাচীতে ১৯৪৭ সাল হতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত অপরাধ করা হয়েছে। আমি ১৯৬৪ সাল হতে ১৯৬৮ সালের কথা বলেছি। (মূল একরারনামায় ম্যাজিস্ট্রেটের নোট হিসেবে একথা রেকর্ড করা হয়েছে।)

সাক্ষী বলেন, ১৯৪৭ সাল হতে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে প্রকৃতপক্ষে একথা আমি বলিনি। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৪ সাল হতে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।

সাক্ষী বলেন, উপরস্থ অফিসারদের অজান্তেই ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন আমি গঠন করি। তারা এই সংগঠন সম্পর্কে জানতেন না।

সাক্ষীকে "এ্যাডহক" শব্দের অর্থ বলতে বলা হয়। সাক্ষী বলেন– "এ্যাডহক" অর্থ হচ্ছে "সেলফ- হেলপ"।

তিনি বলেন, বাঙ্গালী রেটিংদের জন্যই এই ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন গঠন করা হয়। আমরা বাঙ্গালী রেটিংদের নিকট হতে কোন চাঁদা আদায় করিনি। এই প্রতিষ্ঠানের কোন কমিটি ছিল না। প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের নামের কোন রেকর্ড ছিল না। সভার কোন কার্যবিবরণী কখনও লিপিবদ্ধ হয়নি। রেটিংরা শুধুমাত্র আমার বাসায় আসত।

সাক্ষীকে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের নাম বলতে বলা হয়। তিনি লীডিং সীম্যান সুলতান আহমদ, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও নূর মোহাম্মদের নাম বলেন। তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের আর অন্য কোন সদস্যের নাম আমি বলতে পারি না।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর জেরার জবাবে বলেন, নৌবাহিনীর সর্বনিম্ন অফিসার হচ্ছেন এ্যাকটিং সাব- লেফটেন্যান্ট। তার ওপরে রয়েছেন সাব-লেফটেন্যান্ট এবং তার ওপরে লেফটেন্যান্ট। ১৯৬৩ সালে আমি একজন সাব-লেফটেন্যান্ট ছিলাম। এবং ১৯৬৪ সালেও তাই ছিলাম। ১৯৬৫ সালে আমি ক্যাটারিং লেফটেন্যান্ট ছিলাম। ১৯৬৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর আমাকে এই পদে উন্নীত করা হয়।

আমি লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জমকে তার বাড়ীতে ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভা ডাকার জন্য অনুরোধ করিনি। প্রকৃতপক্ষে আমি তাকে আমার বাড়ীতে সভায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাই। আমি তাকে আমন্ত্রণ জানাবার আগে তিনি এই সংগঠন সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। ১৯৬৩-৬৪ সালে লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জম একটি ডেস্ট্রয়ারের চীফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। আমি ঐ ডেস্ট্রয়ারের নাম ভুলে গেছি। সম্ভবতঃ তা 'আলমগীর' হবে। তিনি ১৯৬৩-৬৪ সাল কে, ভি, এস-এর এক নম্বর স্কীমের একটি পরিবারের সঙ্গে বসবাস করতাম। এর অর্থ মোহাম্মদ আলী হাউজিং

সোসাইটি কিনা তা আমি জানি না। এই প্রসঙ্গে ম্যাজীস্ট্রেটের নিকট আমি মোহাম্মদ আলী হাউজিং সোসাইটির নাম উল্লেখ করিনি। (ম্যাজীস্ট্রেটের নিকট তার একরারনামায় এ কথা লিপিবদ্ধ আছে।)

আমি এ কথা জানি না যে, মোহাম্মদ আলী সোসাইটি এবং কেডিএস এক নম্বর স্কীম পৃথক না এক। একথা সত্য নয় যে, আমি মোহাম্মদ আলী হাউজিং সোসাইটির উল্লেখ বাদ দিয়ে যাচ্ছি এই কারণে যে, মোহাম্মদ আলী সোসাইটি ও কেডিএস এক নম্বর স্কীম দুটি ভিন্ন এলাকা তা আমি জানতে পেরেছি একথাও সত্য নয় যে, আমাকে মোহাম্মদ আলী হাউজিং সোসাইটির উল্লেখ বাদ দিতে বলা হয়েছে এই কারণে যে, ১৯৬৪ সালে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জম ঐ হাউজিং সোসাইটিতে বাস করত না বলে আমাকে জানান হয়েছে।

১৯৬০ হতে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সময়ে নৌবাহিনীর কোন পূর্ব পাকিস্তানী অফিসার সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছেন তা আমি জানি না। আমি শোয়েব নামে একজন পূর্ব পাকিস্তানী লেঃ কম্যান্ডারকে চিনি। নৌবাহিনীতে লেঃ কম্যান্ডারের ওপরে আরও ছয়জন অফিসার আছেন। আমি মেজর হাসান নামক একজনকে চিনি। এই মামলার ব্যাপারে যে সমস্ত অফিসার কাজ করছেন তিনি তাদের মধ্যে একজন প্রশাসনিক অফিসার।

সাক্ষী বলেন, এই মামলার ব্যাপারে আমাকে পুলিশ একবার মাত্র জেরা করেছে। পুলিশ আমাকে দুবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এ কথা সত্য নয়। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একরারনামা লিপিবদ্ধের পর আমাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে।

বিগত ৯ই মে আমাকে জেরা করা হয়। আমি ম্যাজীস্ট্রেটের নিকট একরারনামায় ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লার নাম বলিনি। পরে তদন্তের সময় আমি তার উল্লেখ করেছি।

(বিবাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীর এই দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে আপত্তি প্রদর্শন করেন ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬২ ধারামতে তা গ্রহণযোগ্য নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেন)।

[সাক্ষী এই সময় বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে আমি পুলিশের নিকট দ্বিতীয় বার একটি অতিরিক্ত বিবৃতি প্রকাশ করি]

তিনি বলেন, আমি পুলিশের নিকট একটি মাত্র বিবৃতি দিয়েছি বললে মিথ্যা বলা হবে এ কথা স্বীকার করার জন্য কৌসুলী আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন বলেই আমি এই বিবৃতি দিয়াছি এ কথা সত্য নয়। এ কথাও সত্য নয় যে, পরে কোন এক পর্যায়ে আমাকে শিখিয়ে দেওয়ায় আমি ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লার নাম উল্লেখ করেছি।

Pakistan Observer

31st July 1968

Thomas Williams meets Mujib at detention camp

(By A Staff Correspondent)

Mr. Thomas Williams, Queen's Council now in the city in connection with State vs. Sheikh Mujib and others case saw Sheikh Mujibur Rahman in his detention camp at Dacca Cantonment on Tuesday afternoon. He had over two hours discussion with the detained Awani League chief regarding the case according to a Press release of Awami League.

Mr. Amirul Islam accompanies the British lawyer.

Mr. Maudood Ahmed, a Barrister Mr. Maudood Ahmed is acting as Honorary Private Secretary to Mr. Thomas Williams. Anybody desirous of contacting Mr. Williams may contact Mr. Maudood Ahmed on the telephone of the Queen's Council at Hotel Inter-Continental.

সংবাদ

৩১শে জুলাই ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যদের মামলা

রাজসাক্ষী লেঃ মোজাম্মেলের সওয়াল-জবাব সমাপ্ত:

আজ কামালুদ্দীনের সাক্ষ্য শুরু

পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া বানচালের জন্য

এই মামলা সাজানো হইয়াছে বলিয়া বিবাদী পক্ষের কৌসুলীর উক্তি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে তিন সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য" দের মামলার দ্বিতীয় দফা শুনানীর দ্বিতীয় দিবসে বিবাদীপক্ষের কৌসুলিগণ রাজসাক্ষী লেঃ মোজাম্মেল হোসেনের জেরা সমাপ্ত করেন। অদ্য (বুধবার) ট্রাইব্যুনালের অন্যতম সাক্ষী কামালুদ্দিনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে বলিয়া ট্রাইব্যুনাল ঘোষণা করেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান রাজসাক্ষী লেঃ মোজাম্মেলকে জেরাকালে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়াকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানী রাজনীতিক ও পদস্থ কর্মচারীদের জড়িত করিয়া সংশ্লিষ্ট রাজসাক্ষীর সাহায্যে বাদীপক্ষ এই মামলা সাজাইয়াছেন। রাজসাক্ষী লেঃ মোজাম্মেল হোসেন এই অভিযোগ অস্বীকার করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পাঁচ সপ্তাহ বিরতির পর গত সোমবার সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে দ্বিতীয় দফা শুনানী শুরু হয়। শুনানী শুরুর পর হইতেই গত দুই দিবসব্যাপী লেঃ মোজাম্মেলকে দীর্ঘ সাড়ে সাত ঘণ্টাব্যাপী বাদী ও বিবাদীপক্ষের কৌসুলিগণ জেরা করেন। গতকাল জনাব সালাম খান ছাড়াও খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন, খান বাহাদুর ইসমাইল, জনাব বদরুল হায়দার চৌধুরী, জনাব জুলমত আলী ও জনাব ফজলুল করিম রাজসাক্ষীকে জেরা করেন। বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের জেরার পর বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির সাক্ষীকে পুনরায় কতিপয় প্রশ্ন করেন। গতকাল ট্রাইব্যুনাল কক্ষ অন্যান্য দিনের ন্যায় কৌসুলী, দেশী-বিদেশী সাংবাদিক, দর্শক ও নিরাপত্তারক্ষীতে পরিপূর্ণ ছিল।

সকাল নয়টা পাঁচ মিনিটে বিচারপতি জনাব এস,এ রহমানের নেতৃত্বে ট্রাইব্যুনালের অন্যান্য সদস্য আদালত কক্ষে প্রবেশ করিয়া আসনগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হয়। আলোচ্য ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমান, তিনজন সি এস পি অফিসার, একজন মেজর ও ৫ জন ক্যাপ্টেনসহ ৩৫ জন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালত কক্ষে আগেই উপস্থিত করান হয়।

ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণ আসনগ্রহণের পরপরই বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব সালাম খান পূর্বদিনের অসমাপ্ত জেরা পুনরায় শুরু করেন।

জেরার বিবরণ

জনাব সালাম খানঃ আপনি কোথায় বাস করতেন?

লেঃ মোজাম্মেলঃ করাচীতে আমার বাসস্থান ছিল ম্যানোরা ক্যান্টনমেন্ট "হিমালয়" নামক ট্রেনিং অর্গানাইজেশনে।

প্রশ্নঃ আপনার বাসা থেকে কে ডি এ স্কীম-১ কত দূর?

উত্তর ঃ প্রায় পনের মাইল হবে।

প্রশ্ন ঃ যাতায়াতের জন্যে আপনার ব্যক্তিগত অথবা সরকারী কোন গাড়ী ছিল কি?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ মোহাম্মদ আলী হাউজিং সোসাইটি আপনি চেনেন?

উত্তর ঃ আমি তা আদৌ চিনি না। তবে নাম শুনেছি। কে,ডি,এ,স্কীম-১ ও কারসাজ পাশাপাশি অবস্থিত।তবে মোহাম্মদ আলী হাউজিং সোসাইটি এ দুটো এলাকায় সন্নিহিত কিনা আমার জানা নেই; তবে হতেও পারে।

প্রশ্ন ঃ আপনি নিজের ভাষায় বলুন– ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসের কথিত সভায় ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ঠিক কি বলেছিলেন?

উত্তর ঃ আমার বাসায় অনুষ্ঠিত ঐ সভায় ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণ অনাহারে ও আশ্রয়হীন অবস্থায় বাস করছে বলে তিনি দেখেছেন। তিনি আরও বলেন যে, তিনি সেখানে সর্বত্রই বেকারত্ব ও অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করেছেন। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে এসবের কোন অস্তিত্ব নেই। আমার এটুকুই মনে আছে।

প্রশ্ন ঃ আলোচনা বাংলায় হয়েছিল না ইংরেজীতে?

উত্তর ঃ প্রধানতঃ বাংলায়।

প্রশ্নঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত আপনার স্বীকারোক্তি সম্বলিত বিবৃতিতে আপনি আলোচ্য সভায় ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের বক্তব্য সম্পর্কে কি বলেছিলেন মনে আছে?

উত্তর ঃ আমার মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন ঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আপনি কি ভাষায় এবং কি বিবৃতি দিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ কি ভাষায় এবং আসলে কি কি শব্দ ব্যবহার করেছিলাম তা আমি মনে করতে পারছি না।

প্রশ্ন ঃ আপনি মনে করতে পারছেন না–কারণ আপনাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল?

উত্তর ঃ না, আমাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়নি। আমি আমার নিজের ভাষায় বলেছিলাম এবং ম্যাজিষ্ট্রেট তা তার নিজের ভাষায় লিখে নিয়েছিলেন।

ইহার পর রাজসাক্ষী নিজেই বলেন,"গতকাল মাননীয় কৌসুলী আমাকে কয়েকটি বাংলা অনুচ্ছেদ ইংরেজীতে অনুবাদ করতে দিয়েছিলেন।এই অনুচ্ছেদে আমার নিজের ভাষা বা নিজের শব্দ ছিল না। ম্যাজিষ্ট্রেটকে আমি যা বলেছিলাম ম্যাজিষ্ট্রেট তা নিজের ভাষায় রেকর্ড করেন। কৌসুলী সেখান থেকেই শব্দ গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন ঃ ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরের সভায় লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম কি বলেছিলেন?

উত্তর ঃ তিনি বলেন, পূর্ব বাংলার মুক্তির জন্যে আমরা কেন ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি না? তিনি এইটুকুই বলেন।এরপর কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী বন্ধুর আগমনের ফলে আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ সেইসব পশ্চিম পাকিস্তানী বন্ধুরা কে? তাদের নাম মনে আছে?

উত্তর ঃ তারা নৌবাহিনীর কর্মচারী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তোফায়েল, গুলজার আহমেদ, নবী বক্স ও আরও কয়েকজন।

প্রশ্ন ঃ এই সভা সম্পর্কে আপনি আর কাউকে কিছু বলেছিলেন?

উত্তর ঃ আমি কাউকে কিছুই বলিনি।

প্রশ্ন ঃ সেখানে কথিত ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য ও কিভাবে লক্ষ্য অর্জনের জন্যে এগোতে হবে সে সম্পর্কে কোন প্রস্তাব উঠেছিল?

উত্তর ঃ না, তেমন কোন প্রস্তাব উঠেনি। কি আমরা করব এবং কেমনভাবে করব ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশনের কোন সভায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত সভায় অনুরূপ কোন আলোচনা হয়েছে বলে আমার মনে পড়ছে না।

অতঃপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তিনি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের কে,ডি,এ, স্কীম-১-এ অবস্থিত বাসভবনে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেন।

জনাব মোয়াজ্জেম কখনো করাচীর মোহাম্মদ আলী হাউজিং সোসাইটিতে কোনকালে বাস করিতেন কিনা সাক্ষী তাহা জানেন না বলিয়া জানান।

সাক্ষী বলেন, যতদূর তাঁর মনে হয়, সুলতানউদ্দীন, নুর মোহাম্মদ ও ষ্টুয়ার্ড মুজিব ঐ সময় 'হিমালয়' এষ্টাবলিশমেন্টে বাস করতেন। সাক্ষী বলেন, ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরের সভার পর আর কোন সভা হয়নি। এ কথা সত্য নয়।

প্রশ্ন ঃ ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে জনাব মোয়াজ্জেমের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত কথিত সভার দিনক্ষণ ও তারিখ আপনার মনে আছে কি?

উঃ আমার মনে নেই। ঐ সভা কোন মাসে,কত তারিখে এবং কোন সময়ে হয়েছে তা আমার মনে না থাকিলেও ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী থেকে এপ্রিলের মধ্যে তা হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ ঐ সভার পরে আর কবে সভা হয়েছিল?

উত্তর ঃ ১৯৬৪ সালের সেপটেম্বর মাসে।

প্রশ্ন ঃ কোন তারিখে ?

উত্তর ঃ মনে নেই।

প্রশ্ন কটার সময়?

উত্তর ঃ যদ্দুর মনে হয় রাত আটটা থেকে সাড়ে ৮টার মধ্যে।

প্রশ্ন ঃ কতক্ষণ সে সভা চলেছিল?

উত্তর ঃ রাত সাড়ে নটার পর আর চলেনি।

প্রশ্ন ঃ 'হিমালয়' থেকে কামালুদ্দীনের বাসস্থান কতদূর হবে?

উত্তর ঃ তা প্রায় ১২ মাইল হবে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে,রাত্রের জন্য ছুটি না থাকিলে নৌবাহিনীর নাবিকদিগকে ১১টার মধ্যে জাহাজে পৌঁছিয়া কাজের জন্য হাজিরা দিতে হয় এবং একমাত্র বিবাহিত ব্যক্তিদিগকেই তীরে থাকার ছুটি দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি শেরশাহ বাজার কোথায় জানেন?

উত্তর ঃ নাম শুনেছি। তবে সেখানে কখনো যাইনি।

প্রশ্নঃ আপনি সর্বপ্রথম কবে শেখ মুজিবর রহমান ও জনাব এ,এফ, রহমান সি এস পিকে দেখেন?
উত্তর ঃ ১৯৬৪ সালের সেপ্‌টেম্বর মাসে।
প্রশ্নঃ আপনি জানতেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিস জিন্নাহর পক্ষে শেখ মুজিবর রহমান প্রচার চালাচ্ছেন?
উত্তর ঃ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও মিস ফাতেমা জিন্নার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল তা আমার স্মরণ আছে। তবে শেখ মুজিবর রহমান মিস জিন্নার জন্য প্রচার চালাচ্ছিলেন কিনা তাহা আমার জানা নেই। ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর সম্মিলিত বিরোধীদলের নেতা হিসাবে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থীদের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছিলেন কিনা সে সম্পর্কেও আমি কিছু জানি না।

এই পর্যায়ে অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের পার্টি আওয়ামী লীগের কোন সদস্য জাতীয় একং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য থাকতে পারেন। তিনি বলেন যে, আমি মাঝে মাঝে খবরের কাগজ পড়ি এবং তা বিশেষভাবে ক্রীড়া সম্পর্কিত।
প্রশ্ন ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিরাট বৈষম্য রয়েছে বলে আপনি জানেন?
উত্তরঃ হ্যাঁ, আমি জানি।
প্রশ্নঃ এই বৈষম্য কিরূপ? আপনি বৈষম্য বলতে কি বোঝেন?
উত্তরঃ বৈষম্য বলতে আমি এটুকুই বুঝি, পঃ পাকিস্তানের তুলনায় পুঃ পাকিস্তানে কমসংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে।তাছাড়া চাকুরী-বাকুরী ও সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে।
প্রশ্ন ঃ উপরোক্ত সভার পূর্বে কি আপনি এই বৈষম্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন?
উত্তর ঃ হ্যাঁ।

এই সময় ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিবাদীপক্ষের কৌসুলীকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলেন। কৌসুলী জনাব সালাম খান তখন পুনরায় বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়াকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদ, সি,এস,পি অফিসার প্রমুখকে জড়িত করিয়া এই ষড়যন্ত্র মামলাটি সাজানো হইয়াছে। কৌসুলী অতঃপর সাক্ষী লেঃ মোজাম্মেলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, এই সাজানো মামলায় আপনি বাদীপক্ষের ক্রীড়নক মাত্র।

উত্তরে লেঃ মোজাম্মেল বলেন যে, "আমি বাদীপক্ষের ক্রীড়নক নই।" এবং তাহার যোগসাজসে এই ষড়যন্ত্র মামলা সাজান হয় নাই।
প্রশ্ন ঃ আপনি জানেন কিনা শেখ মুজিবর রহমান সবসময়ই প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করে আসছেন, তিনি কখনো পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা দাবী করেননি–এমনকি ওই সভার পরেও না।

উত্তর ঃ শেখ মুজিবর রহমান আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সংখ্যা সাম্য চাহেন, তবে, বিচ্ছিন্ন (কেন্দ্র হইতে) হতে চান না বলে প্রকাশ্য ঘোষণা সম্পর্কে আমার জানা আছে। শেখ মুজিবর রহমান কোন সময় প্রকাশ্যে কেন্দ্র হতে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা দাবী করেছেন বলেও আমি জানি না।
সাক্ষী অতঃপর বলেন,"তথাকথিত ষড়যন্ত্রকারীদের সভায় শেখ মুজিবর রহমান সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে নয় পরন্তু কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বায়ত্তশাসন লাভ ও সংখ্যাসাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে কথা বলেছেন বললে ভুল করা হবে।"
প্রশ্ন ঃ ভারতের সঙ্গে কোন সময় পাকিস্তানের যুদ্ধ হয়েছিল?
উত্তর ঃ ১৯৬৫ সালের সেপ্‌টেম্বরে।
প্রশ্নঃ তখন সুলতান উদ্দিন আহমদ ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান কোথায় ছিলেন?
উত্তর ঃ বোধ করি পূর্ব পাকিস্তানে ছুটিতে ছিলেন। হয়ত তাঁরা চট্টগ্রাম নৌ-দফতরে যুদ্ধ শুরুর পরে কাজে যোগদান করেন। যুদ্ধ শুরুর পর নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনী তথা সকল সামরিক কর্মচারীকে কাজে যোগদান করতে নির্দেশ দেওয়া হয় বলে জানি।
প্রশ্নঃ আপনি কি জানতেন যে, "শেখ মুজিবর রহমান যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যে পূর্ব পাকিস্তানসহ সকল পাকিস্তানীর প্রতিরক্ষার কাজে পূর্ণ সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানান?"
উত্তর ঃ না।
প্রশ্নঃ আপনি কি জানতেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের তাসখন্দ চুক্তিতে সমর্থন জানাতে শেখ মুজিবর রহমান খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়েছিলেন?
উত্তরঃ আমার মনে নেই।
প্রশ্নঃ ১৯৬৪ সালের সেপটেম্বরের সভায় আপনি কি বলেছিলেন?
উত্তর ঃ আমি কিছুই বলেনি। লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের সঙ্গে আমাকে সাব লেফটন্যান্ট হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন।
প্রশ্ন ঃ আপনি কি ঈদুজ্জোহার দিনে অফিসার্স মেসে জনাব এ,এফ রহমান সি এস পিকে প্রথম দেখেন?
উত্তর ঃ না, পূর্বোক্ত সভায় তাকে আমি প্রথম দেখি। আমি ১৯৬৮ সালের ঈদুল ফিতরের পরে গ্রেফতার হই।
আপনার গ্রেফতারের পর ফটো তোলা হয়েছিল? সেটা কোথায়?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, চতুর্দশ ডিভিশন মেসে।
প্রশ্ন ঃ আপনাকে অন্যান্যদের ফটো দেখান হয়?
উত্তরঃ না।

এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, "এই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ফটো গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা অথবা তাকে তাদের ফটো দেখানো হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে তার কিছু জানা নেই।"

প্রশ্ন ঃ ইতিপূর্বে জনাব কামালুদ্দীনের বাড়ীতে আপনি কখনো গিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর সভার আগে কখনো যাইনি।

প্রশ্ন ঃ রাস্তা থেকে ওই বাড়ীটি কতদূর? আপনি সেখানে কিভাবে গিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ রাস্তা থেকে কতদূর তা বলতে পারিনে। তবে আমি সেখানে ট্যাক্সী ভাড়া করে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন ঃ তখন আপনার কত বেতন ছিল?

উত্তর ঃ সাতশত টাকা।

প্রশ্ন ঃ ঠিকত?

উত্তর ঃ না, প্রায় ছয়শত টাকা।

প্রশ্ন ঃ ট্যাক্সী কি জনাব কামালুদ্দীনের বাসা পর্যন্ত গিয়েছিল?

উত্তর ঃ জী হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ বলুনতঃ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মোয়াজ্জেমের বাসা থেকে জনাব কামালুদ্দীনের বাসার দূরত্ব কতটুকু?

উত্তর ঃ জানি না।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে লেঃ মোজাম্মেল বলেন,এই ষড়যন্ত্রের সংগে নৌবাহিনীর সহিত বিমান বাহিনীকে জড়িত করার উদ্দেশ্যে তথাকথিত ষড়যন্ত্রকারীদের বৈঠকে ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন বলে বলার জন্য তাকে বাধ্য করা হয়নি।

প্রশ্ন ঃ বিমান বাহিনীর সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী থেকে ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ছুটিতে ছিলেন?

উত্তর ঃ আমি জানি না।

প্রশ্ন ঃ মেজর নাসের আপনাকে ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন?

আপনি তার সঙ্গে ক পাঁচ মিনিট কথা বলে তাকে স্বীকারোক্তি প্রদানের জন্য চেষ্টা করতে ছিলেন?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ পুলিসের কাছে আপনি বলেছেন, ১৯৬৫ সালের জানুয়ারীর সভায় শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আইনগতভাবে কোন কিছু আদায় করা সম্ভব নয়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ তিনি আর কি বলেছিলেন?

উত্তর ঃ পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান সরকার কর্তৃক শোষিত হচ্ছে।

সাক্ষী বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান এই সভায় আর্থিক সাহায্য প্রদানের কোন কথা বলেন নাই।

প্রশ্ন ঃ আপনি আর কাউকে রাজসাক্ষী হতে অনুরোধ করেছেন?

উত্তর ঃ না।

এই সময় ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন কিছুক্ষণের জন্য বিরত ঘোষণা করা হয়। বিরতির পরে পুনরায় জেরা শুরু হলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী পূর্ব পাকিস্তানে ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন ঃ চর্তুদশ ডিভিশনের মেস থেকে আপনাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা হয়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে সিগন্যাল মেসে অবস্থিত কোর্ট রুমে নিয়ে যান। তিনি আমাকে শপথ গ্রহণ করান এবং আমি যখন দাঁড়িয়েছিলাম তিনি তখন আমাকে একটা কাগজ দেন। তারপর তিনি আমাকে আমার বক্তব্য বলতে বলেন।

প্রশ্ন ঃ বক্তব্য রেকর্ড করতে কতটুকু সময় লেগেছিল?

উত্তর ঃ তা আমার মনে নেই।

জনাব সালাম খানঃ অতএব আপনাকে আমার বলতে হচ্ছে যে, আপনার সকল বক্তব্য, বিবৃতি মিথ্যা ও বানোয়াট।

খান বাহাদুর নাজির উদ্দীন

অভিযুক্ত মেজর শামসুল আলমের কৌসুলী খান বাহাদুর নাজিরউদ্দীন অতঃপর রাজসাক্ষী লেঃ মোজাম্মেলকে জেরা শুরু করেন। জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আমি বাংলায় নহে,নংরাজীতে জবানবন্দী করেছি।

প্রশ্ন ঃ পুলিসের কাছে প্রদত্ত আপনার বিবৃতির কোন কপি আপনি দেখেছেন কি?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ কোন কোর্টের সামনে আপনাকে কোন প্রশ্ন করা হয়েছিল? আপনি লক্ষ্য করেছেন কি পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত আপনার পৃথক পৃথক বিবৃতির ভাষা ও বক্তব্য অক্ষরে অক্ষরে উল্লেখযোগ্যভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

উত্তর ঃ না, লক্ষ্য করিনি।

প্রশ্ন ঃ এই কোর্টে হাজির হওয়ার আগে আপনি কি বলতে যাচ্ছেন তাকি কেউ পরীক্ষা করেছে?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ এই কোর্টে আসার আগে কেউ কোন প্রশ্ন করেছে?
উত্তর ঃ না।
প্রশ্ন ঃ আপনি যখন রাজসাক্ষী হন, তখন কি জানতেন আরও অনেক রাজসাক্ষী আছেন?
উত্তর ঃ না। খবরের কাগজ পড়ে তা আমি জানতে পারি।
প্রশ্নঃ স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি গ্রহণের পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট আপনাকে কোন প্রশ্ন করেছিলেন?
উত্তর ঃ তিনি আমাকে কোন প্রশ্ন করেননি।
প্রশ্ন ঃ কোন রাজসাক্ষীর সঙ্গে আপনি কথাবার্তা বলেছেন অথবা দেখা করেছেন?
উত্তর ঃ না, তবে আমি আমার ঘরের জানালা দিয়ে তাদের ২/১ জনকে দেখেছি মাত্র। আমি জানি –তাঁরা সাক্ষী অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তি কি না।

খান বাহাদুর ইসমাইল

অতঃপর অভিযুক্ত জনাব রুহুল কুদ্দুস সি,এস,পি'র কৌসুলী জনাব ইসমাইল সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন।
প্রশ্ন ঃ আপনাকে গ্রেফতারের পূর্বে কোন গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল?
উত্তরঃ আমি তা জানতাম না।
তবে আমার কমাণ্ডিং অফিসারের তা জানা থাকতে পারে। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে যে, আমাকে সেকেণ্ড ইন-কম্যাণ্ড ফিল্ড সিকিউরিটি অফিসে হাজির হবার নির্দেশ দেন। সেখানে পৌঁছানোর পর আমাকে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।
প্রশ্ন ঃ আপনার প্রশ্নকারী অফিসারের নাম কি?
উত্তর ঃ লেঃ কঃ এজাজ মেহেদী এবং হাজী আকবর।
প্রশ্ন ঃ কতক্ষণ এই প্রশ্ন চলে?
উত্তর ঃ প্রায় আধঘণ্টা ধরে।
প্রশ্ন ঃ বেলা তখন কত?
উত্তর ঃ দুপুর একটার বেশী।
প্রশ্ন ঃ কতদিন এই জিজ্ঞাসাবাদ চলে?
উত্তর ঃ ৩রা জানুয়ারী হতে ১৮ই জানুয়ারী– রোজই।
প্রশ্ন ঃ জিজ্ঞাসাবাদের কি একই ধরণ ছিল?
উত্তর ঃ তা আমার মনে নেই। অফিসাররা একের পর এক আধ ঘণ্টা থেকে ৪৫ মিনিট যাবৎ আমাকে প্রশ্ন করেন।
প্রশ্ন ঃ কেন আপনি কি সত্য কথা বলছিলেন না?
উত্তর ঃ আমি সত্যি বলছিলাম।
প্রশ্ন ঃ কেন আপনি একই কথা রোজ পুনরাবৃত্তি করতেন?

উত্তর ঃ আমি জানি না।
প্রশ্ন ঃ বারংবার জিজ্ঞাসাবাদে আপনি বিরক্ত হননি?
উত্তর ঃ না। কখনই আমি বিরক্ত হইনি।
প্রশ্ন ঃ আপনার গ্রেফতারে আপনি কি বিস্মিত হয়েছিলেন?
উত্তর ঃ তারা যখন ষড়যন্ত্রের কথা আমাকে বললেন, তখন আমি সন্ত্রস্ত হই।
প্রশ্ন ঃ আপনি বিস্মিত হয়েছিলেন কি?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, হয়েছিলাম।
আমাকে যখন আগরতলা ষড়যন্ত্রের কথা বলা হলো তখন আমি বিভ্রান্তি বোধ করছিলাম।
প্রশ্ন ঃ ১৯৬৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হওয়ার আগে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়?
উত্তর ঃ না।
প্রশ্ন ঃ আপনি কি জানতেন, আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কেন হাজির করা হচ্ছে?
উত্তর ঃ হ্যাঁ । নৌবাহিনীর লেঃ শরীফ আমাকে জানান যে, স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি প্রদানের জন্যে আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লইয়া যাওয়া হচ্ছে।
প্রশ্ন ঃ আপনাকে স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতির জন্যে কে বলেছিলেন?
উত্তর ঃ বিবৃতি প্রদানের একদিন কিম্বা দুইদিন আগে আমি স্বেচ্ছায় লেঃ শরীফকে স্বীকারোক্তি প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করি।
প্রশ্নঃ আপনি কি এই স্বীকারোক্তি প্রদানের ব্যাপারে ইতিপূর্বে দ্বিধান্বিত ছিলেন?
উত্তর ঃ না, আমি সবসময়ই সত্য বলার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম।
প্রশ্ন ঃ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কতবার আপনি স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য বিবৃত করেন?
উত্তর ঃ মাত্র একবার।
প্রশ্ন ঃ রাজসাক্ষী হলে আপনাকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে, এ কথা কেউ কি আপনাকে বলছিল?
উত্তর ঃ মেজর নাসের আমাকে বলেন যে, আমাকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে এবং আমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে।
সাক্ষী অতঃপর বলেন যে, তিনি জানতেন এই স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি প্রদানের পর তাঁহাকে আবার সামরিক কাষ্টডিতে ফেরৎ নেওয়া হইবে। সাক্ষী আরও বলেন যে, তাকে ২০/৫/৬৮ হইতে ২১/৫/৬৮-এর মধ্যে কোন পুলিস অথবা সামরিক অফিসার সাক্ষাৎ করেন নাই। সাক্ষী কোন তদন্তকারী অফিসারকে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দরখাস্ত লেখার অনুরোধ জানান নাই বলিয়া বলেন।

বদরুল হায়দার চৌধুরী

ইহার পর অভিযুক্ত ষ্টুয়ার্ড জহুরুল হকের কৌসুলী বদরুল হায়দার চৌধুরী জেরা করেন।

প্রশ্ন ঃ ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত হওয়ার পর আপনি আপনার কল্যাণ সমিতির ব্যাপারে নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন কেন?

উত্তর ঃ কারণ আমার 'কল্যাণ সমিতি' স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসের পর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আমার সকল যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র হতে বিচ্ছিন্ন করার চিন্তা আমার মনে ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ার পরেও বিদ্যমান ছিল।

জুলমত আলী খান

অভিযুক্ত শ্রী বিধান চন্দ্র সেনের কৌসুলী জনাব জুলমত আলী খান অতঃপর জেরা শুরু করেন। তাহার জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন, '১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরের সভার পর আমি ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আসি। আমি স্ত্রী ও সন্তানাদিসহ এখানে আসি।'

প্রশ্ন ঃ পূর্ব পাকিস্তানে আপনি কতদিন ছিলেন?

উত্তর ঃ দুই মাস।

ইহার পর অভিযুক্ত সার্জেন্ট শামসুল হকের সরকার নিয়োজিত উকিল জনাব ফজলুল করীম সাক্ষীকে জেরা করেন।

তাঁহার প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানান, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধকালে অভিযুক্ত ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু ওই সময় কাজ শুরু করার উপযুক্ত মূহুর্ত কিনা সে সম্পর্কে তাঁহাদের কোন আলোচনার কথা মনে পড়ছে না বলিয়া সাক্ষী জানান।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের জেরা সমাপ্ত হবার পর সবশেষে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জানাব মঞ্জুর কাদির সাক্ষীকে 'রি একজামিনেশন' করেন।

পরবর্তী সাক্ষী প্রসঙ্গেঃ

রাজসাক্ষী লেঃ মোজাম্মেলের পর কাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে তা লইয়া বাদী ও বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেয়। জনাব মঞ্জুর কাদির ইহার পর অন্যতম রাজসাক্ষী আমির হোসেনের সাক্ষ্য গ্রহণের দাবী করেন। তিনি সকল রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর অন্যান্যদের সাক্ষ্য গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

কিন্তু বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান অন্যতম সাক্ষী জনাব কামালুদ্দীনের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন জানান। ট্রাইব্যুনাল জনাব সালাম খানের আবেদন গ্রহণ করিয়া অদ্য (বুধবার) জনাব কামালুদ্দীনের সাক্ষ্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

সংবাদ

৩১শে জুলাই ১৯৬৮

শেখ মুজিবের সহিত উইলিয়মসের সাক্ষাৎ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ,গতকাল বেলা ২.৩০ মিঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ডিটেনশন ক্যাম্প-এ মিঃ টমাস উইলিয়মস তদীয় মক্কেল শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মামলার বিষয়ে দীর্ঘ দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা করিয়াছেন।

গতকাল সন্ধ্যা ৭.৩০ মিঃ জনাব সালাম খানের গুলশানস্থ বাসভবনে মিঃ টমাস উইলিয়মস মামলার বিষয়ে লিগ্যাল এইড কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত সকল কৌসুলীর সহিত একটি আলোচনায় মিলিত হন।

গতকাল রাত্রি ৮-৩০ মিঃ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী, মোল্লা জালালুদ্দিন,ময়েজউদ্দিন, আবদুল মান্নান, শামসুল হক,এ,চৌধুরী প্রমুখ মিঃ উইলিয়মসের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

উইলিয়মসের সেক্রেটারী

ঢাকা বারের আইনজীবী জনাব মওদুদ আহমদ বার-এট-ল' মিঃ টমাস উইলিয়মসের অবৈতনিক প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করিতেছেন। মিঃ উইলিয়মসের সহিত যোগাযোগ স্থাপনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদেরকে মিঃ উইলিয়মসের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঠিকানায় মিঃ মওদুদকে 'রিং' করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

সংবাদ

৩১শে জুলাই ১৯৬৮

সওয়াল-জবাবের বিবরণ

অতঃপর শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষের কৌশুলী জনাব আবদুস সালাম সাক্ষীকে জেরা করা শুরু করেন।

তিনি সাক্ষীকে (মোজাম্মেল হোসেন) জিজ্ঞাসা করেন,কবে তিনি নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। জনাব সালাম বাংলায় প্রশ্ন করেন। বিচারপতি জনাব এম এ রহমান কৌশুলীকে ইংরেজীতে প্রশ্ন করিতে বলেন। এই পর্যায় জনাব সালাম বলেন যে, সাক্ষীকে বেশ শিক্ষিত বলিয়া মনে হয় না। বিচারপতি জনাব এস,এ রহমান বলেন যে,সাক্ষী বেশ ভাল ইংরেজী জানে বলিয়া মনে হইতেছে। জনাব সালাম খান অতঃপর ইংরেজীতে তাহার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেন। উত্তরে লেঃ মোজাম্মেল হোসেন বলেন যে, ১৯৪৪ সালে তিনি তদানীন্তন ভারতীয় নৌবাহিনীতে যোগদান করেন।

জনাব সালাম খান জিজ্ঞাসা করেন ষ্টুয়ার্ড হিসাবে তিনি কি কাজ করিতেন।এই পর্যায় মোজাম্মেল হোসেন একটু ইতঃস্তত করিতে থাকিলে জনাব সালাম তাহার প্রশ্ন বাংলায় জিজ্ঞাসা করেন। তখন বিচারপতি জনাব এস,এ,রহমান কৌশলীকে ইংরেজীতে প্রশ্ন করার জন্য পুনরায় বলেন।

জনাব আবদুস সালাম বলেন, সাক্ষী যে ইংরেজী জানেন না তিনি তাহাই প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন। এতদসত্ত্বেও জনাব সালাম খান ইংরেজীতে প্রশ্ন করেন এবং তাহার পূর্বের প্রশ্ন পুনরায় উল্লেখ করেন এবং ষ্টুয়ার্ডে কি কাজ করিতে হয় উহা জানিতে চাহেন। তখনও সাক্ষী ইতস্তত করিতে থাকেন। এই অবস্থায় কৌশুলী জনাব সালাম খান বলেন,"মনে করার কিছুই নেই, বলুন– কি কাজ– রান্না করা, অফিসারদের পরিবেশন করা ইত্যাদি তাই না"।

মোজাম্মেল হোসেন –হ্যাঁ, উহা আমার কাজেরই অংশ বটে। জনাব সালাম খান– আপনার বেতন কত ছিল?

মোজাম্মেল হোসেন– আমার মনে নাই।

জনাব সালাম খান– মনে করার চেষ্টা করুন।

বলুন না–লজ্জার কিছুই নাই–

আপনার বেতন কি ২৫ টাকা ছিল?

মোজাম্মেল–৪০ টাকার নীচে ছিল।

জনাব সালাম– আপনিনংরাজী শিখলেন কি করিয়া?

মোজাম্মেল–ট্রেনিং এর মাধ্যমে অফিসারদের কথা শুনে।

এই পর্যায় জনাব সালাম খান লেঃ মোজাম্মেলের ভুল ইংরেজী বলার প্রতি লক্ষ্য করতে কোর্টকে অনুরোধ জানান।

জনাব আবদুস সালাম খান বলেন যে, তিনি সাক্ষীর ইংরেজী জ্ঞান আরও কিছু পরীক্ষা করিতে চাহেন এবং তাহাকে একটি বাংলা বাক্য ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে দেন। বাক্যটি হইলঃ

"জাতিপুঞ্জের সদর দফতরে আফ্রিকান সদস্য দেশসমূহের এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে।"

কিন্তু সাক্ষী উহা অনুবাদ করিতে ব্যর্থ হন।'জাতিপুঞ্জ' কথার অর্থ কি বারবার জিজ্ঞাসা করিলে সাক্ষী বলেন "প্রাদেশিক এই ধরনের কিছু একটা হইবে"।

জনাব আবদুস সালাম অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন সদর দফতর বলিতে কি বুঝা যায়।

সাক্ষী বলেনঃ 'সদর' কথার অর্থ 'প্রেসিডেন্ট' তক্ষুণি বাংলা ভাষার অজ্ঞতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়া বলেন, 'আমি দীর্ঘদিন ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম না।'

জনাব সালাম খান বলেন– হ্যাঁ, 'আপনি শিখানো সাক্ষী বলিয়া পরীক্ষায় ব্যর্থ হইলেন।'

এই সময়ে কোর্ট কিছুক্ষণের জন্য মুলতবী হয়।এই সময়ে প্রতিবাদী পক্ষের কৌসুলী জনাব জহিরুদ্দীন অভিযোগ করেন যে, বাদী পক্ষের কৌসুলীগণ সাক্ষীকে কিছু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা পাইতেছেন। তখন যুক্তি পাল্টা যুক্তি প্রদর্শন শুরু হইয়া যায়, কিছুক্ষণ পরে তর্ক বিতর্ক প্রশমিত হয়।

কোর্ট পুনরায় শুরু হইলে প্রতিবাদী পক্ষের কৌসুলী জনাব সালাম খান আর একটি বাক্য ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে দেন। বাক্যটি হইলঃ

"পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারা বিভিন্ন দেশগুলির পৃথক পৃথক সমস্যাসমূহ কিভাবে ও কোন পথে সমাধান করা যাইতে পারে আলোচনা তাহাতেই সীমাবদ্ধ থাকে।"

সাক্ষী বলেন যে, তিনি কিছুই অনুবাদ করিতে পারেন না।

সালাম খান সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন – কোন তারিখে আপনি গ্রেফতার হন?

মোজাম্মেল হোসেন– ১৯৬৮ সালের ৩রা জানুয়ারী আমাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

জনাব সালাম খান– গ্রেফতারের পর আপনাকে কোথায় লইয়া যাওয়া হয়?

মোজাম্মেল–এফ,এস, ও,তে মানে ফিল্ড সিকিউরিটি অফিসে।

জনাব সালাম–আপনাকে নৌবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারের সম্মুখে হাজির করা হইয়াছিল কি?

মোজাম্মেল–হ্যাঁ।

জনাব সালাম–আপনাকে কিছু প্রশ্ন করা হইয়াছিল?

মোজাম্মেল–হ্যাঁ।

জনাব সালাম– আপনি কিছু বলেছিলেন কি?

মোজাম্মেল–কোন বক্তব্য রেকর্ড করা হয় নাই।

জনাব সালাম–সে যাই হোক, আপনি কি অভিযুক্ত কার্যাবলীতে আপনার অংশগ্রহণের বিষয়ে কি কিছু বলিয়াছিলেন?

মোজাম্মেল–হ্যাঁ, কিন্তু কিছুই রেকর্ড করা হয় নাই।

জনাব সালাম–আপনি জানেন কি যে, নৌবাহিনীর আইন অনুসারে আপনার বক্তব্য রেকর্ড করার কথা?

মোজাম্মেল–হ্যাঁ।

জনাব সালাম– আপনি যে জবানবন্দী দিয়াছিলেন আর আপনার বর্তমান বক্তব্যের সহিত কোন মিল নাই–তাই কি আপনি সত্য চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন।

মোজাম্মেল–না-না–।

জনাব সালাম– নৌবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের অফিস হইতে আপনাকে স্থানান্তর করা হইয়াছে কবে?
মোজাম্মেল–১৯শে জানুয়ারী আমাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তর করা হয়।
জনাব সালাম–এই সময়ের মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন?
মোজাম্মেল–এফ,এস,ও তে।
জনাব সালাম–আপনি কি হাজতে ছিলেন?
মোজাম্মেল–না, আমি একজন অফিসারের সাথে ছিলাম।
জনাব সালাম–আপনাকে কি স্বাধীনভাবে চলাফেরা বা কথাবার্তা বলতে দেওয়া হইত?
মোজাম্মেল– না।
জনাব সালাম–আপনি যাহা বলিতেছেন একথা না বলিলে আপনাকে আসামী করা হইবে এমন কিছু আপনাকে বলা হইয়াছিল কি?
মোজাম্মেল–না।
জনাব সালাম– আপনার ক'টি ছেলেমেয়ে?
মোজাম্মেল–নয়টি।
জনাব সালাম– সবচাইতে ছোটটির বয়স কত?
মোজাম্মেল–সবচেয়ে ছোট্টটির বয়স প্রায় এক বৎসর।
জনাব সালাম– আপনি কি আপনার পরিবারের জন্য ভর করিয়া ছিলেন এবং আপনার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন?
মোজাম্মেল–না, কারণ আমি যাহা কিছু করিয়াছি তজ্জন্য আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী।
জনাব সালাম–কথিত পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সংগ্রামী শক্তি গঠনের কাজে অংশগ্রহণের পরিণতি সম্পর্কে আপনি সচেতন ছিলেন কি?
মোজাম্মেল– হ্যাঁ।
জনাব সালাম –তবে আপনি উহা করিতে গেলেন কেন?
মোজাম্মেল– পরিণতির মোকাবিলা করিতে আমি আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম।
জনাব সালাম–আপনি যখন ঢাকায় অবতরণ করিলেন অমনি বুঝি আপনার দৃঢ়তা নিঃশেষ হইয়া গেল, কিছুই রইল না?
মোজাম্মেল–না, এখন পর্যন্ত আমার মধ্যে দৃঢ়তা রহিয়াছে।
জনাব সালাম খান –ঢাকায় আপনাকে কোথায় রাখা হইয়াছিল?
মোজাম্মেল–ক্যান্টনমেন্টের পাঞ্জাব অফিসার মেসে।
জনাব সালাম – কোনরুমে?
মোজাম্মেল– নম্বর আমার মনে নাই।

জনাব সালাম–আপনাকে কি পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছিল?
কোন লোকের সাথে কি কথা বলিতে দেওয়া হয় নাই?
মোজাম্মেল–হ্যাঁ, আমাকে কাহারও সহিত কথা বলিতে দেওয়া হইত না।
জনাব সালাম–আপনার আত্মীয়-স্বজনের সহিত আপনাকে কি যোগাযোগ করিতে দেওয়া হইত?
মোজাম্মেল– হ্যাঁ, পরে আমাকে আমার আত্মীয়-স্বজনের সহিত যোগাযোগের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল।
জনাব সালাম–আপনাকে কি কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হইয়াছিল? কবে?
মোজাম্মেল–হ্যাঁ, ১৭ই ফেব্রুয়ারী আমার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার জন্য হাজির করা হইয়াছিল।
জনাব সালাম– আপনাকে কি বলা হইয়াছিল যে, আপনি যদি একবারী হন তবে আপনাকে ক্ষমা করা হইবে?
মোজাম্মেল–হ্যাঁ, মেজর এ,বি,এম নাসের আমাকে এই পরামর্শ দান করেন যে, ক্ষমা পাইতে হইলে আমি যেন স্বীকারোক্তি প্রদান করি।
জনাব সালাম –কবে?
মোজাম্মেল–২২শে মে।
জনাব সালাম–আপনার স্বীকারোক্তির পরিণতি কি হইবে তাহা আপনার জানা আছে?
মোজাম্মেল–হ্যাঁ।
জনাব সালাম–মারাত্মক পরিণতির ভয় করিয়াই কি আপনি ইহা করিয়াছেন?
মোজাম্মেল–না, আমি স্বেচ্ছায়ই করিয়াছি।
আমাকে যা কিছু বলিতে বলা হইয়াছে, আমি তাহাই বলিয়াছি এ কথা সত্য নয়।
জনাব সালাম– কোন সময়ে আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করা হইয়াছিল?
মোজাম্মেল– ১৯৬৮ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টা হইতে ১০ঃ৩০ মিনিটের মধ্যে।
জনাব সালাম–আপনি কখন ফিরিয়া আসেন?
মোজাম্মেল–আমার মনে নাই।
জনাব সালাম– আপনাকে কে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লইয়া গিয়াছিল?
মোজাম্মেল–পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেঃ শরীফ। সিগন্যাল মেসের কোর্টে আমাকে হাজির করা হয়।
জনাব সালাম–আপনাকে জীপে না "কার"এ নেওয়া হইয়াছিল?
মোজাম্মেল–একটা জীপে করিয়া।

জনাব সালাম–কোন ড্রাইভার ছিল?
মোজাম্মেল–হ্যাঁ।
এই পর্যায় জনাব সালাম সাক্ষীকে অনুবাদের জন্য প্রদত্ত বাক্যটি প্রদর্শন করিয়া বলেন, এই বাক্যটি সাক্ষী অনুবাদ করিতে পারে নাই, অতঃপর তিনি একটি জবানবন্দীর কপি সাক্ষীকে দেখাইয়া বলেন,"এই জবানবন্দীকে কি পূর্ব হইতে আপনার জন্য লিখিতভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছিল?"
মোজাম্মেল– না।
জনাব সালাম–আপনি কি জবানবন্দীতে বলিয়াছিলেন, ডিসকাশন রিসেন্ড কমফাইন্ড উইথ ইন ফাইন্ডিং ওয়েজ এ্যাণ্ড মিনস ফরসলভিং ইনডিভিজুয়াল প্রোবলেম বাই মিউচিয়াল কো-অপারেশন"।
পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সমস্যাসমূহ কিভাবে, কোন পথে সমাধান করা যাইতে পারে আলোচনা তাতেই সীমাবদ্ধ ছিল
মোজাম্মেল–হ্যাঁ।
জনাব সালাম–অনুগ্রহ করে অনুবাদ করুনতো।
'ইহা অদৃষ্টের পরিহাস'

সংবাদ

১লা আগস্ট ১৯৬৮

২নং সরকারী সাক্ষী কামালদ্দীনকে বৈরী ঘোষণা
অতঃপর ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে মুক্তিলাভ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (বুধবার) "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যে"র ষড়যন্ত্র মামলার তৃতীয় দিবসের শুনানীকালে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বাদীপক্ষের আবেদনক্রমে বাদীপক্ষের ২ নম্বর সাক্ষী জনাব কামালুদ্দীনকে "বৈরীভাবাপন্ন"(হোষ্টাইল উইটনেস) বলিয়া ঘোষণা করেন। সাক্ষী কামালুদ্দীনের আবেদনক্রমে ট্রাইব্যুনাল তাঁহাকে মুক্তিদানের নির্দেশ দিয়াছেন এবং তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সাক্ষ্য প্রদান শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের ট্রাইব্যুনাল সমীপে বলেন যে, সাক্ষী জনাব কামালুদ্দীন তাহার বিবৃতিতে উল্লেখিত তিনজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সনাক্তকরণে "ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল" করিয়াছেন। অতএব,তাঁহাকে বৈরীভাবাপন্ন সাক্ষী বলিয়া গণ্য করা হউক।

এই বক্তব্যে আপত্তি জানাইয়া বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়মস ট্রাইব্যুনালকে বলেন যে, সাক্ষীকে দেখিয়া অসুস্থ মনে হয়। তাঁহার অভিযুক্তকারী ও আটককারীরা সাক্ষীর এমন অবস্থার

সৃষ্টি করিয়াছে যে, তাহার ক্ষমতা ও মানসিক শক্তি বলিতে আর কিছু নাই। এই অবস্থায় তিনি বাদীপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করার উপযুক্ত নহেন।

মিঃ উইলিয়মসের এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া ট্রাইব্যুনাল সাক্ষীকে জেরা করিবার জন্য বাদীপক্ষের কৌসুলীকে অনুমতি দেন।

গতকাল বিচারপতি জনাব এস,এ রহমান, বিচারপতি জনাব এম, আর খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমূল হাকিমকে লইয়া গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের তৃতীয় দিনের অধিবেশন যথারীতি সকাল নয়টায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল মেসে শুরু হয়। ইতিপূর্বে ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনজীবী, সাংবাদিক ও দর্শকে পরিপূর্ণ আদালত কক্ষে উপস্থিত হন।

ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণ আদালতে আসনগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব ইসমাইল ও জনাব আতাউর রহমান খান কতিপয় টেকনিক্যাল বিষয়ের প্রতি চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কৌসুলী জনাব সালাম খান কতিপয় মূল দলিল পরীক্ষা করার ব্যাপারে অসুবিধার কথা ট্রাইব্যুনালকে জানান। অতঃপর জনাব মঞ্জুর কাদের উল্লেখিত অসুবিধা দূর করার প্রতিশ্রুতি দেন।

ইহার পর ১ নম্বর রাজসাক্ষী লেঃ মোজাম্মেলকে ট্রাইব্যুনাল গত দিনের প্রদত্ত কতিপয় বিবৃতি সংশোধন করার অনুমতি দেন। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া রাজসাক্ষী লেঃ মোজাম্মেল ইতিপূর্বে প্রদত্ত বিবৃতির সহিত নূতন বক্তব্য সংযোজন করিতে উদ্যত হইলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান আপত্তি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, সাক্ষ্য প্রদান ও জেরা সমাপ্ত হইবার পর সাক্ষ্যের রেকর্ডে কোন নূতন বক্তব্য সংযোজন করিতে দেওয়া যায় না–শুধুমাত্র ভুল সংশোধন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। অতঃপর ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন যে,এক্ষণে প্রথম রাজসাক্ষীর সংযোজনী লিখিয়া রাখা যাইতে পারে।

এই সময় আদালত কক্ষে গুঞ্জন শোনা যায়। রাজসাক্ষী লেঃ মোজাম্মেল সকাল নয়টা বিশ মিনিট হইতে পৌনে দশটা পর্যন্ত সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া তাঁহার পূর্বদিনের বিবৃতির অনুলিপি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে থাকেন। এই সময় জনাব সালাম খান মোজাম্মেলের গতকালকার একটি বিবৃতির ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান জনাব এস,এ রহমান তাঁহাকে বসিয়া পড়িতে বলেন।

অতঃপর পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ নম্বর সরকারী সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ২ নম্বর সরকারী সাক্ষী জনাব কামালুদ্দীনকে কাঠগড়ায় আনয়ন করা হয়। বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের তাঁহার বিবৃতি পরীক্ষা শুরু করেন।

জনাব মঞ্জুর কাদেরের প্রশ্নের জবাবে জনাব কামালুদ্দীন জানান, "আমি ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত নৌবাহিনীতে ছিলাম। নৌবাহিনী থেকে আমি পেন্সন নিয়ে চলে আসি। নৌবাহিনী থেকে আসার পর আমি প্রথমে করাচীতে (৪৭/৩, স্কুল টিচার্স কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটিতে জনাব কে,জি, আহমদের বাসায়) এবং পরবর্তীকালে চট্টগ্রামে বাস করি। ১৯৬৫ সালের মে পর্যন্ত জনাব কে,জি আহমদ যতদিন করাচী এসেছেন– আমার সঙ্গে ঐ বাসায়ই থাকতেন। সুলতানউদ্দীন আমার আত্মীয়– আমার স্ত্রীর বড় ভাই।

এই সময় ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান সাক্ষীকে সুলতানউদ্দীনকে সনাক্ত করিতে বলেন। কিন্তু সাক্ষীকে খুব বিচলিত দেখা যায়। জনাব কামালুদ্দীন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট গিয়া প্রায় ৫/৭ মিনিট যাবৎ নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে জনাব সুলতানউদ্দীনকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

অতঃপর বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী প্রশ্ন করেনঃ "আপনি নৌবাহিনীর আর কাউকে জানেন?"

উত্তর ঃ হ্যাঁ, জানি।

প্রশ্ন ঃ (অভিযুক্তদের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া) উহাদের মধ্যে নৌবাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত কাহাকেও আপনি চেনেন?

উত্তর ঃ (কৌসুলীর দিকে চাহিয়া) আমি অভিযুক্ত নূর মোহম্মদ ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে চিনি।

প্রশ্ন ঃ তাদের সঙ্গে আপনার কিভাবে সাক্ষাৎ ঘটেছিল?

উত্তর ঃ ১৯৬৪ সালের সেপটেম্বর মাসে আমি করাচী গিয়েছিলাম। এই সময়– যদ্দুর মনে পড়ে আমার সমন্ধী সুলতানউদ্দীন আহমদ করাচীর বাসায় তাঁর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করতে চান। পরের দিন সেখানে লেঃ মোজাম্মেল হোসেন (চাঁদ মিয়া) সেখানে আসেন।আমি তখন ঘুমোচ্ছিলাম। তিনি দরজায় ধাক্কা দিলে আমি দরজা খুলি। তিনি জিজ্ঞেস করেন–সুলতান কোথায়? আমি বলি –তিনি বাসায় নেই। লেঃ মোজাম্মেল তখন বলেন, সুলতান খুবই দায়িত্বজ্ঞানহীন; কারণ সে কয়েকজন বড় বড় অফিসার ও বড় বড় লোককে দাওয়াত করে এখন নিজেই অনুপস্থিত। ঠিক তখন একটা ট্যাক্সি করে লেঃ মোয়াজ্জেম, নূর মোহাম্মদ ও সুলতানউদ্দীন আহমদ এসে উপস্থিত হন। আমি তখন মুখ ধুতে চলে যাই।

প্রশ্ন ঃ তাঁদের আপনি এখানে সনাক্ত করতে পারেন?

উত্তরঃ জী হ্যাঁ পারি। অতঃপর সাক্ষী কামালুদ্দীন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট গিয়া অনেকক্ষণ এধার-ওধার নিরীক্ষণের পর বলেন, "লেঃ মোজাম্মেল অভিযুক্তদের মধ্যে নেই।" তারপর সাক্ষী সম্মুখ হইতে দ্বিতীয় সারিতে উপবিষ্ট জনাব এ,এফ,রহমান সি এস-পিকে দেখাইয়া বলেন, ইনি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম।

এই সময় আদালত কক্ষে তুমুল গুঞ্জন শোনা যায়। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান সাক্ষীকে কিছু প্রশ্ন করিতে চাহেন। বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব সালাম খান আপত্তি জানান।

চেয়ারম্যান সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেনঃ আপনি সঠিকভাবে সনাক্ত করিয়াছেন?

সাক্ষী ঃ জী হ্যাঁ।

এই সময় জনাব সালাম খানকে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের সহিত উচ্চঃস্বরে কথাবার্তা বলিতে শোনা যায়।

চেয়ারম্যান ঃ জনাব সালাম খান আপনি বসে পড়ুন।

সালাম খান ঃ স্যার, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

সাক্ষী পুনরায় অভিযুক্তদের চতুর্দিকে ঘুরিয়া অন্যান্যকে সনাক্ত করিতে চেষ্টা করেন। অবশেষে বহুক্ষণ পর ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে তিনি সঠিকভাবে সনাক্ত করিতে সক্ষম হন।

তারপর তিনি এক্স কর্পোরেল সামাদের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলেন, ইনি নূর মোহাম্মদ।

জনাব মঞ্জুর কাদের তখন সাক্ষীকে প্রশ্ন করেনঃ

'ওই দিন আর কেউ সেখানে এসেছিলেন'।

উত্তর ঃ জী হ্যাঁ, তিনজন। তাদের মধ্যে একজন লম্বা ও আর একজন বেঁটে।

প্রশ্ন ঃ তাঁদের নাম কি?

উত্তর ঃ একজন ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, অপর ২ জনের ব্যাপারে আমি পরে শুনেছি। লম্বা ব্যক্তি হলেন শেখ মুজিবর রহমান ও বেঁটে ব্যক্তি হলেন জনাব এ,এফ,রহমান সি,এস,পি।

তখন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের নির্দেশে সাক্ষী কামালুদ্দিন জনাব রুহুল কুদ্দুস সি এস পি-কে জনাব আহমদ ফজলুর রহমান সি এস পি ও সার্জেন্ট জহিরুল হককে শেখ মুজিবর রহমান বলিয়া সনাক্ত করেন।

ইহার পর জনাব মন্‌জুর কাদের সাক্ষীকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করেন।

প্রশ্ন ঃ নৌবাহিনী থেকে চলে আসার পর আপনি কি পেশা গ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ স্যালভেজ বিজনেস।

প্রশ্ন ঃ উপরোক্ত ঘটনার পর আপনি আবার করাচী গিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে আমি করাচী যাই। করাচী এয়ারপোর্টে আমার সমন্ধি আমার সঙ্গে দেখা করেন। সেখান থেকে শহরে যাবার পথে তিনি কারসাজে অবস্থিত লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের বাসায় তাকে নামিয়ে দিতে বলেন।

সেই বাসার সামনে যখন যাই– তখন লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম ছাড়াও আরও ৭/৮ জনকে দেখি। তারা ইতিমধ্যেই বেড়িয়ে পড়েছেন–তাই সুলতানউদ্দীন আর সে বাসায় ঢুকলেন না।

এই সময় সাক্ষীকে খুবই বিভ্রান্ত ও বিচলিত মনে হতেছিল। তিনি মাথায় ও চোখে হাত দিয়ে কাঁপতে থাকেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ বসার জন্য ট্রাইব্যুনালের অনুমতি চাহেন।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানঃ

আপনি কি সুস্থ আছেন?

উত্তরঃ জী হ্যাঁ।

ইহা বলিয়া সাক্ষী বসিয়া পড়েন। কিছুক্ষণ পর বাদীর পক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের সাক্ষীকে আবার প্রশ্ন শুরু করেন।

উত্তরে সাক্ষী বলেন,"আমি ১৯৬৫ সালের সেপ্টম্বর মাসে ঢাকায় আসি। নারায়ণগঞ্জে আমার একটা জরুরী কাজ ছিল। সেই সময় গোপীবাগে আমার ভাইয়ের বাসায় বাস করি। একদিন যখন ঢাকায় আমার বাসা থেকে আমি বেড়োচ্ছিলাম আমি দেখলাম আমার সমন্ধী সুলতানউদ্দীন আহমদ, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও টাক-মাথা কালো রঙের আর এক ভদ্রলোক—একে আমি চিনি না—তাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছিলেন। আমি বললাম, আমার সময় নেই। আমার জন্যে একটা ট্যাক্সি প্রতীক্ষা করছিল। তাঁরা সেই ট্যাক্সিতে উঠলেন এবং তাঁদেরকে ধানমণ্ডিতে নামিয়ে দিতে বল্লেন। ট্যাক্সির মধ্যে উপরোক্ত টাক-মাথা ভদ্রলোক যেসব কথাবার্তা বললেন,তার মধ্যে আমার "শেখ" শব্দটি মনে আছে। তাদেরকে আমি ধানমণ্ডির মীরপুর রোডের রক্সি হোটেলের কোনে অবস্থিত একটি বাসায় নামিয়ে দিলাম। সেটা কার বাসা আমি জানি না।

প্রশ্ন ঃ আপনার জীপটি আপনি কোথায় পেলেন?

উত্তর ঃ আমার ব্যবসার জন্যে ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে একটি জীপ কিনি। আমার ঢাকা অফিস ছিল ১৬, নম্বর দিলকুশা কমার্শিয়াল এরিয়া।

তখন বাদীপক্ষের কৌসুলী জিজ্ঞাসা করেনঃ

তারপর কি হলো ?

এই সময় সাক্ষী কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া অনুচ্চস্বরে অনেকক্ষণ বিড় বিড় করিতে থাকেন।

তারপর সাক্ষী চক্ষু খুলিয়া আবার বলিতে শুরু করেনঃ

১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে একদিন যখন আমি জীপে করে অফিসে যাচ্ছিলাম তখন সুলতানউদ্দীন আমার ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে জনাব রুহুল কুদ্দুস সি এস পি'র অফিসে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে বলেন।

ইহার পর সাক্ষী চুপ করিয়া থাকেন। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করার পর তিনি বলেনঃ

আমার জীপে করে আমি ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে ই পি আই ডি সি অফিসের কাছে নামিয়ে দিই।

প্রশ্নঃ এখন বলুন, আপনি কোন জবানবন্দী দিয়েছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ১৯৬৮ সালের ৬ই মার্চ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে শপথ নিয়ে জবানবন্দী দিই।

প্রশ্ন ঃ তারপর থেকে কোথায় বাস করছেন আপনি ?

উত্তর ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট মেসে।

প্রশ্ন ঃ তা কি আপনার অনুরোধক্রমে?

এই সময় বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব সালাম খান জনাব মঞ্জুর কাদেরের প্রশ্নে ঘোরতর আপত্তি করেন। বিবাদীপক্ষের অন্যান্য কৌসুলীও সমস্বরে আপত্তি তোলেন। এই সময় সাক্ষী নির্বাক হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকেন। তখন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান সাক্ষীকে কিছুক্ষণের জন্য আদালত কক্ষের বাহিরে যাইতে অনুমতি দেন।

সাক্ষী কামালুদ্দীনের অনুপস্থিতিকালে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের সাক্ষীকে হোষ্টাইল (বৈরী) ঘোষণা করা সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন করেন। তিনি বলেন,'নিজের সমন্ধির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া সত্যই কষ্টকর। তাছাড়া সাক্ষীর সঙ্গে তার আত্মীয়-স্বজনের পত্রালাপও ছিল।'

এই সময় জনাব সালাম খান উচ্চকণ্ঠে আপত্তি তুলিয়া বলেন,'বাদীপক্ষের কৌসুলীদের সঙ্গে সাক্ষীর যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ ছিল। সাক্ষী তাদেরই তত্বাবধানে রয়েছেন।'

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান জনাব মঞ্জুর কাদেরকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি সাক্ষীকে হোষ্টাইল (বৈরী) ঘোষণা করা হোক—তাই চান?

মঞ্জুর কাদের ঃ সাক্ষী তার জবানবন্দীতে উল্লেখিত তিনজন অভিযুক্তকে সনাক্ত করতে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করেছেন। তাই সাক্ষীকে হোষ্টাইল বলে বিবেচনা করা উচিত।

এই সময় বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী মিঃ টমাস উইলিয়মস আপত্তি তুলিয়া বলেনঃ

'সাক্ষীর আটককারী এবং অভিযুক্তকারীরা সাক্ষীর এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যাতে তার আর কোন ক্ষমতা ও মানসিক শক্তি অবশিষ্ট নেই। এ অবস্থায় সাক্ষী বাদীপক্ষের বিরুদ্ধে 'হোষ্টাইল' (বৈরী ভাবাপন্ন) হওয়ার অনুপযুক্ত।

এই বক্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া ট্রাইব্যুনাল সরকারী সাক্ষী কামালুদ্দীনকে 'হোষ্টাইল' বলিয়া ঘোষণা করেন।

ইহার কিছুক্ষণ পর সাক্ষী কামালুদ্দীন পুনরায় কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়ান। জনাব মঞ্জুর কাদের জেরা শুরু করেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি ইচ্ছাকৃতভাবে তিনজনকে মিথ্যা সনাক্তকরণ করেননি?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ আপনি খবরের কাগজ পড়েন? কাগজে কোন দিন শেখ মুজিবের ছবি দেখেননি? সাক্ষী কয়েকবার ইতস্ততঃ করিয়া বাদীপক্ষের কৌসুলীদের আসনের দিকে চাহিতে থাকেন। তারপর বলেনঃ "আমি একজন ব্যবসায়ী। আমি জানি না।"

প্রশ্নঃ শেখ মুজিবর রহমানকে আপনি কখনো দেখেননি?

উত্তর ঃ স্যার আমি কখনো তাঁকে দেখিনি। আঠার বছর বয়স থেকে আমি নৌবাহিনীতে ছিলেম। আমি কোন রাজনৈতিক নেতাকে চিনি না। কয়েক মিনিটের জন্যে দেখলেও আমি এখন চিনতে পারছি না।

প্রশ্ন ঃ আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে সনাক্ত করেন নাই?

উত্তর ঃ না, তা সত্য নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত জবানবন্দীতে বলেছিলেন যে, ট্যাক্সি থেকে তাঁদেরকে শেখ মুজিবর রহমানের বাসায় নামিয়ে দিয়েছেন। এখন আপনি সে বাসাটা কার তা চিনেন না বলছেন ?

উত্তর ঃ আমি ভুল বলছিলাম।

মঞ্জুর কাদের ঃ আপনার উপর অত্যাচার করা হয়েছে বলে আপনি হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন; কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষায় তা অসত্য প্রমাণিত হয়।

জনাব সালাম খানসহ বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ এই সময় জনাব মঞ্জুর কাদেরের উপরোক্ত প্রশ্নে তীব্র আপত্তি করেন।

জনাব মঞ্জুর কাদেরকে উচ্চ কণ্ঠে বলিতে শোনা যায়;

"আমি সেই সকল ডাক্তারকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ডেকে পাঠাব।"

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ঃ ডাক্তারদের রিপোর্ট কি আপনি দেখেছেন?

সাক্ষী ঃ না স্যার। আমাকে সে সম্পর্কে কিছু জানান হয়নি। হাইকোর্টে পেশকৃত আমার আবেদনটি বাতিল হয়েছে কিনা তা-ও আমি জানি না।

সাক্ষীকে এই সময় খুবই উত্তেজিত দেখাইতেছিল। তিনি বারবার বামদিকে তাকাইতেছিলেন।

সালাম খানের জেরা

অতঃপর বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান জেরা শুরু করেন।

সালাম খান ঃ আপনি কবে গ্রেফতার হন? আপনাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়?

উত্তর ঃ ১৯৬৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর আমাকে একজন সামরিক অফিসারসহ পুলিস গ্রেফতার করে সিটি গোয়েন্দা অফিসে নিয়ে যায়। সেখান থেকে আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠান হয়। পরের দিন অথবা ১১ তারিখে আমাকে আবার গোয়েন্দা অফিসে নেওয়া হয়। আজকে ১৮ কিম্বা ১৯ তারিখে পুনরায় কারাগারে ফেরত পাঠান হয়।

চেয়ারম্যান ঃ সেখানে কি আপনার উপর নির্যাতন করা হয়েছিল?

উত্তর ঃ সেখানে আমাকে ৭/৮ দিন যাবৎ সারা দিনরাত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সাক্ষীকে এই সময় খুবই ভীত সন্ত্রস্ত মনে হইতেছিল। সাক্ষী প্রথমে বলেন যে, তাঁকে দৈহিক নির্যাতন করা হয় নাই।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর পরবর্তী প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, "হ্যাঁ, আমাকে সামান্য মারধর করা হয়।"

সালাম খানঃ কে মারধর করেছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ স্যার....। লেঃ শরীফ, ক্যাপ্টেন সুলতান মাত্র একদিন। ... যতদূর আমার মনে পড়ে। মারপিট করেছিলেন ...।

প্রশ্ন ঃ আপনার জীপের নম্বর কি ছিল?

উত্তর ঃ ঢাকা ৯১৩৯।

প্রশ্ন ঃ ড্রাইভারের নাম কি?

উত্তর ঃ নওয়াব আলী।

প্রশ্ন ঃ জীপ কোথায় রাখা হতো?

উত্তর ঃ ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় জনাব কে জি আহমদের বাসায়... দু'এক মাস সেখানে ছিল।

এই পর্যায়ে সাক্ষী জনাব কামালুদ্দীন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করেনঃ

"স্যার 'হোষ্টাইল সাক্ষী' মানে কি ? যদি আমি হোষ্টাইল সাক্ষী হই তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণের পর যেন আমাকে সামরিক হেফাজতে আর পাঠান না হয়। আমি ঘরে যেতে চাই। সামরিক হেফাজতে আর যেতে চাই না। আর আমাকে আমার আইনজ্ঞের সঙ্গে কথা বলতে দিন।

সাক্ষী পুনরায় বারবার তাঁহার বাম দিকে লক্ষ্য করিতে দেখা যায়। সাক্ষী ভীত চক্ষে চতুর্দিকে তাকাইতে থাকেন। কম্পিত কণ্ঠে সাক্ষী বলেন ঃ

'আমি তাঁদের লোক ঃ তাঁরা যদি আমাকে হোষ্টাইল করে ...'।

এই সময় সাক্ষীকে 'হোষ্টাইল' সাক্ষীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান জনাব এস,এ রহমান জানান যে, ইহাতে তাঁহার সংকিত হইবার কিছুই নাই। তাহার কোন ক্ষতি হইবে না।

সাক্ষী ঃ তা হলে স্যার আমার আরও কিছু বলার আছে।

সালাম খানঃ কামালুদ্দীন সাহেব মনে হচ্ছে আপনি সন্ত্রস্ত...আপনি বাড়ী যেতে চান?

সাক্ষী ঃ হ্যাঁ ,আমি বাড়ী যেতে চাই–অন্য কোন হেফাজতে নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে যখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়–আপনাকে দিয়ে কিছু সই করিয়েছিল তারা?

উত্তর ঃ জি হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে কিসে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?
উত্তর ঃ জীপে করে।
প্রশ্ন ঃ প্রথমে আপনাকে কোথায় নেয়া হয়?
উত্তর ঃ প্রথমে আমাকে 'হোয়াইট হাউস'– সিদ্ধেশ্বরীতে ঢাকা শহর গোয়েন্দা অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে আমাকে একজন নৌ ও একজন সামরিক অফিসারের হাতে তুলে দেয়া হয়। সেসময় গোয়েন্দা বিভাগের ডি এস পি ইয়াসিন ও ইন্সপেক্টর কে, আহমদ উপস্থিত ছিলেন।
সাক্ষীকে এই সময় খুবই উত্তেজিত ও অস্থির দেখা যায়। ভীত চোখে বারবার চারিদিকে তাকাইতে থাকেন। চেয়ারম্যান তাঁহাকে নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে বলেন। সাক্ষী উত্তেজিত কণ্ঠে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানকে কিছু বলিতে চান। সমস্ত আদালত কক্ষে তখন উচ্চ গুঞ্জরণ শোনা যায়।
ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানকে লক্ষ্য করিয়া সাক্ষী কামালুদ্দীন পুনরায় কম্পিত কণ্ঠে বলিতে থাকেনঃ
"স্যার আপনি এখানে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে রয়েছেন,... তারপরে আমার কি হবে?
সালাম খান ঃ আপনাকে মারধর ও নির্যাতন করা হয়েছে। তাই আপনি ভয় পাচ্ছেন। ভয় কিসের।
প্রশ্ন ঃ ১৯৬৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর আপনাকে গোয়েন্দা অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, না?
উত্তর ঃ জী হ্যাঁ।
প্রশ্ন ঃ তারপর আপনাকে সামরিক অফিসারের হাতে তুলে দেওয়া হয়, না?
উত্তর ঃ জী হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন সুলতান, লেঃ শরীফ এবং গোয়েন্দা বিভাগের ডি,এস পি ইয়াসিন ও ইন্সপেক্টর কে, আহমদ সেখানে ছিলেন।
প্রশ্ন ঃ সেখানে আপনাকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হয় কি?
সাক্ষী ঃ নিরুত্তর।
এই সময় জনাব সালাম খান সাক্ষীর লেখা একখানি চিঠি পড়িয়া শোনান। সাক্ষী উহা দেখিয়া স্বীকার করেন উহা ডিসেম্বর মাসে লেখা তাঁহারই চিঠি (১নং চিঠি)। এই চিঠিতে তাঁহার উপর নির্যাতনের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।
চেয়ারম্যান ঃ এই চিঠিতে যাহা লেখা আছে উহা সত্য?
সাক্ষী ঃ (অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করার পর) আমাকে স্মরণ করতে হবে।
সালাম খান ঃ ঐ চিঠিতে আপনি যা লিখেছেন তা সত্য, না মিথ্যা?
উত্তর ঃ (চতুর্দিকে চাহিয়া) আপনারা সবই জানেন স্যার।
এই পর্যায়ে বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী মিঃ টমাস উইলিয়মস দাঁড়াইয়া ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানকে বলেনঃ
"বাহ্যতঃ এটা পরিস্কার যে, সাক্ষী খুবই ভয় পাচ্ছেন।"

চেয়ারম্যান ঃ মিঃ উইলিয়মস আপনি বসুন।
মিঃ উইলিয়মসঃ স্যার, আমি উত্তেজিত হইনি। ... আমি জানতে চাই–এরপরে তার কি হবে?... আদালত থেকে তাঁর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা দরকার।
ইহা বলিয়া মিঃ উইলিয়মস স্বীয় আসন গ্রহণ করেন।
ইতিমধ্যে চেয়ারম্যানকে লক্ষ্য করিয়া সাক্ষী কামালুদ্দীনকে বলিতে শোনা যায়ঃ "স্যার আমি আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।"
চেয়ারম্যান ঃ না, কোন কথা নয়। আপনি ওই চিঠিতে যা লিখেছেন তা সত্য কিনা?
জনাব সালাম খান এই সময় উক্ত চিঠির পরবর্তী অনুচ্ছেদ পড়িয়া শোনাইতে থাকেন– "১৯৬৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর শুক্রবার তাঁরা আমাকে অচেতন অবস্থায় উদ্যত বেয়নেটের মুখে কতকগুলো কাগজে সই করিয়ে নেয়।"
প্রশ্ন ঃ একথা সত্যি কিনা?
উত্তর ঃ আমার মনে পড়ছে না।
সালাম খান ঃ তা পাবেন না। সত্য কথা বলুন।
উত্তর ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ সব সত্য। একশ' ভাগই সত্য।
প্রশ্ন ঃ আপনি কি একটু আগে বলেছেন যে, চিঠির প্রথম অংশে যেসব ঘটনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে তারপর দ্বিতীয় অংশের কথা আপনি আর মনে করতে পারছেন না?
উত্তর ঃ জ্বী হ্যাঁ।
প্রশ্ন ঃ এটা সত্যি?
উত্তর ঃ এটা ১৯৬৭ সালে সত্যি ছিল স্যার। কিন্তু এখন আমি আর রীট আবেদন করতে চাই না।
চেয়ারম্যান ঃ কে আপনাকে হাইকোর্টে রীট করতে বলেছে ?... যেটা ডিসেম্বরে সত্য ছিল, সেটা এখন নয় কেন?
ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান অতঃপর জনাব সালাম খানকে উপরোক্ত চিঠির প্রামাণ্য দাখিলের নির্দেশ দেন।
অতঃপর জনাব সালাম খান সাক্ষী কামালুদ্দীনের (১৯৬৮ সালের ৩রা জুন স্ত্রীর কাছে লেখা-২–নম্বর)
আর একখানি চিঠি সাক্ষীর হাতে তুলিয়া দিয়া উহা পড়িতে বলেন। সাক্ষী উহা সরবে পাঠ করেন।
প্রশ্ন ঃ এটা কোথেকে লিখেছেন?
উত্তর ঃ চর্তুদশ ডিভিশন মেস থেকে।
প্রশ্ন ঃ যা লিখেছেন, তা সত্য?
উত্তর ঃ সবই সত্য।

জনাব সালাম খান গত ২৬শে জুন লিখিত সাক্ষীর আর একখানি চিঠি সাক্ষীকে পড়িতে দেন। সাক্ষী পড়ার পরে তিনি প্রশ্ন করেন যা লিখেছেন, তা সত্য?
উত্তর ঃ জী হ্যাঁ, সব সত্যি।
প্রশ্নঃ চিঠিতে উল্লেখিত মেজর হাসান কে?
উত্তর ঃ মেজর হাসান আমাদের এডমিনিষ্ট্রেটর।
প্রশ্ন ঃ তিনি কি আদালত কক্ষে এখন উপস্থিত আছেন?
সাক্ষী বিব্রত ও হতচকিত হইয়া একবার ডানদিকে ও একবার বামদিকে চাহিয়া জবাব দিলেনঃ
হ্যাঁ।
মেজর হাসান
জনাব সালাম খান তখন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানকে লক্ষ্য করিয়া অনুরোধ করলেন, আমি মেজর হাসানকে একবার দেখতে চাই।
চেয়ারম্যান ঃ 'মেজর হাসান কে, উঠে দাঁড়ান।'
এই সময় চেয়ারম্যানের নির্দেশের পর বাদীপক্ষের কৌসুলীদের সঙ্গে উপবিষ্ট একজন ঘোলাটে কাচের চশমা পরিহিত প্রায় ৬ ফুট লম্বা স্যুট পরিহিত এক ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইলেন।
জনাব মঞ্জুর কাদের তাঁহার পরিচয় প্রদান করেন।
অতঃপর জনাব সালাম খান সাক্ষীর লেখা আর একখানি চিঠি জনাব কামালুদ্দীনের হাতে তুলিয়া দেন। ওই চিঠিটিও সাক্ষী পড়িয়া শোনান। সাক্ষী বলেন যে, উহা এ বছর মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে তাঁহার স্বহস্তে লেখা।
জনাব সালাম খান ঃ পুলিস কি আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?
উত্তর ঃ জী হ্যাঁ। তারা আমার থেকে কতগুলো নাম লিখে নিয়েছে।
প্রশ্ন ঃ পুলিসের কাছে কি জবানবন্দী দিয়েছিলেন, তা আপনার মনে আছে?
উত্তর ঃ না, আমার মনে নেই। সুলতানউদ্দিনের অনুরোধে আমি ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে জনাব রুহুল কুদ্দুস সি এস পি'র অফিসে পৌঁছে দিয়েছি বলে পুলিসকে বলেছি কিনা, আমার মনে নেই।
প্রশ্ন ঃ পুলিসের কাছে জবানবন্দীতে আপনি বলেছেন কি সুলতানউদ্দীন আপনার শ্যালিকার স্বামী?
উত্তর ঃ না।
জনাব সালাম খান জানান যে, পুলিসের কাছে প্রদত্ত জনাব কামালুদ্দীনের জবানবন্দীতে সুলতানউদ্দীনকে তাঁহার শ্যালিকার স্বামী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।
সাক্ষী আরও বলেন, তিনি পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এমন কিছু বলিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িতেছে না যে, করাচীর সভায় লেঃ মোজাম্মেল তাঁহাকে শেখ মুজিবর রহমান ও জনাব এ এফ রহমান সি এস পি'র নাম বলিয়াছিলেন।

অতঃপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব সালাম খান সাক্ষীকে আবার প্রশ্ন করেনঃ "আপনি কি বাড়ী যেতে চান, না সামরিক হেফাজতে ফিরে যেতে চান?"
সাক্ষী ঃ আমি বাড়ী যেতে চাই।
জনাব সালাম খান তখন ট্রাইব্যুনালকে উদ্দেশ করিয়া বলেন,"সাক্ষীকে বাড়ী ফিরে যেতে দেয়া হবে এই নিশ্চয়তা আজ আপনাদের দিতে হবে।"
'আমার স্বামীকে ফিরিয়ে নিতে চাই'
ঠিক এই সময় দর্শকদের গ্যালারী হইতে জনৈকা মহিলাকে উদভ্রান্ত অবস্থায় চিৎকার করিয়া বলিতে শোনা যায়, "আমার স্বামীকে ফিরিয়ে নিতে চাই।...তাঁকে এখান থেকে যেতে দিন"।
এই সময় আদালত কক্ষে দারুণ উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। সকলের দৃষ্টি তখন পিছনের সারিতে দণ্ডায়মান মহিলার দিকে নিবদ্ধ। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানকে উচ্চকণ্ঠে বলিতে শোনা যায়, আপনারা চুপ করুন, শান্ত হয়ে বসুন।...
জনৈক পুলিস অফিসার মহিলাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করেন। মহিলা পুনর্বার চিৎকার করিয়া বলিতে থাকেন, আমি ন'টি মাস একা বাস করছি।... বাড়ীওয়ালা আমাকে অপমান করে।
সাক্ষী জনাব কামালুদ্দীন কিছুক্ষণের জন্য একবার বাইরে গিয়া পুনরায় কাঠগড়ায় ফিরিয়া আসার পর ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কোথায় যেতে চান?'
সাক্ষী জবাব দেন ঃ 'আমি বাড়ীতে ফিরে যাব।'
অতঃপর চেয়ারম্যান সাক্ষীকে অদ্য (বৃহস্পতিবার) আদালতে হাজির হওয়ার জন্য একজনের সিউরিটি দিয়া বাড়ী যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।
আদালতের অধিবেশনের পর জনাব কামালুদ্দীন স্ত্রী ও ভ্রাতার সহিত বাড়ী চলিয়া যান।
গতকাল বুধবার ১-২০ মিঃ পর্যন্ত আদালতের অধিবেশন চলে। আজ (বৃহস্পতিবার) পুনরায় সাক্ষী জনাব কামালুদ্দিনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান
১লা আগস্ট ১৯৬৮
বাদীপক্ষের সাক্ষী কামাল বিরূপ সাক্ষী ঘোষিত
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী
(স্টাফ রিপোর্টার)
আগরতলা ষড়যন্ত্র নামে পরিচিত "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের" মামলায় গতকাল বুধবার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সরকারপক্ষের প্রধান কৌসুলীর অনুরোধ ক্রমে বাদীপক্ষের ২নং সাক্ষী জনাব কামালউদ্দীনকে বিরূপ সাক্ষী বলে ঘোষণা করেন।

পাকিস্তান নৌবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য জনাব কামালউদ্দীন সরকারপক্ষের ২নং সাক্ষীরূপে গতকাল সাক্ষ্য দিতে এসে প্রথমে দু'জন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে পারলেও পরে অপর ৪ জনকে ভুল সনাক্ত করায় সরকারপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির ট্রাইব্যুনালের কাছে সাক্ষীকে বিরূপ ঘোষণার জন্য আবেদন জানিয়ে বলেন যে, সাক্ষী কর্তৃক অভিযুক্তদের ভুল সনাক্তকরণ ইচ্ছাকৃত।

এই সময় বিবাদীপক্ষের কৌসুলী মিঃ টমাস উইলিয়ামস বলেন যে, ভুল সনাক্তকরণ দ্বারাই প্রতীয়মান হয় না যে,সাক্ষী বাদীপক্ষের প্রতি বিরূপ হয়েছে। বরং প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাদীপক্ষের বিরূপ বক্তব্য পেশের মত অবস্থা তার নেই। যাদের তত্ত্বাবধানে তাকে রাখা হয়েছে তারা হয়ত সাক্ষীর এ অবস্থা করেছে।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে ট্রাইব্যুনাল সাক্ষীকে বাদীপক্ষের বিরূপ সাক্ষী বলে ঘোষণা করেন এবং বাদীপক্ষের কৌসুলীকে জেরা করার অনুমতি দেন। বিরূপ সাক্ষী জনাব কামালউদ্দীনের সাক্ষ্য গ্রহণ গতকাল অসমাপ্ত অবস্থায় ট্রাইব্যুনালের এ দিনের বৈঠক শেষ হয়। তবে সাক্ষীর ইচ্ছাক্রমে তাঁকে বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। অসমাপ্ত সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যাতে সে আজ ট্রাইব্যুনালে হাজির হয় সেজন্য জনৈক আইনজীবী ও তার একজন আত্মীয়ের প্রত্যেককে দশ হাজার টাকার মুচলেকা নেওয়া হয়। গতকাল প্রথমে ১নং একরারী সাক্ষী লেঃ মোজাম্মেল হোসেনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হওয়ার পর বাদীপক্ষের ২নং সাক্ষী জনাব কামালউদ্দীনকে হাজির করা হয়। শপথ গ্রহণের পর কামালউদ্দীন বলেন, আমার পিতা হচ্ছেন মরহুম লাল মিয়া। আমার বয়স ৪১ বছর। গ্রামের নাম রুহিথিয়া, থানা ফেণী এবং জেলা নোয়াখালী। বর্তমান ঠিকানা হচ্ছে ২৯/৩ আউটার সার্কুলার রোড, ঢাকা।

এরপর বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মনজুর কাদের কামালউদ্দীনের জবানবন্দী গ্রহণ করেন।

মনজুর কাদের–আপনি কি নৌবাহিনীতে ছিলেন?

কামাল–আমি ১৯৪৬ সাল হতে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত নৌবাহিনীতে ছিলাম।

মনজুর কাদের–আপনি কিভাবে নৌবাহিনী ত্যাগ করেন?

কামাল–আমি পেনশন নিয়ে নৌবাহিনী ত্যাগ করি।

মনজুর কাদের– নৌবাহিনী ত্যাগের পর আপনি কোথায় বসবাস করতেন?

কামাল–নৌবাহিনী ত্যাগের পর আমি চট্টগ্রামে বসবাস করতাম।

মনজুর কাদের–তার আগে আপনি কোথায় থাকতেন?

কামাল–এর আগে আমি করাচীতে ছিলাম। করাচীতে আমি ৪৭/৬, স্কুল টিচার্স কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটিতে বাস করতাম।

মনজুর কাদের–এটা কার বাড়ী?

কামাল–এটা জনাব কে, জি, আহমদের বাড়ী। তিনি আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। আমি এই বাড়ীর জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিতাম।

মনজুর কাদের–জনাব কে, জি, আহমদ করাচী এলে কোথায় উঠতেন?

কামাল–১৯৬৫ সালের মে মাস পর্যন্ত জনাব কে, জি, আহমদ যখনই করাচীতে আসতেন তিনি আমার বাসায় উঠতেন। তারপর তিনি আর করাচী আসেননি। সাক্ষী কামালউদ্দীন বলেন, অভিযুক্ত সুলতানউদ্দিন আহমদ আমার আত্মীয়। তিনি আমার স্ত্রীর বড় ভাই।

এরপর সাক্ষীকে আসামীর কাঠগড়ায় সুলতানউদ্দিন আহমদকে সনাক্ত করার জন্য বলা হয়। তিনি আসামীর কাঠগড়ার নিকট গিয়ে সকল অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর নজর বুলিয়ে সুলতানউদ্দিন আহমদকে সনাক্ত করেন।

মনজুর কাদের–আপনি অভিযুক্তদের মধ্যে নৌবাহিনীতে ছিল, এরূপ কাউকে চেনেন কি?

কামাল–আমি কতিপয় ব্যক্তিকে চিনি।

মনজুর কাদের– কোন জন তা বলতে পারেন?

কামাল–আমি স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে চিনি।

মনজুর কাদের–আপনি আর কাউকে চিনেন কি না?

সাক্ষী এই সময় পানি খেতে চান। তাকে এক গ্লাস পানি দেয়া হয়। পানি খাওয়ার পর তিনি বলেন, আমি নূর মোহাম্মদকে চিনি।

বিচারপতি এস, এ, রহমান– তিনি কি করতেন?

কামাল–আমি জানি না।

মনজুর কাদের–করাচীতে এদের কারুর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে কি?

কামাল–আমি ১৯৬৪ সালের কোন এক সময়ে করাচী গমন করি। আমার মনে পড়ে যে, তখন আমার শ্যালক সুলতানউদ্দিন আহমদ তার কতিপয় বন্ধুকে করাচীর বাসায় আমন্ত্রণ করতে চেয়েছেন।

মনজুর কাদের–তারপর কি হল?

কামাল–পরদিন তার বাড়ীতে লেঃ মোজাম্মেল হোসেনের আগমন ঘটে। আমি তাকে আগে চাঁদ মিয়া নামে জানতাম। পরে আমি তার নাম মোজাম্মেল বলে জানতে পারি। আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। মোজাম্মেল দরজায় ধাক্কা দেওয়ার পর আমি দরজা খুলে দিই। সে আমাকে বলে যে, সুলতান কোথায় গেছে? আমি তাকে জানাই যে সুলতান বাসায় নেই। মোজাম্মেল বলেন যে, সুলতান অত্যন্ত দায়িত্বহীন। সে কতিপয় বড় বড় অফিসার ও ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করেছে কিন্তু সে নিজেই অনুপস্থিত। এই সময় একখানা ট্যাক্সি এসে হাজির হয়। ঐ ট্যাক্সি হতে লেঃ মোয়াজ্জেম, নূর মোহাম্মদ এবং সুলতান আহমদ বের হয়ে আসে। তারপর আমি হাতমুখ ধোয়ার জন্য গমন করি।

সাক্ষী কামালকে তখন স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, লেঃ মোয়াজ্জেম ও নুর মোহাম্মদকে সনাক্ত করতে বলা হয়।

সাক্ষী বলেন যে, লেঃ মোজাম্মেল অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে নেই। সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকট গমন করে আহমদ ফজলুর রহমানকে দেখিয়ে দেন। বিচারপতি এস এ রহমান আহমদ ফজলুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করেন আপনার নাম কি? তিনি বলেন, আমার নাম আহমদ ফজলুর রহমান। বিচারপতি এম, আর খান বলেন যে, সাক্ষী বোধহয় তাকে নির্দেশ করেনি। বিচারপতি এস, এ, রহমান তখন সাক্ষীর নিকট জানতে চান যে, তিনি আহমদ ফজলুর রহমানকে নির্দেশ করেছেন কিনা। বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব আবদুস সালাম খান তখন আপত্তি উত্থাপন করে বলেন যে, সাক্ষীকে দ্বিতীয়বার সনাক্ত করার কোন সুযোগ দেয়া যেতে পারে না। বিচারপতি এস এ রহমান বলেন, আমি সাক্ষীর কাছ থেকে জেনে নিতে চাচ্ছি যে, তিনি সত্যিই আহমদ ফজলুর রহমানকে নির্দেশ করেছেন কিনা। পুনর্বার সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি হ্যাঁ বলেন। তারপর তিনি বলেন, আমি তাকে লেঃ মোয়াজ্জেম মনে করেছি।

তারপর সাক্ষী সঠিকভাবে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে সনাক্ত করেন। এরপর তিনি প্রাক্তন কর্পোরাল সামাদকে দেখিয়ে দিয়ে বলেন যে, ইনি হচ্ছেন নূর মোহাম্মদ।

মনজুর কাদের–ট্যাক্সি থেকে বেরিয়ে আসার পর কি হল?

কামাল–কিছুক্ষণ পর আরো ৩ ব্যক্তি আগমন করেন। এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান। বাকী দুজনের মধ্যে একজন লম্বা এবং অপরজন বেঁটে। পরে আমি জানতে পারি যে, লম্বা ব্যক্তি হচ্ছেন শেখ মুজিবর রহমান এবং বেঁটে ব্যক্তি হচ্ছেন আহমদ ফজলুর রহমান।

মনজুর কাদের– আপনি কি সেই লম্বা ব্যক্তি ও বেঁটে ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে পারেন? সাক্ষী সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য বলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সকলে দাঁড়াবার পর তিনি তাদের কাঠগড়ার নিকট গিয়ে ঘুরে ঘুরে সকলকে দেখেন। তারপর তিনি সকলকে বসতে বলেন। তিনি বলেন, লম্বা ও বেঁটে তিনি দেখে নিয়েছেন এবার তিনি তাদের মুখ ভাল করে দেখতে চান। তিনি রুহুল কুদ্দুসকে দেখিয়ে বলেন, ইনি হচ্ছেন আহমদ ফজলুর রহমান এবং সার্জেন্ট জহুরুল হককে দেখিয়ে বলেন, ইনিই হচ্ছেন সেই লম্বা ব্যক্তি।

সাক্ষী বলেন, আমি যখন চা পান করছিলাম তখন সুলতানউদ্দিন ও মোজাম্মেল আমাকে জিজ্ঞেস করে যে, যারা এখানে এসেছেন আমি তাদের সাথে পরিচিত হতে ইচ্ছুক কিনা। আমি তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করি। আমি তাদের নিকট গিয়ে সালাম দিয়ে বের হয়ে যাই।

মনজুর কাদের– নৌবাহিনী ত্যাগ করার পর আপনি কি কাজ করতেন?

কামাল– নৌবাহিনী ত্যাগ করার পর আমি চট্টগ্রামে স্ক্যাপের ব্যবসায় শুরু করি।

মনজুর কাদের– আপনার পরিবার তখন কোথায় ছিল?

কামাল– করাচীতে।

মনজুর কাদের–চট্টগ্রামে আপনার কোন অফিস ছিল কিনা?

কামাল– সেখানে সরকারী রেস্ট হাউসে ২৪ নম্বর কক্ষে আমার একটি অফিস ছিল। আমি নিজেও সেখানে বসবাস করতাম।

মনজুর কাদের–এরপর আপনি করাচী গমন করেছিলেন কি?

কামাল–১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে আমি করাচী গমন করি। বিমানবন্দরে আমার শ্যালক সুলতানউদ্দিন আমাকে অভ্যর্থনা জানায়। আমরা সেখান থেকে একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করি। সুলতানউদ্দিন আমাকে বলে যে, সে কারসাজ এস্টাব্লিশমেন্টে মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসায় নেমে যাবে। তখন ট্যাক্সি কারসাজের একটি বাড়ীর সামনে এসে থামে। ওটা মোয়াজ্জেমের বাড়ী বলে আমার মনে হয়েছে। ট্যাক্সি যখন ওখানে গিয়ে থামে তখন ৭/৮ ব্যক্তিকে ওই বাড়ী হতে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। এদের মধ্যে চাঁদ মিয়া অর্থাৎ লেঃ মোজাম্মেল ছিল। সুলতানউদ্দিন আহমদ আমাকে জানায় যে, সেখানে তার বন্ধুদের একটি পার্টিতে সে নিমন্ত্রিত। কিন্তু তিনি লোকজনদের বাড়ী হতে বের হয়ে আসতে দেখে আর ট্যাক্সি হতে নামেন নি।

মনজুর কাদের–আপনি কখনও ঢাকা এসেছিলেন?

কামাল–হ্যাঁ।

মনজুর কাদের–আপনার কোন কাজ ছিল?

কামাল–হ্যাঁ।

সাক্ষী এই সময় অত্যন্ত ধীরে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। তিনি তখন দুই মিনিট বসবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি কপালে হাত দিয়ে দু' মিনিট কাঠগড়ায় একটা টুলের উপর বসেন।

দু' মিনিট পর তিনি দাঁড়িয়ে বলেন, আমি ঢাকা এসেছিলাম। নারায়ণগঞ্জে আমার একটা জরুরী কাজ ছিল। ঢাকায় অবস্থান কালে আমি আমার ভাইয়ের গোপীবাগের বাসায় উঠি। একদিন আমি যখন ভাইয়ের বাসা হতে বেরিয়ে আসছিলাম তখন তিন ব্যক্তিকে দেখতে পাই। এদের মধ্যে আমার শ্যালক সুলতানউদ্দিন, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও বেঁটে, কালো ও মাথায় টাকওয়লা অপর এক ব্যক্তি ছিলেন। আমি তার নাম জানতাম না। তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আমি জানাই যে, আমার এখন সময় নাই। আমি একখানা ট্যাক্সি আনিয়ে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম। তারা তখন ঐ ট্যাক্সিতে উঠে বসেন।

মনজুর কাদের–তারা কোথায় যেতে চেয়েছিলেন?
কামাল–ধানমন্ডি। সুলতানউদ্দিন বলে যে, সেখানে তাদের একটা জরুরী কাজ আছে। কি কাজ তা আমি জানি না। ট্যাক্সিতে অবস্থানকালে বেঁটে টাকওয়ালা ব্যক্তি কিছু বলছিলেন। তাতে "শেখ" শব্দটির উল্লেখ ছিল। আমি তাদের ধানমণ্ডির রক্সি হোটেলের কোনায় নামিয়ে দেই। আমি তাদের একটা বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেখি। ঐ বাড়ীটা কার তা আমি জানি না।
মনজুর কাদের–আপনি কোন গাড়ী ক্রয় করেছিলেন?
কামাল–১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে ব্যবসার কাজের জন্য আমি একখানা জীপ ক্রয় করি।
মনজুর কাদের– আপনার কোন অফিস ছিল কি?
কামাল–হ্যাঁ ।
মনজুর কাদের–কোথায়?
কামাল–১৬নং দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায়।
তিনি আরও বলেন, ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে আমি ঢাকায় একদিন যখন আমার নিজের জীপে করে অফিসে যাচ্ছিলাম সুলতানউদ্দিন আমাকে অনুরোধ করে আমি যেন স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে সিএসপি অফিসার রুহুল কুদ্দুসের অফিসে নামিয়ে দিয়ে যাই।
মনজুর কাদের–তারপর?
অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর সাক্ষী বলেন যে, আমি স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে জীপে তুলে নিয়ে ইপিআইডিসি হাউসের কাছাকাছি নামিয়ে দিয়ে যাই।
সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সালের আগস্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসে একদিন আমাকে অনুরোধ করে যে, আমি যেন লেঃ মোয়াজ্জেমের ভাইয়ের জন্য লঞ্চ ও বাজ যোগাড় করার ব্যাপারে আমার প্রভাব খাটাই। মোয়াজ্জেমের ভাই তখন ব্যবসায় শুরু করেছে।
মঞ্জুর কাদির–আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কোন বিবৃতি দিয়েছেন?
কামাল–হ্যাঁ। ১৯৬৮ সালের ৬ই মার্চ বিবৃতি দেই ।
মঞ্জুর কাদির– ঢাকায়?
কামাল– হ্যাঁ। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সেটা হচ্ছে শপথে আবদ্ধ হওয়ার বিবৃতি।
কাদের–আপনি এখন কোথায় অবস্থান করছেন?
কামাল–ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ডিভ মেসে।
কাদের–আপনার নিজের অনুরোধে?
কামাল–হ্যাঁ–আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে এখানে রাখা হয়নি।
বাদীপক্ষের কৌসুলী এই সময় ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করেন যে, তিনি সনাক্তকরণের ব্যাপারে সাক্ষীকে সওয়াল করতে চান। বিচারপতি এস এ

রহমান জানতে চান যে, বাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীকে বিরূপ সাক্ষী ঘোষণা করতে চান কিনা।
জনাব মঞ্জুর কাদির তখন সাক্ষী কামালকে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে পাঠাতে অনুরোধ জানান। সাক্ষীকে কয়েক মিনিটের জন্য আদালত কক্ষের বাইরে পাঠান হয়।
জনাব মঞ্জুর কাদির তখন বলেন যে, সাক্ষী যখন অভিযুক্তদের সনাক্ত করার জন্য আসামীদের কাঠগড়ার নিকট গমন করেন তখন তিনি ভুল করে এ এফ রহমানকে মোয়াজ্জম হোসেন বলে নির্দেশ করেন। পরে তিনি জানতে পারেন যে, তিনি যাকে নির্দেশ করেছেন তিনি হচ্ছেন এ এফ রহমান। কারণ আদালতে যখন তার নাম জানতে চান তখন তিনি নিজেই তার নাম বলেন। তারপর তিনি রুহুল কুদ্দুসকে দেখিয়ে বলেন যে, ইনি হচ্ছেন এ এফ রহমান।
জনাব মঞ্জুর কাদির বলেন, সাক্ষী ইচ্ছাকৃতভাবেই ভুল সনাক্ত করেছেন। কাজেই সাক্ষীকে বিরূপ ঘোষণা করে সওয়াল করার জন্য তাকে অনুমতি দেওয়া হউক।
শেখ মুজিবরের কৌসুলী টমাস উইলিয়ামস তখন বলেন যে, যা ঘটেছে তাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, সাক্ষী বাদীপক্ষের প্রতি নারাজ। এই ঘটনা হতে অপর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা হচ্ছে, সাক্ষী বাদীপক্ষের বিরুদ্ধে জবানবন্দী দেওয়ার মত সুস্থ অবস্থায় নেই।
তিনি আরও বলেন, যেসব ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সে ছিল তারাই হয়ত তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তার মানসিক ক্ষমতা এতে বিনষ্ট হয়েছে। কারণ তার চেহারা এবং কার্যকলাপই তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে।
মিঃ উইলিয়ামস-এর আপত্তি শ্রবণের পর ট্রাইব্যুনাল অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই সাক্ষীকে বিরূপ সাক্ষী ঘোষণার ব্যাপারে যে আইনসঙ্গত কারণ রয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। তাকে বাদীপক্ষের প্রতি নারাজ ঘোষণা করা হল। সাক্ষীকে সওয়াল করার জন্য বাদীপক্ষের কৌসুলীকে অনুমতি দেওয়া হল।

মঞ্জুর কাদিরের জেরা

কাদির–আপনি কাঠগড়ায় অভিযুক্তদের ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল সনাক্ত করেছেন কিনা?
কামাল–একথা সত্য নয়।
কাদির –আপনি খবরের কাগজ পড়েন কি?
কামাল– সময় সময় পড়ি।
কাদের–আপনি শেখ মুজিবর রহমানকে চেনেন?

কামাল–আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে আমি শেখ মুজিবর রহমানের নাম শুনেছি। তবে আমি কখনও তার ছবি দেখিনি।
সাক্ষী–নিজ থেকেই বলেন, আমি জন্ম হতেই মুসলিম লীগে রয়েছি এবং বিরোধীদলগুলোর বিরুদ্ধে রয়েছি।
কাদির–আপনি কখনও জনসভায় শেখ মুজিবর রহমানকে দেখেছেন?
কামাল–না। আমি গত ৫ বছরেও তাকে কোথায়ও দেখিনি।
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সঠিকভাবে সনাক্ত না করতে পারার কারণ হচ্ছে আমি আগে তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখেছিলাম।
মনজুর কাদের–আপনি কি ইচ্ছা করেই তাকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন নি?
কামাল–একথা ঠিক নয়।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, আমি যখন শেখ মুজিবর রহমানকে সনাক্ত করতে চেষ্টা করছিলাম তখন আমি কাঠগড়ায় একজনের প্রতি নির্দেশ করি। তার নাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, তার নাম হচ্ছে এ এফ রহমান। তারপর আমি আমার জবানবন্দীতে দুজনের নাম উল্লেখ করেছি–একজন লম্বা ও একজন বেঁটে। আমি বলেছি যে, বেঁটে ব্যক্তি হচ্ছেন এ, এফ রহমান এবং লম্বা ব্যক্তি হচ্ছেন শেখ মুজিবর রহমান। তারপর আমি এ এফ রহমানকে সনাক্ত করি। আমি রুহুল কুদ্দুসের প্রতি নির্দেশ করে তাকে এ, এফ রহমান বলি। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আমার বিবৃতিতে আমি বলেছিলাম, ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে ৩ ব্যক্তি তাদেরকে ধানমণ্ডিতে শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ীতে পৌঁছে দেবার জন্য আমাকে বলেছিল। আজ আমি বলেছি যে, তারা কি উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ীতে যেতে চেয়েছেন তা আমি জানি না। একথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আজ আমি একটা ভুল করেছি। প্রকৃত অবস্থা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে লিপিবদ্ধ আছে।

সাক্ষীকে এই সময় কিছুটা সবল বলে মনে হচ্ছিল। তিনি বলেন, ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার পক্ষ থেকে হাইকোর্টে একটা দরখাস্ত করা হয়েছিল। তাতে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, আমাকে নির্যাতন করা হয়েছে। তারপর ৫ জন ডাক্তারের সমবায়ে গঠিত একটি মেডিক্যাল বোর্ড আদালতের নির্দেশে আমাকে পরীক্ষা করেন। আমি উক্ত বোর্ডের রিপোর্ট এবং হাইকোর্টে আমার আবেদন খারিজ হয়েছে কিনা কিছুই জানি না।

সাক্ষী কামাল বলেন, ১৯৬৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে। পুলিশের সঙ্গে সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। আমাকে তারপর সিটির স্পেশাল ব্রাঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান হতে আমাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠান হয়। ১০ অথবা ১১ই ডিসেম্বর আমাকে এস বি'তে নিয়ে আসা হয়। ১৮ই অথবা ১৯ শে ডিসেম্বর পুনরায় সেন্ট্রাল

জেলে প্রেরণ করে। উক্ত সময়ে তারা আমাকে দিনরাত্রি সারাক্ষণ প্রশ্ন করেন। ৭/৮ দিন এরূপ চলে। আমাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়নি।
সাক্ষী বলেন যে, তাকে নির্যাতন করা হয়নি। তারপর আবার বলেন যে, তাকে সামান্য প্রহার করা হয়েছে। পুনরায় বলেন যে, তাকে কয়েকটা চড় মারা হয়। যতদূর মনে পড়ে লেঃ শরীফ ও ক্যাপ্টেন সুলতান আহমদ একদিন চড় মারেন। তিনি বলেন, আমি যে জীপ কিনেছি তার নম্বর হচ্ছে ঢাকা-৯১৩৯। ড্রাইভারের নাম হচ্ছে নওয়াব আলী। আমার মনে হচ্ছে যে, ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে এই জীপ কে, জি, আহমদের ঢাকাস্থ বাসভবনে রাখা হয়। এক মাস বা দু' মাস এটা তার কাছে রাখা হয়।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদিরের জেরা শেষ হলে বিরূপ সাক্ষী জনাব কামালউদ্দীন আহমদ ট্রাইব্যুনালের কাছে কিছু আবেদন জানাবার অনুমতি চেয়ে বলেন যে, তাকে সরকারপক্ষ বিরূপ সাক্ষী ঘোষণা করেছেন। এই বিরূপ ঘোষণার তাৎপর্য কি হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কে তার পক্ষ সমর্থন করবে?

ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান বিরূপ ঘোষণার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দিলে সাক্ষী বলেন যে, সেক্ষেত্রে তাকে যেন সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে সামরিক জিম্মায় পুনরায় না পাঠান হয় তার ব্যবস্থা করা হোক। বিরূপ সাক্ষী জানান যে, তিনি বাড়ী যেতে চান।

অতঃপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান তাকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের উত্তরে জনাব কামালউদ্দীন বলেন, ঢাকা সেন্ট্রাল জেল হতে আমাকে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসে নেওয়ার সময় যে অফিসার সহগামী হয়েছিলেন তিনি জেল-গেটে কাগজপত্র দস্তখত করেছিলেন। আমাকে একটি জীপে করে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর সোমবার আমাকে সিদ্ধেশ্বরী এলাকার সিটি এসবি অফিসে নেওয়া হয়। সেখানে আমাকে দু'জন সামরিক অফিসারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তাদের একজন নৌবাহিনীর ও অপরজন স্থলবাহিনীর। তখন ডিএসপি জনাব ইয়াসিন ও ইন্সপেক্টর জনাব কে আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

এই সময় বিবাদীপক্ষের কৌসুলী কয়েকখানা চিঠি সাক্ষীর হাতে দিয়ে জানতে চান যে, চিঠিগুলো তার স্বহস্তে স্ত্রীর কাছে লিখিত কিনা?

সাক্ষী বহুক্ষণ ইতস্ততঃ করেন এবং ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বারংবার জিজ্ঞাসিত হয়ে শেষে বলেন যে, এগুলো তার লেখা। প্রথম চিঠিটি সম্পর্কে বলেন যে, এখানা ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে লেখা।

বিবাদী কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান প্রথম চিঠির প্রথম ভাগ পড়ে শোনান।

চিঠির এই বক্তব্য সত্য কিনা প্রশ্ন করা হলে সাক্ষী নানাদিকে তাকাতে থাকে এবং বলে, এসব গত ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরের ঘটনা। অন্য উত্তর দিতে সাক্ষী বহুক্ষণ ইতস্ততঃ করে। পরে জানায় যে, তাকে একটু চা দেওয়া হোক। সাক্ষী বহু সময় নিয়ে পরে ট্রাইব্যুনালকে জানায় যে, তার কি হবে? তাকে কি পুনরায় হাজতে পাঠানো হবে? ট্রাইব্যুনাল আশ্বাস দেন যে, সে যা কিছু ট্রাইব্যুনালকে বলবে তার জন্য তার কোন শাস্তি হবে না বা কেহ তাকে নির্যাতন করবে না।

মিঃ টমাস উইলিয়ামস ট্রাইব্যুনালকে বলেন, সাক্ষী নিরাপত্তার নিশ্চয়তা সম্পর্কে ট্রাইব্যুনালের কাছে আশ্বাস পেতে চান।

বিচারপতি জনাব এস এ রহমান বলেন ,তাকে সেই আশ্বাসই দেওয়া হয়েছে।

বিচারপতি জনাব এস এ রহমান বলেন, তাকে সেই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি জনাব এম আর খান সাক্ষীকে বাংলায় বলেন, আপনি এখানে সব নির্ভয়ে বলতে পারেন।

সাক্ষী বলেন যে, যা লেখা হয়েছে তা সত্য। পরে আবার বলেন যে,তবে এসব হাল্কাভাবে করা হয়েছিল–কঠোরভাবে নয়।

জনাব সালাম খান চিঠির পরবর্তী অংশ পাঠ করেন।

বিবাদী কৌসুলী জানতে চান যে, এ বিবরণ সত্য কিনা? সাক্ষী এরপরেও নানা দিকে তাকাতে থাকেন ও পরে বলেন, আমি এসব লিখেছি। তবে এসবের সত্যতা এখন স্মরণ করতে পারছি না। সাক্ষীকে ট্রাইব্যুনাল পুনরায় প্রশ্ন করেন যে, এ বক্তব্য সত্য কিনা। তখন সাক্ষী ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যানের কাছে ৫ মিনিট কিছু জানাতে চান। ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান যা কিছু বলার তা প্রকাশ্যেই বলতে বলেন। সাক্ষী বলেন, আমি বলি না যে এর শতকরা একশ ভাগ সত্য। কিছুক্ষণ থেমে সাক্ষী বলেন, এসব সত্য। কারণ আমার উপর যা যা করা হয়েছিল তা চিঠির প্রথম অংশেই বিস্তারিত বলা আছে। আমার যে কি হয়েছিল তাতে ভুলে গেছি এবং এখন সব ঘটনা মনে করা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর।

বিবাদী কৌসুলী এরপর চিঠিটির বাকী অংশ পড়ে শোনান।

সাক্ষীকে এর সত্যতা জিজ্ঞেস করা হলে এবারও কিছুক্ষণ উত্তরদানে বিরত থেকে সাক্ষী বলেন, এসব ডিসেম্বরে সত্য ছিল। এসব প্রশ্ন এখন আমি তুলতে চাই না।

তারপর ১৯৬৮ সালের ৩রা জুন তার স্ত্রীর কাছে লিখিত আরেকখানা চিঠি দেওয়া হলে তিনি এ চিঠি সম্পর্কে বলেন যে, এটা তার হাতে লেখা ও সহিযুক্ত চিঠি। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ১৪শ ডিভিশন সদর দফতর হতে সে চিঠি

লিখেছেন।তাকে চিঠিখানা পড়ে শোনাতে বলা হলে তিনি জোরে পাঠ করে শোনান। তারপর ১৯৬৮ সালে ২৬শে জুন আরেকখানা চিঠি দেওয়া হলে তাও তিনি পড়ে শোনান। তিনি স্বীকার করেন যে, এ সমস্ত তার স্বহস্তে লিখিত স্ত্রীর কাছে লেখা চিঠি। এর বক্তব্য সত্য। বিবাদী কৌসুলীর প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, চিঠিতে উল্লেখিত মেজর হাসান ট্রাইব্যুনাল কক্ষে উপস্থিত আছেন। কোর্ট মেজর হাসানকে দাঁড়াতে নির্দেশ দিলে তিনি উঠে দাঁড়ান।

বিবাদী কৌসুলী আরো একখানা চিঠি সাক্ষীর হাতে দেন। এর উপরের একদিকে কিছুটা ছেঁড়া। সেখানে কোন তারিখ নেই। তারিখ জানতে চাওয়া হলে সাক্ষী বলেন, এ চিঠিও তারই লেখা। ১৯৬৮ সালের মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে স্ত্রীর কাছে তিনি চিঠি লিখেছিলেন বলে জানান। ক্যান্টনমেন্ট এলাকার সিগনাল মেস-এর এই ভবন থেকেই এ চিঠি তিনি লিখেছিলেন। এর বক্তব্যগুলোও সত্য। বিবাদী কৌসুলীর প্রশ্নের উত্তরে বিরূপ সাক্ষী বলেন, পুলিশ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পুলিশের কাছে আমি কি জবানবন্দী দিয়েছি তা আমার মনে নেই। জনাব রুহুল কুদ্দুসের অফিসে যাওয়ার ব্যাপারে সুলতানউদ্দীন আহমদের অনুরোধে আমি স্টুয়ার্ড মোহাম্মদ মুজিবর রহমানকে মতিঝিল পর্যন্ত লিফট দিয়েছি এ মর্মে কোন কথা আমি পুলিশের কাছে উল্লেখ করেছি কিনা তা আমি মনে করতে পারছি না। (পুলিশের কাছে জবানবন্দীতে এর উল্লেখ নেই)। পুলিশের কাছে জবানবন্দীতে আমি বলিনি যে, সুলতানউদ্দীন আমার স্ত্রীর ভগ্নীর স্বামী।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এ সম্পর্কে জানান, উক্ত জবানবন্দীতে আমরা দেখতে পাই যে তিনি বলেছেন 'সুলতানউদ্দীন আমার স্ত্রীর বড় ভাই' কিন্তু জবানবন্দীর শেষভাগে দু' জায়গায় ব্রাদার-ইন-ল'র পরে ব্রাকেটে 'আমার স্ত্রীর ভগ্নীর স্বামী' উল্লেখ রয়েছে।

করাচী বৈঠকে মোজাম্মেল আমাকে শেখ মুজিবর রহমান ও জনাব এ এফ, রহমানের নাম প্রদান করে একথা আমি পুলিশ অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দীতে বলেছি কিনা তা আমার মনে নেই। (ট্রাইব্যুনাল জানান, এর কোন জবানবন্দীতেই এ সম্পর্কিত ব্যাপারে তিনি মোজাম্মেলের নাম উল্লেখ করেননি)।

তার জেরা শেষ হবার আগেই এদিনের অধিবেশন শেষ হয়।

এর আগে গতকাল শুনানীর শুরুতে একরারী সাক্ষী মোজাম্মেল হোসেনকে তার জবানবন্দীর কপি পড়তে দেওয়া হয় এবং কোনও ভুলত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করে দিতে বলা হয়।

বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মনজুর কাদের উক্ত সাক্ষীর জবানবন্দীর একস্থানে টাইপিং-এর ত্রুটির উল্লেখ করেন। সাক্ষী মোজাম্মেল হোসেন তা

সংশোধন করার পর কতিপয় নতুন বক্তব্য যোগ করতে চাইলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান তাতে আপত্তি প্রদর্শন করেন । তিনি বলেন, সওয়াল জওয়াবের পর সাক্ষী নতুন কথা যোগ করতে পারেন না।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস, এ, রহমান বলেন, সাক্ষী যে নতুন কথা যোগ করতে চাচ্ছেন তা লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে তবে এর ওপর কতখানি গুরুত্ব দেয়া হবে তা যুক্তিতর্কের বিষয়।

সংবাদ

২রা আগস্ট ১৯৬৮

কামাল উদ্দীনের জেরা সমাপ্তঃ

'এখন আমার মনে হইতেছে দেশে আইন আছে' –কামাল উদ্দীন

রাজসাক্ষী আমীর হোসেনের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী চলাকালে গতকাল (বৃহস্পতিবার) এখানে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে বাদীপক্ষের বৈরিতা ভাবাপন্ন (হোষ্টাইল) সাক্ষী জনাব কামালউদ্দীন বলেনঃ "গতকাল পর্যন্ত আমি সন্ত্রাসের মধ্যে কাল কাটাচ্ছিলাম। আজ আমি মুক্ত। শুধুমাত্র স্বগৃহে পৌঁছানোর পরই নিজেকে স্বাভাবিক মনে করছি। স্যার, এখন আমার মনে হচ্ছে, দেশে আইন আছে।" পূর্বের কতিপয় বক্তব্য ও জবানবন্দীর সহিত বর্তমান বক্তব্যের অসামঞ্জস্যের কারণ জানার জন্য জনাব মঞ্জুর কাদের দাবী করিলে সাক্ষী জনাব কামালউদ্দীন উপরোক্ত মন্তব্য করে।

জনাব মঞ্জুর কাদেরের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী জনাব কামালউদ্দীন আরও বলেন যে, তাঁহার উপর নির্যাতন চালাইয়া এবং দেশরক্ষা আইনে আটক ও মৃত্যুর হুমকি দিয়া তাঁহার জবানবন্দী আদায় করা হইয়াছে বলিয়া তিনি যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা মোটেও অসত্য নহে।

জনাব কামাল উদ্দীনের সওয়াল জওয়াবের পর তৃতীয় সাক্ষী ও দ্বিতীয় রাজসাক্ষী জনাব আমীর হোসেনের জেরা শুরু হয়।

গতকাল (বৃহস্পতিবার) পূর্বনির্ধারিত সময় সকাল নয় ঘটিকায় যথারীতি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল মেসে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হয়।'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যের' ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীর সপ্তম অধিবেশনে পূর্ব দিনের জের টানিয়া 'বৈরীভাবাপন্ন সাক্ষী' বলিয়া ঘোষিত ২নং সরকারী সাক্ষী জনাব কামাল উদ্দীনের সাওয়াল জওয়াব চলে। বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান প্রথমে জেরা শুরু করেন পরে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী তাঁহাকে পুনঃপরীক্ষামূলক জেরা করেন।

বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী মিঃ টমাস উইলিয়মস জনাব মঞ্জুর কাদেরের নূতন করিয়া জেরার প্রচেষ্টায় আপত্তি জানান,কিন্তু ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস,এ রহমান এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া জনাব মঞ্জুর কাদেরকে নূতন 'পয়েন্টে' পুনঃপরীক্ষামূলক সওয়াল জওয়াবের অনুমতি দেন।

'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যের' ষড়যন্ত্র মামলায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, তিনজন সি,এস,পি, অফিসার, একজন মেজর, একজন লেঃ কমাণ্ডার, ৫ জন ক্যাপ্টেনসহ মোট ৩৫ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার চলিতেছে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাইয়া পাকিস্তানকে উহার একটি অঞ্চল (পূর্ব পাকিস্তান) হইতে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হইয়াছে। বিগত ১৯শে জুন এই মামলায় প্রথম শুনানী শুরু হয়। সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনাকারীদের নেতৃত্ব করিতেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মঞ্জুর কাদের, অপরদিকে প্রখ্যাত বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়মস কিউ সি এম পি, জনাব সালাম খান, খান বাহাদুর নাজিরউদ্দীন, খান বাহাদুর ইসমাইল, জনাব আতাউর রহমান খানসহ প্রায় ৬০ জন আইনজীবী বিবাদীপক্ষকে সমর্থন করিতেছেন।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, সরকারপক্ষের প্রথম রাজসাক্ষী লেঃ মোজাম্মেলের সওয়াল জওয়াব সমাপ্তির পরে গত পরশু ২ নম্বর সরকারী সাক্ষী জনাব কামালউদ্দীনের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। সাক্ষ্য শুরুর অনতিকাল পরে 'ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল সনাক্ত করণের' অভিযোগে বিবাদীপক্ষের দাবী অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল সাক্ষী কামালউদ্দীনকে' 'বৈরীর' হুমকি দিয়া তাঁহার জবানবন্দী মোটেও অসত্য নহে।

ভাবাপন্ন' সাক্ষী বলিয়া ঘোষণা করেন। ওই দিনই সাক্ষী কামাল উদ্দীনকে ট্রাইব্যুনাল স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেন। গতকাল সাক্ষী কামাল উদ্দীন পুনরায় তাঁহার অসমাপ্ত জেরা সমাপ্ত করার জন্য আদালতে হাজির হন।

কামাল উদ্দীনের জেরা

সাক্ষী কামাল উদ্দীনকে পূর্বদিনের জেরা টানিয়া সর্বপ্রথম বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান জেরা শুরু করেন।

সালাম খানঃ বন্দী অবস্থায় আপনার উপর নির্যাতন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরদানকালে গতকাল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানকে লক্ষ্য করে আপনি কি বলেছিলেন যে, "আদালতে আপনি দশ মিনিট আছেন... তারপর আমার কী হবে?"

উত্তর ঃ জী হ্যাঁ আমি তা বলেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছিলেন যে, আপনি জীপটি কিনেছেন ও কে,জি আহমদের কাছে এক মাসের জন্যে জীপটি রেখেছিলেন?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমি জীপটি কিনি। কিন্তু কি বলেছি আমার মনে নাই।
প্রশ্ন ঃ এটা কি সত্যি যে, আপনি আদৌ জীপটি খরিদ করেননি?
উত্তর ঃ না, সত্য নয়।
প্রশ্ন ঃ সেটা কি নতুন মডেলের ছিল?
উত্তর ঃ জীপটি '৬৫ সালের মডেল ও সেটা অন্য একজনের কাছ থেকে কিনি।
প্রশ্ন ঃ গাড়ীর 'বুলু বুকে' কি আপনি নাম বদলেছেন?
উত্তর ঃ না। তবে 'বুলু বুক' আমার কাছে আছে।
প্রশ্নঃ কার কাছ থেকে সেটা কিনেছিলেন?
উত্তরঃ (কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকার পর) সিলেটের মুসলিম লীগ দলীয় চৌধুরী নামের জনৈক জাতীয় পরিষদ সদস্যের কাছ থেকে।
প্রশ্ন ঃ আপনার ফার্মের সঙ্গে কে,জি আহমদের সম্পর্ক কি ছিল?
উত্তর ঃ প্রথম তিন মাস তিনি ছিলেন আমার কোম্পানীর চেয়ারম্যান আর আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।
প্রশ্ন ঃ রক্সী হোটেলটা কোথায় বলতে পারেন? আর সেটা শেখ মুজিবরের বাসা থেকে কদ্দুর?
উত্তর ঃ রক্সী হোটেল মীরপুর রোডে। শেখ মুজিবরকে আমি চিনি না। কখনো দেখিনি। তাঁর বাসাও আমি চিনি না।
অতঃপর জনাব সালাম খানের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী গোপীবাগের তার বাসস্থান থেকে নারায়ণগঞ্জ ও রক্সী হোটেলের দূরত্ব বর্ণনা করেন।
অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে করাচীর বাসায় দুপুরের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।
প্রশ্ন ঃ কে আপনার দরজা ধাক্কা দিয়েছিলেন?
উত্তর ঃ লেঃ মোজাম্মেল।
প্রশ্ন ঃ সেদিনকার সভা কতক্ষণ চলেছিল ?
উত্তর ঃ বিকেল তিনটে থেকে চারটে। চারটের পর আমি ঘর থেকে বেড়িয়ে যাই।
প্রশ্ন ঃ আপনি শেরশাহ বাজার চেনেন?
উত্তর ঃ চিনি।
প্রশ্ন ঃ করাচী বিমান বন্দর থেকে আপনি ঘরে গিয়েছিলেন কেমন করে?
উত্তর ঃ সুলতানউদ্দীন আমাকে একটি "ইয়েলো ক্যাব" (ট্যাক্সি)-এ করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিমান বন্দরে এসেছিলেন।

প্রশ্ন ঃ তখন বেলা কত?
উত্তর ঃ রাত সোয়া দশটা হবে।
প্রশ্ন ঃ পথে আপনাদের কোন কথা হয়েছিল?
উত্তরঃ না।
কৌঁসুলীর অন্য প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী জানান যে, তিনি করাচীর বাসস্থানের জন্য ১৯৬৫-এর মে মাস পর্যন্ত মোট দেড় শত টাকার ঘর ভাড়ার মধ্যে ৫০ টাকা করিয়া দিয়া আসিয়াছেন বাকী ভাড়া জনাব কে, জি, আহমদ দিতেন।
প্রশ্ন ঃ পুলিসকে আপনি ভাড়া সম্পর্কে কি কিছু বলেছিলেন?
উত্তর ঃ স্যার, পুলিস আমাকে যা জিজ্ঞাস করছে তার জওয়াব দিয়েছি মাত্র।
সাক্ষী বলেন যে, তিনি লেঃ মোজাম্মেলকে চিনতেন।
প্রশ্ন ঃ গতকাল আপনি বলেছিলেন কি যে, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দীন আপনার কাছ থেকে একটি জবানবন্দী নিয়েছেন?
উত্তর ঃ জী হ্যাঁ, ঐ জবানবন্দী ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বিবৃত ৬ই মার্চ ম্যাজিস্ট্রেট গ্রহণ করেন।
প্রশ্ন ঃ আপনি কি বলেননি যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট মেসে থাকার সময় মেজর হাসান ও লেঃ শরীফ প্রায়ই আপনার কাছে আসতেন?
উত্তর ঃ জী হ্যাঁ।
এই সময় জনাব মঞ্জুর কাদের উপরোক্ত প্রশ্নে আপত্তি উত্থাপন করেন।
বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব সালাম খান হাসিয়া মন্তব্য করেন, "মাননীয় বন্ধু ওই দেখা সাক্ষাৎ কোন ষড়যন্ত্রমূলক সভা ছিল না।" অতঃপর তিনি সাক্ষীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করেন ঃ
'তাদের কেউ কি আপনাকে জবানবন্দী দেওয়ার জন্যে বলেছিলেন?
উত্তর ঃ লেঃ শরীফ আমাকে পুলিস ও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দী দিতে বলেন।
প্রশ্ন ঃ আপনাকে কি তখন নির্যাতন করা হয়েছিল?
উত্তর ঃ ঠিক নির্যাতন করা নয়– তবে মারধর করা হত। আর আমাকে দরজা-জানালা বন্ধ আলো-বাতাসহীন একটি বদ্ধ ঘরের মেঝের উপর শুতে হত।
প্রশ্ন ঃ তারা কি আপনাকে সাক্ষী হতে, না আসামী হতে বলেছিল?
উত্তর ঃ নৌবাহিনীর লেঃ কঃ ইকবাল, লেঃ শরীফ, লেঃ শামীম আমার কাছে আসতেন ও আমাকে বলতেন যে, আমি যদি তাঁদের কতগুলো বক্তব্যের সঙ্গে একমত হই, তা হলে আমাকে আরও ভালো অবস্থায় রাখা হবে। কিন্তু আমি তাতে রাজী হইনি। তারপর তারা আমার সিগারেট বন্ধ করে দেয়।
প্রশ্ন ঃ পরে তারা আবার কবে ফিরে এসেছিলেন?
উত্তর ঃ সপ্তাহখানেক পরে লেঃ শরীফ আবার এসেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, যদি আমি জবানবন্দী দিই তা হলে আমাকে আরও সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি রাজী হইনি।

প্রশ্ন ঃ শেষ পর্যন্ত কিভাবে বিবৃতি দিলেন?
উত্তর ঃ তিন-চারদিন পর লেঃ শরীফ একদিন এসে আমাকে সিগন্যাল মেসের একটি ঘরে নিয়ে যান। তিনি আমাকে বলেন, আমি সাক্ষী বা আসামী হতে পারি। তিনি আরও বলেন যে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আমি যদি বিবৃতি দিই তা'হলে আমাকে এখানে রাখা হবে না। সিগন্যাল মেসের ওই ঘরে তিনি আমাকে জনৈক 'কর্ণেল সাব' এর (পরে তাঁকে আমি লেঃ রমীজ বলে জানি) সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।
প্রশ্ন ঃ তারপর সেখানে কি হলো?
উত্তর ঃ লেঃ শরীফ আমাদের জন্যে চা আনতে বলে আমাকে গান গাইতে বললেন।
এই সময় আদালত কক্ষে তুমুল হাস্যরোল শোনা যায়।
প্রশ্ন ঃ আপনি গান গেয়েছিলেন? কি গান ? ইংরেজী না বাংলা?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমি একটা পাঞ্জাবী গান গাই।
আদালত কক্ষে তখন আবার হাস্যরোল শোনা যায়।
প্রশ্ন ঃ সে ঘরে আর কেউ ছিল?
উত্তর ঃ সেখানে উপস্থিত অন্য একজন আমাকে তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে বললেন। আমি রাজী হলাম না। তখন দরজার কাছে দাঁড়ান সুবেদার শফি বলে উঠল, "স্যার, এভাবে সে রাজী হবে না... দাঁড়ান আমি আরও ক'জন লোক নিয়ে আসি ভালো করে 'বানালে' সব মানবে।..." তখন আমি বললাম, "আমি মোরগের এক পা দেখেছি যদিও আর একটা পা তার আছে" এবং আরও বললাম, তারা যা বলবে আমি এখন তাতে রাজী। এর চার-পাঁচদিন পর লেঃ শরীফ আমাকে ৪/৫টি পয়েন্ট দিলেন এবং তার উপর ভিত্তি করে জবানবন্দী দিলাম।
সালাম খান ঃ সে পয়েন্টগুলো কি?
উত্তর ঃ তিনি আমাকে শেখ মুজিবর রহমান ও এ, এফ, রহমান সি, এস, পিকে চিনি এবং তাঁরা আমার বন্ধু বলে বলতে বললেন।
প্রশ্ন ঃ আর কার নাম তিনি উল্লেখ করেছিলেন?
উত্তর ঃ লেঃ শরীফ আমাকে আরও বললেন, আমি যেন বলি যে, জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী আমার চেনা লোক এবং চট্টগ্রামে আমার ঘরে তিনি জেনারেল আযম খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমকেও বন্ধু হিসেবে বলার জন্যে তিনি আমাকে বললেন। আমি তাতে রাজী হইনি। তিনি তখন বললেন,"চিনতে কোন অসুবিধে নেই আমি আপনাকে তাদের সকলেরই ফটো দেখাব।"
পরবর্তীকালে সাক্ষীকে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী বারবার জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় অথবা কাদের কথামত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দী দিয়েছেন?

উত্তরে সাক্ষী তখন বললেন, মৃত্যুর ভয়ে দেশরক্ষা আইনের ভয়ে এবং রাস্তার ধারে নদীতে ভাসমান একজন তরুণের মৃতদেহ দেখার পর লেঃ শরীফের কথামত আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দী দিই। আমি অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করায় লেঃ শরীফ ও ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে বললেন যে, আদালতের সামনে ওই বিবৃতি আমার নয় বলে বললে আমাকে এক বছরের জন্য ঠেলে দেয়া হবে অথবা কোন খুনের মামলায় জড়িত করা হবে। পরে একজন অফিসার আমার জবানবন্দী লিখতে শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত আমাকে দিয়ে লেখান হয়। মেজর হাসান বলে দিতে লাগলেন ও আমি তা টুকতে থাকলাম।
প্রশ্ন ঃ আদালতে কি এখন মেজর হাসান আছেন?
উত্তর ঃ না, তাকে দেখছি না।
প্রশ্ন ঃ গতকাল আপনি জনাব ফজলুর রহমান সি,এস,পিকে দেখিয়ে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। জনাব ফজলুর রহমান সি,এস,পি তখন নিজের নাম বলেছিলেন। আপনি কি তা শুনেছিলেন?
উত্তর ঃ না স্যার, সেই সময় খুব গণ্ডগোল হচ্ছিল ।
ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ঃ গতকাল আমি যখন জনাব ফজলুর রহমানকে নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম তখন কি আপনি শুনেছিলেন?
উত্তর ঃ মনে নেই স্যার।

মঞ্জুর কাদেরের জেরা

ইহার পর বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী পুনঃপরীক্ষামূলক জেরা করিতে উঠিলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী মিঃ টমাস উইলিয়মস ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলেন যে, যেহেতু সাক্ষীকে বাদীপক্ষের প্রতি 'বৈরী ভাবাপন্ন' (হোষ্টাইল) ঘোষণা করা হইয়াছে সেই হেতু বিবাদীপক্ষের কৌসুলী কর্তৃক জেরাকালে উত্থাপিত বিষয়গুলো লইয়াই জনাব মঞ্জুর কাদের পুনঃপরীক্ষামূলক প্রশ্ন করিতে পারেন– নতুন কোন প্রশ্ন নয়।
ট্রাইব্যুনাল মিঃ উইলিয়মসের এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া জনাব মঞ্জুর কাদেরকে জেরা করিতে বলেন।
মঞ্জুর কাদেরঃ নির্যাতন সংক্রান্ত পত্রটি (EXT DA-6) আপনি স্ত্রীর কাছে লেখেননি? আপনার নির্যাতন সম্পর্কে অভিযোগ আনার জন্যে একটি দলিল তৈরী করেছেন?
উত্তর ঃ না, তা আমার চিঠিরই অংশ। আমি এই চিঠি লিখেছিলাম ইংরেজীতে এইজন্যে যে, যাতে আমার স্ত্রী ভালভাবে আমার আইনজ্ঞের কাছে বক্তব্য হাজির করতে পারেন।
প্রশ্ন ঃ আপনি চিঠি লেখার কাগজ কলম কোথায় পেয়ে ছিলেন?
উত্তর ঃ কলম আমার কাছে ছিল–কাগজ কোথায় পেয়েছিলাম মনে নেই।
প্রশ্ন ঃ কিভাবে চিঠিখানি আপনার স্ত্রীর কাছে পাঠালেন?
উত্তর ঃ জেল গেটে সাক্ষাতের সময় আমার স্ত্রীর হাতে দিয়ে দিই।

প্রশ্ন ঃ চিঠিখানি হাইকোর্টে রীট করার আগে না পরে লেখা?
উত্তর ঃ ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরের আগে লেখা।
প্রশ্ন ঃ আপনাকে কি ৫জন ডাক্তারের মেডিক্যাল বোর্ড পরীক্ষা করে নির্যাতনের কোন চিহ্ন নেই বলে রায় দেন নি?
উত্তর ঃ তারা কি রায় দিয়েছেন আমি জানি না– আমাকে জানান হয়নি, তবে তারা একেকজন করে ঘরে ঢুকেছিলেন, আমি তাদেরকে আমার দেহের আঘাতের চিহ্ন দেখাই।একজন ডাক্তার বলেন,"দেখ কামাল আমি তোমায় স্নেহ করি। কিন্তু আমার হাত-পা বাঁধা। আমার চোখ নেই।
প্রশ্ন ঃ ডাক্তাররা কি আপনার দেহের কোন আঘাতই লক্ষ্য করেননি?
উত্তর ঃ আমি তাদেরকে আমার দেহের আঘাতের কথা বলেছিলাম। ডাক্তাররা তাঁদের চোখ দিয়ে কি দেখেছিলেন তা আমার চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব নয়।
সাক্ষী জানান যে, সামরিক হেফাজতে থাকার পর থেকে গত পরশু পর্যন্ত তার স্ত্রীর সঙ্গে মাত্র তিনবার সাক্ষাৎ হয়।
সাক্ষী কামালউদ্দীন অতঃপর জনাব মঞ্জুর কাদেরের প্রশ্নের জবাবে বলেনঃ
আমার উপর নির্যাতনের অভিযোগ মিথ্যা বা বানোয়াট নয়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত আমার জবানবন্দী আমার নিজের নয়– অন্যদের কথামত লেখা–এ কথাও অসত্য নয়। আমার প্রথম পত্রের প্রথম অংশে লেখা নির্যাতনগুলো বিভিন্ন সময়ের ঘটনা... আমি একদিন জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম পানিতে ভেজা মেঝেতে আমি নগ্ন অবস্থায় পড়ে আছি আর আমার বুড়ো আঙ্গুলে কালির দাগ লেগে আছে।
প্রশ্ন ঃ আপনি আগে যা বলেছেন, তাহলে তা মিথ্যা কথা?
উত্তর ঃ ঘরে ফিরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমি মৃত্যুভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ছিলাম। এখন আমি মুক্ত। ঘরে ফিরে আমি স্বাভাবিক হয়েছি। এখন দেখছি দেশে আইন আছে।

সাক্ষী আরও বলেন,"মিলিটারী অফিসাররা আমাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়ার ভয় দেখান। আমি যে 'স্বাভাবিক' মৃত্যুর কথা বলে ছিলাম তার মানে আমি খুন হয়ে যাব ভেবেছিলাম। গত ২৪শে থেকে ২৮শে জুলাই আমাকে এই সব ভয় দেখান হয়। বিবাদীপক্ষের কৌসুলী আমাকে 'মিথ্যাভাবে' এই অভিযোগ করতে প্ররোচিত করেছেন, এ কথা মোটেই সত্য নয়। আমি যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম তার মর্মকথা ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলামকে জানানোর জন্যে। ডাক্তার ও সামরিক অফিসারদের সম্পর্কে আমি যা বলেছি তা মোটেই মিথ্যা নয়।

জনাব মঞ্জুর কাদেরের অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী জানান যে, তাঁর আইনজ্ঞদের সঙ্গে জেলগেটে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎকারের স্থানটি

জেলের ভিতর যেখানে তিনি থাকতেন সেখান থেকে ৪শত গজ দূরে অবস্থিত। সাক্ষাৎকারী ব্যারিষ্টারদের আমি আমার দেহের আঘাতের চিহ্ন দেখাই।

অতঃপর ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান সাক্ষী কামাল উদ্দীনকে পরবর্তী দিনে তাঁহার সাক্ষ্য রেকর্ড করার জন্য আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়ে চলে যেতে বলেন।

চেয়ারম্যানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাক্ষী জিজ্ঞাসা করেনঃ স্যার,এখন আমার নিরাপত্তার কি হবে? সামরিক হেফাজতে আমার যে জিনিসপত্রগুলো রয়েছে সেগুলি ফিরে পাব কিনা?

উত্তরে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস,এ,রহমান বলেন,"আপনি এখন একজন মুক্ত মানুষ। আপনার জিনিসপত্র সবই ফিরিয়ে দেয়া হবে।"

ইহার পর বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের তৃতীয় সাক্ষী ও দ্বিতীয় রাজসাক্ষী জনাব আমীর হোসেনের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরুর জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান অনুমতি দেওয়ার পর রাজসাক্ষী আমীর হোসেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়ান।

এই সময় জনাব সালাম খান ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের কাছে এই মর্মে আবেদন করেন যে, রাজসাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণকালে যেন মেজর হাসানকে আদালত কক্ষে উপস্থিত থাকিতে না দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে, গতকালের অধিবেশনের প্রথম পর্যায়ে মেজর হাসান আদালত কক্ষে উপস্থিত না থাকিলেও রাজসাক্ষী আমীর হোসেনের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরুর পূর্বে বাদীপক্ষের কৌসুলীদের সঙ্গে আদালত কক্ষে আসন গ্রহণ করেন।

জনাব সালাম খানের আবেদনের পর ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান মেজর হাসানকে আদালত কক্ষ ত্যাগের নির্দেশ দেন। মেজর হাসান এই নির্দেশ শোনার পরই সঙ্গে সঙ্গে আদালত কক্ষ ত্যাগ করেন।

রাজসাক্ষী আমীর হোসেনের সাক্ষ্য

সরকার পক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের রাজসাক্ষী জনাব আমীর হোসেনকে জেরা শুরু করিলে সাক্ষী বলেন ঃ আমি ম্যাটিকুলেশন পাস করেছি। আমি তৃতীয় বিভাগে পাস করি।

আমার নাম হচ্ছে প্রাক্তন কর্পোরাল মোঃ আমীর হোসেন মিয়া, পিতা মৌলবী ফাজেল মোল্লা, বয়স ৩৪, জাতিতে মুসলমান, বাড়ী রূপচরকান্দী, থানা জাঞ্জিরা, জেলা ফরিদপুর।

আমি ১০.০৭.১৯৫২ হইতে ১৯৬৪ সালের আগষ্ট পর্যন্ত পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে বৈমানিক হিসাবে নিযুক্ত ছিলাম। বিমান বাহিনী থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আমি করাচীতে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসে যোগ দিই। বিমান বাহিনীতে চাকুরী করা কালেই আমি অর্থনীতিতে এম,এ পাশ করি।

১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর কিম্বা ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের সহিত আমার বন্ধুত্ব হয় (সাক্ষী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ডকে সঠিকভাবে ষ্টুয়ার্ড মজিবুর রহমানকে সনাক্ত করেন)।

এই সময়ই লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমদের সহিতও আমার পরিচয় হয়। (সাক্ষীকে ডকে সুলতানউদ্দীন আহমদকে সনাক্ত করিতে বলায় তিনি সঠিকভাবে তাঁহাকে সনাক্ত করেন)। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সহিতও আমার পরিচয় হয়। (সাক্ষী সঠিকভাবে অভিযুক্তদের ডকে তাঁহাকে সনাক্ত করেন)।

১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে যা হয় ১৯৬৫ সালের জানুয়ারীতে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও সুলতানউদ্দীন আহমদ আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং আমাকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্যে প্ররোচনা দিতে চেষ্টা করেন। আমার সাথে লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদেরও পরিচয় ছিল। (তিনি সঠিকভাবে অভিযুক্ত নূর মোহাম্মদকে সনাক্ত করেন) আমি পূর্বেই যে দু'জন লোকের নাম করেছি ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও সুলতানউদ্দীন আহমদ আমাকে তাঁদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বুঝিয়ে দেন। তাঁদের কথায় বিশ্বাস করতে না পারায় তাঁরা আমাকে নিয়ে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসস্থান ৭৭/ডি কে,ডি,এ,স্কিমনং ১ ঠিকানার বাড়ীতে নিয়ে যান। ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের কাছে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একজন প্রাক্তন বৈমানিক ও বর্তমানে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান আফিসের একজন কর্মচারী বলে আমার পরিচয় দেন।

এছাড়া ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে আরো জানান যে, তিনি আমাকে তাঁদের আন্দোলন বুঝিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আমি তাঁদের কথায় বিশ্বাস করতে পারিনি। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে বিশ্বাস সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তিনি আমাকে বলেন যে, তিনি কেন্দ্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যদিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে প্রতিরোধ বাহিনী সংগঠন করেছেন। আমি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে তাঁকে এই ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ জিজ্ঞেস করি। তিনি কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানীদের ভাগ্যে যে সমস্ত দুঃখের কারণ ঘটিয়েছেন, তার একটা ফিরিস্তি দেন। তিনি বলেন যে, সরকার পশ্চিম পাকিস্তানীদের সুবিধের জন্যে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ শোষণ করছেন। তিনি আমাকে জানান যে, প্রাক্তন সৈনিক এবং সেনাবাহিনীতে কার্যরত সৈনিকদের নিয়েই এই আন্দোলন গড়া হয়েছে। আমি তার মতে অত্যন্ত বিশ্বাসী হয়ে আন্দোলনে যোগ দিই। এরপর আমি নিয়মিতভাবে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ীতে

তাঁর সাথে দেখা করতে শুরু করি। আমি আর লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ছাড়াও আমাদের এই সব বৈঠকে সুলতানউদ্দীন আহমদ, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, নূর মোহাম্মদ এবং গরিলা বাহিনীর হাবিলদার দলিলুদ্দীনও উপস্থিত থাকতেন। (সাক্ষী সঠিকভাবে ডকে অভিযুক্ত দলিলুদ্দীনকে নির্দেশ করেন)। এই সব বৈঠকে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কি উপায়ে তা হাসিল হবে, সেই সব বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। ১৯৬৫ সালের আগষ্টে আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ী যাই।

তিনি আমাকে গোপনে জানান যে, তিনি ১৯৬৫ সালের ২৮শে আগষ্ট ঢাকাতে পার্টির একটি সভার ব্যবস্থা করবেন। এই সময়ে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সাথে দেখা করার আগে আমি সুলতান উদ্দীন আহমদের কাছ থেকে তিনখানি পত্র পাই। সেই সময় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রচারণা চালাবার জন্যে সুলতান উদ্দীন আহমদ পূর্ব পাকিস্তানে ছুটি ভোগ করছিলেন। তিনি ঢাকা থেকে এই চিঠিগুলি লেখেন। (কৌসুলী সাক্ষীর হাতে দুইখান পত্র প্রদান করেন –উহার একখানিতে ১৩-৮-৬৫ তারিখ এবং অপরখানি তারিখবিহীন)। আমি দুইখানি পত্রই লেখক সুলতান উদ্দীন আহমদের নিকট হইতে পাই। (এই পত্রগুলো Ext, P W 31 এবং P W 32 চিহ্নিত)। Ext P W 31 পত্রের বিষয়বস্তু হইতেছে এই যে, তিনি আন্দোলনের জন্যে ছাত্রসমাজের সাথে কাজ করছেন।

তিনি পত্রে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান কেন পূর্ব পাকিস্তানে আসেননি তার কারণ জানতে চান। তিনি আরো বলেন যে, পত্র পাওয়া মাত্র যেন তাঁকে অবিলম্বে জানান হয়। তিনি আরো জানান যে, তিনি এই আন্দোলনের জন্যে কাজে এগুতে পারছেন না, তবে তিনি আশা করেন যে, ছাত্রসমাজের এ ব্যাপারে কোন ধারণা থাকবে না এবং এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটতে পারে। তিনি জানান যে, এই আন্দোলনের জন্যে তিনি বহু জায়গায় ঘুরেছেন। তাঁর কথায় "এটা বলা নিরর্থক"। তিনি আরো জানান যে, আমি আপনার আসার জন্যে সব রকম ব্যবস্থা করেছি এবং আপনি ২ কিম্বা ৩ দিনের মধ্যে আমাকে জানাবেন। এই পত্রে যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে ঢাকার প্রস্তাবিত সভা অনুষ্ঠান।

ঢাকায় যাওয়ার ব্যবস্থা করা সম্পর্কে যে উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে আন্দোলনের জন্যে প্রস্তাবিত সভা ছাড়াই শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ীতে সভা সম্পর্কে।

পত্রের শেষ ভাগে উল্‌টো পিঠের বাম কোণে তিনি বলেন, তাঁর কাছে আমি যে পত্র লিখবো তাতে যেন আমার ঠিকানা না লিখি। তিনি আমাকে যে ঠিকানা লিখতে বলেন, তা হচ্ছে "মোঃ মতিউর রহমান (এস)" (এবং

"এস" মানে সুলতানউদ্দীন "পথিকাবাস, ৪নং মোমেনপুর, ঢাকা-৫।" (জনাব মঞ্জুর কাদের বলেন যে, এই সব পত্রের ইংরেজী অনুবাদ ইতিমধ্যেই আদালতে পেশ এবং উহাদের কপি বিবাদীপক্ষের মাননীয় কৌসুলীদের সরবরাহ করা হইয়াছে। বিবাদীপক্ষের কৌসুলী বলেন যে, তাঁহারা এখনও কপি পান নাই। অনুবাদের কপি তাঁহাদের অবিলম্বে সরবরাহ করা উচিত। কৌসুলী তৃতীয় পত্রটি সাক্ষীর হাতে দেন। এইপত্রে কোন তারিখ নেই পত্রে Ext PW3/3 চিহ্ন রহিয়াছে) এই তৃতীয় পত্রটিও সুলতান উদ্দীন আমাকে লিখেছে এবং আমি চিঠিটা পেয়েছি। চিঠি ঢাকার মোমেনপুরের একই ঠিকানা হতে লেখা হয়েছে। এ পত্রে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি একটি গোপন প্রেস পেয়েছেন। আন্দোলনের জন্যে সেখানে প্রচারপত্র ছাপা যাবে। পত্রে তিনি লিখেছেন যে, তিনি খুব তাড়াহুড়া করে এই পত্র লিখেছেন। কারণ তিনি ট্রেনে কোথাও যাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন যে,"যাওয়া আসার" জন্য তিনি টিকেটের টাকা পাঠাবেন। যাওয়া আসা মানে করাচী হতে ঢাকা যাওয়া এবং পুনঃপ্রত্যাবর্তন করা। এই পত্রে তিনি বলেন যে, তিনি ১৮ই আগষ্টের মধ্যে টাকা পাঠাবেন। পত্রে তিনি আমাকে করাচীতে কাজ শেষ করে ঢাকায় ফিরে আসা এবং ফিরে আসা সম্পর্কে তার বা পত্রযোগে তাঁকে জানাতে বলেন। তিনি আরও বলেন, "আমি সব ব্যবস্থা করেছি, এজন্যে চিন্তা করো না। নূর মোহাম্মদকে সঙ্গে করে আনবে।"

এই নূর মোহাম্মদ হচ্ছে লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ।

খান বাহাদুর ইসমাইলের আপত্তি

বাংলায় লিখিত চিঠি ইংরেজীতে অনুবাদকালে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন যেভাবে নিজস্ব ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ করিতেছিলেন এবং বাদীপক্ষের কৌসুলী ও ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের প্রশ্নের জবাবে তিনি চিঠিতে উল্লিখিত বিভিন্ন নামের যে ব্যাখ্যাসহ পরিচয় দিতেছিলেন বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ উহাতে ঘোরতর আপত্তি তোলেন। বিবাদীপক্ষের কৌসুলী খান বাহাদুর ইসমাইল ও জনাব আতাউর রহমান খান রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের অনুরূপ পদ্ধতিকে 'অনিয়মিত' বলিয়া বিভিন্ন বার ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কৌসুলী খান বাহাদুর ইসমাইল সাক্ষ্যদান সংক্রান্ত আইন (এভিডেন্স এ্যাক্ট)-এ ৯৩, ৯৫, ৯৮ ধারার সুস্পষ্ট বিধানসমূহ উল্লেখ করিয়া আপত্তি উত্থাপন এবং এ সম্পর্কে ট্রাইব্যুনালের রুলিং প্রার্থনা করেন।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিবাদীপক্ষের এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া রাজসাক্ষী আমীর হোসেনকে আদালতে পেশকৃত দলিলগুলো (চিঠি) পড়িয়া উহার ব্যাখ্যাসহ ইংরেজী অনুবাদ ও মৌখিক সাক্ষ্য প্রদানের অনুমতি দেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের আবেদন মোতাবেক গতকাল ট্রাইব্যুনাল সাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কিত কোন রুলিং প্রদান করেন নাই।

জনাব আমীর হোসেন বলেন, তিনি আরও বলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে আগেই ঢাকায় প্রেরণ করা উচিত। পত্রের শেষে লেখকের কোন নাম নেই তবে 'এস' অক্ষরটি লেখা রয়েছে। ইহার মানে সুলতান উদ্দীন আহমদ। পুনরায় তিনি মোঃ মতিউর রহমান (এস), পথিকাবাস, মোমেনপুর, ঢাকা-৫ এ ঠিকানায় পত্র লিখার নির্দেশ দেন। এ পত্রে তিনি আরও লিখেন যে, এ মতিউর রহমান আমাদের লোক। (এস) অক্ষর হতে তিনি বুঝবেন যে, পত্রটি সুলতানউদ্দীন আহমদের এবং তিনি পত্রটি তাকে দিয়ে দিবেন পত্রটির বিষয়বস্তু পাঠ আমি বলতে পারি যে, ইহা ১৯৬৫ সনের ১৩ই আগষ্টে লেখা পত্রের পরে লেখা হয়েছে। Ext, PW3/3 চিহ্নযুক্ত পত্রের সঙ্গে আমি একটি প্রচারপত্রও পেয়েছি। প্রচারপত্রটি এখানেই রয়েছে। (ইহাতে PW3/4 চিহ্ন রয়েছে) প্রচারপত্রটি অবশ্য আমাদের আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত নহে। Ext, PW3/2 পত্রে সুলতানউদ্দীন জানতে চেয়েছেন যে, তাঁর এতগুলোর পত্রের আমি উত্তর দেইনি কেন। এ পত্রে আমি আরও বলি, "আপনারা ১৪ ও ১৫ তারিখে ঢাকায় আসতে পারেননি। কারণ তিনি (সুলতানউদ্দীন) টাকা সংগ্রহ করতে পারেন নি।" তিনি আরও বলেন যে, আজ আমি ইন্স্যুরেন্সে (ইহার অর্থ ইন্স্যুরকৃত পত্রে) ১৫ শত টাকা পাঠালাম। তিনি আরও বলেন, তুমি যাকে খুশী সঙ্গে নিতে পার। আমাকে উপরের ঠিকানায় জানাবে, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের কি হলো" তিনি জানতে চান। তিনি আরও বলেন যে, ঢাকার বৈঠকে তুমি যা বলবে অবশ্যই সেভাবে ব্যবস্থা করবে।" তিনি আরও বলেন যে, স্থান ঠিক হয়ে রয়েছে। তাঁর মতে ২৮ বা ২৯ তারিখে হলে ভালো হয়। কারণ ৯ই সেপটেম্বর তাঁর ছুটি শেষ। এছাড়া আর কোন ভালো তারিখ পাওয়া যাচ্ছে না। পত্রে তিনি আরও বলেন যে, ২৮ বা ২৯ তারিখে বৈঠক হবে। তিনি আরও বলেন, তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন এবং বলেন, যা করতে হয় তাড়াতাড়ি করো। পত্রের শেষে তিনি, 'সুলতান বলে স্বাক্ষর করেন। পত্রের নীচে একটি নোট দেওয়া আছে তাতে লেখা রয়েছে–টেলিগ্রাম মনি অর্ডারে নূর মোহাম্মদের কাছে আরও ৫ শত টাকা পাঠালাম'। তিনি আরও বলেন, "সব টাকা একত্র পাঠালে ভালো হতো না?" এ নূর মোহাম্মদ হচ্ছে লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ জনাব ইসমাইল (এতে আপত্তি করেন)। আমি যে তিনটি পত্র পেয়েছি উহাদের মধ্যে ইহাই শেষ পত্র।

EXT3/3 পত্রটি খামে করে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে। খামটি এখানেই রয়েছে। (খামে EXT P W 3/5 চিহ্ন রয়েছে)।

দৈনিক পাকিস্তান

২রা আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : একরারী সাক্ষী আমির হোসেনের জেরা

(স্টাফ রিপোর্টার)

"আগরতলা ষড়যন্ত্র" নামে পরিচিত রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলায় গতকাল বৃহস্পতিবার সাক্ষ্য গ্রহণের চতুর্থ দিনে সরকারপক্ষের দু'নং একরারী সাক্ষী জনাব আমীর হোসেন মিয়ার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়।

এর আগে বাদীপক্ষের বিরূপ সাক্ষী জনাব কামালউদ্দীনের জেরা শেষ হয়েছে।

গতকাল একরারী সাক্ষী জনাব আমীর হোসেনের সাক্ষ্য গ্রহণের প্রাক্কালে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান ট্রাইব্যুনালের কাছে এক আবেদনে বলেন যে, প্রথমে অভিযুক্ত ও পরে একরারী হয়ে ক্ষমাপ্রাপ্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণকালে ট্রাইব্যুনাল কক্ষে মেজর হাসান যেন উপস্থিত না থাকেন।

মেজর হাসান গতকাল বিরূপ সাক্ষী কামালউদ্দীনের সাক্ষ্যদান কালে অনুপস্থিত ছিলেন। তবে একরারী সাক্ষী জনাব আমীর হোসেনের সাক্ষ্যদানকালে উপস্থিত হন। ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস এ রহমান বিবাদী কৌসুলীর অনুরোধ গ্রহণ করে তাকে কক্ষের বাইরে যেতে নির্দেশ দিলে মেজর হাসান কক্ষত্যাগ করেন।

এর আগে বিবাদী কৌসুলী মীর্জা গোলাম হাফিজ অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন খন্দকার এ নাজমূল হুদা ও ক্যাপ্টেন এ এন এম নূরুজ্জামানের পক্ষে ট্রাইব্যুনালের নিকট এক আর্জি পেশ করে বলেন, যেহেতু তার মক্কেলদ্বয় সেনাবাহিনীর লোক সেজন্য সেনাবাহিনীর আইন অনুযায়ী তাদের বিচার হওয়া উচিত।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস এ রহমান বলেন, ট্রাইব্যুনাল ইতিমধ্যেই আরেকটি আর্জির ব্যাপারে নির্দেশ দান করেছে যে, এই ট্রাইব্যুনাল শাসনতান্ত্রিক বিষয়ের মধ্যে যাবে না। কাজেই ঐ আদেশও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ট্রাইব্যুনাল মীর্জা গোলাম হাফিজের আর্জি বাতিল করে দেন।

দুই নম্বর একরারী সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া তার জবানবন্দীতে বলেন, আমি ১৯৬৪ সালের ১লা আগস্ট বিমানবাহিনী ত্যাগ করি এবং করাচীর সেন্ট্রাল স্টাটিসটিক্স অফিসে চাকুরীতে যোগ দেই।

তিনি বলেন, ঐ বছরের ডিসেম্বর অথবা পরবর্তী সালের জানুয়ারী মাসে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমদ এবং সীম্যান নূর মোহাম্মদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়।

তিনি বলেন, স্টুয়ার্ড মুজিব ও সুলতানউদ্দীন আহমদ তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে তাকে বুঝান। তাদের কথায় তার দৃঢ় প্রত্যয় না হওয়ায় তারা তাকে লেঃ মোয়াজ্জমের করাচীস্থ কেডিএ স্কীমের এক নম্বর বাড়ীতে নিয়ে যান। মোয়াজ্জম তাকে বলেন যে, তারা পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র হতে পৃথক করার জন্য একটা প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলছেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলবেন। লেঃ মোয়াজ্জম পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুর্দশা বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের কল্যাণের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ শোষণ করছেন।

সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় সুলতানউদ্দীন আহমদ, লেঃ মোয়াজ্জম, সীম্যান নূর মোহাম্মদ ও স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

সাক্ষী বলেন, মোয়াজ্জম তাকে বলেন যে এই সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারী এবং কর্মরত সেনাবাহিনীর লোকদের নিয়ে এই আন্দোলন গড়ে তোলা হচ্ছে। তার এই চিন্তাধারায় আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে এবং আমি এই আন্দোলনে যোগদান করি। এরপর আমি নিয়মিত লেঃ মোয়াজ্জম হোসেনের বাসায় তার সাথে দেখা করতাম। আমি এবং লেঃ মোয়াজ্জম হোসেন ছাড়াও সুলতানউদ্দীন আহমদ, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, নূর মোহাম্মদ এবং সেনাবাহিনীর হাবিলদার দলিলউদ্দীন আমাদের বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন।

সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় দলিলউদ্দীনকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

সাক্ষী তার জবানবন্দীতে বলেন, এই সমস্ত বৈঠকে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কি পদ্ধতির মাধ্যমে এই লক্ষ্য হাসিল করা যাবে তা নিয়ে আলোচনা করতাম।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে আমি লেঃ মোয়াজ্জমের বাড়ী গমন করি। তিনি আমাকে জানান যে, ১৯৬৫ সালের ২৮শে আগস্ট ঢাকায় তিনি পার্টির একটি সভা অনুষ্ঠান করছেন।

আমীর হোসেন মিয়া বলেন, এই উপলক্ষে লেঃ মোয়াজ্জেমের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে আমি সুলতানউদ্দীন আহমদের নিকট হতে তিনখানা পত্র পেয়েছি। সুলতানউদ্দীন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন প্রচার করার জন্য ঐসময় পূর্ব পাকিস্তানে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। ঢাকা হতে এই পত্রগুলো লেখা হয়। এই সময় বাদীপক্ষের কৌসুলী মঞ্জুর কাদির তার হাতে দুখানা পত্র দেন– একখানা পত্রের তারিখ হচ্ছে ১৩-৮-৬৫ এবং অন্য পত্রে কোন তারিখ নেই।

তিনি বলেন, আমি দুখানা পত্রই সুলতানউদ্দীন আহমদের নিকট হতে পেয়েছি। একখানা পত্রের মর্ম হচ্ছে এই যে, সুলতানউদ্দীন জানিয়েছেন যে, তিনি আন্দোলনের জন্য ছাত্রদের মধ্যে কাজ করছেন। স্টুয়ার্ড মুজিবর

রহমান কেন পূর্ব পাকিস্তানে আসে নাই সে কথাও পত্রে সে জানতে চেয়েছে। পত্রে তিনি আরও বলেন যে, আপনি যখনই আমার পত্র পাবেন তখনই তাড়াতাড়ি আমাকে তা জানাবেন। আন্দোলনের কাজে তিনি অগ্রসর হতে পারছেন না বলেও পত্রে উল্লেখ করেন। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ছাত্রসমাজ আমাদের আদর্শ গ্রহণ করবে এবং অনেক কিছুই ঘটতে পারে।

পত্রে তিনি বলেন, আন্দোলনের ব্যাপারে তিনি অনেক জায়গায় গিয়েছেন। তার কথায় বলতে গেলে বলতে হয় "একথা বলা বাহুল্য।" সুলতান পত্রে আরও জানান যে, আমি আপনার আসার সকল ব্যবস্থা করেছি এবং দু'-তিনদিনের মধ্যেই আপনি আমাকে জানাবেন। এই পত্রে এই প্রসঙ্গে যে কথার উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে ঢাকায় প্রস্তাবিত সভা অনুষ্ঠানের কথা। ঢাকা যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে আন্দোলনের জন্য শেখ মুজিবর রহমানের বাসায় প্রস্তাবিত সভা অনুষ্ঠান।

পত্রে তিনি আরও বলেন যে, আমি তাকে যে পত্র লিখব আমি যেন সে পত্রের ঠিকানায় তার নাম না লিখি। আমাকে পত্রে ঠিকানা লেখার জন্য তিনি যে নির্দেশ দেন তাতে–"মোহাম্মদ মতিউর রহমান (এস) (এস–এর অর্থ হচ্ছে সুলতানউদ্দীন), 'পথিকাবাস' চারনং মোমেনপুর, ঢাকা-৫।"

জনাব মঞ্জুর কাদির এই পর্যায়ে বলেন যে, এই সকল পত্রের ইংরেজী তরজমা ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে এবং বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের তার কপি সরবরাহ করা হয়েছে। বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জানান যে, তারা এই পত্রের কপি এখনও পাননি। তাদের অনুবাদের কপি শীঘ্র সরবরাহ করা উচিত। সাক্ষীর হাতে বাদীপক্ষের কৌসুলী তৃতীয় পত্র প্রদান করেন। এই পত্রেও কোন তারিখ নেই। সাক্ষী বলেন, এই পত্রও সুলতানউদ্দীন আহমদ আমাকে লিখেছেন। আমি এই পত্র পেয়েছি। এই পত্র ঢাকা হতে মোমেনপুরের ঠিকানা হতে লেখা হয়েছে। পত্রে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি একটি গোপন ছাপাখানার ব্যবস্থা করেছেন যেখান হতে আন্দোলনের জন্য প্রচারপত্র মুদ্রণ করা যাবে।

পত্রে তিনি আরও বলেন, তিনি অত্যন্ত তাড়াহুড়ার মধ্যে এই পত্র লিখেছেন কারণ তিনি ট্রেনে কতিপয় স্থানে গমন করছেন। পত্রে তিনি আরও বলেন, তিনি টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডারযোগে আসা-যাওয়ার তিনখানা টিকিট পাঠাবেন। তিনি বলেন, এই পত্রে জানান হয় যে, ১৮ই আগস্টের মধ্যে টাকা পাঠাবেন। এই পত্রে তিনি আমাকে করাচীর কাজ শেষ করতে বলেন এবং ঢাকা চলে আসতে বলেন। ঢাকা আসার খবর টেলিগ্রাফ বা পত্রে তাকে জানাবার জন্যও তিনি বলেন।

তিনি পত্রে আরও বলেন, "আমি সকল ব্যবস্থা করেছি, এর জন্য চিন্তা করবেন না। অনুগ্রহ করে নূর মোহাম্মদকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন।" এই নূর

মোহাম্মদের আগে লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদের কথা বলা হয়েছে। বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব ইসমাইল এত আপত্তি প্রদর্শন করেন।

পত্রে তিনি আরও বলেন যে, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে আগেই ঢাকা পাঠান উচিত। এই পত্রের শেষে লেখকদের কোন নাম নেই কিন্তু 'এস' অক্ষরটি লেখা আছে। এস মানে হচ্ছে সুলতানউদ্দীন আহমদ। এইবারও তিনি পত্রে মতিউর রহমান (এস) পথিকাবাস, মোমেনপুর, ঢাকা-৫ ঠিকানায় পত্র লিখতে নির্দেশ দেন। এই পত্রে তিনি লেখেন যে, এই মতিউর রহমান আমাদের লোক এবং চিঠিতে "এস" অক্ষর হতে তিনি বুঝতে পারবেন যে, এই পত্র সুলতানউদ্দীন আহমদের জন্য লেখা হয়েছে এবং তা তার নিকট পৌঁছে দেবেন।

পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করার পর আমি বলতে পারি যে, এই পত্র ১৯৬৫ সালের ১৩ই আগস্টের পত্রের পর লেখা হয়েছে। এই পত্রের সাথে আমি তার নিকট হতে একটা প্রচারপত্র পাই। এই প্রচারপত্র এখানে রয়েছে। এই প্রচারপত্রের অবশ্য আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

আগের একটি পত্রে সুলতানউদ্দীন জানতে চেয়েছেন যে, সে এতগুলো পত্র লেখার পরও আমি কেন উত্তর দেইনি। চিঠিতে আরও বলা হয় যে, সে (সুলতানউদ্দীন) টাকা পাঠাতে পারেনি বলে আমরা ১৪ই ও ১৫ই তারিখে ঢাকা যেতে পারিনি। তিনি পত্রে আরও বলেন, আজ আমি পনেরশ' টাকা ইন্সিরেন্সযোগে (অর্থাৎ ইন্সিওরড লেটার মারফত) পাঠিয়েছি। আপনি যাকে খুশী সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন। তবে উপরোক্ত ঠিকানায় আমাকে তা জানাবেন।

তিনি পত্রে আরও বলেন, 'স্টুয়ার্ড' মুজিবর রহমানের কি হয়েছে? ঢাকায় সভায় আপনি যা বলবেন তা ঠিক করে আসবেন। তিনি আরও জানান যে, জায়গা ঠিক করা হয়েছে। তবে তার কাছে মনে হচ্ছে যে, ২৮শে অথবা ২৯শে তারিখে সভা হলে ভাল হয়। কারণ তার ছুটি ৯ই সেপ্টেম্বর শেষ হবে। এর জন্য আর ভাল তারিখ নেই। এই পত্রে তিনি আরও জানান যে, সভা ২৮শে অথবা ২৯শে তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি পত্রে আরও বলেন যে, তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন এবং বলেন, আপনি যা করবার তাড়াতাড়ি করেন। তিনি পত্রের শেষে 'সুলতান' বলে দস্তখত করেন।পত্রের শেষে নোটে বলা হয়েছে যে, পঁচিশ টাকা নূর মোহাম্মদের নিকট টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডারযোগে পাঠান হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'আমি যদি সব টাকা একত্রে পাঠাতাম এটা ভাল হত না।' এই পত্রে যে নূর মোহাম্মদের কথা বলা হয়েছে তিনি হচ্ছেন লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব ইসমাইল এতে আপত্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, এটা সাক্ষ্যদান আইনের পরিপন্থী। আদালত তার আপত্তি অগ্রাহ্য করেন।

সাক্ষী বলেন, আমি যে তিনখানা পত্র পেয়েছি এটা তার শেষ পত্র। শেষ পত্র খামের মাধ্যমে আমার কাছে আসে। যা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি।

দু'নং একরারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় এদিনের অধিবেশন শেষ হয়।

একরারী সাক্ষী জনাব আমীর হোসেনের সাক্ষ্য গ্রহণের আগে গতকাল প্রথমে বাদীপক্ষের বিরূপ সাক্ষী জনাব কামালউদ্দীন আহমদের অসমাপ্ত সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ করা হয়।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার উত্তরে সাক্ষী জনাব কামালউদ্দীন দশ মিনিট আছি; কিন্তু এরপর বলেন, আগের দিন আমি ট্রাইব্যুনাল সমক্ষে বলেছি যে, এখানে আমি আমার কি অবস্থা হবে।

জীপ কেনা সম্পর্কে সাক্ষী বলেন, এক ব্যক্তির জীপটি সে ক্রয় করেছিল তবে ব্লু বুকে মালিকানার নাম পাল্টানো হয়নি। সিলেটের মুসলিম লীগ দলীয় জনৈক এমএনএ'র কাছ হতে তিনি এই জীপটি ক্রয় করেন। তার নাম স্মরণ করতে পারছেন না তবে নামের শেষে চৌধুরী আছে। সাক্ষী বলেন, জনাব কে জি আহমদ প্রথমে আমাদের কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন ও আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলাম। তিনি তিন মাস আমাদের কর্পোরেশনে ছিলেন।

বিবাদী কৌসুলীর প্রশ্নঃ রক্সি হোটেল কোথায়?

উঃ–মীরপুর রোডে।

প্রঃ– শেখ মুজিবরের বাড়ী হতে রক্সি হোটেল কত দূর?

উঃ– শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ী কোথায় জানি না তাই রক্সি হোটেল সেখান হতে কত দূর তা বলতে পারি না।

প্রঃ– নারায়ণগঞ্জ আপনার গোপীবাগ বাসা হতে কোন দিকে?

উঃ– দক্ষিণ পূর্বদিকে।

প্রঃ– দূরত্ব কত?

উঃ– দশ মাইলের বেশী হবে না।

প্রঃ– গোপীবাগ হতে রক্সি হোটেল কোন দিকে?

উঃ- উত্তর-পশ্চিম দিকে। দূরত্ব কতখানি?

উঃ– প্রায় ৬ মাইল।

এরপর বিবাদী কৌসুলী ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বরে করাচীতে লেঃ মোয়াজ্জমের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত বৈঠক সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সাক্ষী বলেন, ঐদিন দুপুরের খাওয়ার পর আমি ঘুমিয়ে পড়ি। বেলা ৩টার দিকে লেঃ মোয়াজ্জম এসে দরজায় কড়া নাড়েন। কতিপয় ব্যক্তি তথায় আসার পর আমি বেলা ৪টায় বাড়ী হতে বের হয়ে যাই।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, আমি ও সুলতানউদ্দীন আহমদ করাচী এয়ারপোর্ট থেকে একটি হলুদ ট্যাক্সি করে আসি। প্লেন রাত প্রায় সাড়ে ১০টায় করাচী পৌঁছেছিল।

আরেক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, জনাব কে জি আহমদকে আমি ১৯৬৫ সালের জুন পর্যন্ত মোট বাড়ী ভাড়া ১৫০ টাকার মধ্যে আমি ৫০ টাকা করে দিতাম। (১৯৬৫ সালের মে মাসের পরে আর ও বাড়ী যায়নি)। জুন মাসের পর হতে আমি ১৫০ টাকা করে ভাড়া দিতাম।

আরেক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন লেঃ মোজাম্মেল ও আমি পরস্পরকে দীর্ঘ দিন ধরে জানি।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার উত্তরে সাক্ষী জনাব কামালউদ্দীন তার সাক্ষ্যে আরো বলেন, ১৯৬৮ সালের ৬ই মার্চ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বর্তমান মামলা সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেট সমক্ষে আমার এক জবানবন্দী নেওয়া হয়। নৌবাহিনীর লেঃ শরীফ আমাকে প্রথমে পুলিশের কাছে ও পরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিবৃতি দিতে বলেন। সামরিক বাহিনীর হাতে আটক থাকাকালে মেজর হাসান ও লেফটেন্যান্ট শরীফ মাঝে মাঝেই আমার সাথে দেখা করত। এ সময় আমাকে দৈহিকভাবে নির্যাতন করা হত না তবে একটা কক্ষের মেঝেতে ঘুমাতে হত এবং দরজা-জানালা ও ভেন্টিলেটর বন্ধ করে আমাকে রাখা হত।

জেরার উত্তরে সাক্ষী আরো বলেন, নৌবাহিনীর তিনজন অফিসার যথা লেঃ কমান্ডার ইকবাল, লেঃ শরীফ ও লেঃ সামীম আমার সাথে দেখা করে এই আশ্বাস দেন যে, তাদের কতগুলো 'পয়েন্টস' অনুযায়ী আমি বিবৃতি দিতে সম্মত হলে উন্নততর জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি তাদের প্রস্তাবে সম্মত হইনি। এর এক সপ্তাহ পর নেভাল অফিসার লেঃ শরীফ পুনরায় আমার কাছে এসে বলেন যে, আমি যদি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কিছু বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হই তবে আমাকে যে অবস্থায় রাখা হয়েছে তেমন আর রাখা হবে না এবং অন্যত্র নিয়ে ভাল খাবার দেওয়া হবে। এবারও আমি অসম্মতি জানাই এরও ৩/৪ দিন পর লেঃ শরীফ আবার এসে আমাকে সিগনাল মেসে নিয়ে যান এবং এক কক্ষে ঢুকিয়ে আমাকে একজনের সাথে কর্নেল সাব বলে পরিচয় করিয়ে দেন। পরে আমি জেনেছি যে, 'কর্নেল সাব' বলে যাকে পরিচয় করে দেওয়া হয় তিনি প্রকৃতপক্ষে স্থল বাহিনীর লেঃ রমিজ।

এখানে আসার পর লেঃ শরীফ চা আনতে বলেন ও আমাকে একটি গান করতে বলেন। আমি সেখানে একটি গান গেয়েছিলাম–গেয়েছিলাম। একটি পাঞ্জাবী গান। তখন বেলা ১১টা। কয়েকজন ঐকক্ষে আরো ছিলেন; তার মধ্যে একজন লেঃ সামীম ও সাদা পোশাকে একজন সামরিক ব্যক্তি ছিলেন। সাদা পোষাক পরিহিত ব্যক্তি আমাকে তাদের দেওয়া মত বিবৃতি দিতে বলেন। আমি অসম্মতি জানাই। এই সময় দরজায় দাঁড়ানো সুবেদার শফী বলে ওঠেন 'এ লোক সহজে সম্মত হবে না। আমি ৩/৪ জনকে ডেকে আনি দেখবেন তারা একে সম্মত করার ব্যবস্থা করবে।'

এই সময় সাক্ষী বলেন, পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করি এবং পরিণতি ভেবে তাদের ইচ্ছামত বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি হই। আমাকে তখনই কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নেওয়া হয়নি। আমাকে আমার আগের জায়গায় ফেরত পাঠানো হয়। তারপর প্রায় ১৫ দিনের মধ্যে আমার কাছে কেহ আর আসেনি। (এই সময় কোর্ট প্রশ্নটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলে সাক্ষী বলেন যে, কতদিন পর তা স্মরণ নেই পরে বলেন, ৪/৫ দিন পর লেঃ শরীফ আসেন।)

সাক্ষী বলেন, লেঃ শরীফকে আমি বিবৃতিদানে সম্মতির কথা জানালে তিনি আমাকে সিগনালস মেস-এ নিয়ে আসেন ও তথায় আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিবৃতি দেই। লেঃ শরীফ আমাকে ৪/৫টি পয়েন্ট দেন ও তা উল্লেখ করতে বলেন। লেঃ শরীফ আমাকে বলেছেন যে, আমার কেস তিনি পড়ে দেখেছেন এবং আমার বিরুদ্ধে কিছু পাওয়া যায়নি তাই আমাকে বলেন যে, হয় আমি তাদের পয়েন্ট অনুযায়ী বিবৃতি দেব নয়ত ডিপিআর বলে আটক থাকতে হবে। তিনি আমাকে দুটো পয়েন্ট দেন। (সাক্ষী কতিপয় প্রশ্নের পর বলেন, তখনই পয়েন্টগুলো দেওয়া হয়নি তবে তাকে জানান হয় যে, নীতিগতভাবে সাক্ষী সম্মত হলেই পয়েন্টগুলো দেওয়া হবে।)

লেঃ শরীফ আমাকে প্রশ্ন করেন যে, আমি শেখ মুজিবর রহমানকে চিনি কিনা। আমি বলি যে তাকে চিনি না। লেঃ শরীফ আমাকে বলতে বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানকে আমি চিনি ও সে আমার বন্ধু। জনাব এ এফ রহমানকেও আমি জানি ও সেও আমার বন্ধু একথাও বলতে বলা হয়। আমাকে আরো বলতে বলা হয় যে, আমাকে বলতে হবে ফজলুল কাদের চৌধুরীকে আমি চিনি এবং জেনারেল আজম খান চট্টগ্রামে গবর্নমেন্ট রেস্ট হাউসে আমার কামরায় বসে জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাথে বৈঠকে মিলিত হন। আমি এসব বলতে অস্বীকার করি, তার কিছুপর লেঃ শরীফ আবার আমাকে এসে আমাকে বলতে বলেন, আমি লেঃ মোয়াজ্জমকে আমার বন্ধু হিসেবে জানি। আমি এ প্রস্তাবে অসম্মত হই। কারণ হিসেবে বলি যে, নৌবাহিনীতে লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জম একজন বড় অফিসার ও আমি একজন সাধারণ অফিসার ছিলাম। সুতরাং সে আমার বন্ধু হতে পারে না। তখন আমাকে বলতে বলা হয়, 'শেখ মুজিবর রহমান, স্টুয়ার্ড মজিবর, জনাব এ এফ রহমান সিএসপি ও লেঃ মোয়াজ্জম আমার বন্ধু। আমাকে তাদের ফটো দেখানো হবে। কাজেই ঘাবড়াবার কিছু নেই।'

সাক্ষীকে বারবার প্রশ্ন করা হয় যে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সে স্বেচ্ছায় বিবৃতি দিয়েছে না অন্যের পরামর্শে দিয়েছে। বেশকিছু সময় নিয়ে সাক্ষী বলেন, মৃত্যু ভয়, ডিপিআর এবং রাস্তার ধারে যুবকের লাশ যা নদীতে

ভাসমান লাশ দেখার কথা চিন্তা করে আমি লেঃ শরীফের কথামত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিবৃতি দেবার সিদ্ধান্ত করি। আমি একথা বলতে এতক্ষণ সময় নিয়েছি কারণ আমাকে লেঃ শরীফ ও ম্যাজিস্ট্রেট বলেছিলেন যে, ট্রাইব্যুনালকে যদি আমি জানাই যে এ বিবৃতি আমার নয় তবে আমাকে এক বছর সাজা খাটতে হবে বা অন্য খুনী মামলার আসামী করা হবে। এরপর জনৈক অফিসার আমার হয়ে বিবৃতি লিখতে শুরু করেন কিন্তু পরে আমাকে লিখতে বলা হয়। আমি লেখা হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য বলি যে, আমি সঠিকভাবে লিখতে পারছি না। তখন আমাকে ধীরে ধীরে লিখতে বলা হয়।

এই সময় বিবাদী কৌশুলী জনাব সালাম খান প্রশ্ন করেন আজ এখন এই ট্রাইব্যুনাল কক্ষে মেজর হাসান উপস্থিত আছেন কি?

সাক্ষী বলেন, না নেই।

মঞ্জুর কাদিরের অতিরিক্ত জেরা

জনাব কামালউদ্দীনকে অপর কোন বিবাদীপক্ষে কৌসুলী জেরা করেননি। সরকারপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদিরের পুনর্বার জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন, আমার স্ত্রীর কাছেনংরাজীতে লেখা চিঠিটি স্ত্রীর কাছে লেখা চিঠির অংশবিশেষ। ইহা পরে নির্যাতন করার কাহিনী তৈরী করা ডকুমেন্ট নহে। আমার স্ত্রী ইংরেজী জানেন না আমি সাধারণতঃ তাকে ইংরেজীতে চিঠি লিখি না –তাকে বাংলায় চিঠি লিখি। এ চিঠিনংরাজীতে লিখেছিলাম কারণ যাতে সে আমার উকিলের সঙ্গে আমার অবস্থা সম্পর্কে আলাপ করতে পারে আর জন্য কারণনংরাজীতে লিখিত চিঠিতে উকীল আমার সমস্যাদি পূর্ণভাবে বুঝতে সক্ষম হবে। চিঠির গোড়ায় কিছুটা বাংলায় লিখে পরে কেটেছি। কাটা অংশে লেখা আছে "খুকী এ চিঠি ইসলাম সাহেবকে দিও।" পরে এটা কেটে দিই এবং এর সঙ্গে আমার স্ত্রীকে পৃথক চিঠি দেই। কারণ আমি চাইনি যে, উকীল আমার পারিবারিক চিঠি যাতে না দেখে।

সেন্ট্রাল জেলে কি করে সাক্ষী চিঠি লেখার কাগজ যোগাড় করেছিল জিজ্ঞাসা করা হলে সে উত্তর দিতে সময় নেয় ও পরে বলে "আমার স্মরণ নেই।" আমার নিজের কলম ছিল ও তা দিয়ে লিখেছি। আমার স্ত্রী যখন জেলে সাক্ষাৎ করতে আসে তখন তাকে এ চিঠি দিয়েছিলাম। সেন্ট্রাল জেলে আমাকে নির্জন কক্ষে রাখা হত এবং যখন আমি এ চিঠি লিখি তখন কেউ দেখতে পারেনি। এ চিঠি আমার রীট আবেদনের আগে লেখা। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা হাইকোর্ট আমার রীট আবেদন পেশ করা হয়েছিল। হাইকোর্টের নির্দেশক্রমে যে ৫ জন ডাক্তার আমাকে দেখতে আসেন তারা

এক একজন করে আমার কক্ষে আসেন। তাদের আমি দেহের ক্ষত দেখাই। একজন ডাক্তার আমাকে বলেন, "দেখুন কামাল আমি আপনাকে ভালবাসি কিন্তু আমার হাত বাঁধা আর চক্ষু নাই।" অপর ৪ জন ডাক্তারকেও আমার ক্ষতের কথা বলি ও দেখাই। কিন্তু জানি না তারা সেদিকে তাকিয়ে ছিল কিনা। একথা সত্য নয় যে, নির্যাতনের কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিবাদীপক্ষকে সাহায্য করার জন্য তৈরী করা হয়েছে। একথা সত্য নয় যে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আমি অপরের ইচ্ছায় বিবৃতি দিয়েছি বলে আজ যা বলেছি তা মিথ্যা বা বিবাদীদের সাহায্যের জন্য বলেছি। স্ত্রীর কাছেনংরাজীতে লেখা চিঠিতে যে নির্যাতনের কথা বলা হয়েছে তা এক সময় করা হয়নি–বারে বারে করা হয়েছে। সংজ্ঞাহীন হওয়া সম্পর্কে যা বলেছি তার অর্থ হল মাঝে মাঝেই আমি সংজ্ঞাহারা হচ্ছিলাম। একবার সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে দেখি যে আমার বৃদ্ধাঙ্গুলীতে কালির দাগ ও আমি মেঝের ওপর উলঙ্গভাবে শায়িত। মেঝের যেখানে শায়িত ছিলাম তা পানিতে ভেজা। যখন এ অবস্থা দেখি তখন আমার কাঁপুনি শুরু হয়।

জনাব মঞ্জুর কাদিরের জেরার উত্তরে সাক্ষী আরো বলেন, আগের দিন সাক্ষ্যদানকালে আমি খুবই ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছিলাম এবং মনে হচ্ছিল যে, আমার মাথা চেপে কেহ রয়েছে। মিলিটারী অফিসাররা আমাকে ভয় দেখাত যে, আমাকে সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হবে। লেঃ শরীফ আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি আমার ব্যাপারে রাওয়ালপিন্ডি টেলিফোন করেছেন। তিনি আমাকে স্বাভাবিক মৃত্যুর কথাও বলতেন। স্বাভাবিক মৃত্যু বলতে আমাকে খুন করার কথাই বোঝাত। একজন ব্রিগেডিয়ারকে দেখিয়ে লেঃ শরীফ বলতেন যে তার কাছেও আমার কথা বলা হয়েছে। এসব ভীতি প্রদর্শন গত ২৬শে জুলাই হতে শুরু করা হয়। (সাক্ষী পরে সংশোধন করে বলেন, ২৪শে জুলাই হতে ২৮শে জুলাই পর্যন্ত এসব ভীতি দেখানো হয়।)

জনাব মঞ্জুর কাদিরের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, বিবাদীদের প্ররোচনায় আজ এসব মিথ্যা অভিযোগ করছি একথা সত্য নয়। গতকাল বাড়ী যেতে পেরে আজ ট্রাইব্যুনাল কক্ষে বুঝতে পারছি যে, এ দেশে আইন-কানুন আছে। যে ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করেছিলেন ও বলেছিলেন যে, তার চোখ নেই তার নাম আমি জানি না। বিবাদীদের সাহায্য করার জন্য ডাক্তার ও মিলিটারী অফিসারদের বিরুদ্ধে আজ আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছি একথা সত্য নয়।

সাক্ষীর সাক্ষ্য সমাপ্ত হলে তাকে আজ শুক্রবার তার সাক্ষ্যে দস্তখত করার জন্য আসতে কোর্ট নির্দেশ দেন।

আজাদ

৩রা আগস্ট ১৯৬৮

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের নিকট শেখ মুজিবের কতিপয় অভিযোগ পেশ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন গতকাল শুক্রবার শুরু হইবার পরই এক নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবর রহমান ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের নিকট অভিযোগ করেন যে, পাঞ্জাব রেজিমেন্ট মেসে অবস্থানরত অভিযুক্তদের যে খাদ্য দেওয়া হইতেছে, তাহা তাহারা গ্রহণ করিতে অনভস্ত। "স্থানীয় খাদ্য" চাহিয়াও তাহারা পান নাই।

ট্রাইব্যুনালের নিকট এই অভিযোগ করার সময় রেলিংঘেরা কাঠগড়ার মধ্যে সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিই তাঁহার সাথে দাঁড়াইয়াছিলেন। বিচারপতিগণ তাঁহার সমস্ত অভিযোগ শ্রবণ করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, এই খাদ্য আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিতে পারে। প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের জন্য ভিন্ন পাচক দিবার কথায় রাজী হইয়াছিলেন। তবে পাচকের বেতন তাহাদের দিতে হইবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের জন্য একজন পাচক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি আরও বলেন, অভিযুক্তদের তত্ত্বাবধায়ক মেজর নাসেরকে এই বিষয় বলা হইয়াছিল কিন্তু তিনি উত্তর দেন যে যদি অভিযুক্তগণ এই খাদ্য পছন্দ না করেন,তবে তাহারা খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করিতে পারেন।

তিনি বলেন, যদি আমরা অনশন ধর্ম্মঘট করি, তবে আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত ইহা ট্রাইব্যুনালের কার্য্যক্রম ব্যাহত করিবে।

শেখ মুজিব ট্রাইব্যুনালকে আর একটি অসুবিধার কথা জানান এবং বলেন যে, পরস্পরকে সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় না এবং বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হয়। তাঁহাকে বারান্দায় যাইতে দেওয়া হয়। কিন্তু অন্যান্যদের বারান্দায় যাইতে সুযোগ দেওয়া হয় না।

তিনি বলেন, উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে মেজর নাসের বলেন যে, 'আমিই কর্ত্তৃপক্ষ।' শেখ মুজিব বলেন, আমি দশ বছর জেলে কাটাইয়াছি। এই জাতীয় ব্যবহার আশা করি না।

শেখ মুজিব ট্রাইব্যুনালের নিকট বলেন যে, অভিযুক্তদের বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখার বিধি নাই।

তিনি এই সমস্ত অসুবিধা দূর করার জন্য আবেদন জানান।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান জনাব রহমান বলেন যে, অভিযুক্তগণ সামরিক তত্ত্বাবধানে রহিয়াছেন।তাহাদের নিজস্ব বিধি রহিয়াছে। অভিযুক্তদের খাদ্যের ব্যাপারে ন্যায্য দাবী পূরণ করা উচিত হইবে। আমি ইহা জানাইব।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব কাদের বলেন যে, তিনি শেখ মুজিবর রহমানের বক্তব্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট জানাইবেন এবং এই সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ট্রাইব্যুনালকে জ্ঞাত করিবেন।

Pakistan Observer

3rd August 1968

Mujib complains of segregation, diet

(By A Staff Correspondent)

Sheikh Mujibur Rahman, now on trial in the case State versus Sheikh Mujibur Rahman and others, being heard by the Special Tribunal, made a prayer on Friday to the tribunal about the difficulties being faced by the accused in the case at their place of detention.

He complained to the Court that the accused were being given food to which they were not accustomed and, secondly, they were kept segregated.

As the sitting of the Court began on Friday morning all the accused stood up and Sheikh Mujibur Rahman sought the permission from the Chairman, Mr. Justice S. A. Rahman, to make some submission. On being permitted, Sheikh Mujibur Rahman said that during the seven months that the accused were in detention in military custody, they were being served food which was not local and to which they were not accustomed. This had affected the health of some of the accused, Sheikh Mujibur Rahman said.

Continuing, he said that the accused had made a representation to the deraining authority and Major A. B. Naser had told them that arrangements for appointing a local cook would be made so that local could be prepared for the accused. After sometime the accused were told that a cook could not be found till then. The accused were also told that when a cook would be found the accused themselves would have to pay his salary, Sheikh Mujibur Rahman said. He said, "We agreed to make the payment although we were prisoners, but nothing happened although it is two months that we were given the assurance."....

সংবাদ

৩রা আগস্ট ১৯৬৮

ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন সোমবার পর্যন্ত মূলতবী

রাজসাক্ষী আমীর হোসেনের সাক্ষ্য ও জেরা অসমাপ্ত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (শুক্রবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে দ্বিতীয় রাজসাক্ষী এবং বাদীপক্ষের তৃতীয় সাক্ষী জনাব আমীর হোসেনের সাক্ষ্য গ্রহণ অব্যাহত থাকে। ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমান ট্রাইব্যুনালের নিকট অভিযুক্তদের সামরিক হেফাজতে বন্দী অবস্থায় থাকাকালে খাদ্যদ্রব্য ও বাসস্থানের ব্যাপারে বিভিন্ন অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া উহার আশু প্রতিকারের আবেদন জানান।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল মেসে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে যখন ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী চলিতেছিল সেই সময় ঢাকা হাইকোর্টে শেখ মুজিবর রহমানের প্রধান কৌসুলী প্রখ্যাত বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়মস উক্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জের জন্য একটি রীট আবেদন পেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন।

গতকাল যথানিয়মে ট্রাইব্যুনালের অধিবেশনে "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যে'র ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হইলে শেখ মুজিবের অভিযোগ পেশের পর পূর্বদিনের আদালতের কার্যক্রমের মুদ্রিত রেকর্ডে কতিপয় সংশোধনের জন্য বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী খান বাহাদুর নাজির উদ্দীন আদালতকক্ষে সাক্ষীদের বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে শোনার সুবিধার জন্য 'মাইক্রোফোন' রাখার প্রস্তাব করেন। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এই প্রস্তাব গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেন।

ইহার পর ২নং সরকারী সাক্ষী ও পরবর্তী বাদীপক্ষের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন (হোষ্টাইল) সাক্ষী বলিয়া ঘোষিত জনাব কামালউদ্দিনকে তাঁহার সওয়াল জওয়াবের রেকর্ডসমূহ পড়িয়া দেখিতে এবং উহা ঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিতে অনুমতি দেওয়া হয়। জনাব কামালউদ্দীন রেকর্ড পরীক্ষা করিয়া কতিপয় স্থানে কয়েকটি সংশোধনী আনয়ন করেন, কিছু সংযোজন করেন। বিভিন্ন সংযোজন ও সংশোধনের মাধ্যমে তিনি উল্লেখ করেন যে, তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামরিক হেফাজতে রাখা হইয়াছিল এবং তিনি মুক্তির জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট পাঁচখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। ইহাছাড়া অন্য একটি বক্তব্য (রেকর্ডের ৪২

পৃষ্ঠায় ৮ম লাইন) সংশোধন করিয়া তিনি বলেন, মেজর হাসান কিম্বা লেঃ শরীফকে তাহার জবানবন্দীর ডিক্টেশন দিয়াছেন সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নহেন, তবে সম্ভবতঃ লেঃ শরীফ।

অতঃপর রাজসাক্ষী আমীর হোসেনকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দেন। পূর্বদিন তাঁহার সাক্ষ্য প্রদান শুরু হয়।

সংবাদপত্রের প্রতি ট্রাইব্যুনাল

ঠিক ইহার পূর্ব মূহুর্তে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের একটি বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীর বিবরণের প্রতি ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেনঃ উপরোক্ত রিপোর্টটি সাক্ষীর বাহ্যিক আচরণের বিবরণ সংক্রান্ত। অতএব এ সম্পর্কে সংবাদপত্রগুলিকে সাধারণভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত।

অতঃপর ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস,এ,রহমান মন্তব্য করেন সংবাদপত্রসমূহের উচিত এই মামলার রিপোর্ট সঠিকভাবে পরিবেশন করা। তিনি আরও বলেন, মামলার গুণাগুণ সম্পর্কে এবং কোন সাক্ষীর বাহ্যিক আচরণ সম্পর্কে মন্তব্য করা তাহাদের উচিত হইবে না। করিলে তাদের অসুবিধায় পড়িতে হইবে বলিয়া তিনি সতর্ক করিয়া দেন।

আমির হোসেনকে তাহার সাক্ষ্য পরীক্ষা শুরু করেন। জনাব মঞ্জুর কাদেরঃ খামের উপরে ঠিকানাটি দেখছেন?

আমীর হোসেনঃ জী হ্যাঁ, ১৬ই আগষ্ট ১৯৬৫ সাল। এই খামটির ভিতরে একটি চিঠিসহ ১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসে আমি পেয়েছি।

প্রশ্ন ঃ কার হাতের লেখা চেনেন?

উত্তর ঃ জী হ্যাঁ, ওই হাতের লেখার সঙ্গে আমি পরিচিত। ওটা অভিযুক্ত সুলতান উদ্দীনের লেখা।

জনাব মঞ্জুর কাদেরের অন্যান্য প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী জনাব আমীর হোসেন বলেন ঃ

"একটি পত্রে যে টেলিগ্রাম মনিঅর্ডারের উল্লেখ করা হয়েছে, আমি বলি যে সেটা করাচীতে পি এন এস হিমালয়ার লিডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদের নামে পাঠান হয়েছিল। পত্রে ইনসিওর করা যে খামের উল্লেখ করা হয়েছে, তা আমার নামে ৩২/৬, ই, জাহাঙ্গীর রোড, ইষ্ট করাচী ৫ ঠিকানায় আমার নামে পাঠান হয়েছিল। এই ইনসিওর করা খামে আমি ১৫০০ টাকা পাই। আমি ১৯৬৫ সালের ১৮ই এবং ২০শে আগষ্টের মধ্যে এই টাকা পাই। একই সময়ে নুর মোহাম্মদও তাঁর নামে পাঠান টাকা পান। তিনি আমাকে টাকা দেখিয়ে যান। আমি আমার টাকা লেঃ মোয়াজ্জেমের কাছে হস্তান্তর করি। নুর

মোহাম্মদও আমার সামনেই তাঁর টাকাও তাঁকে দেন। পত্রে পি আই এ-র যে টিকিটের উল্লেখ করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা আমাকে পাঠান হয়নি। পি আই এ-র টিকিটের জন্যেই এই টাকা পাঠান হয়। সুলতান তাঁকে আমাদের সিদ্ধান্ত জানাতে বলেন।"

"আমরা বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্যে ২৮শে আগষ্ট সন্ধ্যার ফ্লাইটে ঢাকা রওনা হব বলে লেঃ মোয়াজ্জেমের পক্ষে "মোঃ মতিউর রহমান (এস) –মমিনপুর, ঢাকা-৪, ঠিকানায় একটা টেলিগ্রাম পাঠাই।"

"আমাদের সাংগঠনিক কাজে লিডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমদকে সাহায্য করার জন্যে লেঃ মোয়াজ্জেম ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে ছুটি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ার নির্দেশ দেন। আমি অভিযুক্ত লেঃ মোয়াজ্জেমকে চিনি (সাক্ষী ডকে তাঁকে সনাক্ত করেন)। তিনি ছুটি নিয়ে সারাক্ষণ আমার সাথে আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন।

তিনি প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৫ সালের ১৫ই হইতে ১৮ই আগষ্টের মধ্যে সম্ভবতঃ ২ দিনের ছুটি পান।"

"তিনি প্রকৃতপক্ষে ১৮ই আগষ্ট ঢাকা রওয়ানা হন। তিনি আমার বাড়ী এসে, তিনি যাচ্ছেন বলে জানিয়ে যান।"

এই সময়ে বাদীপক্ষের কৌসুলী তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "যদি ১৮ই তাঁর ছুটি শেষ হয়, তাহলে তাঁর পক্ষে ১৮ই তারিখে রওয়ানা হওয়া সম্ভব হল কি করে?"

সাক্ষী ঃ "ছুটি ১৮ই আগষ্টে শেষ হয়নি।"

ট্রাইব্যুনালকে উদ্দেশ করিয়া সাক্ষী ইহার পর বলেন, ছুটি প্রকৃতপক্ষে এক মাসের ছিল বলে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন। আমি বলতে চাই যে, তিনি আমাকে ছুটি মঞ্জুরীর আদেশ ১৫ই থেকে ১৮ই আগষ্টের মধ্যে দেয়া হয়েছিল জানিয়েছিলেন।"

ট্রাইব্যুনালের এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী উপরোক্ত জওয়াব দান করেন।

সাক্ষী ঃ "ছুটি কোন তারিখ থেকে শুরু হয়েছিল তা' আমি বলতে পারি না।"

জনাব মঞ্জুর কাদেরকে সাক্ষী বলেন, আমিও লেঃ মোয়াজ্জেমের সাথে ১৯৬৫ সালের ২৮শে আগষ্ট সন্ধ্যা ফ্লাইটে ঢাকা যাই। পত্রে আমাকে নূর মোহাম্মদকে সঙ্গে আনতে বলা হয়। কিন্তু তিনি আমার সাথে যায় না। কারণ হচ্ছে,তাঁর কমাণ্ডিং অফিসার তাঁর ছুটি মঞ্জুর করেন না।

"আমি ঢাকা রওয়ানা হওয়ার আগে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ীতে তাঁর সাথে দেখ করতে গেলে তিনি আমাকে গোপনে জানান যে, তিনি সেই মাসেই ঢাকায় পার্টির একটা বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন।

"ঢাকায় পৌঁছে আমরা বিমান বন্দরে লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমদ ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে দেখি। তাঁরা আমাদেরকে একটা জিপে করে ধানমণ্ডী ২নং রোডে 'আলেয়া' নামে একটা বাড়ীতে নিয়ে আসেন। আমি পরে এটাকে লেঃ মোয়াজ্জেমের আত্মীয় ডঃ খালেকের বাড়ী বলে বুঝতে পারি।"

"আমরা লেঃ মোয়াজ্জেমকে এখানে রেখে যাই। আমরা বাকী সবাই ঢাকা হোটেলে যাই। ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও সুলতান উদ্দীন আহমদ এখানেই বাস করছিলেন।"

আমি ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের কামরাতে থাকি। আমরা যখন লেঃ মোয়াজ্জেমকে তাঁর আত্মীয়ের বাড়ীতে ছেড়ে আসি, তখন তিনি আমাদেরকে পরের দিন তাঁকে এখান থেকে নিয়ে যেতে বলে দেন। পরের দিন সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ লীডিং সীম্যান সুলতান উদ্দীন আহমদ ঢাকা হোটেলে একটা জিপ পাঠাবার জন্যে কে,জি,আহমদকে ফোন করেন। জিপখানা এসে পৌঁছলে দেখি, এখানাতেই আমাকে আর আমার সঙ্গীদেরকে বিমান বন্দর থেকে ঢাকা হোটেলে আনা হয়েছে।"

গাড়ীর নম্বরটা আমার ঠিক মনে নাই। এর প্রথম সংখ্যা দুইটি সম্ভবতঃ '৩৯' ছিল। লীডিং সীম্যান সুলতানুদ্দীন আহমেদ ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও আমি জিপটিতে করে ২নং ধানমণ্ডী রোডে ডঃ খালেকের বাসায় যাচ্ছিলাম। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি শেখ মুজিবের সাথে বৈঠকের সময় নির্ধারণের জন্য ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে বলেন এবং তাঁকে সেই উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে পাঠিয়ে দেন। তিনি একটি রিকশায় করে যান।"

সাক্ষী আসামীর কাঠগড়ায় শেখ মুজিবুর রহমানকে সনাক্ত করেন। তারপর বাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে বলেন ঃ তারপর সুলতানউদ্দীন আহমদ, লেঃ মোয়াজ্জেম ও আমি ঐ একই জীপে করে ঢাকা হোটেলে যাই। সেখানে অপরাহ্ন আড়াইটা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করি। ইত্যবসরে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ফিরে আসেন এবং আমাদেরকে জানান যে, অপরাহ্ন ৩টায় শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে বৈঠকের সময় ঠিক করা হয়েছে।

বাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, "ঐ বৈঠকে আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমেদ উপস্থিত ছিলাম। আমরা ৪ জনে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে যাই এবং তিনি আমাদেরকে দোতলায় নিয়ে যান। জনাব রুহুল কুদ্দুস সি, এস পিও বৈঠকে যোগদান করেন। তিনি বৈঠক সমাপ্তির প্রাক্কালে আগমন করেন।"

সাক্ষী জনাব রুহুল কুদ্দুসকে আসামীর কাঠগড়ায় সঠিকভাবে সনাক্ত করেন এবং বাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে বলেন ঃ বৈঠকে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের আশীর্বাদে আমরা একাধিক সামরিক ও প্রাক্তন সামরিক অফিসারকে আমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে শরিক হতে বলছি। তিনি বলেন যে, এই সব লোক সাধারণ স্বার্থে তাঁদের জীবন বিসর্জন দিবেন। তারপর তিনি বলেন, "আমাদের অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন।" তিনি যা বলেন তাতে আমরা সন্তুষ্ট হই। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, এই উদ্দেশ্যে সকল প্রকার উৎসই কাজে লাগনো হবে। তিনি আমাদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, তিনি ভারত থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহে সফল হবেন। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন সাময়িকভাবে কিছু টাকাপয়সার ব্যবস্থা করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে অনুরোধ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, তিনি সাময়িকভাবে ১ লক্ষ টাকা, ২ হাজার থেকে ৪ হাজার করে টাকা কিস্তিবন্দীতে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজনের সময় তাঁর কাছ থেকে এই টাকা নেয়ার জন্যে মোয়াজ্জেম হোসেনকে এক অথবা দুইজন লোক নিয়োগ করতে বলা হয়। তারপর লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও সুলতানউদ্দীন আহমদকে একাজে নিয়োগ করেন। ঠিক এই সময়ে জনাব রুহুল কুদ্দুস বৈঠকে আসেন এবং তাঁকে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরকে বলেন, তিনি আমার বন্ধু। ঐ সময় তিনি তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। পরপর আমরা চা পান করি এবং সেখান থেকে চলে যাই।

কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী আরও বলেন, "জনাব রুহুল কুদ্দুস আসার পর কোন আলোচনা হয়নি। তারপর আমরা ঢাকা হোটেলে ফিরে যাই।"

সাক্ষী কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে বলেনঃ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ২৯শে আগষ্ট বৈকালে করাচী যান। আমরা ঢাকাতেই থাকি। লেঃ মোয়াজ্জেমকে যেতে হয়, কারণ তাঁর সরকারী ছুটি নেয়া ছিল না। তিনি আমাকে একথাই বলেন।

সাক্ষী বলেন, "২৮শে আগষ্ট ছিল শনিবার, সেই দিন আমরা করাচী থেকে আসি আর ২৯শে আগষ্ট ছিল রবিবার। ঐ সভায় আমাদের টাকার ঘাটতি ছিল। আমি আমার নিজ পকেট থেকে আমাদের সকলের হোটেল বিল পরিশোধ করি।" এই সঙ্গে সাক্ষী আবার বলেন, "আমার নিজের টাকা থেকে আমি পরিশোধ করিনি।"

বাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৫ সালের ১লা সেপটেম্বরে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও আমি শেখ মুজিবুর

রহমানের বাড়ীতে যাই। ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান বাড়ীর ভিতরে চলে যান এবং আমি বাইরে থাকি। ১০/১৫ মিনিট পর তিনি ৭ শত টাকা নিয়ে বাড়ীর ভিতর থেকে বের হন এবং তা আমার হাতে দেন। এই টাকা থেকে আমি হোটেল বিল পরিশোধ করি।"

প্রশ্ন ঃ তারপর?

উত্তর ঃ তারপর ১৯৬৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, সুলতানউদ্দীন আহমদ ও আমি একটি ট্যাক্সিতে করে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ীতে যাই।

প্রশ্ন ঃ ট্যাক্সিটি কার?

উত্তর ঃ ট্যাক্সিটি জনাব কে, জি, আহমদের।

তারপর সাক্ষী বলেন, "সুলতানউদ্দীন আহমদ ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান বাড়ীর ভিতরে যান। ১৫/২০ মিনিট পর তাঁরা ৪ হাজার টাকা নিয়ে বের হন।"

সাক্ষী বাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে বলেন ঃ শেখ মুজিবের নিকট থেকে প্রাপ্ত এই টাকা অর্থাৎ ৪ হাজার ও ৭ শত টাকার মধ্যে আমি ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও সুলতানউদ্দীন আহমদকে তাঁদের খরচের জন্য ৩শত টাকা দেই। তারপর আমি হোটেল বিল পরিশোধ করি। এই সময় ভারতের সাথে যুদ্ধ লেগে যায়।

সাক্ষী বলেন ঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমাকে বলেন যে, তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে ৪ হাজার ৭ শত টাকা এনেছেন।

প্রশ্ন ঃ অবশিষ্ট টাকা কার কাছে ছিল?

জবাবঃ অবশিষ্ট টাকা আমার কাছে ছিল।

তারপর সাক্ষী বলেনঃ ১৯৬৫ সনের সেপটেম্বরের শেষ সপ্তাহ অবধি আমি ঢাকায় ছিলাম। ১৯৬৫-এর শেষ সপ্তাহে আমি করাচীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করি।

বাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ঃ করাচীতে গমনের পরদিন আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ীতে যাই এবং মিসেস মোয়াজ্জেম হোসেনের উপস্থিতিতে আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের কাছে ৪ হাজার ১ শত টাকা হস্তান্তর করি এবং অবশিষ্ট টাকা কীভাবে খরচ হয়েছে, তা তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করি। আমি তাঁকে বলি যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীনের মাধ্যমে শেখ সাহেবের কাছ থেকে ৪ হাজার ৭ শত টাকা পাওয়া গেছে।

বাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন ঃ ১৯৬৫ সনের নভেম্বর মাসে লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ আমাকে করাচীতে কে, জি, আহমদের নিকট পরিচয় করিয়ে দেন এবং কে, জি, আহমদ আমাকে

আহমদ ফজলুর রহমান সি,এস,পি'র নিকট পরিচয় করিয়ে দেন। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান সেই সময় করাচীতে অর্থ দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারী হিসেবে ছিলেন। এইসব ব্যক্তি যাদের নিকট আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় তাঁরা সংস্থার সিনিয়র সদস্য ছিলেন।

সাক্ষী আসামীর কাঠগড়ায় আহমদ ফজলুর রহমানকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন। তারপর বাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে বলেনঃ ঐ একই মাসে দুইটি বাড়ীতে আমাদের দুইটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। একটি বৈঠক হয় পি এন কারসাজে লেঃ মোয়াজ্জেমের বাড়ীতে। অপর বৈঠকটি হয় ইলাকো হাউসে। এখানে আহমদ ফজলুর রহমান থাকতেন। প্রথম বৈঠকটি লেঃ মোয়াজ্জেমের বাড়ীতেই হয়। ঐ সময় লেঃ মোয়াজ্জেম জনাব আহমেদ ফজলুর রহমান, প্রাক্তন করপোরাল সামাদ, লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রাক্তন করপোরাল সামাদ ১৯৫৩ সন থেকেই আমার সহকর্মী ছিলেন। তিনি ১৯৬৫ সনের নভেম্বরে সংস্থার কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন অর্থাৎ আমি তাঁকে নভেম্বর থেকে দেখি।

সাক্ষী সঠিকভাবে অভিযুক্তদের ডকে সামাদকে সনাক্ত করেন।

জনাব আমীর হোসেন বলেন, এই সভায় লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাদের বলেন যে, আমাদের কাজ চলবে শুধু পূর্ব পাকিস্তানে। তার জন্যেই ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান লীডিং সীম্যান সুলতান চট্টগ্রামে ছিল। তাঁর ভাষায় তারা সার্বক্ষণিক কর্মী। তিনি আরও বলেন যে, আমাদের অভ্যুত্থানমূলক আন্দোলন ত্বরান্বিত করার জন্যে অদূর ভবিষ্যতে তিনি এক্স কন্ট্রোরাল সামাদ ও আমাকে পূর্ব পাকিস্তান পাঠাবে। তিনি বলেন যে, তার কয়েকটি ট্রাঞ্জিসটর সম্বলিত ট্রান্সমিটার দরকার।

আমীর হোসেন আরও জানান, তিনি আমাকে করাচীর চাকুরী ছেড়ে দিতে বলেন ও আমাকে ঢাকায় একটা ভালো চাকুরী দেয়া হবে বলে বলেন। তিনি জানান, এ ব্যাপারে তিনি ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও শেখ মুজিবুর রহমানকে চিঠি লিখেছেন। সেই সভায় জনাব আহমদ ফজলুর রহমান বলেন যে, তিনি লন্ডন হতে আমাদের জন্যে ট্রাঞ্জিসটর সম্বলিত কয়েকটি ট্রান্সমিটার আনার ব্যবস্থা করবেন। এজন্যে তিনি লণ্ডনে অধ্যয়নরত তাঁর ছোট ভাইয়ের নিকট লিখবেন। এরপর সভা ভেঙ্গে যায়। এর দু'তিন দিন পর ইলাকো হাউসে দ্বিতীয় বৈঠক বসে।"

আমির হোসেন আরও বলেন, 'এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলো নূর মোহাম্মদ, লেঃ মোয়াজ্জেম, কে,জি, আহমদ, জনাব ফজলুর রহমান। আমি ও লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাদের জানান যে, পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের আন্দোলনের কাজ সুন্দরভাবে চলছে। তিনি আরও জানান, লীডিং সীম্যান সুলতান উদ্দীন ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে তাদের কার্যক্রমের

রোজকার খবর দিচ্ছে। তিনি জানান, তাদের খবর অনুসারে পার্টির সদস্যসংখ্যা প্রায় ৩ হাজার। আন্দোলনের সাফল্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে তার থাকা কতখানি প্রয়োজন —সেটা সে সবিস্তারে বর্ণনা করে। জনাব কে,জি, আহমদ প্রস্তাব করেন, লেঃ মোয়াজ্জেমকে পূর্ব পাকিস্তানে বদলীর জন্যে তিনি নৌবাহিনীতে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের উপর প্রভাব বিস্তার করবেন। তারপর আমাদের সভা শেষ হয়।

জনাব আমীর হোসেন আরও জানান,"লেঃ কঃ হোসেন কয়দিন পরে আমাকে এ,এফ,রহমানের কাছে গিয়ে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের জন্য একখানি চিঠি দিয়ে যেতে বলেন। চিঠিখানা ছিল লণ্ডন থেকে ট্রানজিসটর সম্বলিত ট্রান্সমিটার ক্রয় সম্পর্কিত। আমি ইলাকো হাউসে তাঁর কাছে যাই। তিনি আমার সামনে লণ্ডনে পাঠ্যরত তাঁর ছোট ভাই জনাব সফিকুর রহমানের নিকট চিঠি লেখেন। আমি চিঠি নিয়ে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে তাঁর বাড়ীতে বসে দিই।"

আমীর হোসেন জানান,"আমি এ,বি, খুরশীদকে চিনি। তিনি এ্যাংলীম্যান।

এই পর্যায়ে জনাব আমীর হোসেন অভিযুক্তদের মধ্যে অভিযুক্ত খুরশীদকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

জনাব আমীর হোসেন বলেন, ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান,এল,এস,সুলতানউদ্দীন ও এ, বি, খুরশীদ চট্টগ্রামের ঘাঁটিতে ছিল। ৬ই সেপ্‌টেম্বর যখন যুদ্ধ শুরু হয় তার কদিন পর ৯ই সেপ্‌টেম্বর ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও এল, এস সুলতানউদ্দীন আহমদ চট্টগ্রাম যান। কার্যতঃ যা হয়েছিল সেসময় তা হ'লো রেডিওতে সকল সামরিক কর্মচারীকে কার্যে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাই তারা ৯ই সেপ্‌টেম্বর চট্টগ্রাম রওয়ানা হন। আমি তখন ঢাকায়। আমি জানি তারা চট্টগ্রামে কার্যে যোগদান করেছেন। ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে আমি করাচীতে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে একটি কি দুটি চিঠি পাই।"

এই সময় আমীর হোসেনকে বাদীপক্ষের কৌসুলী একখানি চিঠি দেন।

প্রশ্ন ঃ এটা কি সেই চিঠিরই একখানা ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ওই চিঠিরই একখানা।

জনাব আমীর হোসেন পরে বলেন,"এই চিঠির সঙ্গে একই খামে আমি আর একখানি চিঠি পাই। দ্বিতীয় চিঠিখানা লেখা লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদের কাছে। আমার কাছে লেখা চিঠিখানা এ, বি, খুরশীদের হাতের হলেও সেখান লিখেছে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান। চিঠির শেষে 'M' লেখা।

'M' অর্থ ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান। খামের দ্বিতীয় চিঠিখানাও এ, বি, খুরশীদের হাতে লেখা। এর শেষেও 'M' অক্ষর।

এর অর্থ হলো এখানিও লিখেছে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান।

আর একখানি চিঠি

অতঃপর সাক্ষীর কাছে লেখা উক্ত চিঠিখানি সাক্ষী ব্যাখ্যা সহকারে পড়িয়া শোনান। চিঠিতে লেখা হয়,"মাই ডিয়ার হোসেন সাব, আমার ছালাম নিবেন। এর পূর্বে করাচী হতে দুইখানি চিঠি পেয়ে বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারলাম। বড় ভাইয়ার পত্রে জানতে পারলাম তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। উনাকে বলবেন, আমি যা লিখেছি এখানে বড় ভাইয়ের নির্দেশ মত ও ঝগড়া হওয়ার পর লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম।"

চেয়ারম্যান ঃ এর অর্থ কি? বড় ভাই কে?

উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, বড় ভাই হলো করাচীতে লেঃ মোয়াজ্জেম ও ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমান।

সাক্ষী চিঠির অপর অংশ পড়িতে থাকেন। "আমাদের ঔষধের সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত হয়েছে। লোকের অভাবে এখানে পাঠান হচ্ছে না।"

মঞ্জুর কাদের ঃ ঔষধের অর্থ কি?

সাক্ষী ঃ ঔষধ অর্থ এখানে টাকাপয়সা।

সাক্ষী চিঠির বাকী অংশ পড়িতে থাকেন ঃ "খোদার রহমতে কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছি ও আরও অগ্রসর হচ্ছি। আশা করি, মাস খানেকের মধ্যে আরও অগ্রসর হতে পারব।

ক্রমে ক্রমে ঘরের মিস্ত্রি ভালোই পাচ্ছি। তারাও পূর্ণোদ্যমে তাদের নিজ নিজ কাজ নিঃস্বার্থভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।"

মঞ্জুর কাদের ঃ ঘরের মিস্ত্রি মানে?

সাক্ষী ঃ মানে দলের কর্মীদের কথা এখানে বলা হয়েছে।

সাক্ষী আরো পড়েন "আমরা আগামী বর্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আশা করি, আপনারাও একমত থাকবেন, আমার টেলিগ্রাম পেয়ে চলে আসবেন।"

চিঠির পরবর্তী অংশ পাঠকালে সাক্ষী বলেন (state) এর সঙ্গে যতশীর্ঘ সম্ভব হয় নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এখানে এসে পৌঁছাইতে পারে সে চেষ্টা করবেন। আমরাও এদিকে চেষ্টা করছি। দেশের জনসাধারণ আমাদেরই। শুধু তারা আমাদের সেই চিরস্মরণীয় দিনের অপেক্ষায় আছে।"

সাক্ষীকে এখানে State-এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি শুধু state বলিয়াই উল্লেখ করেন।

সাক্ষী আরও পড়েন ঃ আমার সুলতানের এখানে বদলী হওয়ার ব্যাপারে আপনারা সকলে মিলে চেষ্টা করবেন। খুরশীদও আমাদের সাথে বর্তমানে পূর্ণোদ্যমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ও সে নিজেও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে।

পত্রের শেষাংশটি পাঠকালে রাজসাক্ষী জনাব আমীর হোসেন মিয়া যখন জনৈক আনোয়ার জাহিদের নাম উল্লেখ করেন, তখন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ওই অংশটি পুনরায় পড়িয়া শুনাইতে বলেন।

সাক্ষী বলেন ঃ "বড় ভাইয়ের খালু সাহেব আনোয়ার জাহিদ সাহেব বর্তমানে করাচী আছেন। ১০/১৫ দিন করাচী থাকবেন। সম্ভব হলে দেখা করবেন।"

চেয়ারম্যান ঃ আনোয়ার জাহিদ কে?

সাক্ষী জবাবে বলেন ঃ "বড় ভাইয়ের অর্থাৎ লেঃ মোজাম্মেলের খালার স্বামী।"

চিঠির শেষে আপনার 'M' কথাটি লেখা আছে। সাক্ষী জানান, 'M' অর্থ ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান।

এই সময় বিবাদীপক্ষের কৌসুলী খান বাহাদুর ইসমাইল ট্রাইব্যুনালের নিকট সাক্ষী কর্তৃক ব্যাখ্যাসহ পত্র পাঠে আপত্তি প্রকাশ করেন।

সংবাদ

৩রা আগস্ট ১৯৬৮

সামরিক হেফাজতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দুরবস্থা সম্পর্কে
শেখ মুজিবের অভিযোগ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (শুক্রবার) সকাল নয় ঘটিকায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণ আদালতকক্ষে আসনগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্তদের 'ডক' হইতে ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ট্রাইব্যুনালের নিকট সামরিক হেফাজতে বন্দীদশায় তাঁহাদের খাওয়া দাওয়া ও বাসস্থানের দুরবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ করেন।

তিনি বলেন যে, সাতমাসের অধিককাল যাবৎ বহুবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কোন প্রতিকার পাওয়া যায় নাই।

শেখ মুজিব আরও বলেন, "আমি প্রায় ১০ বছর কারাভোগ করেছি কিন্তু এমন অব্যবস্থা আর কখনো দেখিনি।"

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস,এ,রহমান শেখ মুজিবর রহমানের অভিযোগগুলি ধৈর্য্য সহকারে শুনিতে থাকেন।

শেখ মুজিবর রহমান ধীরকণ্ঠে তাঁহার অভিযোগগুলি ট্রাইব্যুনালকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে থাকেন। তিনি জানান যে, সামরিক হেফাজতে অভিযুক্তদের যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহারা অভ্যস্ত নহেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ গত ৭ মাস যাবৎ কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানীয় খাদ্য সরবরাহের দাবী জানাইয়া আসিতেছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের স্থানীয় খাদ্য রান্নাবান্নার জন্য

স্বতন্ত্র বাবুর্চি নিয়োগের দাবী জানাইয়াও এ পর্যন্ত কোন ফল হয় নাই। শেখ মুজিব আরও জানান যে, এমনকি সরবরাহকৃত খাদ্য গ্রহণে অভিযুক্তদের অসুবিধা নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাইলে জনৈক মেজর তাহার উত্তরে বলেন, "খেতে না পারলে খাবেন না।"এ ব্যাপারে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার অনুমতিও তাঁহারা পান নাই।

শেখ মুজিবর রহমান আরও অভিযোগ করেন যে,বন্দী অবস্থায় তাঁহাদেরকে একে অপরের সহিত কথাবার্তা বলিতে কিম্বা আটক গৃহের বারান্দায় তাঁহাদের হাঁটাচলা করিতে দেওয়া হয় না।

সকলকেই নির্জনকক্ষে বন্দী রাখা হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, সামরিক হেফাজতে বন্দী অবস্থা নিয়ন্ত্রণের যে বিধান রহিয়াছে তাহাও তিনি দেখিয়াছেন। সেই বিধানেও নির্জনকক্ষে বন্দী রাখার কোন বিধান নাই। এমনকি বেসামরিক কারাগারের বিধানেও কাহাকেও তিন মাসের অধিক নির্জনকক্ষে বন্দী রাখার নিয়ম নাই। তিনি আটক কর্তৃপক্ষের কাছে আরও ভদ্র ব্যবহার আশা করেন বলিয়া জানান।

শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত অভিযোগসমূহের প্রতি ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উহার আশু প্রতিকার প্রার্থনা করেন।

বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাবএস,এ, রহমান শেখ মুজিবের এই অভিযোগ শ্রবণের পর বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদেরকে ইহার বিহিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলেন। জনাব মঞ্জুর কাদের সামরিক বাহিনীর সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বিষয়টি জানাইবার এবং ট্রাইব্যুনালকে তাঁহাদের বক্তব্য অবহিত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

সংবাদ

৩রা আগস্ট ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া
আগামী সোমবার হাইকোর্টে রীট আবেদন পেশ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

১৯৬৮ সালের অপরাধ আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অর্ডিন্যান্স বলে গঠিত "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যে"র ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া গতকল্য (শুক্রবার) সকালে ঢাকা হাইকোর্টে একটি রীট আবেদন পেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। রীট আবেদনে অভিযুক্তদের বিচারের প্রশ্নে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারও চ্যালেঞ্জ করা হইবে।

বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়মস কিউ,সি উপরোক্ত ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের পক্ষ হইতে উক্ত রীট আবেদন পেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন।

ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বি,এ,সিদ্দিকী ও বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিমকে লইয়া গঠিত রীট বেঞ্চ আগামী সোমবার উক্ত রীট আবেদন পেশের দিন ধার্য করিয়া আবেদনকারীর কৌসুলীকে জানাইয়া দিয়াছেন।

টমাস উইলিয়মস গতকাল (শুক্রবার) তাঁহার রীট আবেদন পেশের অনুমতিদানের প্রার্থনা জানাইয়া নিম্নলিখিত কারণ উল্লেখ করেন ঃ

১। যেহেতু উক্ত অর্ডিন্যান্স অনুসারে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার শুরু হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদেরকে (অভিযুক্ত ব্যক্তিদের) সামরিক বাহিনীর হেফাজতে রাখা হইয়াছে, সেহেতু অবিলম্বে রীট আবেদনের শুনানী শুরু হওয়া প্রয়োজন।

২। আগামী সোমবার ব্যক্তিগত অসুবিধার দরুন মিঃ উইলিয়মসের পক্ষে রীট আবেদন পেশ করা সম্ভব হইবে না। কারণ তাঁহাকে সেই দিন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বাদীপক্ষের একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে জেরা করিতে হইবে।

মিঃ উইলিয়মসের এই প্রার্থনার জবাবে প্রধান বিচারপতি জানান যে, বিষয়টির আশু গুরুত্ব ইতিমধ্যেই শেষ হইয়াছে। কারণ বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ইতিমধ্যেই মামলার শুনানী শুরু হইয়া গিয়াছে।

বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন ১টা পর্যন্ত চলে– মাননীয় বিচারপতিকে এই তথ্য জানান হইলে তিনি মিঃ উইলিয়মসকে সোমবার অপরাহ্ন দুইটায় তাঁহার রীট পেশ করার নির্দেশ দেন। ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম ও ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদসহ কতিপয় সিনিয়র এডভোকেট মিঃ উইলিয়মসকে সাহায্য করেন।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৬৮ সালের অপরাধ আইন (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) সংশোধনী অর্ডিন্যান্স অনুসারে ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারের জন্য সুপ্রীমকোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস,এ, রহমান, বিচারপতি জনাব এস, আর, খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিমকে লইয়া বিশেষ ট্রাইব্যুনালটি গঠিত হইয়াছে।

আরও উল্লেখযোগ্য যে, বিরতির পর গত ২৯শে জুলাই বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইলে মিঃ উইলিয়মস উহার বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল উক্ত প্রশ্ন বিবেচনার স্থান নয় বলিয়া মাননীয় বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান মন্তব্য করেন।

দৈনিক পাকিস্তান

৩রা আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

একরারী সাক্ষী আমির হোসেনের জবানবন্দী অব্যাহত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শুক্রবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দ্বিতীয়পর্বের শুনানীর পঞ্চম দিনে ২নং একরারী সাক্ষী আমির হোসেনের সাক্ষ্য গ্রহণ অব্যাহত থাকে। বৃহস্পতিবার থেকে তার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। আমির হোসেনের সাক্ষ্য গ্রহণ অসমাপ্ত থাকা অবস্থাতেই গতকালের শুনানী শেষ হয়। আগামী সোমবার পুনরায় শুনানী শুরু হবে।

বাদীপক্ষের বিরূপ সাক্ষী কামালউদ্দিন আহমদ গতকাল প্রথমে ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তার পূর্ব দুদিনের জবানবন্দী পাঠ ও কোন কোন জায়গায় ইষৎ সংশোধন করে স্বাক্ষরদান করেন।

একরারী সাক্ষী আমির হোসেনের জবানবন্দী

গতকাল ২নং একরারী সাক্ষী আমীর হোসেনকে বাদীপক্ষের কৌসুলী মঞ্জুর কাদের পূর্বদিনের আদালতে প্রদর্শিত তৃতীয় পত্রের খাম প্রদান করলে তিনি তা পরীক্ষা করে বলেন যে, খামের ওপরের সীলে ১৯৬৫ সালের ১৫ই আগস্ট লেখা রয়েছে।

কাদের–আপনি কখন এটা পেয়েছেন?

সাক্ষী–আমি ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে পত্রসহ এই খাম পেয়েছি।

তিনি বলেন, আমি উক্ত মাসে আরও দুখানি পত্র পেয়েছি।

কাদের–আপনি কি এই হস্তলিপির সঙ্গে পরিচিত?

সাক্ষী–যিনি এই পত্র লিখেছেন আমি তার হাতের লেখার সঙ্গে পরিচিত।

কাদের–এটা কার হস্তলিপি?

সাক্ষী–এটা অভিযুক্ত সুলতানউদ্দিন আহমদের হস্তলিপি।

কাদের–আপনি টেলিগ্রাফিক মানি অর্ডারের কথা বলেছিলেন। আপনি কি সে টাকা পেয়েছিলেন?

সাক্ষী–একটি পত্রে যে টেলিগ্রাফিক মানি অর্ডারের উল্লেখ ছিল উক্ত পত্র পি এন এস হিমালয়ের লীডিং সীমেন নূর মোহাম্মদের নামে করাচী পাঠান হয়েছিল।

কাদের–ইনসিওরড কভার করে নামে পাঠান হয়েছিল?

সাক্ষী–তা আমার নামে ৩২/৬-ই, জাহাঙ্গীর রোড, ইস্ট করাচী-৫ ঠিকানায় পাঠান হয়েছিল।

কাদের–আপনি কি সেই টাকা পেয়েছিলেন?

সাক্ষী– উক্ত কভারে আমি পনরশ টাকা পাই।

কাদের–কখন উক্ত টাকা পেয়েছেন?
সাক্ষী–১৯৬৫ সালের ১৮ই হতে ২০শে আগস্টের মধ্যে উক্ত টাকা পেয়েছি।
কাদের–নূর মোহাম্মদ টাকা পেয়েছিল কি?
সাক্ষী–একই সময়ে নূর মোহাম্মদের নিকট যে টাকা পাঠান হয়েছিল উক্ত টাকাও সে পেয়েছে।
বিচারপতি এস এ রহমান–আপনি কি করে তা জানলেন?
সাক্ষী– সে আমার কাছে এসে আমাকে টাকা দেখিয়েছে।
কাদের–আপনি এই টাকা দিয়ে কি করলেন?
সাক্ষী–আমি এই টাকা লেঃ মোয়াজ্জমকে প্রদান করি।
কাদের–নূর মোহাম্মদ উক্ত টাকা কি করেছিল?
সাক্ষী– সেও আমার সামনে টাকা মোয়াজ্জমের হাতে দেয়।
কাদের–পত্রে পিআইএ টিকেটের কথা উল্লেখ ছিল। আপনি কি ঐ টিকেট পেয়েছিলেন?
সাক্ষী–পত্রে যে পিআইএ টিকেটের কথা উল্লেখ ছিল তা আমার নিকট পাঠান হয়নি। পিআইএ টিকেটের জন্যই এই টাকা পাঠান হয়েছিল।
কাদের–একখানা পত্রে আপনাকে বলা হয়েছিল যে, আপনি কি স্থির করেছেন তা জানাবার জন্য। আপনি তা জানিয়েছিলেন কি?
সাক্ষী–সুলতান আমাকে বলেছিল যে, আমরা কি স্থির করেছি তা তাকে জানাতে। আমি লেঃ মোয়াজ্জেমের পক্ষ হতে মোহাম্মদ মতিউর রহমান (এস) মোমিনপুর, ঢাকা-৪ ঠিকানার করাচীর সদর পোস্ট অফিস হতে এক তারবার্তা পাঠাই। তারবার্তায় জানিয়েছিলাম যে, ঢাকায় বৈঠকে যোগদানের জন্য আমরা ২৮শে আগস্ট বিকালের ফ্লাইটে ঢাকা যাচ্ছি। লেঃ মোয়াজ্জেম স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে ছুটি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গিয়ে আমাদের সাংগঠনিক কাজে এল, এস সুলতানউদ্দিন আহমদকে সাহায্য করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, আমি লেঃ মোয়াজ্জেমকে চিনি। তিনি মোয়াজ্জেমকে সঠিকভাবে কাঠগড়ায় সনাক্ত করেন।
কাদের–মুজিব ঢাকা পৌঁছেনি কেন?
সাক্ষী–১৫ই হতে ১৮ই আগস্টের মধ্যে তিনি সম্ভবত দুদিনের ছুটি পেয়েছিলেন।
কাদের–তিনি যখন ছুটি পান তখন কি পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছিলেন?
বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব সালাম খান এই প্রশ্নে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, এটা উত্তর নির্দেশক প্রশ্ন। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস এ রহমান বলেন, আগের প্রশ্নের পর এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আসে।
সাক্ষী–আমরা ১৮ই আগস্ট ঢাকা রওয়ানা হই। তিনি এসে আমাকে বলেন যে, তিনিও যাচ্ছেন।

কাদের–তার ছুটি যখন ১৮ তারিখে শেষ হচ্ছে তখন তিনি কিভাবে ঐ দিন ঢাকা রওয়ানা হলেন?
সাক্ষী–ছুটি ১৮ই আগস্ট শেষ হয়নি।
এই পর্যায়ে আদালত ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে জানতে চাইলে সাক্ষী বলেন, তিনি এক মাসের ছুটি নেন বলে আমাকে জানান। আমি যা বলতে চেয়েছি তা হচ্ছে এই যে, ১৫ই হতে ১৮ই আগস্ট তারিখের মধ্যে তার ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে একথা তিনি আমাকে জানিয়েছেন। তবে ছুটি কোন তারিখ হতে শুরু হয়েছে তা আমি বলতে পারব না।
কাদের–আপনি কি ঢাকা গিয়েছিলেন?
সাক্ষী–১৯৬৫ সালের ২৮শে আগস্ট আমি লেঃ মোয়াজ্জেমসহ বিকালের ফ্লাইটে ঢাকা গমন করি।
কাদের–একটি পত্রে আপনাকে বলা হয়েছিল নূর মোহাম্মদকে সঙ্গে নিয়ে আসতে আপনি তাকে এনেছিলেন কি?
সাক্ষী–না–তিনি আমার সঙ্গে আসতে পারেননি। কারণ তার অফিসার কম্যান্ডিং তাকে ছুটি মঞ্জুর করেনি।
কাদের–ঢাকা যাওয়ার পূর্বে মোয়াজ্জেমের সঙ্গে আপনার কোন আলোচনা হয়েছিল কি?
সাক্ষী–ঢাকা রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসায় যাই তিনি আমাকে জানান যে, তিনি ঢাকায় ঐ মাসেই পার্টির একটি সভা অনুষ্ঠিত করবেন।
কাদের–আপনারা বিকেলের ফ্লাইটে ঢাকা এসেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ঢাকা বিমানবন্দর হতে পরের ঘটনা বর্ণনা করুন।
সাক্ষী–বিমানে ঢাকা পৌঁছার পর আমরা বিমান বন্দরে সুলতানউদ্দিন আহমদ ও স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে দেখি। তারা আমাদের একখানা জীপে করে ধানমন্ডির ২ নম্বর রোডে আলেয়া নামক একটি বাড়ীতে নিয়ে যায়। সেটা লেঃ মোয়াজ্জমের আত্মীয় ডাঃ মালেকের বাড়ী। আমরা মোয়াজ্জেমকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে বাকী সবাই ঢাকা হোটেলে গমন করি।
কাদের–আপনি কোথায় উঠেছিলেন?
সাক্ষী–স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এবং সুলতানউদ্দিন ঢাকা হোটেলে উঠে। আমি স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের সঙ্গে একই কামরায় বাস করি। আমরা যখন লেঃ মোয়াজ্জেমকে তার আত্মীয়ের বাড়ীতে নামিয়ে দিই তখন তিনি আমাদের বলেন যে, আমরা যেন পরদিন ভোরে তাকে ঐ বাড়ী হতে উঠিয়ে নিয়ে যাই।

ঢাকা হোটেল প্রসঙ্গ

কাদের–২৯ শে আগস্টের ঘটনা এবার বর্ণনা করুন?

সাক্ষী–পরদিন সকালে প্রায় ৭.৩০ মিনিটে সুলতানউদ্দিন কে জি আহমদকে ফোন করে ঢাকা হোটেলে একখানা জীপ পাঠাবার জন্য বলেন। তারপর একখানা জীপ গাড়ী আসে।

কাদের–এটা কোন জীপ?

সাক্ষী–যে জীপ আমাকে ও আমার সঙ্গীদের নিয়ে বিমান বন্দর হতে ঢাকা হোটেলে নিয়ে আসে।

কাদের–ঐ জীপের নম্বর আপনার মনে আছে?

সাক্ষী–জীপের নম্বর ঠিক আমার মনে নেই। তবে নম্বরের প্রথম দুটি সংখ্যা হচ্ছে সম্ভবতঃ "৩৯"।

কাদের–ঐ দিনের বাকী ঘটনা বলুন।

সাক্ষী–সুলতানউদ্দীন, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও আমি জীপে করে ধানমন্ডি ২ নম্বর রোডে ডাঃ খালেকের বাড়ী গমন করি। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন এখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে বলেন, শেখ সাহেবের সঙ্গে বৈঠকের সময় ঠিক করতে। তারপর তিনি স্টুয়ার্ড মুজিবকে এই ব্যাপারে শেখ মুজিবর রহমানের বাসায় প্রেরণ করেন। তিনি রিকশা করে চলে যান।

এই সময় সাক্ষীকে বলা হয় শেখ মুজিবর রহমানকে সনাক্ত করতে। তিনি কাঠগড়ায় সঠিকভাবে শেখ মুজিবর রহমানকে সনাক্ত করেন।

কাদের–ঐদিন তারপর কি হয়েছিল?

সাক্ষী–তারপর সুলতানউদ্দীন, আমি ও মোয়াজ্জেম ঐ জীপে করে ঢাকা হোটেলে ফিরে যাই। আমরা সেখানে বেলা প্রায় আড়াইটা পর্যন্ত অপেক্ষা করি।

শেখ মুজিবের বাড়ীতে বৈঠক

সাক্ষী বলেন, এই সময় স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ফিরে আসে এবং আমাদের জানায় যে, বেলা ৩ টায় শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ীতে বৈঠক বসবে।

কাদের–আপনি কি সেই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন?

সাক্ষী– হ্যাঁ। আমি লেঃ মোয়াজ্জম, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এবং সুলতানউদ্দিন যোগদান করি। আমরা ৪জনে শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ী পৌঁছিলে তিনি আমাদের দোতলায় নিয়ে যান।

কাদের–এই বৈঠকে আর কেউ যোগ দিয়েছিলেন কি?

সাক্ষী– জনাব রুহুল কুদ্দুস সিএসপিও এই সভায় যোগ দেন। সভা যখন শেষ হয়ে আসে তখন তিনি এসে পৌঁছেন।

রুহুল কুদ্দুসকে সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী কাঠগড়ায় সঠিকভাবে জনাব রুহুল কুদ্দুসকে সনাক্ত করেন।

কাদের–ঐ সভায় কি আলোচনা হয়েছিল?

সাক্ষী–লেঃ মোয়াজ্জম হোসেন সভায় আলোচনার সূচনা করেন। তিনি বলেন, শেখ মুজিবর রহমানের আশীর্বাদে আমরা সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত এবং সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কতিপয় কর্মচারীকে আমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগ দিতে বলেছি। তিনি বলেন, এই সকল ব্যক্তিরা উক্ত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাদের প্রাণ উৎসর্গ করবে। তারপর তিনি বলেন, আমাদের অর্থ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের দরকার। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। শেখ মুজিবর রহমান বলেছেন যে, এই কাজের জন্য সকল সম্পদ ব্যবহার করা হবে এবং তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও অর্থ ভারত হতে সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন।

মুজিব কর্তৃক ১ লক্ষ টাকা দানের আশ্বাস

সাক্ষী আরও বলেন, শেখ মুজিবর রহমানকে আপাততঃ এক লক্ষ টাকা প্রদানের জন্য মোয়াজ্জম হোসেন অনুরোধ জানান। শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, তিনি আপাততঃ এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রদান করবেন। এই অর্থ ২ হাজার হতে ৪ হাজার টাকা করে কিস্তিতে দেওয়া হবে। শেখ মুজিবর রহমান লেঃ মোয়াজ্জম হোসেনকে একজন বা দুজন লোক নির্বাচন করতে বলেন যারা প্রয়োজনের সময় তার নিকট হতে টাকা গ্রহণ করবে। তখন লেঃ মোয়াজ্জম হোসেন, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও সুলতানউদ্দীন আহমদকে এই কাজের জন্য নির্বাচন করেন। ঠিক এই সময় জনাব রুহুল কুদ্দুস আগমন করেন। তাকে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। শেখ মুজিবর রহমান আমাদের বলেন, তিনি আমার বন্ধু। তখন তিনি তার নাম উল্লেখ করেননি। আমরা চা পান করার পর চলে যাই। জনাব রুহুল কুদ্দুস আসার পর কোন আলোচনা হয়নি। তারপর আমরা ঢাকা হোটেলে চলে যাই।

কাদের–ঐ বৈঠকের পর আপনি ঢাকা থেকে যান না করাচী চলে যান?

সাক্ষী– লেঃ মোয়াজ্জম হোসেন ২৯ শে আগস্ট বিকেলে করাচী চলে যান। আমরা ঢাকা থেকে যাই।

কাদের–তিনি কেন ঢাকা ত্যাগ করেন তা আপনি বলতে পারেন?

সাক্ষী–কারণ তিনি সরকারীভাবে কোন ছুটি নিয়ে আসেননি। তিনি আমাকে একথা জানিয়েছেন। ২৮শে আগস্ট ছিল শনিবার। ঐদিন আমরা করাচী হতে আসি। ২৯শে আগস্ট ছিল রোববার। তখন আমাদের টাকার অভাব ছিল। আমি নিজ পকেট থেকেই সকলের হোটেলের বিল পরিশোধ করি। সাক্ষী পুনরায় বলেন, আমি নিজ পকেট হতে বিল পরিশোধ করিনি। আসলে

১লা সেপ্টেম্বর আমি ও স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান শেখ মুজিবর রহমানের বাসায় গমন করি। স্টুয়ার্ড মুজিব বাড়ীর ভেতরে যান এবং আমি বাইরে অপেক্ষা করি। ১০/১৫ মিনিট পর তিনি নগদ ৭শ টাকা নিয়ে এসে আমার হাতে দেন।এই টাকা হতে আমি হোটেলের বিল শোধ করি।

কাদের–তারপর কি হয়েছিল?

সাক্ষী–এরপর ১৯৬৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর স্টুয়ার্ড মুজিব, সুলতান ও আমি একখানা ট্যাক্সি করে শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ী যাই। এই ট্যাক্সিখানার মালিক হচ্ছেন কে জি আহমদ, সুলতানউদ্দীন ও স্টুয়ার্ড মুজিব বাড়ীর ভেতরে যান এবং আমি বাইরে অপেক্ষা করি। ১০/১৫ মিনিট পর উভয়েই বাইরে আসেন। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমাকে নগদ ৪ হাজার টাকা দেন। শেখ মুজিবর রহমানের নিকট হতে আমি যে চার হাজার টাকা এবং সাতশ' টাকা পাই তার থেকে আমি তিনশ' টাকা স্টুয়ার্ড মুজিব ও সুলতানউদ্দীনকে তাদের খরচের জন্য প্রদান করি। তারপর আমি হোটেলের বিল শোধ করি। এই সময় ভারতের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়।

বাদীপক্ষের কৌসুলী মঞ্জুর কাদির একথা রেকর্ড করার জন্য বলেন যে, সাক্ষী বলেছেন "আমি হোটেলের বিল শোধ করেছি।"

আদালত ভুল করে এর অর্থ করেছেন যে, নিজ পকেট হতে তিনি দিয়েছেন।

সাক্ষী বলেন, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমাকে বলেছেন যে, তিনি শেখ মুজিবর রহমানের নিকট হতে চার হাজার সাতশ' টাকা এনেছেন।

সাক্ষী বলেন, আমি বাকি টাকা আমার নিকট রেখে দিই।

কাদির–আপনি কতদিন ঢাকা ছিলেন?

সাক্ষী–আমি ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত ঢাকা থাকি। করাচী গমনের পরদিন আমি লেঃ মোয়াজ্জমের বাড়ী গমন করি। মিসেস মোয়াজ্জম হোসেনের সামনে আমি নগদ চার হাজার টাকা মোয়াজ্জেম হোসেনকে প্রদান করি। বাকী টাকা কিভাবে ব্যয় হয়েছে তাও আমি তাকে বলি।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৫ সালের নবেম্বর মাসে নূর মোহাম্মদ আমাকে কে জি আহমদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। কে জি আহমদ আমাকে করাচীতে আহমদ ফজলুর রহমান সিএসপি'র সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান তখন করাচীতে ফাইন্যান্স সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

সাক্ষী কাঠগড়ায় সঠিকভাবে আহমদ ফজলুর রহমানকে সনাক্ত করেন।

তিনি বলেন, ঐ মাসেই দুটি বাসায় আমাদের দুটি বৈঠক হয়। একটি লেঃ মোয়াজ্জমের পিএন কারসাজে এবং অপরটি জনাব আহমদ ফজলুর

রহমানের বাসা "ইলাকো হাউজে" অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বৈঠক হয় লেঃ মোয়াজ্জমের বাসায়। ঐ বৈঠকে লেঃ মোয়াজ্জম, জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, এক্স-কর্পোরাল সামাদ, নূর মোহাম্মদ ও আমি উপস্থিত ছিলাম । সামাদ ১৯৫৩ সাল হতে আমার সহকর্মী ছিল। তিনি ১৯৬৫ সালের নবেম্বরে আমাদের প্রতিষ্ঠানের কাজে যোগ দেন। অর্থাৎ আমি তাকে নবেম্বর থেকে দেখি।

সাক্ষী কাঠগড়ায় অভিযুক্ত সামাদকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

ঐ প্রথম বৈঠকে লেঃ মোয়াজ্জেম আমাদের বলেন যে, আমাদের কাজ পূর্ব পাকিস্তানে আরও জোরদার করতে হবে। এই কাজের জন্য স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, সুলতানউদ্দীন আহমদ চট্টগ্রামে রয়েছেন। তার মতে, ওরা উভয়েই হোলটাইম ওয়ার্কার্স। তিনি আরও বলেন যে, নিকট ভবিষ্যতে তিনি এক্স-কর্পোরাল সামাদ ও আমাকে এই বিদ্রোহী আন্দোলন ত্বরান্বিত করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান পাঠাবেন। তিনি আরও বলেন, তার কতিপয় ট্রানজিসটারাইজড ট্রান্সমিটার দরকার। তিনি আমাকে বলেন যে, আমার করাচীর চাকুরী ছেড়ে দিতে হবে এবং ঢাকায় আমাকে একটা ভাল চাকুরী দেবেন। এ ব্যাপারে তিনি স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও শেখ মুজিবর রহমানের নিকট পত্র লিখেছেন বলে জানান।

এই সভায় জনাব আহমদ ফজলুর রহমান লন্ডন হতে আমাদের জন্য কতিপয় ট্রানজিসটারাইজড ট্রান্সমিটার সংগ্রহ করে দেবেন বলে জানান। তিনি বলেন, তিনি তার ছোট ভাই যে লন্ডনে পড়াশুনা করছে তার কাছে এ ব্যাপারে লিখবেন। এরপর আমরা সভা শেষ করে চলে যাব। এর দু-তিনদিন পর "ইলাকো হাউজে" দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল মামলায় শুনানীর শুরুতে দু'নং সাক্ষী কামালউদ্দীনকে তার জবানবন্দী ও জেরার বিবরণ পাঠ করে তাতে দস্তখত করতে বলা হয়। তিনি এই লিপিবদ্ধ বিবরণ পাঠের সময় কতিপয় বক্তব্য সংশোধন করেন।

তিনি বলেন, সাক্ষ্যদানের সময় তিনি বলেছিলেন যে, নিজ ইচ্ছায় তিনি সামরিক হাজতে আছেন। কিন্তু একথা সত্য নয়। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে আটক রাখা হয়েছে।

একরারী সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া বলেন, নূর মোহাম্মদ, লেঃ মোয়াজ্জম, কে জি আহমদ, জনাব এ এফ রহমান ও আমি বৈঠকে মিলিত হই। বৈঠকে লেঃ মোয়াজ্জম আমাদের বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের আন্দোলনের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছে। লেঃ মোয়াজ্জম আরো বলেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের কার্যাবলী সম্পর্কে লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন ও স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান তাকে দিনের পর দিন ওয়াকিফহাল রাখছেন। তার পাওয়া

খবর অনুয়ায়ী পার্টি সদস্যসংখ্যা প্রায় তিন হাজার হয়েছে। তখন লেঃ মোয়াজ্জম এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, আন্দোলনের "ডি-ডে'র" জন্য তার পূর্ব পাকিস্তানে উপস্থিত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। জনাব কে জি আহমদ তখন লেঃ মোয়াজ্জমকে পূর্ব পাকিস্তানে বদলি করাবার ব্যাপারে নৌবাহিনীতে তার বন্ধুদের উপর প্রভাব বিস্তার করার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এরপরে বৈঠক শেষে আমরা চলে যাই।

ট্রানজিস্টার ট্রান্সমিটার

ঐ বৈঠকে কয়েকদিন পর লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম তার জন্য জনাব এ এফ রহমানের কাছ হতে একখানা চিঠি আদায় করতে বলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল লন্ডন থেকে ট্রানজিস্টারাইজড ট্রান্সমিটার সংগ্রহ করা। আমি এজন্য এলাকো হাউজে তার কাছে যাই এবং আমার সামনেই জনাব এ এফ রহমান লন্ডনে পাঠ্যবস্থায়রত তার ভাই জনাব শফিকুর রহমানের কাছে চিঠি লিখে দেন। আমি সে চিঠি এনে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জম হোসেনকে তার বাড়ীতে এসে দেই।

এক প্রশ্নের উত্তরে একরারী সাক্ষী বলেন, আমি এ বি খুরশীদকে চিনি। সে একজন এবল সীম্যান (সাক্ষী অভিযুক্ত এ বি খুরশীদকে সনাক্ত করেন)। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, সুলতানউদ্দীন ও এ বি খুরশীদ ১৯৬৫ সালের নবেম্বর মাসে চট্টগ্রামের নৌবাহিনীর ঘাঁটিতে ছিল। ১৯৬৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর যুদ্ধ লাগার পর স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও সুলতানউদ্দীন চট্টগ্রাম যায়। তখন রেডিওতে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, সামরিক বাহিনীর সকলকে কাজে যোগদান করতে হবে এবং তদনুযায়ী ৯ই সেপ্টেম্বর তারা চট্টগ্রাম যাত্রা করে। আমি তখন ঢাকায় ছিলাম ও আমি জানতে পারি যে, তারা চট্টগ্রাম জয়েন করেছে।

স্টুয়ার্ড মুজিবের চিঠি

১৯৬৫ সালের নবেম্বরে করাচীতে বসে আমি স্টুয়ার্ড মুজিবরের কাছ হতে একখানা কি দুখানা চিঠি পাই।

বাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীর হাতে একখানা চিঠি দিয়ে প্রশ্ন করেনঃ এ চিঠিখানা কি তারই এক খানা?

উঃ হ্যাঁ। আমি চিঠির সাথে একই খামে আরো একখানা চিঠি পাই। সে খানা লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদের কাছে লেখা হয়েছিল। আমার কাছে লেখা চিঠিখানা এ বি খুরশীদের হাতে লেখা তবে স্টুয়ার্ড মুজিবরের জবানবন্দীতে লিখিত। চিঠিখানার ইতি করা হয়েছে 'এম' অক্ষর দিয়ে অর্থাৎ স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান। একই খামের অপর চিঠিখানাও এ বি খুরশীদের হাতে লেখা এবং সেখানাও অনুরূপ 'এম' অক্ষর দিয়ে ইতি করা হয়েছে।

সাক্ষী চিঠিখানা পড়ে তার ব্যাখ্যাও দেন। চিঠিতে প্রথম সালাম জানিয়ে বলা হয়েছে যে, সে আমার দু'খানা চিঠি পেয়েছে। এ ব্যাপারে সাক্ষী ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, "উল্লিখিত দুখানা চিঠি সাক্ষী লেখেনি বরং লেঃ মোয়াজ্জম লিখেছিল।" "এম" লিখিত চিঠিতে বলা হয়েছে লেঃ মোয়াজ্জমের চিঠিতে বোঝা যাচ্ছে যে, সে তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। চিঠিতে আরো বলা হয় যে, যা কিছু লেখা হয়েছিল তা শেখ মুজিবর রহমানের নির্দেশক্রমেই লেখা হয়েছিল। চিঠিতে শেখ মুজিবরের নাম উল্লেখ নাই। তবে তাকে "বড় ভাই" রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। লেঃ মোয়াজ্জম হোসেনকেও চিঠিতে "বড় ভাই" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বড় ভাই প্রসঙ্গ

সাক্ষী বলেন, লেঃ মোয়াজ্জম হচ্ছেন করাচীতে "বড় ভাই" আর শেখ মুজিবর রহমান হচ্ছেন ঢাকায় "বড় ভাই" এই চিঠিতে শেখ মুজিবর রহমানকে এখানের "বড় ভাই" বলা হয়েছে। লেঃ মোয়াজ্জম হোসেন ও শেখ মুজিবর রহমান উভয়ই আমাকে বলেছিলেন যে, মোয়াজ্জম হোসেন স্টুয়ার্ড মুজিবরের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন কারণ তাকে যে টাকা পাঠাতে বলা হয়েছিল তা সে পাঠায়নি। চিঠিতে সে আরো লিখেছিল যে, আমাদের ঔষধের জন্য সকল ব্যবস্থাই করা হয়েছে। এই ঔষুধের অর্থ টাকাপয়সা তবে চিঠিতে বলা হয় যে, লোকের অভাবে তা পাঠানো যায়নি। তবে চিঠিতে আশা করা হয় যে, শীঘ্রই তা পাওয়া যাবে। চিঠিতে বলা হয় টাকার জন্য আপনারা চিন্তা করবেন না। আপনারা আপনাদের কাজ করুন খোদার রহমতে কাজকর্ম চলছে এবং আমরা আরো এগিয়েছি। এক মাসের মধ্যে আরো এগুবে। ক্রমেই আমরা ঘড়ের জন্য মিস্ত্রী ভালই পেয়েছি। সাক্ষী ঘরের মিস্ত্রীর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন এর অর্থ পার্টি কর্মী। চিঠিতে আরো বলা হয়, আমাদের নিঃস্বার্থভাবে আন্দোলনের জন্য কাজ করতে হবে। আগামী বর্ষার আগেই আমরা তৈরী হচ্ছি। আপনারা সকলে একমত থাকুন। আমার টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র চলে আসবেন। আপনারা আপনাদের কাজ করুন ও ঐ সময়ের জন্য তৈরী থাকুন। চিঠির পরের অংশ পাঠ করার সময় সাক্ষী বলেন যে, এখানে একটি শব্দ কাটা আছে। তারপরে আছে স্টেট-এর সাথে চেষ্টা করুন প্রয়োজনীয় মালপত্র আমার ও তা এখানে পাঠান। আমরাও এখানে চেষ্টা চালাচ্ছি এখানে যারা আছে তারা আমাদের সাথে আছে। আমরা সেই স্মরণীয় দিনের অপেক্ষায় আছি।

সাক্ষী বলেন, স্টুয়ার্ড মুজিবর লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীনকে চট্টগ্রাম বদলীর ব্যবস্থা করতে হবে। এ সময় পর্যন্ত তারা চট্টগ্রামের সাথে সংযুক্ত ছিল তবে আনুষ্ঠানিকভাবে বদলী হয়নি।

চিঠিতে আরো বলা হয়েছে, সে খুরসীদ আমাদের সাথে কাজ করছে এবং ভয়ানকভাবে খাটছে। সে কাজে আরো এগিয়েছে। আমি ও খুরশীদ এই উদ্দেশ্যে ঢাকা গিয়েছিলাম এবং আরো এগিয়েছি ও বহু সাফল্য অর্জন করেছি। তার এখানেই থাকা উচিত। (এখানে এ বি খুরশীদের কথা বলা হয়েছে। তাকে চট্টগ্রাম থেকে অন্যত্র যাতে না নেওয়া হয় আপনি তার ব্যবস্থা করুন)।

খুরশীদ ও সুলতান আপনাকে সালাম জানাচ্ছি। বর্তমানে এ কাজে খুবই ব্যস্ত। আনোয়ার জাহীদ করাচী গিয়েছিল। সে বড় ভাইয়ের খালু আনোয়ার জাহীদকে করাচীতে ১৪/১৫ দিন থাকতে হয়েছিল। যদি সম্ভব হয় আপনি তার সাথে দেখা করুন। এখানে সবই আল্লার রহমতে ভাল আছে। কুসাল কামনা করি। ইতি 'এম'

সাক্ষী কর্তৃক এই চিঠির ব্যাখ্যাদান ব্যাপারে বিবাদীপক্ষের সিনিয়র কৌসুলী খান বাহাদুর প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলেন যে, এভিডেন্স এ্যাক্ট-এর পরিপন্থীভাবে সাক্ষী চিঠির ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। যেসব বাক্য অস্পষ্ট শুধু সে ব্যাপারেই ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে।

গতকাল সাক্ষ্য এ পর্যন্ত গ্রহণের পর অসমাপ্ত অবস্থায় এ দিনের সেসন শেষ হয়।

দৈনিক পূর্বদেশ

৪ঠা আগস্ট ১৯৬৮

খাদ্য ও আটকাবস্থা সম্পর্কে ট্রাইব্যুনাল সমীপে শেখ মুজিবের অভিযোগ

গত শুক্রবার সকাল নয় ঘটিকায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণ আদালতকক্ষে আসন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্তদের কাঠগড়া থেকে 'ডক' হইতে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের মামলার প্রধান অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ট্রাইব্যুনালের নিকট সামরিক হেফাজতে বন্দীদশায় তাঁদের খাওয়া-দাওয়া, বাসস্থানের দুরবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন যে, সাতমাসের অধিককাল যাবৎ বহুবার অভিযোগ করা সত্বেও এ পর্যন্ত কোন প্রতিকার পাওয়া যায় নি। শেখ মুজিব আরও বলেন, 'আমি প্রায় ১০ বছর কারাভোগ করেছি; কিন্তু এমন অব্যবস্থা আর কখনও দেখিনি'। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান শেখ মুজিবর রহমানের অভিযোগগুলি ধৈর্য সহকারে শুনিতে থাকেন। শেখ মুজিবর রহমান জানান যে, সামরিক হেফাজতে অভিযুক্তদের যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তা গ্রহণে তাঁরা অভ্যস্ত নন। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ গত ৭ মাস যাবৎ কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানীয় খাদ্য সরবরাহের দাবী জানিয়ে আসছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের স্থানীয় খাদ্য রান্নাবান্নার জন্য স্বতন্ত্র বাবুর্চি নিয়োগের দাবী জানিয়েও এ পর্যন্ত কোন ফল হয়নি। শেখ মুজিব আরও

জানান যে, এমনকি সরবরাহকৃত খাদ্য গ্রহণে অভিযুক্তদের অসুবিধা নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানালে জনৈক মেজর তার উত্তরে বলেন, "খেতে না পারলে খাবেন না।" এ ব্যাপারে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার অনুমতিও তাঁরা পাননি।

শেখ মুজিবর রহমান আরও অভিযোগ করেন যে, বন্দী অবস্থায় তাঁদেরকে পরস্পরের সাথে কথাবার্তা বলতে কিম্বা আটক গৃহের বারান্দায় তাঁদের হাঁটাচলা করতে দেয়া হয় না। সকলকেই নির্জনকক্ষে বন্দী রাখা হয়েছে।তিনি বলেন যে, সামরিক হেফাজতে বন্দী অবস্থা 'নিয়ন্ত্রণের' যে বিধান রয়েছে তাও তিনি দেখেছেন। সেই বিধানেও নির্জনকক্ষে বন্দী রাখার কোন নিয়ম নেই। এমনকি বেসামরিক কারাগারের বিধানেও কাকেও তিন মাসের অধিক নির্জনকক্ষে বন্দী রাখার নিয়ম নাই। তিনি আটক কর্তৃপক্ষের কাছে আরও ভদ্র ব্যবহার আশা করেন বলে জানান। শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত অভিযোগসমূহের প্রতি ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উহার আশু প্রতিকার প্রার্থনা করেন।বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস,এ,রহমান শেখ মুজিবের এই অভিযোগ শ্রবণের পর বাদীপক্ষের প্রধান কৌশলী জনাব মঞ্জুর কাদেরকে এর বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। জনাব মঞ্জুর কাদের সামরিক বাহিনীর সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বিষয়টি জানাবার এবং ট্রাইব্যুনালকে তাঁদের বক্তব্য অবহিত করার প্রতিশ্রুতি দেন। শেখ মুজিবকে বহুদিন পর একবার দেখার জন্য গত ১লা আগষ্ট একজন বৃদ্ধ রাজনীতিক ট্রাইব্যুনাল কক্ষে দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ রাজনীতিক আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ দর্শকদের গ্যালারীতে চুপ করে বসে ছিলেন। তুলনামূলকভাবে কম বয়সের দর্শকদের কাছে তিনি পরিচিত নন।

এই বৃদ্ধের চোখে অশ্রু ছিল। অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় শেখ মুজিবকে দেখতে পেয়ে তিনি চঞ্চল হননি। দূর থেকে "মুজিবকে" এক নজর দেখতেই শুধু তিনি শহরের দূরপ্রান্তে গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিনের "রাজনৈতিক বন্ধু" শেখ মুজিবর তাকে অভিবাদন জানান। শেখ মুজিবকে এই দিন বিশেষ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। বিরতির সময় তিনি দর্শকদের মধ্যে বন্ধু ও কৌসুলীদের ডেকে কথা বলেন।

সংবাদ

৫ই আগস্ট ১৯৬৮

ঢাকা হাইকোর্টে আজ বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

১৯৬৮ সালের অপরাধ আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অর্ডিন্যান্স বলে গঠিত "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যের" মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া অদ্য (সোমবার) ঢাকা হাইকোর্টে

একটি রীট আবেদন পেশ করা হইবে। রীট আবেদনে অভিযুক্তদের বিচারের প্রশ্নে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার চ্যালেঞ্জ করা হইবে।

উল্লেখযোগ্য যে, প্রখ্যাত বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়মস কিউ, সি উক্ত রীট আবেদন পেশের জন্য উপরোক্ত মামলার এক নম্বর অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ হইতে গত শুক্রবার সকালে রীট আবেদন পেশের আবেদন পেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন।

ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বি,এ,সিদ্দিকী ও বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিমকে লইয়া গঠিত বেঞ্চ অদ্য (সোমবার) রীট আবেদন পেশের দিন ধার্য করিয়া আবেদনকারীর কৌসুলীকে জানাইয়া দেন।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৬৮ সালের অপরাধ আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অর্ডিন্যান্স অনুসারে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যের মামলার বিচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান, ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম, আর, খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিমকে লইয়া বিশেষ ট্রাইব্যুনালটি গঠিত হইয়াছে।

আরও উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম পর্যায়ের অধিবেশন মুলতবীর পর গত ২৯শে জুলাই বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইলে মিঃ উইলিয়মস উহার বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল উক্ত প্রশ্ন বিচারের স্থান নয় বলিয়া মাননীয় বিচারপতি জনাব এস,এ, রহমান মন্তব্য করেন।

সংবাদ

৫ই আগস্ট ১৯৬৮

আজ ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী পুনরায় শুরু

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান (ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান) এবং ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম,আর,খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিম সমবায়ে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যের" মামলার শুনানী দুইদিন মুলতবী থাকার পর আজ (সোমবার) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল মেসে পুনরায় শুরু হইবে। জুন মাসের ১৯ তারিখে এই মামলার প্রথম শুনানী আরম্ভ হয় এবং তিন দিন চলার পর শুনানী মুলতবী ঘোষণা করা হয়। ইহার পর গত ২৯শে জুলাই দ্বিতীয় পর্যায়ের শুনানী শুরু হয় এবং ৫ দিন চলার পর অদ্য সকাল ৯টা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের শুনানী শুরু হইলে প্রথমে ১নং রাজসাক্ষী লেঃ মোজাম্মেল হোসেন এবং মামলার অন্যতম সাক্ষী কামাল উদ্দীনকে জেরা

করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের শুনানীর তৃতীয় দিবসের শুনানীকালে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বাদীপক্ষের আবেদনক্রমে বাদীপক্ষের ২নং সাক্ষী জনাব কামালউদ্দীনকে "বৈরীভাবাপন্ন"(হোষ্টাইল উইটনেস) বলিয়া ঘোষণা করেন। সাক্ষী কামাল উদ্দীনের আবেদনক্রমে ট্রাইব্যুনাল তাঁহাকে মুক্তিদানের নির্দেশ দেন এবং তিনি মুক্তিলাভ করেন। জনাব কামালউদ্দীনের সওয়াল-জওয়াবের পর তৃতীয় সাক্ষী ও দ্বিতীয় রাজসাক্ষী জনাব আমীর হোসেনের জেরা শুরু হয়। শুক্রবার জনাব আমীর হোসেনের জেরা অসমাপ্ত থাকা অবস্থাতেই অধিবেশন অদ্য সকাল ৯টা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হয়। আজ তাঁহার অসমাপ্ত সাক্ষ্যগ্রহণ ও জেরা শুরু হইবে।

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যের মামলায় তিনজন সি,এস,পি অফিসার জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব এম, শামসুর রহমান খান এবং একজন লেফটেন্যান্ট কম্যাণ্ডার, একজন মেজর ও ৫জন ক্যাপ্টেনসহ মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে "ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থের সাহায্যে সশস্ত্র এবং অর্থের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাইয়া পাকিস্তানকে উহার একটি অঞ্চল (অর্থাৎ) পূর্ব পাকিস্তান হইতে বঞ্চিত করার" অভিযোগ করা হইয়াছে। আলোচ্য ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতারকৃত ১১ জনকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং তাঁহারা রাজসাক্ষী হইয়াছেন। এই মামলায় সরকারপক্ষে মোট ২শত ৩২ জন সাক্ষী সাক্ষ্যদান করিবেন।

প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মঞ্জুর কাদেরসহ ৫জন আইনজীবী সরকারপক্ষে ও প্রখ্যাত বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়মস শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে এবং জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব মসিউর রহমান, জনাব জহিরউদ্দিন, মীর্জা গোলাম হাফিজ, জনাব ভিখারুল ইসলাম চৌধুরী, খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল প্রমুখ প্রদেশের প্রায় ৬০ জন বিশিষ্ট আইনজীবী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করিতেছেন।

অদ্য অধিবেশন শুরু হইলে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার অসমাপ্ত সাক্ষ্য গ্রহণ পুনরায় শুরু হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

৫ই আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আজ পুনরায় শুরু

(স্টাফ রিপোর্টার)

দু'দিন অবকাশের পর আজ সোমবার সকাল ৯ টায় কুর্মিটোলা সেনানিবাসের সিগনালস মেসে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য-এর "ষড়যন্ত্র" মামলার" শুনানী পুনরায় শুরু হবে।

বিচারপতি জনাব এস,এ,রহমান, বিচারপতি জনাব এম, আর, খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকীমকে নিয়ে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এ পর্যন্ত বাদীপক্ষের দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়েছে ও তৃতীয় সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার সাক্ষ্য গ্রহণ চলছে। ইতিপূর্বে বাদীপক্ষের দু'নম্বর সাক্ষী জনাব কামালউদ্দীনের সাক্ষ্য গ্রহণকালে বাদীপক্ষ তাকে বিরুপ সাক্ষী বলে ঘোষণা করেন।

আজাদ

৬ই আগস্ট ১৯৬৮

সরকার ও মেজর এ,বি, এম নাসেরের উপর রুল জারীঃ
১৫ই আগষ্টের মধ্যে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ
ঢাকা হাইকোর্টে রীট আবেদন পেশ
বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্য্যক্রমের বৈধতা চ্যালেঞ্জ

(হাইকোর্ট রিপোর্টার)

গতকাল সোমবার ঢাকা হাইকোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চ সমীপে জনাব শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ হইতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্য্যক্রমের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া এক রীট আবেদন পেশ করা হয়।

উপরোক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি জনাব বি,এ, সিদ্দিকী ও বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম পাকিস্তান সরকার এবং মেজর এ, বি, এম, নাসেরকে এই মর্ম্মে কারণ দর্শাইতে বলিয়াছেন যে, কেন বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্য্যক্রমকে এখতেয়ার বহির্ভূত বিধায় অবৈধ ও আইনের দৃষ্টিতে মূল্যহীন বলিয়া ঘোষণা, উক্ত কার্যক্রম খারিজ করার এবং আবেদনকারীকে মুক্তি দেওয়ার নির্দ্দেশ প্রদান করা হইবে না।

বিচারপতিদ্বয় চলতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে প্রতিবাদীদের কারণ দর্শাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

উপরোক্ত আবেদনে ফৌজদারী আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অর্ডিন্যান্সের (১৯৬৮) বিধান মতে সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সমীপে বিচারাধীন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত সরকার বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলার কার্য্যক্রমের বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত মামলার শুনানী গত ১৯শে জুন তারিখে শুরু হয়। এখন উক্ত মামলার বাদীপক্ষের ... নম্বর সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইতেছে। আবেদনকারী রীট আবেদনে অভিযোগ করেন

যে, তিনি দেশের সর্ব্ব বৃহৎ বিরোধী দল পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি তাঁহাকে ১৯৬৬ সালের মে মাসে দেশরক্ষা আইনের ৩২ বিধিবলে গ্রেফতার করা হয়। আবেদনকারী আরও বলেন যে, জনসভায় বক্তৃতাদানের দায়ে তাঁহার বিরুদ্ধে পূর্ব্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় প্রায় দশটি মামলা দায়ের করা হয়।

আবেদনকারী অনুরূপ একটি মামলায় খালাস পাইয়াছেন এবং দুইটি মামলা বিচারাধীন রহিয়াছে। একটি মামলা জনৈক বিশেষ ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে বিচারাধীন ছিল এবং গত ২৩শে জানুয়ারী উক্ত মামলার রায় প্রদানের দিন ধার্য্য ছিল। আবেদনকারী উক্ত মামলার ফলাফল সম্পর্কে এখনও অবগত নহেন।

আবেদনকারী দেশরক্ষা আইনে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলেন। গত জানুয়ারী মাসের ১৭/১৮ তারিখে আবেদনকারীকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সদর দরজায় অবস্থিত জেল অফিসে আনা হয় এবং ১৭ই জানুয়ারী তারিখ সম্বলিত একটি আদেশ তাহার উপর জারি করা হয়। উক্ত আদেশ দেশরক্ষা আইনে আবেদনকারীর মুক্তি সম্পর্কে ছিল। মুক্তির আদেশ থাকা সত্ত্বে আবেদনকারীকে তখন কিংবা পরে প্রকৃতপক্ষে এক সেকেণ্ডের জন্য মুক্তি প্রদান করা হয় নাই।

অতঃপর আবেদনকারী লেফটেন্যান্ট শরীফের নেতৃত্বাধীনে পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর কতিপয় ব্যক্তিকে দেখিতে পান। উক্ত ব্যক্তিরা জোরপূর্ব্বক তাঁহাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে লইয়া যান। আবেদনকারী উপরোক্ত ব্যক্তিদের নিকট তাঁহার আটক সম্পর্কে জারিকৃত সংশ্লিষ্ট আদেশ দাবী করেন। কিন্তু আবেদনকারীর উপর কোনরূপ আদেশ জারি করা হয় নাই। কিংবা কোন আদেশ তাঁহাকে প্রদর্শন করা হয় নাই।

গত জানুয়ারী মাসের ১৭/১৮ তারিখের রাত্রিবেলা হইতে আবেদনকারীকে একটি নির্জ্জন ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট ঘরের জানালাগুলিতে লাল রং দেওয়া হয়। ফলে তিনি দিনের আলো হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। আবেদনকারী নির্জ্জন ঘরে বন্ধ থাকেন এবং বহিজগতের সহিত তাঁহার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে। উক্ত সময়ে বই ও সংবাদপত্র পাঠ এবং রেডিও শ্রবণ করা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হয়। উক্ত সময়ে আবেদনকারীকে তাঁহার আত্মীয়পরিজন ও বন্ধুবান্ধব কিংবা তাঁহার উকিলদের সহিত সাক্ষাতের সুযোগও প্রদান করা হয় নাই। উক্ত সময়ে শুধুমাত্র প্রহরী এবং সামরিক অফিসারদের সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ ছিল। আবেদনকারীকে নির্জ্জনে রাখিয়া তীব্র মানসিক যন্ত্রণা

দেওয়া হয়। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তাহা অবগত না কারাইয়াই তাঁহার সহিত উপরোক্ত ব্যবহার করা হয়।

অতঃপর গত ১৯শে জুন তারিখে আবেদনকারীকে ফৌজদারী আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অর্ডিন্যন্স মোতাবেক গঠিত কুরমিটোলাস্থ বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সমীপে আনয়ন করা হয়। আবেদনকারীকে ভারত কর্ত্তৃক সরবরাহকৃত অস্ত্রের দ্বারা সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব্ব পাকিস্তানের উপর পাকিস্তানের যে সার্ব্বভৌমত্ব রহিয়াছে উহা হরণ এবং সেনাবাহিনীর লোকদের বিদ্রোহের ব্যাপারে সাহায্য করার দায়ে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১ (ক) ও ১৩১ ধারা মোতাবেক অভিযুক্ত করা হয়। উপরোক্ত অপরাধ ১৯৬৪-১৯৬৭ সালে সংঘটিত হয় বলিয়া অভিযোগ করা হয়। যদিও ১৭/১৮ জানুয়ারী তারিখে উপরোক্ত ফৌজদারী আইন সংশোধনী অর্ডিন্যান্স জারি হয় নাই তথাপি আবেদনকারীকে সেনাবাহিনীর হেফাজতে রাখা হয়। সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে আনয়ন করার কিছু পূর্ব্বে উপরোক্ত অভিযোগসমূহ আবেদনকারীকে জানান হয়।

আবেদনকারী দাবী করেন যে, তিনি নির্দোষ এবং তিনি কখনই পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ কিংবা সেনাবাহিনীর কোন ব্যক্তিকে বিদ্রোহ করা সম্পর্কে প্রলুব্ধ করেন নাই।

আবেদনকারী বলেন যে, অপরপক্ষে তিনি গত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় সমূহ উদ্যম প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণ বহু সংস্কারের স্বপক্ষে বক্তব্য প্রকাশ করেন যাহা তাঁহার প্রকাশিত বিবৃতি এবং পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ছয় দফায় স্থান পাইয়াছে।

অভিযোগে দেখা যায় যে, তাহার কার্য্যাবলী ১৯৬৪ হইতে ১৯৬৬ সালের মধ্যে সীমিত রহিয়াছে। যখন আবেদনকারীর তথাকথিত আপত্তিকর কর্ম্মে লিপ্ত হন তখনকার প্রচলিত আইন মোতাবেক বিচার হওয়ার ব্যাপারে আবেদনকারীর অধিকার ছিল। পরবর্ত্তীকালে সংশ্লিষ্ট অর্ডিনান্স জারির মাধ্যমে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও মামলাকে আবেদনকারীর পক্ষে অসুবিধাজনক করা হইয়াছে। আবেদনকারীকে যখন জোরপূর্বক সেনাবাহিনীর হেফাজতে লইয়া যাওয়া হয়। তখন শাসনতন্ত্র মোতাবেক পাকিস্তানের একজন নাগরিক হিসাবে তিনি ফৌজদারী কার্যবিধি এবং সাক্ষ্য সম্পর্কিত আইন (এভিডেন্স এ্যাক্ট) অনুযায়ী তথাকথিত অভিযোগের দায়ে বিচারাধীন হইতে পারিতেন। উপরোক্ত ফৌজদারী আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অর্ডিনান্স (১৯৬৮) জারি হওয়ায় তিনি প্রাথমিক অনুসন্ধান সম্পর্কিত ফৌজদারী কার্য্যবিধির ষোড়শ অধ্যায়ের ষষ্ঠ অংশে প্রদত্ত সমূহ

সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে নির্দ্দিস্ট সময়ে হাজির করা এবং প্রচলিত আইনানুযায়ী পরিচালিত হইবার অধিকার হারাইয়াছেন। উক্ত অর্ডিনান্সের ভিত্তিতে বিশেষ ট্রাইবুনালকে জরুরী সাহায্য ব্যতীতই বিচারের এখতেয়ার দেওয়া হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট অর্ডিন্যান্স কেন্দ্রীয় সরকারকে বিচারের স্থান নির্দ্দিষ্ট করার অধিকার দিয়াছে। উক্ত বিধানের ভিত্তিতে ঢাকা শহর হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরে বিচারের স্থান নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। ফলে আসামীদের কৌসুলী এবং পরিবারবর্গকে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। সাক্ষ্য সম্পর্কিত আইনে পরিবর্তন ঘটিয়াছে ফলে যাহা পূর্ব্বে সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে আইনসিদ্ধ ছিল না তাহা আইনতঃ গ্রাহ্য হওয়ার যোগ্য হইয়াছে। উক্ত অর্ডিন্যান্সের ফলে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের শাস্তি কঠোর হইয়াছে এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধির উনত্রিশ অধ্যায় ও চতুর্থ খণ্ডের প্রয়োগকে বহিষ্কৃত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট অর্ডিন্যান্স আবেদনকারীকে অনির্দ্দিকালের জন্য আটক রাখার এখতেয়ার অর্পণ করিয়াছে। সংশ্লিষ্ট অর্ডিন্যান্স ট্রাইব্যুনালের রায়কে চূড়ান্ত করিয়াছে এবং আপীল এবং পূনর্ব্বিচারের অধিকার হরণ করিয়াছে। সংশ্লিষ্ট অর্ডিন্যান্স সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আবেদনকারীকে অন্তরীণ এবং রাজসাক্ষীদের তাহাদের হেফাজতে রাখার এখতেয়ার প্রদান করিয়াছে। সংশ্লিষ্ট অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে জামিনে মুক্তিলাভের অধিকার হইতেও আবেদনকারীকে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

আবেদনকারীর পক্ষে আরও অভিযোগ করা হয় যে, সংশ্লিষ্ট অর্ডিন্যান্স শাসনতন্ত্রের ৩০ দফার পরিপন্থী। উক্ত অর্ডিন্যান্সকে অতীত বিষয় সম্পর্কে প্রযোজ্য করা হইয়াছে এবং উহা শাসনতন্ত্রের ২ ও ৬ দফায় রক্ষিত মৌলিক অধিকার।

আবেদনকারীর অভিযোগের যৌক্তিকতা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য উপরোক্ত বিচারপতিদ্বয় সংশ্লিষ্ট রীট আবেদনটী প্রাথমিক শুনানীর পর গ্রহণ করেন এবং ১ ও ৩নং প্রতিবাদীদের উপর কারণ দর্শাইবার জন্য উক্ত রুলটি জারী করেন।

উপরোক্ত বিচারপতিদ্বয় উক্ত মামলার শুনানীর সময় পাকিস্তানের এর্টনী জেনারেল ও পূর্ব্ব পাকিস্তানের এডভোকেট জেনারেলকে উপস্থিত থাকার জন্যও এক আদেশ দিয়াছেন।

আবেদনকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন মিঃ টমাস উইলিয়ামস ও জনাব আমিরুল ইসলাম এবং তাঁহাদের সাহায্য করেন জনাব মইনুল হোসেন ও জনাব মওদুদ আহমদ।

আজাদ

৬ই আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার জবানবন্দী দান অব্যাহত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলায় রাজসাক্ষী আমির হোসেন মিয়ার জবানবন্দী দান গতকাল সোমবারও অব্যাহত থাকে। গতকাল পর্য্যন্ত তিন দিনব্যাপী তিনি জবানবন্দী দিয়াছেন। আগামীকাল মঙ্গলবারও তিনি বাদীপক্ষের কৌসুলীয় প্রশ্নের জবাবদানের মাধ্যমে জবানবন্দী দিবেন। গতকাল সকাল নয়টায় কুর্মিটোলায় সেনানিবাসে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন দুইদিন বিরতির পর আরম্ভ হয়, বিচারপতি জনাব এস,এ,রহমান সভাপতিত্ব করেন। রাজস্বাক্ষী আমীর হোসেন গতকাল কয়েকটি পত্র ও একটি ডাইরী সনাক্ত এবং উক্ত ডাইরী ও চিঠির বক্তব্য ব্যাখ্যা করেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী খান বাহাদুর ইসমাইল ও আবদুস সালাম খান উক্ত ডাইরী ও পত্রসমূহ সম্পর্কিত ব্যাখ্যার ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালের নিকট আপত্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

রাজসাক্ষী আমীর হোসেন লেঃ মোয়াজ্জেম কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া কথিত একটি ডাইরী হইতে উদ্ধৃতি দিয়া দাবী করেন যে, তাহাকে ঢাকাস্থ ভারতীয়, চীনা ও যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল- জেনারেলদের সাথে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অর্থ সাহায্য এবং সমর্থনের জন্য যোগাযোগ করিতে নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল। তাহাকে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ উজির এ সবুর খানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে জ্ঞাত করানোর জন্যও ডাইরীতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া রাজসাক্ষী দাবী করেন।

তাহাছাড়া মামলার সাথে জড়িত সাতজন অভিযুক্ত ব্যক্তি ও দুইজন রাজসাক্ষীর সাংকেতিক নামের তালিকা ও একটি তথ্যের তালিকা উক্ত ডাইরীতে রহিয়াছে বলিয়া রাজসাক্ষী দাবী করেন।

রাজসাক্ষী আমির হোসেন বাংলায় লেখা দুইটি চিঠি সেনাক্ত করেন। একটি তাহার নিজের কাছে এবং অপরটি অভিযুক্ত নূর মোহাম্মদের কাছে লেখা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, অভিযুক্ত ষ্টুয়ার্ড মুজিব কর্ত্তৃক ১৯৬৫ সালের নবেম্বর অথবা ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে চিঠি লেখা হইয়াছিল। রাজসাক্ষী বলেন যে, নূর মোহাম্মদের নিকট লিখিত চিঠিতে অভিযুক্ত ষ্টুয়ার্ড মুজিব পূর্ব পাকিস্তান হইতে জানাইয়াছেন, তাহাদের দলের (বিচ্ছিন্নতাবাদী) কাজ ভালই চলিতেছে এবং বেশ কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। পত্রে তিনি করাচীতে কেমন কাজ হইতেছে তাহা জানিতে চাহেন।

করাচী গুরুপের সহিত কাজ করাইবার সোপারেশ করিয়া ষ্টুয়ার্ড মুজিব পত্রে গোলাম মোহাম্মদ নামক জনৈক ব্যক্তির পরিচয় দান করেন। সাক্ষী আরও বলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিব তাহাকে চট্টগ্রাম রাখার ব্যবস্থা করিবার জন্য লেঃ মোজাম্মেলকে বলার জন্য পত্রে নূর মোহাম্মদকে উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, গোলাম মোহাম্মদকে তিনি আগেই চিনিতেন এবং সে সুলতান উদ্দিন ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবের সহকর্মী।

রাজসাক্ষী আরও বলেন যে, ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ষ্টুয়ার্ড মুজিবের হস্তাক্ষরে বাংলায় লিখিত একটি পত্র পান। পত্রটিরনংরাজী অনুবাদ প্রদান করা হইলে তিনি বলেন যে, অনুবাদ ঠিক হইয়াছে।

বাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে আমীর হোসেন বলেন যে, পূর্বে লিখিত "বড় ভাই" অর্থ শেখ মুজিবর রহমান। তিনি বলেন যে, "বড় ভাই" অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন অর্থ শেখ মুজিবর রহমান অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। "তোমার দিকের বড় ভাই" অর্থ করাচীর লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম।

বাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী বলেন যে, পত্রে লিখিত আমাদের জিনিসপত্র অর্থ অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং 'তহবিল' অর্থ শেখ মুজিবর রহমানের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

বাদীপক্ষের কৌসুলী রাজসাক্ষীকে বাংলায় লিখিত অপর একটি পত্র প্রদান করিলে রাজসাক্ষী বলেন যে, পত্রটি ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ষ্টুয়ার্ড মূজিব নিজের হাতে আমার নিকট লিখিয়াছিল। তিনি বলেন যে, এই পত্রে ষ্টুয়ার্ড মুজিব লিখিয়াছিলেন যে, রোগীর অবস্থা খুবই ভাল। রাজসাক্ষী বলেন যে 'রোগী' অর্থ পূর্ব্ব পাকিস্তান।

আমীর হোসেন বলেন যে, পত্রে ষ্টুয়ার্ড মুজিব আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি সুলতান উদ্দিনের সাথে আমার চাকুরীর খোঁজে ঢাকা গিয়াছিলেন এবং আমাকে ঢাকা লইয়া যাইতে কিছু সময় লাগিবে। রাজসাক্ষী বলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর তাহার পত্রে আমাকে টাকা পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন। পত্রে টাকার অর্থ হিসাবে "ঔষধ" লেখা হইয়াছিল। রাজসাক্ষী আরও বলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিব পত্রে লিখিয়াছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তানে তাহারা বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন। সাক্ষী বলেন যে, এখানে ভারতের কথা বলা হইয়াছে।

আমীর হোসেন বলেন যে, ৬ই ডিসেম্বর লিখিত পত্রে ষ্টুয়ার্ড মূজিব বলিয়াছিলেন যে, তাহাকে ভুল বোঝা "বড় ভাই" (লেঃ মোয়াজ্জেম) এর উচিত হইবে না। ষ্টুয়ার্ড মূজিব আরও জানাইয়াছিলেন যে,তাহার সহিত শেখ মুজিবর রহমানের ঝগড়া হইয়াছে এবং শেখ মুজিবর রহমান তাহার সহিত ঝগড়ার জন্য লজ্জিত।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী রাজসাক্ষীকে একটি পত্র প্রদান করিলে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন বলেন যে, ১৯৬৫ সালে ডিসেম্বর মাসে সুলতান উদ্দিন আমাকে উক্ত পত্রটি লিখিয়াছিল।

আমীর হোসেন বলেন যে, পত্রে আমাকে 'উক্ত দেশের' সকল কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করিতে বলা হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, "উক্ত দেশ" অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুতাবাস। রাজসাক্ষী বলেন যে, উক্ত পত্র পাওয়ার পরে নূর মোহাম্মদ দুইটি পত্র এবং দুই হাজার দুই শত টাকা লইয়া আমার নিকট আসে। নুর মোহাম্মদের মতে ষ্টুয়ার্ড মুজিব ও সুলতান উদ্দিন চট্টগ্রাম হইতে আগত বাণিজ্য জাহাজের জনৈক ষ্টুয়ার্ডের মাধ্যমে উক্ত টাকা প্রেরণ করিয়াছে। রাজসাক্ষী আরও বলেন যে, আমরা উভয়েই কারসাজ-এর লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমের বাসায় যাই এবং আমার উপস্থিতিতে নুর মোহাম্মদ লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমের হাতে দুই হাজর দুইশত টাকা এবং পত্র দুইটি প্রদান করে।

রাজসাক্ষী বলেন যে, লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম রাগ দেখান। তিনি বলেন যে, কারণ হইল লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমের মতে ষ্টুয়ার্ড মুজিব ও সুলতানউদ্দিন তিন হাজার টাকা গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু পাঠাইয়াছে মাত্র দুই হাজার দুইশত টাকা।

একটি ডাইরী

রাজসাক্ষী বলেন, তিনি ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব্ব পাকিস্তানে বদলী হওয়ার ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানান। ঢাকা আসিবার পূর্ব্বে তিনি করাচীতে লেঃ মোয়াজ্জেমের বাসায় যান এবং তিনটি ডাইরী তাহাকে দেওয়া হয়। তাহার একটি ডাইরীতে লেঃ মোয়াজ্জেম নিজ হাতে কাজ করার কতিপয় নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া রাজসাক্ষী দাবী করেন। এই সমস্ত নির্দ্দেশ রাজসাক্ষীকে পূর্ব্ব পাকিস্তানে থাকাকালে মানিয়া চলিতে হইবে।

ডাইরীর একটি পৃষ্ঠায় মামলার সাথে জড়িত নয় ব্যক্তির সাংকেতিক নাম লেখা রহিয়াছে বলিয়া রাজসাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলেন। তিনি নয়জনের সাংকেতিক নামও ব্যাখ্যা করেন।

আমীর হোসেন উক্ত ডাইরীর একটি পৃষ্ঠায় লিখিত নির্দ্দেশাবলীর বর্ণনা দেন এবং বলেন যে, এই সমস্ত নির্দ্দেশ "জরুরী"। প্রথম নির্দ্দেশে রাজসাক্ষীকে ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশনের ডাইরেক্টর কে,জী, আহম্মদের সাথে যোগাযোগ করিয়া লেঃ মোয়াজ্জেমের পূর্ব পাকিস্তানে বদলীর ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহাকে বলিতে বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ ঢাকায় তাহার নিজের থাকার জন্য এবং ভারত হইতে আমদানীকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখিবার প্রয়োজনে একটি বাসা ভাড়া করিতে বলা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ এক্সকর্পোরাল সামাদ ও দোহা (সামাদের বন্ধু) যদি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগদান করেন তবে রাজসাক্ষীকে তাহাদের চাকুরীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। চতুর্থতঃ শেখ মুজিব ও অন্য যে কোন উৎস হইতে নির্দ্দেশে তাহাকে অর্থ সংগ্রহ করিতে বলা হইয়াছে। পঞ্চম জরুরী নির্দ্দেশে তাহাকে ষ্টুয়ার্ড মূজিব ও সুলতানউদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাজের অগ্রগতি ও নূতন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে বলা হইয়াছে। ষষ্ঠ নির্দ্দেশে তাহাকে কে, জী আহম্মদের নিকট হইতে একটি জীপ সংগ্রহ করিতে বলা হয়।

রাজসাক্ষী লেঃ মোয়াজ্জেমকে বলিয়াছিলেন যে, আন্দোলনের কাজের জন্য একটি জীপের প্রয়োজন হইবে। লেঃ মোয়াজ্জেম এ, এফ রহমানকে (সিএসপি) একটী জীপ সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিলেন। জনাব রহমান জানাইয়াছিলেন যে, কে, জী আহম্মদের একটী জীপ রহিয়াছে এবং তাহা পাওয়া যাইবে। কিন্তু তিনি ঢাকায় আসিয়া জানিতে পারেন যে, উক্ত জীপটি কামাল উদ্দিনের। সপ্তম নির্দ্দেশে তাহাকে সুলতান ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে " "যে কোন প্রতিশ্রুতিতে যে কোন উৎস হইতে তহবিল সংগ্রহ করিতে বলা হয়।"

উক্ত ডাইরীতে "অতি জরুরী নহে" এই শিরোনামায় চারিটি নির্দ্দেশ রহিয়াছে। প্রথম নির্দ্দেশে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ উজির জনাব খান আবদুস সবুর খানের সাথে যোগাযোগ করিতে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তাহাকে ঢাকায় ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের (ইউ, এস, এ) কন্সাল জেনারেলদের সাথে সাহায্য, অর্থ, গোলাবারুদ ও অস্ত্র পাওয়ার ব্যাপারে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলনের প্রতি স্ব স্বদেশের সমর্থনের জন্য যোগাযোগ করিতে বলা হয়। তৃতীয়তঃ যদি শেখ মুজিবর রহমান অস্ত্র ও গোলাবারুদ আনিয়া থাকেন তবে তাহা রাজসাক্ষীকে ডেলীভারী নিতে বলা হইয়াছে।

চতুর্থতঃ রাজসাক্ষীকে যে কোন প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে কাজ করাইয়া লইতে বলা হইয়াছে।

তথ্য তালিকা

রাজসাক্ষী বলেন যে, ডাইরীর পর পৃষ্ঠায় "বিচ্ছিন্নকরণ পরিকল্পনা" কার্য্যকরী করা সম্পর্কে তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করা রহিয়াছে। এই সম্পর্কে যে ব্যাপক তথ্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে উহার মধ্যে কারখানার সংখ্যা, স্কুল ও কলেজসমূহের নাম, মালিক ও ডিরেক্টরের নামসহ সমুদ্রগামী জাহাজের নাম এম,এন, এ, এম, পি, এ, ১৯৪৭ সাল হইতে উজিরদের নাম, কারাগারে আবদ্ধ বন্দীদের

নাম ও তাহাদের মুক্তি লাভের সম্ভাব্য দিন, বিশ্বাসী পুলিশ ও সিভিল সার্ভিস অফিসারদের নাম ইত্যাদি তালিকায় ঢাকা, কুমিল্লা এবং যশোর ক্যান্টনমেন্টের ম্যাপ রহিয়াছে। রাজসাক্ষী বলেন যে, আমি জনৈক সুবেদার আশরাফের নিকট হইতে একটি ক্যান্টনমেন্টের নক্সা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু ইহা কোন ক্যান্টনমেন্টের তাহা আমি জানি না। রাজসাক্ষী বলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিব আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের জনৈক মহকুমা অফিসারের নিকট হইতে কিছু ম্যাপ সংগ্রহ করিয়াছেন।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী রাজসাক্ষীকে তিনখানি আলগা কাগজ দেন। রাজসাক্ষী বলেন যে, এই কাগজগুলি উক্ত ডায়রীর অংশ এবং উহা হইতে ছেঁড়া হইয়াছে। ডায়রীতে লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী উক্ত আন্দোলনের নবাগতদের শপথ লইয়া বলিতে হইবে যে, তাহাদের সততার সহিত কাজ করিতে হইবে এবং কোন গোপন কথা প্রকাশ করিবেন না।

রাজসাক্ষী বলেন যে, আমার একটা গোপন টেলিফোন পাওয়ার কথা ছিল যাহাতে আমি ধরা না পড়িয়া লেঃ মোয়াজ্জেমের সহিত কথা বলিতে পারি। তিনি বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেম বিচ্ছিন্নকরণ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদের স্বহস্তে লিখিত একটি তালিকা আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

রাজসাক্ষীকে চারখানি আলাদা কাগজ প্রদান করা হইলে তিনি সনাক্ত করেন যে, কাগজগুলিই লেঃ মোয়াজ্জেম তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। সাক্ষী বলেন যে, কাগজ চারটি দুইখানি লেঃ মোয়াজ্জেমের হাতে লেখা অপর দুইটি কাহার হাতের লেখা তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু সব কাগজই ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা যাওয়ার পূর্ব্বে লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে দিয়াছিলেন।

আমীর হোসেন বলেন যে, ফেব্রুয়ারী মাসের দুই তারিখে আমি ঢাকা আসি এবং দুইদিন পরে চট্টগ্রাম যাই এবং মিস্কা হোটেলে অবস্থান করি। চট্টগ্রামে একটি বৈঠক করি। বৈঠকে ষ্টুয়ার্ড মুজিব, সুলতান উদ্দিন, খুরশীদ, পোর্ট অফিসার রহমান ও লেঃ হক উপস্থিত ছিলেন।

রাজসাক্ষী বলেন যে, 'ষ্টুয়ার্ড মুজিব পূর্ব্ব পাকিস্তানে তাহাদের কার্য্যকলাপের বর্ণনা দান করেন এবং তিনি ও খুরশীদ যে সকল সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের সহিত যোগাযোগ করিয়াছেন' তাহাদের নামের তালিকা প্রদান করেন। রাজসাক্ষী বলেন যে, আমি ব্যক্তিগত ডাইরীতে উক্ত নামের তালিকা লিখিয়া নিই। তিনি বলেন যে, বৈঠকে ষ্টুয়ার্ড মুজিব বলেন যে, পরবর্তী বর্ষকাল মধ্যে তাহারা তৈরী থাকিবেন।

আজাদ
৬ই আগস্ট ১৯৬৮

মঞ্জুর কাদের কর্তৃক মুজিবের অভিযোগের জবাব দান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের গতকাল সোমবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালের নিকট জানান যে, নিরাপত্তার কারণে অভিযুক্তদের রন্ধন করার জন্য পৃথক পাচক নিযুক্ত করা সম্ভব নহে।

তিনি বিশেষ ট্রাইব্যুনালকে জানান যে, চাকুরীরত অফিসারগণ মেসে যে খাদ্য গ্রহণ করেন, প্রথম শ্রেণীর অভিযুক্তদের সেই খাদ্যই সরবরাহ করা হইয়া থাকে। তবে কার্য্যরত অফিসারগণ ডাইনিং রুমে আহার গ্রহণ করেন এবং অভিযুক্তগণ নিজ নিজ কক্ষে খাদ্য খান। গ্রুপ ক্যাপটেন আসলাম উক্ত মেসে একই খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

গত শুক্রবার অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমান প্রধানতঃ অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, অভিযুক্তদের যে খাদ্য সরবরাহ করা হইয়া থাকে সেই খাদ্যে তাহারা অভ্যস্ত নহেন এবং তিনি ছাড়া অন্যান্যদের কক্ষের বারান্দায় আসিতে দেওয়া হয় না। সেই সময় তিনি "স্থানীয় খাদ্য" সরবরাহের কথাও উল্লেখ করেন এবং তাহাদের দাবী অনুযায়ী একজন পৃথক পাচক নিযুক্ত করা হয় নাই বলিয়া ট্রাইব্যুনালকে জানায়।

জনাব মঞ্জুর কাদের গতকাল শেখ মুজিবর কর্তৃক ইতিপূর্ব্বে উত্থাপিত উক্ত অভিযোগের জবাবে বক্তব্য পেশ করিতেছিলেন। তিনি এই সমস্ত অভিযোগ সম্পর্কে তত্ত্বাবধানেয় দায়িত্বসম্পন্ন ব্রিগেডিয়ারের সাথে আলাপ করিয়াছেন।

তিনি বলেন, অভিযুক্তদের দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যাহারা পূর্ব্বে অফিসার ছিলেন এবং যেসমস্ত বেসামরিক অভিযুক্ত ব্যক্তি মর্য্যাদাসম্পন্ন তাহাদের একটি শ্রেণীতে এবং যাহারা অন্যান্য পদধারী (র‍্যাঙ্ক) ও যে সমস্ত বেসামরিক অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাদের মর্য্যাদায় পড়েন তাহাদের অপর শ্রেণীতে রাখা হইয়াছে।

অভিযুক্তদের খাদ্য তালিকায় ভাত, চাপাতি এবং চপ ইত্যাদি যুক্ত ইউরোপীয় ডিস রহিয়াছে। তবে ভাত দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। তাহাদের সপ্তাহে তিনবার মাছ দেওয়া হইয়া থাকে।

তিনি জানান অভিযুক্তদের প্রত্যহ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়–অবশ্য যাহারা পুরাতন ব্যাধিতে ভুগিতেছেন তাহাদের নয়। তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল আছে এবং তাহাদের অনেকের ওজন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জনাব মনজুর কাদের আরও বলেন, অভিযুক্তদের শরীর চর্চার জন্য বাহিরে লইয়া যাওয়া হয় এবং ব্যায়ামের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

তিনি বলেন, তাহাদের নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখা হয় না। অভিযুক্তদের দুইজনকে একটি কক্ষে রাখা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা তিনজনও এক কক্ষে রহিয়াছেন।

শেখ মুজিবর রহমানকে বারান্দায় যাইতে দেওয়া হয় একথা ঠিক। সামরিক তত্ত্বাবধান নির্দ্দিষ্ট বিধি (রুলস) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যান্যদের বারান্দায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন যে, ইহাতে শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইতে পারে।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব সালাম খান বলেন যে, এই কথা স্বীকার্য্য যে, খাদ্য ভাল। কিন্তু বাঙালী খাদ্য এমনকি সামরিক তত্ত্বাবধানেও তৈরী করা সম্ভব!

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান জনাব এস এ রহমান অভিযুক্তগণ যে খাদ্যে অভ্যস্ত তাহা সরবরাহের জন্য চেষ্টা করিতে বলেন। তিনি আরও বলেন যে, পৃথক পাচক অভিযুক্তদের রুচি অনুযায়ী না হইলেও চলিবে।

সাক্ষী ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ষাকাল অর্থ হইল বর্ষাকালে বন্যার জন্য সেনাবাহিনী বাধার সম্মুখীন হইবে এবং তাহারা ক্ষমতা দখলের জন্য এই সুযোগ সদ্ব্যবহার করিবে। ষ্টুয়ার্ড মুজিব আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, অস্ত্র ও গোলাবারুদ ঠিক সময় পৌঁছাইবে কিনা। যাহাতে তাহারা পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের তাড়াইয়া দিতে পারে।

আমীর হোসেন বলেন যে, লেঃ হক আমার নিকট জানিতে চাহেন যে, তাহাদের পরিকল্পনা কোন দেশ সমর্থন করিবে। আমি তাহাকে বলি যে, শেখ মুজিবর রহমান ও লেঃ মোয়াজ্জেম অস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রদানের জন্য ভারতের নিকট চেষ্টা করিয়াছেন এবং ভারত আমাদের সমর্থন করিবে। আমীর হোসেন দলীয় বিষয় আলোচনার জন্য হোটেল নিস্কাতে তাহার কক্ষে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৈঠকের বর্ণনা দান করেন। তিনি বলেন যে, ৬ই ফেব্রুয়ারী আমি বৈঠকটি আহ্বান করি এবং ষ্টুয়ার্ড মুজিব, সুলতান উদ্দিন, এ, বি, খুরশীদ, ডাক্তার সায়েদুর রহমান, মানিক চৌধুরী, বিধান চন্দ্র সেন (বিধান কৃষ্ণ সেন) এবং ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার আবদুর রাজ্জাক উক্ত বৈঠকে যোগদান করেন।

রাজসাক্ষী মানিক চৌধুরীকে সেনাক্ত করেন এবং বিধান কৃষ্ণ সেনকে বিধান চন্দ্র সেন বলিয়া সেনাক্ত করেন। তিনি সুবেদার রাজ্জাককেও সেনাক্ত করেন।

আমীর হোসেন বলেন যে, বৈঠকে যাহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদের অনেককেই আমি পূর্ব্বে চিনিতাম না। ষ্টুয়ার্ড মুজিব আমার সহিত

তাহার পরিচয় করাইয়া দেন। পরিচিতি পর্ব্বের পর গ্রুপ দলীয় বিষয় আলোচনা করে। সাক্ষী বলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিব উপস্থিত যাহারা দলের জন্য দান করিয়াছিলেন তাহাদের প্রশংসা করেন। রাজসাক্ষী বলেন যে, মানিক চৌধুরী দলীয় তহবিলে তিন হাজার টাকা দান করেন।

আমীর হোসেন আরও বলেন যে, ডাক্তার সায়েদুর রহমান ও মানিক চৌধুরী আমাকে গোপনে বলিয়াছিলেন যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে কাজ করার জন্য শেখ মুজিবর রহমান তাহাদের নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন। রাজসাক্ষী বলেন যে, দলীয় কর্মীদের সহিত বৈঠকের পর সম্ভবতঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী আমি ঢাকা ফিরিয়া আসি।

বাদীপক্ষের কৌসুলী ১৯৬৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী "আলো" কর্ত্তৃক "উল্কার" নিকট লিখিত একটি পত্র রাজসাক্ষীর নিকট প্রদান করেন। রাজসাক্ষী ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, "আলো" অর্থ লেঃ মোয়াজ্জেম এবং "উল্কা" আমি নিজে। তিনি বলেন, যে পত্রে "পরশ" এর সহিত বৈঠকের যে কথা লেখা রহিয়াছে উহার অর্থ শেখ মুজিবর রহমানের সহিত বৈঠক।

আমীর হোসেন বলেন যে, পত্রে "আমরা বাম হস্ত কি করিতেছে উহা ডান হস্তকে জানিতে দিব না" বলিয়া যে কথা আছে উহার অর্থ হইল আমরা আহমদ ফজলুর রহমানের সহিত কি করিতেছি তাহা যেন শেখ মুজিবর রহমান জানিতে না পারে কারণ শেখ মুজিবর রহমান আহমদ ফজলুর রহমানকে বিশ্বাস করেন নাই। রাজসাক্ষী বলেন যে, ইহার অর্থ হইল উভয় ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা টাকা পাইতে পারি।

পত্রে লেখা "তিনি এখনও আমাকে বোকা বলিয়া মনে করেন" এই কথা সম্পর্কে রাজসাক্ষী বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানও লেঃ মোয়াজ্জেমের মধ্যে পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সময় সম্পর্কে মত বিরোধ হইয়াছিল।

শেখ মুজিবর রহমান আগেই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু লেঃ মোয়াজ্জেম মনে করিয়াছিলেন যে, এখনও উপযুক্ত সময় হয় নাই।আমীর হোসেনের জবানবন্দী আজ মঙ্গলবার সকালে পূনরায় শুরু হইবে।

Morning News
6th August 1968
Special Tribunal
Rule issued upon Govt. and others

The East Pakistan High Court yesterday issued Rule Nisi upon the Central Government and others to show cause why the proceedings before the Special Tribunal should not be declared illegal, being without lawful Authority and of no legal effect, reports APP.

The rule was made returnable by August 15 next. It was issued on the write petition moved by Mr. Thomas Williams Q.C. appearing on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, number one accused, in the Agartala Conspiracy Case.

The Division Bench comprising the Chief Justice, Mr. Justice B.A. Siddiky and Mr. Justice Abdul Hakim also asked the respondents to show cause why a direction should not be made quashing the entire proceedings (of the Tribunal) and discharge the petitioner (Sheikh Mujibur Rahman).

Besides the Central Government the other respondents are chairman, the Special Tribunal Kurmitola, Dacca and Major A. B. M. Naser, 14th Division, Kurmitola having the custody of the petitioner.

Appearing for Sheikh Mujib, the Awami League leader, the British lawyer, Mr. Thomas Williams, Q.C. challenged the validity of the Ordinance under which the Special Tribunal was set up.

Mr. Williams contended that the promulgation of the Ordinance was beyond the powers of the President provided by the Article 30 of the Constitution. He submitted that the provision conferred powers to make an ordinance if it was necessary for immediate legislation to meet an emergency. The ordinance providing for setting up the tribunal could not be said to meet an emergency, he contended.

Mr. williams argued that the proceedings before the Special Tribunal were repugnant to the Constitution, particularly under Article 2, which guarantees the right of individuals to be dealt with in accordance with law, and Article 4 for the Constitution.

He submitted that both the provisions of the Constitution were fully operative not withstanding the proclamation of the State of emergency.

Mr. Williams' submission was that a person alleged to have committed an offence incurred the liability to be proceeded against in accordance with the law it stood at the time of the alleged offence was committed.

But, he submitted, the proceedings against the petitioner began when he was taken into custody and detained in military custody. This detention–between January and June this year–was "certainly wholly illegal" and the ordinance was given retrospective effect contrary to the provisions of the Constitution he contended.

Mr. Williams contended that there was no law which could take him to the military custody from the central jail. He said the petitioner was not given the protection of law as provided in Article 2 of the Constitution.

Others who appeared on behalf of Sheikh Mujibur Rahman were Mr. Amirul Islam, Mr. Moudud Ahmed and Mr. Monirul Hossain.

সংবাদ

৬ই আগস্ট ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলার বিচাররত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতার প্রশ্নে দশদিনের মধ্যে কারণ দর্শাইবার জন্য সরকারের প্রতি হাইকোর্টের নির্দেশঃ শেখ মুজিবের পক্ষে রীট আবেদন শুনানীর জন্য গৃহীত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (সোমবার) প্রখ্যাত বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়মস কিউ-সি ঢাকা হাইকোর্টে এক রীট আবেদন প্রসঙ্গে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যে'র ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সমুদয় কার্যক্রমকে শাসনতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের খেলাফ বলিয়া বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন এবং শেখ মুজিবর সহ ষড়যন্ত্র মামলায় আটক সকল অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির দাবী জানান।

উক্ত রীট আবেদন শ্রবণের পর ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বি-এ-সিদ্দিকী ও বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম সমবায়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এক নম্বর প্রতিবাদী পাকিস্তান সরকার এবং তিন নম্বর প্রতিবাদী মেজর এ-বি-এম নাসের (আবেদনকারী শেখ মুজিবর রহমানের সামরিক কাষ্টোডিয়ান)-এর উপর এক 'রুল-নিসি' জারী করিয়া আগামী দশ দিনের মধ্যে (১৫ই আগষ্ট) কেন শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলা বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের 'বর্তমান কার্যক্রম'কে অবৈধ ঘোষণা করা হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইবার নির্দেশ দিয়াছেন।

বিচারপতিদ্বয় তাঁহাদের নির্দেশে আরও বলেন যে, কেন উক্ত ষড়যন্ত্র মামলার বর্তমান কার্যক্রম বাতিল করিয়া আবেদনকারী জনাব শেখ মুজিবর রহমান ও উক্ত মামলায় আটক অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হইবে না, তাহারও কারণ দর্শাইতে হইবে। মাননীয় বিচারপতিদ্বয় বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারাধীন মামলার অধিকতর কার্যক্রম (ফারদার প্রসিডিংস)

অন্তর্বর্তীকালের জন্য স্থগিতের আবেদন নাকচ করিয়া দেন এবং উক্ত মামলায় হাজির হওয়ার জন্য পাকিস্তানের এটর্নী জেনারেল ও পূর্ব পাকিস্তানের এডভোকেট জেনারেলকেও নির্দেশ দেন।

রীট আবেদন পেশের ব্যাপারে মিঃ টমাস উইলিয়মসকে সহায়তা করেন ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম, ব্যারিষ্টার মইনুল ইসলাম ও ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ।

সংবাদ

৬ই আগস্ট ১৯৬৮

সাক্ষ্যদানের ৩য় দিবসে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন বলেনঃ
অস্ত্র ও অর্থের জন্য আমাকে ভারত, চীন অথবা মার্কিন দূতাবাসের সহিত যোগাযোগ করিতে বলা হয়

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (সোমবার) দুইদিন বিরতির পর "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যে"র ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে পুনরায় শুরু হইলে দ্বিতীয় রাজসাক্ষী ও তৃতীয় সরকারী সাক্ষী জনাব আমীর হোসেন মিয়া জবানবন্দী প্রদানকালে একখানি ডাইরী হইতে উদ্ধৃতি প্রদান করিয়া জানান যে, তাঁহাকে বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলনের পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র ও সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে ভারত, চীন অথবা যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলেট জেনারেলদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে বলা হইয়াছিল। সাক্ষী আমীর হোসেন আরও জানান যে, এ ব্যাপারে খান এ, সবুরের সহিতও তাঁহাকে যোগাযোগ করিতে বলা হয়।

গতকালও রাজসাক্ষী আমীর হোসেনের সাক্ষ্য গ্রহণ অব্যাহত থাকে। তিনি একাধিক 'পত্র' ও 'ডাইরী' সনাক্ত ও উহার অংশ বিশেষের অর্থ ব্যাখ্যা করেন।

ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইলে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের সামরিক হেফাজতে বন্দী অভিযুক্তদের খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসা সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। এই বিবৃতির পর ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান অভিযুক্তদের জন্য স্থানীয় খাদ্য রান্নার উদ্দেশ্যে সামরিক কর্তৃপক্ষের পছন্দমত একজন স্বতন্ত্র বাবুর্চি নিয়োগের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

গতকাল হাইকোর্টে শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া রীট আবেদন পেশের জন্য মিঃ টমাস উইলিয়মস ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে ট্রাইব্যুনালের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তবে শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য অভিযুক্তদের অন্যতম

প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান, খান বাহাদুর ইসমাইল, জনাব আতাউর রহমান খান প্রমুখ কৌসুলি শুনানীর সময় উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য দিনের ন্যায় গতকালও আদালতে বিপুলসংখ্যক দর্শক, অভিযুক্তদের আত্মীয়-স্বজন এবং দেশী-বিদেশী সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

জেরার বিবরণ

সামরিক হেফাজতে অভিযুক্তদের খাদ্যদ্রব্য প্রসঙ্গে বিবৃতি প্রদানের পর বাদীপক্ষে প্রধান কৌসুলি পূর্বদিনের শুনানীর জের টানিয়া রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার সাক্ষ্য ও জেরা শুরু করেন।

রাজসাক্ষী আমীর হোসেন গতকাল একাধিক চিঠি ও ডাইরীর সনাক্তকরণ ও উহার ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

জনাব মঞ্জুর কাদের সাক্ষীর নিকট ২ খানি চিঠি প্রদান করিয়া প্রশ্ন করেনঃ চিঠিগুলি আপনি দেখেছেন; এখন আদালতকে বলুন কখন আপনি এ চিঠি পেয়েছেন?

উত্তর ঃ PW3/6 চিহ্নযুক্ত এই চিঠিখানা আমি হয় ১৯৬৫-এর নভেম্বর মাসে অথবা ১৯৬৬-এর জানুয়ারী মাসে পেয়েছি। ঠিক তারিখ আমার মনে নেই।

প্রশ্ন ঃ চিঠির কোণের যে অংশটি ছেঁড়া সে সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ হয়ত এই ছেঁড়া অংশেই ওই তারিখটা ছিল। আমি যখন খামটা খুলি দুর্ভাগ্যবশতঃ তখনই ঐ অংশটা ছেঁড়া ছিল।

প্রশ্ন ঃ অপর চিঠি (PW3/7) র কোন ছেঁড়া সম্পর্কে আপনি কি বলেন?

উত্তর ঃ সে সম্পর্কেও আমার বক্তব্য এক। দুটো চিঠিই এক খামে আছে।

সাক্ষী আর এক প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, দ্বিতীয় চিঠিটি বড় ভাইকে সম্বোধন করিয়া 'সালাম' জানাইয়া শুরু করা হয়। পত্রে বলা হয়, "তার আগে আমি আপনার কাছে একখানি পত্র লিখেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তার উত্তর পাইনি। ওখানে কাজ কেমন এগোল আমাকে জানাও। আমার চিঠি পাওয়ার পরে তোমার ইচ্ছানুযায়ী লোক ভর্তি করুন। আমরা জোরেসোরে কাজ চালাচ্ছি। আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখুন ও নির্ধিধায় নিজেদের কাজ চালিয়ে যান। গোলাম মোহাম্মদকে আমার ভালোবাসা জানাবেন। বলবেন আপনার সঙ্গে যেন মিলেমিশে কাজ করে। মোজাম্মেল সাহেবকে "আমার সালাম জানাবেন। খুরশীদের সালাম নিন। আপনাদের খবরাখবর দিবেন।"

প্রশ্ন ঃ 'M' অর্থ কি?

উত্তর ঃ 'M' মানে এখানে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান।

প্রশ্ন ঃ চিঠিতে উল্লিখিত গোলাম মোহাম্মদ কে?

উত্তর ঃ গোলাম মোহাম্মদ হলেন ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদের সহকর্মী।

ইহার পর জনাব মঞ্জুর কাদের রাজসাক্ষী আমীর হোসেনকে একখানি চিঠি (PW3/7) পড়িতে দেন।
প্রশ্ন ঃ কোন তারিখে আপনি এ চিঠি পেয়েছেন?
উত্তর ঃ ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে–তারিখ হলো ২৯/১১/৬৫।
প্রশ্ন ঃ কে লিখেছেন?
উত্তর ঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান।
প্রশ্ন ঃ তাঁর হাতের লেখা চেনেন?
উত্তর ঃ জী হ্যাঁ, এ চিঠিখানা তাঁর নিজের হাতের লেখা।
সাক্ষীকে চিঠির ইংরেজী অনুবাদ (PW3/10) দেওয়া হইলে তিনি উক্ত বাংলার সহিত মিলাইয়া সঠিক বলিয়া মন্তব্য করেন।
প্রশ্ন ঃ চিঠিতে 'বড় ভাই' বলে যাকে বলা হয় তিনি কে?
উত্তর ঃ এখানে বড় ভাই হলেন শেখ মুজিবর রহমান।
প্রশ্ন ঃ পরের ছত্রে সুলতান বলে যার নাম আছে, তিনি কে?
উত্তর ঃ তিনি হলেন লীডিং সীম্যান সুলতান উদ্দীন আহমদ।
প্রশ্ন ঃ চিঠির অপর এক জায়গায় "ওখানের বড় ভাই" বলে যিনি আছেন, তিনি কে?
উত্তর ঃ এখানে বড় ভাই হলেন লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন। চিঠির একাংশ নিম্নরূপ ঃ "আমরা আমাদের সাধ্যাধিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আপনারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কতদূর কি করতে পারলেন ও আমাদের জিনিসপত্র আনার ব্যবস্থা করতে পারলেন কিনা জানাবেন।"
চিঠির উপরোক্ত অংশ সম্পর্কে জনাব মঞ্জুর কাদেরের একাধিক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানান যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা এখানে বলা হয়েছে এবং "আমাদের জিনিসপত্র" মানে হলো "অস্ত্রশস্ত্র"।
চিঠির আর এক অংশে জনৈক শফির নাম উল্লেখ করা হয়। আর এক জায়গায় "আপনাদের টাকার ব্যাপার পত্রে জানতে পারবেন" লেখা হয়।
প্রশ্ন ঃ এর অর্থ কি?
উত্তর ঃ এখানে শেখ মুজিবর রহমানের নিকট থেকে টাকা সংগ্রহের ব্যাপার বলা হচ্ছে।
চিঠির শেষে "ইতি আপনারই মুজিবর" লেখা ছিল। সাক্ষী জানান যে, ইনি হইলেন ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান।
ইহার পর বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি সাক্ষীকে আর একখানি পত্র পাঠ করতে দেন। উহা পাঠ করিয়া সাক্ষী জানান, এই চিঠিটিও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের লেখা।
প্রশ্ন ঃ চিঠিতে তিনি কি বলেছিলেন?

সাক্ষী ঃ চিঠিতে তিনি বলেন, আপনার ভালবাসা থেকে অনেকদিন ধরে বঞ্চিত আছি। জানি না কিভাবে এবং কোথায় আমরা মিলিত হব। সম্ভবতঃ আপনারা সকলেই আমার 'পর' রাগ করেছেন। কারো বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। ২৯-১১-১৯৬৫' তে আমি একজন লোকের মারফত জাহাজযোগে চিঠিপত্র পাঠিয়েছি। সম্ভবতঃ আপনারা পেয়েছেন। ঐসব চিঠিতে আমি সবকিছু বিস্তারিত জানিয়েছি। রোগীর অবস্থা ভাল।
প্রশ্ন ঃ রোগীটা কি?
সাক্ষী ঃ এখানে 'রোগী' বলতে পূর্ব পাকিস্তানকে বুঝান হয়েছে, আর অবস্থা বলতে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বুঝান হয়েছে।
তারপর সাক্ষী বলেন, পত্রে বলা হয়, "এ ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। আমি নিজে এবং সুলতানউদ্দীন আপনার পুনর্বাসনের ব্যাপারে ঢাকায় গিয়েছিলাম।"
আপনাকে এখানে আনতে কিছু সময় লাগবে। বর্তমানে কোন কর্মখালী নেই। আমি ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট অথবা ইন্স্যুরেন্স করে আপনার কাছে 'ঔষধ' পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি।
প্রশ্ন ঃ ঔষধ কি?
সাক্ষী ঃ এখানে 'ঔষধ' বলতে টাকা-পয়সা বুঝান হয়েছে।
সাক্ষী বলেন, চিঠিতে আরও বলা হয়,"কিন্তু আপনার এ ব্যাপারে চিন্তা করার দরকার নেই। আমরা এখানে বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছি।"

বাদীপক্ষের কৌসুলির জবাবে সাক্ষী বলেন ঃ "বিদেশী রাষ্ট্র" বলতে এখানে ভারতকে বুঝান হয়েছে। তারপর চিঠিতে বলা হয়, যদি সম্ভব হয় আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করবো। 'বড়ভাই'র আমাকে ভুল বুঝা উচিত নয়। জনাব মঞ্জুর কাদিরের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন ঃ এখানে 'বড় ভাই' বলতে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন।

সাক্ষী বলেন, চিঠিতে আরও বলা হয়, আমি একজন খাঁটি কর্মী হিসাবে আপনাদের সাথেই থাকবো। যদি আমি কোন ভুল করে থাকি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। আমি জানি 'বড়ভাই' আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। সেইজন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এরপর আমি 'বড় ভাই'র সাথে ঝগড়া করেছি (সাক্ষী বলেন, এই 'বড় ভাই' শেখ মুজিবর রহমান)। তিনি স্বীকার করেছেন যে, এজন্য তিনি লজ্জিত। আপনার উচিত সেখানে জোরেসোরে আপনার কাজ চালিয়ে যাওয়া। অনেকদিন ধরে কোন খবর না পাওয়াতে আমি খুব উদ্বিগ্ন আছি। আমার চিঠিপত্রের দয়া করে শীঘ্রই উত্তর দিবেন। তাছাড়া, আপনি অনুগ্রহ করে যত দামেই হোক একটা গরম পুলওভার কিনে জাহাজযোগে

পাঠিয়ে দিবেন। শীতে দারুন কষ্ট পাচ্ছি। পুলওভারটি যেন আকাশী রঙের হয়। দয়া করে সাদেক ভাই অথবা নূর মোহাম্মদ অথবা গোলাম মোহাম্মদের হাতে এটা দিবেন।

প্রশ্ন ঃ কে এই সাদেক?

জবাব ঃ আমি জানি না এই সাদেক কে।

তারপর সাক্ষী আবার চিঠি পাঠ করেন ঃ "আমি নৈমিত্তিক ছুটির জন্য দরখাস্ত করছি। যদি ছুটি পাই একবার করাচী আসব। যাতে ছুটি পাই সেজন্য দোয়া করবেন। আর অধিক কি লিখব? আমি এক প্রকার দিন কাটাচ্ছি। আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি ভাল আছি। আপনার খাদেম, মুজিবর।"

সাক্ষী বলেন ঃ চিঠির নীচে বিশেষ দ্রষ্টব্য সম্বলিত একটি নোট ছিল। তাতে লেখা ছিল, "ইতিমধ্যে আমি বরবাকুণ্ডের কাছে যাই এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করি (বরবাকুণ্ড বলতে এখানে জনাব সফি)।"নোটে আরও বলা হয়, "আমি দুঃখের সাথে বলছি যে, তিনি মোটেই আগ্রহী নন। তিনি আপনার উপর নির্ভর করেন। তিনি অভিযোগ করছেন যে, তিনি আপনার কাছ থেকে কোন চিঠি পাননি। এই কারণে তিনি চুপচাপ আছেন। তিনি কি করবেন, আমাকে বলেননি। এজন্য আমি ভাল মনে করছি না। শফি অনেক কথাই বলেছেন। সাক্ষাতে আপনাকে বলবো। আজ আর না। খোদা হাফেজ, মুজিব।"

তারপর সাক্ষী বলেন ঃ চিঠির প্রথম পৃষ্ঠার মার্জিনে লেখা ছিল, আমি উদ্বিগ্ন যে টাকাপয়সার অভাবে শেষ পর্যন্ত আপনি পোষ্টকার্ড সংগ্রহ করতে না পারেন। যদি তাই না হয়ে থাকে তাহলে আমি কেন চিঠি পাচ্ছি না? আমি কি জানতে পারি? আমি জানি কেন আপনি লিখছেন না। আপনি দয়া করে আপনার মন থেকে ভুল বুঝাবুঝি ঝেরে ফেলুন (এখানে নির্দিষ্ট কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি)। যদি আপনি সত্যিকারভাবে আমার বিশ্বাসে না রাখতে পারেন, তাহলে সবকিছুই সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। বর্ত্তমানে আপনাদের দরকার। অথচ আপনাদেরকে পাচ্ছি না।"

চিঠির উপরোক্ত অংশটি বাংলায় লেখা ছিল। ট্রাইব্যুনাল ইহার ইংরেজী অনুবাদ ট্রাইব্যুনালে পেশ করার জন্য বাদীপক্ষের কৌসুলির জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই চিঠিখানি তিনি Ext P, W 3/6 চিহ্ন সম্বলিত চিঠিখানির আগে পান।

এরপর সাক্ষী বাথরুমে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। ট্রাইব্যুনাল তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করেন।

বাদীপক্ষের কৌসুলি সাক্ষীকে বাংলায় লেখা আর একটি চিঠি দেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি উহা পাইয়াছিলেন কি-না। সাক্ষী বলেন, "হ্যাঁ,

আমি পেয়েছিলাম। এটা আমার কাছে লেখা চিঠি। চিঠিটি ২৪-১২-১৯৬৫ তারিখে লেখা সুলতানউদ্দীনের। এই লেখা সুলতান উদ্দীনের। আমি লেখার সাথে পরিচিত। চিঠির উপরিভাগে ইংরেজীতে লেখা ঠিকানাও তার হাতে লেখা।"

সাক্ষী বলেন, চিঠিতে লেখা আছে,"প্রিয় আমির সাহেব, আমার প্রীতি জানবেন। আপনি অনেক কিছুই লিখেছেন। কিন্তু প্রতিটির জবাব দেয়া অসম্ভব। আপনারা আমাকে ভালভাবে জানেন। আমার নূতন করে পরিচয় দেয়ার দরকার নেই। আমি চিঠি লিখতে অভ্যস্ত নই। আমি কাজের লোক এবং আমার দৃষ্টি ঐদিকেই নিবদ্ধ। দোয়া করবেন আমরণ যেন আমি কাজ করে যাই। যখন আপনি এই চিঠি লেখেন, তখন এ ব্যাপারে আপনি চিন্তা করবেন। আপনাকে কি লিখতে হবে এবং কিভাবে আপনি লিখবেন। আপনি জ্ঞানী লোক আর বেশী লেখার কোন দরকার নেই। আপনি আমার টেলিগ্রাম পেয়েছেন কিনা জানাবেন। আপনি ঐ দেশের সাথে সকল কাজ শেষ করেন এবং যতশীঘ্র সম্ভব আপনার কাছে আসা উচিত এবং আসার সাথে সাক্ষাৎ করা উচিত।

কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানান যে, এখানে 'ঐ দেশ' বলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস বুঝান হইয়াছে। তারপর সাক্ষী আবার চিঠি পাঠ করেন ঃ আপনার "বড়ভাই"র সাথে আলাপ-আলোচনা করা উচিত। "বড়ভাই"র সাথে বিস্তারিত আলোচনার পর আপনার এখানে আসা উচিত (এই "বড় ভাই" বলতে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন) আজ আর না। আপনি কেমন? এখানে আমরা ভালই। আপনারই সুলতান।"

সাক্ষী বলেন ঃ এই চিঠি একটি খামে করে পাঠান হয়। খামটি এখানে আমি দেখছি। চিঠিতে Ext, PW 3/12 এবং Ext PW 3/13 চিহ্ন রয়েছে।

বাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন ঃ লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ আমার কাছে ২ খানা চিঠি ও ২২ শত টাকা নিয়ে আসেন। এই টাকা আমি চট্টগ্রাম থেকে আগত একটি বাণিজ্য জাহাজের একজন ষ্টুয়ার্ডের মাধ্যমে পাই। তিনি আমাকে বলেন যে, এই টাকা ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও লীডিং সীম্যান সুলতান উদ্দীন পাঠিয়েছেন। তারপর নূর মোহাম্মদ ও আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসভবন পি এন কারসাজে যাই। সেখানে আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট Ext, PW 3/11 চিহ্ন যুক্ত পত্রটির বিষয়বস্তু পেশ করি এবং আমার উপস্থিতিতে লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ তাঁকে পত্র দুটো সহ ২২ শত টাকা দেন। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন চিঠিগুলো পড়েন এবং খুব রেগে যান। কারণটা হলো, তাঁর মতে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও সুলতানউদ্দীন ৩ হাজার টাকা পেয়েছেন এবং তারমধ্যে মাত্র ২২ শত টাকা

পাঠান হয়েছে। জনাব মঞ্জুর কাদেরের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন ঃ আমি Ext, PW 3/6 চিহ্ন সম্বলিত পত্রটি আগে Ext, PW 3/12 চিহ্ন সম্বলিত পত্র পাই। ১৯৬৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি পূর্ব পাকিস্তানে আবার বদলির ব্যবস্থা করি। ঢাকা যাওয়ার আগে আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসভবনে যাই। তিনি আমাকে ৩টি ডায়রী দেন। এই তিনটি ডায়রীতে নির্দেশ দেওয়া ছিল। এই নির্দেশগুলো মোতাবেক আমাকে কাজ করতে বলা হয়।

এই সময় জনাব মঞ্জুর কাদের সাক্ষীর হাতে একটি ডায়রী দেন। সাক্ষী বলেন, উহা ঐ ডায়রীগুলোর একটি। তারপর সাক্ষী বলেন, এই ডায়রীর লেখাগুলো লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের। আমি তাঁর হাতের লেখার সাথে পরিচিত। ডায়রীগুলো আমার হাতে দেওয়ার সময় লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে বলে দেন যে, এতে আমার জন্য যা লেখা হয়েছে আমাকে সেই অনুসারে কাজ করতে হবে। তিনি আমাকে অস্ত্রশস্ত্রেরও একটি তালিকা দেন। এই তালিকাটি ডায়রীতেও ছিল।

সাক্ষীকে একটি ডায়রীর তিনটি ছেঁড়া পাতা দেওয়া হয়। সাক্ষী বলেন যে, এইসব পাতাতেও নির্দেশ লেখা রয়েছে। সাক্ষী ডায়রীতে লেখা কতিপয় ছদ্মনাম লিপিবদ্ধ থাকার কথাও উল্লেখ করেন। এইসব ছদ্মনাম লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন কর্তৃক বাংলায় লেখা ছিল।

বাদীপক্ষের কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন ঃ ছদ্মনামগুলোর একটি হচ্ছে "নিজস্ব আলো"। অর্থাৎ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন 'আলো' নামে পরিচিত হবেন। তারপর "মিয়া– উল্‌কা"। অর্থাৎ আমার ছদ্মনাম হবে 'উলকা'। তৃতীয়তঃ 'মোজাম্মেল –ছদ্মনাম তুহিন।" এটা লেঃ মোজাম্মেলের জন্য। তারপর 'সুলতান– ছদ্মনাম কমল'। এটা লীডিং সীম্যান সুলতান উদ্দীন।

আহমদের জন্য। তারপর "মুজিব –ছদ্মনাম দুরাদ"।এটা ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের জন্য। তারপর "শেখ–ছদ্মনাম পরশ"। এটা শেখ মুজিবর রহমানের। তারপর হলো "রহমান–তুষার"। এটা জনাব এ,এফ,রহমান, সি,এস,পি'র ছদ্মনাম (তুষার)। তারপর "নূর মোহাম্মদ–সবুজ"। এটা লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদের। এরপর হলো "কুদ্দুস–ছদ্মনাম শেখর"।এটা জনাব রুহুল কুদ্দুস সি,এস,পি'র জন্য।

প্রঃ এই ডায়রী আপনি চেনেন? এটা কার ডায়রী?

উঃ হ্যাঁ, চিনি।এটা লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের ডায়রী। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমার পরিচিত। এই ডায়রীর প্রথম পাতায় লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের লেখা রয়েছে। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের এই ইংরেজী হাতের লেখা আমি চিনি।

প্রঃ ডাইরীর এই পৃষ্ঠায় স্কুটারের যে বিবরণ রয়েছে তা দেখে আপনি বলতে পারেন স্কুটারটা কার?

উঃ এ স্কুটার লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের। ডায়রীর পৃষ্ঠায় বর্ণিত কে,এ,এইচ ৪৭৬৮ স্কুটারের বিবরণটি লেঃ মোয়াজ্জেমের হাতের লেখা।

প্রঃ ডায়রীর এই পৃষ্ঠার লেখা ১৯-৩-৬৭ তারিখটি কার হাতের লেখা বলতে পারেন কি?

উঃ পারি। ১৯-৩-৬৭ ডায়রীর পাতায় লেখা এই তারিখটি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতের লেখা।

প্রঃ ডায়রীর পাতায় লেখা এই প্রথম দুটি লেখা পড়ে বলতে পারেন এগুলি কি সম্পর্কিত?

উঃ এ দুটি লেখা আমি পড়লাম কিন্তু এ দুটি কি সম্পর্কে লিখিত তা আমি জানি না।

প্রঃ ডায়রীর এই পৃষ্ঠায় যেখানে লেখা আছে ১৭ই জানুয়ারী ১৯৬৪ সাল, বলতে পারেন এ কার হাতের লেখা ?

উঃ এটাও লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের লেখা। এই পৃষ্ঠায় আমার প্রতি নির্দেশ করা এবং এই নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে আমার কাজ করতে হয়েছে। এই নির্দেশগুলো হচ্ছে ঃ

(১) "আমার বদলীর জন্য মিঃ কে,জি'র সাথে যোগাযোগ করুন।" এখানে লেঃ মোয়াজ্জেমের করাচী হতে চট্টগ্রামে বদলীর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কে,জি বলতে কোন এক নামের সংক্ষেপকরণ বুঝানো হয়েছে কিন্তু এর পূর্ণ অর্থ অর্থাৎ পুরো নাম আমি জানি না। এতে ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশন ডিরেক্টরকে উল্লেখ করা হয়েছে। কে,জি, বলতে সম্ভবতঃ কাজী গিয়াসুদ্দীন বুঝানো হয়েছে। এই নির্দ্দেশের অর্থ হলো কে, জি, আহমেদ ঢাকায় এলে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে করাচী হতে চট্টগ্রামে বদলীর জন্য আমি তার কে জি আহমদ) সঙ্গে যোগাযোগ করবো। কে জি আহমেদ ন্যাশনাল শিপিং করপোরেশনের ডিরেক্টর।

(২) দ্বিতীয় নির্দেশটিতে রয়েছে "ভাড়ার ব্যবস্থা কর।" এতে একথাই বলা হয়েছে যে, ঢাকায় পৌঁছলে থাকার জন্যে এবং ভারত হতে যেসব অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাবে সেগুলো রাখার জন্যে ঢাকায় আমার একটা বাড়ির প্রয়োজন হবে। শেখ মুজিবর রহমান অথবা আহমদ ফজলুর রহমানের কাছ হতে বাড়ির ভাড়া নেওয়ার জন্যে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

(৩) তৃতীয় নির্দেশটিতে বলা হয়, "সামাদ, দোহা প্রভৃতির জন্যে চাকুরীর ব্যবস্থা করুন। আমি ঢাকায় পৌঁছুবার আগেই সামাদ ও দোহা পূর্ব পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে করাচী ত্যাগ করেছে। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন

আমাকে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন যে, সামাদ ও দোহা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগদান করলে আমি যেন তাদের চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিই। সামাদ বলতে এখানে অভিযুক্ত এক্স কর্পোরাল সামাদকে বুঝানো হয়েছে এবং দোহা বলেন, একজন এক্স এয়ারম্যান, তিনি সামাদের একজন বন্ধু।

(৪) চতুর্থ নির্দেশে বলা হয়েছে, "নগদ অর্থ সংগ্রহ করে যতশীঘ্র পার পাঠাও।" অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্য শেখ মুজিবর রহমান অথবা যে কোন সূত্র হতে অর্থ সংগ্রহ করে আমি তা পাঠাবো।

(৫) পঞ্চম নির্দেশটিতে বলা হয় যে, সুলতান ও মুজিবরের সাথে দেখা করুন এবং বিশদভাবে আলোচনা করুন।

অর্থাৎ ঢাকায় পৌঁছিয়া আমি, সুলতানউদ্দীন এসটিডি মুজিবর রহমানের সঙ্গে দেখা করবো, তারা কতদূর অগ্রসর হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করে দেখবো ও বিষয়টি নিয়ে তাদের সাথে বিশদভাবে আলোচনা করবো এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার নয়া পদ্ধতি গ্রহণ করবো।

(৬) ছ' নম্বর আইটেমে বলা হয় যে,"কে,জি'র কাছ হতে জীপ নিও।" বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন স্থানে যাওয়া আসার ব্যাপারে আমার একটি জীপের প্রয়োজন বলে আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে জানিয়ে ছিলাম। আমায় একটা জীপ দেওয়ায় লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন মিঃ ফজলুর রহমানকে বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে বলা হয়, মিঃ কে,জি,আহমদ ইতিমধ্যেই একটা জীপ পেয়েছেন এবং সেই জীপটি আমায় দেওয়ার জন্য তিনি তাকে সম্মত করাবেন। ঢাকায় পৌঁছে আমি দেখলাম জীপটি কে,জি,আহমদের নয়। জীপটি কামালউদ্দীনের। এবং এই কারণেই জীপটির জন্য আমি কে, জি আহমদের কাছ থেকে জীপটি চাইনি।

(৭) সাতনং আইটেমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল "যেকোন সূত্র হতে অর্থ সংগ্রহ করতে শুরু করুন। এর অর্থ ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, সুলতানউদ্দীন ও আমি যে কোন লোকের থেকে হোক অর্থ সংগ্রহ করবো।

প্রঃ এই ডায়রীতে লেখা ১৮ই জানুয়ারী ১৯৬৪ তারিখে যে সকল নির্দেশ রয়েছে আপনি চেনেন এগুলো কার হাতে লেখা?

উঃ হ্যাঁ চিনি। এসব লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতের লেখা। এগুলোর শিরোনামা হলো, এত তাড়াতাড়ি নয়।

(১) সবুরের সাথে যোগাযোগ করুন। অর্থাৎ এখানে যোগাযোগ মন্ত্রীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমায় জনাব এ, সবুর খানকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে জড়ানোর জন্য নির্দেশ দেন।

(২) "ভারত, চীন অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ করুন। অর্থাৎ এতে আমায় উল্লিখিত দেশগুলির কনসুলেট জেনারেলদের সাথে সাহায্য, অর্থ অথবা অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য এবং সমর্থন লাভের ব্যাপারে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।"

(৩) "মাল খালাসের ব্যবস্থা কর" অর্থাৎ এতে আমার প্রতি এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে, মুজিবর রহমান যদি ভারত হতে সমরাস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে পারে তাহলে সেগুলি আমি যেন তাদের কাছ হতে গ্রহণ করি।

প্রঃ ডায়রীর পরের পৃষ্ঠায় যেসব লেখা রয়েছে সেগুলো কার হাতের লেখা তা আপনি চেনেন?

উঃ হ্যাঁ চিনি। এগুলোও লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতের লেখা। এখানে শিরোনাম রয়েছে, "তথ্যের একটি তালিকা।"

(১) প্রথমে লেখা আছে, "বিভিন্ন গ্রুপের কারখানা ও শিল্পসমূহের বিশদ বিবরণ জেলা ভিত্তিতে।"

(২) "শিল্পসমূহের ডিরেক্টর ও কর্ত্তাব্যক্তিদের এবং তাদের বাসার ঠিকানার তালিকা।"

(৩) "স্কুল ও কলেজসমূহের তালিকা।"

(৪) "সমুদ্রগামী ও আভ্যন্তরীণ শিপিং কোম্পানীসমূহের তাদের মালিকদের, ডিরেক্টরদের এবং ঠিকানার তালিকা।"

(৫) "জেলে আটক ব্যক্তিগণ, তাদের অপরাধ ও খালাস পাওয়ার সম্ভাব্য তারিখের তালিকা।"

(৬) "বিশ্বস্ত ও ভাল পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট এবং এডিশনাল পুলিস সুপারিনটেনডেন্টদের তালিকা।"

(৭) "ভাল সি এস পি দের তালিকা।"

(৮) "শিল্প ও রেলওয়েতে সিনিয়র বাংলা অফিসার তালিকা।"

(৯) "এক্স-সার্ভিসমেন ও তাদের বর্ত্তমান যোগ্যতার তালিকা।"

(১১) "রেলওয়ে কর্তাব্যক্তিদের ও তাদের জন্মস্থানের তালিকা।"

(১২) "বাস ও ট্রাকসমূহের ঠিকানা ও সেগুলির রেজিঃ নম্বর।"

(১৩) "বিশিষ্ট চিকিৎসক ও আইনজীবীদের তালিকা।"

এইসব তালিকা ডায়রীর তিন পাতা জুড়িয়া এবং প্রতিটি পাতার উভয় পৃষ্ঠায় লেখা।

সর্বশেষ লেখাটি হলো ২৫ নম্বরের। এতে ঢাকা, কুমিল্লা ও যশোর ক্যান্টনমেন্টের মানচিত্রের কথা লেখা আছে। এই শেষোক্ত নির্দেশ অনুযায়ী আমি অবশ্য কোন মানচিত্র সংগ্রহ করিনি। সুবেদার আশরাফ আলী অবশ্য আমার একটা ক্যানটনমেন্টের স্কেচ দিয়েছিল মাত্র। কিন্তু আমি জানতাম না যে, সেই স্কেচটি কোন্ ক্যান্টনমেন্টের। তবে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি এম, ই, এস-এর এম,ডি, ও'র নিকট হতে তিনটি ক্যানটনমেন্টের মানচিত্র সংগ্রহ করেছেন।

ডায়রীতে অপর এক আইটেমে যে 'শপথের' উল্লেখ রয়েছে তাতে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে নয়া যোগদানকারী সকলকেই শপথ নিতে হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগদান করলে সকলকেই সততার সাথে কাজ করতে হবে এবং তারা এই আন্দোলনের কথা সম্পূর্ণরূপে গোপন করবেন। ডায়রীতে "আমাদের প্রয়োজন" বলতে তালিকা বহির্ভূত টেলিফোন বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঢাকায় একটা বাড়ি নেওয়ার পর আমার একটা গোপন টেলিফোন থাকা উচিত, যাতে আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ও পার্টির অন্যান্য কর্মীদের সাথে কথা বলতে পারি।

এই পাতায় অপর এক আইটেমে 'বাঙলা দেশের একটা বড় আকারের মানচিত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে এরূপ একটি মানচিত্র সংগ্রহ করতে বলেন, কিন্তু আমি তা করিনি। এ তিনটি আলগা পাতার সবগুলো লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতের লেখা।

(এই সময় বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি সাক্ষীর হাতে চারটি আলগা পাতা দেন। এবং সাক্ষী সেগুলো সনাক্ত করতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করেন)। সাক্ষী বলেন, Ext, PW 3/24 এবং PW 3/25 চিহ্নিত দুটো পাতার লেখা লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের Ext PW 3/26 এবং PW 3/27 চিহ্নিত অপর দুটো আলগা পাতার লেখা কার আমি বলতে পাচ্ছি না। Ext PW 3/24 এবং PW 3/25 চিহ্নিত দুটো পাতায় দলের জন্যে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের তালিকা রয়েছে। এ চারটি আলগা পাতা লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ডায়েরীর সাথে আমাকে দেন। অপর দুটো পাতায় যেগুলোর লেখা আমি চিনি না বলে জানিয়েছি সেগুলোতেও অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদের তালিকা রয়েছে।

"১৯৬৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী আমি করাচী থেকে ঢাকায় আসি। এসে আমি ঢাকা হোটেলে উঠি। (সাক্ষীর হাতে একটা রেজিষ্টার দেওয়া হয়। Ext PWW 3/28 চিহ্নিত পৃষ্ঠায় এনট্রিনং ৩০-এর প্রতি সাক্ষীকে তাকাতে বলা হয়। রেজিষ্টারের প্রথম পৃষ্ঠাতেই Ext PW 3/29 চিহ্ন দেওয়া হয়)। এ রেজিষ্টারী ঢাকা হোটেলের। Ext PW 3/28 চিহ্নিত পৃষ্ঠার ৩০ নম্বরে আমার

নাম রয়েছে। আমি নিজেই নাম লিখেছি। হোটেলে উঠার তারিখ ১৯৬৬ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী। ঢাকা হোটেলে যাওয়ার পর আমি ২৮ নয়া পল্টন, ঢাকায় আমার অফিস অর্থাৎ সেন্ট্রাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অফিসে হাজিরা দেই।

১৯৬৬ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারীর রাতে আমি চট্টগ্রাম নৌঘাঁটিতে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে টেলিফোন করি। তিনি আমাকে চট্টগ্রাম যেতে বলেন।

১৯৬৬ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী আমি ঢাকা হতে চট্টগ্রাম যাত্রা করি। চট্টগ্রামে আমি 'হোটেল মিশকায়' অবস্থান করি। (সাক্ষীর হাতে আর একটি রেজিষ্টার দেওয়া হয়। তিনি বলেন যে, ইহাই হোটেল মিশকার রেজিষ্টার)। রেজিষ্টারের প্রথম পৃষ্টায় Ext PW 3/30 চিহ্নিত রহিয়াছে। সাক্ষীকে Ext 3/32 চিহ্ন লক্ষ্য করতে বলা হয়)। তিনি বলেন, উপর হতে ৭ নম্বরে আমি আমার হাতে লেখা আমার নাম দেখতে পাচ্ছি। এতে দেখা যায়, ১৯৬৬ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী আমি তথায় পৌঁছেছি। নাম লেখা রয়েছে 'এ,এম, হোসেন'। আমার চট্টগ্রাম পৌঁছার পর ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, এল, এস সুলতানউদ্দিন, এ, বি, মোঃ খুরশীদ, খুদে অফিসার রহমান এবং লেঃ হক একে একে এসে আমার সাথে দেখা করেন। আমরা সকলে মিশকা হোটেলের ৪নং রুমে মিলিত হই। ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমার সাথে লেঃ হক ও খুদে অফিসার রহমানের পরিচয় করিয়ে দেন। কারণ, তাদের সাথে আমার পরিচয় ছিল না।

প্রশ্ন ঃ– লেঃ হক ও খুদে অফিসার রহমান কি অভিযুক্তদের ডকে আছেন?
উত্তর ঃ আমি লেঃ হক অথবা খুদে অফিসার রহমানকে অভিযুক্তদের ডকে দেখছি না।

ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এরপর যেসব কাজ করা হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তিনি এবং এ, বি খুরশীদ সেনাবাহিনীর যাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন, তাদের একটা দীর্ঘ তালিকা প্রদান করেন। তালিকাটি লিখিত ছিল। আমার ব্যক্তিগত ডায়েরীতে তিনি তালিকাটি লেখেন। এরপর তিনি বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন কার্যকরী করার জন্যে আমরা আগামী বর্ষা মৌসুমের অপেক্ষায় রয়েছি। বর্ষা মৌসুমের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ঐ সময় সেনাবাহিনীর লোকেরা বন্যায় বাধাপ্রাপ্ত হবে। আমাদের উক্ত সুযোগ গ্রহণ করতে বলা হয়। অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ঠিক সময়ে পৌঁছবে কিনা তিনি আমার কাছে জানতে চান। তিনি বলেন যে, আমরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের তাড়িয়ে দেবো। সবাই এ প্রস্তাবে সন্তোষ প্রকাশ করেন। লেঃ হক জানতে চান অপর কোন দেশ আমাদের সমর্থন এবং আমাদের পরিকল্পনা কার্যকরীকরণে সাহায্য করবে। আমি তাকে বললাম যে, আমাদের আন্দোলনের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে সাহায্য করতে

শেখ মুজিবর রহমান ও লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ভারতকে রাজী করানোর চেষ্টা করেছেন এবং ভারত আমাদের সমর্থন করবে। লেঃ হক, তারপর আমাদের জানান যে, তিনি চট্টগ্রামে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপটেন নুরুজজামানকে ভর্ত্তি করেছেন। তারপর তাঁরা চলে যান। সে সভায় ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান অভিযোগ করেন যে, লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমদ কোন কোন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তা ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও এ,বি খুরশীদকে না জানিয়ে তিনি অসহযোগিতার পরিচয় দিয়েছেন। লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দিনকে চট্টগ্রাম হতে করাচী বদলীর ব্যবস্থা করার জন্য লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে অনুরোধ করে তাঁর কাছে একটি তারবার্ত্তা প্রেরণের খসড়া করেছিলাম। সেটা পাঠাবার জন্যে আমি তা ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের নিকট দেই। এ ব্যাপার ঘটে ৫ই ফেব্রুয়ারী রাতে।

৬ই ফেব্রুয়ারী মিশকা হোটেলের একই রুমে আমি পার্টির এক সভা আহ্বান করি। এই সভায় যোগদান করেন ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন, এ বি মোহাম্মদ খুরশিদ, ডঃ সাইদুর রহমান, মানিক চৌধুরী, বিধান চন্দ্র সেন, চট্টগ্রামের ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার রাজ্জাক। এই সময় সাক্ষী অভিযুক্তদের ডকে সঠিকভাবে মানিক চৌধুরী, সুবেদার আবদুর রাজ্জাক ও বিধান কৃষ্ণ সেনকে বিধান চন্দ্র সেন নামে সনাক্ত করেন।

সাক্ষী বলেন, "এই সকল নতুন নতুন লোককে এর আগে আমি কখনো দেখিনি। ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। আমি ডঃ সাইদুর রহমানকে অভিযুক্তদের ডকে দেখতে পাচ্ছি না।

সাক্ষী বলেন, "নতুন লোকদের সঙ্গে পরিচয়ের পর আমরা পার্টির ব্যাপার আলোচনা শুরু করি। এই সকল লোক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিভাবে অবদান রেখেছেন ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান তা ব্যাখ্যা করেন।

এই সভায় মানিক চৌধুরী পার্টির খরচের জন্য আমাকে তিন হাজার টাকা দেন। ডঃ সাইদুর রহমান ও মানিক চৌধুরী আমাকে জানান যে,এই আন্দোলনের জন্য কাজ করতে তাদের শেখ মুজিবর রহমান নির্দেশ দিয়েছেন। আমি সম্ভবতঃ '৬৬ সালের ৮ই ফেবরুয়ারী ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। আমি হোটেল আরজুতে ছিলাম। ঢাকা পৌঁছে ওই রাতেই আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে তারবার্তায় জানিয়ে দিই যে, আমি কে, জি মোস্তফার বদলির জন্যে তার সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি তার ব্যবস্থা করবেন বলে কথা দিয়েছেন।"

এরপর সাক্ষীর নিকট একখানি কাগজ প্রদান করা হয়।

প্রঃ এ চিঠি কার কাছে লেখা?

উত্তরঃ এ চিঠি আলো, 'উলকা'র কাছে লিখেছেন। একটি খামের মধ্যে এই চিঠি আমি পেয়েছি। (পত্রে PW 3/32 ও খামে PW 3/33 চিহ্ন প্রদত্ত)।

সাক্ষী বলেন, "এ লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতের লেখা 'উল্‌কা', আমার ও 'আলো' লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের নাম। চিঠি লেখার তারিখ ৯-২-৬৬।

এরপর সাক্ষীকে চিঠির ইংরেজী অনুবাদ পরীক্ষা করিতে বলা হয়। সাক্ষী পরীক্ষা করে বলেন যে, অনুবাদ নির্ভুল হয়েছে। তিনি বলেন, "এই চিঠির শুরুতে 'পরশ'-এর উল্লেখ রয়েছে। 'পরশ' বলে অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ চিঠি লেখা হয় করাচী থেকে। পত্রে আরও বলা হয় যে, 'তুহীন' ও 'সবুজ' করাচী থেকে আসছেন। তুহীন বলেন লেঃ মোজাম্মেল ও 'সবুজ' হলেন লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ। পরের বাক্যে যে 'কমলের' কথা বলা হয়েছে তিনি বলেন সুলতানউদ্দীন। সুলতানকে বদলীর ব্যাপারে আমি যে তারবার্তা প্রেরণ করি পরের বাক্যে তারই ইঙ্গিত করা হয়েছে। চিঠির পরের বাক্যে বলা হয় "সামান্য অসুবিধা দেখা দিয়াছে। 'সবুজ' যাতে বদলী না হয়, তিনি তেমন ব্যবস্থাই করেছেন।" এর অর্থ হলো যে, সুলতান উদ্দীন যাতে চট্টগ্রাম হতে বদলী না হন তার জন্যে নূর মোহাম্মদ ব্যবস্থা করেছে। পরের বাক্যে যে, 'কামাল সাবে'র কথা বলা হয়, তিনি বলেন সেনা বিভাগের এস এম জি'র মেজর কামাল। ...। ঐ চিঠিতে তুষার ও 'শেখরের' বিষয় উল্লেখ রয়েছে। 'তুষার ' হলো জনাব এ, এফ, রহমান পিএপি'র ছদ্মনাম, শেখর রুহুল আমীন সি এসপি'র ছদ্মনাম।

প্রশ্ন ঃ চিঠিতে বলা হয়েছে "আমাদের পথ হলো ডান হাতকে বাহাতের খবর জানতে দেব না"– এর মানে কি?

উত্তর ঃ এর মানে হলো, পূর্বে শেখ মুজিবর রহমান জনাব এ এফ রহমানকে বিশ্বাস করতে চাননি। কিন্তু তিনি সংগঠনের সদস্য। এই বাক্যের মানেগুলো জনাব এ এফ রহমানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের বিষয় শেখ মুজিবর রহমানকে জানান উচিত হইবে না। আমরা তখন বস্তুতঃ এই ২ লোকের নিকট হতে অর্থ লাভের আশা করেছিলাম। পত্রে বলা হয়, "আমি ইতিমধ্যে আপনাকে বলে দিয়েছি যে, আমরা তাদের নিকট হতে বাড়ী নেব না" এর মানে হলো যদি শেখ মুজিবর রহমান কিম্বা জনাব এ এফ রহমান কোন বাড়ী দেন তাহলে আমরা সেই বাড়ী নেব না। এর বদলে তাদের কাছ থেকে আমরা টাকা নেব। এবং তা দিয়ে আমরা বাড়ীভাড়া করব। পত্রে বলা হয়েছে, "পরশ এখনো তাঁকে বোকা বলে মনে করেন।"এর মানে হলো শেখ

মুজিবর রহমান ও লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের মধ্যে মতভেদ। প্রথমোক্ত ব্যক্তির মত হলো আমাদের পরিকল্পনা তাড়াতাড়ি কার্যকরী করা উচিত, অপরপক্ষে শেষোক্ত ব্যক্তির মতে এখনো সময় হয়নি।

এই সভায় বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব ইসমাইল ও জনাব সালাম খান সাক্ষী কর্তৃক এই চিঠির ব্যাখ্যায় আপত্তি তোলেন।

ইহার পর আদালতের গতকালকার অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। আজ (মঙ্গলবার) সকাল ৯ টায় শুনানী পুনরায় শুরু হইবে।

দৈনিক পয়গাম

৬ই আগস্ট ১৯৬৮

ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্ত মোয়াজ্জেমের হস্তলিখিত ডাইরী পেশ
মানিক চৌধুরী ও ডঃ রহমানের প্রতি শেখ মুজিবের নির্দেশ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

দুইদিন বিরতির পর গতকল্য (সোমবার) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে সাধারণভাবে পরিচিত "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের" মামলার শুনানী পুনরায় শুরু হইলে বাদীপক্ষ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন পরিচালন সম্পর্কে নির্দেশ সম্বলিত দুই নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন কর্তৃক লিখিত ডাইরী বিশেষ ট্রাইব্যুনালে পেশ করেন।

রাজসাক্ষী এবং বাদীপক্ষের সাক্ষী জনাব আমির হোসেন মিয়া এই ডাইরীর লেখা লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বলিয়া সনাক্ত করেন।

সাক্ষী জনাব আমির হোসেন মিয়া বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে বদলী হইয়া আসিবার পূর্বে তিনি লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেমের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি (কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম) তাঁহাকে (আমির হোসেন) তিনটি ডাইরী প্রদান করেন। এই ডাইরীতে পূর্ব পাকিস্তানে সাক্ষীর অবস্থানকালে করণীয় কার্য সম্পর্কে নির্দেশ ছিল।

ডাইরীতে ভারত হইতে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ সঙ্গোপনে রাখিবার জন্য ঢাকায় একটি বাড়ীভাড়া নেওয়ার জন্য লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম রাজসাক্ষী জনাব আমির হোসেন মিয়াকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম উক্ত ডায়রীতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সফল করিবার জন্য সাক্ষী আমির হোসেন মিয়াকে সাহায্য, অর্থ, অস্ত্র এবং গোলাবারুদ সংগ্রহে এবং স্ব স্ব দেশের সমর্থন আদায়ের ব্যাপারে ভারত, চীন অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনসালদের সহিত যোগাযোগ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। সাক্ষী আমির হোসেন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ডাইরীর এই তথ্য প্রকাশ করেন।

ডাইরীতে ঢাকা, কুমিল্লা এবং যশোর ক্যান্টনমেন্টের ম্যাপ সংগ্রহের জন্যও লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেমের নির্দেশ ছিল। সাক্ষী আমির হোসেন বলেন যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সফল করিবার জন্য লেঃ মোয়াজ্জেম তাঁহার (সাক্ষী) নিকট অস্ত্র ও গোলাবারুদের একটি তালিকাও প্রদান করিয়াছিলেন।

সাক্ষী জনাব আমির হোসেন মিয়া বলেন, "চট্টগ্রামের হোটেল মিশকায় অনুষ্ঠিত এক গোপন বৈঠকে ডঃ সাইদুর রহমান (৪নং রাজসাক্ষী) এবং মানিক চৌধুরী (১২নং অভিযুক্ত ব্যক্তি) গোপনে আমাকে বলিয়াছেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহাদিগকে এই উদ্দেশ্য সফলতার জন্য (বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন) কাজ করিবার নির্দেশ দিয়েছেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, তিনজন সিএসপি অফিসার এবং নৌবাহিনীর একজন লেঃ কম্যাণ্ডারসহ সর্বমোট ৩৫ ব্যক্তি বিচারাধীন রহিয়াছেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে ভারত কর্তৃক সরবরাহকৃত অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাইয়া পাকিস্তানকে ইহার এক অংশ হইতে বঞ্চিত করিবার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান, ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম, আর, খান এবং জনাব মকসুমুল হাকিম সমবায়ে এই বিশেষ ট্রাইব্যুনালে গঠিত হইয়াছে।

শুনানীর পূর্ণ বিবরণ

বাদীপক্ষের ৩নং সাক্ষী জনাব আমির হোসেন মিয়া তাঁহার নিকট ৩নং অভিযুক্ত ব্যক্তি ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রেরিত একখানি চিঠি সম্পর্কে পূর্বদিনের অর্থাৎ গত শুক্রবারের বক্তব্যের জেরা টানিয়া বলেনঃ "আদালতে পি, ডব্লিউ ৩/৬ নম্বর দলিল হিসাবে চিহ্নিত এই চিঠিখানি ১৯৬৫ সালের নভেম্বর এবং ১৯৬৬ সালের জানুয়ারীতে আমি পাই। সঠিক তারিখটি আমি মনে করিতে পারিতেছি না। চিঠির যে কোণায় তারিখের উল্লেখ থাকে, খাম খোলার সময় দুর্ভাগ্যবশতঃ সে স্থানটি ছিঁড়িয়া যায়। আদালতে পি, ডব্লিউ ৩/৭ নম্বর দলিল হিসাবে চিহ্নিত অপর চিঠিখানি সম্পর্কিত আমার জবাব একই। দুইখানি চিঠি একই খামের ভিতর ছিল এবং দুইখানিরই একটি অংশ ছিঁড়িয়া যায়। পি, ডব্লিউ ৩/৭ নম্বর দলিল হিসাবে চিহ্নিত দ্বিতীয় চিঠিখানি "বড় ভাইয়ের" নিকট লেখা ছিল এবং ইহাতে এল, এস নূর মোহাম্মদের উল্লেখ ছিল। চিঠিতে পত্রের প্রাপকের নিকট প্রথমে সালাম জানাইয়া লেখা ছিল যে, আপনারা সকলে ভাল আছেন বলিয়া আশা করি। তিনি আরও বলেন, "ইহার আগেও আমি আপনার নিকট একখানি চিঠি লিখিয়াছি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি আপনার উত্তর পাই নাই। ওখানকার কাজে আপনি কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, সে বিষয়ে আমাকে জানান। আমার চিঠি পাওয়ার পর আপনি আপনার পছন্দমত কর্মী সংগ্রহ করুন। আল্লাহের অনুগ্রহে আমরা খুব জোরেসোরেই কাজ করিতেছি এবং অনেকদূর আগাইয়া গিয়াছি। আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখুন এবং ইতস্ততঃ না করিয়া কাজ করিয়া যান। গোলাম মোহাম্মদকে আমার ভালবাসা দিবেন। তাহাকে বলিবেন, তিনি যেন আপনাদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কাজ করিয়া যান। আমার দেরাজের চাবি গোলাম মোহাম্মদের কাছে আছে। তাহাকে বলিবেন যে, দেরাজের ভিতর কাগজপত্রের মধ্যে আমার পে-বুক রহিয়াছে। তিনি যেন সেটি আমাকে পাঠাইয়া দেন। তাহাকে সেটি রেজিষ্ট্রি করিয়া পাঠাইতে বলিবেন। এজন্য তাহার নিকটও আমি একখানি চিঠি লিখিয়াছি। চিঠিখানি হয়ত তিনি পাইয়া থাকিবেন। ২৫ তারিখের ভিতর আমি এটি পাইব বলিয়া আশা করি। অন্যথায় আমি আমার বেতন পাইব না। মোজাম্মেল হোসেন সাহেবকে আমার সালাম বলিবেন। পরের চিঠিতে আমি আপনাকে বিস্তারিতভাবে সবকিছু জানাইব। চট্টগ্রামে আমার ড্রাফট সম্পর্কে জনাব মোজাম্মেল হোসেনের নিকট আমার কথা বলিবেন। আমি যাহাতে এখানে থাকিতে পারি, তিনি যেন সে বন্দোবস্ত করেন। খুরশীদের সালাম গ্রহণ করিবেন। সর্বশক্তিমানের অনুগ্রহে আমরা ভালই আছি। আপনার সংবাদ জানাইবেন।"
এই চিঠির শেষে লেখা আপনার চিঠিতে উল্লিখিত গোলাম মোহাম্মদকে আমি (আমির হোসেন) চিনি। তিনি এল, এস, নূর মোহাম্মদ এবং ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের একজন সহকর্মী।

করাচীতে আমার ৩২/৬নং জাহাঙ্গীর রোড (ইষ্ট) এর বাসভবনে গোলাম মোহাম্মদ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।
(মাননীয় আদালতে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলীকে আদালতে পি, ডব্লিউ ৩/৭ নম্বর দলিল হিসাবে চিহ্নিত চিঠিখানির ইংরেজী তরজমা প্রদান করিতে বলেন।)
(বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির সাক্ষীর হাতে একখানি চিঠি দেন। এই চিঠি আদালতে পি, ডব্লিউ ৩/৯নং দলিল হিসাবে চিহ্নিত।)

রাজসাক্ষী জনাব আমির হোসেন বলেনঃ "১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে আমি এই চিঠি পাই। চিঠিখানিতে তারিখ লেখা আছে ২৯/১১/৬৫/ এইখানি পাঠাইয়াছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাহার হস্তাক্ষর আমি চিনি। চিঠিখানি তাঁহার নিজের হাতের লেখা। আদালতে পি, ডব্লিউ ৩/৯নং দলিল হিসেবে চিহ্নিত এই চিঠিখানি আমি পড়িয়াছি। ইহার ইংরেজী তরজমাও আমি

দেখিয়াছি এবং এটি আমার হাতে দেওয়া হইয়াছে। ইহাকে এক্ষণে আদালতে পি, ডব্লিউ ৩/১০নং দলিল হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। ইহা পূর্বোক্ত চিঠিখানিরই নির্ভুল ইংরেজী তরজমা। ইহার শুরুতে 'বড় ভাই' হিসাবে যাহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি হইলেন অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমান। পরের বাক্যে 'সুলতান' হিসাবে যাহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি হইলেন এল,এস সুলতানুদ্দীন আহমদ। পরের বাক্যে পুনরায় "বড় ভাইয়ের" উল্লেখ রহিয়াছে। শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কেই ইহা বলা হইয়াছে। পরের বাক্যে আমার সম্পর্কে "চূড়ান্ত ব্যবস্থার" কথা বলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা ঢাকায় আমার জন্য একটি সুবিধাজনক চাকুরীর সংস্থানের কথা বুঝান হইয়াছে। চিঠির শেষেও পুনরায় "বড় ভাইয়ের" কথা উল্লেখ রহিয়াছে। এই চিঠিতে লেফ্‌টেন্যান্ট কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনেরও উল্লেখ করিয়াছে। ইহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা এবং আমাদের জিনিসপত্র আনার সম্পর্কেও কথা বলা হইয়াছে।

এখানে আমাদের জিনিসপত্র দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ বুঝান হইয়াছে। এই চিঠিতে জনাব শফিরও উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি আমার একজন বন্ধু। সেই সময়ে তিনি চট্টগ্রামে কাজ করিতেন। আসলে তিনি বাড়বকুণ্ডাতে কাজ করিতেন এবং এই স্থানটি চট্টগ্রামেরই একটি অংশ। চিঠিতে আপনাদের তহবিল সম্পর্কেও লেখা ছিল। অর্থ সম্পর্কেই এ কথা বলা হইয়াছে। শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট হইতে ইহা সংগ্রহ করার কথা ছিল। চিঠির শেষে লেখা ছিল আপনার মুজিবুর। ইহার অর্থ ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান।

বাদীরপক্ষের কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির এই সময়ে আরেকখানি বাংলায় লেখা চিঠি রাজসাক্ষীর হাতে দিয়া তাহা পড়িয়া শুনাইতে বলেন।

সাক্ষী বলেন, এই চিঠিখানি ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের নিকট হইতে আমি পাই। চিঠিখানি তাহার নিজের হাতের লেখা। এই লেখা আমি চিনি। চিঠিতে ৬-১২-৬৫ তারিখের উল্লেখ রহিয়াছে।

চিঠিতে তিনি লেখেনঃ "বহুদিন যাবৎ আমি আপনার স্নেহাশীষ হইতে বঞ্চিত। কিভাবে এবং কোথায় আপনার সঙ্গে আমার দেখা হইতে পারে জানি না। বোধহয় আপনারা সকলেই আমার উপর রাগ করিয়াছেন। কিন্তু কাহারও বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। গত ২৯/১১/৬৫ তারিখে জাহাজযোগে এক ব্যক্তির মারফত চিঠিগুলি আমি পাঠাইয়াছি। বোধহয় আপনি উহা পাইয়াছেন। ঐসব চিঠিতে আমি বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করিয়াছি। এখানে রোগীর অবস্থা খুব ভাল।" 'রোগীর' অর্থ পূর্ব পাকিস্তান এবং উহার অবস্থা।

চিঠিতে তিনি আরও লেখেনঃ "এ বিষয়ে" চিন্তা করিবেন না। আপনার বিষয়ে নিষ্পত্তির জন্য আমি এবং সুলতানউদ্দীন ঢাকা গিয়াছিলাম। এখানে আপনাকে নিয়া আসিতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হইবে। বর্তমানে কোন পদ খালি নাই। ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বা ইন্সুরেন্সে ঔষধ পাঠানোর জন্য ব্যবস্থা করিয়াছি। এখানে 'ঔষধ' বলিতে টাকা পয়সা বুঝানো হইয়াছে।

চিঠিতে আরও লেখা হয়ঃ "এ বিষয়ে" আপনি চিন্তা করিবেন না। আমরা এখানে 'বিদেশে'র সংগে যোগাযোগের ব্যাপারে অগ্রসর হইয়াছি। এখানে 'বিদেশে'র অর্থ ভারত।

চিঠিতে তিনি আরও লেখেনঃ "সম্ভব হইলে আপনাকে জানাইব। 'বড় ভাইর' পক্ষে আমাকে ভুল বুঝা ঠিক নয়।" এখানে 'বড় ভাই' বলিতে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে বুঝানো হইয়াছে।

তিনি চিঠিতে আরও বলেনঃ "সত্যিকার কর্মী হিসাবে আমি আপনার সংগেই থাকিব। যদি কোন ভুল করিয়া থাকি ক্ষমা করিবেন। জানি, বড় ভাই আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। উহার পর বড় ভাই-এর সংগে আমার কলহ হইয়াছিল।" এখানে বড় ভাই-এর অর্থ শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি স্বীকার করেন যে, ইহার জন্য তিনি লজ্জিত। সেখানে জোরেসোরে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে। বহুদিন যাবৎ আপনার কোন খবর পাই না বলিয়া আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছি। আমার চিঠিপত্র পাইয়া শীঘ্রই উত্তর দিবেন। অধিকন্তু যত খরচাই পড়ুক আপনাকে জাহাজযোগে উলের একটি পুলওভার পাঠাইতে হইবে। শীতে আমাকে বেশ কষ্ট পাইতে হইতেছে। পুলওভারটি আকাশী রং-এর হইতে হইবে। অনুগ্রহপূর্বক উহা সাদেক ভাই বা নুর মোহাম্মদ অথবা গোলাম আহমদের হাতে দিবেন।"

সাক্ষী বলেন যে, তিনি চিঠিতে উল্লিখিত সাদেককে চেনেন না।

তিনি আরও বলেনঃ "আমি নৈমিত্তিক ছুটির জন্য আবেদন করিতেছি। উহা মঞ্জুর হইলে আমি একবার করাচী আসিব। ছুটি যাহাতে পাই, সেজন্য প্রার্থনা করিবেন। আর কি লিখিব? কোনভাবে দিন কাটাইতেছি। আমার জন্য দোয়া করিবেন। ভালই আছি।" চিঠির শেষে লেখা হইয়াছেঃ "আপনার খাদেম মুজিবুর।" উহার নীচে বিশেষ দ্রষ্টব্যতে লেখা হয়, "ইতিমধ্যে আমি বাড়বকুণ্ডে গিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছি।" চিঠিতে তিনি কাহার সঙ্গে দেখা করেন, উহার উল্লেখ নাই। তবে জনাব শফির কথাই বুঝানো হয়।

তিনি দ্রষ্টব্যে আরও লেখেনঃ "দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি যে, তিনি মোটেও আগ্রহী নন। তিনি আপনার উপর নির্ভরশীল। তিনি অনুযোগ করিয়াছেন যে, আপনার নিকট হইতে তিনি কোন চিঠিপত্রই পান না। এজন্য

তিনি নীরব রহিয়াছেন। তিনি কি করিবেন,তাহা তিনি আমাকে জানান নাই। এজন্য আমি স্বস্তিবোধ করিতে পারিতেছি না। জনাব শফি অনেক কিছু বলিয়াছেন। কখন আপনার সঙ্গে দেখা করিব, তাহা আমি যথারীতি জানাইব। আজ আর নয়।"

পরিশেষে লেখা হয়ঃ "খোদা হাফেজ, মুজিব।"

সাক্ষী জানান যে, চিঠির প্রথম পৃষ্ঠার মার্জিনে আরও লেখা হয়ঃ "পয়সার অভাবে পোষ্টকার্ড সংগ্রহ করা যাইতেছে না–একথা কি আমাকে বিশ্বাসে করিতে হইবে? একথা যদি ঠিক না হয়,তাহা হইলে কেন আমি চিঠিপত্র পাইতেছি না? ইহা কি আমি জানিতে পারি? কেন আপনি চিঠি লিখিতেছেন না, তাহা আমি জানি। অনুগ্রহপূর্বক মন হইতে ভুল ধারণা দূর করুন।" ইহার কোন বিশেষ অর্থ নাই।

তিনি আরও লেখেনঃ "আপনি যদি প্রকৃতই বিশ্বাস রাখিয়া থাকেন,তাহা হইলে সহজ পথে সবকিছু হইবে না। বর্তমানে আমরা আপনাদের মত লোক চাই; কিন্তু পাইতেছি না।" (এই চিঠিকে চিহ্নিত দলিল পিডব্লু ৩/১১ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।) আদালত এই চিঠির ইংরেজী অনুবাদ পেশ করার জন্য বাদীপক্ষকে নির্দেশ দেন।

সুলতানউদ্দীনের পত্র

সাক্ষী বলেন যে, তিনি চিহ্নিত দলিল পি, ডব্লু, ৩/৬-এর পূর্বে উক্ত পত্রটি পান। (এই পর্যায়ে সাক্ষী বাথরুমে যাইতে চাহিলে আদালত উহার অনুমতি প্রদান করেন।)

অতঃপর বাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীকে বাংলায় লেখা আর একটি পত্র দিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি উহা পান কিনা। ইহাতে সাক্ষী বলেন? হ্যাঁ চিঠিটা আমি পাই। উহা আমাকে লেখা হয়। উহাতে তারিখ ছিল ২৪/১২/৬৫। সুলতানউদ্দীন চিঠিটা লিখিয়াছিলেন। সুলতানউদ্দীন নিজের হাতে চিঠিতা লেখেন, কেননা আমি তাহার হাতের লেখার সঙ্গে পরিচিত। চিঠির শিরোভাগে ইংরেজীতে যে ঠিকানা দেওয়া হয়, তাহাও তাহার নিজের হাতে লেখা। চিঠিতে বলা হয়ঃ "প্রিয় আমির সাহেব, প্রীতি গ্রহণ করিবেন। আপনি অনেক কিছুর কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু সবকিছুর উত্তর দেওয়া মুশকিল। আপনি আমাকে তো ভাল করিয়াই জানেন। আপনার নিকট আমাকে নূতন করিয়া তুলিয়া ধরা বাহুল্য মাত্র। চিঠিপত্র লেখা আমার অভ্যাস নয়। আমি কাজের মানুষ এবং আমার উদ্দেশ্যও তাই। যাহাতে আমি আমরণ কাজ করিয়া যাইতে পারি, সেজন্য প্রার্থনা করিবেন।

চিঠি লেখার সময় এ বিষয়ে চিন্তা করিবেনঃ কি লিখিবেন এবং কিভাবে লিখিবেন। আপনি বিজ্ঞ লোক। এ বিষয়ে আর কিছু লেখা বাহুল্য মাত্র।

আপনি কি আমার তারবার্তা পাইয়াছেন? ঐ দেশের সঙ্গে সকল কাজ শেষ করুন। যত শীঘ্র সম্ভব আমার সঙ্গে আপনার দেখা করা উচিত।"

সাক্ষী বলেন যে, এখানে ঐ দেশ বলিতে মার্কিন দূতাবাস বুঝানো হইয়াছে।

চিঠিতে আরও লেখা হয়ঃ বড় ভাই'র সঙ্গে আপনার পরামর্শ করা উচিত। সাক্ষী আরও বলেন, ইহার অর্থ 'বড় ভাই'র সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর আপনাকে এখানে আসিতে হইবে। এখানে বড় ভাই বলিতে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে বুঝানো হইয়াছে। চিঠিতে আরও লেখা হয়ঃ "আজ অধিক আর কি লিখিব। আপনি কেমন? আমরা এখানে সকলেই ভাল আছি। আপনাদের সুলতান।"

সাক্ষী বলেনঃ আমি খামে এই চিঠিটা পাই এবং এক্ষণে উহা দেখিতেছি। চিঠিটার চিহ্নিত দলিলনং পি, ডব্লু ৩/১২ এবং খাম পি, ডব্লু চিহ্নিত দলিল নং ৩/১৩ ।

লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ দুইটি চিঠি এবং ২২০০ টাকাসহ আমার নিকট আসেন। চট্টগ্রাম হইতে আগত একটি সওদাগরি জাহাজের ইয়ার্ড মারফত আমি উহা পাই।

তিনি আমাকে বলেন যে, এই টাকা ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দিন ও নূর মোহাম্মদ প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমি তখন লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের পি, এন, কারসাজস্থ বাসভবনে গমন করি। আমি আদালতের চিহ্নিত পি ডবিলুই ৩/১১ দলিল হিসাবে চিহ্নিত পত্রটির বিষয়বস্তু লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে জানাই এবং আমার সম্মুখে লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদও প্রাপ্ত দুইটি পত্রসহ ২২শত টাকা লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের কাছে হস্তান্তর করেন। লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন পত্রগুলি পাঠ করিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া উঠেন। ইহার কারণ হইতেছে তাহার মতে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান এবং সুলতানউদ্দিন ৩ হাজার টাকা পাইয়া তাহা হইতে মাত্র ২২ শত টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। (সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি আদালতে পি ডব্লিউ ৩/১২ দলিল হিসেবে চিহ্নিত পত্রটি পাওয়ার পূর্বে সুলতানকে কোন পত্র লিখিয়া ছিলেন কি না।) তিনি প্রথমে বলেন, "আমি কিছুই করি নাই।" যখন তাহাকে উক্ত প্রশ্নটি আবার জিজ্ঞাসা করা হয়,তখন তিনি বলেন, আমি ১০টি পত্র লিখিয়াছি।" (কৌসুলী উল্লেখ করেন যে,"তিনি কিছুই করেন নাই" উত্তরটি তিনি কিছু করিয়াছেন কিনা এই প্রশ্নের সাপেক্ষে এবং পত্র লেখার জবাবটি তিনি

সুলতানকে কোন পত্র লিখিয়াছিলেন কিনা এই প্রশ্নের সাপেক্ষে প্রদত্ত)। আমি আদালতের পি ডব্লিউ ৩/৬ দলিল হিসাবে চিহ্নিত পত্রটির পূর্বে আদালতের পি ডব্লিউ ৩/১২ দলিল হিসেবে চিহ্নিত পত্রটি পাইয়াছিলাম। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি পূর্ব পাকিস্তানে আমাকে বদলির ব্যবস্থা করি। ঢাকা যাওয়ার পূর্বে আমি লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের গৃহে গমন করি। তিনি আমার নিকট তাহার লিখিত নির্দেশাবলী সম্বলিত ৩টি ডাইরী হস্তান্তর করেন। এই নির্দেশগুলি আমাকে পালন করিতে বলা হয়। (প্রধান কৌসুলী সাক্ষীকে একটি ডাইরী প্রদান করেন) সাক্ষী বলেন যে, উহা উক্ত ডাইরীগুলিরই একটি। এই ডাইরীটি আদালতের (পি ডব্লিউ ৩/১৪ দলিলরূপে চিহ্নিত হইয়াছে) উহাতে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের স্বহস্তে লিখিত বিষয়াদি রহিয়াছে। আমি তাহার হাতের লেখার সহিত পরিচিত। ডাইরীগুলি আমার নিকট হস্তান্তরের সময় লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে বলেন যে, আমি যেন তাহার লিখিত ডাইরীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করি।

তিনি আমার নিকট অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদেরও তালিকা প্রদান করেন–এইগুলি ডাইরীতেও লিপিবদ্ধ ছিল। (সাক্ষীকে আরও ৩টি ছটানো পাতা দেওয়া হয়–যেগুলি স্পষ্টতঃই একটি ডাইরীর একটি অংশ। এইগুলি আদালতের পি ডব্লিউ ৩/১৬ এবং ৩/১৭ দলিল হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে)। সাক্ষী বলেন যে, এই পাতাগুলিতেও নির্দেশাবলী সংযোজিত হইয়াছে। ৯ম পৃষ্ঠায় আমি দেখিতে পাই যে, এই ডাইরীর শেষের দিকে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের লেখা বাংলায় কতিপয় শব্দ রহিয়াছে।

(এই কাগজগুলিকে আদালতের পি ডব্লু ৩/২৮নং দলিল হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। বাদীপক্ষের কৌসুলী বলেন যে, মূল অভিযোগপত্রের সহিত ইংরেজীতে লিখিত এই সকল সাংকেতিক নামের একটি তালিকা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।) তালিকায় প্রথম লেখা আছে স্বয়ং আলো। এতদ্বারা লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনক 'আলো' বলিয়া বুঝানো হইয়াছেঃ ইহার পর উল্লেখ আছে মিয়া–সাংকেতিক নাম উলকা। সাক্ষী জনাব আমির হোসেন মিয়া বলেন যে, ইহা আমার নিজের সাংকেতিক নাম তৃতীয়তঃ লেখা আছে মোজ্জাম্মেল–সাংকেতিক নাম তুহিন, ইহা লেঃ মোজাম্মেলের সাংকেতিক নাম। অতঃপর লিখিত আছে সুলতান–সাংকেতিক নাম 'কামাল'। ইহা লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দিন আহমদের সাংকেতিক নাম। তারপর উল্লেখ আছে মুজিব–সাংকেতিক নাম 'মুরাদ'। ইহা ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের সাংকেতিক

নাম। তারপর লেখা আছে শেখ–সাংকেতিক নাম 'পরশ', ইহা শেখ মুজিবুর রহমানের সাংকেতিক নাম। অতঃপর উল্লিখিত আছে রহমান– 'তুষার', ইহা জনাব এ, এফ, রহমান সি এস পি'র সাংকেতিক নাম। তারপর লেখা আছে নূর মোহাম্মদ–সাংকেতিক নাম–সবুজ। ইহা লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদের সাংকেতিক নাম। তারপর লেখা আছে কুদ্দুস–সাংকেতিক নাম শেখর। ইহা জনাব রুহুল কুদ্দুস সি এস পি'র নাম।

সাক্ষী জনাব আমির হোসেন মিয়া আদালতকে বলেন, "আমি ডায়রীর প্রথম পৃষ্ঠা দেখিতেছি। ইহা লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন কর্তৃক লিখিত। ইহাকে আদালতের পি ডব্লু ৩/১৯নং দলিল বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। ইহা ইংরেজীতে লেখা এবং লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের হস্তলিপি। আমি এই হস্তলিপির সহিত পরিচিত। এই পৃষ্টায় উল্লিখিত স্কুটারের পরিচিতি-নম্বর হইতেছে কে, এ, এইচ ৪৭৬৮। ইহা লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের স্কুটার।

আমি ডায়রীর ১৯/৩/৬৭ তারিখে লিখিত একটি পৃষ্ঠাও দেখিতেছি। ইহাকে আদালতের পি ডব্লু ৩/২০নং দলিল হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। ইহাও লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতের লেখা। আমি ডায়রিতে উল্লিখিত প্রথম দুইটি বিষয় পড়িয়াছি। কিন্তু ইহা কি সম্পর্কে লিখিত, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। আমি ডায়রীর ১৯৬৪ সালের ১৭ই জানুয়ারী লিখিত পৃষ্ঠাটি দেখিতেছি। বর্তমানে ইহাকে আদালতের পি ডব্লু ৩/২১নং দলিল হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। ইহাও লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের লেখা। এই পৃষ্ঠায় আমার জন্য নির্দেশাবলী উল্লিখিত আছে। এই নির্দেশাবলী অনুসারে আমাকে কাজ করিতে হইত। নির্দেশাবলী হইতেছেঃ "১নং–, আমার বদলির জন্য জনাব কে, জির সহিত যোগাযোগ করুন। লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের করাচী হইতে চট্টগ্রামে প্রস্তাবিত বদলি সম্পর্কে আমাকে উক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়।

কে,জি, একটি নামের সংক্ষিপ্ত রূপ। কিন্তু আমি পুরা নামটি জানি না। ইহা জাতীয় শিপিং কর্পোরেশনের ডিরেক্টরের নাম। সম্ভবতঃ কে, জি, দ্বারা কাজী গিয়াস উদ্দিন– এই নাম বুঝাইয়াছে। এই নির্দেশে ইহা বুঝায় যে, কে, জি, আহমদ ঢাকা বিমানবন্দরে আসিয়া পৌঁছিলে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের চট্টগ্রাম বদলীর ব্যাপারে তাহার সহিত আমার যোগাযোগ করা উচিত। কে, জি আহমদ, জাতীয় শিপিং কর্পোরেশনের ডিরেক্টর। দ্বিতীয় নির্দেশ "বাড়ী ভাড়া করুন।" আলোচ্য নির্দেশের সহিত আমি ঢাকায় গেলে সেখানে বসবাস ও ভারত হইতে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ সংরক্ষণের

জন্য একটি বাড়ীর প্রয়োজন হইবে– এই নির্দেশের সম্পর্ক রহিয়াছে। আমাকে শেখ মুজিবুর রহমান অথবা আহমদ ফজলুর রহমানের নিকট হইতে বাড়ীভাড়া লওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

তৃতীয় নির্দেশঃ "সামাদ দোহা প্রমুখের জন্য চাকুরী জোগাড় করুন।" আমি ঢাকা পৌঁছিবার পূর্বেই সামাদ এবং দোহা করাচী হইতে পূর্ব পাকিস্তানে চলিয়া যায়। আমাকে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন সামাদ ও দোহা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগদান করিবে বলিয়া তাহাদের জন্য চাকুরী জোগাড় করিতে নির্দেশ দেন। এখানে উধৃত 'সামাদ' অভিযুক্ত সাবেক কর্পোরাল সামাদকে বুঝায়। এখানে উধৃত দোহা একজন সাবেক বৈমানিক। তিনি সামাদের একজন বন্ধু। চতুর্থ নির্দেশ হইতেছে, নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পাঠাইয়া দিন ইহা এই বুঝায় বিচ্ছিন্ন পল্লী আন্দোলনের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান অথবা টাকা পাওয়া যাইতে পারে এইরূপ অন্য সূত্র হইতে আমার টাকা জোগাড় করা উচিৎ।

পঞ্চম নির্দেশে বলা হয়, "সুলতান এবং মুজিবুরের সহিত যোগাযোগ করিয়া বিস্তারিত আলোচনা করুন।" এই নির্দেশে বুঝায় যে, ঢাকা পৌঁছিয়া সুলতানউদ্দিন এবং ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের সহিত যোগাযোগ করিয়া কার্যক্ষেত্রে তাহারা কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে,তাহা আমার জানিয়া লওয়া উচিত এবং আমাদের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া লোক সংগ্রহের নয়া পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত।

দৈনিক পয়গাম

৬ই আগস্ট ১৯৬৮

পূর্ব পাকিস্তানকে 'রোগী' বলা হইত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ব্যক্ত ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান রাজসাক্ষী এবং বাদীপক্ষের সাক্ষী জনাব আমির হোসেন মিয়ার নিকট স্বহস্তে লিখিত পত্রে সাঙ্কেতিক ভাষায় পূর্ব পাকিস্তান বুঝাইবার জন্য 'রোগী' শব্দ ব্যবহার করিতেন। ১৯৬৫ সালের ৬ই ডিসেম্বর লিখিত পত্রে ষ্টুয়ার্ড মুজিব লিখিয়াছিলেন, "সেখানে রোগীর অবস্থা খুবই ভালো"। রাজসাক্ষী বলেন, এখানে "রোগী" বলিতে পূর্ব পাকিস্তানকে বুঝাইয়াছে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগদানেচ্ছু নূতন কর্মীদের "সততার সহিত কাজ করিবার এবং গোপন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ না করিবার" অঙ্গীকার করিয়া শপথ গ্রহণ করিতে হইত। রাজসাক্ষী জনাব আমির হোসেন মিয়া গতকল্য সাক্ষ্যদানকালে এই কথা প্রকাশ করেন।

দৈনিক পাকিস্তান

৬ই আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : আমির হোসেনের জবানবন্দী অব্যাহত

ভারত থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাবে, তা রাখার জন্য বাড়ী ভাড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল

(স্টাফ রিপোর্টার)

দু'দিন বিরতির পর গতকাল সোমবার পুনরায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হলে দু'নং একরারী সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার জবানবন্দী গ্রহণ অব্যাহত থাকে। গতকাল ছিল তার জবানবন্দী গ্রহণের তৃতীয় দিন। আমীর হোসেন মিয়ার জবানবন্দী গ্রহণ অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় গতকালকের শুনানী শেষ হয়।

গতকাল আমীর হোসেন মিয়ার জবানবন্দীর সময় নতুন কতিপয় পত্র এবং লেঃ মোয়াজ্জম প্রদত্ত একটি ডায়েরী আদালতের সম্মুখে পেশ করা হয়। সাক্ষী ডায়েরীর বিভিন্ন সাংকেতিক নাম ও নির্দেশাদির বিস্তারিত বিবরণ আদালতের সম্মুখে প্রকাশ করেন।

গতকাল শুনানীর শুরুতে বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের পূর্বদিনের পত্র দু'খানা সাক্ষীকে প্রদান করেন।

কাদের–আপনি কোন তারিখে এই পত্র দু'খানা পেয়েছেন?

সাক্ষী–১৯৬৫ সালের নবেম্বরে অথবা ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে পেয়েছি।

কাদের–চিঠির কোনায় যেখানে তারিখ লেখা থাকে সে জায়গা দেখে তারিখটা বলুন?

সাক্ষী–চিঠির কোনা ছেঁড়া।

কাদের–উভয় পত্রের কোনাই কি ছেঁড়া?

সাক্ষী–হ্যাঁ।

সাক্ষী বলেন, একটা চিঠি আমার কাছে এবং অপরটা নূর মোহাম্মদের নিকট লেখা হয়েছে। উভয় পত্রই স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান লিখেছেন। এই পত্র সাক্ষী আদালতে পড়ে শোনান। পত্রে লেখা হয়েছে–

নূরু ভাই,

আমার সালাম নেবেন। এর আগে আমি আপনার নিকট একখানা পত্র পাঠিয়েছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি ঐ পত্রের কোন জবাব পাইনি। আপনারা আপনাদের কাজে কতদূর অগ্রসর হয়েছেন আমাকে জানাবেন। পত্র পাওয়ার পর আপনি নিজ পছন্দমত লোক নিয়োগ করবেন। খোদার ফজলে আমরা জোরেশোরে কাজ শুরু করেছি এবং অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি। আল্লার ওপর

ভরসা রাখুন এবং বিনাদ্বিধায় নিজের কাজ করে যান। মোহাম্মদকে আমার দোয়া দেবেন। তাকে আপনার সাথে কাজ করতে বলবেন। আমার দেরাজের চাবি গোলাম মোহাম্মদের নিকট আছে। দেরাজের ভেতর কাগজের মধ্যে আমার পে-বুক আছে। পে-বুক তাড়াতাড়ি পাঠান উচিত। তাকে বলবেন সে যেন রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠায়। এজন্য আমি তাকে একখানা পত্র লিখেছি। সে হয়ত তা পেয়ে থাকবে। আমি আশা করি যে, এই মাসের ২৫ তারিখে যেন পেয়ে যাই। অন্যথায় আমি বেতন পাব না। মোজাম্মেল হোসেন সাহেবকে আমার সালাম বলবেন। পরবর্তী পত্রে আমি আপনাকে বিস্তারিত জানাব। আমার ড্রাফটের কথা মোজাম্মেল হোসেনকে বলবেন। আমি যেন এখানে থাকতে পারি সে ব্যবস্থা তার করা উচিত। খুরশীদের সালাম নেবেন। খোদার ফজলে আমরা ভাল আছি। আপনারা কেমন আছেন জানাবেন।

আপনারই "এম" সাক্ষী বলেন,"এম"-এর অর্থ হচ্ছে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান।

কাদের– আপনি গোলাম মোহাম্মদকে চেনেন?

সাক্ষী– হ্যাঁ। এই পত্রে যে গোলাম মোহাম্মদের উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন নূর মোহাম্মদ ও স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের সহকর্মী।

কাদের– আপনার সাথে তার কোথায় দেখা হয়?

সাক্ষী– আমার বাসা ৩২/৬-ই, জাহাঙ্গীর রোড (ইস্ট), করাচীতে।

সাক্ষীকে বাদীপক্ষের কৌসুলী আরেকখানা পত্র প্রদান করেন।

কাদের– আপনি কি এই পত্রখানা পেয়েছিলেন ?

সাক্ষী–হ্যাঁ– ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এটা পেয়েছি।

কাদের– এই পত্রে কোন তারিখ আছে ?

সাক্ষী–হ্যাঁ–২৯-১১-৬৫নং।

কাদের– কে এই পত্র লিখেছে?

সাক্ষী– স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান। এই পত্র সে নিজের হাতে লিখেছে। আমি তার হাতের লেখা চিনি। সাক্ষীকে এই পত্রের ইংরেজী তরজমা প্রদান করা হলে তিনি তা পড়ে বলেন যে, এটা বাংলা পত্রের সঠিক তরজমা।

সাক্ষী বলেন, এই পত্রের শুরুতে যে "বড় ভাই"য়ের উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন শেখ মুজিবর রহমান। পরবর্তী লাইনে যে 'সুলতানের' উল্লেখ রয়েছে তিনি হচ্ছেন এম এস সুলতানউদ্দীন আহমদ। পরবর্তী বাক্যে পুনরায় যে বড় ভাইয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন শেখ মুজিবর রহমান। এরপর আমার সম্পর্কে "চূড়ান্ত সমাধানের" যে উল্লেখ রয়েছে তার অর্থ হচ্ছে ঢাকায় আমাকে একটা উপযুক্ত চাকুরী প্রদান। পত্রের শেষদিকে যে "বড় ভাইয়ের" উল্লেখ রয়েছে তিনি হচ্ছেন লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন।

সাক্ষী বলেন, পত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখ রয়েছে এবং তথা হতে "আমাদের দ্রব্যাদি" আনয়নের কথা আছে। এখানে "আমাদের দ্রব্যাদির" অর্থ হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ।

পত্রে যে শফির উল্লেখ আছে তিনি হচ্ছেন আমার একজন বন্ধু। ঐ সময় তিনি চট্টগ্রাম কাজ করতেন। শফি চট্টগ্রামের বড়বাকুণ্ডায় থাকতেন। পত্রে "আপনাদের তহবিল" কথার অর্থ হচ্ছে শেখ মুজিবর রহমানের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করা। পত্রের শেষে "আপনারই মুজিবর" লেখা আছে। এই মুজিবর হচ্ছেন স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান।

সাক্ষীকে বাদীপক্ষের কৌশুলী আরেকখানা বাংলায় লিখিত পত্র প্রদান করে তা পড়তে বলেন।

সাক্ষী বলেন, এই পত্র তিনি স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের নিকট হতে পেয়েছেন। এটা তারই হাতের লেখা। এই পত্রে ৬-১২-৬৫নং তারিখ লেখা রয়েছে।

সাক্ষী আদালতে পত্র পড়ে শোনান। পত্রটি নিম্নরূপ ঃ

প্রিয় নাসির হোসেন সাহেব,

আপনার স্নেহমাখানো ভালবাসা হতে অনেকদিন বঞ্চিত। কবে কখন আমরা আবার মিলিত হব জানি না। বোধহয় আপনারা সবাই আমার ওপর রাগ করেছেন। আমার কিন্তু কারুর ওপর রাগ নেই। বিগত ২৯-১১-৬৫ তারিখে আমি লোক মারফত একখানা পত্র পাঠিয়েছি। সে জাহাজে রওয়ানা হয়ে গেছে। বোধহয় পেয়েছেন। ঐ পত্রে আমি সব খবর জানিয়েছি। এখানে রোগীর অবস্থা খুবই ভাল।

কাদের–'রোগী' বলতে এখানে কার কথা বলা হয়েছে?

সাক্ষী–রোগীর অর্থ হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান।

পত্রে আরো লেখা হয়েছে এ নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমি ও সুলতান আপনার ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য ঢাকা গিয়েছিলাম। আপনাকে এখানে আনতে কিছু সময় লাগবে। বর্তমানে কোন পদ খালি নাই। আমি আপনাকে ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা ইন্স্যুরেন্সযোগে 'ঔষধ' পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি।

সাক্ষী বলেন, এখানে 'ঔষধ' বলতে টাকার কথা বলা হয়েছে।

পত্রে আরো বলা হয় "এ নিয়ে আপনার চিন্তা করার দরকার নেই। আমরা এখানে বিদেশী রাষ্ট্রের ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছি।"

সাক্ষী বলেন, এখানে 'বিদেশী রাষ্ট্র' বলতে ভারতের কথা বলা হয়েছে।

"পত্রে আরও বলা হয় যদি সম্ভব হয় আমি আপনাকে জানাব। আমাকে ভুল বুঝা বড় ভাইয়ের উচিত নয়।"

এখানে বড় ভাই বলতে লেঃ মোয়াজ্জমকে বুঝান হয়েছে।

"আমি সত্যিকারের কর্মী হিসেবে আপনার সঙ্গে থাকব। আমি যদি কোন ত্রুটি করে থাকি অনুগ্রহ করে আমাকে মাফ করে দেবেন। আমি জানি বড় ভাই আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এরপর আমি "বড় ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছি।"

সাক্ষী বলেন, এখানে বড় ভাই বলতে শেখ মুজিবর রহমানকে বুঝান হয়েছে।

তিনি স্বীকার করেছেন যে, "তিনি এর জন্য লজ্জিত। আপনি সেখানে আপনার কাজ জোরেশোরে চালিয়ে যান। আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন যে, আপনার নিকট হতে অনেকদিন কোন পত্র পাইনি। আমার পত্র পাওয়ার পর শীঘ্র জবাব দেবেন। অনুগ্রহ করে আমার জন্য একটা পশমী পুল ওভার পাঠাবেন। দাম যাই হউক না কেন। জাহাজে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। শীতে আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। আকাশী রংয়ের পাঠাবেন। সাদেক ভাই, অথবা নূর মোহাম্মদ বা গোলাম আহমদের মারফত পাঠাবেন।"

কাদের–এই সাদেক কে আপনি চিনেন?

সাক্ষী–আমি তাকে চিনি না।

"আমি ক্যাজুয়েল লীভের জন্য দরখাস্ত করছি। যদি ছুটি পাই তবে একবার করাচী আসব। অধিক আর কি লিখব। আমার দিন এক রকম কেটে যাচ্ছে আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি ভাল আছি।

পত্রের শেষে লেখা আছে–আপনার খাদেম মুজিবর রহমান।

পত্রের শেষে বিঃ দ্রঃ লেখা আছে। তাতে বলা হয়েছে "এর মধ্যে আমি বড়রাকুণ্ডায় গিয়েছিলাম এবং তার সাথে দেখা হয়েছে।"

সাক্ষী বলেন, এখানে কার কথা বলা হয়েছে তা আমি জানি না।

"দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, সে মোটেও রাজী নয়। সে আপনার ওপর নির্ভর করছে। সে অভিযোগ করেছে যে, সে আপনার নিকট হতে কোন পত্র পায়নি। এজন্য সে নীরব রয়েছে। সে কি করবে তা আমাকে জানায়নি। এজন্য আমি ভাল বোধ করছি না। শফি অনেক কথা বলেছে। আপনার সঙ্গে দেখা হলে আমি সব কথা বলব। আজ আর নয়।

"খোদা হাফেজ, মুজিব"বলে পত্র শেষ করা হয়েছে।

সাক্ষী বলেন, কোনা ছেঁড়া যে পত্র আমার কাছে লেখা হয়েছে তার আগে আমি এই পত্র পেয়েছি।

এরপর সাক্ষী বাথরুমে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়।

এরপর সাক্ষী ফিরে এলে বাদীপক্ষের কৌসুলী তার হাতে আরেকখানা বাংলায় লিখিত পত্র দিয়ে, তিনি তা পেয়েছেন কিনা জানতে চান।

সাক্ষী জানান যে, এই পত্র তার নিকট লেখা হয়েছে। সুলতানউদ্দিন ২৪-১২-১৯৬৫ তারিখে আমাকে এই পত্র লিখেছে। এটা সুলতান তার নিজ হাতে লিখেছে।

সাক্ষী এই পত্র পড়ে শোনান পত্রটি নিম্নরূপ:

প্রিয় আমির সাহেব,

আমার ভালবাসা নেবেন। আপনি অনেক কথা লিখেছেন কিন্তু সব কথার জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি আমাকে ভাল করেই জানেন। আমাকে নতুন করে জানবার দরকার নেই। চিঠি লেখার আমার অভ্যেস নেই। আমি কাজের লোক সেদিকেই আমার নজর রয়েছে। আল্লার নিকট দোয়া করবেন যেন মৃত্যু পর্যন্ত আমি কাজ করে যেতে পারি। আপনি যখন এই পত্র লিখবেন তখন আপনার ভেবে দেখা উচিত। আপনি কি লিখবেন এবং কিভাবে লিখবেন। আপনি বিজ্ঞ লোক। আপনাকে অধিক লেখার কোন দরকার নেই। আপনি আমার টেলিগ্রাম পেয়েছেন কি পাননি তা জানাবেন। আপনি ঐ দেশের সঙ্গে সব কাজ সমাধা করে নেন। পত্রে আরও বলা হয়–'বড় ভাইয়ের' সঙ্গে আপনার আলোচনা করা উচিত। বড় ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করার পর আপনার এখানে আসা উচিত।

সাক্ষী বলেন, এই বড় ভাই হচ্ছেন লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন। পত্রের শেষে সুলতান লেখা আছে।

সাক্ষী বলেন, এম এস নূর মোহাম্মদ দুখানা পত্র ও বাইশ শ টাকা নিয়ে আমার কাছে আসে। আমি এই টাকা গ্রহণ করি। চট্টগ্রাম হতে আগত একখানা সওদাগরী জাহাজের একজন স্টুয়ার্ডের মারফত এই টাকা ও পত্র প্রেরণ করা হয়।

নূর মোহাম্মদ আমাকে জানায় যে, এই টাকা স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও এল এস সুলতানউদ্দীন পাঠিয়েছে। নূর মোহাম্মদ ও আমি পি এন কারসাজে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসভবনে গমন করি। আমি পত্রের বিষয়বস্তু লেঃ মোয়াজ্জেমকে জানাই। আমার সম্মুখে নূর মোহাম্মদ বাইশ শ টাকা ও পত্র দুখানি লেঃ মোয়াজ্জেমের হাতে দেন। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন পত্র পড়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। এর কারণ হচ্ছে তার মতে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও সুলতানউদ্দীন ৩ হাজার টাকা পেয়েছে। ঐ টাকা হতে তারা মাত্র ২২শ টাকা পাঠিয়েছে।

সাক্ষীকে জিজ্ঞাস করা হয় যে, সে সুলতানের নিকট হতে পত্র পাওয়ার আগে কোন পত্র লিখেছিল কিনা। সাক্ষী এখানে বলেন, আমি কিছুই করিনি।

পরে আবার জিজ্ঞেস করা হলে সাক্ষী বলেন, আমি ১০ খানা পত্র লিখেছি।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি ঢাকায় বদলী হওয়ার ব্যবস্থা করি। ঢাকা রওয়ানা হবার পূর্বে আমি লেঃ মোয়াজ্জেমের বাসায় গমন করি।

লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে তিনটি ডায়েরী প্রদান করেন। এতে তিনি নির্দেশাবলী লিখে দিয়ে আমাকে তা পালন করতে বলেন।

সাক্ষীর হাতে বাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী একটি ডায়েরী দিলে সাক্ষী বলেন যে, এটা ঐ তিনটি ডায়েরীর অন্যতম। তিনি বলেন, এতে লেঃ মোয়াজ্জেমের নিজ হাতে লেখা আছে। আমি এই হাতের লেখা চিনি। এই ডায়েরী আমাকে প্রদানের পূর্বে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে বলেন যে, ডায়েরীতে তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুযায়ী আমার কাজ করা উচিত। তিনি আমাকে অস্ত্রশস্ত্রের তালিকাও প্রদান করেন। ডায়েরীতেও এই তালিকা রয়েছে। সাক্ষীকে তিনখণ্ড খোলা কাগজ দেয়া হয়। এগুলোকে ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা বলে মনে হয়।

সাক্ষী বলেন, এই তিনখণ্ড কাগজও নির্দেশ রয়েছে। তিনি বলেন, ডায়েরীর শেষ প্রাপ্ত হতে নবম পৃষ্ঠায় লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন লিখিত সাংকেতিক নাম রয়েছে।

বাদীপক্ষের কৌঁসুলী জানান যে, অভিযোগের বিবরণীর পরিশিষ্ট (এ্যানেকসারে) তালিকার আকারে এই সাংকেতিক নামগুলো দেয়া আছে।

সাক্ষী বলেন, ডায়েরীর প্রথম পাতায় লেঃ মোয়াজ্জেমের হাতের লেখা রয়েছে। তার এই ইংরেজী হস্তাক্ষরের সঙ্গে আমি পরিচিত। এই পৃষ্ঠায় স্কুটারের যে বিবরণ আছে তার নম্বর হচ্ছে কেএএইচ-৪৭৬৮। এটা লেঃ মোয়াজ্জেমের স্কুটার। ডায়েরীতে ১৯-৩-৬৭ তারিখের পৃষ্ঠায় লেঃ মোয়াজ্জেমের হাতে লেখা রয়েছে। এই পৃষ্ঠার প্রথম দুটি নির্দেশে কি বলা হয়েছে তা আমি বলতে পারি না।

১৯৬৪ সালের ১৭ই জানুয়ারী তারিখের পাতায় মোয়াজ্জেমের যে হাতের লেখা রয়েছে তাতে আমার জন্য কতিপয় নির্দেশ রয়েছে। এগুলো আমাকে পালন করতে বলা হয়েছে। ১নং নির্দেশ হচ্ছে– "আমার বদলির জন্য কে জি'র সাথে দেখা করবেন।"

লেঃ মোয়াজ্জেমের করাচী হতে ঢাকায় প্রস্তাবিত বদলির কথা এখানে বলা হয়েছে। কে জি একটি নামের সংক্ষেপ। আমি পুরা নাম বলতে পারব না। ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশনের ডিরেক্টরের কথা এখানে বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ কে জি'র অর্থ হচ্ছে কাজী গিয়াসউদ্দীন। এই নির্দেশের অর্থ হচ্ছে জনাব কে জি আহমদ ঢাকা আসার পর লেঃ মোয়াজ্জেমের চট্টগ্রাম বদলির

ব্যাপারে তার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হবে। কে জি আহমদ হচ্ছেন ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশনের ডিরেক্টর।

২য় নির্দেশ হচ্ছে– "ভাড়ার ব্যবস্থা করা।" এর অর্থ হচ্ছে ঢাকায় আসার পর আমার বসবাসের জন্য একটা বাড়ীর দরকার হবে। যেখানে আমি "ভারত হতে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র রাখতে পারব। আমাকে শেখ মুজিবর রহমান অথবা আহমদ ফজলুর রহমানের নিকট বাড়ীভাড়া গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় নির্দেশ হচ্ছে–"সামাদ, দোহা ইত্যাদির চাকুরীর ব্যবস্থা করা।" আমি ঢাকা আসার আগেই সামাদ ও দোহা করাচী ত্যাগ করেছে। লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সামাদ ও দোহা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগ দিলে তাদের জন্য আমাকে চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে। সামাদ বলতে এখানে অভিযুক্ত প্রাক্তন কর্পোরাল সামাদের কথা বলা হয়েছে। দোহা হচ্ছেন সামাদের বন্ধু বিমান বাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারী।

৪নং নির্দেশ হচ্ছে– নগদ টাকা সংগ্রহ করে যথাসম্ভব শীঘ্র তা প্রেরণ করা। এর অর্থ হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্য শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য সূত্র হতে অর্থ সংগ্রহ করা।

৫ম নির্দেশ হচ্ছে– সুলতান মুজিবরের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিস্তারিত আন্দোলন করা। এর অর্থ হচ্ছে ঢাকা আগমনের পর সুলতানউদ্দীন ও স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের সঙ্গে দেখা করে তারা কতদূর এগিয়েছে তা অবগত হওয়া। আমাদের এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করে লোকজনের যোগদান সম্পর্কে নয়া পদ্ধতি বের করতে হবে। জনসাধারণ বলতে সাধারণ লোকের কথা বলা হয়েছে।

৬নং নির্দেশ হচ্ছে–"কে জির নিকট হতে জীপ গ্রহণ করা।" আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট বলেছিলাম যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ব্যাপারে বিভিন্ন স্থানে গমনের জন্য আমার একখানা জীপের দরকার হবে। লেঃ মোয়াজ্জেম জনাব আহমদ ফজলুর রহমানকে একখানা জীপের ব্যবস্থা করার জন্য বলেছেন। কিন্তু জনাব আহমদ ফজলুর রহমান জানান যে, কে জি আহমদের একখানা জীপ আছে। এই জীপখানা আমাকে দেওয়ার জন্য তিনি তার ওপর প্রভাব বিস্তার করবেন। ঢাকা আগমনের পর আমি দেখতে পাই যে, জীপখানা কামালউদ্দিনের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। এই কারণে আমি আর কে জি আহমদের কাছে যাইনি।

৭নং নির্দেশ হচ্ছে– "সম্ভাব্য সকল সূত্র হতে তহবিল সংগ্রহ করা।" এর অর্থ হচ্ছে সুলতানউদ্দীন, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এবং আমি নিজে যে কোন লোকের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করব।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৪ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখ সম্বলিত পৃষ্ঠায় লেঃ মোয়াজ্জেমের হাতের লেখা নির্দেশ আছে। এতে শিরোনাম হচ্ছে "তত জরুরী নয়।" এই নির্দেশসমূহের মধ্যে ভারতসহ কতিপয় দেশের এজেন্সের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়েছে।

১নং নির্দেশ–"সবুরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন" এখানে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর উল্লেখ করা হয়েছে। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন জনাব এ সবুর খানকে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনভুক্ত করার জন্য।

২নং নির্দেশ– "ভারত, চীন ও ইউএসএ এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন।" এর অর্থ হচ্ছে এই সকল দেশের সকল জেনারেলদের সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ করতে হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য অর্থ সাহায্য গোলাবারুদ এবং তাদের সরকারের সমর্থনের জন্য এই দেশগুলোর কন্সাল জেনারেলের সাথে আমাকে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

৩নং নির্দেশ–"মাল ডেলিভারী নেওয়ার ব্যবস্থা" এর অর্থ হচ্ছে যদি মুজিবর রহমান ভারত হতে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে থাকেন তা হলে সেগুলো আমাকে ডেলিভারী নিতে হবে।

তারপর বিষয় হচ্ছে–"যে কোন ব্যক্তির কাছে যে কোন পর্যায়ে যে কোন কিছুর প্রতিশ্রুতি দাও কিন্তু কাজ আদায় করে যাও।"

ডাইরীর পরবর্তী পৃষ্ঠার লেখাও লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন কর্তৃক লিখিত। শিরোনামায় লেখা রয়েছে "তথ্যের তালিকা।"

সাক্ষী এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, "এ দ্বারা নিম্নবর্ণিত তথ্যগুলোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।"

১নং :–"বিভিন্ন গ্রুপের শিল্প ও কারখানাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ– জেলাওয়ারীভাবে।"

২নং :–"শিল্প কারখানার ডিরেক্টর ও মালিকদের তালিকা ও তাদের আবাসিক ঠিকানা।"

৩নং :–"স্কুল ও কলেজসমূহের তালিকা।"

৪নং :–"সমুদ্রপথে ও আভ্যন্তরীণ নৌপথে চালু শিপিং কোম্পানীগুলোর মালিক ডিরেক্টর ও তাদের ঠিকানাসহ তালিকা।"

৫নং :–"১৯৪৭ সাল হতে এ পর্যন্ত এমএনএ, এমপিএ ও মন্ত্রীদের নামের তালিকা।"

৬নং :– "জেলে আটক ব্যক্তিদের অপরাধ ও সম্ভাব্য মুক্তির দিনের বিবরণসহ নামের তালিকা।"

৭নং :– "নির্ভরযোগ্য ও ভাল এমপি ও এএমপিদের তালিকা।"
৮নং :– "ভাল সিএসপিদের তালিকা।"
৯নং :– "শিল্প ও রেলওয়ে বিভাগে সিনিয়র বাঙ্গালী অফিসারদের তালিকা।"
১০নং :– "সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন ব্যক্তিদের বর্তমান যোগ্যতাসহ তালিকা।"
১১নং :– "রেলওয়ে কর্মকর্তাদের মূল জন্মভূমিসহ তালিকা।"
১২নং : –"বাস ও ট্রাকের ঠিকানা ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর।"
১৩নং : –"খ্যাতনামা ডাক্তার ও আইনজীবীদের নামের তালিকা।"

ডাইরীর তিন পাতাব্যাপী এসব তালিকার বর্ণনা রয়েছে ও শেষ তালিকা ২৫ নম্বরে ঢাকা , কুমিল্লা ও যশোর ক্যান্টনমেন্টের মানচিত্রের কথা বলা হয়েছে।

সাক্ষী বলেন, শেষ তালিকা অনুযায়ী আমি কোন মানচিত্র সংগ্রহ করিনি। আমাকে সুবেদার আশরাফ আলী শুধু একটি ক্যান্টনমেন্টের মানচিত্রের স্কেচ দিয়েছিল মাত্র। সে ক্যান্টনমেন্ট কোনটি তা আমি জানি না। স্টুয়ার্ড মুজিবর আমাকে জানিয়েছিল যে, সে এমইএস-এর এসডিও'র কাছ হতে তিনটি ক্যান্টনমেন্টের মানচিত্র যোগাড় করেছিল।

বাদীপক্ষের কৌসুলী এই সাক্ষীর হাতে তিনখণ্ড ডাইরীর ছেঁড়া কাগজ দেন। এতে ২৭, ২৯ ও ৩১শে আগস্টের তারিখ রয়েছে।

সাক্ষী বলেন, ডাইরীতে এই তিনদিনের কাগজ বর্তমানে সন্নিবেশিত দেখছি না। অথচ আমাকে যখন ডাইরীটি দেয়া হয়েছিল তখন এই তিনদিনের কাগজও ছিল। এই ছেঁড়া পৃষ্ঠার একটিতে "শপথ" শব্দটি লিখিত আছে।

জনাব মঞ্জুর কাদেরঃ এর ব্যাখ্যা কি বলতে পারেন?

উঃ এর অর্থ প্রত্যেক নয়া রিক্রুটকে শপথ নিতে হবে যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সময় প্রত্যেক রিক্রুটকে এই বলে শপথ নিতে হবে যে, তাকে এজন্য সততার সাথে কাজ করতে হবে এবং কারো কাছে কিছু ব্যক্ত করবে না।

"আমাদের প্রয়োজন" শীর্ষক আরেক পৃষ্ঠায় "আনলিস্টেড টেলিফোন" শিরোনামা রয়েছে। এর অর্থ ঢাকায় বাড়ী নিয়ে তাতে যেন আমি একটি "ভুয়া" টেলিফোনের ব্যবস্থা করি এবং লেঃ মোয়াজ্জেম ও অন্যান্য পার্টি কর্মীদের সাথে কথা বলতে পারি। এই পৃষ্ঠার ৫নং তালিকায় বাংলায় একটি বড় আকারের মানচিত্রের কথা রয়েছে। লেঃ মোয়াজ্জম হোসেন এরূপ একটি মানচিত্র সংগ্রহের জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তা করিনি। এই তিনটি ছেঁড়া পৃষ্ঠার লেখাও লেঃ মোয়াজ্জমের হস্তাক্ষরে লিখিত।

বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির এরপর আরো ৪খানা ছেঁড়া কাগজ সাক্ষীর হাতে দিয়ে তা সে সনাক্ত করতে পারে কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন করেন।

একরারী সাক্ষী আমির হোসেন বলেন, দু'খানা কাগজের লেখা লেঃ মোয়াজ্জমের তবে অপর দুখানা কার লেখা তা সে বলতে পারে না।প্রথম দুখানা কাগজে পার্টির জন্য যেসব অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন তার কথা উল্লিখিত হয়েছে। এ চারটি কাগজই লেঃ মোয়াজ্জম আমাকে ঐ ডাইরী দেওয়ার সময় দিয়েছিলেন। অপর দু'খানা কাগজেও অস্ত্র ও গোলাবারুদের কথা বলা হয়েছে।

বাদী কৌসুলীঃ করাচী হতে কবে ঢাকা এসেছিলেন?

সাক্ষীঃ ১৯৬৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী।

সাক্ষীকে ঢাকা হোটেলের একটি রেজিস্ট্রার দিয়ে প্রথম পৃষ্ঠার ৩০নং এনট্রি দেখতে বলা হয়।

সাক্ষীঃ এখানে আমি স্বহস্তে লিখেছি। ঐদিনই ঐ হোটেলে নেমে আমি ঢাকার ২৮, নয়া পল্টনে অবস্থিত সেন্ট্রাল স্টেটিসটিক্যাল অফিসে আমার কাজে যোগদান করি। ৩রা ফেব্রুয়ারী রাতে আমি চট্টগ্রাম নৌ-বাহিনীর ঘাটীতে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে টেলিফোন করি। সে আমাকে চট্টগ্রাম যেতে বলেছিল।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী আমি ঢাকা হতে চট্টগ্রাম যাত্রা করি। চট্টগ্রামে আমি হোটেল মিসকায় গিয়ে উঠি।

সাক্ষীকে মিসকা হোটেলের একটি রেজিস্ট্রার দিয়ে প্রথম পৃষ্ঠা দেখতে বলা হয়।

সাক্ষীঃ এখানে ৭ নম্বরে আমার নাম আছে এবং তা আমার স্বহস্তে লিখিত। এনট্রিতে "এ, এম, হোসেন" লিখিত আছে।

প্রঃ চট্টগ্রামে পৌছার পর কারো সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল কি?

উঃ স্টুয়ার্ড মুজিবর , এল, এস, সুলতানউদ্দীন, এ, বি, এম, খুরশীদ, পোর্ট অফিসার রহমান ও লেঃ হক একের পর এক এসে আমার সাথে দেখা করেন ও আমরা সকলে মিসকা হোটেলের ৪নং কামরায় মিলিত হই। স্টুয়ার্ড মুজিবর আমাকে লেঃ হক ও পোর্ট অফিসার রহমানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

প্রঃ অভিযুক্তদের মধ্যে লেঃ হক ও পোর্ট অফিসার রহমান আছে কি?

সাক্ষীঃ না।

প্রঃ বৈঠকে কি হল?

উঃ স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান কাজ সম্পর্কে বিবরণী দেন এবং সে ও খুরশীদ সামরিক বাহিনীর যাদের সাথে যোগাযোগ করেছে তার এক লম্বা ফিরিস্তি

দেন। ইহা একটি লিখিত তালিকা ছিল এবং সে আমার ডাইরীতে তা লিখে দিয়েছিল। তারপর স্টুয়ার্ড মুজিব বলেছিল যে, তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্য পরবর্তী বর্ষাকালের জন্য প্রস্তুত।

বর্ষাকালে অর্থ হচ্ছে তখন সশস্ত্র বাহিনী বন্যায় বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং আমাদের সেই সময়ের সুযোগ নিতে হবে।

সে আমার কাছে জানতে চেয়েছিল যে, অস্ত্র ও গোলাবারুদ ঠিক সময় পৌঁছবে কিনা? সে আরো বলেছিল যে, আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাড়িয়ে দিতে পারব। সকলেই এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হয়েছিল। লেঃ হক জানতে চেয়েছিলেন যে, আমাদের পরিকল্পনায় আর কোন দেশ সমর্থন ও সাহায্য দেবে। আমি তাকে জানাই যে, শেখ মুজিবর রহমান ও লেঃ মোয়াজ্জেম আমাদের আন্দোলনের জন্য আমাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ দেওয়ার ব্যাপারে ভারতের সাথে চেষ্টা করেছে এবং ভারত আমাদের সমর্থন করবে। তখন লেঃ হক জানান যে, চট্টগ্রামে অবস্থিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামানকে তিনি দীক্ষিত করেছেন।এরপর বৈঠক শেষ হয়। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ঐ বৈঠকে সুলতানউদ্দীনের অমনোযোগিতার অভিযোগ করে বলেন যে, সে কাদের সাথে যোগাযোগ করেছে তা স্টুয়ার্ড মুজিবর ও এ বি খুরশীদকে বলেনি। সুলতানউদ্দীনকে চট্টগ্রাম থেকে করাচী বদলী করার জন্য লেঃ মোয়াজ্জেমের কাছে একটি টেলিগ্রামের মুসাবিদা করেছিলাম। স্টুয়ার্ড মুজিবরকে ৫ই ফেব্রুয়ারী রাতে সে টেলিগ্রামটি পাঠাতে দিয়েছিলাম।

৬ই ফেব্রুয়ারী মিসকা হোটেলের ঐ একই রুমে আমি একটি পার্টি মিটিং ডাকি এবং ঐ বৈঠকে স্টুয়ার্ড মুজিবর, সুলতানউদ্দীন, এ বি এম খুরশীদ, ডাঃ সাঈদুর রহমান, মানিক চৌধুরী, বিধানচন্দ্র সেন ও ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার রাজ্জাক যোগ দিয়েছিলেন। (সাক্ষী অভিযুক্তদের মধ্য হতে মানিক চৌধুরী, বিধানকৃষ্ণ সেন ও সুবেদার আবদুর রাজ্জাককে সনাক্ত করেন। তবে বিধানকৃষ্ণ সেনকে সাক্ষী বিধানচন্দ্র সেন বলে উল্লেখ করেন।)
সাক্ষী বলেন, এ তিনজন আমার কাছে আগে পরিচিত ছিল না। স্টুয়ার্ড মুজিবর এদের সাথে আমাকে পরিচয় করে দেন। অভিযুক্তদের মধ্যে আমি ডাঃ সাঈদুর রহমানকে দেখছি না। এসব নয়া ব্যক্তিদের পরিচয়ের পরে আমরা পার্টি বিষয়ে আলাপ শুরু করি এবং স্টুয়ার্ড মুজিবর আমাদের আন্দোলনে এই তিনজনের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। এই বৈঠকে আমাদের পার্টির ব্যয় নির্বাহের জন্য মানিক চৌধুরী আমাকে তিন হাজার টাকা চাঁদা দেন। ডাঃ সাঈদুর রহমান ও মানিক চৌধুরী আমাকে গোপনে

জানান যে, এই আন্দোলনের জন্য কাজ করতে শেখ মুজিবর রহমান তাদের নির্দেশ দিয়েছিল।
সাক্ষীঃ সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী আমি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি ও হোটেল আরজুতে অবস্থান করি।

ঢাকা ফিরে সে রাতেই আমি লেঃ মোয়াজ্জমকে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানাই যে, তার ট্রান্সফারের জন্য আমি কে, জি, আহমদের সাথে দেখা করেছি এবং তিনি ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
বাদীপক্ষের কৌঁসুলী সাক্ষীকে একখানা কাগজ হাতে দিয়ে কে কার কাছে লিখেছিল তা জানতে চান।
সাক্ষীঃ 'উল্কার' কাছে 'আলো' লিখেছিল আমি এ চিঠি একখানা ইনভেলাপে পেয়েছিলাম। এ চিঠি লেঃ মোয়াজ্জমের হাতে লেখা। 'উল্কা' আমাকে বলা হয়েছে এবং লেঃ মোয়াজ্জম 'আলো' নামে লিখেছেন, ৯-২-৬৬ তারিখে এ চিঠি লেখা। (সাক্ষীকে এই বাংলা চিঠির ইংরেজী অনুবাদ দিয়ে প্রশ্ন করা হয় যে, চিঠির অনুবাদ ঠিক হয়েছে কি না?)
সাক্ষীঃ হ্যাঁ।

এই চিঠির শুরুতে 'পরশ'-এর উল্লেখ রয়েছে। 'পরশ' শেখ মুজিবর রহমান। করাচী হতে এ চিঠি লেখা হয়েছিল। চিঠিতে 'তুহীন' ও 'সবুজ'-এর উল্লেখ আছে। 'তুহীন' হচ্ছে লেঃ মোজাম্মেল ও 'সবুজ' হচ্ছে নূর মোহাম্মদ পরের ছত্রে যে 'কমল'-এর উল্লেখ আছে সে হচ্ছে সুলতানউদ্দিন। তাতে আমি সুলতানের বদলীর জন্য যে টেলিগ্রাম করেছিলাম সে ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, 'সবুজ' তার ব্যবস্থা এমনভাবে করেছে যে, তার বদলী করা এখন কষ্টসাধ্য এর অর্থ নূর মোহাম্মদ ব্যবস্থা করেছে যাতে সুলতানউদ্দীন চট্টগ্রাম থেকে বদলী না হয়। চিঠিতে যে 'কামাল সাহেবের' উল্লেখ আছে তিনি হচ্ছেন এস এস জি'র মজর কামাল। এস এস জি সেনাবাহিনীর একটি বিভাগ তবে এর পুরা নাম বলতে পারি না। চিঠিতে 'তুষার' ও 'শেখর' নামে যাদের উল্লেখ আছে তারা হচ্ছেন জনাব এ এফ রহমান সিএসপি ও জনাব রহুল কুদ্দুস সিএসপি।
প্রশ্নঃ আমাদের পথ হচ্ছে ডান হাত যা করে বাম হাত তা জানবে না এর অর্থ কি?
উঃ আগে শেখ মুজিবর রহমান জনাব এ এফ রহমানকে বিশ্বাস করা হোক তা পছন্দ করতেন না। কিন্তু তিনিও প্রতিষ্ঠানের একজন সদস্য। তাই এর অর্থ শেখ মুজিবর রহমান যেন জানতে না পারেন জনাব এ এফ রহমানের সাথে আমাদের কি ব্যবস্থা হয়েছে। বস্তুতঃ আমরা এ দু'জনের কাজে থেকেই অর্থ সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম।

প্রশ্নঃ চিঠির "আমি আগেই আপনাকে বলেছি যে, তাদের কাছ থেকে ঘর নেয় না" এর অর্থ কি?
উঃ শেখ মুজিবর রহমান বা জনাব এ এফ রহমান যদি কোন বাড়ী দিতে চায় আমরা তা নেব না। তার বদলে আমরা তাদের কাছ থেকে টাকা নেব এবং নিজেরা বাড়ী ভাড়া নেব।
প্রশ্নঃ 'পরশ' এখনও তাকে বোকা মনে করে এ অর্থ কি?
উঃ এ দ্বারা শেখ মুজিবর রহমান ও লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জমের মধ্যকার মতবিরোধের কথাই বলা হয়েছে। শেখ মুজিব এই মত পোষণ করতেন যে, প্ল্যান সত্বর কার্যকরী করতে হবে আর লেঃ মোয়াজ্জম মনে করতেন সময় এখনও হয়নি।
বিবাদী কৌসুলী খান বাহাদুর ইসমাইল ও জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীর এ ধরনের ব্যাখ্যাদানে আপত্তি জানান।
সাক্ষ্যগ্রহণ অসমাপ্ত অবস্থায় এ দিনের অধিবেশন মূলতবী থাকে।

সংবাদ

৭ই আগস্ট ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আজ রাজসাক্ষী আমীর হোসেনের সওয়াল জবাব শুরু

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল মেসে ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হইলে দ্বিতীয় রাজসাক্ষী পাকিস্তান বিমানবাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারী জনাব আমীর হোসেন মিয়ার সাক্ষ্য গ্রহণ অব্যাহত থাকে। এইদিন বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের সাক্ষীর জেরা সমাপ্ত করেন। আজ (বুধবার) বিবাদীপক্ষের কৌসুলি সাক্ষীর সওয়াল-জওয়াব শুরু করিবেন।
'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যে'র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস,এ,রহমান এবং অপর ২ জন সদস্য হইতেছেন বিচারপতি জনাব এম, আর, খান ও বিচারপতি জনাব মুকসুমুল হাকিম।
গতকল্যকার ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে জনাব মঞ্জুর কাদের মেজর হাসান সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন জানান। এতদ্ব্যতীত তিনি আদালতের কার্যবিবরণী সংশোধনের পদ্ধতির ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালের নিকট স্বীয় অভিমত প্রকাশ করেন।
ইতিপূর্বে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান আদালতের নিকট প্রদত্ত মামলার বিভিন্ন দলিল ও কাগজপত্র আদালতের হেফাজতে রাখার প্রশ্নে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আমীর হোসেনের জেরা

রাজসাক্ষী আমীর হোসেনকে অতঃপর পূর্বদিনের জের টানিয়া বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জেরা শুরু করেন। জেরা করার পূর্বে তিনি জনাব আমীর হোসেনের হাতে একখানি চিঠি দিয়া বলেনঃ "চিঠিখানার দিকে তাকান। বলুন তো–এটা আপনি পেয়েছিলেন কি না?"
প্রশ্নঃ কার কাছ থেকে ?
উত্তর ঃ 'আলো'–অর্থাৎ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের কাছ থেকে।
প্রশ্ন ঃ খামটাও কি তাঁর পাঠানো?
উত্তর ঃ জী হ্যাঁ।
প্রশ্ন ঃ কোন তারিখে এখানা লেখা?
উত্তর ঃ ২৫/২/৬৬ তারিখে।
ইহার পর আসামীকে উক্ত চিঠির একটি ইংরেজী অনুবাদ মূল চিঠির সহিত তুলনা করিয়া পরীক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়। সাক্ষী কয়েক স্থানে সামান্য সংশোধনের পর ইংরেজী অনুবাদ নির্ভুল বলিয়া মন্তব্য করেন।
জনাব মঞ্জুর কাদের অতঃপর উক্ত চিঠির ইংরেজী অনুবাদ আদালতে পড়িয়া শোনান ও উহার অংশবিশেষ ব্যাখ্যার জন্য অনুরোধ করেন।
সাক্ষী আমীর হোসেন এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বলেন, চিঠিতে বলা হইয়াছে যে, পত্রলেখক ইতিপূর্বে আমাকে একখানি চিঠি ও দুটি টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন।
প্রশ্নঃ সেগুলো কি আপনি পেয়েছিলেন?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, পেয়েছি। সাক্ষী আরও বলেনঃ চিঠিতে আমাকে পত্রলেখক আমার টেলিফোন নাম্বার জানাতে বলেন– যাতে আমাকে টেলিফোন করতে পারেন।
প্রশ্ন ঃ আপনি টেলিফোন নাম্বার দিয়েছিলেন ? কি নম্বর?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমি হোটেল আরজুর টেলিফোন নাম্বার দিয়েছিলাম। নাম্বারটি আমার মনে নেই।
প্রশ্ন ঃ আপনি কোন ট্রাঙ্ক-কল পেয়েছিলেন ?
উত্তর ঃ হ্যাঁ। ৩/৩/৬৬ তারিখে আমি ট্রাংকল পাই।
প্রশ্নঃ চিঠির তৃতীয় ছত্রে উল্লেখিত 'কামাল'/কে?
উত্তর ঃ উনি সুলতান উদ্দীন আহমদ।
প্রশ্ন ঃ এর পরের ছত্রে যে লেখা হয়েছে, "ব্যাপার শিগ্‌গিরই সমাধান করা হবে"। এর মানে কি?
উত্তর ঃ সেটা হলো সুলতান উদ্দীনকে চট্টগ্রাম থেকে করাচীতে বদলীর ব্যাপার।

প্রশ্ন ঃ চিঠির পরের ছত্রে উল্লেখিত 'মুরাদ' কে? উত্তর তিনি হলেন ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান।

এরপর সাক্ষী বলেনঃ পত্রলেখক ৫ই মার্চ আসতে পারেন বলে জানান। কিন্তু তিনি আসলে আসেননি। চিঠির চতুর্থ অনুচ্ছেদে চারের যে কথাটি উল্লেখ করা আছে সে সম্পর্কে আমি চিঠি দিয়েছিলাম।

"আর একখানি পত্রে যে কথা আছে তা তাহলো আহমেদ ফজলুর রহমানের কাছ থেকে নেওয়া চিঠি– লণ্ডন থেকে ট্রানজিষ্টার সম্বলিত ট্রান্সমিটার আনয়ন সম্পর্কিত"।

প্রশ্ন ঃ "গত দু'মাস ধরে ভদ্রলোক ঐ জায়গাতে বাস করছেন না," এর অর্থ কি?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারটি আহমদ ফজলুর রহমান সি, এস, পি'র ভাই সম্পর্কে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ পরের অনুচ্ছেদে এক্স-কর্পোরাল সামাদ বলে যার উল্লেখ আছে তিনি কে?

উত্তর ঃ উনি এক্স-কর্পোরাল সামাদ।

প্রশ্ন ঃ চিঠিতে যে 'কন্ট্রাক্ট ব্যবসা' শব্দ উল্লেখ আছে সেটা কি?

উত্তর ঃ সেটা আন্দোলন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ চিঠির পূর্বে অনুচ্ছেদে "পারিবারিক ব্যাপারে"র কথা উল্লেখ আছে সেটা কি?

উত্তর ঃ এটাও আমাদের আন্দোলন সম্পর্কিত।

প্রশ্ন ঃ চিঠিতে 'মায়ের অসুখ' এটা কি?

উত্তর ঃ উহা পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

প্রশ্নঃ চিঠিতে উল্লিখিত 'ডাক্তার' কে?

উত্তর ঃ ডাক্তার হলেন শেখ মুজিবর রহমান আর 'ঔষধপত্র' হলো অস্ত্রশস্ত্র।

ইহার পর সাক্ষী চিঠির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, চিঠিতে উল্লেখিত 'পরশ' হইলেন শেখ মুজিবর রহমান। 'রহমান' হইলেন আমাদের সঙ্গে জড়িত নন এমন একলোক আর 'সবুজ' হইলেন লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ।

ইহার পর সাক্ষী জানান, ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে এক্স কর্পোরাল সামাদ আমাদের আন্দোলনের ৪জন নয়া কর্মীকে হোটেল আরজুতে আমার নিকট নিয়ে আসেন। তাঁরা হলেন সুবেদার আশরাফ আলী খান, সরকারী ডিসপেন্সরীর কম্পাউণ্ডার ইউসুফ, ই পি আর টিসির ক্লার্ক মুজিবর রহমান ও ইপি আর টি সির সিকিউরিটি অফিসার রাজ্জাক।

এই সময় সাক্ষী 'ডকে' মুজিবর রহমানকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

সাক্ষী বলেন ঃ "আমার নিকট তাঁদের আনা হলে আমি তাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিই। তাঁরা আমায় পূর্ণ সহযোগিতা দানের প্রস্তাব করেন।

এরপর আমি তাঁদের যাতায়াত ভাড়া দিই, তাঁরা চলে যান। আমি অভিযুক্ত সামাদের জন্য চাকুরীর চেষ্টা করি। কিন্তু কোথাও চাকুরী খালি ছিল না।"

সাক্ষী আরও বলেন, "১৯৬৬ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় সপ্তাহে আমি করাচী হইতে মোয়াজ্জেম হোসেনের কাছ থেকে একটি ট্রাঙ্ককল পাই। এক্সকর্পোরাল সামাদকে আহমদ ফজলুর রহমানের নিকট নিয়ে তার জন্যে একটি চাকুরির ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে ট্রাঙ্ককলে নির্দেশ দেওয়া হয়। আমি তাকে আহমদ ফজলুর রহমানের নিকট নিয়ে যাই। তিনি তাহাকে ধানমণ্ডি এলাকায় রাস্তার পাশে গ্রীন ভিউ পেট্রোল পাম্পে ম্যানেজারের চাকুরী দেন। ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারী ও জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের মধ্যে যোগাযোগের জন্য এজেন্ট হিসাবে কাজ করানোর উদ্দেশ্যে তাঁকে পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করা হয়। ওই পেট্রোল পাম্প হতে ভারতীয় দূতাবাস কতদূর তা আমি জানি না। বস্তুতঃ ওই পেট্রোল পাম্পের মালিক মিসেস ফজলুর রহমান।

রাজসাক্ষী আমীর হোসেন আরও বলেন ঃ ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি মহাখালীতে পার্টির এক সভা আহ্বান করি। মহাখালী এয়ারপোর্টের নিকটে। এই সভায় যোগদান করেন এক্সকর্পোরাল সামাদ, সুবেদার আশরাফ আলী খান, ইপি আর টিসি ক্লার্ক মুজিবর রহমান, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ইউসুফ কম্পাউন্ডার, ইপিআর টিসির সিকিউরিটি অফিসার রাজ্জাক, এডুকেশনাল ইন্সট্রাক্টর ফ্লাইট সার্জেন্ট হক,এল,এ সি, এম এ, নওয়াজ, জে,টি জেড,এ, চৌধুরী ও সার্জেন্ট মিয়া। সাক্ষী এই পর্যায়ে 'ডকে' সার্জেন্ট শামসুল হককে সনাক্ত করেন ও বলেন, এই সামসুল হকই সেদিনকার সভায় উপস্থিতি ছিলেন।

এরপর সাক্ষী ফ্লাইট সার্জেন্ট হককে সনাক্ত করেন এবং বলেন, তিনি ফ্লাইট সার্জেন্ট হক।

প্রশ্ন ঃ ওই সভায় কতজন 'হক' ছিলেন?

উত্তর ঃ এই সভায় ২ জন হক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হলেন সার্জেন্ট হক ও ফ্লাইট সার্জেন্ট হক। আমি 'ডকে' ২ জনকেই দেখিয়েছি।

ইহার পর সাক্ষী বলেন, "আমি ঐ সভায় আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু বলি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করি। সভায় যোগদানকারী এ সকল লোক আমাকে তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতা দানের আশ্বাস দেন। এক্স-কর্পোরাল সামাদ বলেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য সফল করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, ও লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ভারতের কাছ থেকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করছেন।

এই সময় বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জানাব মঞ্জুর কাদের সাক্ষী আমীর হোসেনকে একটি দলীল প্রদান করেন।

রাজসাক্ষী আমীর হোসেন বলেনঃ "এটা একটি ক্যান্টনমেন্টের স্কেচ। সুবেদার আশরাফ আলী খান এটা আমাকে দিয়েছেন।" দলিলটিতে পরে Ext, PW 3/30 চিহ্ন দেওয়া হয়।

বাদীপক্ষের কৌসুলি সাক্ষীকে একটি চিঠি দেন। সাক্ষী চিঠিখানা হাতে লইয়া বলেন, "আমি এটা পেয়েছিলাম"। (চিঠিতে Ext, PW 3/39 চিহ্ন দেওয়া ছিল)। এতে ৪-৩-১৯৬৬ তারিখ দেয়া আছে। এটা 'আলো' কাছ থেকে লেখা। আলো হচ্ছেন লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন। চিঠিখানা লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতেই লেখা। আমি এটা সনাক্ত করছি। Ext, PW 3/35 চিহ্ন সম্বলিত চিঠিখানাও লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতে লেখা।

সাক্ষীকে চিঠির ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হয় এবং অনুবাদ ঠিক আছে কিনা জানিতে চাওয়া হয়। উত্তরে সাক্ষী বলেনঃ সপ্তম প্যারায় "E" শব্দটির আগে "N" অক্ষরটি বসাতে হবে। বাকী অনুবাদ ঠিক আছে। পঞ্চম প্যারার মধ্যে লেখা "শনি ও রবিবার" শব্দগুলো অপ্রয়োজনীয়। মূল চিঠিতে এই শব্দগুলো নেই। এই প্যারায় উল্লেখ আছে, পত্র লেখক ১২-৩ অথবা ১৩-৩'এ ঢাকায় যাবেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ঢাকায় আসেন ১২-৩'এ। এই প্যারায় উল্লেখিত 'কমল' বলতে সুলতানউদ্দীন আহমদ ও 'মুরাদ' বলতে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে বুঝান হয়েছে। নূর মোহাম্মদ বলতে অভিযুক্ত নূর মোহাম্মদকে বুঝান হয়েছে। চিঠির সর্বশেষ প্যারায় আমাকে "মুরাদ"-এর নিকট ট্রাঙ্ক-কল করতে বলা হয় যাতে 'ছেলেটি আবগারী শুল্ক রেহাই পায়।'

প্রশ্ন ঃ আবগারী শুল্কের ব্যাপারটা কি?

উঃ এই আবগারী শুল্কটা হচ্ছে জি,এম,চৌধুরী কর্তৃক লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের জন্য লণ্ডনে ক্রয়কৃত একটি রেডিওর জন্য। চিঠির শেষে লেখা আছে "আপনারই আলো" অর্থাৎ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন।

বাদীপক্ষের কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ ১৯৬৬ সনের ১২ই মার্চ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ঢাকায় এলে আমি তাঁকে বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানাই।

প্রশ্ন ঃ তারপর কোথায় গেলেন?

জবাব ঃ আমরা একটি ট্যাক্সী ভাড়া করে ধানমণ্ডীর 'আলেয়া' নামফলক সম্বলিত বাসায় যাই। ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানও সন্ধ্যার দিকে সেখানে আসেন।

প্রশ্ন ঃ তারপর?

জবাব ঃ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন বৈঠকের সময় নির্ধারণের জন্য ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে শেখ মুজিবরের নিকট পাঠান।

প্রশ্ন ঃ তারপর?

জবাব ঃ তারপর লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও আমি সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ৭টার দিকে ধানমণ্ডীর 'সাতমসজিদ' রোডে বাসষ্ট্যাণ্ডে যাই। শেখ মুজিবর রহমান তাঁর নিজের গাড়ীতে করে বাসষ্ট্যাণ্ডে আসেন। তিনি আমাদেরকে তাঁর গাড়ীতে করে আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীনের বাসভবনে নিয়ে যান।

জবাব ঃ আমাদের ৫/১০ মিনিট পর জনাব রুহুল কুদ্দুস সেখানে আসেন। তারপর আমাদের একটি বৈঠক হয়।

প্রশ্ন ঃ বৈঠকে কি আলোচনা হয়?

জবাব ঃ বৈঠকে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, আমরা এক বিরাট সংখ্যক সামরিক বাহিনীর লোক ও বেসামরিক কর্মচারীকে আমাদের আদর্শে ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছি। তিনি বলেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আলাদা হওয়া ছাড়া আর কোন কিছুই মেনে নিতে রাজী নন।

প্রশ্ন ঃ তারপর ?

উত্তর ঃ প্রত্যেকেই এতে সন্তুষ্ট হন। তিনি আরও বলেন যে, ভারতের নিকট থেকে অস্ত্রশস্ত্র পেলেই আমরা সংগ্রামের একটা দিন ধার্য করবো। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ঐদিন আমাদেরকে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন ঃ তারপর কি হোল?

জবাব ঃ তারপর লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ও শেখ মুজিবর রহমান কয়েক মিনিটের জন্য অপর একটি কক্ষে যান। প্রায় ১৫ মিনিট পর তাঁরা ফিরে আসেন। এসে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকারের সাথে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করার জন্য হাবিলদার দলিলুদ্দীন ও জয়দেবপুর থেকে একজন ক্যাপ্টেনকে ভারতে পাঠান হবে।

প্রশ্ন ঃ তারপর ?

জবাব ঃ তারপর তিনি বলেন যে, অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তির পর রাঙ্গামাটি পার্বত্য এলাকায় গেরিলা ট্রেনিং দানের ব্যাপারে হাবিলদার দলিলুদ্দীন ও লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমদকে বিস্তারিত নির্দেশাদি দেয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ বাসার মালিক জনাব তাজুদ্দীন কী এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ?

জবাব ঃ না, জনাব তাজুদ্দীন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না।

বাদীপক্ষের কৌসুলি সাক্ষীর হাতে একটি চিঠি দেন এবং জিজ্ঞাসা করেন ঃ এটা কি আপনি পেয়েছিলেন ?

জবাব ঃ হ্যাঁ, এটা আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের কাছ থেকে পাই। চিঠিখানা লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতে লেখা। তবে চিঠির শেষে কোন নাম নেই। (চিঠিতে Ext, PW 3/41 চিহ্ন দেয়া আছে)। চিঠিতে ১৯-৩-১৯৬৬ এই তারিখ দেয়া আছে।

সাক্ষীকে চিঠির ইংরেজী অনুবাদ দিয়া বলা হয়, অনুবাদটি ঠিক আছে?
জবাব ঃ ষষ্ঠ প্যারায় "Bless him" এর স্থলে "Bless her" হবে। ষষ্ঠ প্যারার পর 'ইতি' কথাটি রাখতে হবে। বাকী অনুবাদ ঠিক আছে। অনুবাদে Ext, PW 3/42 চিহ্ন দেয়া আছে। প্রথম প্যারায় উল্লেখিত "জনাব রহমান" বলতে অভিযুক্ত জনাব আহমদ ফজলুর রহমানকে বুঝান হয়েছে। দ্বিতীয় প্যারা "শফি" হচ্ছে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের একজন প্রাক্তন ভৃত্য। এই প্যারার শেষ লাইনে উল্লেখিত "যন্ত্রপাতি" বলতে "পিস্তল" বুঝান হয়েছে। পরবর্তী প্যারা "ট্রেড এর অবস্থা কেমন আমি তা বুঝতে পারলাম না" বলতে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের অবস্থা এবং "বাজারদর" বলতে অস্ত্রশস্ত্রের দাম বুঝান হয়েছে। এই প্যারায় উল্লেখ আছে যে, আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট একটি চিঠি লিখি। ঐ চিঠিতে আমি পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের আন্দোলনের অবস্থা বর্ণনা করি এবং তাকে তার বদলীর বিষয় জানাই। "নাম প্রেরণ" বলতে বুঝান হয়েছে যে, তিনি ভাল ও সৎ অনুসারীর নাম পাঠাবেন।

বাদীপক্ষের কৌসুলির অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন ঃ জনাব আহমদ ফজলুর রহমান লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের কাছ থেকে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বদলির বার্ত্তা সংক্রান্ত প্রাপ্ত ট্রাঙ্ককল সম্পর্কে আমায় অবহিত করেন। পি,এস নোটে উল্লিখিত "মালপত্র" বলতে অস্ত্রশস্ত্র বুঝান হয়েছে।ইহার পর জনাব মঞ্জুর কাদের সাক্ষীর হাতে দুইটি দলিল দেন এবং প্রশ্ন করেন; আপনি কী এগুলো সনাক্ত করতে পারবেন? কী অবস্থায় সেগুলো প্রণীত হয় এবং কী সম্পর্কিত?
জবাব ঃ ১৯৬৬ সনের ৩০শে মার্চ আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন কর্তৃক অভিযুক্ত জনাব এ,এফ,রহমান ও আমার নিকট প্রেরিত একটি চিঠি পাই। আমি ঐদিনই এ,এফ,রহমানের হাতে চিঠিখানা দেই। চিঠিতে টাকার কথা বলা হয়েছিল। জনাব এ,এফ, রহমান আমাকে টাকা নেয়ার জন্য পরদিন আসতে বলেন। সেই অনুসারে আমি ৩১শে মার্চ তাঁর নিকট যাই এবং তাঁর নিকট থেকে নগদ সাড়ে ৫ হাজার টাকা গ্রহণ করি।
প্রশ্ন ঃ তারপর?
জবাব ঃ তারপর আমি ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, জিন্নাহ এভেন্যুতে যাই। ব্যাঙ্ক থেকে আমি Ext, PW 3/44 চিহ্ন সম্বলিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে Ext, PW 3/43 চিহ্ন সম্বলিত এই ব্যাঙ্ক ড্রাফটি পাই।
প্রশ্ন ঃ ব্যাঙ্ক ড্রাফটি কী করলেন ?
জবাব ঃ ব্যাঙ্ক ড্রাফটি আমি করাচীতে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট পাঠাই।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ Ext, PW 3/44 চিহ্নটি আমার আবেদনপত্রে রয়েছে, ড্রাফটে নয়। Ext, PW 3/44 চিহ্ন সম্বলিত আমার লেখা আবেদনপত্রটিতে লেখা আছে যে, ড্রাফটি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট যাবে।
সাক্ষী বলেনঃ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের চিঠির সাথে একটি চিরকুটও আসে। সেটা আমি নিজে রাখি। সাক্ষীর হাতে আর একটি কাগজ খণ্ড দেওয়া হয়। উহা হাতে লইয়া সাক্ষী বলেনঃ "এটা লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন লিখিত আর একটি চিরকুট। এতে Ext, PW 3/45 চিহ্ন দেওয়া আছে। এই চিরকুটে আমাকে টাকা পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়। জনাব এ,এফ, রহমান কর্তৃক আমাকে প্রদত্ত সাড়ে ৫ হাজার টাকার মধ্যে আমি আমাদের খরচের জন্য ৫ শত টাকা রাখি"।

তারপর সাক্ষী বলেনঃ ১৯৬৬ সনের এপ্রিলে আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের কাছ থেকে আর একটি চিঠি পাই। এই চিঠি অনুসারে আমি ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে 'ট্রাঙ্কল কল' করে এনে তাঁকে নিয়ে বকর ঈদের দিনে অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমানের নিকট যাই। আমরা শেখ মুজিবর রহমানকে আমাদের সংগঠনের কাজকর্মের কথা জানাই এবং তাঁর কাছে টাকা চাই। তিনি অপর একটি কক্ষ থেকে ৪ হাজার টাকা নিয়ে আসেন এবং আমার উপস্থিতিতে সেই টাকা ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের হাতে দেন। পরে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এই টাকা আমার হাতে দেন। আমি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম না বলেই ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে আরও টাকা সংগ্রহ করার জন্য পাঠাই এবং দুই অথবা তিন ঘণ্টা পর তিনি ২ হাজার টাকা নিয়ে আমার কাছে আসেন।আমি জানতে চাইলে তিনি আমাকে বলেন যে, এই টাকা তিনি জনাব রুহুল কুদ্দুসের নিকট থেকে এনেছেন। ঐ একই দিনে আমি ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের হাতে ৬ হাজার টাকা দেই এবং সেই টাকা লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট প্রেরণের নির্দেশ দিয়ে তাঁকে চট্টগ্রাম পাঠাই।
ইহার পর বাদীপক্ষের কৌসুলি সাক্ষীকে বাংলায় লেখা আর একটি চিঠি দেন। এই চিঠি হাতে লইয়া সাক্ষী বলেনঃ "আমি এই চিঠি পাই। এটা ১,৪,৬৬ তারিখে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমার নিকট "উল্কা" নামে পাঠান। চিঠির সাথে যে খামটি রয়েছে, আমি খামটিতে করেই চিঠিটি পাই। (চিঠিতে Ext, PW 3/46 এবং খামে Ext, PW 3/47 চিহ্ন রয়েছে)। এই চিঠি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতে লেখা।

সাক্ষীকে চিঠিটির ইংরেজী অনুবাদ দেয়া হয় এবং বলা হয় যে, অনুবাদ ঠিক আছে কি না। ইহার উত্তরে সাক্ষী বলেন, "তৃতীয় প্যারার শেষ শব্দটি "her" হবে, "him" নয়। চতুর্থ প্যারার শুরুতে 'Murad' এর স্থলে 'Mind'

হবে। চিঠির শেষে 'আর না'র স্থলে 'ইতি' হওয়া উচিত। চিঠির বাকী অংশ ঠিক আছে। (অনুবাদে Ext, PW 3/48 চিহ্ন দেওয়া আছে)। এই চিঠি খানি আমীর হোসেন মিয়া, ১০৭ ডি, এন, সেন রোড, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-৪, পূর্ব পাকিস্তান–এই ঠিকানায় আসে। আমি ১৯৬৬ সনের ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে অথবা মার্চের প্রথমদিক থেকে আমার এই ঠিকানা ছিল। আমি সেখানে আমার থাকার জন্য বাড়ী ভাড়া করি। বাসায় একটি টেলিফোন ছিল। টেলিফোনের নম্বর হলো ৮২৪৫২।

বাদীপক্ষের কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ চিঠির দ্বিতীয় প্যারার শুরুতে লেখা "উপকরণাদি" (The Articles) শব্দটির অর্থ হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র। চতুর্থ প্যারায় প্রথম বাক্যটির অর্থ হচ্ছে এই যে, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন করাচীতে থাকতে চাচ্ছেন না। এই প্যারায় "জনাব রহমান" এর যে উল্লেখ আছে, তাতে অভিযুক্ত জনাব আহমদ ফজলুর রহমানকে বুঝান হয়েছে। পঞ্চম প্যারায় লিখিত 'ট্রেড' শব্দটির অর্থ হচ্ছে আন্দোলনের জন্য অস্ত্রশস্ত্র হয়। এই প্যারায় লিখিত "শেয়ার হোল্ডারস" শব্দটি দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব এ,এফ, রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও মানিক চৌধুরীকে বুঝান হয়েছে। একই প্যারায় লিখিত "নয়া শেয়ার হোল্ডার" কথাটি দিয়ে আর অন্যান্য যারা টাকা দিতে চান তাঁদেরকে বুঝান হয়েছে।

বাদীপক্ষের কৌসুলি খামসহ আর একটি চিঠি সাক্ষীর হাতে দেন। সাক্ষী সেইটি হাতে লইয়া বলেন, ৬,৪,৬৬ তারিখ সম্বলিত এই চিঠিখানা আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের কাছ থেকে পাই। এটা আমার কাছে লেখা। এর লেখাগুলো লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতের। যে খামটি আমাকে দেয়া হয়েছে, তাতে করেই চিঠিখানা আমার কাছে আসে। (চিঠিতে Ext, PW 3/49 এবং খামে Ext, PW 3/50 চিহ্ন দেওয়া আছে)।

বাদীপক্ষের কৌসুলি সাক্ষীকে পত্রটির একটি ইংরেজী অনুবাদ দিয়ে বলেন, পত্রটির এই ইংরেজী তরজমা সঠিক হয়েছে কিনা।

উঃ পত্রটির অনুবাদে সর্বশেষ বাক্যে যেখানে 'খালিস।' শব্দটি রয়েছে সেখানে 'খালিস' না হয়ে হবে খালিদ। বাকী সমস্ত তরজমাই ঠিক রয়েছে। (অনুবাদটি ই এক্স টি ডব্লু ৩/৫১ চিহ্নিত হবে)। পত্রের প্রথমে যে 'শফি'র কথা রয়েছে সেগুলো লেঃ মোয়াজ্জেমের ব্যক্তিগত ভৃত্য। অবশ্যই আমার জবানবন্দীতে আমি তার কথা উল্লেখ করেছি। এই পত্রে যে 'ড্রাফট' বা খসড়ার উল্লেখ করা হয়েছে তাহলো লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে আমি যে ৫,০০০ টাকা ড্রাফট পাঠিয়েছিলাম সেই ড্রাফট। এই পত্রের প্রথম অনুচ্ছেদে যে 'রহমান সাব'-এর উল্লেখ করা হয়েছে তিনি বলেন মিঃ আহমদ ফজলুর রহমান। পত্রের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে যে 'জিনিসপত্র' বা মেটিরিয়ালস-এর

উল্লেখ করা হয়েছে। তার অর্থ হলো অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং এই অনুচ্ছেদে 'বিজনেস।' বা ব্যবসা-বাণিজ্য বলে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হলো আমাদের আন্দোলন বা তৎপরতা এবং এই প্লানটেশন বলে সে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হল স্থান –যেখানে অস্ত্রশস্ত্র রাখা যেতে পারে। এই পত্রের প্রথম অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় বাক্যে 'মেটিরিয়ালস' বলে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তারও অর্থ হলো সমরাস্ত্র ও গোলাবারুদ। পত্রে "ইন ফুল" বা সম্পূর্ণরূপে বলতে বোঝানো হয়েছে আমাকে ইতিমধ্যে দেওয়া তালিকানুযায়ী বা উক্ত তালিকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পত্রের চতুর্থ অনুচ্ছেদে "খালিদ" বলতে নৌবাহিনীর প্রাক্তন কমোডোর খালিদ জামিলকে বোঝানো হয়েছে।

পত্রের পঞ্চম অনুচ্ছেদের শুরুতে লেখা "মেটিরিয়ালস অব দি স্পেস" বা এই খানের জিনিসপত্র বলতে পশ্চিম পাকিস্তানের উপজাতীয় এলাকা হতে প্রস্তাবিত অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের কথা বোঝানো হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের উপজাতীয় অঞ্চল হতে কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয়ের জন্য আমিই লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে পরামর্শ দিয়েছিলাম। এই পত্রের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে "ভাবী" কর্তৃক গৃহীত পত্রসমূহের উল্লেখ রয়েছে। এইসব চিঠিপত্রের মধ্যে কতিপয় চিঠি ভাবীকে লেখা বলতে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ও অন্যদের বোঝানো হয়েছে।

এরপর বাদীপক্ষের কৌসুলি সাক্ষীকে খামসহ একটা টেলিগ্রাম দেন এবং প্রশ্ন করেন, তিনি এই টেলিগ্রামটি গ্রহণ করেছিলেন কিনা।

সাক্ষী বলেন, হ্যাঁ আমি তা গ্রহণ করেছিলাম। গত ৭-৪-৬৬ তারিখে আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের প্রেরিত এই টেলিগ্রামটি গ্রহণ করি। এই টেলিগ্রামে আমাকে জানানো হয় যে, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন চট্টগ্রামে বদলি হয়েছেন। (এই টেলিগ্রামটিকে ই এক্স টি পি ডব্লু ৩/৫২ এবং খামটিকে ই এক্স টি পি ডব্লু ৩/৫৩ চিহ্নিত করা হয়)।

এরপর সাক্ষী বলেন,"এই টেলিগ্রামটি পেয়ে আমি আহমদ ফজলুর রহমান ও মিঃ কে,জি, আমাদের নিকটে যাই। আমি তাঁদের লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বদলির খবরটি জানাই।" এরপর বাদীপক্ষের কৌসুলি সাক্ষীর হাতে একটি চিঠি এবং একটি খাম দিয়া প্রশ্ন করেন যে, সাক্ষী এই খামের ভিতর এই পত্রটি পেয়েছিলেন কিনা।

সাক্ষী বলেন, এই খামের ভিতরে আমি এই পত্রটি পেয়েছিলাম। এই চিঠি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে দিয়েছিলেন। এ চিঠিতে তারিখ রয়েছে ৮-৪-৬৬। এ চিঠি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের লেখা।"(এ চিঠি ই এক্স টি পি ডব্লু ৩/৫৪ এবং এই খাম ইএক্স টি পি ডব্লু ৩/৫৫ চিহ্নিত করা হয়)।

এরপর বাদীপক্ষের কৌসুলি সাক্ষীর হস্তে একটি পত্রের ইংরেজী তরজমা দিয়ে সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন, এই পত্রটির অনুবাদ সঠিক কিনা?

সাক্ষী বলেন, এই পত্রের শেষের দিকে 'সবাই ভালো আছে', 'আমাকে জানাও' এই কথাকটি যোগ করতে হবে। বাকী সব অনুবাদ ঠিক আছে।

(অনুবাদটি ই এক্স টি পি ডব্লু ৩/৫৬ রূপে চিহ্নিত করা হয়)।

সাক্ষী বলেন, এই পত্রে যে "টেলিগ্রামের" কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা ই এক্স টি পি ডব্লু ৩/৫২ টেলিগ্রাম। এই পত্রে 'তুষার' বলতে মিঃ আহমদ ফজলুর রহমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পত্রের শেষে 'মাদার' বা মা বলতে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের 'শিশু' নামে ৪ বছরের (তখনকার বয়স) কন্যার কথা উল্লেখ করা রয়েছে। স্নেহবশে তাকে 'মা' বলে সম্বোধন করা হতো। এ পত্রে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন গত ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় আসেন।

প্রঃ কবে কোন তারিখে ?

উঃ তারিখটা আমার ঠিক মনে নেই।

সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের ২৩শে এপ্রিলে মিঃ বিধানচন্দ্র সেন ও ডঃ সায়েদুর রহমান আমার বাড়ীতে আসেন। পরের দিন অর্থাৎ ২৪শে এপ্রিলে এই দুই ব্যক্তি ও আমি জয়দেবপুরে যাই। আমি তাদের জয়দেবপুরে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের আন্দোলনের পক্ষে কর্মরত সামরিক ব্যক্তিদের দেখানোর উদ্দেশ্যে। সেখানে ২/৩ জনের সাথে আমাদের দেখা হয় কিন্তু আমি তাদের নাম স্মরণ করতে পারছি না। তাদের সাথে একসঙ্গে বসে আমরা চা পান করি এবং তারপর আমরা ঢাকায় ফিরে আসি।

এরপর ট্রাইব্যুনাল সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন,জয়দেবপুরের কর্মীদের নাম তিনি কেন মনে রাখতে পারেন নি?

উঃ সুলতানউদ্দিন আহমদ আমাকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমানে আমি তাদের নাম ভুলে গেছি।

জনাব মঞ্জুর কাদেরের প্রতিঃ

লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন বদলি হয়ে ঢাকায় আসেন। তিনি ১০৭, দীননাথ সেন রোড,গেণ্ডারিয়ায় আমার বাসায় আসেন। আন্দোলনের জন্যে আমি যে অর্থ পেয়েছি তিনি তার হিসাব চান। আমি তাঁকে হিসেব দেই এবং আমি তাঁর কাছে যে টাকা পাঠিয়েছি তার হিসেব চাই। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। কারণ তিনি যে টাকা ব্যয় করেছেন আমি তার যৌক্তিকতা খুঁজে পাইনি। সেদিন বিকেলে আমি ডাঃ খালেকের বাসভবন 'আলেয়া'য় গমন করি এবং কতিপয় ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ নগদ ৮ হাজার টাকা লেঃ মোয়াজ্জেমের হাতে দেই এবং তাকে বলি যে, আমি এ

সংস্থা ত্যাগ করতেছি। ঐ মুহূর্তে তিনি আমাকে দেড় হাজার টাকা দিয়ে আমি যে বাড়ীভাড়া করেছিলুম তার ভাড়া শোধ করতে বলেন। তিনি আমাকে সাবধান করে দেন যে, আন্দোলন সম্পর্কে আমি যদি কোন কথা বলি তবে তিনি আমাকে খুন করবেন। তিনি সেখানে উপস্থিত এক্স কর্পোরাল সামাদ এবং ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে আমার প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেন। এরপর আমি এ সংস্থার সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করি। আমি কয়েকটি চিঠি এবং ২/৩টি ডায়েরী রেখে দিই। সেগুলো আমি প্রমাণ করেছি।

১৯৬৭ সনের ১৩ই ডিসেম্বর আমাকে গ্রেফতার করা হয়। এসব কাগজপত্র আমি ২৮ নয়া পল্টন, ঢাকায় সেন্ট্রাল ষ্টাটিষ্টিক্যাল অফিসের ষ্টোর রোমে দেখেছিলুম। (কৌসুলি সাক্ষীর হাতে একটি চিরকুট দেন)। সাক্ষী বলেন, "এ চিরকুটটা আমার হাতের লেখা" (উহা Ext, PW 3/57 চিহ্নিত)। গ্রেফতার হওয়ার পর আমাকে রাজারবাগ পুলিস জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে নেয়া হয়। যে পুলিস অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাঁকে আমি জানাই যে, আমার সাথে কিছু কাগজপত্র রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ কোন পুলিস অফিসার আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?

উত্তর ঃ ডি,এস,পি মন্নাফ। আমি ডি,এস,পি মন্নাফকে এ চিরকুটটা দেই। Ext, PW 3/57 চিহ্নিত চিরকুটটাতে বাংলায় লেখা রয়েছে "ভালবাসা নিও। এই চিরকুট বাহকের হাতে একটা বড় ডায়েরী এবং একটা পকেট ডায়েরী দিবে।"

সেন্ট্রাল ষ্টাটিষ্টিক্যাল অফিসের চৌকিদার রহমত আলীর কাছে চিরকুটটা লেখা হয়েছে। আমার হ্যাণ্ড ব্যাগ থেকে ডায়েরীগুলো দেওয়ার জন্য তাকে চিরকুটে বলা হয়। চিরকুটে আরো বলা হয়, 'ওটা আমার দরকার'। 'আমি এক প্রকার আছি' এবং 'তোমার' মোঃ আমীর হোসেন মিয়া। 'তারিখ ১৪-১২-৬৭'। (সাক্ষীর হাতে একটা কাগজ দিয়ে উহা কি তা জিজ্ঞেস করা হয়)। সাক্ষী বলেন, আদালতে পৌঁছার পর আমি ২৮ নয়া পল্টন, রমনা, ঢাকা এ ঠিকানায় ষ্টাটিষ্টিক্যাল অফিসার, সি এস, ও রিজিওনাল অফিসারের কাছে একটা জয়েনিং রিপোর্ট প্রেরণ করি। তাতে তারিখ দেয়া হয় ৩-২-৬৬। আমি ঢাকায় ষ্টাটিষ্টিক্যাল অফিসে যোগ দিয়ে এ রিপোর্ট প্রেরণ করি।এই রিপোর্টে Ext, PW 3/58 চিহ্নিত রয়েছে। কৌসুলি সাক্ষীর হাতে আর একটি কাগজ দিয়ে উহা কি ব্যাখ্যা করতে বলেন)। সাক্ষী বলেন,"এ কাগজ আমার করাচী যাওয়া সম্পর্কে" আমার অফিসের ডিলিং এসিসট্যান্টের রিপোর্ট রয়েছে। এতে আমার করাচী যাওয়া সম্পর্কে আমি যে অগ্রিম ভ্রমণ ভাতা চেয়েছি আমার হাতে তা লেখা রয়েছে।" উহাতে Ext, PW 3/59 চিহ্নিত রয়েছে। সাক্ষীর হাতে কৌসুলি খামসহ একটা টেলিগ্রাম দেন এবং তিনি উহা পেয়েছেন কিনা এবং কি অবস্থায় পেয়েছেন জিজ্ঞাসা করেন)।

তিনি বলেন, "লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের কাছ হতে আমি এ টেলিগ্রাম পেয়েছি। এতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ সন লেখা রয়েছে। টেলিগ্রামে বলা হয়, "চিন্তিত আছি। তারযোগে পরিস্থিতি জানাও।" লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বদলি সম্পর্কে এটা বলা হয়েছে। টেলিগ্রামের নীচে প্রেরকের নাম দেয়া রয়েছে 'আলো'। 'আলো' মানে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন। (টেলিগ্রামটি Ext, PW 3/60 এবং খামটি Ext, PW 3/61 চিহ্নিত। কৌঁসুলি সাক্ষীর হাতে একটি হ্যাণ্ড ব্যাগ দেন)। তিনি বলেন, 'এটা আমার নিজের হ্যাণ্ড ব্যাগ। আমি পত্রসমূহ ও ডায়েরীগুলো এ হ্যাণ্ড ব্যাগে করে আমার অফিস ষ্টোরে তালা দিয়ে রেখেছিলুম, ডি এস, পি চাবি চাওয়ায় আমি তাঁকে সেটা দিয়ে দিয়েছি। (ব্যাগে Ext, PW 3/62 চিহ্নিত রয়েছে)।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে আমাকে সামরিক কাষ্টোডিতে নেয়ার পর আমি স্বীকারোক্তি করার মনস্থ করি। এরপর লেঃ শরিফ একদিন আমার কাছে আসেন। আমি তাকে স্বীকারোক্তি গ্রহণের ব্যবস্থা করতে বলি। ২/৩ দিন পর তিনি আমাকে সিগন্যাল মেসের ভিআইপি রুমে নিয়ে যান। তিনি আমাকে জনাব জি এম কাদরীর হাতে ছেড়ে দেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট বলে আমাকে জানানো হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে হুঁশিয়ার করে চিন্তা করার সময় দেন। ঘণ্টাখানেক পর আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি করি। তিনি আমার স্বীকারোক্তি রেকর্ড করে নেন। উহা আমাকে পড়ে শুনানো হয় এবং আমি তাতে স্বাক্ষর করি। এরপর একদিন মেজর এ,বি, নাসের আমার কাছে এসে আমি রাজসাক্ষী হতে রাজী কিনা জানতে চান। আমি তাতে সম্মত হই। ১৯৬৮ সালের ২৩শে মে আমাকে সিগন্যাল মেসে এডিসির কাছে নেয়া হয়। আমি সত্য কথা বলবো এ শর্তে তিনি আমাকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন।

(কৌঁসুলি সাক্ষীর হাতে একটা মানচিত্র দিয়ে তিনি উহা চিনতে পারেন কিনা জিজ্ঞেস করেন)। সাক্ষী বলেন, ঢাকা রওয়ানা হওয়ার সময় লেঃ মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে আমি এ মানচিত্র পেয়েছি। (মানচিত্রটিতে Ext, PW 3/63 চিহ্নিত রয়েছে)।

সংবাদ

৭ই আগস্ট ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

অভিযুক্তদের খাদ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে মঞ্জুর কাদেরের বিবৃতি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

দুইদিন বিবৃতির পর গত সোমবার ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি পুনরায় শুরু হইলে বাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের সামরিক হেফাজতে

আটক অভিযুক্তদের খাদ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির ব্যাপারে এক বিবৃতি দেন।

গত শুক্রবার ১নং অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, তাঁহাদের যে খাবার দেওয়া হয়, উহা খাইতে তাঁহারা অভ্যস্ত নহেন। শেখ মুজিবর রহমান ব্যতীত অন্য কাহাকেও নির্জন কক্ষের বাহিরে আসিতে দেওয়া হয় না।

জনাব মঞ্জুর কাদের ট্রাইব্যুনালকে জানান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দুইটি পৃথক গ্রুপে ভাগ করা হইয়াছে। সামরিক বাহিনীর অফিসার ও বেসামরিক ক্ষেত্রে সমমর্যাদাসম্পন্নদের লইয়া একটি সামরিক বাহিনীতে অফিসার নহেন এমন অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ ও বেসামরিক ক্ষেত্রে অনুরূপ মর্যাদাসম্পন্ন অভিযুক্তদেরকে লইয়া আর একটি গ্রুপ গঠন করা হইয়াছে। প্রথম গ্রুপ সামরিক বাহিনীর অফিসারদের অনুরূপ খাদ্য গ্রহণ করেন।

তিনি বলেন, তাহাদের খাদ্য তালিকায় রহিয়াছে ভাত, চাপাতি ও ইউরোপীয় খাদ্য যেমন চপ। ইহা ছাড়া সপ্তাহে তাঁহাদের তিন দিন মাছও দেওয়া হয়।

অভিযুক্তদের জন্য স্বতন্ত্র বাবুর্চি নিয়োগের প্রশ্নে জনাব মঞ্জুর কাদের বলেন, ইহার সহিত বন্দীদের নিরাপত্তা জড়িত। অভিযুক্তদের প্রত্যহ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় বলিয়া জনাব মঞ্জুর কাদের ট্রাইব্যুনালকে জানান। তিনি আরও জানান যে, বন্দীদের দুইজন কখনো বা তিনজনকে একত্রে এক কক্ষে থাকিতে দেওয়া হয়।

তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানকে বা তাঁহার রুমের বারান্দায় বসতে দেওয়া হয়। সামরিক হেফাজতের বিশেষ নিয়ম-কানুনের জন্য এই বিশেষ সুবিধা অন্য কাহাকেও দেওয়া হয় না বলিয়া তিনি জানান।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান অভিযুক্তদের জন্য স্বতন্ত্র বাবুর্চির ব্যবস্থা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তবে তিনি বলেন যে, বাবুর্চি যে অভিযুক্তদের পছন্দ মত হইবে তেমন কোন কথা নাই। সামরিক কর্তৃপক্ষও বাবুর্চি পছন্দ করিয়া নিয়োগ করিতে পারেন।

দৈনিক পয়গাম

৭ই আগস্ট ১৯৬৮

লেঃ মোয়াজ্জেম বলিয়াছিলেনঃ

দলিলউদ্দিন ও সুলতান উদ্দিনকে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দানের দায়িত্ব দেওয়া হইবে –আমীর হোসেনের সাক্ষ্য

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (মঙ্গলবার) রাজসাক্ষী জনাব আমির হোসেন মিয়া বিশেষ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, আওয়ামী লীগের জনাব তাজুদ্দিনের

বাসভবনে অনুষ্ঠিত অভিযুক্তদের এক গোপন সভায় লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ভারত হইতে অস্ত্র এবং গোলাবারুদ প্রাপ্তির পর আন্দোলনকারীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে ট্রেনিং দানের জন্য অভিযুক্ত হাবিলদার দলিলউদ্দীন এবং এল, এস, সুলতানউদ্দিন আহমদকে দায়িত্ব দেওয়া হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় গৃহের মালিক জনাব তাজুদ্দিন উপস্থিত ছিলেন না।

সাক্ষী বলেন যে, সভা হইতে শেখ মুজিবুর রহমান এবং লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন অন্য একটি কক্ষে গমন করিয়া ১৫ মিনিট পরে পুনরায় সভায় আগমনের পর গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং সম্পর্কিত বিষয় প্রকাশ করেন।

রাজসাক্ষী আরও বলেন যে, উল্লেখিত দুই অভিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন কক্ষে গোপন আলোচনা শেষ করিয়া মূল সভায় আগমনের পর লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, হাবিলদার দলিলুদ্দিন আহমদ এবং জয়দেবপুর হইতে একজন ক্যাপ্টেন অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে আলোচনার জন্য ভারত গমন করিবেন।

গতকল্য বাদীপক্ষ বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে মামলার দুইনং অভিযুক্ত ব্যক্তি লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জম হোসেন কর্তৃক রাজসাক্ষী আমির হোসেন মিয়ার নিকট স্বহস্তে লিখিত ৭টি চিঠি পেশ করেন। সাক্ষী এই চিঠিগুলি অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত বলিয়া সনাক্ত করেন। ইহা ছাড়াও গতকল্য ট্রাইব্যুনালে আমির হোসেন মিয়ার নিকট লেঃ মোয়াজ্জেম প্রেরিত দুইটি টেলিগ্রামের মূল কপি এবং অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত একটি ক্যান্টনমেন্টের হাতে আঁকা মানচিত্র, পূর্ব পাকিস্তানের একটি ম্যাপ এবং কয়েকটি চিরকুট পেশ করা হয়।

গতকল্য (মঙ্গলবার) চতুর্থ দিনে রাজসাক্ষী জনাব আমির হোসেন মিয়ার জবানবন্দী গ্রহণ সমাপ্ত হইয়াছে। অদ্য (বুধবার) বিবাদীপক্ষ তাঁহার সওয়াল-জওয়াব শুরু করিবেন।

সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমানকে চেয়ারম্যান এবং ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম, আর, খান এবং বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিমকে সদস্য করিয়া বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছে।

ষড়যন্ত্র মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, ৩ জন সি, এস, পি অফিসার এবং একজন লেঃ কম্যাণ্ডারসহ সর্বমোট ৩৫ ব্যক্তি বিচারাধীন রহিয়াছেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে ভারত কর্তৃক সরবরাহকৃত অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাইয়া পাকিস্তানকে ইহার এক অংশ হইতে বঞ্চিত করিবার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের রাজসাক্ষী জনাব আমির হোসেন মিয়ার হাতে একখানি বাংলা পত্র দিয়া উহা তিনি পাইয়াছিলেন কিনা এবং পাইয়া থাকিলে কাহার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন সে কথা জিজ্ঞাসা করেন। সাক্ষী বলেন যে, এই পত্রখানি তিনি লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের (সাঙ্কেতিক নাম 'আলো') নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। পত্রের খামখানিও পত্রের সহিত যুক্ত রহিয়াছে বলিয়া তিনি জানান।

জনাব আমির হোসেন মিয়া আরও বলেন যে, পত্র লেখক আমার নিকট দুইখানি টেলিগ্রাম এবং একখানি পত্র দিয়াছিলেন বলিয়া এই পত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। পত্রে আমাকে তিনি (পত্র লেখক) যাহাতে রাত্রে আমার নিকট টেলিফোন করিতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে একটি টেলিফোন নম্বর তাঁহাকে দেওয়ার জন্য লিখিয়াছিলেন। আমি তাহাকে 'হোটেল আরজুর' টেলিফোন নম্বর দিয়াছিলাম। ৩-৩-৬৬ তারিখে আমি একটি ট্রাঙ্ক-কল পাইয়াছিলাম। পত্রে এ কথার উল্লেখ রহিয়াছে। পত্রের তৃতীয় অনুচ্ছেদে "কমল" শব্দ দ্বারা জনাব সুলতানউদ্দীন আহমদকে বুঝান হইয়াছে। পরবর্তী বাক্যে "তাঁহার বিষয়াদির শীঘ্র মীমাংসা হইবে" বলিয়া যে কথার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা চট্টগ্রাম হইতে তাঁহার করাচীতে বদলীর ব্যবস্থাদি সম্পর্কে বুঝান হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, পত্রের পরবর্তী বাক্যে 'মুরাদ' শব্দ ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের নামের পরিবর্তে ব্যবহার করা হইয়াছে। পত্র লেখক ৫ই মার্চ স্বল্পকালীন সফরে আসিবেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি আসেন নাই। চতুর্থ অনুচ্ছেদে বাহিরে একটি চাকুরীর কথা উল্লেখ রহিয়াছে। এই চাকুরীর জন্য আমি তাহাকে একখানি পত্র দিয়াছিলাম। তিনি বলেন যে, জনাব এ, এফ, রহমান সি,এস,পি লন্ডন হইতে ট্রানজিষ্টর ট্রানসমিটার সংগ্রহের জন্য আমাকে যে পত্র দিয়াছিলেন এখানে সেই পত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হইয়াছে। "ভদ্রলোক গত দুই মাস যাবৎ সেই স্থানে বাস করিতেছেন না"–ইহার দ্বারা জনাব এ, এফ, রহমান সি, এস পি'র কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথা বুঝান হইয়াছে। (রাজসাক্ষী জনাব আমির হোসেন বাংলা পত্রের প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়া বলেন), পত্রের ৪র্থ অনুচ্ছেদের শেষে উল্লিখিত "বিনা এমাউন্ট" এই শব্দের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'মানি' (টাকা-পয়সা) হইবে।

তিনি আরও বলেন যে, পরবর্তী অনুচ্ছেদে সামাদ বলিয়া যাহার উল্লেখ রহিয়াছে, তিনি হইতেছেন অভিযুক্ত সাবেক কর্পোরাল সামাদ। এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত "কন্ট্রাক্ট বিজনেস" দ্বারা আমাদের আন্দোলনকে বুঝান হইয়াছে। ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদের "ফেমিলি এফেয়ার্স" দ্বারাও আমাদের আন্দোলনের কথা বুঝান হইয়াছে। ইহার পরবর্তী অনুচ্ছেদের "মাদার্স

ইলনেস" বলিতে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পরবর্তী বাক্যে 'ডাক্তার' দ্বারা শেখ মুজিবুর রহমান এবং 'প্রেসক্রাইভ মেডিসিন' বলিতে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের কথা বুঝান হইয়াছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুচ্ছেদে শেখ মুজিবুর রহমানের নামের পরিবর্তে "পরশ" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। "রহমান" বলিতে নৌবাহিনীর জনৈক র‍্যাটিং রহমানকে বুঝান হইয়াছে। কিন্তু তিনি আমাদের আন্দোলনের সহিত জড়িত ছিলেন না। এই অনুচ্ছেদে "সুবজ" বলিতে এল, এস, নূর মোহাম্মদকে বুঝান হইয়াছে।

রাজসাক্ষী জনাব আমির হোসেন মিয়া আরও বলেন যে, প্রাক্তন কর্পোরাল সামাদ ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হোটেল আরজুতে আমাকে ৪ জন নূতন রিক্রুটের কথা জানান। উক্ত ৪ ব্যক্তি হইতেছেন সুবেদার আশরাফ আলী খান, সরকারী ডিসপেন্সারীর কম্পাউণ্ডার জনাব ইউসুফ, ই পি আরটিসি'র কেরানী জনাব মুজিবুর রহমান এবং ইপিআরটিসি'র সিকিউরিটি অফিসার জনাব রাজ্জাক।

(সাক্ষী আসামী কাঠগড়ায় উপবিষ্ট পূর্ব পাকিস্তান সড়ক পরিবহন সংস্থার একজন কেরানী অভিযুক্ত মুজিবুর রহমানকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।) তাহাদের আমার নিকট আনয়ন করা হইলে আমি তাহাদের আমাদের মতবাদে দীক্ষিত করিয়া আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করি। তাহারা আমার সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করে।

ইহার পর আমি তাহাদের ভ্রমণ ব্যয় দিয়া দেই। তাহারা চলিয়া যায়। আমি অভিযুক্ত সামাদের জন্য চাকুরী যোগাড় করিতে চেষ্টা করি; কিন্তু কোন কর্মস্থল শূন্য পাওয়া যায় নাই।

আমি ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় কিম্বা চতুর্থ সপ্তাহে করাচী হইতে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট হইতে একটি ট্রাঙ্ককল পাই। উক্ত ট্রাঙ্ককলে মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে সাবেক কর্পোরাল সামাদকে চাকুরী প্রদানের জন্য জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের নিকট লইয়া যাইতে নির্দেশ দেন। আমি তাহাকে জনাব ফজলুর রহমানের নিকট লইয়া যাই এবং তিনি (ফজলুর রহমান) তাহাকে (সামাদকে) ধানমণ্ডি এলাকার রাস্তার অপর পাড়ে অবস্থিত গ্রীনভিউ নামক পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার পদে চাকুরী দান করেন। তাঁহাকে উক্ত পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত করার পশ্চাতে এই উদ্দেশ্য ছিল যে, সে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারী ও জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করিতে পারিবে। এই পেট্রোল পাম্পটি প্রকৃতপক্ষে বেগম ফজলুর রহমানের।

মহাখালীতে বৈঠক

সাক্ষী আমীর হোসেন বলেন যে, ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি মহাখালীতে আমাদের দলের একটি বৈঠক আহ্বান করি। মহাখালী ঢাকা বিমানবন্দরের নিকটে অবস্থিত। এই বৈঠকে সাবেক কর্পোরাল সামাদ, সুবেদার আশরাফ আলী খান, পূর্ব পাকিস্তান সড়ক পরিবহন সংস্থার কেরানী মুজিবুর রহমান, ঢাকা কেন্টনমেন্টের কম্পাউণ্ডার ইউসুফ, পূর্ব পাকিস্তান সড়ক পরিবহন সংস্থার নিরাপত্তা অফিসার রাজ্জাক, এডুকেশনাল ইনষ্ট্রাক্টর ফ্লাইট সার্জেন্ট হক, এল, এ, সি, এম,এ, নেওয়াজ, জে, টি, জেড, এ, চৌধুরী এবং সার্জেন্ট মিয়া উপস্থিত ছিলেন। (সাক্ষী আসামী কাঠগড়ায় উপবিষ্ট সার্জেন্ট শামসুল হককে সনাক্ত করিয়া বলেন যে, ইনি সার্জেন্ট হক। তিনি বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। সাক্ষী ফ্লাইট সার্জেন্ট হককে দেখাইয়া দিয়া বলেন যে, ইনি ফ্লাইট সার্জেন্ট হক। সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই বৈঠকে কয়জন হক অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।) তিনি বলেন যে, এই বৈঠকে দুইজন হক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা হইতেছেন সার্জেন্ট হক এবং ফ্লাইট সার্জেন্ট হক। সাক্ষী বলেন, আমি তাহাদের উভয়কেই আসামীর কাঠগড়ায় সনাক্ত করিয়াছি। এই বৈঠকে আমি আমাদের আন্দোলনের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করি এবং ইহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করি। যাহারা এই বৈঠকে যোগদান করেন তাঁহারা আমার সহিত সহযোগিতা করেন। সাবেক কর্পোরাল সামাদ বলেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হইবে। তিনি আরও বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব আহমদ ফজলুর রহমান এবং লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ভারত হইতে অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ যোগাড়ের চেষ্টা করিতেছেন।
(বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার হস্তে একটি দলিল প্রদান করেন।)

সাক্ষী বলেন, "সুবেদার আশরাফ আলী খান আমাকে একটি ক্যান্টনমেন্টের যে রেখা মানচিত্র প্রদান করিয়াছিলেন ইহা সে মানচিত্র।"

(বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির সাক্ষী আমির হোসেনের হাতে একখানি চিঠি দিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, এই চিঠি তিনি পাইয়াছিলেন কিনা)।

সাক্ষী বলেনঃ "আমি এই চিঠিখানি পাইয়াছিলাম। চিঠিতে তারিখ লেখা আছে ৪/৩/১৯৬৬। ইহা 'আলো' নামে পরিচিত লেফটেন্যান্ট কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত। মোয়াজ্জেম হোসেনেরই হাতে লেখা ছিল চিঠিখানি। আমি ইহা সনাক্ত করিতেছি। আদালতে পি, ডব্লিউ ৩/৩৫নং দলিল হিসাবে চিহ্নিত চিঠিখানিও লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতে লেখা ছিল। (সাক্ষীর হাতে উক্ত বাংলায় লেখা চিঠির ইংরেজী তরজমা দিয়া জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ইহা সঠিক তরজমা কিনা?)

সাক্ষী বলেন, ইহার সপ্তম অনুচ্ছেদে 'ই' অক্ষরের আগে 'এম' অক্ষর বসিবে। তরজমার বাদবাকী ঠিকই হইয়াছে। পঞ্চম অনুচ্ছেদে বন্ধনীর মধ্যে 'শনিবার এবং রবিবার' শব্দগুলি অতিরিক্ত হইয়াছে। মূল চিঠিতে এগুলি ছিল না। এই অনুচ্ছেদে ইহা বলা হইয়াছে যে, লেখক ১২ই অথবা ১৩ই মার্চ ঢাকা যাইবে। ১২ই মার্চ তিনি ঢাকা আসেন। এই অনুচ্ছেদের "কমল" শব্দের অর্থ হইল সুলতানউদ্দীন আহমদ এবং "মুরাদ"-এর অর্থ ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান। এখানে যাহাকে "নূর মোহাম্মদ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি হইলেন অভিযুক্ত নূর মোহাম্মদ। চিঠির সর্বশেষ অনুচ্ছেদের উপরের অনুচ্ছেদে আমাকে "মুরাদ"-এর নিকট ট্রাংকল করিয়া "বালকটি যাহাতে কাষ্টম ডিউটি হইতে মুক্তি পায়" সে বিষয়ে বলিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। একটি রেডিও সেটের ব্যাপারে এই শুল্ক মুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়। লণ্ডনে জি, এম, চৌধুরী লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের জন্য এই বেতারযন্ত্র কেনেন। "আপনার আলো" এই শব্দগুলি দিয়া চিঠি শেষ করা হয়। 'আলো' অর্থ লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, ১৯৬৬ সালের ১২ই মার্চ লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ঢাকা আসিলে বিমানবন্দরে আমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাই। আমরা একটি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া ধানমণ্ডির 'আলেয়া'তে উপস্থিত হই। বিকালে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানও সেখানে উপস্থিত হন। লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে বৈঠকের সময় নির্ধারণ করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট প্রেরণ করেন। ইহার পর সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ৭টায় লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান এবং আমি ধানমণ্ডির সাত মসজিদ রোডস্থ বাসষ্টাণ্ডে যাই। শেখ মুজিবুর রহমান এই সময়ে নিজের মোটরে করিয়া বাসষ্টাণ্ডে আসিয়া হাজির হন। তিনি আমাদিগকে তাঁহার গাড়ীতে করিয়াই আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব তাজুদ্দীনের বাসভবনে লইয়া যান। আমরা সেখানে ড্রয়িংরুমে বসিয়া জনাব রুহুল কুদ্দুসের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকি। পাঁচ-দশ মিনিট পর জনাব রুহুল কুদ্দুস সি এস পি সেখানে হাজির হন। ইহার পর আমাদের একটি সভা হয়। এই সভায় লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন যে, বিপুলসংখ্যক সামরিক ও বেসামরিক লোককে আমাদের মনোবল ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে আমরা সফল হইয়াছি। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আদায় ভিন্ন তিনি আর কিছু চাহেন না। সভার প্রত্যেকেই ইহাতে সন্তুষ্ট হন। তিনি আরও বলেন যে, ভারতের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ লাভের পরই আমরা কাজ শুরু করার তারিখ ধার্য করিব। সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ লোক আমাদের সহযোগিতা করিবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। উহার পর লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন এবং শেখ মুজিবুর রহমান কয়েক মিনিটের

জন্য অপর একটি কক্ষে যান। প্রায় ১৫ মিনিট পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসেন। লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ঘোষণা করেন যে, হাবিলদার দলিলুদ্দীন এবং জয়দেবপুরের একজন ক্যাপ্টেন ভারত সরকারের সহিত অস্ত্রাদি আনার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য ভারত গমন করিবেন। ইহার পর তিনি বলেন যে, ভারত হইতে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার পরই রাঙ্গামাটি পার্বত্য এলাকায় সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন লোকদের গেরিলা যুদ্ধে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য হাবিলদার দলিলুদ্দীন এবং এল, এস, সুলতানুদ্দীন আহমদকে দায়িত্ব দেওয়া হইবে। বাড়ীর মালিক জনাব তাজুদ্দীন সভায় উপস্থিত ছিলেন না। (বাদীপক্ষের কৌঁসুলী সাক্ষীর হাতে একখানি চিঠি দিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, ইহা তিনি পাইয়াছিলেন কি-না)

সাক্ষী বলেন, লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট হইতে এই চিঠিখানি আমি পাই এবং ইহাতে তাঁহারই হাতের লেখা রহিয়াছে। কিন্তু চিঠির শেষে কোন নাম নাই। ইহাতে তারিখ লেখা ছিল ১৯/৩/১৯৬৬ (উক্ত বাংলায় লেখা চিঠিখানির ইংরেজী তরজমা সাক্ষীর হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ইহা সঠিক তরজমা কিনা।)

সাক্ষী বলেন, আমার হাতে দেওয়া তরজমার ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে "ব্লেস হিম"-এর পরিবর্তে "ব্লেস হার" হইবে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের শেষেও "এণ্ড" এই শব্দটি হইবে। তরজমার বাদবাকী অংশ নির্ভুল হইয়াছে। চিঠির প্রথম অনুচ্ছেদে "জনাব রহমানের" কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইনি হইলেন অভিযুক্ত জনাব আহমদ ফজলুর রহমান। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লিখিত "শফি" হইল লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের একজন প্রাক্তন চাকর। সে পরে পি, আই, এ-তে 'লোডারের' চাকুরী পায়। এই অনুচ্ছেদে শেষ লাইনে লেখা "যন্ত্রপাতির" অর্থ হইল "পিস্তলসমূহ"। ইহার পরের অনুচ্ছেদে লেখা হইয়াছে, "ব্যবসায়ের অবস্থা কি রকম সে বিষয়ে আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" ইহার দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের কথা বলা হইয়াছে, 'বাজার দর' অর্থে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের দামের কথা বুঝান হইয়াছে। আমি লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম। এই চিঠিতে উহারও উল্লেখ আছে। আমার চিঠিতে আমি পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের আন্দোলনের অবস্থা সম্পর্কে লিখিয়াছিলাম। তাঁহার এ, এফ, রহমানের নিকট হস্তান্তর করি। ইহাতে তিনি টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। জনাব এ, এফ, রহমান আমাকে পরের দিন টাকা লইয়া যাইতে বলেন। অতএব আমি ৩১শে মার্চ তাঁহার নিকট গমন করিয়া নগদ ৫ হাজার ৫ শত টাকা গ্রহণ করি। আমি অতঃপর জিন্নাহ এভিনিউর ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানে গমন করি এবং সেখান হইতে একটি ব্যাংক ড্রাফট মারফত করাচীতে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম

হোসেনের নিকট উক্ত অর্থ প্রেরণ করি। জনাব এ, এফ, রহমান আমাকে যে ৫ হাজার ৫ শত টাকা দিয়াছিলেন তাহা হইতে আমি আমাদের ব্যয় বাবদ ৫ শত টাকা রাখিয়া দেই।

আমি ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট হইতে আর একটি চিঠি পাই এবং ঐ চিঠির মর্ম অনুযায়ী আমি ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানসহ বকর ঈদের দিন অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট গমন করি। আমি ট্রাঙ্ককল করিয়া চট্টগ্রাম হইতে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে ঢাকা আনাইয়া ছিলাম। আমরা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানকে অবহিত করিয়া আমি তাহার নিকট হইতে টাকা চাই। তিনি অপর একটি কক্ষ হইতে ৪ হাজার টাকা আনিয়া আমার সামনে উক্ত অর্থ ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের হাতে প্রদান করেন। পরে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান উক্ত অর্থ আমাকে প্রদান করেন। আমি ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে কোন বিশেষ ব্যক্তির নাম না করিয়া আরও টাকা জোগাড় করিতে পাঠাই। দুই অথবা তিন ঘণ্টা পর তিনি ২ হাজার টাকা লইয়া আমার নিকট আসেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তিনি বলেন যে, তিনি জনাব রুহুল কুদ্দুসের নিকট হইতে উক্ত অর্থ আনয়ন করেন। আমি সেইদিন সন্ধ্যাবেলা এই ৬ হাজার টাকা ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে প্রদান করিয়া তাহা লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে পাঠাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়া তাঁহাকে চট্টগ্রাম পাঠাইয়া দেই।

(সাক্ষী আমীর হোসেনের হস্তে বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির বাংলায় লিখিত একটি চিঠি প্রদান করেন।) সাক্ষী বলেন, "আমি এই চিঠিটি পাইয়াছিলাম। এই চিঠিতে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে 'উলকা' বলিয়া সম্বোধন করেন। ইহা ১/৪/৬৬ তারিখে লেখা হয়। আমি চিঠিটি একটি খামে পাই। উক্ত খামটি এখানে চিঠির সঙ্গে রহিয়াছে। ইহা লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতের লেখা।" (সাক্ষীকে এই চিঠির ইংরেজী তরজমা প্রদান করিয়া, উক্ত তরজমা শুদ্ধ কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়।) সাক্ষী আমীর হোসেন বলেন, "তৃতীয় অনুচ্ছেদের সর্বশেষ অক্ষর ইংরেজী 'হার' হইবে এবং ইংরেজী 'হিম' হইবে না। সাক্ষী বলেন যে, চতুর্থ অনুচ্ছেদের প্রথমে ইংরেজী 'মুরাদ' শব্দটির পরিবর্তে ইংরেজী 'মাইণ্ড' শব্দটি হইবে। তিনি আরও বলেন যে, চিঠির শেষে ইংরেজী 'নো মোর' শব্দগুলি সেখানে হইবে না। তদস্থলে ইংরেজী 'এণ্ড' হইবে। চিঠির অবশিষ্ট তরজমা শুদ্ধ আছে। এই চিঠিটি আমীর হোসেন মিয়া ১০৭ ডি, এন, সেন রোড, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-৪, পূর্ব পাকিস্তান এই ঠিকানায় আসে। আমি ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে অথবা মার্চ মাসের প্রথম দিকে এই ঠিকানায় বাসা বদল করি। আমি বসবাস করার জন্য এই বাড়ীটি ভাড়া লই। এখানে ৮২৪৫২ এই নাম্বারের একটি টেলিফোন ছিল।

এই চিঠির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শব্দগুলি "জিনিসপত্র" দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বুঝানো হইয়াছে। এই চিঠির চতুর্থ অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যে বুঝানো হইয়াছে যে, লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন করাচীতে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক নহেন। এই অনুচ্ছেদ 'জনাব রহমানের' উল্লেখ করিয়া অভিযুক্ত জনাব আহমদ ফজলুর রহমানকে বুঝান হইয়াছে। ইহার পঞ্চম অনুচ্ছেদে লিখিত শব্দ 'ব্যবসা' (বিজিনেস) দ্বারা আন্দোলনের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের কথা বুঝানো হইয়াছে। এই অনুচ্ছেদের 'শেয়ারহোল্ডার' এই শব্দ দ্বারা শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব এ, এফ রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস এবং মানিক চৌধুরীকে বুঝানো হইয়াছে। এই অনুচ্ছেদেই 'নূতন শেয়ার- হোল্ডার' এই শব্দগুলি দ্বারা অন্যান্য ব্যক্তি যাহারা টাকা প্রদান করিতে ইচ্ছুক তাহাদের বুঝানো হইয়াছে।

সাঙ্কেতিক শব্দের অর্থ

(বাদীপক্ষের কৌসুলী খামসহ একখানি চিঠি সাক্ষীর হাতে দেন)। সাক্ষী বলেন, ৬-৪-৬৬ তারিখের এই পত্রখানি আমি লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। এই চিঠিখানি লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতে লেখা এবং আমাকেই ইহা লেখা হইয়াছিল। যে খামখানি আমাকে দেওয়া হইয়াছে, উহার মাধ্যমে চিঠিখানি আসে। (কৌসুলী সাক্ষীর হাতে চিঠিখানির ইংরেজী অনুবাদের একটি কপি দেন এবং ইহা চিঠিখানির সঠিক অনুবাদ কপি কিনা জিজ্ঞাসা করেন)। সাক্ষী বলেন যে, চিঠিখানির অনুবাদ কপিতে ৪র্থ অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যে 'খালিস' শব্দের স্থলে 'খালিদ' হইবে। অনুবাদের অবশিষ্টাংশ ঠিক আছে।

পত্রের শুরুতে "শফি" বলিয়া যাহার উল্লেখ আছে, সে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের ব্যক্তিগত চাকর। আমি আমার বিবৃতিতে তাহার কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমি লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট ৫ হাজার টাকার যে ড্রাফটখানি প্রেরণ করিয়াছিলাম, উহাই আলোচ্য পত্রে উল্লেখিত ড্রাফট। এই পত্রের প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লেখিত রহমান সাহেব, জনাব আহমদ ফজলুর রহমানকে বুঝানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত 'ম্যাটেরিয়্যালস' শব্দ দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বুঝানো হইয়াছে। 'বিজিনেস' শব্দ দ্বারা আমাদের আন্দোলন এবং 'প্ল্যান্টেশন' শব্দ দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ কোথায় রাখা হইবে, তাহা বুঝানো হইয়াছে। অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় বাক্যের শুরুতে যে 'ম্যাটেরিয়েলস' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, উহা দ্বারাও অস্ত্রশস্ত্র বুঝান হইয়াছে। 'ইন ফুল' শব্দ দুইটি দ্বারা লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে যে তালিকা দিয়াছিলেন সে তালিকা অনুসারে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার কথাই বুঝানো

হইয়াছে। পত্রের ৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'খালিদ' শব্দ দ্বারা নৌবাহিনীর সাবেক কমোডর খালিদ জামিলকে বুঝান হইয়াছে। পত্রের ৫ম অনুচ্ছেদের শুরুতে "ম্যাটেরিয়েলস অব দিস প্লেস" শব্দ কয়টি দ্বারা আমি লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট পশ্চিম পাকিস্তানের উপজাতীয় এলাকা হইতে কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয় করা উচিত বলিয়া যে প্রস্তাব দিয়াছিলাম, তাহাই বুঝান হইয়াছে। পত্রের ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে পত্রগুলি 'ভাবী' পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল পত্রের যে কতগুলি "ভাবীকে" উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত, উহাদের কতগুলি লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম ও বাকী কয়টি তাঁহার (ভাবীর) নিজের জন্য।

একখানি টেলিগ্রাম

(বাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের রাজসাক্ষী জনাব আমির হোসেনের হাতে খামসহ একখানি টেলিগ্রাম দেন। তিনি (সাক্ষী) টেলিগ্রামখানি পাইয়াছিলেন কিনা, সে কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়)। সাক্ষী বলেন, "আমি ইহা পাইয়াছিলাম।" লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট হইতে ৭/৪/৬৬ তারিখে আমি ইহা পাই। ইহা দ্বারা লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন চট্টগ্রাম বন্দরে বদলী হইয়াছেন বলিয়া আমাকে জানান হয়। সাক্ষী আরও বলেন যে, এই টেলিগ্রামখানি পাইয়া আমি জনাব আহমদ ফজলুর রহমান ও জনাব কে, জি, আহমদের নিকট গিয়া লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন বদলী হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের জানাই।

(বাদীপক্ষের কৌঁসুলী সাক্ষীর হাতে খামসহ একখানি পত্র দিয়া তিনি উহা পাইয়াছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করেন)। সাক্ষী বলেন, 'আমি এই খামেই পত্রখানি লইয়াছিলাম।' পত্রখানিতে ৮-৪-৬৬ এই তারিখ লিখিত আছে। লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন এই পত্রখানি আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। পত্রখানি লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতের লেখা।

(বাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির সাক্ষী জনাব আমির হোসেনের হাতে পত্রখানির ইংরেজী অনুবাদের একটি কপি দিয়া উহা আলোচ্য পত্রের সঠিক ইংরেজী অনুবাদ কিনা, তাহা দেখিতে বলেন)। তিনি বলেন, "পত্রের শেষে 'অল আর ওয়েল' এই শব্দ কয়টি এবং 'রাইট টু মি' এই শব্দ কয়টি যোগ করিতে হইবে।" অনুবাদের বাকী অংশ ঠিক আছে বলিয়া তিনি জানান। তিনি আরও বলেন যে, পত্রে উল্লিখিত 'তুষার' দ্বারা অভিযুক্ত জনাব আহমদ ফজলুর রহমানকে বুঝান হইয়াছে।

পত্রের শেষে "মাদার" শব্দ দ্বারা লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের কন্যা "শিপুকে" বুঝান হইয়াছে। সেসময় শিপুর বয়স ৪ বৎসর ছিল। স্নেহবশতঃ তাহাকে 'মা' বলা হইত। লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন

১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকা আসিয়াছিলেন; কিন্তু আমি সঠিক তারিখ স্মরণ করিতে পারিতেছি না।

রাজসাক্ষী জনাব আমির হোসেন আরও বলেন যে, সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের ২৩শে এপ্রিল মিঃ বিধান চন্দ্র সেন ও ডঃ সাইদুর রহমান আমার বাসায় আসিয়াছিলেন। তার পরদিন অর্থাৎ ২৪শে এপ্রিল এই দুই ব্যক্তিকে লইয়া আমি অপর যে সকল সামরিক কর্মচারী আমাদের আন্দোলনের পক্ষে কাজ করিতেছিলেন তাহাদের দেখার জন্য জয়দেবপুর গমন করি। সেখানে দুই অথবা তিন ব্যক্তির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু আমি তাঁহাদের নাম স্মরণ করিতে পারিতেছি না। সেখানে আমরা তাঁহাদের সহিত একত্রে চা পান করি। ইহার পর আমরা ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি।

আদালত

আদালত যখন রাজসাক্ষী আমির হোসেনকে জয়দেবপুরে তাঁহাদের আন্দোলনের পক্ষে কর্মরত ব্যক্তিদের নাম তিনি কেন স্মরণ করিতে পারিতেছেন না জিজ্ঞাসা করেন তখন সাক্ষী বলেন, "জনাব সুলতানউদ্দীন আহমদ আমাকে তাঁহাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। এখন তাঁহাদের নাম ভুলিয়া গিয়াছি।"

দৈনিক পাকিস্তান

৭ই আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

আমীর হোসেনের জবানবন্দী দান সমাপ্ত:

অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে ভারতে প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যবস্থা:

সামাদ বলে- শেখ মুজিব এ এফ রহমান ও মোয়াজ্জেম ভারত থেকে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করছেন

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ২নং একরারী সাক্ষী জনাব আমীর হোসেন গতকাল মঙ্গলবার মোট ছয়খানি চিঠির ও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রের সত্যতা ও ব্যাখ্যাদান করে। সাক্ষী আরো জানায় যে, সে দলত্যাগ করার পর তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। সরকারপক্ষের কৌঁসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের বাংলায় লেখা একখানা চিঠি সাক্ষীর হাতে দিয়ে প্রশ্ন করেনঃ এ চিঠিখানা কি আপনার কাছে লেখা হয়েছিল এবং কে লিখেছিল?

সাক্ষীঃ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন সাংকেতিক নাম "আলো" নামে আমার কাছে লিখেছিল। এই সাথে যুক্ত ইনভেলাপে এ চিঠি পেয়েছিলাম। গত ২৫-২-৬৬ তারিখে এ চিঠি লেখা হয়েছিল।

সাক্ষীকে এই চিঠির ইংরেজীতে অনুবাদ করা এক কপি দিয়ে জানতে চাওয়া হয় যে, অনুবাদ সঠিক কিনা? মূল চিঠির সাথে সাক্ষী অনুবাদ পরীক্ষা করে জানায় যে, অনুবাদ ঠিক আছে।

সাক্ষীঃ চিঠিতে বলা হয়েছে যে, পত্র লেখক আমাকে দুটি টেলিগ্রাম ও একটি চিঠি লিখেছিল।

প্রঃ আপনি কি তা পেয়েছিলেন?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ চিঠিতে কি লেখা ছিল?

উঃ আমাকে রাত্রে যাতে টেলিফোনে যোগাযোগ করা যায় তার জন্য চিঠিতে আমার কাছে টেলিফোন নম্বর চাওয়া হয়েছিল।আমি হোটেল আরজুর টেলিফোন নম্বর দিয়েছিলাম। আমি এখন সে টেলিফোন নম্বর স্মরণ করতে পারি না।

প্রঃ আপনি কি সে টেলিফোনে ট্রাঙ্ককল পেয়েছিলেন?

উঃ হ্যাঁ, ৩-৩-৬৬ তারিখে ট্রাঙ্ককল পেয়েছিলাম । চিঠির তৃতীয় প্যারায় যে "কমল"-এর উল্লেখ আছে তা সুলতানউদ্দীনকে লক্ষ্য করে। পরবর্তী বাক্যে "তার ব্যাপার শীঘ্রই মীমাংসা করা হবে বলে" যে উল্লেখ আছে তার অর্থ তাকে চট্টগ্রাম হতে করাচীতে বদলির ব্যবস্থার প্রসঙ্গ। পরবর্তী বাক্যে "মুরাদ" বলে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের কথা বলা হয়েছে।

পত্র লেখক চিঠিতে লিখেছিল যে, ৫ই মার্চ সে স্বল্পকালীন সফরে হয়ত আসতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে আসেনি। চিঠির চতুর্থ প্যারায় যে, "বাইরের কাজ" উল্লেখ করা হয়েছে এবং এজন্য আমি চিঠি লিখেছিলাম, এর দ্বারা আমি জনাব এ এফ রহমান সিএসপি'র কাছ হতে লন্ডন থেকে ট্রানজিস্টার ট্রান্সমিটার আনার ব্যাপারে যে চিঠি সংগ্রহ করেছিলাম তারই উল্লেখ করা হয়েছে। "ভদ্রলোক" সেখানে গত দু'মাস ধরে বাস করছেন না" বলে যে কথা বলা হয়েছে তাতে জনাব এ এফ রহমানের ছোট ভাইয়ের কথা বলা হয়েছে।

পরের প্যারায় "সামাদ" বলে যার উল্লেখ আছে সে প্রাক্তন কর্পোরাল সামাদ (অভিযুক্ত)– "কন্ট্রাক্ট বিজনেস" অর্থ আমাদের আন্দোলন। ৬ষ্ঠ প্যারায় "পারিবারিক বিষয়" বলে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাও আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে। "মায়ের অসুখ"-এর অর্থ পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা। 'ডাক্তার' বলে যা বলা হয়েছে তা শেখ মুজিবর রহমান সম্পর্কে এবং "ঔষধ" বলতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ বোঝানো হয়েছে।

পরের প্যারায় 'পরশ' বলে শেখ মুজিবর রহমানকেও "রহমান" বলে যার উল্লেখ করা হয়েছে তিনি নৌবাহিনীর র‍্যাটিং রহমান এবং তিনি আমাদের আন্দোলনে জড়িত নন। "সবুজ" নামে যার উল্লেখ রয়েছে সে নুর মোহাম্মদ।

প্রঃ ১৯৬৬ সালে আপনার কার্যাদির বিবরণ দিতে পারেন কি?

উঃ ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এক্স-কর্পোরাল সামাদ হোটেল আরজুতে আমার কাছে আন্দোলনের জন্য চারজন নয়া রিক্রুট নিয়ে আসেন। তারা হলেন সুবেদার আশরাফ আলী খান, গবর্ণমেন্ট ডিসপেনসারীর কম্পাউন্ডার ইউসুফ, ইপিআরটিসির ক্লার্ক' মজিবর রহমান ও ইপিআরটিসির সিকিউরিটি অফিসার রাজ্জাক। (সাক্ষী ইপিআরটিসি ক্লার্ক ও বর্তমানে অভিযুক্ত মজিবর রহমানকে সনাক্ত করেন।) আমি তাদের দীক্ষা দেই ও আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করি। তারা সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

তারপর আমি তাদের যাতায়াত ভাড়া দেই এবং তারা চলে যান। আমি সামাদের জন্য চাকুরীর চেষ্টা করি কিন্তু কোন পদ খালি পাওয়া যায়নি।

১৯৬৬ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সপ্তাহে আমি করাচী হতে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের ট্রাঙ্ককল পাই। তাতে সে আমাকে এক্স-কর্পোরাল সামাদকে একটি চাকুরী যোগাড় করে দেওয়ার জন্য জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের কাছে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

আমি তাকে জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের কাছে নিয়ে তিনি তাকে ধানমন্ডি এলাকার রাস্তার বিপরীত দিকে অবস্থিত গ্রীন ভিউ পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজারের চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেন। উদ্দেশ্য ছিল যাতে সামাদ ভারতীয় দূতাবাসের লোকজনের সাথে এজেন্ট হিসেবে যোগদান করতে পারে। পেট্রোল পাম্প হতে ভারতীয় দূতাবাস কতদূরে তা আমি বলতে পারি না। পেট্রোল পাম্পটি প্রকৃতপক্ষে মিসেস ফজলুর রহমানের ছিল।

ভারত থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা

একরারী সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি মহাখালীতে আমাদের পার্টির এক বৈঠক আহ্বান করি। মহাখালী এয়ারপোর্টের নিকটে। বৈঠকে এক্স-কর্পোরাল সামাদ, সুবেদার আশরাফ আলী খান, ইপিআরটিসি ক্লার্ক মজিবর রহমান, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কম্পাউন্ডার ইউসুফ, ইপিআরটিসি'র সিকিউরিটি অফিসার রাজ্জাক, ফ্লাইট সার্জেন্ট হক, এডুকেশনাল ইনস্ট্রাক্টর এল এ সি এমএ নওয়াজ, জে-টি জেড এ চৌধুরী ও সার্জেন্ট মিয়া উপস্থিত ছিল।

সাক্ষীকে অভিযুক্তদের মধ্যে তাদের কেহ আছে কিনা সনাক্ত করতে বলা হলে সার্জেন্ট হক ও ফ্লাইট সার্জেন্ট হককে সনাক্ত করেন।

প্রঃ ক'জন হক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন?

সাক্ষীঃ দুজন হক ছিল। বৈঠকে আমি আমাদের আন্দোলনের পন্থা এবং আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করি। তারা সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেয়।

এক্স-কর্পোরাল সামাদ বলেন যে, আমাদের লক্ষ্য সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা অর্জিত হতে পারে। সে আরো জানায় যে, শেখ মুজিবর রহমান, জনাব আহমদ ফজলুর রহমান ও লেঃ মোয়াজ্জেম অর্থ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ ভারত হতে সংগ্রহের চেষ্টা করছেন।

বাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীর হাতে একখানা মানচিত্রের স্কেচ দিলে সাক্ষী বলেন যে, সুবেদার আশরাফ আলী খান তাকে ক্যান্টনমেন্টের যেসব স্কেচ দিয়েছিলেন এখানা তারই একখানা।

এরপর বাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীর হাতে আরেকখানা চিঠি দেন।

সাক্ষী বলেন, এখানাও "আলো"র কাছ হতে সে পেয়েছিল। আলো লেঃ মোয়াজ্জেম । এখানা ৪-৩-৬৬ তারিখে লিখিত। তখন তাকে বাংলা চিঠিখানার ইংরেজী অনুবাদের কপি দেওয়া হলে সে জানায় যে, ইংরেজী অনুবাদ সঠিক হয়েছে। তবে এ চিঠির সপ্তম প্যারার শেষে "ই" শব্দের বদলে "এম" হবে।

চিঠিতে বলা হয়েছে যে, পত্রলেখক ১২ই মার্চ অথবা ১৩ই মার্চ ঢাকা পৌঁছিবে। প্রকৃতপক্ষে লেঃ মোয়াজ্জেম ১২ই মার্চ ঢাকা আসেন। চিঠিতে "কমল" ও "মুরাদ" বলতে সুলতানউদ্দীন ও স্টুয়ার্ড মুজিবরকে বোঝান হয়েছে। নূর মোহাম্মদ বলতেও অভিযুক্ত নূর মোহাম্মদকেই বোঝানো হয়েছে।

চিঠিতে "মুরাদ"-এর কাছে আমাকে ট্রাঙ্ককল করে "ছেলেটি যাতে কাস্টমস ডিউটি হতে অব্যাহতি পায়" তা জানাতে বলা হয়েছে। লেঃ মোয়াজ্জেমের জন্য লন্ডনে জি এম চৌধুরী যে রেডিওটি কিনে পাঠিয়েছেন তার কাস্টমস ডিউটির ব্যাপারে একথা বলা হয়েছে। চিঠিটি "তোমারই আলো" বলে শেষ করা হয়েছে–এর অর্থ লেঃ মোয়াজ্জেম।

প্রঃ লেঃ মোয়াজ্জেম আসার পর কি হল?

উঃ আমি তাকে ১২ই মার্চ ঢাকা বিমানবন্দরে সম্বর্ধনা জানাই। আমরা একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে ধানমন্ডি এলাকার "আলেয়া" নামক গৃহে নিয়ে যাই। সন্ধ্যায় স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানও সেখানে উপস্থিত হয়। লেঃ মোয়াজ্জেম স্টুয়ার্ড মুজিবরকে শেখ মুজিবরের কাছে বৈঠকের সময় ঠিক করার জন্য পাঠায়। তারপর লেঃ মোয়াজ্জেম, স্টুয়ার্ড মুজিবর ও আমি "সাত মঞ্জিল" রোডের বাসস্ট্যান্ডে যাই; সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শেখ মুজিবর রহমান তার নিজ গাড়ীতে সেখানে এসে আমাদের তার গাড়ীতে করে আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী জনাব তাজউদ্দীনের বাড়ী নিয়ে যান। আমরা ড্রয়িংরুমে গিয়ে জনাব রুহুল পাঁচ-দশ মিনিট পর জনাব রুহুল কুদ্দুসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। পাঁচ-দশ পর মিনিট জনাব রুহুল কুদ্দুস সেখানে এলে আমরা সভায় মিলিত হই। বৈঠকে লেঃ মোয়াজ্জেম জানান যে, আমাদের ভাবধারায়

সামরিক বাহিনীর ও অন্য নাগরিকদের বিপুলসংখ্যককে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ হতে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করা ভিন্ন অন্য কোন প্রস্তাবই তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তার একথায় সকলেই সন্তুষ্ট হয়। সে আরো জানায় যে, ভারত থেকে আমরা অস্ত্র ও গোলাবারুদ পেলেই সংগ্রামের দিন স্থির করা হবে। সে আরো বলে, পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ লোক ঐদিন আমাদের পেছনে থাকবে।

ভারতে প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যবস্থা

এরপর শেখ মুজিবর রহমান ও লেঃ মোয়াজ্জেম অপর একটি কামরায় কিছুক্ষণের জন্য যান। প্রায় পনের মিনিট পর তারা ফিরে এলে লেঃ মোয়াজ্জেম জানান যে, ভারত সরকারের সাথে অস্ত্র সরবরাহ ব্যাপারে আলোচনার জন্য হাবিলদার দলিলউদ্দীন ও জয়দেবপুরের ক্যাপ্টেন ভারতে যাবে।

রাঙ্গামাটিতে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং

এরপর লেঃ মোয়াজ্জেম জানান যে, হাবিলদার দলিলউদ্দীন ও এল এম সুলতানউদ্দীনকে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে গেরিলা যুদ্ধের শিক্ষাদান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা হবে এবং অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার পর সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন লোকদের দ্বারা ব্যবহার করা হবে। জনাব তাজউদ্দীন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না।

এরপর সাক্ষীকে আরেকখানা চিঠি দেওয়া হয়।

সাক্ষী বলেন, এখানাও লেঃ মোয়াজ্জেমের স্বহস্তে লিখিত তার কাছে লেখা আরেকখানা চিঠি। চিঠির শেষে কোন নাম নেই।

১৯-৩-৬৬ তারিখে এ চিঠিখানা লেখা।

সাক্ষীকে এর ইংরেজী অনুবাদের কপি দিয়ে অনুবাদ পরীক্ষা করতে বলা হয়। সাক্ষী অনুবাদ ঈষৎ সংশোধন করেন। সাক্ষী বলেন, চিঠিতে "রহমান" বলতে জনাব আহমদ ফজলুর রহমানকে, "শফী" বলতে লেঃ মোয়াজ্জেমের জনৈক প্রাক্তন পরিচারককে, "ইন্সট্রুমেন্ট" বলতে পিস্তলকে বোঝানো হয়েছে। এছাড়া "আমি বুঝতে পারছি না ব্যবসার অবস্থা কি" অর্থ পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের অবস্থা জানতে চাওয়া হয়েছে।

সাক্ষী বলেন, এর উত্তরে আমি অবস্থা লিখে তাকে জানিয়েছিলাম এবং তার বদলীর ব্যাপারে জানিয়েছিলাম। চিঠিতে "নাম" পাঠাবার যে কথা বলা হয়েছে তা সম্ভবতঃ ভাল সৎ লোকদের নাম সে পাঠাবে বুঝিয়েছে। জনাব এ এফ রহমান আমাকে জানিয়েছিলেন যে, সে লেঃ মোয়াজ্জেমের কাছ হতে বদলীর ব্যাপারে ট্রাঙ্ককল পেয়েছেন। চিঠির পুনশ্চতে 'জিনিসপত্র' বলতে যা বলা হয়েছে তা অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে।

তারপর বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির সাক্ষীর হাতে দু'খানা প্রামাণ্য কাগজ দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি এগুলো চিনতে পারছেন কিনা এবং এই কাগজপত্রগুলো কি সংক্রান্ত?

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সালের ৩০ শে মার্চ আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট হতে একখানা পত্র পাই। এই পত্র আমাকে ও জনাব আহমদ ফজলুর রহমান সাহেবকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। আমি ঐদিনই পত্র জনাব আহমদ ফজলুর রহমান সাহেবকে প্রদান করি। পত্রে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন টাকা চেয়েছেন। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান আমাকে পরদিন টাকা তার কাছ নেবার জন্য বলেন। সে অনুসারে আমি পরদিন তার নিকট হতে নগদ ৫ হাজার ৫শ টাকা গ্রহণ করি। তারপর আমি ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানের জিন্নাহ এভিনিউস্থ শাখা অফিসে গমন করি। সেখান হতে আমি দরখাস্ত করে এই ড্রাফট সংগ্রহ করি। এই বলে সাক্ষী উক্ত ড্রাফট এবং দরখাস্ত সনাক্ত করেন। কাদির–এই কাগজগুলো দেখে বলুন, আপনি এতে স্বাক্ষর করেছেন কিনা?

সাক্ষী–দরখাস্তে আমার দস্তখত আছে–ড্রাফটে নয়।

লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট পাঠাবার জন্য আমি আবেদনপত্র নিজ হাতে তার নাম লিখেছি। লেঃ মোয়াজ্জেম পত্রের সঙ্গে একটা চিরকুট পাঠান। এটা আমি আমার কাছে রেখে দেই।

এই সময় কৌসুলী সাক্ষীর একহাতে এক টুকরা ছোট্ট কাগজ দিলে সাক্ষী বলেন যে, এটাই হচ্ছে সেই চিরকুট।

তিনি বলেন যে, চিরকুটে বলা হয়েছে "টাকা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠাও।"

আমাকে জনাব এ এফ রহমান যে টাকা দিয়েছেন তা থেকে ৫ হাজার টাকা লেঃ মোয়াজ্জেমের নামে করাচীতে পাঠাই। বাকী ৫শ টাকা আমাদের খরচের জন্য রেখে দেই।

সাক্ষী আমির হোসেন বলেন, ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে লেঃ মোয়াজ্জেমের নিকট হতে আমি আরেকটি পত্র পাই। ঐ পত্র অনুসারে আমি শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ী যাই। ঐদিন ছিল কোরবানীর ঈদের দিন। আমার সঙ্গে ছিলেন স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান। তাকে ট্রাঙ্ককল করে আমি ঢাকা আনিয়েছিলাম।

আমরা শেখ মুজিবর রহমানকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করাই। এরপর আমি টাকা চাই। তিনি পাশের একটি কক্ষে গিয়ে সেখান থেকে ৪ হাজার টাকা এনে আমার সামনে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে প্রদান করেন। পরে এই টাকা স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমাকে দেন। এরপর আমি স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে আরও অর্থ সংগ্রহের জন্য

পাঠাই, এই টাকা কার কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে তা আমি বলিনি। ২/৩ ঘণ্টা পর স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ২ হাজার টাকা নিয়ে এসে হাজির হন। এই টাকা কে প্রদান করেছে জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, জনাব রুহুল কুদ্দুসের নিকট হতে তিনি এই টাকা এনেছেন। ঐদিন সন্ধ্যায় আমি ৬ হাজার টাকা স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের হাতে দিয়ে তাকে চট্টগ্রাম পাঠাই। এই টাকা লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে দেওয়ার জন্য আমি তাকে নির্দেশ প্রদান করি।

এরপর বাদীপক্ষের কৌশুলী সাক্ষীকে আরেকখানা পত্র প্রদান করেন।

সাক্ষী বলেন, আমি এই পত্র পেয়েছিলাম। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন "উল্কা" বলে আমাকে এই পত্রে সম্বোধন করেছেন। এই পত্রে ১-৪-৬৬নং তারিখ লেখা আছে। আমি ৪-৪-৬৬নং তারিখে খামসহ এই পত্র পেয়েছি। এই পত্র আমির হোসেন মিয়া ১০৭নং দীননাথ সেন রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা-৭ এ ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। আমি ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে অথবা মার্চ মাসের প্রথমভাগে এই ঠিকানায় চলে আসি। আমি নিজে থাকবার জন্য এই বাড়ী ভাড়া নেই। এই বাড়ীতে একটি টেলিফোন ছিল। তার নম্বর হচ্ছে ৮২৪৫২।

এরপর সাক্ষী উক্ত পত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, পত্রে "দ্রব্যাদি" বলতে অস্ত্রশস্ত্রের কথা বলা হয়েছে। "রহমান এখানে" আহমদ ফজলুর রহমানের কথা বলা হয়েছে। "ট্রেড" বলতে পত্রে আন্দোলনের জন্য অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ক্রয় বুঝান হয়েছে।

শেয়ার হোল্ডার

"পত্রে শেয়ার হোল্ডার" বলতে শেখ মুজিবর রহমান, জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও মানিক চৌধুরীর কথা বলা হয়েছে। "নিউ শেয়ার হোল্ডার" বলতে যে সমস্ত ব্যক্তি টাকা দিতে সম্মত হবেন তাদের বুঝান হয়েছে।

এরপর কৌসুলী সাক্ষীকে আরেকখানা পত্র প্রদান করেন।

সাক্ষী বলেন, এই পত্রে ৬-৪-৬৬নং তারিখ রয়েছে। লেঃ মোয়াজ্জেমের নিকট হতে আমি এই পত্র পেয়েছি। এই পত্রে আমাকে লেখা হয়েছে যে, লেঃ মোয়াজ্জেম নিজ হাতে উক্ত পত্র লিখেছেন।

এরপর সাক্ষী পত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, এখানে যে "শফির" কথা বলা হয়েছে সে হচ্ছে লেঃ মোয়াজ্জেমের বাড়ীর চাকর। যে "ড্রাফটের" কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে উক্ত ৫ হাজার টাকার "ড্রাফট" যা আমি লেঃ মোয়াজ্জেমকে পাঠিয়েছি। "রহমান সাহেব" হচ্ছেন জনাব আহমদ ফজলুর রহমান।

সাক্ষী বলেন, পত্রে "দ্রব্যাদি" হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র এবং "ব্যবসায়" বলতে এখানে আন্দোলন- এর কথা বলা হয়েছে। "প্ল্যানটেশন" এর অর্থ হচ্ছে যেখানে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ রাখা হবে। "পুরাপুরি" কথার অর্থ হচ্ছে আমাকে তারা অস্ত্রশস্ত্রের যে তালিকা দিয়েছেন সে অনুসারে হতে হবে। "খালিদ" হচ্ছেন নৌবাহিনীর প্রাক্তন কমোডোর খালেদ জামিল।

এই স্থানের দ্রব্যাদি অর্থ হচ্ছে আমি লেঃ মোয়াজ্জেমকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপজাতীয় এলাকা হতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের পরামর্শ দিয়েছিলাম।

এরপর বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির সাক্ষীর হাতে একখানা টেলিগ্রাম ও খাম প্রদান করেন। সাক্ষী বলেন যে, আমি ৭-৪-৬৬নং তারিখে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট হতে এই তারবার্তা পেয়েছি। তিনি তারবার্তায় আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি চট্টগ্রামে বদলী হয়েছেন।

কাদির–এই তারবার্তা পাওয়ার পর আপনি কি করলেন?

সাক্ষী–আমি জনাব আহমদ ফজলুর রহমান ও জনাব কে জি আহমদের নিকট গমন করি এবং তাদেরকে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বদলীর খবর তাদেরকে জানাই।

এরপর বাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীকে আরেকখানা পত্র প্রদান করেন। সাক্ষী পত্র দেখে বলেন যে, আমি এই খামে উক্ত পত্র পেয়েছি। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে এই পত্র লিখেছেন। পত্রে ৮-৪-৬৬নং তারিখ রয়েছে।

সাক্ষী পত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন এখানে যে "তুষার"-এর কথা বলা হয়েছে তিনি হচ্ছেন জনাব আহমদ ফজলুর রহমান এবং "মা" হচ্ছে লেঃ মোয়াজ্জেমের কন্যা "শিপু"। তার বয়স ৪ বছর। আদর করে তাকে মা বলে ডাকা হত।

সাক্ষী বলেন, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৬৬ সালের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ঢাকা আগমন করেন। সঠিক তারিখ আমার মনে নেই। তিনি বলেন, সম্ভবত ১৯৬৬ সালের ২৩শে এপ্রিল বিধানচন্দ্র সেন এবং ডাঃ শায়েদুর রহমান আমার বাড়ী আসেন।পরদিন অর্থাৎ ২৪শে এপ্রিল এরা দুজন ও আমি জয়দেবপুরে গিয়েছিলাম। আমাদের আন্দোলনের জন্য যে সমস্ত সামরিক কর্মচারী কাজ করছিলেন তাদেরকে দেখাবার জন্যই এদের নিয়ে জয়দেবপুর গিয়েছিলাম। সেখানে ২/৩ জনের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাদের নাম আমার মনে পড়ছে না। তাদের সঙ্গে চা খেয়ে আমরা ঢাকা ফিরে আসি। আদালত সাক্ষীকে তাদের নাম বলতে বলেন এবং তাদের নাম কেন মনে পড়ছে না জানতে চাইলে সাক্ষী বলেন, সুলতানউদ্দীন আহমদ আমাকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এখন তাদের নাম আমি ভুলে গেছি।

হিসাব নিয়ে বচসা ও দল ত্যাগ

এরপর সাক্ষী বলেন, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন বদলী হয়ে ঢাকা আগমন করেন। তিনি আমার ১০৭নং দীননাথ সেন রোডের বাড়ীতে আগমন করেন। আমি আন্দোলনের জন্য যে অর্থ পেয়েছি তিনি সে সম্পর্কে জানতে চান। আমি তাকে টাকার হিসাবপত্র প্রদান করি এবং তাকে আমি যে টাকা পাঠিয়াছি তার হিসাব দিতে বলি। এনিয়ে আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। তিনি যে টাকা ব্যয় করেছেন তার যথার্থতা তিনি প্রমাণ করতে না পারার দরুনই ঝগড়া হয়। ঐদিন বিকেলে আমি ডাঃ খালেকের বাড়ী 'আলেয়া'য় গমন করি এবং মোয়াজ্জেমের নিকট নগদ ৮ হাজার টাকা কতিপয় ভাউচার ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রদান করি। আমি তাকে জানাই যে, আমি প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করলাম। ঐ সময় তিনি আমাকে পনরশ টাকা দেন। আমি যে বাড়ীতে থাকতাম তার ভাড়া পরিশোধ করার জন্য এই অর্থ দান করেন।

হত্যার হুমকি

সাক্ষী আমির হোসেন বলেন, এরপর লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে, আমি যদি এই আন্দোলন সম্পর্কে কোন কথা উচ্চারণ করি তবে আমাকে মেরে ফেলা হবে। তিনি প্রাক্তন কর্পোরাল সামাদ ও স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে নির্দেশ দেন আমার ওপর দৃষ্টি রাখার জন্য। তারা উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিল। এরপর আমি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করি। আমি কতিপয় চিঠি এবং ২/৩ খানা ডায়েরি আমার কাছে রেখে দেই।

সাক্ষী বলেন, আমাকে ১৯৬৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর গ্রেফতার করা হয়। আমি এ সকল কাগজপত্র আমার অফিসের (সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস ২৮, নয়া পল্টন) স্টোর রুমে রেখে দেই।

সাক্ষীকে কৌসুলী এই সময় একটা চিরকুট প্রদান করেন। সাক্ষী বলেন, এই চিরকুট আমার হাতের লেখা। গ্রেফতারের পর আমাকে রাজারবাগে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। যে পুলিশ অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন তাকে আমি জানাই যে, আমার কাছে কতিপয় দলিল আছে।

তিনি বলেন, ডিএসপি মান্নাফ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। আমি তাকে এই চিরকুট প্রদান করি। এই চিরকুট আমার অফিসের চৌকিদার রহমত আলীকে সম্বোধন করে লিখেছিলাম। এতে লেখা আছে আমার ভালবাসা নিও।এই পত্র বাহকের নিকট একটা বড় ডায়েরী ও একটা ছোট ডায়েরী দিয়ে দিও। এতে আরও বলা হয়েছে যে, আমার হ্যান্ড ব্যাগ হতে যেন ডায়েরী দিয়ে দেওয়া হয়। এতে আরও বলা হয় যে, আমার এটার প্রয়োজন হয়েছে আমি এক প্রকার, তোমারই আমির হোসেন।

এরপর কৌসুলী সাক্ষীকে আরেকখানা কাগজ দিয়ে ওটা কি তা বলতে বলেন। সাক্ষী বলেন, ঢাকা আগমনের পর আমি স্টাটিসটিক্যাল অফিসারের নিকট কাজে যোগদানের যে রিপোর্ট দিয়েছিলাম এটা সেই রিপোর্ট। এতে ৩-২-৬৬ তারিখ রয়েছে।

এরপর কৌসুলী সাক্ষীর হাতে আরেকখানা কাগজ দিয়ে ওটা কি সম্পর্কিত তাও বলতে বলেন। সাক্ষী বলেন, আমার করাচী গমন সম্পর্কিত অফিসের ডিলিং এ্যাসিসট্যান্টের রিপোর্ট এতে রয়েছে।

এরপর কৌসুলী সাক্ষীকে একখানা টেলিগ্রাম দিয়ে বলেন যে, তিনি এটা পেয়েছিলেন কিনা। সাক্ষী বলেন, আমি লেঃ মোয়াজ্জেমের নিকট হতে এই টেলিগ্রাম পেয়েছি। এই টেলিগ্রামে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ সাল লেখা আছে। তারবার্তায় বলা হয়েছে– "উদ্বিগ্ন আছি– পরিস্থিতি তারবার্তা করে জানাও" লেঃ মোয়াজ্জেমের বদলী সম্পর্কে খবর জানবার জন্য এই তারবার্তা পাঠান হয়েছে। তারবার্তায় প্রেরকের নাম দেওয়া হয়েছে "আলো"। আলো হচ্ছেন লেঃ মোয়াজ্জেম।

এরপর কৌসুলী সাক্ষীর কাছে একটি হ্যান্ড ব্যাগ প্রদান করেন। সাক্ষী বলেন, এটা আমার হ্যান্ড ব্যাগ। আমি আমার অফিসের স্টোর রুমে এই ব্যাগ, ডায়েরী ও চিঠিপত্র রেখেছিলাম। এটা তালাবদ্ধ ছিল। ডিএসপি চাওয়ার পর আমি তাকে তালার চাবি প্রদান করি।

সাক্ষী বলেন, এরপর কেন্দ্রীয় কারগার হতে হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি স্বীকারোক্তি করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করি। এরপর লেঃ শরীফ আমার কক্ষে... আমি তাকে আমার স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার ব্যবস্থা করার জন্য বলি। ২/৩ দিন পর তিনি সিগন্যাল মেসের ভিআইপি কক্ষে নিয়ে যান। তিনি আমাকে জি এম কাদরীর নিকট নিয়ে ... তাকে আমার নিকট প্রথম... ম্যাজিস্ট্রেট বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে সাবধান করে দিয়ে এ ব্যাপারে চিন্তা করার সময় দেন। এক ঘণ্টা পর আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করি। তিনি আমার স্বীকারোক্তি রেকর্ড করে আমাকে পড়ে শুনান তারপর আমি স্বাক্ষর করি। তারপর একদিন মেজর এ বি নাসের আমার নিকট এসে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি একরারী সাক্ষী হতে রাজী আছি কিনা। আমি তাতে রাজী হই। ১৯৬৮ সালের ২৩শে মে আমাকে সিগন্যাল মেসে এডিসির নিকট হাজির করা হয়। সত্য কথা বলব এ সর্তে তিনি আমাকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন।

এরপর কৌসুলী সাক্ষীর নিকট একখানা মানচিত্র প্রদান করে তা তিনি চিনতে পেরেছেন কিনা জানতে চান। সাক্ষী বলেন, আমি যখন করাচী হতে ঢাকা রওয়ানা হই তখন লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে এই মানচিত্রটি প্রদান করেন। আজ বুধবার একরারী সাক্ষী আমির হোসেনের জেরা শুরু হবে।

Pakistan Observer

8th August 1968

Williams calls on Mrs. Mujib

Mr. Thomas Williams, Q. C, Member of the Parliament, accompanied by Mr. Amirul Islam Advocate called on Mrs. Sheikh Mujibur Rahman at her Dhanmondi residence on Wednesday evening in connection with the defence of Mr. Sheikh Mujibur Rahman, President, East Pakistan Awami League now under trial in the conspiracy case.

Mr. Williams, who has arrived in Dacca in connection with the defence of Mr. Sheikh Mujibur Rahma, is likely to leave for UK on Thursday and is expected back during the last stage of the case.

Dawn

8th August 1968

'Sk Mujib gave money twice in Sept. 1965'

Approver says he retained letters for writing biography

From MAHBUBUL ALAM

DACCA, Aug 7: Cross-examined by the Defence Counsel Mr. Thomas Williams, approver Amir Husain Mian told the Special Tribunal in the Agartala Conspiracy case today that he had himself never tried to contact any foreign official in connection with their movement.

The witness said Lt. Comm. Moazzam had told him that Sheikh Mujibur Rahman and Mr. Ahmed Fazlur Rahman, CSP, would contact these Embassies and that he would be informed. In reply to a question by Mr. Thomas Williams, the witness said no one from these Embassies contacted him personally.

He told the court that in June or July, 1965 Lt Comm. Moazzam had introduced him to the Assistant Naval Attache of a foreign embassy in Karachi.

After cross-examination by Mr. Thomas Williams, the witness was cross-examined by Mr. Abdus Salam Khan, Defence Counsel. The cross-examination was still continuing when the court rose for the day.

In reply to further question during the cross-examination by Mr. Williams, Amir Husain Mian told the court that he was present only once when Sheikh Mujibur Rahman paid Rs 4,000 to Steward Mujib.

Sheikh Mujib also paid money to Steward Mujib and Sultanuddin on other occasions, the witness said.

Mr. Williams asked the witness if it was correct that no threat was given to him by accused Moazzam after he had ended his connection with the movement. The witness replied that it was wrong that he was not threatened by Lt. Comm. Moazzam when he left the organisation. "In fact no harm was done to me in the execution of the threat issued to me by Moazzam", the witness said.

Mr. Amir Husain said he was arrested at Dacca airport on Dec 13, 1967, on his return from Karachi. He said he was first taken to the Dacca Central jail and from there to Rajarbagh for questioning. He said the Deputy Superintendent of Police Mr. Mannaf and one or two others interviewed him for questioning . Lt. Sharif or Maj. Hasan were not there, the witness said in reply to a question.

Referring to a chit he had given to a Police officer at Rajarbagh, the Defence Counsel asked the witness whether he remembered when he gave the chit for bringing one big diary and the small pocket diary and that there were letters also in the same bag. The witness replied that at that time he did not remember.

He told the counsel in reply to a question as to why he had kept these letters (letters that he said, he had received from accused Moazzam and others), the witness said he had kept these letters in order to write his biography. The letters would have given a picture of his activities.

Question : You are lying on the point that you got the letters.
Answer: It is not true.
Question: You knew the Diaries were dangerous. Why did you keep them?
Answer: I can't say why I kept them.
Question: Did you keep any other thing for your biography?
Answer: I had kept records of papers of service for the biography.

The witness said he had these things in a bag in the office because he thought it was a safe place. He thought it was safer than his house. The counsel suggested: all your evidence in regard to this are a pack of lies.

Answer : It is not true that they are so.

The witness said in reply to a question that it was incorrect to say that he had never met Sheikh Mujibur Rahman.

Asked if he saw any arms and ammunition, the witness said during his association with the organisation he never saw any arms and ammunitions.

Amir Husain Mian said during the Indian war of September 1965 Sheikh Mujib gave money twice for the organisation. Nobody else dies anything to help India win the war.

The witness told the court that during his military service he had nothing to do with transistorised transmitter. Cross-examined further the witness said he had not seen a transistorised transmitter. He said Mr. Ahmed Fazlur Rahman had written to his brother in London to go to a shop and buy a transmitter. A suggestion was made the witness said, that those transistorised transmitters would be brought through a PIA steward whom Lt. Comm. Mmoazzam knew.

Question: Was there any mention of any licence?
Answer: No.

The witness said he did not know if anyone could buy transistorised transmitters in London without a licence.

In reply to a question the witness said it was not corrcct to say that he was the kind of person to say anything against anybody to save his skin.

After cross-examination by Mr. Thomas Williams, Mr. Abdus Salam Khan began his cross-examination. Mr. Khan was still cross-examining the witness when the tribunal rose for the day.

The witness will be further cross-examined tomorrow.

APP adds: As the Tribunal today sat for the day's hearing the Chief Prosecution Counsel. Mr. Manzur Qadir, said that in view of the objection raised by the defence he had advised Maj. Hasan not to be present in the court room when the approvers were being examined. He said that though Maj. Hasan was not associated with the investigation of the case he was associated with the investigation team. He had advised Maj. Hasan not to be present in the court room "in deference to the nature of objection by the defence" though technically he could argue on the point.

The Chairman of the Tribunal sometime last week had asked Maj. Hasan to leave the court room at the request of the .... defence counsel who had submitted that his (Maj. Hasan) presence in the court might prevent the approver-witnesses from deposing freely.

সংবাদ

৮ই আগস্ট ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাজসাক্ষী আমীর হোসেনের জেরা শুরু

বিবাদী পক্ষীয় কৌঁসুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর আচরণে উত্তেজনা ও বাক-বিতণ্ডা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য (বুধবার) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হইলে আলোচ্য মামলার প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থনকারী প্রখ্যাত বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়ামস কিউ-সি ২

নম্বর রাজসাক্ষী জনাব আমীর হোসেন মিয়াকে জেরা করিতে শুরু করেন। মিঃ উইলিয়ামস তাঁহাকে প্রায় আড়াই ঘণ্টাব্যাপী জেরা করার পর বিবাদীপক্ষীয় অন্যতম প্রধান কৌঁসুলি জনাব সালাম খান জেরা করিতে শুরু করেন।

কৌঁসুলি জনাব সালাম খান জেরার শুরুতে রাজসাক্ষী জনাব আমীর হোসেন মিয়াকে কয়েকটি বিশেষ ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ইহাতে সংশ্লিষ্ট রাজসাক্ষী উত্তেজিত হইয়া এবং বিবাদীপক্ষীয় কৌঁসুলির ঐসব প্রশ্নে আপত্তি জানাইয়া স্বাভাবিকের অতিরিক্ত উচ্চকণ্ঠে জবাব দিতে শুরু করেন। এই পর্যায়ে বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলিগণ আদালতকক্ষে রাজসাক্ষী এহেন আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

রাজসাক্ষী জনাব আমীর হোসেন ও বিবাদীপক্ষীয় কৌঁসুলিদের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য বিনিময় হইতে থাকে। আদালতকক্ষে উপস্থিত বিবাদীপক্ষ সমর্থনকারী কৌঁসুলিগণ রাজসাক্ষীর আপত্তিকর আচরণের প্রতিবাদে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান। অতঃপর ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়াকে বিবাদীপক্ষীয় কৌঁসুলির নিকট স্বীয় আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে নির্দেশ দেন এবং রাজসাক্ষী উহা মান্য করেন।

গতকাল (বুধবার) প্রখ্যাত বৃটিশ আইনবিদ ও ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমানের প্রধান কৌঁসুলি টমাস উইলিয়ামস কিউ,সি,তৃতীয় সরকারী সাক্ষী ও দ্বিতীয় রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়াকে সর্বপ্রথম জেরা শুরু করেন।

মিঃ টমাস উইলিয়ামসঃ মিয়া সাহেব, আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু বলুনত? আপনি কি বিয়ে করেছেন?

আমীর হোসেন ঃ জ্বী হ্যাঁ, আমি বিবাহিত।

প্রশ্ন ঃ আপনার কোন ছেলে পেলে আছে?

উত্তর ঃ না, আমার কোন ছেলেমেয়ে নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনি কোথায় থাকতেন?

উত্তর ঃ বিমান বাহিনীর চাকুরীর পর আমি ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অফিসে কাজ নেই। সেসময় আমি করাচীর জাহাঙ্গীর রোডে থাকতাম।

প্রশ্ন ঃ কতদিন থেকেছেন সেখানে?

উত্তর ঃ ১৯৬৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত।

প্রশ্ন ঃ তারপর কোথায় গেলেন?

উত্তর ঃ ওখান থেকে আমি ঢাকায় বদলি হই।

প্রশ্ন ঃ ঢাকায় কোথায় থাকতেন?

উত্তর ঃ ঢাকায় এসে আমি ঢাকা হোটেলে উঠি। সেখানে ১৯৬৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ তারপর সেখান থেকে কোথায় গেলেন?

উত্তর ঃ চট্টগ্রামে।

প্রশ্ন ঃ সেখানে কত দিন ছিলেন?

উত্তর ঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত।

প্রশ্ন ঃ তারপর কি ঢাকায় ফিরে এসেছিলেন?

উত্তর ঃ জী হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ ঢাকায় ফিরে এসে কোথায় উঠলেন?

উত্তর ঃ আরজু হোটেলে।

প্রশ্ন ঃ এই শেষোক্ত হোটেলে আপনি কত দিন থেকে ছিলেন?

উত্তরঃ যতদূর আমার মনে পড়ে ১৯৬৬-এর ফেব্রুয়ারীর শেষ নাগাদ অথবা মার্চের প্রথম দিক পর্যন্ত।

প্রশ্ন ঃ সেখান থেকে আপনি কোথায় গেলেন?

উত্তর ঃ আরজু হোটেল থেকে গিয়ে ১০৭ নম্বর দীননাথ সেন রোড, ঢাকার ঠিকানায় একটা ভাড়াটে বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

প্রশ্ন ঃ এ বাড়ীটা কার ছিল?

উত্তর ঃ জনাব হারুন-অর-রশীদ নামের জনৈক এসিষ্ট্যান্ট সেশন জজের।

প্রশ্ন ঃ কি করে জানলেন যে, বাড়ীর মালিক তাঁর বাড়ী ভাড়া দেবেন?

উত্তর ঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের কাছ থেকে সেটা জেনেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ এর আগে আপনি বাড়ীর মালিককে চিনতেন?

উত্তর ঃ না। এর আগে আমি বাড়ীর মালিককে জানতাম না।

প্রশ্ন ঃ বাড়ীটা ভাড়া নেওয়ার কে ব্যবস্থা করল?

উত্তর ঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও বি,টি,জেড,এইচ চৌধুরী ঘরটা নেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

প্রশ্ন ঃ বাড়ীটা ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে আপনার কোনই হাত ছিল না?

উত্তরঃ না,আমার হাত ছিল না।

ইহার পর বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি টমাস উইলিয়ামসের অপর এক প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া বলেন যে, তিনি ১৯৬৬ সালের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে অথবা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে দলের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

টমাস উইলিয়ামসঃ তার মানে এই বাড়ীতে আসার অল্প কিছুদিন বাদেই?

উত্তর ঃ জী হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ লেঃ মোয়াজ্জেম কি আপনাকে সেজন্য হুঁশিয়ারি জানিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ তাহলে তিনি আপনাকে দল ছেড়ে দেওয়ার জন্য ভয় দেখাননি?

উত্তর ঃ তিনি আমাকে ভয় দেখাননি, একথা ঠিক নয়।....

প্রশ্ন ঃ এই ভয় দেখাবার পর বাস্তবে কি তিনি কিছু করেছেন?
এই সময় সাক্ষী কৌসুলির কথা বুঝিতে পারিতেছেন না বলিয়া জানান। কৌসুলি তখন তাঁহাকে বলিলেনঃ "মিয়া সাহেব, আমার প্রশ্নগুলো ভালো করে শুনুন। বুঝতে না পারলে আবার জিজ্ঞাসা করুন।"
তারপর কৌসুলী আবার প্রশ্নটি পুনরোক্তি করিলেন। তাহার উত্তরে রাজসাক্ষী জানাইলেনঃ
আসলে লেঃ মোয়াজ্জেম যা বলে আমাকে ভয় দেখিয়েছিলেন সে অনুযায়ী আমার কোন ক্ষতি তিনি করেননি।
ইহার পর মিঃ উইলিয়ামস সাক্ষীকে পি ডব্লিউ ৩/৫৯ চিহ্নযুক্ত একটি দলিল দেখাইয়া বললেনঃ মিয়া সাহেব, দলিলটি নিশ্চয়ই চিনতে পারছেন। এর কারণ কি?
উত্তর ঃ আমি বলতে পারি না।
প্রশ্ন ঃ করাচীতে আপনাকে ডেকে পাঠানোর কারণটা আপনি কখন জানতে পারলেন?
উত্তর ঃ ১৯৬৭-এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমার অফিসার ইন-চার্জ আমাকে জানান যে, করাচীতে আলোচনার জন্য ডিরেক্টর জেনারেল আমাকে চাচ্ছিলেন।
প্রশ্ন ঃ কখন আপনি ডেকে পাঠানোর কারণ জানলেন?
উত্তর ঃ করাচীতে গিয়ে।
প্রশ্ন ঃ সেখানে গিয়ে কি আলোচনা হল?
উত্তর ঃ আলোচনাটা ছিল ফিল্ড ষ্টাফদের ট্রেনিং সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে।
প্রশ্ন ঃ করাচীতে আপনি কতদিন ছিলেন?
উত্তর ঃ ৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৩ই ডিসেম্বর সকাল পর্যন্ত।
প্রশ্ন ঃ আপনি কি রাওয়ালপিণ্ডি গিয়েছিলেন?
উত্তর ঃ না, যাইনি।
প্রশ্ন ঃ আপনি কি কখনো রাওয়ালপিণ্ডি গিয়েছিলেন?
উত্তর ঃ ১৯৫৩ সালে কোহাটে যাওয়ার পথে করাচী থেকে আমি রাওয়ালপিণ্ডি গিয়েছিলাম।
অতঃপর মিঃ উইলিয়ামস তাঁহার গ্রেফতার সম্পর্কে জেরা শুরু করেন।
সাক্ষী আমীর হোসেন উত্তরে বলেন যে, করাচী থেকে ফিরে আসার সময় ১৩ই ডিসেম্বর ঢাকা এয়ারপোর্টে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়।
মিঃ টমাস উইলিয়ামসঃ ঢাকায় এলে গ্রেফতার হবেন এরকম সন্দেহ ... আপনার হয়েছিল?
উত্তর ঃ না, আমার কোন সন্দেহ ছিল না।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে কারা গ্রেফতার করল?
উত্তর ঃ ২ জন সাদা পোশাক পরিহিত পুলিস আমাকে দেশরক্ষা আইনবলে গ্রেফতার করেন।
প্রশ্ন ঃ তারা কি বলল?
উত্তর ঃ আমি তাদের জিজ্ঞাসা করায় তারা বলল, তারা কিছু জানে না।
প্রশ্ন ঃ তারপর কি আপনাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়?
উত্তর ঃ হ্যাঁ।
প্রশ্ন ঃ মিয়া সাহেব, এবার বলুন তো পরের দিন সকালে কি আপনি আপনার অফিস হতে চিঠিপত্র ও ডাইরী আনার জন্য পুলিসকে একটা চিরকুট দিয়েছিলেন?
উত্তর ঃ ১৩ই ডিসেম্বর জেলে আমার নাম লিপিবদ্ধ হওয়ার পর আমাকে রাজারবাগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয়। তারপরের দিন সকালবেলা আমি পুলিসের হাতে এই (পিডব্লু ৩/৫৭) চিরকুটটা দিই।
প্রশ্ন ঃ সে রাত্রে কি হল?
উত্তর ঃ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল।
প্রশ্ন ঃ কতক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ চলে?
উত্তর ঃ ২/৩ ঘণ্টা।
এই সময় কৌসুলি মিঃ উইলিয়ামস রাজসাক্ষী আমীর হোসেনকে জিজ্ঞাসা করেন, "মিয়া সাহেব, এই জিজ্ঞাসাবাদের সময়ই কি আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?
উত্তর ঃ কারো সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রশ্নই উঠতে পারে না।
প্রশ্ন ঃ তাহলে এই সময়ে কি আপনি পুরো স্বীকারোক্তি করবেন বলে ঠিক করেছিলেন?
রাজসাক্ষী মিঃ উইলিয়ামসের এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পূর্বে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান প্রশ্নটি নাকচ ঘোষণা করেন।
মিঃ উইলিয়ামস পুনরায় প্রশ্ন করেন।
"জিজ্ঞাসাবাদের কতক্ষণ পর আপনি পুলিস অফিসারের হাতে এই চিরকুটটি দিয়েছিলেন?"
উত্তর ঃ পরদিন ১৪ই ডিসেম্বর সকালে। তখন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল না।
প্রশ্ন ঃ কোন পুলিস অফিসার আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?
উত্তর ঃ ডি,এস,পি মান্নাফ ও আরো একজন কি দু'জন।
প্রশ্ন ঃ তাঁদের মধ্যে লেঃ শরীফ ছিলেন?
উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ মেজর হাসান ছিলেন?
উত্তর ঃ না।
প্রশ্ন ঃ কার হাতে আপনি চিরকুটখানি দিয়েছিলেন?
উত্তর ঃ ডি,এস,পি, মান্নাফের হাতে।
কৌসুলি ইহার পর সাক্ষীর হাতে চিরকুটখানি প্রদান করিয়া বললেনঃ এটা ভালো করে দেখুন। এর মধ্যে আপনি শুধু একটা বড় ডাইরী ও একটা পকেট ডাইরীর কথা বলেছেন–এতে আপনার চিঠিগুলোর কোন উল্লেখ নেই। ঠিকত?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, ঠিক।
প্রশ্ন ঃ তখন কি আপনার মনে ছিল যে, ব্যাগের মধ্যে আপনার চিঠিগুলো আছে?
উত্তর ঃ না, আমার মনে ছিল না।
প্রশ্ন ঃ কবে থেকে ওই চিঠিগুলো রাখা ছিল?
উত্তর ঃ ১৯৬৬ সালের মে মাস থেকে।
প্রশ্ন ঃ কেন রেখেছিলেন?
উত্তর ঃ আমি ভেবেছিলাম, বুড়ো বয়সে আমি হয়ত আমার আত্মজীবনী লিখব।
তখন হয়ত দরকার পড়বে।
প্রশ্ন ঃ ওগুলো কি সবই আপনার আত্মজীবনী লেখার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন?
উত্তরঃ না, সব নয়।
প্রশ্নঃ তাহলে কোনগুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন?
উত্তর ঃ আমার কার্যকলাপের বিবরণ যে চিঠিতে আছে সেগুলোই আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।
প্রশ্ন ঃ আপনি কি জানতেন না যে, ওগুলো পুলিসের হাতে পড়া খুব বিপজ্জনক?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, জানতাম।
প্রশ্ন ঃ তাহলে আপনি চিঠির কথা ভুলে গিয়েছিলেন, তা মিথ্যা কথা?
উত্তর ঃ না, মিথ্যা নয়।
প্রশ্ন ঃ ডাইরীগুলো যে বিপজ্জনক তা আপনি জানতেন?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, জানতাম।
প্রশ্ন ঃ এটা জেনেশুনে তা হলে রেখেছিলেন কেন?
উত্তর ঃ বিপজ্জনক জেনেও আমি আমার আত্মজীবনীর জন্যে রেখেছিলাম।
প্রশ্ন ঃ মিয়া সাহেব, আপনি যখন ডাইরীগুলোর কথা পুলিসকে বলেন এবং সেগুলো সংগ্রহের জন্য তাদের হাতে চিরকুটটা দেন, তখন কি আপনি পুলিসের সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন?

উত্তর ঃ জী না।
প্রশ্ন ঃ ডাইরী ছাড়া ব্যাগে আর কি ছিল?
উত্তর ঃ আমার মনে ছিল না।
প্রশ্ন ঃ আপনার আত্মজীবনীর জন্য আর যেসব জিনিস দরকারী সেসব আপনি কোথায় রাখতেন?
উত্তর ঃ বিমান বাহিনীতে চাকুরীর রেকর্ডগুলো আমি এই ব্যাগে রেখেছিলাম। পুলিস সেগুলো পেয়েছে আমাকে কখনো বলেনি।
প্রশ্ন ঃ ওরকম গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনি ওখানে রেখেছিলেন কেন?
উত্তর ঃ অফিস আমার আরও নিরাপদ বলে।
প্রশ্ন ঃ আপনার বাসস্থান থেকেও কি নিরাপদ?
উত্তর ঃ জী হ্যাঁ।
প্রশ্ন ঃ কিন্তু আপনি আপনার বাসায় অস্ত্রশস্ত্র রাখাকে নিরাপদ মনে করতেন, তা নয় কি?
উত্তর ঃ জী হ্যাঁ, বাসায় আমি থাকা পর্যন্ত।
প্রশ্ন ঃ তাহলে অস্ত্রশস্ত্র থাকলে আপনি কি বাসা থেকে বেরোতেন, না বেরোতেন না?
উত্তর ঃ এ প্রশ্ন আসে না। অতঃপর মিঃ উইলিয়ামস রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলেনঃ মিঞা সাহেব, তাহলে কি আমি বলতে পারি যে, 'সাক্ষী দিতে গিয়ে আপনি যা কিছু বলেছেন তা মিথ্যার বাণ্ডিল'।
উত্তর ঃ এটা আদৌ সত্য নয়, স্যার।
ইহার পর সাক্ষী কৌসুলির অপর এক প্রশ্নের জবাবে জানান যে, তিনি ১৯৬৫ সালের ৩০শে আগষ্ট থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১০ দিন ছুটির জন্য করাচীতে তাঁহার অফিসারের নিকট দরখাস্ত করেন।
প্রশ্নঃ ছুটির কি কারণ দেখিয়েছিলেন?
উত্তর ঃ আমার দরখাস্তের কপি না দেখা পর্যন্ত বলতে পারছি না। তখন কৌসুলি সাক্ষীর হাতে সংশ্লিষ্ট ছুটির দরখাস্তের একটি অনুলিপি তুলিয়া দিয়া বললেনঃ "এটাই আপনার দরখাস্তের হুবহু কপি।"
সাক্ষী ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি আমার দরখাস্তের মূল কপি দেখি ততক্ষণ জবাব দেবো না।
মিঃ টমাস উইলিয়ামসঃ আপনি এই দরখাস্তে লিখেছেন আপনার অত্যন্ত জরুরী ব্যক্তিগত কাজের জন্যে যা কিছুতেই এড়ানো যায় না– যা না করলে আমার সম্পত্তির ক্ষতি হবে, তার জন্যে ছুটি চাচ্ছেন।
সাক্ষীঃ না, আমি কিছুতেই আমার দরখাস্তের মূল কপি না দেখে বলব না।
প্রশ্ন ঃ আপনার কি এমন সমস্যা ছিল, যার ফলে আপনার সম্পত্তির ক্ষতি হতে পারে?

উত্তর ঃ গত ৫ বছরে আমার তেমন কোন সমস্যা ছিল না।
এই সময় উপরোক্ত প্রসঙ্গে অধিক প্রশ্ন না করার জন্য কৌসুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়।
মিঃ টমাস উইলিয়ামস তখন প্রশ্ন করেনঃ
"ছুটির সময় আপনি কি করেছিলেন?"
উত্তরঃ লেঃ মোয়াজ্জেম এই সময় ২৮ তারিখের পার্টি মিটিংয়ের জন্য ঢাকায় আসতে বলেন। সেই জন্যেই আমি ছুটি নিয়েছিলাম।
প্রশ্ন ঃ আপনি যখন ঢাকায় আসেন, তখন ভারতের সঙ্গে কি যুদ্ধ শুরু হয়?
উত্তরঃ হ্যাঁ, ঠিক।
প্রশ্নঃ আপনি কি ওই সময় করাচীতে টেলিগ্রাম করেছিলেন যে, "পি,আই,এ'র সকল ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। কার্যে পুনরায় যোগদানে অক্ষম। পরামর্শ চাই।"
উত্তর ঃ হ্যাঁ, তা লিখেছিলাম। চেয়ারম্যান কৌসুলিকে তখন বলেন যে, উপরোক্ত প্রশ্নে সাক্ষী ইতিপূর্বেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। সুতরাং পুনরায় এ প্রশ্ন করার কারণ কি?
জবাবে কৌসুলি বলেনঃ মাননীয় বিচারপতি, এখুনি তা শুনবেন।
ইহার পর কৌসুলি সাক্ষীকে টেলিগ্রামটির একটি সরকারী নকল তুলিয়া দিয়া উহার আদ্যোপান্ত উচ্চঃস্বরে পড়িতে বলেন।
প্রশ্ন ঃ বলুনত, ওই টেলিগ্রামটায় প্রেরকের কোন ঠিকানা লেখা আছে?
সাক্ষী পড়িলেনঃ "১০৭নং ডি,এন,সেন রোড, ফরিদাবাদ, ঢাকা-৪।"
টেলিগ্রামটির উপর করাচীতে পৌছানোর পোষ্টাল ষ্ট্যাম্পের তারিখ রহিয়াছে ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।
প্রশ্ন ঃ টেলিগ্রামে লেখা এই ঠিকানায় আপনি কবে গিয়েছিলেন?
উত্তরঃ ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে আমি ওই ঠিকানায় গিয়েছিলাম।
ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান কৌসুলিকে তখন এই প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করেন।
কৌসুলিঃ মাননীয় বিচারপতি, সাক্ষী বলেছেন যে, তিনি ১৯৬৫ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর এই টেলিগ্রামটি পাঠান।
সাক্ষীঃ আমি ঠিক বলতে পারছি না।
প্রশ্ন ঃ আপনি না বলেছিলেন যে, এ বাসা আপনি আগে চিনতেন না?
উত্তর ঃ আমি কবে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছি তা আমার মনে নেই। ইহার পর কৌসুলি মিঃ টমাস উইলিয়ামস অন্য প্রসঙ্গে জেরা শুরু করেন।
প্রশ্ন ঃ শেখ মুজিবর রহমান উপস্থিত ছিলেন, এ রকম ক'টি সভায় আপনি যোগ দেন?
উত্তর ঃ দুটো সভায়, তা ১৯৬৫ সালের ২৯শে আগষ্ট, আর একটা ১৯৬৫ সালের ১২ই মার্চ।

প্রশ্ন ঃ শেখ মুজিবরের বাসা আপনি চেনেন?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, চিনি।
প্রশ্ন ঃ দ্বিতীয় মিটিংটা কোথায় হয়েছিল?
উত্তর ঃ ধানমণ্ডি এলাকায় জনৈক তাজউদ্দীনের বাসায়।
প্রশ্ন ঃ শেখ মুজিবরের সঙ্গে আপনি কতবার সাক্ষাৎ করেন?
উত্তর ঃ বহুবার, তার সংখ্যা মনে নেই।
প্রশ্ন ঃ কতবার আপনি তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন?
উত্তর ঃ আমি নিজে তার কাছ থেকে টাকা নেইনি।
প্রশ্ন ঃ টাকা নেওয়ার সময় কতবার আপনি সেইখানে ছিলেন?
উত্তর ঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে ৪ হাজার টাকা দেওয়ার সময় একবারই আমি সেখানে ছিলাম।
প্রশ্ন ঃ ও টাকা কি আপনার হোটেল খরচার জন্য?
উত্তর ঃ না স্যার।
প্রশ্ন ঃ এর কিছু অংশ?
উত্তর ঃ তা'ও না।
ইহার পর কৌসুলি সাক্ষীর হাতে পিডব্লিউ ৩/৩ দলিলটি দিয়া উহার প্রথম বাক্যটি ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে বলেন।
সাক্ষী অনুবাদ করিয়া বলিলেনঃ এই বাক্যের অর্থ "আই গট প্রেস হুইচ ওয়াজ ফর আণ্ডারগ্রাউণ্ড ওয়ার্ক।" কৌসুলি তখন বললেনঃ আমি যদি এভাবে ইংরেজীতে অনুবাদ করিঃ "আই হ্যাভ রিসিভড, দিস কাইন্ড অব প্রেস হুইচ ওয়ার্ক ফর আন্ডারগ্রাউন্ড পাবলিকেশন।"
এই সময় এই প্রশ্নটিকে চেয়ারম্যান নাকচ ঘোষণা করেন।
১৮ই আগষ্টে সুলতানের কাছ হতে আপনি একটি চিঠি (পিডব্লু ৩/২) পান। আপনি কি ঐদিনই ঢাকায় গিয়েছিলেন?
উত্তর ঃ কবে চিঠি পেয়েছিলাম তা মনে নেই, তাই ঐদিনেই ঢাকা গিয়েছিলাম কিনা তা বলতে পারি না। আমি ২৮শে আগষ্ট, ১৯৬৫ ঢাকায় আসি।
প্রশ্ন ঃ ঐ চিঠির সঙ্গে আপনি ১৫শ' টাকা পাননি?
উত্তর ঃ সম্ভবতঃ চিঠি পাওয়ার একদিন পরে পেয়েছি।
রাজসাক্ষী আরও জানান যে, তিনটি টিকেট ক্রয়ের জন্য ঐ টাকা পাঠানো হয়েছিল; কিন্তু দুইটি কেনা হয়–একটি আমি নিজে এবং অপরটি জনৈক পি, আই, এ কর্মচারীর মারফত লেঃ মোয়াজ্জেম ক্রয় করেন।
প্রশ্ন ঃ আপনি কি লেঃ মোয়াজ্জেমের সঙ্গে ঢাকায় এসেছিলেন?
উত্তর ঃ ঐদিন আমার আগে লেঃ মোয়াজ্জেম ঢাকায় এসেছিলেন কিনা আমি জানতাম না।
রাজসাক্ষী বলেন যে, তিনি রাত একটা থেকে তিনটার মধ্যে ঢাকায় আসেন।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে কি এজন্য আপনার অফিস কোন শাস্তি দিয়েছিলেন?
উত্তর ঃ না, মনে নেই। অতঃপর কৌসুলি প্রশ্ন করেনঃ এই সময়ে আপনি ২৯শে আগষ্ট, ১৯৬৫ শেখ মুজিবরের বাসায় যান, সেখানে টাকার সম্পর্কে কি আলাপ হয়?
উত্তর ঃ শেখ মুজিব বলেন যে, তিনি আন্দোলনের জন্য দু'হাজার, চার হাজার কিস্তিতে এক লাখ টাকা দিতে প্রস্তুত রয়েছেন।
প্রশ্ন ঃ কত টাকা তিনি দেন?
উত্তর ঃ একবার সুলতানউদ্দীনের মারফত ১৫শ' ও ৫শ' টাকা; তারপর ষ্টুয়ার্ট মুজিবর রহমানের মারফত ৭শ' টাকা, আর একবার ষ্টুয়ার্ট মুজিবর রহমানের মারফত ৪ হাজার টাকা শেষবার ষ্টুয়ার্ড মুজিবরের মারফতে আমার উপস্থিতিতে আরও ৪ হাজার টাকা দেন। সুলতানউদ্দীনের মারফত টিকিট কিনতে তিনি দু'হাজার টাকা দেন বলে সুলতানউদ্দীনই আমাকে বলেছিলেন।
প্রশ্ন ঃ ঢাকায় মিটিং সম্পর্কে আপনি কবে শুনেছিলেন?
উত্তর ঃ আগষ্টের প্রথমদিকে লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে বলেন।
প্রশ্ন ঃ মিয়া সাহেব, এই মিটিংয়ের কথা কি আপনি কাউকে বলেছিলেন?
উত্তর ঃ না।
এই সময় রাজসাক্ষী চেয়ারম্যানের নিকট তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার কথা বলেন এবং ইতিমধ্যে ১১টা বাজিয়া যাওয়ায় চেয়ারম্যান কিছুক্ষণের জন্য আদালতের অধিবেশন বিরতি ঘোষণা করেন।
বিরতির পর বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি পুনরায় জেরা শুরু করেন।
রাজসাক্ষী বলেন যে, তিনি ২৯শে আগষ্টে শেখ মুজিবর রহমানকে দেখেননি এবং তাঁহাকে টাকা-পয়সা দিতে দেখেননি ইহা সত্য নহে।
প্রশ্ন ঃ আপনি কোন অস্ত্রশস্ত্র দেখেছেন?
উত্তর ঃ না।
প্রশ্ন ঃ যুদ্ধের সময় আপনি ঢাকায় ছিলেন, কিন্তু তখনতো কোন ষড়যন্ত্র হয়নি?
উত্তরঃ রহমান টাকা দিয়েছিলেন।
প্রশ্ন ঃ এ সময় আর কিছু হয়েছে?
উত্তর ঃ না।
প্রশ্ন ঃ যুদ্ধের সময় আপনাদের কেউ ভারতকে সাহায্য করেছে?
উত্তর ঃ না।

ইহার পর কৌসুলির প্রশ্নের উত্তরে রাজসাক্ষী জানান যে, বিমান বাহিনীতে চাকুরীকালে তিনি কোনদিন ওয়ারলেসে কাজ করেননি। 'ট্রানজিষ্টরাইজড ট্রানজিষ্টরও' তিনি দেখেননি। এ আকারে কত বড় তাও তিনি জানেন না। কিভাবে লণ্ডনে তা কেনা হবে তাহা তিনি বলিতে অক্ষম।

অতঃপর রাজসাক্ষীকে কৌসুলি জিজ্ঞাসা করেনঃ মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ করার কথা ছিল, না?
উত্তর ঃ আমাকে তা-ই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
প্রশ্নঃ কিভাবে যোগাযোগ করবেন বলে আপনি ভেবেছিলেন?
উত্তরঃ সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই।
সাক্ষী আরও বলেনঃ ১৯৬৫ সালের জুন অথবা জুলাই মাসে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে নিয়ে করাচীর মার্কিন দূতাবাসের এ্যাসিসট্যান্ট নৌ এ্যাটাচী মিঃ নোবল-এর বাসায় যান। সেখানে তিনি আমাদের পরিকল্পনা জানিয়ে সাহায্য চান।
প্রশ্ন ঃ চীনা দূতাবাসের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করার পরিকল্পনা আপনার ছিলো?
প্রথমবারের মতো আপনি এখন বলছেন যে, অভিযুক্তদের কেউ কেউ বিদেশী দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং আপনাকে সে খবর তাঁদের দেওয়ার কথা ছিল।
উত্তর ঃ এটা সত্য নয়।
ইহার পর মিঃ উইলিয়ামস প্রশ্ন করেনঃ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করানোর জন্য আপনার দু'তিন ঘণ্টা সময় জিজ্ঞাসাবাদ লেগেছিল, ঠিক নয় কি?
উত্তর ঃ না, ঠিক নয়।
প্রশ্ন ঃ আপনি কি ঐ রকম একজন লোক নন যে, নিজের চামড়া বাঁচানোর জন্য যেকোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেকোন অভিযোগ করতে পারেন?
উত্তর ঃ না, সেটা সত্য নয়।
ইহার পর মিঃ টমাস উইলিয়ামস তাঁহার জেরা সমাপ্ত করেন।

দৈনিক পয়গাম

৮ই আগস্ট ১৯৬৮

জেরার উত্তরে রাজসাক্ষী আমীর হোসেনের উক্তিঃ
অভিযুক্ত মোয়াজ্জেম আমাকে করাচীস্থ মার্কিন দূতাবাসের
মিঃ নোবলের বাসভবনে লইয়া গিয়াছিলেন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বুধবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী মিঃ টমাস উইলিয়ামস এবং জনাব আবদুস সালাম খান ২নং রাজসাক্ষী এবং বাদীপক্ষের সাক্ষী জনাব আমির হোসেন মিয়াকে জেরা করেন। মিঃ উইলিয়ামস জেরা সমাপ্ত করিয়াছেন।

রাজসাক্ষী জনাব আমির হোসেন মিঃ উইলিয়ামসের জেরার জবাবে একসময়ে বলেন যে, ১৯৬৫ সালের জুন অথবা জুলাই মাসে দুই নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন তাহাকে লইয়া করাচীস্থ মার্কিন দূতাবাসের সহকারী নৌ-এ্যাটাচী মিঃ নোবলের বাসভবনে গমন করিয়াছিলেন। সাক্ষী বলেন যে, কিভাবে মার্কিন দূতাবাসের সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে সে সম্পর্কে তাহার কোন ধারণা ছিল না।

কৌঁসুলী রাজসাক্ষীকে কি যোগ্যতার জন্য তার মত ব্যক্তিকে বৈদেশিক দূতাবাসের সহিত যোগাযোগ করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলে জনাব আমির হোসেন বলেন, "প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান এবং জনাব আহমদ ফজলুর রহমানেরই এইসব দূতাবাসের সহিত যোগাযোগ করিবার কথা ছিল।" সাক্ষী বলেন, "যোগাযোগের পর আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দেওয়ার কথা বলা হইয়াছিল। আমি নিজে কোন দূতাবাসের সহিত যোগাযোগ করি নাই।" সাক্ষী বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন বলিয়াছিলেন যে, শেখ মুজিব এবং জনাব আহমদ ফজলুর রহমান বৈদেশিক দূতাবাসসমূহের সহিত যোগাযোগ করিবেন।

সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমানকে চেয়ারম্যান এবং ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম, আর, খান এবং জনাব মকসুমুল হাকিমকে সদস্য করিয়া বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছে।

মামলার ১নং অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ সমর্থনকারী বৃটিশ কৌঁসুলী মিঃ টমাস উইলিয়ামস রাজসাক্ষী জনাব আমির হোসেন মিয়াকে প্রথম জেরা শুরু করেন। তিনি সাক্ষীকে "মিঃ মিয়া" বলিয়া সম্বোধন করেন।

প্রশ্ন–মিঃ মিয়া আপনি কি বিবাহিত?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আপনার সন্তান আছে?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনি কবে বিমান বাহিনীর চাকুরী হইতে অবসর নিয়াছেন?
উত্তর–১৯৬৪ সালে।
প্রশ্ন–তারপর?
উত্তর–তারপর আমি করাচীস্থ কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসে যোগদান করি এবং সেখানে ১৯৬৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অবস্থান করি।
প্রশ্ন–তারপর কোথায় গমন করেন?
উত্তর-কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দফতরের ঢাকা অফিসে।
প্রশ্ন-ঢাকা কোথায় অবস্থান করেন?
উত্তর–ঢাকা হোটেলে।

প্রশ্ন-কত দিন পর্যন্ত?
উত্তর–৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ সাল।
প্রশ্ন–তারপর কোথায় যান?
উত্তর–চট্টগ্রাম।
প্রশ্ন–কতদিন চট্টগ্রামে ছিলেন?
উত্তর–৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ সাল।
প্রশ্ন–তারপর?
উত্তর–তারপর হইতে আরজু হোটেলে অবস্থান করিতে থাকি।
প্রশ্ন–ইহার পর কোথায় অবস্থান করেন?
উত্তর–গেণ্ডারিয়াস্থ ১০৭, ডি, এন সেন রোডে। ভাড়া বাড়ীতে।
প্রশ্ন–ইহা কার বাড়ী ছিল?
উত্তর–সে বাড়ী জনৈক সহকারী সেশন জজ জনাব হারুন-অর-রশীদের।
প্রশ্ন–আপনি কি বাড়ীর মালিককে পূর্ব হইতেই জানিতেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–এই বাড়ী আপনার জন্য কে ভাড়া করিয়াছিল?
উত্তর–ষ্টুয়ার্ড মুজিব এবং জনৈক জেড, এ, চৌধুরী।
প্রশ্ন–আপনি কবে আন্দোলনের (বিচ্ছিন্নতাবাদী) সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন?
উত্তর–১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ অথবা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে।
প্রশ্ন–লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম কি আপনাকে শাসাইয়াছিলেন?
প্রকৃতপক্ষে তিনি আপনাকে কোন রূপ ভয় দেখান নাই।
উত্তর–হ্যাঁ, তিনি আমাকে শাসাইয়াছিলেন।
প্রশ্ন–প্রকৃতপক্ষে কিছুই ঘটে নাই?
উত্তর–শাসানির পর প্রকৃতপক্ষে আমার কোন ক্ষতি করা হয় নাই।
(পূর্বদিনে সাক্ষী তাঁহার জবানবন্দীতে বলিয়াছিলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার পর লেঃ মোয়াজ্জেম তাহাকে শাসাইয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি কথা ফাঁস করিলে তাহাকে (আমীর হোসেন) তিনি হত্যার ব্যবস্থা করিবেন।)
বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী মিঃ টমাস উইলিয়ামস রাজসাক্ষীকে একটি কাগজ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করেন–"আপনাকে করাচী পরিসংখ্যান অফিসে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছিল বলিয়া আপনি বলিয়াছেন। কি উদ্দেশ্যে ডাকা হইয়াছিল?
উত্তর–আমি বলিতে পারি না। ঢাকা অফিস আমাকে বলিয়াছিল যে, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল আমাকে করাচীতে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

প্রশ্ন–করাচীতে কি আলোচনা হইয়াছিল?
উত্তর–পূর্ব পাকিস্তানে পরিসংখ্যান বিভাগের কর্মচারীদের ফিল্ড ট্রেনিং দান সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল।
প্রশ্ন–কতদিন করাচীতে ছিলেন?
উত্তর–১৯৬৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর হইতে ১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত।
প্রশ্ন–সেসময় কি রাওয়ালপিণ্ডিতে গিয়াছিলেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–কোন সময় গিয়াছিলেন কি?
উত্তর–হ্যাঁ। বিমানবাহিনীতে চাকুরীর সময় ১৯৫৩ সালে কোহাট গমনের পথে রাওয়ালপিণ্ডি গিয়াছিলাম।
প্রশ্ন–আপনি কবে গ্রেফতার হন?
উত্তর–করাচী হইতে ঢাকা বিমানবন্দরে আগমনের পর ১৩ই ডিসেম্বর শেষ রাত্রে।
প্রশ্ন–ঢাকা বিমানবন্দরে আপনি গ্রেফতার হইবেন, এই ধারণা কি আপনার পূর্বে ছিল?
উত্তর–না। গ্রেফতারের সময় পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে আমাকে গ্রেফতার সম্পর্কে একটি ওয়ারেন্ট দেখান হইয়াছিল।
প্রশ্ন-কে আপনাকে গ্রেফতার করিয়াছিল?
উত্তর–তারা সাদা পোশাকে ছিল, নাম জানি না।
প্রশ্ন–গ্রেফতারের পর আপনাকে কোথায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল?
উত্তর-ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে আমার নাম রেজিষ্ট্রির পর ১৪ই ডিসেম্বর (আবার বলেন, ১৩ই ডিসেম্বর) রাজারবাগ জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে আমাকে নেওয়া হইয়াছিল।
প্রশ্ন– সেখানে সে রাত্রে কি হইয়াছিল?
উত্তর–আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইয়াছিল।
প্রশ্ন–কতক্ষণ পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ করা হইয়াছিল?
উত্তর–দুই হইতে তিন ঘণ্টা।
প্রশ্ন– সেসময়েই আপনি আপনার বন্ধুদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করার সিদ্ধান্ত নেন?
উত্তর–বন্ধুদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতার কোন প্রশ্নই উঠে না।
প্রশ্ন– আপনি বলিয়াছেন যে, জিজ্ঞাসাবাদ দুই-তিন ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াছিল। এই সময়েই আপনি পূর্ণ স্বীকারোক্তি করার সিদ্ধান্ত নেন, ইহা কি সত্য নয়?
মাননীয় বিচারপতি বিধিগত কারণে এই প্রশ্ন বাতিল করিয়া দেন।
প্রশ্ন–কতক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর আপনি আপনার অফিস হইতে (কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দফতরের ঢাকা অফিস) ডাইরী আনয়নের জন্য পুলিশ অফিসারের হাতে চিরকুট দিয়াছিলেন?

উত্তর–১৪ই জানুয়ারী সকালে।
প্রশ্ন- সেসময়ও কি আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইতেছিল?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–যখন চিরকুটটি দেন, তখন আপনি কোথায় ছিলেন?
উত্তর–রাজারবাগ পুলিশ কেন্দ্রে।
প্রশ্ন–কে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন?
উত্তর–ডি,এস, পি, মান্নাফ এবং আরও দুই-একজন।
প্রশ্ন–সেখানে কি লেঃ শরীফ ছিল?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–মেজর হাসান ছিল কি?
উত্তর– না।
প্রশ্ন–আপনি কাহাকে ডাইরী আনয়নের জন্য চিরকুটটি দিয়াছিলেন?
উত্তর–ডি, এস, পি মান্নাফ।
প্রশ্ন–চিরকুটে শুধু দুইটি ডাইরীর কথা উল্লেখ ছিল। চিঠির কথা উল্লেখ ছিল না।
উত্তর–চিরকুটটি লেখার সময় অফিসে রক্ষিত যে ব্যাগে আমার ডাইরী ছিল সেখানে চিঠিগুলি ছিল কি-না তাহা আমার মনে ছিল না।
প্রশ্ন–কেন ব্যাগে চিঠিগুলি রাখিয়াছিলেন?
উত্তর–পরবর্তী কোন একসময়ে আত্মজীবনী রচনার অভিপ্রায়ে আমার নিকট লিখিত (অভিযুক্ত লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন কর্তৃক) পত্রগুলি ব্যাগে রাখিয়া দিয়াছিলাম।
প্রশ্ন–আত্মজীবনীর জন্য সব গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রই কি আপনি রাখিয়া দিয়াছিলেন?
উত্তর–সবকিছু রাখি নাই। কিন্তু সব চিঠিগুলি রাখিয়া দিয়াছিলাম।
প্রশ্ন–কেন চিঠিগুলি রাখিয়া দিয়াছিলেন?
উত্তর–এই চিঠিগুলির গুরুত্ব হইতেছে–ইহা আমার কার্যাবলীর একটি চিত্র প্রদান করিবে। আমি জানিতাম, যদি চিঠিগুলি পুলিশের হাতে পড়ে বিপজ্জনক হইতে পারে। যখন আমি বলিয়াছি যে, আমি চিঠিগুলির কথা ভুলিয়া গিয়াছি তখন আমি মিথ্যা বলিয়াছি একথা ঠিক নহে। ডাইরীগুলি রাখা বিপজ্জনক হইবে জানিয়াও আমি যে কেন সেইগুলি আমার কাছে রাখিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আমার আত্মজীবনীর জন্য আমি সেইগুলি রাখি নাই।

আমি যখন পুলিশকে চিরকুটটি প্রদান করি তখন ডাইরীগুলি সংগ্রহের জন্য আমি তাহাদের সঙ্গে যাইতে চাহি নাই। ব্যাগের ভিতর ডাইরী ছাড়া আর কি ছিল আমার মনে নাই। ব্যাগের ভিতর অন্য কিছু ছিল কিনা আমি স্মরণ করিতে পারিতেছি না। আমি আত্মজীবনী লেখার খাতিরে ব্যাগের

ভিতর আমার চাকুরী জীবনের রেকর্ডের কাগজপত্র রাখিয়া ছিলাম। পুলিশ কখনও আমাকে জানায় নাই তাহারা ব্যাগের ভিতর কি পাইয়াছে। আমি আমার অফিসেই উক্ত কাগজপত্র একটি ব্যাগের ভিতর রাখিয়াছিলাম কারণ, তাহা আমার কাছে নিরাপদ মনে হয়। তাহা আমার ঘরের চাইতে নিরাপদ ছিল। আমি ঘরে থাকিলে সেখানে গোলাবারুদ রাখা নিরাপদ ছিল। (সাক্ষীকে প্রশ্ন করা হয় যে, তাহার ঘরে গোলাবারুদ থাকিলে তিনি ঘরের বাহিরে যাইতে পারিতেন কিনা। সাক্ষী বলেন যে, এ ব্যাপারে প্রশ্ন উঠে না।) ইহা অবশ্যই ঠিক নহে যে, চিঠিগুলির ব্যাপারে আমার সাক্ষ্যের সবটাই কতগুলি মিথ্যা কথা।

আমি করাচীতে আমার অফিসারের নিকট ১৯৬৫ সালের ৩০শে আগষ্ট হইতে ৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০ দিনের ছুটি প্রদানের আবেদন জানাই। ছুটির জন্য আমি কি কারণ দর্শাইয়াছিলাম তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। (সাক্ষীকে আবেদনপত্রের একটি নকল প্রদান করা হয়। উহা সাক্ষীর লেখা বলিয়া মনে করা হয়)। সাক্ষী বলেন, "আমি আমার মূলে আবেদনপত্র না দেখিয়া কিছু বলিতে পারি না।" সাক্ষীকে জানান হয় যে, "তাহাকে যে নকলটি হস্তান্তর করা হইয়াছে তাহা তাহার মূল আবেদনপত্রের হুবহু নকল। তিনি তবু বলিতে থাকেন মূল আবেদনপত্রটি না দেখিলে প্রশ্নের উত্তর দিব না।" একটি জরুরী অপরিহার্য ব্যক্তিগত সমস্যা মোকাবিলা করার এবং তাহা না করিলে আমার সম্পত্তির ক্ষতি হইতে পারে এইরূপ কোন কারণ ছুটির জন্য আমি প্রদর্শন করিয়াছি কি-না আমি বলিতে পারি না। এই ঘটনা আমি স্মরণ করিতে পারি না এবং আমার মূল আবেদনপত্রটি না দেখিলে আমি উত্তর প্রদান করিতে পারি না। গত ৫ বছরে আমার এমন কোন পারিবারিক সমস্যা ছিল না যাহার ফলে আমার সম্পত্তির ক্ষতি হইতে পারিত।

লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে ২৮ তারিখে দলীয় বৈঠকের জন্য তাহার সহিত ঢাকা গমনের জন্য বলিয়াছিলেন এবং আমি সেজন্য ছুটি লইয়াছিলাম। ইহা সত্য যে, আমি যখন ছুটিতে ঢাকা ছিলাম, তখন ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেজন্য আমি ছুটি শেষে করাচী প্রত্যাবর্তন করিতে পারি নাই, সেসময় সকল ফ্লাইট বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। আমি করাচীতে আমার অফিসারের নিকট এই মর্মে এক তারবার্তা প্রেরণ করি "পিআইএ ফ্লাইট বাতিল। কাজে ফিরিতে অক্ষম"। আমি তারবার্তায় ইহাও বলি, "উপদেশ দিবেন"। আমি দেখিতেছি আমার কাছে হস্তান্তরিত সরকারী কপিতে নীচের ঠিকানাটি এইভাবে রহিয়াছেঃ "১০৭ ডি এন, সেন রোড ফরিদাবাদ, ঢাকা-১৪"। আমি বলিতে পারি না উক্ত তারবার্তাটি ১০ই সেপ্টেম্বর প্রেরণ করা হইয়াছে কি-না।

তারবার্তাটি ১৯৬৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর করাচীতে পৌছিয়াছে বলিয়া উপরে স্বাক্ষর রহিয়াছে। আমি দুইটি সাধারণ বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত উপস্থিত ছিলাম। একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ সালের ২৯শে আগষ্ট এবং দ্বিতীয়টি ১৯৬৫ সালের ১২ই মার্চ। শেখ মুজিবুর রহমানের আবাস কোথায়, তাহা আমার জানা আছে। দ্বিতীয় বৈঠকটি জনাব তাজুদ্দিনের গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। উহা ধানমণ্ডী এলাকায় অবস্থিত। উক্ত দুইটি বৈঠক ছাড়াও বহুবার শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে; কিন্তু কতবার তাহা আমি বলিতে পারিনা। আমি নিজে শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট হইতে কোন টাকা পাই নাই। আমি শুধু একবার শেখ মুজিবুর রহমান ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে টাকা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলাম। ইহার পরিমাণ ছিল ৪ হাজার টাকা। (সাক্ষীকে আদালতের পি ডব্লিউ ৩/৩ হিসাবে চিহ্নিত দলিলটি দেওয়া হয় এবং উক্ত পত্রের প্রথম বাক্যটি অনুবাদ করিতে বলা হয়।) সাক্ষী বলেন, এই বাক্যটির অর্থ হইতেছে "গুপ্ত কাজের জন্য আমার হাতে প্রেস ছিল।" এই চিঠিটি একটি প্রচারপত্রের উল্টা পিঠে লেখা হয়। আমি ঠিক কখন আদালতের পি ডব্লিউ ৩/২ দলিল হিসাবে চিহ্নিত এই চিঠিটি পাই তাহা বলিতে পারি না। সেজন্যই চিঠিটি প্রাপ্তির দিনই আমি ঢাকা যাত্রা করি কিনা বলিতে পারি না। আমি ১৯৬৫ সালের ২৮শে আগষ্ট ঢাকা রওয়ানা হই। আমি এই চিঠিটি পাওয়ার পর সম্ভবতঃ একদিন পর ১৫ শত টাকা পাই। উক্ত টাকা ৩টি টিকেট ক্রয় করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হইলেও মাত্র দুইটি টিকেট ক্রয় করা হয়। উহার একটি আমি নিজেই ক্রয় করি এবং অপরটি লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন পি আই এ ষ্টাফ-এর মাধ্যমে ক্রয় করেন। আমি লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট ১৫ শত টাকার সঙ্গে লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ কর্তৃক আনিত ৫ শত টাকা প্রদান করি। লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনই পিআইএ হইতে আমার টিকেট কাটার টাকা প্রদান করেন। লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৬৫ সালের ২৮শে আগষ্টের পূর্বেও ঢাকা গমন করিয়াছিলেন কিনা আমি জানি না। আমরা রাত ১টা হইতে ৩টার মধ্যে ঢাকা পৌছি। উহা রাত্রির ফ্লাইট ছিল। ইহা ভুল যে, সেসময়ে ছুটিতে করাচী ছাড়িয়া ঢাকা যাওয়ার জন্য আমার বিরুদ্ধে কোন প্রকার শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। (সাক্ষীকে তাঁহার নৈমিত্তিক ছুটির হিসাব সম্পর্কিত কাগজ দেওয়া হয় এবং তাহাতে তিনি করাচীতে তাঁহার বাসভবনে অবস্থানের জন্য নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন করিয়া বিনানুমতিতে ঢাকা গিয়াছেন– এই মন্তব্যসহ ১৯৬৫ সালের ৩০শে আগষ্ট ১০ দিনের নৈমিত্তিক ছুটির কথা লেখা রহিয়াছে কিনা প্রশ্ন করা হয়।) তিনি বলেন, "হ্যাঁ, ইহাতে সেইরূপ লেখা

রহিয়াছে।" এখন নৈমিত্তিক ছুটির হিসাব সম্পর্কিত দলিলটি আদালতের ডি বি/১ দলিল হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। আমি এই লিখিত বিষয়টি দেখিয়াও মনে করিতে পারিতেছি না বিনানুমতিতে করাচী ত্যাগ করায় আমাকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল কিনা। (তারবার্তাটির তারিখ হইতে ঢাকা, ১০-৯-৬৫ এবং উহা করাচীতে ১১-৯-৬৫ তারিখে পৌঁছে এবং এই তারবার্তাটি আদালতের ডিবি/২ দলিল হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।)

১৯৬৫ সালের ২৯শে আগষ্টে অনুষ্ঠিত বৈঠকে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন প্রকাশ করেন যে, আন্দোলনের জন্য তাহার টাকার প্রয়োজন আছে। শেখ মুজিবুর রহমান তখন তাহাকে জানান যে, তিনি এজন্য এককালীন দুই হাজার হইতে ৪ হাজার টাকার কিস্তিতে মোট এক লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। একসময় শেখ মুজিবুর রহমান সুলতানউদ্দিনের মারফত মোট দুই হাজার টাকা প্রেরণ করেন। ইহার পর তিনি ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে ৭শত টাকা দেন। ইহার পর। আরেক সময় তিনি ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে ৪ হাজার টাকা এবং আরেক সময় আরও ৪ হাজার টাকা দেন। এই দুইবারই আমার উপস্থিতিতে টাকা দেওয়া হইয়াছিল। সুলতানউদ্দিনের প্রদত্ত দুই হাজার টাকা টিকিটের জন্য দেওয়া হইয়াছিল। জনাব সুলতানউদ্দিন এই অর্থ যে শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন তাহা আমি জানি। কারণ যে বৈঠকে অর্থনৈতিক অসুবিধার কথা আলোচনা করা হইয়াছিল উহাতে জনাব সুলতানউদ্দিন আহমদ উপস্থিত ছিলেন। এই সময় তিনি করাচীতে অবস্থান করিতেছিলেন। বৈঠকে জনাব সুলতানউদ্দিনকে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়া শেখ মুজিবুর রহমানকে টাকা দানে রাজী করানোর জন্য বলা হইয়াছিল। কারণ, আমাদের টিকেটের জন্য তাহার টাকা দেওয়ার প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল।

রাজসাক্ষী জনাব আমির হোসেন আরও বলেন যে, ১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসের প্রথমদিকে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমাদের আন্দোলন সংগঠনের এবং সভার ব্যবস্থা করার জন্য এল, এস সুলতানউদ্দিনকে ঢাকায় প্রেরণ করা হইতেছে। (এই সময় সাক্ষী জনাব আমির হোসেন বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদেরের এক প্রশ্নের উত্তরে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহার প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়)। তিনি বলিয়াছিলেন, "ঢাকা গমনের পূর্বে আমি লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসায় গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, উক্ত একই মাসে তিনি ঢাকায় একটি দলীয় বৈঠক করিবেন।" তিনি বলেন যে, এই বাক্যে আমি কখন লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসায় গিয়াছিলাম, তাহা উল্লেখ করি নাই। কাজেই আমার আজকের বিবৃতির সহিত ইহার পার্থক্য নাই।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর অপর এক প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী জনাব আমির হোসেন বলেন যে, ১৯৬৫ সালের ২৯শে আগষ্ট আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত কখনও মিলিত হয় নাই এ কথা বলা মোটেই সত্য নয়। শেখ মুজিবুর রহমান কোন ব্যক্তিকে টাকা দিতে আমি কখনও দেখি নাই এই কথাও ঠিক নয়। তিনি আরও বলেন যে, এই সংস্থার সহিত জড়িত থাকাকালে আমি কখনও কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দেখি নাই। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পি, আই, এ-র ফ্লাইট শুরু হওয়ার দ্বিতীয় দিন আমি করাচীর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করি। ভারতের সহিত যুদ্ধ চলাকালে ষড়যন্ত্রকারীরা কিছুই করে নাই একথা ঠিক নয়। ১৯৬৫ সালের পয়লা ও ৯ই সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান আন্দোলনের জন্য টাকা দিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় টাকা দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ করা হয় নাই এবং আমাদের কেহ যুদ্ধ জয়ের জন্য ভারতকে সাহায্য করে নাই।

রাজসাক্ষী জনাব আমির হোসেন বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, বিমানবাহিনীতে চাকুরিরত থাকাকালে বেতার বিভাগের সহিত আমার কোন সংশ্রব ছিল না। কাজেই লণ্ডন হইতে কি ধরনের ট্রাঞ্জিষ্টার ট্রান্সমিটার আনিতে হইবে সে বিষয়ে আমার কোন ধারণা ছিল না। যে সকল বৈঠকের কথা আমি বলিয়াছি সেই সকল বৈঠক হইতে আমি এই সকল বিষয়ে জানিতে পারি। আমি নিজে কখন ট্রাঞ্জিষ্টার ট্রান্সমিটার দেখি নাই। ট্রাঞ্জিষ্টার ট্রান্সমিটার লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের পরিচিত পি আই, এ'র ষ্টুয়ার্ডের মারফত পাকিস্তানে আনয়নের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ট্রাঞ্জিষ্টার ট্রান্সমিটার এই আদালতের মহামান্য বিচারপতিদের সম্মুখে রক্ষিত টেবিলের আয়তনের অর্দ্ধেকের সমান কিনা তাহা আমি জানি না। জনাব ফজলুর রহমান সি, এস, পি-র প্রদত্ত পত্র অনুসারে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মাধ্যমে লণ্ডন হইতে ট্রাঞ্জিষ্টার ট্রান্সমিটার ক্রয় করার কথা ছিল। ঐ পত্রটি লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট ছিল; কিন্তু আমি উহা দেখিতে পাইয়াছিলাম। জনাব ফজলুর রহমান সি, এস, পি আমার উপস্থিতিতেই পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পি, আই, এ'র জনৈক ষ্টুয়ার্ডের সহিত গমন করিয়া কোন দোকান হইতে ট্রাঞ্জিষ্টার ট্রান্সমিটার ক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু ট্রান্সমিটার ক্রয়ের জন্য লাইসেন্স সংগ্রহের ব্যাপারে ঐ পত্রে কোন কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। লণ্ডনে কোন ব্যক্তি লাইসেন্স ছাড়া ট্রান্সমিটার ক্রয় করিতে পারে কিনা সে কথা আমার জানা নাই। এই সকল ট্রান্সমিটারের কোনটা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল কিনা তাহা আমি দেখি নাই। তবে ঐ ধরনের কোন ট্রান্সমিটার ক্রয় করা হয় নাই বলিয়া আমি জানি।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী জনাব আমীর হোসেন বলেন যে, আমেরিকানদের সকল কথা হয়ত আমি নাও বুঝিতে পারি। আমেরিকান দূতাবাসের সহিত কিভাবে আমাকে যোগাযোগ করিতে হইবে, সে বিষয়ে আমার কোন ধারণা ছিল না।

১৯৬৫ সালের জুন অথবা জুলাই মাসে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন একদিন আমেরিকান দূতাবাসের সহকারী নৌ-এ্যাটাচী মিঃ নোবলের করাচীস্থ বাসভবনে লইয়া যান। চীনা দূতাবাসের সহিত কিভাবে যোগাযোগ স্থাপন করিব সে বিষয়ে আমার কোন ধারণা ছিল না। ভারতীয় দূতাবাসের ব্যাপারেও আমার একই উত্তর।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে জনাব আমীর হোসেন বলেন যে, এই সকল দূতাবাসের সহিত যোগাযোগ করার জন্য আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই, এই কথা বলা সম্পূর্ণ অন্যায়। তিনি বলেন, "এই উদ্দেশ্যে যে সকল ব্যক্তি আমাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন আপনি তাহাদের জিজ্ঞাসা করুন।"

(সাক্ষীকে এই সময় কৌসুলী টমাস উইলিয়ামস তাহার কোন যোগ্যতার ভিত্তিতে অন্যরা তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে সে কথা জিজ্ঞাসা করেন।) ইহার উত্তরে তিনি বলেন যে, "প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান ও জনাব আহমদ ফজলুর রহমান এই সকল দূতাবাসের সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন এবং তাহারাই আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিতেন। আমি নিজে কখনও এই সকল দূতাবাসের কোনটির সহিত যোগাযোগ করার চেষ্টা করি নাই। লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, অমুক অমুক লোক দূতাবাসগুলির সহিত যোগাযোগ করিবে এবং তাহারা আমাকে জানাইবেন। কিন্তু অনুরূপ কোন কিছু আমাকে কখনও জানান হয় নাই। এই সকল দূতাবাসের কোন লোকও ব্যক্তিগতভাবে আমার সহিত কখনও যোগাযোগ করেন নাই। দূতাবাসগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে অভিযুক্তদের কয়েকজন যে ভূমিকা পালন করিবেন এবং আমাকে তাহা জানান হইবে, এই কথা আমি এই প্রথমবার বলিতেছি– ইহা সত্য নয়। ইহাও সত্য নয় যে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে আমাকে রাজী করানোর জন্য মাত্র ২ হইতে ৩ ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহার পরও আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইত। নিজেকে বাঁচানোর জন্য যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন কিছু বলার মত ব্যক্তি আমি, এ কথা সত্য নয়।

সালাম খানের জেরা

বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম মিঃ টমাস উইলিয়ামসের পর রাজসাক্ষীকে জেরা শুরু করেনঃ

প্রশ্ন–আপনি কি অসুস্থ?

উত্তর–আমি বিগত তিনদিন হইতে আমাশয়ে ভুগিতেছি।

প্রশ্ন–আপনি কি চিন্তিত?

উত্তর–না।

প্রশ্ন–আপনি কি আপনার বেতন পাইতেছেন?

উত্তর–তিন ভাগের এক ভাগ পাইতেছি।

প্রশ্ন–কত টাকা পাইয়াছেন?

উত্তর– ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৬৮ সালের জুলাই পর্যন্ত বেতন গত মাসে আমি পাইয়াছি। টাকার পরিমাণ ১ হাজার ২৮ টাকা কয়েক পয়সা। (সাক্ষী প্রথমে বলেন, 'বেতনের এক তৃতীয়াংশ কত হইবে আমি বলিতে পারিতেছি না')।

প্রশ্ন–কে আপনাকে এই টাকা দিয়াছে?

উত্তর–ডিউটি অফিসার আমাকে নগদে এই টাকা দিয়াছেন। তিনি মেজর হাসানের নিকট হইতে ইহা পাইয়াছিলেন।

প্রশ্ন–কত মাস বেতন পাননি?

উত্তর–এই সময়ের মধ্যে আমাকে কোন বেতন দেওয়া হয় নাই।

প্রশ্ন–আপনাকে কিছু ক্রয় করিতে কি দেওয়া হয়?

উত্তর–ডিউটি অফিসার মারফত আমাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন–আপনার গায়ের হাওয়াই সার্টটি কবে ক্রয় করিয়াছেন?

উত্তর–ইহা নূতন হাওয়াই সার্ট। বেতন পাওয়ার পর জনৈক ডিউটি অফিসারের মারফত আমি ইহা ক্রয় করিয়াছিলাম।

প্রশ্ন–এটা কি কাপড়ের সার্ট?

উত্তর–টেট্রন সার্ট।

প্রশ্ন–কত দাম পড়িয়াছে?

উত্তর–২২ টাকা ৫০ পয়সা।

প্রশ্ন–আপনার পরিহিত জুতা কি নতুন?

এই প্রশ্নে রাজসাক্ষী জনাব আমির হোসেন মিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন এবং বলেন যে, তিনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি (তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতি শাস্ত্রে এম এ পাস করিয়াছেন) এবং বিবাদীপক্ষের কৌসুলী যেভাবে প্রশ্ন করিতেছেন সেভাবে প্রশ্ন করা উচিত নয়।

জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীর এই কথায় আপত্তি করেন। ফলে সাক্ষী এবং কৌসুলীর মধ্যে গরম কথা কাটাকাটি হয়। ফলে আদালতে বিবরণী অল্প কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত থাকে।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান মাননীয় বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান বিবাদীপক্ষের কৌসুলীকে বলেন যে, সাক্ষীকে ভ্রু-ভঙ্গী করিয়া শাসন করা উচিত নয়। বিবাদী কৌসুলী বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে সাক্ষী তাঁহাকেই (সালাম খান) শাসাইয়াছে।

এই পরিবেশে জনাব সালাম খান বলেন যে, তিনি তাঁহার ৪০ বৎসরের আইন-পেশার জীবনে কোন সাক্ষীকে এইভাবে ব্যবহার করিতে দেখেন নাই।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান মাননীয় বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান সাক্ষীকে বলেন যে, বাদীপক্ষের কৌসুলীর তাঁহাকে জামা, জুতা এবং ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও প্রশ্ন করার সার্বিক অধিকার রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, সাক্ষীর চরিত্র সম্পর্কেও কৌসুলী প্রশ্ন করিতে পারেন।

মাননীয় বিচারপতি তখন সাক্ষীকে বাদীপক্ষের কৌসুলীর নিকট এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে সাক্ষীকে নির্দেশ দেন। জনাব আমির হোসেন মিয়া নির্দেশ পালন করেন।

মাননীয় বিচারপতি বলেন যে, সাক্ষ্যদানের সময় সাক্ষীকে কাঠগড়ায় ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। জনাব সালাম খানের এই বক্তব্যের সহিত তিনি একমত নন।

ইহার পর জনাব সালাম খান সাক্ষীকে পুনরায় জেরা করিতে শুরু করেন।

প্রশ্ন–আপনি কি মদ্য পান করেন?

উত্তর–না।

প্রশ্ন–আপনি কি ঔষধ খাইয়াছেন?

উত্তর–সকালে আমি আমাশয়ের জন্য দুইটি ট্যাবলেট খাইয়াছি।

প্রশ্ন–কি ট্যাবলেট?

উত্তর–ট্যাবলেটের নাম আমি জানি না।

প্রশ্ন–আপনি কি ভিনুমগ্লেসিয়া পান করেন?

উত্তর–আমি ইহার নাম শুনি নাই।

প্রশ্ন–ইহা যে একটি টনিক তাহা কি আপনি জানেন?

উত্তর–না।

প্রশ্ন–রাজসাক্ষী বলিতে আপনি কি বুঝেন?

উঃ–রাজসাক্ষী বলিতে আমি এমন একজন অভিযুক্তকে বুঝি, যিনি সত্য কথা বলিবেন এই শর্তে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়াছেন। আমি জানি, এই আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় আমি যদি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত

আমার বিবৃতির উপর অটল না থাকি, তবে আমি ক্ষমা লাভের অধিকার হারাইব এবং জেলে যাইব।

করাচীতে ট্রেনিং

করাচীতে আমাকে ডাকিয়া নেওয়ার পর যে ট্রেনিংয়ের কথা আলোচিত হইয়াছিল; উহা ছিল বিভাগীয় কতিপয় কর্মচারীকে ট্রেনিং দেওয়া সম্পর্কিত। গ্রামে গ্রামে গিয়া এইসব লোকের তথ্য সংগ্রহের কথা ছিল। এ ব্যাপারে আমাকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আমাকে করাচীতে ডাকা হইয়াছিল। পাঁচদিন পর্যন্ত এই ট্রেনিং চলে। ইহার কোন কোর্স ছিল না। ট্রেনিং গ্রহণের জন্য আমাকে যে করাচীতে পাঠান হইয়াছে, উহা দেখানোর জন্য আমার ঢাকা অফিসে কোন কাগজপত্র নাই। ইহা সত্য যে, ঢাকায় আমার ঊর্ধ্বতন অফিসার ও সেসময়ে জানিতেন না যে, এই ট্রেনিংয়ের জন্য আমাকে করাচীতে ডাকা হইয়াছে। আমাকে যে ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছে, সে সম্পর্কে আমার করাচী অফিসে কোন রেকর্ড আছে কিনা, তাহা আমি জানি না। এই ট্রেনিংয়ের সময় আমাকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য কোন লোক ছিল না। চীফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার জনাব এম, আই, হক আমাকে শুধু কয়েকখানি বই পড়িতে দেন। তিনি কোন জায়গার লোক, তাহা আমি জানিতাম না। তবে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী। পাঁচদিনের ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর আমি ঢাকা চলিয়া আসি (সাক্ষী উল্লেখ করেন যে, ১৯৬৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তিনি ঢাকা আসেন)। এই ট্রেনিংয়ের জন্য ১৯৬৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর আমি করাচী যাই। আমি অফিসের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনভেষ্টিগেটর ছিলাম। আমার কাজ ছিল ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর, এ্যাসিষ্ট্যান্ট ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর এবং এন্যুমারেটরদের নিকট হইতে তথ্য গ্রহণ করা। গ্রামসমূহ হইতে তাঁহারা এইসব তথ্য সংগ্রহ করেন। আমি তথ্যগুলির তুলনামূলক বিচার করিতাম এবং এইগুলি সঠিক কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইয়া এগুলি সংকলন করার জন্য করাচী পাঠাইতাম। তথ্যগুলি ঠিক কিনা , উহা দেখার জন্য আমি নিজে গ্রামে যাইতাম না। সর্বপ্রথম আমার মূল বেতন ছিল মাসে ৩৩৫ টাকা। আমি করাচীতে থাকিলে এই মূল বেতন ছাড়াও প্রবাস ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা, নগর ভাতা, যাতায়াত ভাতা প্রভৃতি পাইতাম। ভাতাগুলি মিলাইয়া করাচীতে সর্বমোট আমি ৪২৫ টাকা পাইতাম। খুব সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের ১৬ই নবেম্বর করাচী হইতে প্রাপ্ত একটি টেলিগ্রামে আমাকে সেখানে গিয়া যোগদান করিতে বলা হয়। আমাকে অবিলম্বে করাচী পাঠাইয়া দেওয়ার জন্যও খুব সম্ভব টেলিগ্রাম নির্দেশ দেওয়া হয়। আমি একটি আলাদা অফিস অর্ডারও পাই। ইহাতে আমাকে অবিলম্বে করাচী রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। আমার মনে হয় আমার বিবাহের জন্য ১৭ই নবেম্বর ঢাকা অফিসে

আমি ছুটির জন্য দরখাস্ত করি এবং এই উদ্দেশ্যে আমি মাদারীপুর গমন করি। আমি ১০ দিনের, না ৫ দিনের ছুটি লইয়াছিলাম, তাহা আমার মনে নাই। ছুটিশেষে অফিসে আমি আবার যোগদান করি। তাহাও আমার মনে নাই। আবার নৈমিত্তিক ছুটির তালিকায় বিবাহের এই ছুটির কথা উল্লেখ নাই। মেডিক্যাল কারণে আমি বিবাহের জন্য ছুটি নিই (সাক্ষী বলেন, যে ছুটির তালিকা তাহার হাতে দেওয়া হইয়াছে, উহা করাচী অফিসের, ঢাকার নহে)। (সাক্ষীকে আদালতে চিহ্নিত পি ডব্লু ৩/৫৯নং দলিলের প্রতি নজর দিতে বলা হয়।) সাক্ষী বলেন, আমি মেডিক্যাল কারণে অথবা বিবাহের জন্য ছুটি নিই, সেকথা দলিলে উল্লেখ নাই। কারণ, দলিলে এভাবে লেখা যায় না।

এই দলিলে যে বিষয়টি উল্লিখিত আছে তাহা হইতেছে যে, আমি করাচী যাইবার জন্য অগ্রিম ভ্রমণভাতা চাহিয়াছিলাম। আমি যদি নিজের বিবাহের জন্য কয়েকদিনের ছুটি চাহিতাম, তবে আমার ছুটি নামঞ্জুর করা হইত না। আমি সেই সময়ে বিবাহ করি। উহাই আমার প্রথম বিবাহ। আমার শ্বশুরের নাম আবদুল মজিদ বয়াতি। আমি আমার ছুটির দরখাস্তে যে কারণ উল্লেখ করিয়াছি, উহা মিথ্যা নহে। আমি ঐ সময় অসুস্থও ছিলাম। জরীপ অফিসার মীর আসরাফদ্দীন আহমদ ঢাকায় আমার পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্মচারী ছিলেন। আমি আমার বিবাহের তারিখ স্মরণ করিতে পারিতেছি না। (মাননীয় আদালত সাক্ষীকে কেন সে তাঁহার বিবাহের নির্দিষ্ট তারিখ ভুলিয়া গিয়াছে, ইহা জিজ্ঞাসা করেন। সাক্ষী বলেন, "মোট কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।") আমি সংবাদপত্র পড়ি। আমাদের আন্দোলনের আরও কোন কর্মী গ্রেফতার হইয়াছিল কিনা, তাহা আমি গ্রেফতার হইবার পূর্বে জানিতাম না। আমি "পাকিস্তান অবজারভার" পড়ি, কোন বাংলা সংবাদপত্র পড়ি না। আমার গ্রেফতারের পূর্বে 'পাকিস্তান অবজারভার' ও অন্যান্য সংবাদপত্রে এই ষড়যন্ত্র প্রসংগে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাহাদের পক্ষ হইতে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টে আবেদন পেশ করা হয় বলিয়া প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম না। পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকালে আমি কোন সংবাদপত্র পড়ি নাই। আমি করাচীতে রেডিও হইতে প্রচারিত খবরও শ্রবণ করি নাই। কিছুসংখ্যক ব্যক্তি গ্রেফতার হয় এবং এই সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টে আবেদন পেশ করা হয়–এই সংবাদ আমাকে কেহই জানায় নাই। আমি করাচীতে আমার অফিসের একজন পূর্ব পাকিস্তানী অফিসার জনাব ওয়াজেদ আলীর বাসায় অবস্থান করিতেছিলাম। করাচীতে ট্রেনিং-এর সময় আমি অফিসে গিয়া পাঠাগারে বসিয়া আমাকে যে সকল বই দেওয়া হইত ঐগুলি পড়িতাম। এই সময়ে আমি পূর্ব পাকিস্তান হইতেও কোন ব্যক্তিগত চিঠি লাভ করি নাই। করাচীতে

ট্রেনিং-এর সময় আমার স্ত্রী ঢাকায় ছিলেন এবং তিনি ৭১, নাজনিন বাগ, শান্তিনগর, ঢাকা এই ঠিকানায় অবস্থান করিতেছিলেন। এই বাসাটি গোয়েন্দা অফিস হইতে মাত্র ৫ হইতে ১০ মিনিটের পথ। এই সময়ে এই বাসায় আবদুল হাকিম নামক আমার একজন নিজস্ব গ্রামের লোক ও একজন চাকর ছিল। আমি আমার বিবাহের ২ কি তিনদিন পর আমার শ্বশুরকে বলি যে, আমি অফিসের কাজে করাচী যাইতেছি। আমি তাহাকে (শ্বশুর) আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্ত্রী যে বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন, যেখানে অন্য কোন ব্যক্তিকে থাকিতে দেওয়ার পরামর্শ প্রদান করি নাই।

১৯৬৭ সালের নবেম্বর মাসে তৃতীয় সপ্তাহ হইতে ১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমি করাচীতে ছিলাম–এ কথা ঠিক নয়। সেসময় করাচীতে কোন পুলিশ অফিসার আমার সংগে যোগাযোগ স্থাপন করেন নাই। বোধহয় আমি স্ত্রীকে চিঠি দিয়া জানাইয়াছিলাম যে, করাচীতে আমাকে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে হইবে। অবশ্য আমি কবে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করিব সেকথা তাহাকে জানাই নাই। করাচী গমনের ৩/৪ দিন পর আমি স্ত্রীকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। পি, আই এ বিমানযোগে আমি ঢাকা হইতে করাচী গমন করি। করাচী অফিস পি আইএ'র টিকেট ঢাকা অফিসে পাঠান। ঢাকা অফিস পরে উহা আমার নিকট প্রদান করেন। ঢাকা ত্যাগের দুইদিন আগে আমাকে এই টিকেট দেওয়া হয়। ২রা বা ৩রা ডিসেম্বর আমাকে টিকেটটি দেওয়া হয়। পি আই এ টিকেট বইতে আমার নাম ও রওয়ানা হওয়ার তারিখ যথারীতি উল্লেখ করা হয়।
সাক্ষী আরও বলেন, "আমি ঢাকা বিমানবন্দরে আসিয়া পৌঁছিলে সাদা পোষাক পরিহিত দুই ব্যক্তি এবং ইউনিফর্মধারী জনৈক এস, আই আমাকে গ্রেফতার করেন।"

তিনি বলেনঃ "লাগেজ রুমে যখন আমি মালপত্র ফেরৎ নিতে যাই। সেসময় আমাকে গ্রেফতার করা হয়। যাই হোক, আমি মালপত্র ফেরৎ লই। মালপত্রের মধ্যে একটি ছিল ফলের ঝুঁড়ি, অন্যটি এটাচী কেস। এই দুইটি প্যাকেজসহ আমাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নিয়া যাওয়া হয়।

সাক্ষী বলেন, আমাকে যখন লাগেজ রুমে গ্রেফতার করা হয়, সেসময় আমাকে তল্লাশী করা হয় নাই। পুলিশ এই দুইটি প্যাকেজ আটকের কোন তালিকাও তৈরী করে নাই। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আমার নাম জেল রেজিষ্ট্রারভুক্ত করার পর দুইটি প্যাকেজসহ আমাকে জীপে করিয়া রাজারবাগ পুলিশ কেন্দ্রে পাঠানো হয়।

আমাকে জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় আমার সঙ্গে জিনিসপত্র ছিল কিনা উহা জেলের কর্মচারীগণ জানিতে চাহেন। ইহাতে আমি এই দুইটি প্যাকেজের কথা উল্লেখ করি। কিন্তু উহা জেল রেজিষ্ট্রারভুক্ত করা হয় না।

আমি জেল রেজিষ্ট্রারে শুধু ৩০ টাকা, একটি সোনার রিং এবং কিছু খাম জমা দিয়াছিলাম। জেল বা বিমানবন্দরে কেহই এই দুইটি প্যাকেজের প্রতি লক্ষ্য করে না। এই দুইটি প্যাকেজ আটক বন্দীর বলিয়া উহা জেলে রাখা উচিত– জেল কর্তৃপক্ষ এ ধরনের কোন কথা পুলিশ অফিসারদের বলেন কিনা তাহা আমি বলিতে পারি না। জেল গেটের রেজিষ্ট্রারে আমি স্বাক্ষর করি নাই। আর কেহ উহাতে স্বাক্ষর করেন কিনা তাহাও আমি জানি না। আমাকে জেল গেটের অফিসে নিয়া যাওয়া হইয়াছিল। জেলের ভিতরে না নিয়া আমাকে সেখান হইতে রাজারবাগ জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে পাঠানো হয়। ডি, এস, পি পূর্বে আমার ফলের ঝুঁড়িটা আমার স্ত্রীকে প্রদান করেন। আমি এটাচী কেস হইতে কিছু কাপড়-চোপড় বাহির করি এবং উহা আমার স্ত্রীকে প্রদানের জন্য ডি,এস, পি'র হাতে দেই। অতঃপর উক্ত দুইটি প্যাকেজসহ আমাকে রাজারবাগ পুলিশ কেন্দ্রে নিয়া যাওয়া হয়। সেখানেও দ্রব্য আটকের কোন তালিকা তৈরী করা হয় নাই। আমার স্ত্রী রাজারবাগে যান নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করার বহু পূর্বে আমি পুলিশের নিকট সবকিছু জানাই। জিজ্ঞাসাবাদের প্রথম দিনেই আমি তাহাদের সবকিছু জানাইয়া দেই। আদালতে আমি যে বিবরণ প্রদান করিয়াছি, রাজারবাগ পুলিশ কেন্দ্রে জিজ্ঞাসাবাদের পূর্বেই তদন্তকারী কর্মচারীদের খুশী করার জন্য উহা তাহাদের নিকট আমি ব্যক্ত করি– একথা সত্য নয়।

দৈনিক পাকিস্তান

৮ই আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী কর্তৃক একরারী সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার জেরা আরম্ভ

আবদুস সালাম খান জেরা করেন। চার ঘণ্টাকাল জেরার পর অসমাপ্ত অবস্থায় এদিনের শুনানী মুলতবী রাখা হয়েছে।

গতকাল বুধবার মামলার শুনানীর শুরুতেই বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান বিদেশ যাবেন–কাজেই তাকে প্রথম জেরা করার সুযোগ দেয়া হউক।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস এ রহমান বলেন যে, প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য একজন কৌসুলী জেরা করতে পারবেন। জনাব সালাম খান বলেন যে, উইলিয়ামস ২নং একরারী সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়াকে জেরা শুরু করেন।

উইলিয়ামস– মিঃ মিয়া আপনি কি বিবাহিত?

সাক্ষী– হ্যাঁ।

উইলিয়ামস–আপনার কোথায় বসবাস করতেন?

সাক্ষী–জাহাঙ্গীর রোড, করাচীতে।

উইলিয়ামস–এখানে কতদিন পর্যন্ত ছিলেন?

সাক্ষী–১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত।

সাক্ষী–ঢাকা হোটেলে।

উইলিয়ামস–সেখান হতে আপনি কোথায় যান?

সাক্ষী–আমি চট্টগ্রাম গমন করি।

উইলিয়ামস–সেখানে আপনি কতদিন ছিলেন?

সাক্ষী–৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত।

উইলিয়ামস-ঢাকা ফিরে এসে আপনি কোথায় উঠেন?

সাক্ষী-হোটেল আরজুতে।

উইলিয়ামস-ওখানে কতদিন ছিলেন?

সাক্ষী-১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগ অথবা মার্চ মাসের প্রথমভাগ পর্যন্ত।

উইলিয়ামস-সেখান হতে আপনি কোথায় গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন?

সাক্ষী-১০৭নং দীননাথ সেন রোডের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে গমন করি।

উইলিয়ামস-এটা কার বাড়ী?

সাক্ষী-এ্যাসিস্ট্যান্ট সেসন জজ জনাব হারুনুর রশীদের বাড়ী।

উইলিয়ামস-এই বাড়ীর সন্ধান আপনি কি করে পেলেন?

সাক্ষী-স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের নিকট হতে আমি এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে বলে জানতে পারি।

উইলিয়ামস-আপনি কি বাড়ীওয়ালাকে চেনেন?

সাক্ষী-না।

উইলিয়ামস-বাড়ী ভাড়া করার ব্যাপারে বাড়ীওয়ালার সাথে আপনার কোন কথাবার্তা হয়েছিল কি?

সাক্ষী -এই বাড়ী ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না।

উইলিয়ামস-আপনি কখন প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে যান?

সাক্ষী-১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে অথবা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে।

উইলিয়ামস-আপনাকে হত্যা করার কোন হুমকি দেয়া হয়েছিল কি?

সাক্ষী-হ্যাঁ।

উইলিয়ামস-কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনার কিছুই হয়নি এটা ঠিক কিনা?

সাক্ষী-প্রকৃতপক্ষে আমার কোন ক্ষতি করা হয়নি।

এরপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীর করাচী গমন সম্পর্কিত তার অফিসের ডিলিং এ্যাসিসট্যান্টের নোট তাকে দেখিয়ে বলেন, আপনার করাচী গমনের উদ্দেশ্য কি ছিল?

সাক্ষী-আমি জানি না।
উইলিয়ামস-আপনি এই নোট কখন পেয়েছিলেন?
সাক্ষী-১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে। আমার অফিসার ইনচার্জ আমাকে বলেন যে, আমাদের ডিরেক্টর জেনারেল আলোচনার জন্য আমাকে করাচী ডেকে পাঠিয়েছেন।
উইলিয়ামস-আপনি কখন করাচী গমন করেছিলেন?
সাক্ষী-৫ই ডিসেম্বর।
উইলিয়ামস-কি আলোচনা হয়েছিল?
সাক্ষী-ফিল্ড স্টাফদের এক সপ্তাহ ট্রেনিং প্রদান সম্পর্কে।
উইলিয়ামস-আপনি কতদিন করাচীতে ছিলেন?
সাক্ষী-৬ই ডিসেম্বর হতে ১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত।
উইলিয়ামস-ঐ সময়ে আপনি কি রাওয়ালপিন্ডি গমন করেছিলেন?
সাক্ষী-না।
উইলিয়ামস-আপনি পূর্ব পাকিস্তান হতে কোন সময় রাওয়ালপিন্ডি গমন করেছিলেন কি?
সাক্ষী-না। আমি ১৯৫২ সালে করাচী হতে পিন্ডি গমন করেছিলাম।
উইলিয়ামস-আপনি করাচীতে ফিরে আসার পর কি গ্রেফতার হয়েছিলেন?
সাক্ষী-১৩ই ডিসেম্বর যখন আমি করাচী হতে ঢাকা ফিরে আসি তখন গ্রেফতার হই।
উইলিয়ামস-আপনি গ্রেফতার হতে পারেন এরূপ কোন সন্দেহ আপনার মনে জেগেছিল?
সাক্ষী-না।
উইলিয়ামসঃ আপনাকে গ্রেফতারের পূর্বে কোন গ্রেফতারী পরোয়ানা দেখান হয়েছিল কি?
সাক্ষীঃ আমাকে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতারের পরোয়ানা দেখান হয়।
উইলিয়ামসঃ আপনাকে কে গ্রেফতার করেছিলেন?
সাক্ষীঃ সাধারণ পোশাক পরিহিত কতিপয় ব্যক্তি।
উইলিয়ামসঃ গ্রেফতারের পর আপনাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়?
সাক্ষীঃ ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে।
উইলিয়ামসঃ পরদিন আপনি আপনার ব্যাগ আনার জন্য এই চিরকুটখানা দিয়েছেন তাই নয় কি? (এই বলে কৌসুলী পূর্ববর্তী দিনে যে চিরকুট আদালতে পেশ করা হয় তা সাক্ষীকে দেখান)।
সাক্ষী-১৩ই ডিসেম্বর আমাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর আমাকে রাজারবাগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন সেখান হতে আমি ঐ চিরকুট প্রদান করি।

উইলিয়ামস-রাত্রিবেলায় আপনাকে কি জিজ্ঞেস করা হয়েছিল?
সাক্ষীঃ আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল।
উইলিয়ামসঃ আপনাকে কতক্ষণ প্রশ্ন করা হয়েছিল?
সাক্ষীঃ তিন ঘণ্টা পর্যন্ত।
উইলিয়ামসঃ আপনি স্বীকারোক্তি করার জন্য কি তখনই মনস্থির করেছিলেন?
সাক্ষীঃ এ প্রশ্নই উঠে না।
উইলিয়ামসঃ কতক্ষণ যাবৎ প্রশ্ন করার পর আপনি এই চিরকুট প্রদান করেছিলেন?
সাক্ষীঃ আমি ১৪ই ডিসেম্বর সকালে এই চিরকুট প্রদান করি। ঐ সময় আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি।
উইলিয়ামসঃ আপনি তখন কোথায় ছিলেন?
সাক্ষীঃ রাজারবাগে।
উইলিয়ামসঃ কোন কোন অফিসার আপনাকে প্রশ্ন করেছিলেন?
সাক্ষীঃ ডি এস পি মান্নাফ ও অপর দুজন। তাদের আমি চিনি না।
উইলিয়ামসঃ লেঃ শরীফ তখন ছিলেন?
সাক্ষীঃ না।
উইলিয়ামসঃ মেজর হাসান ছিলেন?
সাক্ষীঃ না।
উইলিয়ামসঃ আপনি এই চিরকুট কাকে দিয়েছিলেন?
সাক্ষীঃ ডি এস পি মান্নাফকে।
উইলিয়ামসঃ চিরকুটে একটা বড় ডায়েরী ও একটা ছোট ডায়েরীর কথা উল্লেখ আছে। আপনি চিঠিপত্রের কথা কিছুই লেখেননি কেন?
সাক্ষীঃ আমি ভুলে গিয়েছিলাম।
উইলিয়ামসঃ আপনি ১৯৬৬ সালের ৪ঠা মে পর্যন্ত চিঠিপত্র রেখেছিলেন এটা কি সত্য?
সাক্ষীঃ হ্যাঁ।
উইলিয়ামসঃ চিঠিপত্র সম্পর্কিত আপনার সাক্ষ্য মিথ্যা, একথা ঠিক কিনা?
সাক্ষীঃ মোটেই নয়।
উইলিয়ামসঃ ১৯৬৫ সালের ২৮শে আগষ্ট আপনার করাচী অফিসে ছুটির জন্য আবেদন করেছিলেন কি?
সাক্ষীঃ আমি ৩০ শে আগষ্ট হতে ১০ দিনের ছুটি চেয়েছিলাম।
উইলিয়ামসঃ এই ছুটি আপনি কি জন্য চেয়েছিলেন?
সাক্ষীঃ কারণ ঠিক আমার মনে পড়ছে না ।
কৌসুলী এই সময় সাক্ষীকে তার উক্ত ছুটির দরখাস্তের নকল প্রদান করে বলেন, আপনি যে দরখাস্ত অফিসে দিয়েছেন সেটা টাইপ করা আর এটা

টাইপ করা নয়। এই প্রভেদটুকু ব্যতীত আর সবই হুবহু এক। এটা দেখে আপনি ছুটি নেওয়ার কারণ বলতে পারবেন কিনা?
সাক্ষীঃ মুল দরখাস্ত না দেখে আমি জবাব দিব না।
উইলিয়ামসঃ এটা কি সত্য যে, আপনার একটা ঘরোয়া, ব্যক্তিগত, জরুরী ও যা এড়ানো যায় না এরূপ একটা সমস্যা ছিল। আপনাকে ছুটি না দেয়া হলে পরিণামে আপনি সম্পত্তি হারাতেন, ঠিক কিনা?
সাক্ষীঃ মূল দরখাস্ত না দেখলে আমি বলতে পারব না।
উইলিয়ামসঃ বিগত ৫ বছরে আপনার এমন কোন ব্যক্তিগত সমস্যা দেখা দিয়েছিল কিনা যার ফলে সম্পত্তি খোয়ানোর কারণ ঘটেছিল?
সাক্ষীঃ না।
উইলিয়ামসঃ আগষ্টে ছুটি নেওয়ার পর আপনি কি করেছিলেন?
সাক্ষীঃ লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে ঢাকার বৈঠকের কথা জানান।
উইলিয়ামসঃ আপনি ঢাকায় অবস্থানকালে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়েছিল কি?
সাক্ষীঃ হ্যাঁ।
উইলিয়ামসঃ ফলে আপনি করাচী ফিরে যেতে পারেননি। তাই না?
সাক্ষীঃ হ্যাঁ, সকল ফ্লাইট বাতিল করা হয়।
কৌসুলী সাক্ষীরা টেলিগ্রামের একটি সার্টিফাইড কপি পড়ে শোনান "পিআইএ ফ্লাইট বাতিল। কাজে যোগদানে অপারগতা। পরামর্শ প্রার্থনা করছি।"
উইলিয়ামসঃ আপনি কি করাচী স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিসে এই তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন?
সাক্ষীঃ হ্যাঁ।
এরপর সাক্ষীকে তা পড়তে দেয়া হয়। তিনি তারবার্তার নীচে ঠিকানা পড়েন ১০৭ ডি এন, সেন রোড, ফরিদাবাদ, ঢাকা।
উইলিয়ামসঃ আপনি কি ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা বদলী হয়ে আসেননি?
সাক্ষীঃ ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে অথবা মার্চের প্রথমভাগে আমি ঢাকা বদলী হয়ে আসি।
উইলিয়ামসঃ এই তারবার্তা কবে পাঠান হয়েছিল?
সাক্ষীঃ এটা কখন পাঠান হয়েছিল তা আমি বলতে পারব না। তবে এর উপরের অংশে যে লেখা আছে তাতে ১৯৬৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর করাচী পৌঁছেছে বলে উল্লেখ আছে।
উইলিয়ামসঃ শেখ মুজিব কয়টা সভায় উপস্থিত ছিলেন?

সাক্ষীঃ বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত ২টি বৈঠকে শেখ মুজিবের সঙ্গে আমি উপস্থিত ছিলাম। এর একটা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালের ২৯শে আগষ্ট এবং অপরটি ১৯৬৫ সালের ১২ই মার্চ।
উইলিয়ামসঃ আপনি শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ী চেনেন?
সাক্ষীঃ হ্যাঁ।
উইলিয়ামসঃ দ্বিতীয় বৈঠক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
সাক্ষীঃ ধানমন্ডি এলাকায় জনাব তাজুদ্দিনের বাড়ীতে।
উইলিয়ামসঃ এই বৈঠক ছাড়া কতবার শেখ মুজিবের সাথে আপনার দেখা হয়েছিল?
সাক্ষীঃ অনেকবার দেখা হয়েছিল। কিন্তু কতবার তা আমার মনে নেই।
উইলিয়ামসঃ শেখ মুজিব আপনার সাক্ষাতে কতবার টাকা দিয়েছিলেন?
সাক্ষীঃ একবার আমার উপস্থিতিতে শেখ মুজিব স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে টাকা দিয়েছিলেন।
উইলিয়ামসঃ কত টাকা?
সাক্ষীঃ ৪ হাজার টাকা।
উইলিয়ামসঃ ঢাকা হোটেলের বিল শোধের জন্য?
সাক্ষীঃ না।
উইলিয়ামসঃ আপনি ও মোয়াজ্জেম কি একত্রে ঢাকা এসেছিলেন?
সাক্ষীঃ হ্যাঁ।
উইলিয়ামসঃ আপনি কখন ঢাকা পৌঁছেন?
সাক্ষীঃ রাত ১টা হতে ৩ টার মধ্যে।
উইলিয়ামসঃ করাচী ত্যাগ করার জন্য আপনার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল কি?
সাক্ষীঃ তখন আমি ছুটিতে ছিলাম।
উইলিয়ামসঃ তখন বলেন যে, সাক্ষী ক্যাজুয়েল লীভের দরখাস্ত করেছিলেন করাচীতে অবস্থান করার জন্য। কিন্তু তিনি ঢাকা চলে আসেন।
তারপর কৌসুলী সাক্ষীর লীভ একাউন্ট সাক্ষীর হাতে দেন।
উইলিয়ামসঃ আপনি এর জন্য শাস্তি পেয়েছিলেন?
সাক্ষীঃ আমার মনে পড়ছে না।
উইলিয়ামসঃ ১৯৬৫ সালের ২৯শে আগষ্টের বৈঠকে শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ীতে টাকা-পয়সা সম্পর্কে কি আলোচনা হয়েছিল?
সাক্ষীঃ ঐ সভায় লেঃ মোয়াজ্জেম আন্দোলনের জন্য টাকার দরকার বলে জানান। শেখ মুজিবর রহমান এক লাখ টাকা পর্যন্ত দিতে সম্মত হন। তিনি এক একবারে ২ হতে ৪ হাজার টাকা করে দেবেন বলে জানান।

উইলিয়ামসঃ আপনার জানামতে শেখ মুজিব কত টাকা দিয়েছেন?
সাক্ষীঃ প্রথম ১৫শ ও ৫শ টাকা দেন। সুলতানউদ্দিনের মারফত এই টাকা প্রদান করা হয়। তারপর একবার ৭শ টাকা পরে ৪ হাজার টাকা দেন। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের নিকট এই টাকা দেয়া হয়। তারপর আমার উপস্থিতিতে ৪ হাজার টাকা দেন।
উইলিয়ামসঃ শেখ মুজিবের বাড়ীর বৈঠকের কথা লেঃ মোয়াজ্জেম আপনাকে কখন বলেছিলেন?
সাক্ষীঃ ১৯৬৫ সালের আগষ্টের প্রথম দিকে।
শেখ মুজিবর রহমানের কৌসুলী মিঃ টমাস উইলিয়ামস একরারী সাক্ষী আমির হোসেন মিয়াকে প্রশ্ন করেনঃ জনাব মিয়া আপনি ১৯৬৫ সালেল ২৯ শে আগষ্ট শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন নি?
সাক্ষীঃ একথা মোটেও সত্য নয়।
প্রঃ আপনি কখনও শেখ মুজিবর রহমানকে কারো কাছে টাকা দিতে দেখেননি?
উঃ একথা সত্য নয়?
প্রঃ আপনি ষড়যন্ত্রের কাজে লিপ্ত থাকাকালে কখনও অস্ত্র ও গোলাবারুদ দেখেছেন কি?
উঃ না।
প্রঃ আপনি যতদিন "ষড়যন্ত্রের" কাজে লিপ্ত ছিলেন বলে বলছেন তখন কি কোন অস্ত্র ও গোলাবারুদ এসেছিল?
উঃ না।
প্রঃ ১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ লাগার সময় আপনি কি ঢাকা হতে করাচী গিয়েছিলেন?
উঃ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর গিয়েছিলাম।
প্রঃ ভারতের সাথে যুদ্ধের সময় ষড়যন্ত্রের কাজ এগিয়ে নেয়ার জন্য কাজকর্ম চলছিল কি?
উঃ না।
প্রঃ তখন কোন কিছু করা হয়নি?
উঃ কিছু করা হয়নি একথা সত্য নয়। শেখ মুজিবুর রহমান এ সময় স্টুয়ার্ড মুজিবরকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন।
প্রঃ এই টাকা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করা হয়েছিল কি?
উঃ না।
প্রশ্ন ঃ জনাব মিয়া যুদ্ধে ভারত যাতে জয়ী হয় এরূপ কোন কাজ করা হয়েছিল কি?
উঃ না।

প্রঃ ট্রান্সজিস্টর ট্রান্সমিটার আনয়ন প্রসঙ্গে জনাব ফজলুর রহমানের সাথে সাক্ষাতের কথা আপনার মনে আছে কি?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে চাকুরীকালে আপনি কখনও ট্রান্সজিস্টর ট্রান্সমিটার দেখেছেন কি?
উঃ না। আমি আমার জীবনেও দেখিনি।
প্রঃ তখন ওয়ারলেস সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা ছিল কি?
উঃ না।
প্রঃ লন্ডন হতে জনাব এ এফ রহমান কি ধরনের ট্রান্সজিস্টর ট্রান্সমিটার আনতে বলেছিলেন?
উঃ কি ধরনের সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই।
প্রঃ লন্ডন হতে কিভাবে ট্রান্সজিস্টর ট্রান্সমিটার পাকিস্তানে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল?
উঃ পিআইএ বিমানযোগে। লেঃ মোয়াজ্জেমের পরিচিত জনৈক পিআইএ স্টুয়ার্ডের মাধ্যমে।
প্রঃ ট্রান্সজিস্টর ট্রান্সমিটারের সাইজ কত বড় বলতে পারেন কি? উহা কি ট্রাইব্যুনাল কক্ষের টেবিলের অর্ধেক পরিমাণ হবে না?
উঃ এ সম্পর্কে আমার ধারণা নেই।
প্রঃ লন্ডনে যে কোন ব্যক্তিই কি ট্রান্সজিস্টর ট্রান্সমিটার কিনতে পারে?
উঃ আমি জানি না।
প্রঃ তবে জনাব এ এফ রহমান কিভাবে লন্ডন হতে আনতে বললেন?
উঃ কিভাবে তার ছোট ভাই লন্ডনে কিনবে তা জনাব এ এফ রহমান চিঠিতে লিখেছিলেন। সে চিঠি লেঃ মোয়াজ্জেমের কাছে এনে দিয়েছিলাম।
প্রঃ আপনি সে চিঠি দেখেছিলেন?
উঃ হ্যাঁ, আমি নিজেই দেখেছিলাম।
প্রঃ বলুন, তবে লন্ডনে কিভাবে ট্রান্সজিস্টর ট্রান্সমিটার কেনা যেতে পারে?
উঃ জনাব এ এফ রহমান আমার সামনেই চিঠি লিখেছিলেন এবং তার ভাইকে পিআইএ'র স্টুয়ার্ডের সাথে লন্ডনের কোন দোকানে গিয়ে ট্রান্সজিস্টর ট্রান্সমিটার কিনতে লিখেছিলেন।
প্রশ্নঃ এজন্য কোন লাইসেন্স সংগ্রহের কথা বলা হয়েছিল কি?
উঃ লাইসেন্স সংগ্রহের কোন কথা বলা হয়নি।
প্রঃ জনাব মিয়া আমিও এ ধরনের ট্রান্সমিটার পেতে আগ্রহী। তাই আপনি কি আমাকে জানাতে পারেন যে, বিনা লাইসেন্সে লন্ডনে যে কেহ যে কোন দোকান থেকে ট্রান্সজিস্টর ট্রান্সমিটার কিনতে পারে?
উঃ আমি জানি না বিনা লাইসেন্সে কেহ কিনতে পারে কিনা।

প্রঃ কোন ট্রান্সমিটার আনা হয়েছিল কি?
উঃ আমি যতদূর জানি কোন ট্রান্সমিটারই আনা হয়নি।
বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়াম যেসব প্রশ্ন করছিলেন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান তা সাক্ষীকে বুঝিয়ে বলছিলেন। এ প্রসঙ্গে মিঃ উইলিয়াম সাক্ষীকে প্রশ্ন করেনঃ জনাব মিয়া, আপনি কি করাচী বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমএ পাস করেছেন এবং সেখানে কি ইংরেজীতে উত্তর লিখতে হয়েছিল?
সাক্ষীঃ হ্যাঁ।
প্রঃ তবে আপনি কেন আমার ইংরেজী বুঝছেন না?
উঃ আপনার ইংরেজী ভিন্ন ধরনের ও উচ্চারণ আমাদের থেকে পৃথক।
প্রঃ আপনাকে কি ষড়যন্ত্রমূলক কাজের জন্য মার্কিন কনস্যুলেট-এর কাজে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ আপনি আমার ইংরেজী বোঝেন না তবে মার্কিন ইংরেজী উচ্চারণ কি করে বুঝেছিলেন?
উঃ আমেরিকানরা যা কিছু বলেছিল আমি তা সব বুঝিনি।
প্রঃ জনাব মিয়া এই ট্রাইব্যুনালকে বলুন কিভাবে আপনি মার্কিন দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করবেন?
উঃ কিভাবে যোগাযোগ করতে হয় সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। ১৯৬৫ সালের জুন অথবা জুলাই মাসে লেঃ মোয়াজ্জেম একদিন আমাকে করাচীতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের এসিস্ট্যান্ট নেভাল এটাচী মিঃ নোবেল-এর বাসভবনে নিয়ে গিয়েছিলেন।
প্রঃ চীনা দূতাবাসের সাথে আপনি কিভাবে যোগাযোগ করবেন?
উঃ এ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই।
প্রঃ ভারতীয় দূতাবাসের সাথে?
উঃ তাও জানি না।
প্রঃ জনাব মিয়া আপনার মত একজন নগণ্য ব্যক্তিকে এসব দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হাস্যকর ও মিথ্যা এবং আপনি বিদেশী শক্তি সম্পর্কে বেপরোয়া অভিযোগ করছেন?
উঃ না,একথা সত্য নয়।
প্রঃ আপনাকে এহেন দায়িত্ব দেওয়ার মত আপনার কি যোগ্যতা আছে?
উঃ যে লোকেরা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিল তাদের আপনি প্রশ্ন করুন। আমাকে কেন প্রশ্ন করছেন? কোর্ট তখন উত্তর দিতে বললে সাক্ষী বলেন যে, বস্তুতঃ শেখ মুজিবর রহমান ও জনাব এ এফ রহমান এসব দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং এসব দূতাবাস আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি

জানাবেন কথা ছিল। আমি কোনদিন এসব দূতাবাসের সাথে নিজে যোগাযোগ করিনি। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে জানিয়েছিলেন যে, অমুক অমুক ব্যক্তি দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করবে এবং তারা আমাকে জানবে।
প্রঃ কোন দূতাবাস আপনার সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করেছিল কি?
উঃ না, কেহ আমার সাথে যোগাযোগ করেনি।
প্রঃ আপনি বিদেশী শক্তি সম্পর্কে অলীক অভিযোগ করছেন এবং দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করার প্রসঙ্গ এখন এই প্রথম উত্থাপন করে তাদের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে বলছেন?
উঃ না, একথা সত্য নহে।
প্রঃ আপনাকে গ্রেফতারের পরও ২/৩ ঘণ্টা প্রশ্ন করার পরই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য আপনাকে বলা হয়েছিল?
উঃ না, একথা সত্য নয়। আমাকে ঐ ২/৩ ঘণ্টা প্রশ্ন করার পরও অন্যান্য বিভিন্ন সময়ও প্রশ্ন করা হয়েছিল ও তখন অন্যান্যদের কথা বলি।
প্রঃ জনাব মিয়া আপনি হচ্ছেন সেই ধরনের লোক যারা নিজেদের গা বাঁচানোর জন্য অন্যান্যদের সম্পর্কে যা কিছু বলতে পারেন?
উঃ না, একথা সত্য নয়।

বিবাদী কৌশুলী সালাম খানের জেরা

মিঃ টমাস উইলিয়ামের পর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান একরারী সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়াকে জেরা করতে শুরু করেন।
প্রঃ আপনি কি অসুস্থ?
উঃ হ্যাঁ, গত তিনদিন ধরে আমাশয়ে ভুগছি।
প্রঃ আপনি কি এজন্য বিব্রত?
উঃ না।
প্রঃ আপনি কি আপনার বেতন যথারীতি পাচ্ছেন?
উঃ বেতনের তিন ভাগের একভাগ পাচ্ছি।
প্রঃ কত টাকা?
উঃ কত টাকা করে বলতে পারি না। তবে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর হতে ১৯৬৮ সালের জুলাই পর্যন্ত মোট এক হাজার ২৮ টাকা ও কয়েক পয়সা পেয়েছি। এই টাকা জুলাই মাসে পেয়েছি।
প্রঃ আপনি নিজে টাকা পেয়েছেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ কার হাত দিয়ে পেয়েছেন?
উঃ আমাকে সামরিক হাজতের ডিউটি অফিসার এ টাকা মেজর নাসেরের কাছ হতে এনে দিয়েছেন।

প্রঃ এই জুলাই মাসের আগে আর কোন সময় টাকা পেয়েছেন কি?
উঃ না।
প্রঃ আপনাকে কি কেনাকাটা করতে দেওয়া হয়?
উঃ ডিউটি অফিসারের মাধ্যমে কেনাকাটা করতে পারি।
প্রঃ আপনার পরনের এই হাওয়াই সার্ট কি নতুন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ জুলাই মাসে টাকা পেয়ে কিনেছেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ কেনার তারিখ বলতে পারেন?
উঃ না।
প্রঃ ক্যান্টনমেন্ট স্টোর থেকে কিনেছেন কি?
উঃ ডিউটিরত সামরিক বাহিনীর জনৈক লেফটেন্যান্টের মাধ্যমে আমি এটা কিনেছি। কোথেকে তা জানি না।
প্রঃ তার নাম কি?
উঃ নাম বলতে পারি না।
প্রঃ এ সার্টের মূল্য কত?
উঃ ২২ টাকা ৫০ পয়সা।
প্রঃ আপনার জুতাও কি নূতন?
উঃ না।
প্রঃ নতুন দেখা যাচ্ছে যে?

এই সময় সাক্ষী উচ্চৈস্বরে জবাব সালাম খানকে কিছু বলেন। জনাব সালাম খান এর প্রতিবাদ জানান এবং সাক্ষীকে সাক্ষীর ডকে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেন।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বাদানুবাদ থামাতে বলেন। এই সময় বিবাদীপক্ষের সকল কৌসুলী একযোগে উঠে দাঁড়িয়ে সাক্ষীর আচরণের প্রতিবাদ করেন। সাক্ষীকে জেরা করার কতিপয় অসুবিধার উল্লেখ করে তারা বলেন যে, এর প্রতিকার না হলে বিবাদী পক্ষের কৌসুলীদের ট্রাইব্যুনাল কক্ষে থাকার যৌক্তিকতা নেই। বিচারপতি জনাব এস এ রহমান অবস্থা শান্ত করে সাক্ষীকে বলেন যে, বিবাদীপক্ষের কৌসুলী যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করার অধিকার রাখেন। কৌসুলী প্রয়োজন মনে করলে সাক্ষীর ব্যক্তিগত স্বভাবচরিত্র ও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও প্রশ্ন করার অধিকারী। তাই তাকে শান্তভাবে তার উত্তর দিতে হবে। তিনি সাক্ষীকে সোজাভাবে দাঁড়াতে বলেন।
ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান সাক্ষীকে কৌসুলীর প্রতি আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে বললে একরারী সাক্ষী আমির হোসেন মিয়া জনাব সালাম খানকে বলেন, 'স্যার আমি দুঃখীত'।

আজাদ

৯ই আগস্ট ১৯৬৮

বৃটিশ কৌসলী উইলিয়ামসের ঢাকা ত্যাগ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলায় আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের বৃটিশ কৌসুলী মিঃ টমাস উইলিয়ামস গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিমান যোগে লণ্ডনের পথে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি গত ২৫শে জুলাই ঢাকা আগমন করিয়াছিলেন। বিশেষ ট্রাইবুনালে তিনি কয়েকদিন উপস্থিত ছিলেন এবং দুই নম্বর রাজসাক্ষী আমীর হোসেনকে প্রথম জেরা করেন। তিনি ঢাকা হাইকোর্টে শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া রীট আবেদন পেশ করিয়াছেন। উক্ত আবেদনের ফলে হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার ও মেজর নাসেরের উপর কারণ দর্শাইবার রুল জারী করিয়াছেন।

ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি মামলা উপলক্ষে শেখ মুজিবের সাথে কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন। তদুপরি তিনি মিসেস মুজিবর রহমানের সাথেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

এই মামলায় এক পর্যায়ে তিনি পুনরায় ঢাকা আগমন করিবেন বলিয়া জানা যায়।

সংবাদ

৯ই আগস্ট ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার

সওয়াল জবাবের দ্বিতীয় দিবস অতিবাহিত

(নিজস্ব বার্ত্তা পরিবেশক)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যে'র ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশনে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়াকে দ্বিতীয় দিনের মত জেরা করিতে থাকেন। আজও (শুক্রবার) তাঁহার জেরা চলিবে।

জেরা শুরুর অব্যবহিত পূর্বে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট কৌসুলিদের সহযোগিতা দানের আহ্বান জানান।

জেরা শুরু হইবার পূর্বে অভিযুক্ত সার্জেন্ট শামসুল হকের সরকার নিয়োজিত কৌসুলি মোহাম্মদ ফজলুল করীম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে

বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার বৈষম্যের খতিয়ান সম্পর্কিত সরকারী দলিলপত্র আদালতে তলব করার জন্য ট্রাইব্যুনালের প্রতি আবেদন জানান।

তিনি বলেন যে, এ ব্যাপারে তিনি আবেদন পেশ করিয়াছেন। তাঁহাকে জানান হইয়াছে যে, ট্রাইব্যুনাল তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

জনাব ফজলুল করীম এই রূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য সত্য বৈষম্য রহিয়াছে কিনা মামলার ব্যাপারে উহা প্রয়োজনীয়। কৌঁসুলি জনাব ফজলুল করীমকে ট্রাইব্যুনাল জানান যে, তিনি যে দলিল তলবের অনুরোধ জানাইয়াছেন উহা বর্তমান পর্যায়ে মামলার জন্য অপ্রাসঙ্গিক।

অতঃপর রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়াকে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি জনাব সালাম খান জেরা শুরু করেন। জেরা শুরুর প্রথমে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান আমীর হোসেন মিয়াকে তিনি প্রশ্ন করেনঃ মিয়া সাব, আপনিত আগেই বলেছেন গ্রেফতারের পরপরই আপনাকে ঢাকা জেল থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। ইতিপূর্বে তদন্তকারীদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগের কথাও আপনি অস্বীকার করেছিলেন। এখন আমি যদি আপনাকে বলি যে, আপনি তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে যোগসাজশ করে আপনার গ্রেফতারের আগেই ব্যাগের চাবিটা আপনি তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তাহলে আপনার জবাব কি?

আমীর হোসেনঃ না, আমি তদন্তকারী অফিসারের হাতে গ্রেফতারের আগে চাবি তুলে দেই নি।

প্রশ্ন ঃ গ্রেফতারের সময় আপনার কাছে চাবি ছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ তারা তখন আপনাকে সার্চ করে চাবিটা নিয়েছিল কি?

উত্তর ঃ না। পরে আমি দিয়েছি।

প্রশ্ন ঃ আপনি যে চিরকুটটা পাঠিয়েছিলেন তাতে চাবিটাও পাঠাচ্ছেন তা লিখেছিলেন?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ আপনার তল্লাশির পর যে 'সীজার লিষ্ট' তৈরী করা হয় তাতে কি চাবির কথাও উল্লিখিত ছিল?

উত্তর ঃ আমি জানি না।

প্রশ্নঃ আপনার কাছে কটা চাবি ছিল?

উত্তরঃ ওই ব্যাগের দুটো চাবি।

প্রশ্নঃ চাবি ছাড়া কি ব্যাগটা খোলা সম্ভব ছিল?

উত্তরঃ আমি জানি না।

প্রশ্ন ঃ তদন্তকারী অফিসারের কাছে আপনি যেসব কথা বলেন তারপরেই কি তারা আপনার ব্যাগ থেকে ডাইরী ও চিঠিগুলো উদ্ধার করেছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ ব্যাগটা কোথায় রাখা হয়েছিল?

উত্তর ঃ অফিসের (ষ্টোর রুমে)।

প্রশ্ন ঃ সেখানে আর কি রাখা হয়?

উত্তর ঃ অফিসের আরও অনেক কাগজপত্র।

বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলির প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ ষ্টোর রুমটিই হচ্ছে অফিসের প্রধান ঘর। অফিসের কর্মরত লোকের সংখ্যা অবশ্যই ১২ অথবা ১৩ হবে। ষ্টোর রুমটি তালাবদ্ধ থাকে। সাধারণতঃ মীর আফসারুদ্দীন আহমদের কাছেই এর চাবি থাকে। গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তার খাতিরেই আমি ব্যাগটি ষ্টোর রুমে রাখি। সংশ্লিষ্ট বিভাগের কেরানীরা ছাড়াও কোন কোন সময় চৌকিদাররা, কোন কোন সময় পিয়নরা এবং কোন কোন সময় আমি ষ্টোর রুমে যেতাম। আমি তদন্তকারী অফিসারকে বলেছিলাম যে, আমার ব্যাগটি ষ্টোর রুমে রয়েছে এবং সেটা কোথায় রয়েছে তা চৌকিদার জানে। ষ্টোর রুমটির আয়তন আনুমানিক ১০ X ১২ হবে। আমাদের অফিসটি তেতলা ভবনের ষ্টোর রুমটি দোতলায়। দোতলায় ষ্টোর রুমটি ছাড়া আরও ছয়টি রুম আছে। ঐসব রুমে অফিসের কর্মচারীরা কাজ করেন। আমি জানি না নীচের তলায় কয়টি রুম আছে। যখন আমি করাচী প্রত্যাবর্তন করি তখন ব্যাগের চাবি আমার কাছেই ছিল। আমার আর একগুচ্ছ চাবিও আছে। সেগুলো বাড়ীতে আমার স্ত্রীর কাছে থাকে।

প্রশ্ন ঃ আপনার বাসা কি তল্লাশি করা হয়?

উত্তর ঃ আমি জানি না ?

প্রশ্ন ঃ পুলিস কি আপনার উপর কোন নির্যাতন চালায়?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ ব্যাগের মধ্যে আপনার চিঠিগুলোর কথা ওই চিরকুটে আপনি উল্লেখ করেন কেন? আপনি কি এগুলোকে কোন গুরুত্ব দেননি?

উত্তর ঃ আসলে আমি এগুলোর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন ঃ আপনার জবানবন্দীতে উল্লিখিত ৩ নম্বর ডাইরীটির কি হলো?

উত্তর ঃ ওটাও আমার ব্যাগে ছিল, তা আমার মনে ছিল না ।

জনাব সালাম খানের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে ৩টি ডাইরী দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি চিরকুটে দু'টো ডাইরীর কথা উল্লেখ করি। কারণ, সেসময় তৃতীয় ডাইরীটির কথা আমার মনে ছিল না। চিরকুটে এটা উল্লেখ করার কোন দরকার ছিল না যে,

পুলিস অফিসার আমার ব্যাগটি উদ্ধারের জন্য যাবেন। আমি চিরকুটে একথাও বলিনি যে, ব্যাগটিও পুলিসের হাতে দিয়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ডাইরীর কোন পাতাকে আপনি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন?

উত্তর ঃ না। করাচীতে লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে ডাইরীটা যেভাবে দিয়েছিল সেভাবেই ছিল। ওই সময় কৌসুলি সাক্ষীর হাতে লেখা ডাইরীর দুটো পাতা পি ডব্লিউ ৩/২৪ ও পি ডব্লিউ ৩/২৫-এবং অন্য দুটো পাতা পি ডব্লিউ ৩/২৬, পি ডব্লিউ ৩/২৭ তুলে দিয়ে তিনি এগুলো চেনেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। সাক্ষী বললেনঃ প্রথমোক্ত দুটো পাতার হাতের লেখা আমি চিনি–ওগুলো মোয়াজ্জেমের লেখা আর শেষোক্ত দুটো পাতার হাতের লেখা আমার অপরিচিত।

প্রশ্ন ঃ তদন্তের সময় আপনাকে কি এই চারটে পাতা দেখান হয়েছিল? এবং দেখেই কি আপনি বিবৃতি দিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ না।

এই সময় বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদেরের অনুপস্থিতিতে তাঁহার সহযোগী গ্রুপ ক্যাপটেন সৈয়দ আসলাম আদালতকে জানান যে, পুলিসের কাছে প্রদত্ত দুটো বিবৃতির কোথাও উপরোক্ত দলিলের কথা উল্লেখ নাই।

উল্লেখযোগ্য যে, পুলিসের নিকট প্রদত্ত সাক্ষীর দুইটি জবানবন্দীতে এইসব দলিলের এই ধরনের কোন উল্লেখ নাই।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ আমি একেবারে নিশ্চিত যে, পি ডব্লিউ ৩/২৪ ও পি ডব্লিউ ৩/২৫ চিহ্ন সম্বলিত দলিল দুটো লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতে লেখা।

জনাব সালাম খান সাক্ষীর হাতে কয়েকটি কাগজ দেন এবং জিজ্ঞাসা করেনঃ কাগজে লেখাগুলো কার হাতের? উত্তরে সাক্ষী বলেনঃ এ লেখাগুলো কার হাতের সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। উপরোক্ত দলিলগুলোতে ডি-বি/৩, ডি-বি/৪, ডি-বি/৫, ডি-বি/৬, ডি-বি/৭, ডি-বি/৮ ও ডি-বি/৯ চিহ্ন দেয়া আছে।

এই সময় বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান তদন্তকারীদের কাছে প্রদত্ত লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের হস্তলিপির নমুনা দেখিতে চাহেন।

বাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের ইহার জবাবে বলেন যে, তিনি ঠিক জানেন না এখন ওই হস্তলিপির নমুনা কোথায় রহিয়াছে। তিনি উহা খোঁজ করিয়া শীঘ্রই আদালতে পেশ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

জনাব আবদুস সালাম খানঃ তাহলে এই বিষয়ে সাক্ষীকে আমি পরে জেরা করব।

চেয়ারম্যানঃ বেশ, তাই হবে।

জনাব সালাম খান ইহার পর ডাইরীর একটি অংশ হইতে কয়েক অনুচ্ছেদ পড়িয়া (পি ডব্লিউ ৩/২৫) সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আপনি কি এই সব বিষয়ে খবরাখবর নেয়ার চেষ্টা করেছিলেন?

উত্তর ঃ আমি করিনি। লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে এই ডাইরীটা দিয়েছিলেন। তিনি আমার সামনে কিছু লেখেননি। তথ্য সংগ্রহের তালিকাগুলো ব্যক্তিগতভাবে আমি দেখলেও তা সংগ্রহের চেষ্টা করিনি। আমি প্রাক্তন কর্পোরাল সামাদকে সেগুলো সংগ্রহের জন্যে বলেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ ওগুলো সংগ্রহ করতে ক'বছর লাগতে পারে বলে আপনার ধারণা?

উত্তর ঃ তা আমি বলতে পারি না।

প্রশ্ন ঃ শেষ পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন তথ্য সামাদ দিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ আপনার দলে আপনার বিবৃতিতে উল্লিখিত নাম ছাড়া আর কারা সদস্য আছে, সে খবর কি আপনি নিয়েছিলেন?

উত্তরঃ লেঃ মোয়াজ্জেম, সুলতানউদ্দীন ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু তাদের কাছ থেকে আদালতে যেসব নাম বলেছি সেগুলো ছাড়া কিছুই জানতে পারিনি।

প্রশ্ন ঃ করাচীর সভায় যারা উপস্থিত ছিলেন বলে আপনি বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন, তারা ছাড়া আর কাউকে আপনি চেনেন?

উত্তরঃ কে জি আহমদ –অবশ্য তিনি আমাদের 'দলের' সদস্য নন। আমি জানি না, তিনি আমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন কিনা।

প্রশ্ন ঃ কে, জি আহমদ আপনাদের দলের সদস্য ছিলেন না?

উত্তরঃ না, তিনি শুধু লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বদলির ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু কিছু করতে পারেননি।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত আপনার স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দীতে একথা বলেননি কে, জি আহমদ আপনাদের দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তবে করাচীর 'ইলাকো হাউসে' মাত্র একবার কে,জি আহমদ এসেছিলেন যখন আমরা লেঃ মোয়াজ্জেমের বদলির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিলাম,তখন জনাব আহমেদ ফজলুর রহমান কে,জি আহমদকে লেঃ মোয়াজ্জেমের বদলির ব্যাপারে তাঁর বন্ধু নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়কের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন বলে বলেছিলেন। এছাড়া আমাদের আন্দোলনের আর কোন কথা কে,জি, আহমদের সঙ্গে হয়নি।

প্রশ্নঃ আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দীতে একথা বলেননি যে,কে,জি আহমদ ঢাকায় দলীয় কাজের জন্য টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, বলেছিলাম।
এই সময় জনাব সালাম খান বলিলেন যে, সাক্ষীর জবানবন্দীর সঙ্গে বর্ত্তমান বক্তব্য সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী।
চেয়ারম্যান ঃ
(সাক্ষীর প্রতি) আপনি কি সত্যই জবানবন্দীতে এ কথা বলেছিলেন?
সাক্ষী ঃ জ্বী হ্যাঁ, এটা সত্য।
জনাব সালাম খানঃ আপনি কি জানেন, কে জি আহমদ এ মামলার সাক্ষী?
উত্তর ঃ আমি খবরের কাগজ থেকে জেনেছি।
প্রশ্ন ঃ কে,জি আহমদ একটি মিটিং-এ যোগদান করেছিলেন, না একাধিক মিটিং-এ যোগদান করেছিলেন?
উত্তর ঃ শুধু একটা মিটিং-এ, আর কোন মিটিং-এ তিনি যোগ দেননি।
প্রশ্ন ঃ মিয়া সাহেব, এখন আমি যদি বলি যে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত আপনার বিবৃতির পর ট্রাইব্যুনালের সামনে আপনার ভিন্ন কথা বলার উদ্দেশ্য হলো– কে,জি,আহমদকে আপনি অভিযুক্ত হিসেবে নয়, সাক্ষী হিসেবে দেখতে চান?
উত্তর ঃ না স্যার, সত্য নয়।
প্রশ্ন ঃ ডাইরীর পাতায় আপনি নিজে কিছু লিখেছিলেন?
উত্তর ঃ শুধুমাত্র শেষ পৃষ্ঠায় আর এক জায়গায়।
প্রশ্ন ঃ এটা আপনার ব্যবহারের জন্যে দেয়া হয়েছিল?
উত্তর ঃ না, আমার প্রতি নির্দেশ হিসাবে দেয়া হয়েছিল।

এ প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী আরও বলেন যে, Ext PW 3/14 চিহ্ন সম্বলিত ডাইরীর শেষ পৃষ্ঠার ৩নং আইটেমে "জনাব ওবায়দুর রহমান, ১৯১, ইলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা"-এই ঠিকানাটি লেখা আছে। এটা আমার হাতে লেখা। আমিই এটা লিখি। এছাড়া এ ডাইরীতে আমার হাতের আর কোন লেখা নেই। এ ডাইরীটি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে দেন যাতে আমি এতে সন্নিবেশিত নির্দেশগুলো মেনে চলি। আমার ব্যবহারের জন্য এটা আমাকে দেয়া হয়নি। ডাইরীটির বর্তমান অবস্থায় এর প্রথম ৬ পৃষ্ঠায় নির্দেশগুলো রয়েছে এবং অপর একটি পৃষ্ঠায় ছদ্মনামগুলো রয়েছে। কোন কোন জায়গায় তার ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্পর্কিত নোট ছাড়া ডাইরীটির অন্যান্য পাতাগুলো অলিখিত রয়েছে। Ext PW 3/45 চিহ্ন দলিলটি সম্বলিত এই ডাইরীর অংশ নয়।

সাক্ষীকে Ext PW 3/50, PW, 3/60 এবং PW,3/70 চিহ্ন সম্বলিত কাগজের ৩টি পৃষ্ঠা দেয়া হয় এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সেইগুলি ডাইরীর অংশ কিনা। উত্তরে সাক্ষী প্রথমে বলেন, ডাইরী না দেখা পর্যন্ত আমি বলতে পারব না।

তারপর সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ডাইরীটি না দেখিয়া তিনি সেইগুলি সম্পর্কে কিছু বলিতে পারেন কিনা। তারপর সাক্ষী বলেন, হ্যাঁ, এগুলো ডাইরীর অংশ। আমি ডাইরীতে দেখছি যে, এতে ১লা ও ২রা সেপটেম্বর সম্বলিত এর পাতাগুলো নেই। আমি দেখছি Ext, P,W, 3/45 চিহ্ন সম্বলিত কাগজটির দুই পৃষ্ঠায় ১লা ও ২রা সেপ্টেম্বর তারিখ রয়েছে। এই কাগজটি ডাইরীর অংশ নয়। এটা ঠিক নয় যে, আমি ডাইরী থেকে Ext PW 3/45 চিহ্ন সম্বলিত দলিলটি তৈরীর ব্যাপারে পুলিসের সাথে যোগসাজশ করেছিলাম। Ext, P,W, 3/45 চিহ্ন সম্বলিত দলিলটিতে ৭ ও ১৭ তারিখ দেয়া আছে। ৭ তারিখ সম্বলিত কাগজটিতে লেখা আছে "দয়া করে ব্যাঙ্ক ড্রাফট মারফত টাকা পাঠান।" ১৭ তারিখ সম্বলিত কাগজটিতেও একই ধরনের লেখা আছে। এটা আমাকে দেয়া হয়। কিন্তু এটা আমার কাছে পাঠান হয়নি। এটা আমাকেই বোঝান হয়েছে। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন কোন সময় আমাকে "আপনি" এবং কোন কোন সময় "তুমি" বলে সম্বোধন করতেন। ইহার পর বিবাদীপক্ষের কৌসুলি সাক্ষীকে তাহাদের দলীয় গোপনীয়তা ও সাংকেতিক চিহ্ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রশ্ন করেন।
প্রশ্ন ঃ করাচীর সভায় আপনারা কি দলীয় গোপনীয়তা সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা নিয়েছিলেন?
সাক্ষী ইহার অর্থ অনুধাবনে বিলম্ব করায় পুনরায় কৌসুলি জিজ্ঞাসা করেনঃ
ঢাকার পথে রওয়ানা হওয়ার আগে করাচীতে যে দলীয় সততা ও গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে শপথ নেন বলে আপনি বলেছিলেন, আমি সে ব্যাপারেই জানতে চাই। আপনারা গোপনীয়তা সংক্রান্ত বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন।
উত্তর ঃ হ্যাঁ, করি।
প্রশ্ন ঃ আপনারা কি সিদ্ধান্ত নেন যে, কেমন করে গোপনীয়তা রক্ষা করবেন?
উত্তর ঃ হ্যাঁ ।
প্রশ্ন ঃ প্রথম পরিচয়ের পরই যদি আপনি কোন লোককে দলের পরিকল্পনা বলে দেন, তবে কি তা গোপনীয়তা ফাঁস করা হয় না?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, হয়।
ইহার পর জনাব সালাম খান সাক্ষীকে এ সম্পর্কে আরও বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। কৌসুলির বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া বলেনঃ কেমন করে চিঠিপত্র লিখতে হবে এবং কিভাবে তার গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে সে সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।
প্রশ্ন ঃ ডাইরীতে যেসব সাংকেতিক নাম লেখা আছে, সেগুলো লেখার সময় আপনি কি উপস্থিত ছিলেন?
উত্তরঃ না, সেগুলো আমার উপস্থিতিতে লেখা হয়নি। ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম মিটিংয়ে আমরা এইসব সাংকেতিক নামগুলোর কথা ভেবেছিলাম। ইহার পর

কৌসুলির এক প্রশ্নের জওয়াবে আমীর হোসেন মিয়া বলেনঃ ঢাকায় উক্ত মিটিংয়ের পর আমরা করাচী যাই এবং সেখানে এইসব সাংকেতিক নাম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত করা হয়।

প্রশ্ন ঃ তখনই কি ঠিক করা হয় যে, আপনাদের দলের সবাই পরস্পরকে লেখার সময় সাংকেতিক নাম ব্যবহার করবেন?

উত্তরঃ জী হ্যাঁ ।

প্রশ্ন ঃ করাচীতে কবে এই সিদ্ধান্ত করা হয়?

উত্তর ঃ আমার মনে হয় ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে করাচীতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি ঢাকা হতে কবে করাচী গিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ ১৯৬৫ সালের সেপটেম্বর মাসের শেষদিকে আমি ঢাকা হতে করাচীতে যাই।

প্রশ্ন ঃ এই সাংকেতিক নামগুলো কি আপনাদের দলের সবারই ছিল?

উঃ কেবলমাত্র দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বেলাতেই ব্যবহার করা হতো।

কৌসুলির প্রশ্নের জওয়াবে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া আরও জানান যে,এমনকি ১৯৬৬ সালের জানুয়ারীতে সাংকেতিক নাম ব্যবহারের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বেলায় চিঠিপত্রে সাংকেতিক নাম ব্যবহার করা হয় এবং অনেক সময় তাদের নিজেদের নামের ক্ষেত্রেও।

প্রশ্ন ঃ সাংকেতিক নাম ব্যবহার করবেন বলে আপনি কখন ঠিক করেছিলেন?

উত্তরঃ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে যখন ডাইরী দিলেন তখনই তিনি আর আমি ঠিক করি যে, আমাদের মধ্যে পত্রালাপে আমরা সাংকেতিক নাম ব্যবহার করবো।

প্রশ্ন ঃ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আপনাদের দলের কি ছিলেন?

উত্তর ঃ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাদের দলের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের সংস্থার নেতা ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ এই সাংকেতিক নামগুলো কি পত্রালাপে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হতো?

উত্তর ঃ না। সবসময় এইসব সাংকেতিক নাম ব্যবহার করা হতো না।

প্রশ্ন ঃ সাংকেতিক নাম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার সেই সাংকেতিক নাম কি জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল?

উত্তর ঃ না, আমি তা জানি না।

প্রশ্ন ঃ সাংকেতিক নামে আপনাকে আপনার দলের আর কেউ চিঠিপত্র লেখেনি?

উত্তর ঃ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ছাড়া দলের অপর কেহই আমাকে সাংকেতিক নামে পত্র লেখেন নাই।

প্রশ্ন ঃ সাংকেতিক নাম কি জন্যে ব্যবহার করতেন?

উত্তর ঃ গোপনীয়তার জন্য। সুলতানউদ্দীন আহমদ যদি তার পত্রের শেষে "সুলতান" না লিখে কেবলমাত্র "এস" লিখতেন তাহলে আমি তা বুঝতে পারতাম। এই একই ভাবে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন যদি তাঁর পত্রের শেষে তাঁর নিজের নাম না লিখে "আলো" লিখতেন তাহলে আমি তার প্রকৃত নাম বুঝতে পারতাম।

ইহার পর কৌসুলির অপর এক প্রশ্নের জওয়াবে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া জানানঃ আমি জানতে পারি আমাদের আন্দোলনের ব্যাপারে কয়েকজন রহমান রয়েছেন। এঁরা হলেন শেখ মুজিবর রহমান, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, আহামদ ফজলুর রহমান, ইপি আর টিসি'র কেরানী মুজিবুর রহমান ও অন্য মুজিবর রহমান।

প্রশ্নঃ ডাইরীর শেষ পৃষ্টায় যে ওবায়দুর রহমানের নাম রয়েছে সে ব্যক্তি কে?

উত্তর ঃ তিনি একজন ইনসিওরেন্স এজেন্ট। তিনি আমার ইনসিওরেন্স করাতে চেয়েছিল।

কৌসুলির প্রশ্নের উত্তরে আমীর হোসেন মিয়া বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট আমি সাংকেতিক নামগুলোর বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম, তবে সাংকেতিক নামগুলো আমার উপস্থিতিতে ডাইরীতে লেখা হয়নি। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন অন্য একটি বড় নোটবুকে নিজের হাতে এই সাংকেতিক নামগুলো লিখে রেখে ছিলেন এবং সেই নোট বই থেকেই ডাইরীতে এই সাংকেতিক নামগুলো তোলা হয়েছিলো, তবে আমার সমুখে নহে।

প্রশ্ন ঃ আপনার বাসা তল্লাশির পর পুলিস কি বলেছিল, তাঁরা আপনার ব্যাগে কি পেয়েছে?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ আপনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেননি?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ আমি যদি এখন আপনাকে বলি এই মামলাটা সাজানোর জন্যেই ইচ্ছাকৃতভাবে আপনার অফিসে আপনি ব্যাগটি রেখেছিলেন?

উত্তর ঃ না, এটা সত্য নয়।

প্রশ্ন ঃ ১৯৬৬ সালের ১৯শে মার্চে লেখা চিঠি আপনি এখন না পড়ে বলতে পারেন যে, ঐ চিঠির মর্মার্থ কি?

উত্তর ঃ না, আমি বলতে পারি না।

প্রশ্ন ঃ অন্য কোন তারিখের চিঠির ব্যাপারে যদি এই একই প্রশ্ন করি?

উত্তর ঃ না, বলতে পারি না।

প্রশ্ন ঃ জবানবন্দীর জন্য আপনাকে কি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আফসারউদ্দীনের কাছে নেয়া হয়েছিল?
উত্তর ঃ না।
প্রশ্ন ঃ পুলিসের কাছে স্বীকারোক্তি করার পর আপনাকে কি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নেয়া হয়েছিল?
উত্তরঃ না,রাজারবাগে জিজ্ঞাসাবাদের পর আমাকে সেন্ট্রাল জেলে নেয়া হয়–ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নয়। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টেই আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জবানবন্দী দিই।
প্রশ্ন ঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমুলক বিবৃতি দেওয়ার সময় আপনার সামনে কি কোন লিখিত বিবৃতি ছিল?
উত্তর ঃ না, ছিল না।
প্রশ্ন ঃ স্বীকারোক্তিকমূলক বিবৃতি কি আপনি মুখস্ত করে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়েছিলেন?
উত্তর ঃ না, মুখস্থ করে যাইনি।
প্রশ্ন ঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি প্রদানের সময় আপনি কি চিঠির তারিখ ও বক্তব্য উল্লেখ করেছিলেন?
উত্তর ঃ কোন কোন ক্ষেত্রে বলেছিলাম।
প্রশ্ন ঃ কি করে চিঠির তারিখ ও বক্তব্য আপনি ঠিক ঠিক করে বলতে পারলেন?
উত্তর ঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে পুলিস আমাকে চিঠি ও অন্যান্য দলিলপত্রের ফটোষ্টেট কপি দেখিয়েছিল।
প্রশ্ন ঃ বিবৃতি দেয়ার সময় (ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে) ওই ফটোষ্টেট কপি কি আপনার সামনেই ছিল?
উত্তর ঃ না।
ইহার পর সাক্ষী বলেন যে, ট্রাইব্যুনালের সামনে তিনি নিজে ১৯৬৬ সালের ১৯শে মার্চের চিঠি পড়ে তা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আদালতের সম্মুখে আজও তিনি লেঃ মোয়াজ্জেমের চিঠি পড়িয়াছেন। পুলিসের কাছে বিবৃতি প্রদানের সময় চিঠির ফটোষ্টেট কপি তাহাকে দেখান হয়।
প্রশ্ন ঃ পুলিস আপনার ছবি নিয়েছিল?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, সামরিক হেফাজতে নেওয়ার পর।
প্রশ্ন ঃ আপনাকে কোথায় রাখা হয়?
উত্তর ঃ প্রথমে সিগন্যাল অফিসার্স মেসে তারপর চর্তুদশ ডিভিশন মেসে।
প্রশ্ন ঃ আপনার কোন আত্মীয়-স্বজন ওই সময় আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল?
উত্তর ঃ শুধু একবার আমার স্ত্রী দেখা করেছিল।

প্রশ্ন ঃ কে আপনাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বিবৃতি দিতে নিয়ে গিয়েছিল?
উত্তর ঃ লেঃ শরীফ।
ইহার পর সাক্ষী জানানঃ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর রুমের ভিতরই বসেছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,আপনি স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি দিতে রাজী আছেন কিনা–আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে চিন্তা করার সুযোগ দিলেন। আমি পাশের ঘরে বসে ভাবতে লাগলাম, সে ঘরে কোন মিলিটারী গার্ড ছিল না–শুধু সিগন্যাল মেসের গেটে একজন সেনট্রি দাঁড়িয়ে ছিল।
জনাব সালাম খানঃ আপনার ভাববার কি ছিল? আপনিত বলেছেন যে, সবকিছু স্বীকার করার জন্য আপনি আগেই মনস্থির করেছিলেন?
উত্তর ঃ আমি সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটকে কিছু বলিনি।
প্রশ্ন ঃ আপনার হাতে ঘড়ি ছিল?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, ছিল।
প্রশ্ন ঃ কিভাবে আপনার বিবৃতি নেওয়া হল?
উত্তর ঃ আমি বললাম, ও ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর নিজের ভাষায় লিখে নিলেন।
প্রশ্নঃ লেঃ মোজাম্মেলের সওয়াল জবাব শোনার পরে আপনি এখন স্বীকার করছেন যে, আপনার বিবৃতি ম্যাজিষ্ট্রেট লিখে নিয়েছিলেন?
উত্তর ঃ না, এটা সত্য নয়।
প্রশ্ন ঃ আপনাকে খবরের কাগজ দেয়া হয়?
উত্তর ঃ জী হ্যাঁ।
প্রশ্ন ঃ ট্রাইব্যুনালের কার্যবিবরণী খবরের কাগজে পড়েন?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, পড়ি।
প্রশ্ন ঃ কবে প্রথম ষ্টুয়ার্ড মুজিবরের সঙ্গে আপনার দেখা হল?
ইহার উত্তরে সাক্ষী বললেনঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৬২ অথবা ১৯৬৩ সনে। তিনি তাঁর আত্মীয়কে দেখতে আসেন। তাঁর আত্মীয় আমার সাথে বিমান বাহিনীতে কাজ করতেন। ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান নৌবাহিনীতে কাজ করতেন। তিনি প্রায়ই আমাদের ষ্টেশনে আসতেন। আমি বলতে পারছি না, ঐ সময় তিনি কোথায় থাকতেন। সাক্ষী আরও বলেনঃ ১৯৬৪ সনের ডিসেম্বর অথবা ১৯৬৫ সনের জানুয়ারীতে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমার পূর্ব করাচীর জাহাঙ্গীর রোডস্থ ৩২/৬ই কোয়ার্টারে সুলতানউদ্দীন আহমেদকে নিয়ে আসেন। ঐ সময় সুলতানউদ্দীন আহমেদ কোথায় থাকতেন তা আমি জানি না। ঐ সময় পর্যন্ত আমি তাঁদের বাসভবনে যাই নি। এটা ঠিক যে, ১৯৬৫ সনের জানুয়ারীতে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও সুলতানউদ্দীন আহমেদ আমার নিকট আসেন এবং প্রথম বারের মত আমার সাথে বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে আলাপ করেন। তাঁরা আমাকে

দেশে এই আন্দোলনের অস্তিত্বের কথা ও তার সাথে তাদের জড়িত থাকার কথা বলেন এবং আমাকে যোগদানের জন্য বোঝান। তাঁরা বলেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে কেন্দ্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যেই এই আন্দোলন। ঐ সময় করাচীতে আমার অনেক বন্ধু ছিল। তাঁদের কারো কাছে আমি এই আন্দোলন সম্পর্কে বলিনি। সংস্থার সদস্য হিসাবে এই আদালতে আমি যাদের নাম করেছি, তাঁদের ছাড়া আর কারো কাছে আমি এই আন্দোলনের কথা বলিনি।

প্রশ্নঃ কারসাজ কোথায়?

উত্তরঃ কারসাজ হচ্ছে নৌবাহিনীর সমুদ্র তীরবর্তী একটি আবাসিক স্থল। কারসাজে বাড়ীঘর আছে। সেগুলোতে নৌ অফিসারগণ থাকেন। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৬৫ সনে কে,ডি স্কীমনং-১ করাচীতে থাকতেন। এটা কারসাজ থেকে প্রায় ১০/১৫ মিনিটের পথ। দূরত্বটা ২/৩ ফালং হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে আমি উল্লেখ করিনি যে, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৬৫ সনে কে,ডি স্কীমনং-১-এ থাকতেন। অবশ্য একথা আমি পুলিসের নিকট আমার জবানবন্দীতে (এখন রেকর্ড হয়নি) উল্লেখ করি।

এটা ঠিক নয় যে,এখানে একই কথা বলার উদ্দেশ্যে আমি লেঃ মোজাম্মেল হোসেনের জেরা থেকে ১৯৬৫ সনের জানুয়ারীতে কে,ডি,স্কীমনং ১-এ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের থাকার কথা জেনে আমার জবানবন্দী পরিবর্তন করেছি।

প্রশ্ন ঃ কী ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা আপনি চেয়েছিলেন?

উত্তর ঃ অর্থনীতিতে এম,এ হওয়া সত্ত্বেও আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে একথা জিজ্ঞাসা করিনি যে, পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে কী ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা হবে, এটা কী ধরনের রাষ্ট্র হবে এবং অন্যান্য দেশের সাথে তার সম্পর্ক কী রূপ হবে সে সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

প্রশ্ন ঃ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগদানের ব্যাপারটা কী মারাত্মক নয়?

উত্তর ঃ আমি এ ব্যাপারে সজাগ ছিলাম যে, এই ধরনের একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আমাদের মারাত্মক বিরোধ দেখা দিবে।

প্রশ্নঃ সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে একথা আপনি জানেন? লেঃ মোয়াজ্জেমকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

উত্তর ঃ বৈষম্যের কথা আমার জানা নেই। লেঃ মোয়াজ্জেমকেও একথা আমি বলিনি।

প্রশ্ন ঃ পূর্ব পাকিস্তানে ক্যান্টনমেন্টগুলোতে সমর বিভাগের লোক সংখ্যার হিসেব জানেন?

উত্তর ঃ লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে বলেছিলেন যে, যথেষ্ট আছে।

প্রশ্ন ঃ ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ও আপনারা এই বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে পুরোপুরি জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল জানেন? এই সময়ে সামরিক বাহিনীর লোকজন পশ্চিম পাকিস্তান হতে পূর্ব পাকিস্তানে আসতে পারত না, সেটা জানেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ যুদ্ধের সময় আপনার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

উঃ হ্যাঁ, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, সুলতানউদ্দীন আহমদ ও আমি ঢাকা হোটেলে এক সঙ্গে থাকতাম। এই সময় শেখ মুজিবের সঙ্গেও আমার দেখা হয়।

প্রশ্ন ঃ তখন কি এটা আলোচনা করেননি যে, পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ওই সময়ই সুবর্ণ সুযোগ?

উত্তর ঃ না স্যার।

প্রশ্ন ঃ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের সমর বিভাগের লোকজনের সঙ্গে ওই সময় যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেনি?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ 'দলে' আপনার কি দায়িত্ব ছিল? শুধু কি টাকা নেওয়ার?

উত্তর ঃ টাকা নেওয়া ছাড়াও অন্যদের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব ছিল।

প্রশ্ন ঃ শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে ওই সময় আপনাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, একবার হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ যুদ্ধ শুরুর সময় প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীদের কাজে যোগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। আপনিও ত বিমান বাহিনীর একজন প্রাক্তন কর্মচারী আপনি কি করেছিলেন?

উত্তরঃ আমি তেজগাঁ বিমান বন্দরের নিকটবর্তী বিমানবাহিনী দফতরে রিপোর্ট করি, তারা আমাকে ফিরে যেতে বলে।

প্রশ্নঃ আপনি কি জানেন যুদ্ধের সময় শেখ মুজিবর রহমান প্রতিরক্ষার কাজে সকলকে আত্মনিয়োগের জন্যে আহবান জানিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, জানি।

প্রশ্ন ঃ এই সময় আপনি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয় আলোচনা করেছিলেন?

উত্তর ঃ না করিনি।

প্রশ্ন ঃ এই শব্দগুলোর অর্থ বোঝেন?
উত্তর ঃ বুঝি।
প্রশ্ন ঃ লেঃ মোয়াজ্জেম যখন আপনাকে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলেন, তখন আপনি তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন?
উঃ হ্যাঁ সম্মতি দিয়েছিলাম।
প্রশ্ন ঃ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আপনার আর কোন পন্থা কী আপনার জানা ছিল না?
উঃ না।
এই প্রসঙ্গে সাক্ষী আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন জাতি হিসাবে দেখিবার জন্যই তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যাপারে সম্মত হন।
প্রশ্ন ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাট বৈষম্য দেখেই কি আপনি মনে করেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা দরকার?
উত্তর ঃ হ্যাঁ।
প্রশ্ন ঃ বৈষম্য সম্পর্কে আপনি কি সচেতন?
উত্তর ঃ হ্যাঁ।
প্রশ্ন ঃ আপনার অফিসে কি রকম বৈষম্য রয়েছে?
উত্তর ঃ আমার অফিসে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীর সংখ্যা ৪৫ ঃ ৫৫।
এ সম্পর্কে আরও প্রশ্নের পর সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি সামরিক বিভাগ, অন্যান্য বেসামরিক দফতর ছাড়া কোন বৈষম্যের কথা তিনি জানেন না।
প্রশ্ন ঃ করাচীতে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য কি রাষ্ট্রশক্তি রয়েছে তা লেঃ মোয়াজ্জেমকে কখনো জিজ্ঞাসা করেছেন?
উত্তর ঃ না, জিজ্ঞাসা করিনি, তিনি যা বলতেন তা আমি বিশ্বাস করতাম।
প্রশ্ন ঃ আপনি কোন অস্ত্র ব্যবহার করতে জানেন?
উত্তর ঃ ৩৩০ রাইফেল ও ছোট ষ্টেন মেশিনগান চালাতে পারি।
ইহার পর জনাব সালাম খান সাক্ষীকে প্রশ্ন করেনঃ
"সামাদ কি করতেন?"
সাক্ষী ঃ অভিযুক্ত সামাদ বিমান বাহিনীর একজন ওয়ারলেস অপারেটর ছিলেন।
প্রশ্ন ঃ কবে তিনি বিমান বাহিনীতে যোগ দেন?
উত্তর ঃ তা আমি জানি না।
প্রশ্ন ঃ তার সঙ্গে আপনি কাজ করেছেন?
উত্তর ঃ ১৯৫৩ কি '৫৪ সালে মালির ক্যান্টনমেন্টে আমরা একসঙ্গে কাজ করি।
প্রশ্ন ঃ কিন্তু সামাদ ১৯৫৮ থেকে '৬১ সালেই মালির ক্যান্টনমেন্টে কাজ করেছে।
উত্তর ঃ এটা ঠিক নয়।

প্রশ্ন ঃ তার সঙ্গে অন্য কোথাও আপনার সাক্ষাৎ ঘটেছিল?
উত্তর ঃ না।
প্রশ্ন ঃ আপনি বেদিন কোথায় চেনেন?
উত্তর ঃ সিন্ধুর বেদিনে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একটি রাডার ঘাঁটি আছে বলে আমি জানতাম। সেখানে আমি কাজ করিনি, আমি জানতাম ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় সামাদ সেখানে কাজ করত।
প্রশ্ন ঃ ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী থেকে আগষ্টের শুরু পর্যন্ত লেঃ মোয়াজ্জেমের বাসায় আপনাদের মিটিং ছাড়া আর কোন কাজ আপনারা করেছেন?
উত্তরঃ এই সময় মিটিং ছাড়াও লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে মার্কিন দূতাবাসের নৌ এটাচীর বাসায় নিয়ে যান।
প্রশ্নঃ এটাত নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কাজেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত আপনার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে আপনি সে কথা উল্লেখ করেছিলেন?
উত্তর ঃ না, করিনি।
প্রশ্ন ঃ ১৯৬৮ সালের ১৯শে জানুয়ারী আপনাকে না পুলিস পরীক্ষা করে? তারপর আবার ৮ই মে একই পরীক্ষাকার্য হয়। এ দু'বারের একবারও আপনি তাদের কাছে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি উল্লেখ করেছিলেন?
উত্তর ঃ না, উল্লেখ করিনি।
প্রশ্ন ঃ এবার বলুনত, এই ট্রাইব্যুনালের শুনানী কবে থেকে শুরু হয়েছে?
উত্তর ঃ আমি মনে করতে পারছি না।

ইহার পর ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস,এ রহমান আজ (শুক্রবার) সকাল নয়টা পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করেন।

সংবাদ

১০ই আগস্ট ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন সোমবার পর্যন্ত মুলতবী :

রাজসাক্ষী আমীর হোসেনের জেরা অসমাপ্ত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (শুক্রবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি জনাব আবদুস সালাম খানের এক প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী জনাব আমীর হোসেন মিয়া জানান যে, তিনি 'হোটেল আরজু'তে 'আবদুর রহিম' এই ভুয়া নামে বাস করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, হোটেল রেজিষ্টারে নাম না লিখাইয়া তিনি 'ঢাকা হোটেলে' ২৬ দিন অবস্থান করিয়াছেন বলিয়াও সাক্ষী জানান।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলির অপর এক প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন বলেন যে, স্বাস্থ্য বিভাগে হেলথ এসিষ্ট্যান্টের চাকুরীকালে তিনি মেডিক্যাল ষ্টোর হইতে ঔষধপত্র সরানো ও অন্যান্য কীর্তির জন্য বরখাস্ত হইয়াছিলেন, একথা সত্য নহে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যে'র মামলায় জনাব আমীর হোসেন মিয়া রাজসাক্ষী হিসাবে সপ্তাহকাল যাবৎ বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে সাক্ষ্যদান করিতেছেন। তাঁহাকে অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমানের কৌসুলি টমাস উইলিয়ামস জেরা করার পর বর্তমানে বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান জেরা করিতেছেন। আগামী সোমবারও এই জেরা অব্যাহত থাকিবে বলিয়া জানা যায়।

জেরার বিবরণ

বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খানের এক প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী জনাব আমীর হোসেন মিয়া বলেন, 'আমি অবশ্য নিজের কাছে কয়েকখানি চিঠি ও ডাইরী রেখে দিয়েছিলাম। পরে তা আমি পুলিস কর্তৃপক্ষ ঢাকার স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি এস,পি জনাব মান্নাফের হাতে দিই'– ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দীতে এ কথা আমি বলেছিলাম কিনা মনে পড়ে না।

প্রশ্ন ঃ ম্যাট্রিক পাসের পরে কি আপনি স্বাস্থ্য বিভাগে টেমপোরারী হেলথ এ্যাসিষ্ট্যান্টের চাকুরী নিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ জ্বী হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ তারপর সেখানে মেডিক্যাল ষ্টোর থেকে ঔষধপত্র সরানোসহ অন্যান্য কুকীর্তির জন্যে আপনাকে কি বরখাস্ত করা হয়েছিল?

উত্তর ঃ সেটা ঠিক নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি যখন পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে ছিলেন তখন জনৈক কর্মচারীর বিরুদ্ধে একটা শৃংখলা সংক্রান্ত মামলায় আপনি কি রাজসাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দেন নি?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ ১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসে লেঃ মোয়াজ্জেম আপনাকে বলেছিলেন যে, দলের মিটিং-এ যোগদানের জন্য তিনি ঢাকা যাচ্ছেন। এখন বলুনত কোন তারিখে তিনি আপনাকে একথা বলেছিলেন?

উত্তর ঃ আমার মনে নেই। তবে সম্ভবতঃ তিনি ১৯৬৫ সালের আগষ্টের প্রথম কি দ্বিতীয় সপ্তাহে খবরটি দেন।

প্রশ্নঃ আপনি আরও বলেছেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও সুলতানউদ্দীন আহমদও ইতিমধ্যে ঢাকায় রওয়ানা হয়েছেন বলে লেঃ মোয়াজ্জেম আপনাকে জানিয়েছেন।

উত্তর ঃ এ খবর লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে অন্য সময় বলেছেন।

এ সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন আরও বলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি আমাকে পড়ে শুনানো হয়। উক্ত স্বীকারোক্তিতে আমি বলেছিলাম, "লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সাথে একবার দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে বলেন যে, তিনি ঐমাসে ঢাকায় দলের একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করছেন, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে জানান যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এবং এল,এস সুলতানউদ্দীন এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই ঢাকা রওয়ানা হয়ে গেছেন।"

প্রশ্ন ঃ লেঃ মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে এই মিটিং-এর কথা শোনার পর আপনিও ঢাকায় যেতে রাজী হয়েছিলেন?

রাজসাক্ষী আমীর হোসেন জেরার উত্তরে বলেন ঃ ঢাকা হোটেলে ২৬ দিন ছিলাম, কিন্তু রেজিষ্টারে নাম ছিল না– 'হোটেল আরজু'র রেজিষ্টারে আমার নাম ছিল আবদুর রহিম– হোটেলের বিল আমি-ই দিয়েছি, কোন্ নামে মনে নেই–'আলেয়া' থেকে শেখ মুজিবের বাড়ীর দূরত্ব এক মাইল–

উত্তরঃ হ্যাঁ, রাজী হই। ইহার পর সাক্ষী বলেনঃ "আমার বিশ্বাস যে, আমি ১৯৬৫ সনের ২৮ শে আগষ্ট ছুটির দরখাস্ত করি। এটা বলা ভুল হবে যে, বৈঠকটি আগে অনুষ্ঠিত হলে আমি তাতে যোগদান করতে পারতাম না। লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন তার আগেই একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। ২৮শে আগষ্টের আগে আমি কোন ছুটির দরখাস্ত করিনি? আমি আগেই ঢাকা যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি ছুটির জন্য কোন দরখাস্ত করিনি। কারণ বৈঠকের তখনও আয়োজন করা হয়নি। আমার মনে হয় ১৪/১৫ তারিখের আগে বৈঠকটি অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করা হয়। ১৪/১৫ তারিখ অবধি আমি ছুটির কোন দরখাস্ত করিনি। প্রকৃতপক্ষে এই তারিখগুলোতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। কাজেই, আমার ছুটির দরখাস্ত করারও কোন প্রশ্ন উঠে না। প্রকৃতপক্ষে ১৪/১৫ তারিখে বৈঠক অনুষ্ঠান ধার্য্য করা হয়নি। শুধু এই তারিখগুলোতে বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করা হয়। আমি পুলিসের নিকট আমার অতিরিক্ত জবানবন্দীতে একথা বলিনি যে, ১৯৬৬ সনের ১৪/১৫ই আগষ্টে শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবনে বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট লিখিত সুলতানউদ্দীনের পত্রের সাথে এই পত্রের সম্পর্ক আছে।

সাক্ষীর হাতে EXT, PW 3/2 চিহ্ন সম্বলিত একটি পত্র দেওয়া হয় এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি উহা পাইয়াছিলেন কিনা। উত্তরে সাক্ষী বলেনঃ "আমি এটা পাই সম্ভবতঃ ১৯৬৫ সনের ১৮ থেকে ২০শে আগষ্টের মধ্যে। এই পত্রে একটি বাক্যে বলা হয়েছে, যা হোক আপনারা গত

১৪ ও ১৫ তারিখে আসতে পারেননি। কারণ আমি টাকা আনতে পারিনি।" ১৪ ও ১৫ তারিখ হচ্ছে ঢাকায় বৈঠক অনুষ্ঠানের তারিখ। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁর ১৯৬৪ সনের একটি পুরনো ডাইরীতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য 'মা' (MA) ছদ্মনামটি লিপিবদ্ধ করেন। তিনি এটা শুধুমাত্র আমাকেই জানান, আর কাউকে না। আমি যতদুর জানি, এটা অন্যান্যদের জানান হয়নি।

সাক্ষী আরও বলেনঃ EXT,P,W, 3/14 চিহ্ন সম্বলিত ডাইরীর একটি পৃষ্ঠা আমাকে দেখান হয়। Ext, ডি-বি/১০ চিহ্ন সম্বলিত এই পৃষ্ঠাটির ৪নং এন্ট্রিতে 'মা' (মাদার) শব্দটি লেখা আছে। এতে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের মাকে বুঝান হয়েছে। এটা লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতের লেখা। জনাব সালাম খান একটি চিঠি (পি,ডব্লিউ ৩/৭) ও একটি খাম (পি, ডব্লিউ ৩/৮) দেখিতে দিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, এই চিঠিটি উক্ত খামে করিয়াই তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া ছিল কি না?

সাক্ষী ঃ আমার এখন মনে পড়ছে না।

প্রশ্নঃ এই চিঠিটির সঙ্গে আর একটি চিঠি (পি, ডব্লিউ ৩/৬) একই খামে এসেছিল বলে আপনি বলেছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ দুটো চিঠি একই সঙ্গে খামে করে এসেছিল?

সাক্ষী তখন বলিলেনঃ না, আমি একসঙ্গে দুটো চিঠি পাইনি। তবে চিঠি দুটো ওই খামে আমিই রেখেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ তাহলে চিঠিটার খামটা কোথায়?

উত্তর ঃ ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি না আদালতে বলেছিলেন যে, চিঠি দুটো একই খামে ছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমি তাই বলেছিলাম। তবে এই খামে দুটো চিঠি এসেছিল বলে বোঝাই নি।

জনাব সালাম খান তখন সাক্ষীকে বলেনঃ "আপনি বলেছিলেন, এই দুটো চিঠি একখামে এসেছিল এবং খাম খোলার সময় চিঠির কোন্ ছিঁড়ে গিয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে আপনার দুটি বক্তব্য পরস্পর বিরোধী।

কৌঁসুলি তারপর চিঠি দুইটি পুনরায় সাক্ষীর হাতে তুলিয়া দিয়া যেভাবে তিনি ভাঁজ করিয়া রাখিয়াছিলেন সেইভাবে রাখিতে বলিলেন। সাক্ষী ইহাতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া জওয়াব দিলেনঃ "কিভাবে এই চিঠি দুটো ভাঁজ করা ছিল তা আমি মনে করতে পারছি না।"

প্রশ্ন ঃ আপনি নৌবাহিনীর এ,বি,খুরশীদকে কি করে চিনলেন?

উত্তর ঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান একসময় তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

প্রশ্ন ঃ তখন আপনারা কি আন্দোলনের কথা আলোচনা করেছিলেন?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ তিনি আপনার আত্মীয় কিম্বা একই জায়গায় কাজ করেছেন? তার বাবার নাম জানেন? কোন জেলায় তার বাড়ী? সাক্ষী উত্তরে বলেন যে, খুরশীদ তাহার কোন আত্মীয় নয়, একসঙ্গে কাজও করেননি। এবং তার বাবার নামও তার অজ্ঞাত। তবে জনাব খুরশীদের বাড়ী ফরিদপুর বলিয়া সাক্ষী উল্লেখ করেন।

প্রশ্ন ঃ খুরশীদের হাতের লেখা আর কোন চিঠি আপনার কাছে আছে?

উত্তর ঃ এই মামলায় যেগুলো প্রমাণিত হয়েছে তাছাড়া আর কোন চিঠি নেই।

প্রশ্ন ঃ ঢাকায় শেখ মুজিবের বাড়ীতে মিটিং হবে, এটা আপনি কখন জানলেন?

উত্তর ঃ সুলতানউদ্দীনের করাচী ত্যাগের পর। অতঃপর সাক্ষীর হাতে P,W, 3/2 চিহ্ন সম্বলিত একটি পত্র দেওয়া হয় এবং তাঁহাকে একটি নির্দিষ্ট ইংরেজী বাক্যের অনুবাদ করিতে বলা হয়। উত্তরে সাক্ষী বলেনঃ এর অর্থ 'আমি জায়গার ব্যবস্থা করেছি।' অর্থাৎ আমি বৈঠকের স্থানের ব্যবস্থা করেছি। এই চিঠিতে বৈঠকের তারিখ দেয়া আছে ২৮ ও ২৯। অভিযুক্ত নূর মোহাম্মদ এই সংস্থায় আমার চেয়ে পুরনো সদস্য। নূর মোহাম্মদ চাকরী করছিলেন। তিনি ১৯৬৫ সনের আগষ্টে করাচীতে পি,এন,এস হিমালয়'তে থাকতেন। ১৯৬৫ সনের আগষ্টে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন থাকতেন পি এন এস 'কারসাজে'। নূর মোহাম্মদকে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট যেতে হলে তাঁকে প্রথমে সদরে যেতে হতো। সদর কারসাজের পশ্চিম পার্শ্বে। জাহাঙ্গীর রোড, যেখানে আমি থাকতাম, কারসাজের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। পি এন এস, 'হিমালয়' কারসাজের পশ্চিম পার্শ্বে। EXT, PW, 3/2 চিহ্ন সম্বলিত এই পত্রে উল্লিখিত যে দেড় হাজার টাকা ইন্সুরেন্সে আমার নিকট আসে, তা আমার নিকট ছিল না। পোষ্টাল অথরিটির নিকট আমি এর প্রাপ্তি স্বীকার করি। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আমি বলি যে, সুলতানউদ্দীন আহমেদ আমাকে ঢাকা থেকে লিখেছেন যে, তিনি ইন্সুরেন্স ও টি এম ও যোগে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ও লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদের নিকট দেড় হাজার ও ৫ শত টাকা পাঠিয়েছেন। আমি পুলিসের নিকট একথা বলিনি যে, "একটি চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট দেড় হাজার টাকা পাঠাইয়াছেন।"

প্রশ্ন ঃ আপনি সুলতানউদ্দীন সম্পর্কে কী জানেন?

উত্তর ঃ আমি জানি অভিযুক্ত সুলতানউদ্দীন আহমেদ অবিবাহিত, আমি বলতে পারছি না ১৯৬৫ সনের আগষ্টে তিনি কতদিনের ছুটি নিয়েছিলেন। আমি একথাও বলতে পারছি না যে, তাঁর ছুটি ঐ মাসের কোন তারিখ থেকে

হয়। আমি জানি না তাঁর বিয়ের জন্য তিনি ১ মাসের ছুটি নিয়েছিলেন কিনা। হতে পারে যে, ঢাকায় গিয়ে তাঁর বিয়ে ঠিক হতে চলেছিল।

এটা ঠিক যে, EXT PW 3/2 চিহ্ন সম্বলিত পত্রে উল্লিখিত নূর মোহাম্মদের নিকট প্রেরিত ৫ শত টাকা আসলে নূর মোহাম্মদ কর্তৃক সুলতানউদ্দীন আহমেদকে তাঁর প্রস্তাবিত বিয়ের জন্য প্রদত্ত একটি ঋণ।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ এটা ঠিক নয় যে, Ext, P,W 3/2 চিহ্ন সম্বলিত পত্রে এই 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' শুধু এজন্যই দেয়া হয়েছে যে, আমি জানতাম সুলতানউদ্দীন আহমেদ নূর মোহাম্মদকে ৫ শত টাকা ফেরত পাঠিয়েছেন। ২৮শে আগষ্টের বৈঠকে আমাদের যোগদানের অভিপ্রায়ের কথা জানিয়ে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের পক্ষ থেকে আমি ঢাকায় যে টেলিগ্রাম পাঠাই সেটা বা তার কোন নকল আমি আদালতে দেখিনি। আমি স্মরণ করতে পারছি না ১৯৬৮ সনের ১৯শে জানুয়ারী পুলিসের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দীতে আমি এই টেলিগ্রামের কথা উল্লেখ করেছিলাম কিনা। আমি স্মরণ করতে পারছি না ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দীতে আমি এ কথা বলেছিলাম কিনা যে, ১৯৬৫ সনের ১৮ই আগষ্ট ঢাকা বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আসেন এবং আমাকে বলেন যে, তিনি ঢাকায় যাইতেছেন। আমি এটা পুলিসের নিকট বলেছিলাম (এখনও রেকর্ড হয়নি)।

অতঃপর কৌসুলি প্রশ্ন করিলেনঃ ঢাকা আসার জন্য পি আই এ'র টিকিট কেনার জন্য পি আই এ কাউন্টারে আপনি কি নাম দিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ আমি কোন নাম লেখাইনি। সেটা একজন পিআইএ কর্মচারীকে দিয়ে করিয়েছিলাম।

প্রশ্ন ঃ টিকেটে আপনার কি নাম ছিল?

উত্তর ঃ সেখানে আমার নিজের নাম আমীর হোসেন মিয়া ছিল।

প্রশ্ন ঃ টিকেট কেনার জন্য লেঃ মোয়াজ্জেমকে যে দু'হাজার টাকা দেয়া হয়েছিল সেটা ছাড়া আর কোন টাকা আন্দোলনের জন্য লেঃ মোয়াজ্জেম বা আপনি পেয়েছিলেন?

উত্তর ঃ না। আমার জানা নেই।

প্রশ্ন ঃ ঢাকা আসা উপলক্ষে আপনি কতদিনের ছুটি নিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ ১০ দিনের।

প্রশ্ন ঃ ঢাকায় থাকার সময় আপনার খরচ কে বহন করত– আপনি নিজে?

উত্তর ঃ না, সব টাকাই দলের তহবিল থেকে। তবে ঢাকা যাওয়ার সময় আমার নিজের দেড়শ।

প্রশ্ন ঃ আপনার ছুটি কবে থেকে শুরু হয়েছিল?

উত্তর ঃ ৩০শে আগষ্ট থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর।

প্রশ্নঃ ঢাকায় আসার কথা আপনার কোন বন্ধু-বান্ধবকে বলেছিলেন?

উত্তর ঃ আমার চাকর ছাড়া, ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অফিসার–অফিসে আমার অফিসার ইন-চার্জ আমার ঢাকা আসার দিনে জেনেছিলেন।

প্রশ্ন ঃ আপনার আর কোন সহকর্মীকে ঢাকায় আসার কথা বলেছিলেন?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ ঢাকায় এসে আপনি আপনার কোন বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন?

উত্তর ঃ আসলে ঐ রকম দেখা করার মত কোন লোক আমার এ জগতে নেই।

এই জবাব শ্রবণের পর কৌসুলি সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ফরিদপুর জেলার জাজিরা থানার নাওডুবা গ্রামের জনাব আমীর মোল্লা ও তাঁর ছেলে হামিদ মোল্লাকে চেনেন কিনা।

সাক্ষী তাঁদের চেনেন বলে জওয়াব দেন।

প্রশ্ন ঃ আমীর মোল্লার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক? কোন বৈবাহিক সম্পর্ক আছে?

উত্তর ঃ না, আমীর মোল্লা আমার বাবার সম্পর্কে ভাই হয়।

প্রশ্ন ঃ ইয়াসিন আকন্দ কে?

উত্তর ঃ তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। হামিদ মোল্লা হলেন ইয়াসিন আকন্দের জামাই।

রাজসাক্ষী আমীর হোসেনকে কৌসুলি অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

"আপনি কি আমীর মোল্লার মেয়েকে বিয়ে করার পর তালাক দেননি?"

উত্তর ঃ না, আসলে কোন বিয়ে হয়নি। আমীর মোল্লার মেয়ের সঙ্গে আমার আব্বা-আম্মা বিয়ের বন্দোবস্ত করেছিলেন– তখন আমি ক্লাস সিক্স-এ পড়ি। বিয়ের পর তালাক দিয়েছি এ কথা সত্য নয়।

প্রশ্ন ঃ ঢাকাতে কি আপনার চেনা শোনা কেউ নেই? তাদের সঙ্গে সেবার দেখাও করেননি?

উত্তর ঃ ওই সময় ডাক্তার আবদুর রহমান নামে একজন স্বগ্রামের লোকের সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ সেবার ঢাকায় এসে ঢাকা হোটেলে আপনি ক'দিন ছিলেন?

উত্তর ঃ ২৬ দিন।

ছিলাম সেসময় হোটেল রেজিষ্টারে আমি নাম তুলিনি।

প্রশ্ন ঃ সেসময় আপনার নামে হোটেলের কোন বিল করা হয়েছিল?

উত্তর ঃ আমার মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন ঃ বিলের টাকা দেয় কে?
উত্তর ঃ আমি দিয়েছি।
প্রশ্ন ঃ কত টাকা?
উত্তর ঃ তা-ও মনে নেই।
প্রশ্ন ঃ বিলে তাহলে আপনার নামই ছিল?
উত্তর ঃ না।
প্রশ্ন ঃ টাকাটা কিভাবে পরিশোধ করতে হতো–সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে না দৈনিক?
উত্তর ঃ সপ্তাহের শেষে টাকা দিতে হত। তারপর হোটেল ছেড়ে যাবার সময় বাকীটা পরিশোধ করে যাই।
কৌঁসুলি তখন বলেনঃ "আমি যদি বলি ১৯৬৫-এর ৯ই সেপ্টেম্বরের পরে সুলতানউদ্দীন ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আপনার সঙ্গে হোটেলে ছিলেন না।
উত্তর ঃ ঠিকই।
প্রশ্ন ঃ যখন আপনি বিল পরিশোধ করেন তখন আপনার সঙ্গে কেউ ছিল?
উত্তর ঃ না, আমি একা ছিলাম।
প্রশ্ন ঃ তাহলে টাকা প্রাপ্তির রশিদে আপনার নামই লেখা হয়?
উত্তর ঃ আমার নামও হতে পারে–কামাল উদ্দীনের নামও হতে পারে।
প্রশ্ন ঃ এবার বলুনত হোটেল আরজুতে কি আপনার নিজের নাম ছিল?
উত্তরে সাক্ষী বলিলেনঃ না,সেখানেও আমার নিজের নাম ছিল না। তবে হোটেলের খাতায় আমার নাম আবদুর রহিম বলে লেখা হয়।
প্রশ্নঃ তার মানে আপনি হোটেল আরজু'তে ভুয়া নামে ছিলেন? আপনি কি এই ভুয়া নামেই ঢাকার ষ্ট্যাষ্টিক্যাল অফিসে হাজির হতেন?
উত্তর ঃ না, আমি অফিসে ভুয়া নামে হাজিরা দিতাম না।
প্রশ্নঃ ১৯৬৫-এর আগষ্ট থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে ঢাকা হোটেলে ছিলেন তখন আর যারা সেই হোটেলে ছিলেন এবং হোটেলের ম্যানেজার ও কর্মচারীরা আপনার আসল নাম জানতেন?
উত্তর ঃ না, তাদের কাছে আমি নাম গোপন করিনি–ম্যানেজার আমার নাম জানতেন।
জনাব সালাম খান অতঃপর সাক্ষীকে তাহার দাঁতের কষ্ট আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন।
প্রশ্ন ঃ আপনার কোন দাঁত ফেলা হয়েছে? কটা দাঁত নেই?
উত্তর ঃ জী, হ্যাঁ (১৯৬৫ সালে তিনটে, ৬৬-এর জানুয়ারীতে মোট ৬টি আসল দাঁত ফেলে দেওয়া হয়েছে)।
প্রশ্ন ঃ আমি যদি বলি, ১৯৬৭ সালেই আপনার ৬টা দাঁত পড়েছে ....?
উত্তর ঃ না, সেটা ঠিক নয়।

ইহার পর কৌঁসুলি সাক্ষীকে তাঁহার করাচী হইতে ঢাকা আগমন এবং বিবৃতিতে উল্লিখিত জীপটি সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করেন। জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি ১৯৬৫-এর আগষ্টে রাত একটা থেকে তিনটের মধ্যে ঢাকা পৌঁছেই দেখেছেন যে, একটি জীপ তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।
প্রশ্ন ঃ জীপটি তখন প্রথম দেখলেন?
উত্তর ঃ জী হ্যাঁ।
প্রশ্ন ঃ পরে আরও দেখেছেন?
উত্তর ঃ জী হ্যাঁ।
প্রশ্ন ঃ জীপের নম্বর মনে আছে?
উত্তর ঃ হয় ঢাকা-৩৯৯১ অথবা ঢাকা-৯১৩৯।
প্রশ্ন ঃ কে, জি, আহমদ ত ট্যাক্সি ব্যবহার করতেন। সেই ট্যাক্সির নাম্বার মনে আছে?
উত্তর ঃ না, মনে নেই।
প্রশ্নঃ আর কোন গাড়ী বা জীপের নাম্বার আপনি বলতে পারেন?
প্রশ্ন ঃ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের কখনো গাড়ী ছিল জানতেন?
উত্তর ঃ না, জানি না।
প্রশ্ন ঃ চট্টগ্রামে তিনি বদলি হয়ে আসার পর তাকে কখনো পূর্ব পাকিস্তানে নিজের গাড়ী চড়তে দেখেছেন?
উত্তর ঃ না, দেখিনি। তবে অন্যের গাড়ী চড়তে দেখেছি।
প্রশ্ন ঃ সেসব গাড়ীর নাম্বার বলতে পারেন?
উত্তর ঃ না, তাও পারি না।
ইহার পর সাক্ষী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ১৯৬৫-এর ২৯শে আগষ্টে তিনি ধানমণ্ডীর 'আলেয়া'তে গিয়ে দেখেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেম তাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।
প্রশ্ন ঃ 'আলেয়া' থেকে লেঃ মোয়াজ্জেম কতদূরে ছিলেন?
উত্তর ঃ দুশো থেকে তিনশ গজ দূরে।
প্রশ্ন ঃ তখন কটা বাজে?
উত্তর ঃ সকালবেলা।
চেয়ারম্যান ঃ ঠিক ঠিক কোন সময় বলতে পারেন?
উত্তর ঃ আমার মনে নেই। অতঃপর জনাব সালাম খান রাজসাক্ষী আমীর হোসেনকে বলেন যে, আপনি ১৯৬৫ সালের আগষ্টে আদৌ ঢাকা হোটেলে থাকেননি, এবং এই সময় তিনি লেঃ মোয়াজ্জেমের সঙ্গেও আসেননি।
সাক্ষী ইহা অস্বীকার করেন।
প্রশ্ন ঃ ১৯৬৫-র ৬ই সেপ্টেম্বর ভারতের সঙ্গে সরকারীভাবে যুদ্ধ হওয়ার আগেই কাশ্মীরে যুদ্ধ চলছিল জানতেন?

উত্তর ঃ না, জানতাম না।
প্রশ্ন ঃ কাশ্মীরে মোজাহিদরা যে লড়াই করেছিল তাও জানতেন না?
উত্তর ঃ না।
প্রশ্ন ঃ সামরিক কর্মচারীদের জন্য যুদ্ধকালীন জরুরী আইন ১৯৬৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বলবৎ ছিল?
উত্তর ঃ না, জানতাম না।
প্রশ্নঃ যুদ্ধকালে সামরিক অফিসার ও কর্মচারীদের ২৪ ঘণ্টাই কার্যরত থাকিতে হয়, সেটা জানতেন?
উত্তর ঃ জী না।
প্রশ্ন ঃ ওই সময় তারা উর্দ্ধতন অফিসারের অনুমতি ছাড়াও কোথাও যেতে পারতেন না—সেটাও কি ঠিক?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, সেটা সত্য।
প্রশ্ন ঃ ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের সময় লেঃ মোয়াজ্জেম কোথায় ছিলেন তা জানতেন?
উত্তর ঃ তিনি তখন করাচীর নৌবাহিনীর সদর দফতরে লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে কাজ করতেন।
প্রশ্ন ঃ করাচীতে নৌবাহিনীর সদর দফতর কোথায়?
উত্তর ঃ ঠিক কোথায় তা আমি জানি না।
প্রশ্ন ঃ সমুদ্রবক্ষে নয়ত?
উত্তর ঃ তা আমি জানি না।
জনাব সালাম খানঃ ঢাকা হোটেলে ১৯৬৫ সালের আগষ্টে আপনি যে রুমে বাস করতেন তার নম্বরটা কি?
উত্তর ঃ আমার মনে নেই, তবে সেখানে নিয়ে গেলে আমি দেখিয়ে দিতে পারি।
প্রশ্ন ঃ ২৯ শে আগষ্ট শেখ মুজিবের বাসায় মিটিংয়ের কোন সময় নির্দিষ্ট করা ছিল?
উত্তর ঃ না।
প্রশ্ন ঃ শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ী ও 'আলেয়া' ধানমণ্ডীতে অবস্থিত। এখন বলুনত ঢাকা হোটেল থেকে ধানমণ্ডীর আলেয়া এবং আলেয়া থেকে শেখ মুজিবের বাড়ী কতদূর?
উত্তর ঃ ঢাকা হোটেল থেকে আলেয়া ২/৩ মাইল হবে আর আলেয়া থেকে শেখ মুজিবের বাড়ী এক মাইল হবে।
প্রশ্নঃ এক মাইল? ঠিক বলছেন?
উত্তরঃ হ্যাঁ, 'আলেয়া' থেকে শেখ মুজিবের বাড়ী মীরপুর রোড হয়ে গেলে এক মাইল।

প্রশ্ন ঃ 'আলেয়া' থেকে শেখ মুজিবের বাড়ীতে কোন লোক মীরপুর রোড দিয়ে ঘুরে যাবে কেন? আমি জিজ্ঞাসা করি সবচেয়ে নিকটতম রাস্তা দিয়ে যেতে কতদূর হবে?
উত্তর ঃ তা আমি বলতে পারি না।

কৌঁসুলির অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, মিটিংয়ের সময় জানার জন্য কখন ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে শেখ মুজিবের বাসায় পাঠান হয়েছিল তা তিনি বলিতে পারেন না। সাক্ষী স্বীকার করেন যে, শেখ মুজিবর রহমান ও ডঃ খালেক– উভয়েরই টেলিফোন নম্বর রহিয়াছে।

তবে লেঃ মোয়াজ্জেম পূর্বেই টেলিফোনে শেখ মুজিবের সহিত কথাবার্তা বলিয়াছেন কিনা তিনি বলিতে পারেন না।

সাক্ষী জানান যে, ঢাকা হোটেলেও টেলিফোন রহিয়াছে। মিটিংয়ের সময় জানানোর জন্য ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে ঢাকা হোটেলে যাইতে হইত বলিয়াও তিনি মনে করেন।
প্রশ্ন ঃ আপনি কি সেদিন শেখ মুজিবরের বাসায় দুপুরের খাবার খেয়েছিলেন?
উত্তর ঃ না।
প্রশ্নঃ মিটিংয়ের সময় সম্পর্কে আপনারা কখন আলোচনা করেন এবং কখন ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে শেখ মুজিবর রহমানের বাসায় পাঠান?
উত্তর ঃ তখন সকাল আটটা হবে।

অতঃপর জনাব সালাম খান জিজ্ঞাসা করেনঃ "মিটিংয়ের সময় যদি সকাল সাড়ে আটটা ঠিক হতো তাহলে আপনি কি করতেন?

রাজসাক্ষী আমীর হোসেন বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি জনাব আবদুস সালাম খানের প্রশ্নের জবাব দানের আগেই চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস,এ, রহমান ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন আগামী সোমবার সকাল নয়টা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করেন।

দৈনিক পাকিস্তান

১২ই আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আজ আবার শুরু

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন আজ সোমবার সকালে পুনরায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে শুরু হবে।

গতকাল রোববার ঢাকায় পিপিআই পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, আজ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশনে একরারী সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার জেরা অব্যাহত থাকবে। ইতিপূর্বে তার জেরা অসমাপ্ত ছিল।

উল্লেখযোগ্য যে, সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমানের নেতৃত্বে এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে।

Dawn

13th August 1968

Mujib promised to get funds from India

Amir Husain's evidence in Agartala Conspiracy case

(From MAHBUBUL ALAM)

DACCA, Aug 12: The cross examination of the Prosecution witness, Amir Husain Mian, by the defence counsel. Mr. Abdus salam Khan, in the Agartala Conspiracy case, was resumed before the Special Tribunal here today after two days of week-end recess. The defence counsel was still cross-examining the witness when the Court rose for the day.

On being cross-examined by the defence counsel the witness said he had not been to the house of Sheikh Mujibur Rahman before Aug 29, 1965, when a meeting of their movement was held there. After that he had been to the house of Sheikh Mujibur Rahman thrice, both during the day and night, accompanied by someone. He also had an exclusive meeting with sheikh Mujibur Rahman at the latter's Jinnah Avenue office. The witness said after his arrest he was not taken any where near the house of Sheikh Mujibur Rahman by the Pollice.

The witness, who was being cross-examined by Mr. Abdus Salam Khan for the fourth day today, said a list of arms and ammunitions was given to him by Lieutenant Moazzam. He had kept the list with him. He, however, could not explain the contents of the list, he said.

The witness said that he had not prepared the budget for the movement, but said he had suggested to Lt. Moazzam in a letter that such a budget should be prepared. Lt. Moazzam had asked him to prepare a budget, but "I did not do anything", he said.

When his attention was drawn by the defence counsel to a statement he had made to the police, Amir Husain mian said he had made an estimate.

In reply to another question the witness said at the meeting at Sheikh Mujibur Rahman's house on Aug 29, 1965, there was discussion about the progress made by the organisation. There was no mention as to how much money had been collected and how many people were inducted. It was however, mentioned that a large number of persons had been inducted, but their names or number were not specified.

On being further cross-examined, the witness said sultanuddin and Steward Mujib were wholetime workers of the organisation in

East Pakistan. He was not aware, he said, if there was any wholetime worker of the organisation in West Pakistan.

The witness said he had been taken into confidence in respect of the movement. No payment was fixed for sultanuddin and Steward Mujib per month, but they were paid from time to time the witness said.

APP adds: He said he (witness) and LT. Moazzam had agreed among themselves to use one word for one particular meaning.

He said the word "patient" used in some letters meant East Pakistan. It was agreed between him (the witness) and LT. Moazzam that the word "patient" would be used for East Pakistan. He said it was correct that he had earlier stated that the word "mother" stood for East Pakistan. He said the word "medicine" was sometime used for money.

He said he forgot what other words were used for money. The words which were used for arms and ammunition were material, tools and sometimes things.

The defence counsel suggested to the witness that the word "goods" was also used in some letters, the witness said that too meant arms and ammunition. The term "preseribed medicine" as distinguished from the word "medicine" was used for arms and ammunition and funds also. He said it was right that more than on word were used for the same meaning. He said the movement was described in the letters as "business". He said it was true that he had stated that trade also stood for the movement. He had also stated that contract business stood for the movement. He said the statement that he made about the agreement that he and LT. Moazzam had on the use of words in a particular sense was not false.

The witness said he could not give an estimate as to how much time was required to collect the donation of Rs. One lakh if it was to be collected in an instalment of Rs. two to four thousand.

He said Sheikh Mujibur Rahman also promised to get funds from India at the meeting of Aug 29, 1965. Besides Sheikh Mujibur Rahman no other person announced any donation.

The witness said Rs. 4,700 collected from Sheikh Mujibur Rahman (on September 1 and September 9, 1965) were not meant for arms and ammnunition. He said the money was intended for party expenses both at Karachi and Dacca.

Out of this amount he said Rs. 300 were left with Steward Mujib and Sultanuddin Ahmad for expenses in connection with party work in East Pakistan. Another sum of Rs. 300 was spent by

him (witness) in respect of expenses of three of them. The balance, he said was paid by him to LT. Muazzam in Karachi. He did not know if any part of this sum was ever sent to Dacca.

On being further cross-examined by the defence counsel, the witness said he had made a mistake in saying before the Tribunal that two Karachi meetings, one at the residence of Lt. Muazzam and the other at the residence of Mr. Ahmad Fazlul Rahman, were held in November, 1965. Actually the were held in December 1965.

Morning News

13th August 1968

Amir Hossain deposes before Tribunal
Progress achieved by organisatioin
discussed at Sk. Mujib's house

(By Our Staff Reporter)

On the fourth day of cross-examination by the defence yesterday the prosecution witness Mr. Amir Hossain told the Special Tribunal hearing Agartala conspiracy case that in the Meeting held at the residence of Sheikh Mujibur Rahman, Awami League Leader, the progress achieved by the organisation in carrying on their movement had been discussed.

The three-member Special Tribunal headed by the former Chief justice of Pakistan Mr. Justice S.A. Rahman is trying Sheikh Mujibur Rahman and 34 others including three CSP officers and a Naval Commander for allegedly conspiring for the separation of East Pakistan from the Centre by an armed revolt with arms and ammunitions from India.

Mr. Amir Hossain said that in the meeting held at Sheikh Mujibur Rahman's house it was mentioned that large number of people had been inducted into the movement. In that meeting Sheikh Mujibur Rahman had also promised to get funds from India.

Replying to a question by the defence counsel, the prosecution witness said that he had not been to the house of Sheikh Mujibur Rahman before August 29,1965. After that he visited the house of Sheikh Mujibur Rahman thrice but every time he was accompanied by somebody else. He also said that he had once an exclusive talk with Sheikh Mujibur Rahman at his office in Jinnah Avenue. He said Sheikh Mujibur Rahman did not object to his going to his office to meet him.

Mr. Amir Hossain said that he was asked by Lt. Moazzem Hossain to prepare a budget of Rs. 50 to 60 lacs.

সংবাদ

১৩ই আগস্ট ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

জেরার চতুর্থ দিবসে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া বলেনঃ
'অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা থাকিলেও আমি উহার বিবরণ দিতে অক্ষম'

(নিজস্ব বার্ত্তা পরিবেশক)

গতকাল (সোমবার) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল মেসে দুইদিন সাপ্তাহিক বিরতির পর বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান তিন নম্বর সাক্ষী ও দ্বিতীয় রাজসাক্ষী জনাব আমীর হোসেন মিয়াকে জেরা করেন। জেরাকালে জনাব আমীর হোসেন বলেন যে, আদালতে পেশকৃত চিঠিপত্রে ব্যবহৃত "সাংকেতিক শব্দগুলি" ভূয়া নহে।

এই প্রসঙ্গে কৌসুলির বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী ইতিপূর্বে বলিয়াছিলেন যে, একেকটি 'সাংকেতিক শব্দ' শুধু একটিমাত্র অর্থই বহন করে। রাজসাক্ষীর এই বক্তব্য শ্রবণের পর বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান উপরোক্ত চিঠিগুলি হইতে উদ্ধৃতি দিয়া একই বক্তব্য বোঝাইবার উদ্দেশ্যে একাধিক সাংকেতিক শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। সাক্ষী অপর এক প্রশ্নের জবাবে স্বীকার করেন যে, তাঁহার কাছে অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা থাকিলেও তিনি উহার বিবরণ দিতে অক্ষম।

বিচারপতি জনাব এস,এ,রহমান (চেয়ারম্যান), বিচারপতি জনাব এম,আর,খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিম সমবায়ে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে "ষড়যন্ত্র মামলা"র শুনানী চলিতেছে। এই মামলায় সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্রের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হইয়াছে।

উল্লেখযোগ্য যে, গত ৭ই আগষ্ট রাজসাক্ষী জনাব আমীর হোসেনের সওয়াল-জওয়াব শুরু হইয়াছে।

জেরার বিবরণ

গতকাল বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব সালাম খান জেরা শুরু করিলে প্রাথমিক কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন বলেনঃ আমি ১৯৬৫ সালের ২৯শে আগষ্টের আগে কখনো শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ী যাইনি। এই তারিখের পর আমি তিনবার শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ী গিয়েছি। তাঁর বাড়ীতে আমি রাত্রেও গেয়েছি, দিনেও গেয়েছি। আমার গ্রেফতারের পর আমাকে শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ীর ত্রিসীমায়ও নিয়ে

যাওয়া হয়নি। রক্সী হোটেল কোথায় তা আমার জানা নেই। আমি যখনই শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ী গেয়েছি তখনই কেউ না কেউ আমার সঙ্গে থাকতেন। একবার তাঁর জিন্নাহ এভিনিউর অফিসে তাঁর সঙ্গে আমার একলা আলাপ-আলোচনা হয়। সেসময় আমার সাথে কেউ ছিলেন না। তাঁর সাথে একলা দেখা করায় তিনি কোন আপত্তি জানাননি।

জনাব সালাম খানঃ অস্ত্রশস্ত্রের কোন তালিকা কি আপনার কাছে ছিল?

আমীর হোসেন ঃ জী হ্যাঁ, ছিল।

প্রশ্ন ঃ ওই অস্ত্রের তালিকায় যেসব অস্ত্রশস্ত্রের কথা লেখা ছিল আপনি তার বিবরণ দিতে পারেন?

উত্তর ঃ না, পারি না।

প্রশ্ন ঃ শেখ মুজিবের বাসায় অনুষ্ঠিত ২৯শে আগষ্টের কথিত সভায় দলের আর কোন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের নাম উল্লেখ করতে আপনি শুনেছেন?

উত্তর ঃ গুরুত্বপূর্ণ বা কোন সাধারণ সদস্যের নামই সেখানে শুনিনি।

প্রশ্ন ঃ আপনি বলেছিলেন যে, আপনি একটা বাজেট তৈরী করেছেন। সেটা কি?

উত্তর ঃ না, আমি কোন বাজেট তৈরী করিনি, তবে একটা চিঠিতে লেঃ মোয়াজ্জেমকে আমি আন্দোলনের জন্য একটা বাজেট তৈরীর কথা লিখেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ লেঃ মোয়াজ্জেম কি কোন বাজেট তৈরী করেছিলেন?

উত্তর ঃ জী না।

প্রশ্ন ঃ আপনি এই আদালতের সামনে বলেননি যে, আপনি একটা বাজেট তৈরী করেছিলেন?

উত্তরঃ না।

প্রশ্ন ঃ আপনার বিবৃতিতে এ কথা কি আপনি বলেননি যে, আপনাকে লেঃ মোয়াজ্জেম ৫০/৬০ লাখ টাকার অস্ত্রশস্ত্রের একটা বাজেট তৈরী করতে বলেছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

ইহার পর কৌঁসুলি রাজসাক্ষীকে পুলিসের নিকট প্রদত্ত তাঁহার জবানবন্দীর একটি অংশ পড়িয়া শোনান। ইহার সত্যতা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি ব্যয়ের একটি হিসাব তৈরী করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন ঃ চিঠিপত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশেষ সাংকেতিক শব্দের এক বা একাধিক অর্থের কথা আপনি উল্লেখ করেছিলেন। যেমন "মা" অর্থ পূর্ব পাকিস্তান। এরকম সব সাংকেতিক শব্দের অর্থ আপনি জানেন?

উত্তর ঃ কতগুলো পারি, কতগুলো পারি না।

প্রশ্ন ঃ একই সাংকেতিক শব্দ কি সর্বত্র একই অর্থ বহন করে?

উত্তর ঃ একটি সাংকেতিক শব্দকে একটিমাত্র অর্থে ব্যবহারের জন্যে লেঃ মোয়াজ্জেম ও আমি একমত হই।

প্রশ্ন ঃ "রোগী" বলতে কি বোঝাতে চান?

উত্তর ঃ পূর্ব পাকিস্তান।

প্রশ্ন ঃ আবার "মা" শব্দটিরও কি আপনি "পূর্ব পাকিস্তান" অর্থ করেননি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, করেছি।

প্রশ্ন ঃ টাকা-পয়সা মানে কি?

উত্তর ঃ টাকা-পয়সাকে কখনো কখনো "ঔষধপত্র" সাংকেতিক শব্দ দিয়ে বোঝান হইয়াছে।

জেরার উত্তরে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন বলেনঃ

আমার ডাইরী ছিল, তবে ডাইরীতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লিখতাম না–

... ঢাকার আর কোন লোক এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে থাকলেও আমি তাদের নাম জানি না।

প্রশ্ন ঃ টাকা-পয়সার আর কোন সাংকেতিক শব্দ আছে?

উত্তর ঃ আমি জানি না।

প্রশ্নঃ অস্ত্রশস্ত্রের জন্য কোন সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করেছেন?

উত্তর ঃ 'কখনও জিনিসপত্র', কখনো 'খুচরা যন্ত্রপাতি', কখনো শুধু 'জিনিস' বলে বোঝান হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি 'ঔষধপত্র'কেও অস্ত্রশস্ত্রের সাংকেতিক শব্দ বলে বলেছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রের ঔষধ বলতেও অস্ত্রশস্ত্র এবং তহবিল বোঝান হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি তাহলে স্বীকার করেন যে, চিঠিপত্রে একই জিনিস বোঝানোর জন্য বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ঠিক।

প্রশ্ন ঃ 'আন্দোলন' বোঝাতে কোন সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করেছেন?

উত্তর ঃ 'ব্যবসা'।

প্রশ্ন ঃ 'বাণিজ্য' শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করেছেন?

উত্তর ঃ জী হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ 'কনট্রাক্টে ব্যবসা' শব্দটিও কি আন্দোলন অর্থে ব্যবহার করা হয়নি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তা করা হয়েছে।

কৌঁসুলিঃ সুতরাং দেখা যাচ্ছে লেঃ মোয়াজ্জেম ও আপনি একটি সাংকেতিক শব্দ একটিমাত্র অর্থে ব্যবহারের জন্য সিদ্ধান্ত করেছেন বলে আপনি যে বিবৃতি দিয়েছেন তা ডাহা মিথ্যে, নয় কি?

উত্তর ঃ জী না, মিথ্যে নয়।

প্রশ্ন ঃ সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার সংক্রান্ত আপনাদের সিদ্ধান্ত কি দলের আর কেউ জানত?

উত্তর ঃ লেঃ মোয়াজ্জেম অন্য সদস্যদের সেটা জানিয়েছিলেন কিনা, আমার জানা নেই।

ইহার পর কৌসুলি ১৯৬৫-এর ২৯শে আগষ্ট শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত কথিত সভায় যোগদানকারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে সাক্ষী বলেনঃ ১৯৬৫ সালের ২৯শে আগষ্ট তারিখে শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ীর বৈঠকে যে সমস্ত লোক যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা ছাড়া ঢাকার আর কোন লোক এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে থাকলে আমি তাঁদের নাম জানি না। জনাব এ, এফ,ফজলুর রহমানকে করাচী থেকে ঢাকা আনার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে সেসময় আমার কিছু জানা ছিল না। "সমন্বয় সাধন" বলতে আমি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে সমন্বয় বিধান বুঝাইতে চাই।

এই বৈঠকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য সম্পর্কে এই বৈঠকে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল।

এ পর্যন্ত কি পরিমাণ তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে, বৈঠকে তার কোন উল্লেখ করা হয়নি। সংখ্যা কিম্বা কোন নাম উল্লেখ না করে আন্দোলনের জন্য বহু লোক সংগৃহীত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

এই সময়ে জনাব আবদুস সালাম খানের এক প্রশ্নের উত্তরে রাজসাক্ষী বলেন, ২ হাজার থেকে ৪ হাজার টাকার কিস্তিতে দেয়া হলে ১ লক্ষ টাকা চাঁদা শোধ হতে কতদিন সময় লাগতে পারে আমি তার কোন হিসেব দিতে পারব না।

শেখ মুজিবর রহমান ভারত থেকে তহবিল সংগ্রহেরও ওয়াদা করেছিলেন বলেও সাক্ষী বলেন।

জনাব আবদুস সালাম খানের অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী জানান যে, উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি ছাড়া সভায় আর কোন প্রতিশ্রুতি কিম্বা চাঁদা দেওয়া হয়নি।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি ডাইরীতে আপনার নিজের দিনপঞ্জী লিখতেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমার ডাইরী ছিল। তবে ডাইরীতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিনের ঘটনা লিখতাম না।

প্রশ্ন ঃ কি লিখতেন তাহলে?

উত্তর ঃ দলের বিভিন্ন সদস্যের খুচরো খরচপাতির হিসেব। অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে দলের সদস্যদের আমি যেসব খুচরো টাকা-পয়সা দিতাম তার হিসেব।

প্রশ্ন ঃ দলের বিভিন্ন লোককে যেসব কাজে দায়িত্ব দেয়া হত তা কি ডাইরীতে লিখতেন?

উত্তর ঃ আমার মনে নেই।

প্রশ্ন ঃ সেটা কি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি?

উত্তর ঃ বলতে পারি না ।

প্রশ্ন ঃ আপনিত জেরার উত্তরে মিঃ উইলিয়ামসকে বলেছিলেন যে, আপনার 'মহান আত্মচরিত' লেখার এক বিরাট পরিকল্পনা ছিল। সেজন্য কি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জী লিখে রাখার প্রয়োজন মনে করেননি?

উত্তর ঃ আন্দোলন ছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমি আত্মচরিত্রের জন্য লিখে রাখতাম।

প্রশ্ন ঃ কেন, 'আন্দোলন'কে আপনি কি আত্মচরিতের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ বটে। তবে দৈনন্দিন ঘটনাপঞ্জী আমি কোন কাগজে লিখে রাখিনি।

প্রশ্ন ঃ তার সারাংশও নয়?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ এখন আমি যদি বলি আত্মচরিত লেখার উদ্দেশ্যেই ডাইরীগুলো আপনি নিজের কাছে রেখেছিলেন–মিঃ উইলিয়ামসকে প্রদত্ত আপনার জবাব–এটা বলার জন্য আপনাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল?

উত্তর ঃ না, সেটা ভুল।

প্রশ্ন ঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও সুলতানউদ্দীনের সঙ্গে ১৯৬৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর আপনার সম্পর্ক কি খারাপ হয়েছিল?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি সন্দেহ করতেন–সুলতানউদ্দীন ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান যে টাকা-পয়সা পেয়েছিলেন তা ঠিকমত খরচ হবে না ও লেঃ মোয়াজ্জেমের কাছে ঠিকমত পৌঁছাবে না?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ শেখ মুজিবর রহমানের কাছে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান যদি একা যেতেন, তাহলে কি শেখ মুজিবর রহমান তার হাতে টাকা দিতেন না বলে আপনি সন্দেহ করেন?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ টাকা নিতে আপনি যখন ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের সঙ্গে শেখ মুজিবর রহমানের বাসায় যান তখন আপনি কোথায় অপেক্ষা করেন?

উত্তর ঃ "ঘরের বাইরে"।

প্রশ্ন ঃ ঘরের বাইরে মানে কি?

উত্তর ঃ তার মানে ড্রইং রুমে।

প্রশ্ন ঃ "ঘরের বাইরে" ড্রইং রুমের কোন সাংকেতিক শব্দ নাকি?

উত্তর ঃ আমি বলতে চাচ্ছি যে, যখন আমি ড্রইং রুমে অপেক্ষা করছিলাম– তখন ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ঘরের ভিতরে যায়।
প্রশ্ন ঃ যখন ওখানে বসেছিলেন সেখানে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল?
উত্তর ঃ না।
প্রশ্ন ঃ ড্রইং রুমে আপনাকে কে বসতে বলেছিল?
উত্তর ঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান বলেছিল।
প্রশ্ন ঃ আপনি যে ড্রইং রুমে অপেক্ষা করছেন সেটা শেখ মুজিবকে না বলার জন্য আপনি কি ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে অনুরোধ করেছিলেন?
উত্তর ঃ না।
প্রশ্ন ঃ তিনি যে টাকা এনেছেন তা আপনি কখন জানেন?
উত্তর ঃ বাইরে বেরিয়ে এসে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান জানান, শেখ মুজিবর রহমান তাকে ৭ শত টাকা দিয়েছেন। অবশ্য টাকাটা তিনি আমাকে হোটেলে ফিরে এসে দেন। এমনকি যদি ৯ই সেপ্টেম্বর ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান একাই শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ীতে যেতেন। তাহলেও তাঁকে যে টাকাটা দেয়া হবে– না এতে আমার কোন সন্দেহ থাকতো না। ঐ বার অবশ্য সুলতান উদ্দীন ও আমি তার সাথে যাই। আমি বাড়ীর বাইরে থাকি। সুলতানউদ্দীন ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ভেতরে যান। প্রথমবারে ড্রইং রুমে বসে থাকতে কোন আপত্তি ছিল না। বাড়ীর বাইরে আমি রাস্তার একেবারে পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিলাম। এই বার ৪ হাজার টাকা দেয়া হয়। তবে অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য নয়–এই টাকা ছিল করাচীতে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট প্রেরণের জন্য। দলীয় খরচ মানে করাচী ও ঢাকায় দলের জন্য খরচ। মোট ৪ হাজার ৭ শত টাকার মধ্যে ৪ হাজার এক শত টাকা করাচী নিয়ে যাওয়া হয়। মাত্র ৩শত টাকা ছিল ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের নিকট। এই টাকাটা পূর্ব পাকিস্তানে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের নিজস্ব খরচ এবং সুলতানউদ্দিনকে আন্দোলন বাবদ খরচের জন্য দেওয়া হয়।

বাদীপক্ষের কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন,'এই টাকা ব্যক্তিগত খরচের জন্য ছিল না।'এই আদালতে বাদীপক্ষের কৌসুলির জেরাকালে আমি বলি যে, এই টাকাটা তাদেরকে ব্যক্তিগত খরচের জন্য দেওয়া হয়। অপর ৩ শত টাকা আমি ঢাকায় ৩ জনের খরচ বাবদ ব্যয় করি। ঐ সময় আমরা ঢাকায় ছিলাম।

এই সময় সাক্ষীর আচরণে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি আপত্তি জানান এবং আদালতে উচ্চৈঃস্বরে বাকবিতণ্ডা হয়। বিবাদীপক্ষের কৌসুলিগণ সাক্ষীর এহেন আচরণ বন্ধ করার জন্য ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের প্রতি আবেদন জানান। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান সাক্ষীকে চুপ করিতে বলিয়া কৌসুলিদের শান্ত হইতে বলেন।

বাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের উল্লেখ করেন যে, জেরাকালে সাক্ষী কর্তৃক প্রদত্ত জবানবন্দীতে একথা ছিল না যে, তিনি 'ব্যক্তিগত খরচের' জন্য ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও সুলতানউদ্দীনকে ৩ শত টাকা দেন। সেখানে ছিল। 'তাঁহাদের খরচের জন্য'।

তারপর সাক্ষী বলেনঃ আমি অবশ্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত আমার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে একথা বলি যে, আমি এই দুই ব্যক্তির নিকট তাঁদের ব্যক্তিগত খরচের জন্য ৩ শত টাকা দিয়েছিলাম। আমি স্মরণ করতে পারছি না পুলিসকে আমি একথা বলেছিলাম কিনা যে, এই টাকা তাঁদেরকে আমি তাঁদের ব্যক্তিগত খরচের জন্য দেই। এই সময় আমার অবস্থানকালে আমার যে খরচ হয় তা দলীয় তহবিল থেকে দেয়া হয়।
প্রশ্ন ঃ আপনি ধুমপান করেন?
উত্তর ঃ আমি ধুমপান করি।
প্রশ্ন ঃ কী সিগারেট পান করেন?
উত্তর ঃ সাধারণতঃ ক্যাপষ্ট্যান।
প্রশ্ন ঃ দিনে কতটি?
উত্তর ঃ আমি দিনে মাত্র অর্ধেক প্যাকেট সিগারেট খাই।

তারপর জনাব সালাম খানের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী আরও বলেনঃ ১৯৬৫ সনের ২৯শে আগষ্ট থেকে ১৯৬৫ সনের সেপ্টেম্বরের প্রায় শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত আমি ঢাকায় ছিলাম। ছুটি মাত্র ১০ দিনের জন্য ছিল। এই সময়ের মধ্যে কোন দলীয় কাজে আমি বাইরে যাইনি। তবে ঢাকার অনেক জায়গায় গিয়েছি, যেমন অফিসে গিয়েছি ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। কোন কোন সময় বেবী ট্যাক্সীতে এবং কোন কোন সময় রিকশায় গিয়েছি। এটা ঠিক নয় যে, ১৯৬৫ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর অর্থ সংগ্রহের জন্য আমি ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও সুলতানউদ্দীনসহ শেখ মুজিবের বাড়ীতে গিয়েছিলাম বলে যে জবানবন্দী করেছি তা, মিথ্যা।
প্রশ্ন ঃ এই ৪ হাজার ১ শত টাকা আপনি যখন করাচীতে ফিরে গিয়ে লেঃ মোয়াজ্জেমকে দিয়েছিলেন,তখন আপনার সঙ্গে দলের আর কেউ ছিল?
উত্তর ঃ না।
প্রশ্ন ঃ ওই টাকার কিছু পূর্ব পাকিস্তানে পাঠান হয়েছিল?
উত্তর ঃ আমি জানি না।
প্রশ্ন ঃ টাকাটা আপনি কি লেঃ মোয়াজ্জেমের বাসায় দিয়েছিলেন?
উত্তর ঃ জী হ্যাঁ।
প্রশ্ন ঃ তখন বেলা ক'টা?
উত্তর ঃ সুর্য ডোবার আগে।

প্রশ্ন ঃ ওই সময় 'জরুরী' অবস্থায় লেঃ মোয়াজ্জেমের পক্ষে বাসায় থাকা সম্ভব নয় বলে যদি আমি বলি?
উত্তর ঃ তা ঠিক নয়! ইহার পর কৌসুলি বলেনঃ আপনি আদালতে বলেছিলেন যে, ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে করাচীতে দুটো মিটিং হয়। একটি লেঃ মোয়াজ্জেম ও অপরটি জনাব এ,এফ,রহমানের বাসায়, এটা কি ঠিক?
উত্তর ঃ না, আমি সেটা ভুল বলেছিলাম। আসলে তা ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে হবে।
এই প্রসঙ্গে সাক্ষী কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে আরও বলেনঃ

আমি এ সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নির্ভুল জবানবন্দী করি। প্রথম সভা সম্ভবতঃ ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় হপ্তায় লেঃ মোয়াজ্জেমের বাড়ীতে হয় এবং আর একটা সভা হয় শেষ হপ্তায় আহমদ ফজলুর রহমানের বাড়ীতে।
সাক্ষী আবার বলেন ঃ আমার মনে হয়, প্রথম সভাটি ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় হপ্তায় আর দ্বিতীয় সভাটি চতুর্থ হপ্তায় আহমদ ফজলুর রহমানের বাড়ীতে হয়। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ীতে প্রথম সভায় এ,বি,সামাদও যোগ দিয়েছিলেন, তবে দ্বিতীয় সভায় তিনি ছিলেন না। সভার দিনে কর্পোরাল সামাদ করাচী ছিলেন না,তা ঠিক নয়। প্রথম সভা হয় সুর্যাস্তের পর আহমদ ফজলুর রহমানের বাড়ীতে দ্বিতীয় সভা হয় রাত ৮টা কি ৯ টায়। সভা দুটি ২-৩ দিনের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হয়। ঐসব দিনে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ীতে কোন অতিথিকে স্থান দেওয়া হয়েছিল কি না তা আমার জানা নেই।
প্রশ্ন ঃ আপনি আর কোন অতিথিকে দেখেছিলেন কি?
উত্তর ঃ না, আমি এ রকম কোন অতিথিকে দেখিনি। সাক্ষী আরও বলেন, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন যখন বলেন যে, এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানেই কাজ কেন্দ্রীভূত করা হবে। তখন আমি পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলন কতটা অগ্রসর হয়েছে, তা আমি জানতাম না। পূর্ব পাকিস্তানে কাজ কতটা অগ্রসর হয়েছে, আমি দুটো সভার কোন সভাতেই সে সম্পর্কে কোন রিপোর্ট দেইনি।
প্রশ্ন ঃ আপনাদের পার্টির কোন সার্বক্ষণিক কর্মীর অস্তিত্ব সম্পর্কে কি আপনার জানা ছিল?
উত্তর ঃ উল্লিখিত সভাগুলোর সময় আমি কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্তানে দু'জন সার্বক্ষণিক কর্মীর কথা জানতাম।

তাঁরা হচ্ছেন ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আর এল, এস, সুলতানউদ্দীন আহমদ। সেসময় পশ্চিম পাকিস্তানেও এধরনের কোন সার্বক্ষণিক কর্মী ছিল কিনা, তা আমার জানা নেই। আমার সাথে কেবলমাত্র আন্দোলন সম্বন্ধেই আলাপ-আলোচনা হয়।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেনঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও সুলতানউদ্দীন আহমদকে কোন নির্দিষ্ট মাসিক বেতন দেওয়া হত না, তবে তাদেরকে প্রয়োজন অনুসারে মাঝে মাঝে টাকা-পয়সা দেওয়া হত।

১৯৬৫ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও সুলতানউদ্দীন আহমদকে কত টাকা দেওয়া হয়েছিল, তা আমি বলতে পারি না। আমি নিজেও করাচী থাকাকালীন পার্টির তহবিল থেকে কিছু টাকা নেই। উক্ত কাজের জন্যে করাচীতে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে একবার ২০ টাকা এবং আর একবার ২০ টাকা দেন।
প্রশ্নঃ এ সময় আপনি করাচীতে কোন নতুন সদস্য ভর্তি করেছিলেন?
উত্তর ঃ না
প্রশ্নঃ টাকা-পয়সা তুলে ছিলেন?
উত্তরঃ না।
প্রশ্ন ঃ আন্দোলনের কাজে করাচীর বাহিরে গিয়েছিলেন?
উত্তর ঃ না।
প্রশ্ন ঃ তাহলে এই ৪০ টাকা কিভাবে খরচ করলেন?
উত্তর ঃ ওই টাকাটা আমাকে দুটো মিটিং ও লেঃ মোয়াজ্জেমের বাসায় যাতায়াতের খরচ হিসেবে দেয়া হয়েছিল।
প্রশ্ন ঃ লেঃ মোয়াজ্জেমের বাড়ীতে কি আপনি একাই যেতেন?
উত্তর ঃ কখনো একা, কখনো সঙ্গে অন্য লোক থাকত।
প্রশ্ন ঃ সেখানে কি আপনি রোজ যেতেন?
উত্তর ঃ প্রায়ই যেতাম। কেননা আমাদের দলের ব্যাপারে 'দিনভিত্তিতে' আলোচনা করতাম।
প্রশ্ন ঃ "দিন-ভিত্তিতে" মানে কি?
উত্তর ঃ তার মানে হলো আমি রোজই সেখানে যেতাম।
প্রশ্ন ঃ লেঃ মোয়াজ্জেমের বাসা থেকে আপনার বাসা কতদূর?
উত্তর ঃ প্রায় সাড়ে তিন মাইল।
প্রশ্ন ঃ আপনার বদলির জন্য কখন দরখাস্ত করেছিলেন?
উত্তর ঃ আমার মনে নেই। তবে ওই দুটো মিটিং হবার আগে।
প্রশ্ন ঃ এর আগে আপনি বলেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে কাজের জন্যে আপনাকে চাকুরী ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। তারপর আপনি কি করলেন?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, তবে আমি পদত্যাগ করিনি।
প্রশ্ন ঃ চাকুরী ছেড়ে দেওয়ার পর ঢাকায় থাকা-খাওয়ার জন্য কত খরচপত্র দিতে চেয়েছিল?
উত্তর ঃ সে রকম কোন কথা হয়নি।
প্রশ্ন ঃ ঢাকায় কি রকম চাকুরী আপনাকে দেওয়ার কথা হয়?
উত্তর ঃ সে রকম নির্দিষ্ট কিছু নয়।

ইহার পর সাক্ষী বিবাদীপক্ষের কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, করাচীতে চাকুরী ছেড়ে ঢাকায় চলে আসার ব্যাপারে তাকে যে নির্দেশ দেওয়া

হইয়াছিল তাহা মিথ্যা নহে। তবে চাকুরী ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যাপারে তিনি একমত হন নাই।

প্রশ্ন ঃ আপনি আপনার বক্তব্যে বলেছিলেন যে, ট্রানজিষ্টরাইজড ট্রানজিষ্টর পাঠানোর জন্যে জনাব আহমদ ফজলুর রহমান তাঁর ভাইয়ের কাছে চিঠি লেখেন। সে চিঠিতে মূল্যের ব্যাপারে কিছু উল্লেখ ছিল?

উত্তর ঃ না, ছিল না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি পুলিসের কাছে প্রদত্ত জবানবন্দীতে বলেননি যে, কে,জি, আহমদের বাসায় আপনার সঙ্গে জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের দেখা হয় এবং সেখানেই তিনি ট্রান্সমিটারের জন্যে চিঠি লেখেন?

উত্তর ঃ না, আমি বলিনি যে,জনাব আহমদ ফজলুর রহমান সেখানে চিঠি লেখেন এবং সে চিঠিটা লেঃ মোয়াজ্জেমকে তার কারসাজের বাড়ীতে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ঃ 'ইলাকা' থেকে কারসাজ কত দূর?

উত্তর ঃ প্রায় ৫/৬ মাইল হবে।

অপর প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন ঃ জনাব এ,এফ,রহমানের সঙ্গে লেঃ মোয়াজ্জেমের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

এ, এফ, রহমানের ইলাকোর বাসায় টেলিফোনও ছিল। লেঃ মোয়াজ্জেমের বাসায় টেলিফোন ছিল না। তবে তাঁর অফিসে ছিল কিনা জানি না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে বলেননি যে, জনাব এ,এফ, রহমানের কাছ থেকে চিঠিটা সংগ্রহের জন্য লেঃ মোয়াজ্জেম আপনাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ আমার মনে নেই।

প্রশ্ন ঃ পুলিসের কাছে বলেছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, বলেছি।

প্রশ্ন ঃ ১৯৬৫-এর ডিসেম্বরের কথিত সভার সময় নৌ সদর দফতরে জরুরী অবস্থা ছিল?

উ ঃ হ্যাঁ।

প্র ঃ লেঃ মোয়াজ্জেমকে ওই সময় যুদ্ধকালীন 'ডিউটিতে' থাকতে হতো?

উত্তর ঃ তা আমি বলতে পারি না।

প্রশ্ন ঃ আপনি জানতেন, লেঃ মোয়াজ্জেম ওই সময় নৌবাহিনীর সদর দফতরে চীফ লিয়াজোঁ অফিসার ছিলেন?

উত্তর ঃ লিয়াজোঁ অফিসার ছিলেন–তবে 'চীফ' কিনা তা জানতাম না।

প্রশ্ন ঃ তখন তিনি কি কাপড় পরতেন?

উত্তর ঃ ওই সময় আমি তাঁকে খাকি ইউনিফরম পরতে দেখতাম।

কৌসুলির অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের পক্ষ থেকে এ,বি, খুরশীদের হাতের লেখা চিঠিটি তিনি পাওয়ার আগে এ,বি, খুরশীদ তিন বছর যাবৎ চট্টগ্রাম রয়েছেন। ইহার পর আদালতের অধিবেশন কয়েক মিনিটের জন্য মূলতবী করা হয়।

বিরতির পর

বিরতির পর বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান পুনরায় জেরা শুরু করেন। প্রথমে তিনি রাজসাক্ষী আমীর হোসেনকে তাঁহার সহিত জনৈক আনোয়ার জাহিদের সম্পর্কের কথা জিজ্ঞাসা করেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি মিঃ আনোয়ার জাহিদকে চেনেন?

উঃ জী হ্যাঁ, চিনি।

প্রশ্ন ঃ কোথায় তাঁকে চেনেন?

উঃ ২০/৩, গোপীবাগে। সেটাই তাঁর বাসা। এখানে আমি তাঁর সঙ্গে কয়েকবার দেখা করেছি।

প্রশ্ন ঃ আপনি তাঁর বাসায় কয়েকবারই গিয়েছেন? চিঠিপত্র সংগ্রহ করতে সেখানে যেতেন?

উত্তর ঃ জী হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ কি চিঠি আনতে সেখানে যেতেন?

উত্তর ঃ লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে মিঃ জাহিদের কেয়ারে চিঠি পাঠাতেন সেই চিঠি আমি আনতে সেখানে যেতাম।

প্রশ্ন ঃ আমি শুনেছি গোপীবাগে ফার্ষ্ট লেন, সেকেণ্ড লেন, থার্ড লেন আছে। কিন্তু ২০/৩, গোপীবাগ বাসাটা কোন জায়গাটায়?

উত্তর ঃ বাড়ীটা ঠিক কোন জায়গায় তা আমি বুঝাতে পারব না।

প্রশ্ন ঃ এই ঠিকানা আপনাকে কে দিয়েছিল? মৌখিকভাবে, না লিখিতভাবে?

উত্তর ঃ লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে ওই ঠিকানা দিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি নিজে লেঃ মোয়াজ্জেমকে আপনার কোন ঠিকানা দিয়েছিলেন–যেখানে তিনি আপনাকে চিঠি লিখতে পারেন?

উত্তর ঃ চিঠিপত্র লেখার জন্যে পরে আমি লেঃ মোয়াজ্জেমকে আমার নিজের ঠিকানা দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন ঃ 'পরে' বলতে আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন?

উত্তর ঃ 'পরে' বলতে আমি যখন 'আরজু হোটেল' থেকে দীননাথ সেন রোডে যাই তখনকার কথা বোঝাচ্ছিলাম।

প্রশ্নঃ তা হলে আপনি বলতে চান, আপনি লেঃ মোয়াজ্জেমকে ১০৭, দীননাথ সেন রোডের ঠিকানা দিয়েছেন–আর লেঃ মোয়াজ্জেম আপনাকে ২০/৩, গোপীবাগ লেনের ঠিকানাটা দেন?

উত্তর ঃ এটাই ঠিক।

রাজসাক্ষী আমীর হোসেনের এই জওয়াব শোনার পর জনাব আবদুস সালাম খান তাঁহার হাতে তাঁহাকে লিখিত লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের একখানি চিঠি (পি ডব্লিউ ৩/৩৯ চিহ্নযুক্ত) তুলিয়া দিয়া উহার অংশবিশেষ পাঠ করিতে বলেন। সাক্ষীর পাঠ সমাপ্ত হইবার পর কৌসুলি চিঠির ওই অংশটি আদালতে পড়িয়া শোনান। চিঠিতে লেঃ মোয়াজ্জেম রাজসাক্ষী আমীর হোসেনকে লিখিয়াছেঃ "আমি আপনার দেওয়া ঠিকানায় ২০/৩, গোপীবাগে দুটো টেলিগ্রাম ও দুটো চিঠি দিয়েছি ...."

প্রশ্নঃ এখন বলুন, ২০/৩ গোপীবাগের ঠিকানা– যেটা চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে তা আপনিই দিয়েছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এই ঠিকানা আমিই লেঃ মোয়াজ্জেমকে দিয়েছিলাম।

ইহার পর সাক্ষী তাঁহার বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়া কিছু বলিতে চাহিলে জনাব সালাম খান উহাতে আপত্তি প্রকাশ করেন। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান সাক্ষীকে প্রশ্নের উত্তর ছাড়া আর কোন কথা না বলিতে নির্দেশ দেন। কৌসুলি আবার প্রশ্ন করেনঃ আপনার সঙ্গে কি মিঃ আনোয়ার জাহিদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্নঃ চিঠি সংগ্রহ করা ছাড়া আর কোন কাজে তাঁর বাসায় যেতেন?

উত্তর ঃ জী হ্যাঁ, চিঠি আনতে যাওয়া ছাড়াও তাঁর বাসায় গিয়েছি।

প্রশ্ন ঃ এ থেকে প্রমাণ হয় নাকি তাঁর সঙ্গে আপনার অনেক দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব?

উত্তর ঃ না, তা প্রমাণ হয় না।

অতঃপর কৌসুলি অপর এক প্রশ্নে বলেনঃ

"এই চিঠিতে লেখা আছে নূর মোহাম্মদ ঢাকায় যাচ্ছে। আপনি কি নূর মোহাম্মদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন?"

উত্তর ঃ তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেন।

প্রশ্ন ঃ চিঠিতে আছে তাঁর কাছে সব শুনতে পারবেন। আপনি কি কিছু শুনেছিলেন?

উত্তর ঃ না, আমাকে কোন খবর তিনি দেননি।

প্রশ্ন ঃ চিঠিতে 'শফি' বলে একজনের কথা উল্লেখ আছে। আপনি কি তাঁকে টাকা দিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ তিনি কি আপনার দলের সদস্য?

উত্তর ঃ না।

Ext PW 3/9 চিহ্ন সম্বলিত পত্রটির একটি বাক্যের প্রতি সাক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। যেখানে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি শফির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন; কিন্তু শফি আগ্রহী নন।

সাক্ষী বলেনঃ এর অর্থ হলো ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান তাঁকে আন্দোলনে টানার চেষ্টা করেন; কিন্তু তিনি এতে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আমি পুলিসকে বলিনি যে, আমি 'টোপ' হিসেবে আন্দোলনে যোগদানের জন্য তাঁকে ৭শত টাকাও দিয়েছিলাম। PW, 3/6 চিহ্ন সম্বলিত পত্রে উল্লেখ আছে, 'আপনারা একমত থাকেন।' এটার অর্থ এই নয় যে, আগে কোন মতানৈক্য ছিল। ষ্টুয়ার্ড মুজিবর কর্তৃক আমার নিকট প্রেরিত পত্রে জনৈক গোলাম মোহাম্মদের উল্লেখ আছে। আমি তাঁকে চিনতাম। তবে ঐ সময় তিনি আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন না। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দীতে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের নিকট থেকে আমি ৬-১২-৬৫তে Ext, PW, 3/11 চিহ্ন সম্বলিত পত্রটি গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন কিনা আমি স্মরণ করতে পারছি না।

সাক্ষীর হাতে Ext, PW, 3/12 চিহ্ন সম্বলিত পত্রটি দেওয়া হয়। সাক্ষী বলেনঃ পত্রে উল্লেখিত "ঐ দেশের সকল কাজ সম্পন্ন করার পর" বলতে যুক্তরাষ্ট্রের পারসোন্যাল-এর সাথে আমাদের যোগাযোগের কথা বোঝান হয়েছে।

কৌসুলি প্রশ্ন করেন ঃ "আপনি কি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, টাকাটা জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে দেওয়া হয়?"

উত্তর ঃ আমার মনে নেই।

প্রশ্ন ঃ লেঃ মোয়াজ্জেমের কাছে টাকা নিয়ে আপনিও জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে গিয়েছিলেন– সেটা কি পুলিসকে বলেননি?

উত্তর ঃ সেটাও মনে পড়ছে না।

সাক্ষী জানান যে, নূর মোহাম্মদের সঙ্গে টাকা নিয়ে তিনি লেঃ মোয়াজ্জেমের নিকট একই দিনে যান। সাক্ষী বলেনঃ

"এই টাকাটা শেখ মুজিবর রহমানের কাছ থেকে সংগ্রহ করে সুলতানউদ্দীন আহমদ ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান কেরিয়ার মারফত পাঠান। টাকার সঙ্গে একটি কি দুটি চিঠিও আসে।

প্রশ্ন ঃ চিঠিগুলোর তারিখ মনে আছে?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও সুলতানউদ্দীন আহমদ কখন ওই টাকা পান?

প্রশ্ন ঃ সেটা আপনি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন?

উত্তর ঃ মনে হয় বলেছি।

এই সময় রাজসাক্ষী আমীর হোসেন চেয়ারম্যানের প্রতি কিছু বলিতে উদ্যত হইলে চেয়ারম্যান তাঁহাকে বেশী কথা বলিতে বারণ করেন।
কৌসুলি সংশ্লিষ্ট চিঠিটি পুনরায় সাক্ষীর হাতে তুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করেনঃ "ওর মধ্যে কোথাও 'বড় ভাই' শব্দটা উল্লেখ করা আছে?"
উত্তর ঃ এতে 'ঔষধ' সাঙ্কেতিক শব্দের মধ্য দিয়ে টাকা-পয়সার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ আছে ঠিকই তবে 'বড় ভাই' (শেখ মুজিব) যে ওই টাকা দিয়েছেন, সে কথা কোথাও লেখা নেই।
এই সময় সাক্ষী পুনরায় কিছু ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইলে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ "আপনি চুপ করুন।"
অতঃপর চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস,এ,রহমান ট্রাইব্যুনালের শুনানী অদ্য (মঙ্গলবার) সকাল নয়টা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করেন।

দৈনিক পাকিস্তান
১৩ই আগস্ট ১৯৬৮
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
একরারী সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার জেরা অব্যাহত
(স্টাফ রিপোর্টার)

দু'দিন বিরতির পর গতকাল সোমবার "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার" শুনানী পুনরায় শুরু হলে ২নং একরারী সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার জেরা এইদিনও অব্যাহত থাকে। বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান গতকালও তাকে জেরা করেন। গতকাল ছিল সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার জেরার চতুর্থ দিন। জেরা অসমাপ্ত অবস্থায় গতকালকের শুনানী শেষ হয়। আজ মঙ্গলবার আবার তার জেরা শুরু হবে।
প্রশ্নঃ গত ১৯৬৫ সালের ২৯ শে আগস্ট এর বৈঠকের আগে কি আপনি কখনও শেখ মুজিবের গৃহে গমন করেছেন?
উত্তর ঃ না।
প্রশ্ন ঃ এই বৈঠকের পরে কখনও সেখানে গিয়েছিলেন?
উত্তর ঃ জী হ্যাঁ। তিনবার আমি সেখানে যাই।
প্রশ্ন ঃ কখন সেখানে যান–দিনে না রাতে?
উত্তর ঃ দিনেও গিয়েছি রাতেও গিয়েছি।
প্রশ্ন ঃ গ্রেফতারের পরে কি আপনাকে শেখ মুজিবের গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কখনও?
উত্তর ঃ না।
প্রশ্ন ঃ আপনি রক্সী হোটেল চেনেন?
উত্তর ঃ রক্সী হোটেলটা কোথায় আমার জানা নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনি যখন শেখ মুজিবর রহমানের গৃহে যেতেন তখন কি আপনি একাই যেতেন না সঙ্গে কেউ থাকতো?
উত্তর ঃ আমার সঙ্গে অন্যান্যরা থাকতো।
প্রশ্ন ঃ শেখ মুজিবের সঙ্গে কি আপনার কখনও এককভাবে সাক্ষাৎ হয়েছিল বা কথাবার্তা বলেছিলেন?
উত্তর ঃ জী হ্যাঁ। একবার তার জিন্নাহ এভিন্যুর অফিসে তাঁর সঙ্গে আমার একক সাক্ষাৎ ঘটে।
প্রশ্ন ঃ আপনি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের সেই তালিকাটা নিয়ে কি করেছেন?
উত্তর ঃ সেটা আমি সঙ্গে রাখতাম।
প্রশ্ন ঃ তালিকাটিতে কি লেখা ছিল তা কি বলতে পারেন?
উত্তর ঃ জী না।
প্রশ্নঃ শেখ মুজিবর রহমানের গৃহে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই আন্দোলনে কত লোক জড়িত হয়েছে, সে সম্পর্কে কোন রকম আলোচনা হয়েছিল কি?
উত্তর ঃ না।
প্রশ্ন ঃ আপনি কি অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য কোন বাজেট তৈরী করেছিলেন?
উত্তর ঃ না। তবে একটা বাজেট তৈরী করার কথা আমি বলেছিলাম।
প্রশ্নঃ লেঃ মোয়াজ্জেম কোন বাজেট তৈরী করেছিলেন কি?
উত্তর ঃ জ্বী না।
প্রশ্ন ঃ এর আগে আপনি আদালতে বলেছিলেন যে, বাজেট আপনি তৈরী করেছিলেন?
উত্তর ঃ না।
এই সময়ে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আমীর হোসেনের স্বীকারোক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি তখন বলেন যে, তাকে ৫০/৬০ লক্ষ টাকার অস্ত্রশস্ত্র কেনার একটি বাজেট তৈরী করতে লেঃ মোয়াজ্জেম বলেছিলেন।
প্রশ্নঃ আপনাদের চিঠিপত্রে ব্যবহৃত সাংকেতিক শব্দগুলোর প্রতিটি কি একই অর্থবোধক?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, একই শব্দ ব্যবহার করা হত।
প্রশ্ন ঃ এসব সাংকেতিক শব্দ কি আপনার মনে আছে?
উত্তর ঃ কিছু কিছু মনে আছে।
প্রশ্ন ঃ কোন একটি বিশেষ শব্দের জন্য একটিমাত্র সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করতেন, না একাধিক সাংকেতিক শব্দের মাধ্যমে একটি বিশেষ অর্থ বোঝাতেন?
উত্তর ঃ আমরা একটি সাংকেতিক শব্দের মাধ্যমে একটি বিশেষ অর্থ বোঝার ব্যবস্থা করেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ 'রোগী' শব্দের মাধ্যমে আপনারা কি বোঝাতে চেয়েছেন?
উত্তর ঃ পূর্ব পাকিস্তান।
প্রশ্ন ঃ আপনি তো বলেছেন মা অর্থে পূর্ব পাকিস্তান ব্যবহার করেছেন, তাই না?
উত্তর ঃ জী হ্যাঁ।
প্রশ্ন ঃ টাকার জন্য কি সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করা হতো?
উত্তর ঃ টাকার জন্য 'ঔষধপত্র' ব্যবহার করা হত।
প্রশ্ন ঃ এর জন্য আর কোন সাংকেতিক ব্যবহৃত হত?
উত্তর ঃ আমার ঠিক মনে পড়ছে না।
প্রশ্ন ঃ অস্ত্রশস্ত্রের জন্য কি সাংকেতিক শব্দ ব্যবহৃত হত?
উত্তর ঃ 'দ্রব্যাদি', 'যন্ত্রপাতি' ও কখনও কখনও 'জিনিসপত্র'।
প্রশ্ন ঃ মালপত্রও তো ব্যবহৃত হয়েছে?
উত্তর ঃ হ্যাঁ।
প্রশ্ন ঃ ব্যবস্থাপত্রের ঔষধাবলীর অর্থ কি?
উত্তর ঃ একটা অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রশ্নঃ তাহলে আপনি বলেছেন একটি বিশেষ অর্থে একাধিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আচ্ছা, আন্দোলনের জন্য কোন সাংকেতিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে?
উত্তর ঃ ব্যবসা।
প্রশ্ন ঃ আপনি বলেছেন, বাণিজ্য শব্দটাও আন্দোলনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, তাই না?
উত্তর ঃ হ্যাঁ।
প্রশ্ন ঃ আবার আপনি বলেছেন আন্দোলনের অর্থে, ব্যবসা ব্যবহার করা হয়েছে?
উত্তর ঃ জ্বী হ্যাঁ। এটা আমার এবং লেঃ মোয়াজ্জেমের মধ্যে একটা সমঝোতার মাধ্যমেই হয়েছিল।
প্রশ্ন ঃ এই শব্দগুলো কি দলের অন্যান্য সদস্যদেরকে জানানো হয়েছিল?
উত্তর ঃ আমার জানা নেই।
প্রশ্ন ঃ আপনি বলেছেন–শেখ মুজিবরের গৃহে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মাত্র কয়েকজন অংশগ্রহণ করেছিলেন। আপনি আরো বলেছিলেন, ঢাকার অন্যান্য কারা আন্দোলনে যোগদান করেছিল, তা আপনার জানা নেই।
উত্তর ঃ ঢাকায় কারা যোগদান করেছিল তা আমার জানা নাই।
প্রশ্ন ঃ জনাব আহমদ ফজলুর রহমানকে এই বৈঠকে যোগদানের জন্য করাচী থেকে ঢাকায় আনার কোন ব্যবস্থা করা হয়েছিল কি?
উত্তর ঃ আমার জানা নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনার কাজ ছিল, কাজের সমন্বয় সাধন করা। আচ্ছা, সমন্বয় সাধনের অর্থ কি?
উত্তর ঃ এর অর্থ বিভিন্ন সদস্যদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা ও তাদের কাজে সমন্বয় বিধান করা।
প্রশ্নঃ শেখ মুজিবের গৃহে সেই বৈঠকে আন্দোলনের কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে, সে সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়েছে কি? তাছাড়া কত টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে আর কত লোক সংগ্রহ করা হয়েছে বা আন্দোলনে যোগদান করেছে, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে কি?
উত্তর ঃ না, পূর্ব পাকিস্তানে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হয়নি। তবে উল্লেখ করা হয় যে, অনেক লোকজন আন্দোলনকে সমর্থন করছেন।
প্রশ্ন ঃ বৈঠকে শেখ মুজিবর রহমান এক লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন?
উত্তর ঃ জ্বী হ্যাঁ।
প্রশ্ন ঃ ২ হাজার হতে ৪ হাজার টাকা কিস্তিতে দিলে এক লাখ টাকা দিতে কত সময় লাগবে তা হিসেব করে বলতে পারেন?
উত্তরঃ না, বলতে পারি না।
প্রশ্ন ঃ বৈঠকে অন্য কেউ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন?
উত্তর ঃ না। তবে শেখ মুজিবর রহমান ভারত থেকে টাকা সংগ্রহ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।
প্রশ্ন ঃ এই কথা কি আপনি পুলিশ অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করেছিলেন?
উত্তর ঃ জ্বী হ্যাঁ, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছিলাম।
প্রশ্নঃ আপনি পুনরায় ১৯৬৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবের গৃহে গমন করেছিলেন। আচ্ছা, আপনি কি নিজস্ব ডাইরী রাখেন?
উত্তর ঃ জ্বী হ্যাঁ।
প্রশ্ন ঃ ডাইরীতে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা লিখে রাখতেন?
উত্তর ঃ না। এতে অন্যান্য সদস্যদের যেসব টাকা-পয়সা দিতাম, তার হিসেব রাখতাম। আর যেসব লোকের সঙ্গে দেখা ও আলোচনা করতাম, তাদের কথাও লেখা থাকতো।
প্রশ্ন ঃ এই তালিকাটা নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর ঃ জি হ্যাঁ।
প্রশ্ন-আপনি দলের অন্যান্য লোকদের যেসব কাজ দিতেন, সেগুলিতো খুব গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর-আমার ঠিক মনে নেই, কি কি কাজের দায়িত্বভার আমি তাদের দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন-আচ্ছা, আপনি তো, মিঃ টমাস উইলিয়ামস-এর কাছে বলেছিলেন আপনার আত্মজীবনী লেখার ইচ্ছে ছিল। তবে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই টুকে রাখতেন ডায়েরীতে?
উত্তর-কখনও রাখতাম।
প্রশ্ন-এই আন্দোলনকে কি আপনি অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করতেন?
উত্তর-অবশ্যই। তবে দৈনন্দিন ঘটনাবলী আমি নোট করিনি।
প্রশ্ন-গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী ঘটনাবলীর মুল কথা সংক্ষেপে তো টুকে রাখতেন?
উত্তর-না, তাও রাখতাম না।
প্রশ্ন-আপনি তো ১লা সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবের গৃহে গমন করেন। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও সুলতানুদ্দিনের মধ্যে কোনরকম রেষারেষি বা মনোমালিন্য কি লক্ষ্য করেছিলেন?
উত্তর-না, তেমন কিছু লক্ষ্য করিনি।
প্রশ্ন-আপনি যখন শেখ মুজিবের গৃহের ড্রইংরুমে বসেছিলেন। তখন কি আপনাকে কেউ মেরেছিল বা আপনি কাউকে মেরেছিলেন?
উত্তর-না। আমি কাউকে মারিনি বা কেউ আমাকে মারেনি।
প্রশ্ন-আপনি যে শেখ মুজিবের ড্রইংরুমে বসে অপেক্ষা করছিলেন, সেকথা কি আপনি শেখ মুজিবকে না বলার জন্য স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন?
উত্তর-না। তেমন কোন নির্দেশ দেই নি।
প্রশ্ন-শেখ মুজিবের কাছ থেকে টাকা এনে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আপনাকে তৎক্ষণাৎই দিয়ে দিয়েছিল?
উত্তর-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে আমাকে জানায় যে, শেখ মুজিব ৭০০ টাকা দিয়েছেন। হোটেলে এসে সে টাকাটা আমার হাতে দেয়।
প্রশ্ন-এই সময়ে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?
উত্তর-না।
প্রশ্ন-এই টাকা থেকে সেদিন কোন টাকা ব্যয় করা হয়?
উত্তর-না।
প্রশ্ন-আপনার কথা অনুসারে পরবর্তী ১৯৬৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর আপনারা শেখ মুজিবের গৃহে গমন করেন?
উত্তর-হ্যাঁ।
প্রশ্ন-এই সময়ে আপনারা তিনজনেই গিয়েছিলেন?
উত্তর-না। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও সুলতানুদ্দিন ভিতরে গমন করেন। আমি বাইরে থাকি।
প্রশ্ন-আপনার ভেতরে যাওয়ার ব্যাপারে কোন আপত্তি ছিল?
উত্তর-না।

প্রশ্ন-এবারে শেখ মুজিব ৪০০০ টাকা দেন কি অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য?
উত্তর-না। এই টাকাটা অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য দেওয়া হয়নি। দলের কাজে করাচী ও ঢাকার ব্যয়ের জন্য এটা দেওয়া হয়।
প্রশ্ন-আপনি কি সম্পূর্ণ টাকাটাই করাচী পাঠিয়ে দেন?
উত্তর-৪,৭০০ টাকার মধ্যে ৪,১০০ টাকা করাচীতে পাঠিয়ে দেই। মাত্র ৩০০ টাকা স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে দলীয় কাজের জন্য দেওয়া হয়।
প্রশ্ন-ব্যক্তিগত কাজ আর দলীয় কাজতো এক নয়। কিন্তু আপনি বলেছিলেন, টাকাটা ব্যক্তিগত কাজের জন্য দেওয়া হয়েছিল?
উত্তর-হ্যাঁ, আমার স্বীকারোক্তিতে আমি বলেছিলাম, যে টাকাটা তাকে ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্যই দেওয়া হয়েছিল।
প্রশ্ন-বাকি ৩০০ টাকা কি আপনি নিজেই খরচ করেন?
উত্তর-টাকাটা আমাদের তিনজনের হোটেল বিল মেটানোর কাজে ব্যয় করা হয়।
প্রশ্ন-আপনার খরচপত্র কে চালাতো?
উত্তর-আমার থাকার সব খরচ পার্টিই বহন করে।
প্রশ্ন-আপনি কি ধূমপান করেন?
উত্তর-হ্যাঁ।
প্রশ্ন-কোন ব্র্যান্ডের সিগারেট আপনি সেবন করেন?
উত্তর-ক্যাপস্টন।
প্রশ্ন-দৈনিক কত প্যাকেট সিগারেট লাগে আপনার?
উত্তর-অর্ধেক প্যাকেট।
প্রশ্ন-আপনি ২৯শে আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত ঢাকায় থাকার সময় আপনার সব খরচ এই ৩০০ টাকা থেকেই করা হয়?
উত্তর-আমার একার নয়–এ তিনজনের ব্যয়ভারই এই টাকা থেকে নির্বাহ করা হয়। আমি ২৯ শে আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত থাকি। তবে, সবটাই আমার ছুটি নয়। এই সময়ে আমি দলীয় কোন কাজে ঢাকার বাইরে যাইনি। কিন্তু, শহরের মধ্যে কয়েকটা স্থানে গমন করি।
প্রশ্ন-আপনি সাধারণতঃ কিসে যাতায়াত করতেন? ট্যাক্সিতে?
উত্তর-রিকশা ও বেবীট্যাক্সিতে।
প্রশ্ন-শেখ মুজিবের গৃহে সুলতানউদ্দীন ও স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের মিলিত হওয়ার কথাটা একেবারে মিথ্যা তাই না?
উত্তর-না, মোটেই নয়।
প্রশ্ন-এই টাকার কিছু অংশ কি পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে?
উত্তর-তা আমি জানি না। টাকাটা আমি লেঃ মোয়াজ্জেমকে দিয়ে দেই।

প্রশ্ন-টাকাটা আপনি কোথায় দেন?
উত্তর-লেঃ মোয়াজ্জেমের বাসভবনে গিয়ে তাঁর হাতে।
প্রশ্ন-এটা কি সত্য নয় যে, এই সমস্ত জরুরী অবস্থা চালু ছিল এবং লেঃ মোয়াজ্জেম তার বাসভবনে ছিলেন না?
উত্তর-না, এটা সত্য নয়।
প্রশ্ন-আপনি বলেছিলেন যে, নবেম্বর মাসে দুটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়–একটি লেঃ মোয়াজ্জেম-এর বাসভবনে এবং অপরটি জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর-এখানে আমার একটু ভুল হয়ে গেছে। এই বৈঠক ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সঠিক জবানবন্দী দিয়েছি।
প্রশ্ন-আপনাদের এই বৈঠকের একটি মোটামুটি সময় বলতে পারেন?
উত্তরঃ সম্ভবতঃ প্রথম বৈঠকটি ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে লেঃ মোয়াজ্জেমের বাসভবনে ও দ্বিতীয় বৈঠক ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়।
প্রশ্নঃ কবে থেকে তৃতীয় সপ্তাহ শুরু হয়?
উত্তরঃ ১৫ তারিখের পর থেকে ।
প্রশ্নঃ চতুর্থ সপ্তাহের শুরু কবে থেকে?
উত্তর ঃ ২১ শে'র পর।
প্রশ্নঃ আপনি কি বলেছিলেন যে, কর্পোরাল সামাদ লেঃ মোয়াজ্জেমের বাসভবনে অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে অংশগ্রহণ করে?
উত্তরঃ হ্যাঁ। কিন্তু সে দ্বিতীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিল না।
প্রশ্নঃ এটা কি সত্য নয় যে, সামাদ সে সময় করাচীতে ছিল না?
উত্তরঃ না, সামাদ সে সময়ে করাচীতে ছিল।
প্রশ্নঃ কোন সময়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, আপনার মনে আছে কি?
উত্তর ঃ সন্ধ্যার পর।
প্রশ্নঃ দ্বিতীয় বৈঠক?
উত্তরঃ দ্বিতীয় বৈঠক জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের বাসভবনে রাত ৮/৯টার সময় অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠক দুটি ৩/৪ দিনের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হয়।
প্রশ্নঃ লেঃ মোয়াজ্জেমের বাসভবনে সেদিন কোন ব্যক্তিকে দেখেছেন?
উত্তরঃ না।
প্রশ্নঃ পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে আপনি কোন রিপোর্ট বৈঠকে পেশ করেছিলেন কি?
উত্তরঃ না।

প্রশ্নঃ কতজন সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন?
উত্তরঃ আমার কেবল দুজনকেই জানা ছিল স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও সুলতানউদ্দীন।
প্রশ্নঃ এই আন্দোলন সম্পর্কে আপনাকে বিশ্বাসী বলে ধরা হয়েছিল কি?
উত্তরঃ হ্যাঁ।
প্রশ্নঃ এই সর্বক্ষণের কর্মীদের কত বেতন দেওয়া হত?
উত্তরঃ কোন নির্দিষ্ট কিছু ছিল না। প্রয়োজনের সময় তাঁরা টাকা নিতেন।
প্রশ্নঃ ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কত টাকা এদের দেওয়া হয়েছিল?
উত্তরঃ আমি জানি না।
প্রশ্নঃ করাচী থাকার সময় আপনি কোন টাকা-পয়সা নিয়েছিলেন?
উত্তরঃ হ্যাঁ, নিয়েছিলাম।
প্রশ্নঃ কত টাকা?
উত্তরঃ একবার আমাকে বিশ টাকা এবং আর একবার বিশ টাকা দেওয়া হয়।
প্র-এই সময় আন্দোলনের জন্য আপনি কোন লোক সংগ্রহ করেছিলেন?
উ- না। এ সময়ে আমি করাচীর বাইরেও কোথাও যাইনি। এই ৪০টা টাকা আমার গাড়ী ভাড়া বাবদ দেওয়া হয়েছিল।
প্র-এই বৈঠকের সময় ছাড়া আপনি কি লেঃ মোয়াজ্জেমের বাসভবনে যাতায়াত করতেন?
উ-হ্যাঁ, করাচী থাকার সময় প্রায়ই যেতাম। সে সময়ে কখনও আমি একাই যেতাম। আর কখনও অন্য কেউ থাকতো।
প্র-কি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন?
উত্তর-সাধারণতঃ পার্টির ব্যাপারেই আলাপ-আলোচনা করা হত।
প্র-পূর্ব পাকিস্তানে বদলীর জন্য আপনি কখন আবেদন করেন?
উ-আমার ঠিক মনে নেই। তবে, এই বৈঠকের আগেই আমি আবেদনপত্র দিয়েছিলাম।
প্র-আপনি বলেছিলেন যে, আপনাকে চাকুরী ছেড়ে দিতে বলা হয়?
উ-আমাকে চাকুরী ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে যেতে বলা হয়।
প্র-এখানে আপনার জন্য কোন কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কি এবং কত টাকা বেতন দেওয়া হবে?
উ-না, এ ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি। আমাকে শুধু বলা হয়েছিল যে, আমার জন্য ঢাকায় চাকুরীর ব্যবস্থা করা হবে।
প্র-আপনি কি চাকুরী ছাড়তে রাজী হন?
উ-না।

প্র-আচ্ছা, আহমদ ফজলুর রহমান কি একটি ট্রানজিস্টারাইজড ট্রান্সমিটার লন্ডন থেকে আনিয়ে দেওয়ার কথা বলেন?
উ-হ্যাঁ।
প্র-কত টাকা লাগবে সেকথা কিছু বলা হয়েছিল?
উ-না।
প্র-যখন আহমদ ফজলুর রহমান লন্ডনে তার ভাইকে এই ট্রানজিস্টরাইজড ট্রান্সমিটার পাঠানোর জন্য চিঠি লেখেন, তখন তাতে কি টাকা-পয়সার কথা কিছু লেখা ছিল?
উঃ- না।
প্র-আপনি পুলিশকে জানিয়েছিলেন যে, চিঠিটা কে জি আহমদের বাড়ীতে লেখা হয়?
উ-না, আমি তা বলিনি। আমি পুলিশের কাছে বলিনি যে, জনাব ফজলুর রহমান কে জি আহমদের বাড়ীতে চিঠিটা লিখে লেঃ মোয়াজ্জেমের হাতে দেন।
প্র-আপনি আনোয়ার জাহিদকে চেনেন?
উ-হ্যাঁ।
প্র-তিনি কোথায় থাকেন?
উ-২০/৩ গোপীবাগ।
প্র-তার বাসায় কি আপনি কয়েকবার গিয়েছিলেন?
উ-হ্যাঁ।
প্র-কেন?
উ-আমাকে উদ্দেশ্য করে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখতেন সেগুলো সংগ্রহ করার জন্য।
প্র-আপনি কি জানেন যে, গোপীবাগ ফার্স্ট লেন, সেকেন্ড লেন ও থার্ড লেন এই তিনটি লেন রয়েছে। সেখানে শুধু ২০/৩ কোন বাসার নম্বর নেই। তার সঙ্গে যে কোন একটা লেন থাকতে হবে।
উ-আমি সঠিক লেন বলতে পারব না।
প্র-চিঠি পাঠাবার জন্য আপনাকে এই ঠিকানা কে দিয়েছিলেন?
উ-লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন।
প্র-তিনি আপনাকে এই ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন না মৌখিক বলেছিলেন?
উ-মৌখিকভাবে এই ঠিকানা দিয়েছিলেন।
প্র-আপনার কাছে পত্র লেখার জন্য এখান হতে আপনি কি লেঃ মোয়াজ্জেমকে কোন ঠিকানা দিয়েছিলেন?
উ-আমি যখন ডি এন সেন রোডের বাড়ীতে যাই তখন ঐ ঠিকানা তাকে প্রদান করি।

এই সময় কৌসুলী জনাব সালাম খান আদালতে সাক্ষী কর্তৃক পেশকৃত একখানা পত্র তার হাতে দেন। এই পত্রখানা লেঃ মোয়াজ্জেম তাকে লিখেছেন বলে তিনি জবানবন্দীতে বলেছেন।

কৌসুলী মোয়াজ্জম লিখিত বলে কথিত পত্রের একটি অংশ সাক্ষীকে পড়ে শোনান। তাতে লেখা আছে, 'আমি আপনার দেয়া ঠিকানাস্থ ২০/৩, গোপীবাগে দুখানা চিঠি দিয়েছি।'

এর জবাবে সাক্ষী বলেন, 'আমিই লেঃ মোয়াজ্জেমকে গোপীবাগের ঠিকানা প্রদান করেছিলাম।'
প্রঃ-আনোয়ার জাহিদের সাথে আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল কি?
উঃ-না।
প্রঃ-চিঠিপত্র সংগ্রহ করে আনা ছাড়াও আনোয়ার জাহিদের সঙ্গে আপনার কোন প্রকার মেলামেশা ছিল?
উঃ-এছাড়া আমি আর একবার তার বাসায় গিয়েছিলাম। সাক্ষী আরও বলেন, এর দ্বারা একথা বুঝায় না যে, অনেকদিন যাবৎ তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কৌসুলী আদালতে পেশকৃত মোয়াজ্জেম হোসেন লিখেছেন বলে কথিত আরেকখানা পত্রের অংশবিশেষ সাক্ষীকে পড়ে শোনান, "নূর মোহাম্মদ ৮/৩ তারিখে ঢাকা যাচ্ছে। এক মাসের ছুটি। তার কাছে সব শুনতে পাবেন।"
প্রঃ-নূর মোহাম্মদের নিকট হতে আপনি কিছু জানতে পেরেছিলেন?
উঃ-নূর মোহাম্মদ আমার সাথে দেখা করেছিল কিন্তু আমাকে কিছুই জানায়নি।
প্রঃ-আপনি জবানবন্দিতে বড়বাকুণ্ডার জনৈক শফির কথা উল্লেখ করেছেন। আপনি তাকে কোন টাকা-পয়সা দিয়েছিলেন?
উঃ আমি তাকে কোন টাকা দেইনি।
প্রঃ-তিনি কি আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন?
উঃ না।

কৌসুলী জনাব সালাম খান তখন পুলিশের নিকট সাক্ষী আমির হোসেন মিয়া যে অতিরিক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেন তা উদ্ধৃত করেন। সেখানে সাক্ষী শফি সম্পর্কে বলেছেন, "আমি তাকেও ৭শ' টাকা দিয়েছি।"

এর প্রতি সাক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, আমি এমন কথা বলিনি।
প্রঃ জবানবন্দীতে আপনি জনৈক গোলাম মোহাম্মদের নাম উল্লেখ করেছেন। তাকে আপনি চেনেন?
উঃ তাঁকে আমি চিনি। তবে তিনি আমাদের এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

প্রঃ আপনি যখন করাচীতে অবস্থান করছিলেন তখন আপনি জানতেন না যে, উক্ত ব্যক্তি আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আছে?
উঃ তিনি এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।
প্রঃ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিতে আপনি স্টুয়ার্ড মুজিব লিখিত পত্রের সঙ্গে একই খামে "নুরু ভাইকে" লিখিত যে পত্র পেয়েছেন সে পত্রের উল্লেখ করেছিলেন কি?
উঃ না।
প্রঃপুলিশের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে আপনি এই চিঠির উল্লেখ করেছিলেন কি?
উঃ সে কথা আমার মনে পড়ছে না।
এরপর কৌসুলী সাক্ষীর হাতে স্টুয়ার্ড মুজিব লিখিত বলে কথিত একখানা পত্র প্রদান করেন।
প্রঃ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিতে আপনি এই পত্রের কথা উল্লেখ করেছিলেন?
উঃ আমার মনে পড়ছে না।
এরপর কৌসুলী সাক্ষী কর্তৃক পেশকৃত একখানা পত্র হতে পড়ে শোনান "ওদেশে সমস্ত রকম কাজ সমাধা করবেন।"
প্রঃ আপনি জবানবন্দীতে ওদেশ বলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সবগুলো শব্দের কি অর্থ হবে তা বুঝিয়ে বলুন?
উঃ এর অর্থ হচ্ছে "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের কর্মচারীদের সাথে আমাদের যোগাযোগ।"
প্রঃ জবানবন্দীতে আপনি বলেছেন এল,এস,নূর মোহাম্মদ দুটি পত্র ও ২ হাজার টাকা নিয়ে আপনার কাছে এসেছিল। ঐ টাকা চট্টগ্রাম হতে আগত জনৈক স্টুয়ার্ড মারফত পাঠান হয়েছে বলে আপনি উল্লেখ করেছেন। আপনি ঐ স্টুয়ার্ডকে চেনেন?
উত্তরঃ আমি উক্ত ব্যক্তিকে দেখলে চিনতে পারব। তার নাম আমার মনে নেই।
প্রশ্ন ঃ উক্ত সওদাগরী জাহাজের নাম আপনার মনে আছে?
উত্তর ঃ ঐ জাহাজের নাম হচ্ছে "শামস"।
প্রশ্ন ঃ ঐ বাহককে সনাক্ত করার জন্য পুলিশ কি আপনাকে কোথাও নিয়ে গিয়েছিল?
উত্তর ঃ না।
নূর মোহাম্মদ কি আপনাদের আন্দোলনের একজন বিশ্বস্ত কর্মী ছিলেন?
উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেন যে, নূর মোহাম্মদ একাকী গিয়ে লেঃ মোয়াজ্জেমের নিকট টাকা প্রদান করুক এটা মোয়াজ্জেম পছন্দ করতেন না?
উত্তর ঃ হ্যাঁ।
প্রশ্ন ঃ আপনি নূর মোহাম্মদসহ কোন তারিখে লেঃ মোয়াজ্জেমের বাসায় টাকা প্রদানের জন্য গিয়েছিলেন?
উত্তর ঃ আমার মনে পড়ছে না কখন গিয়েছিলাম।
এরপর সাক্ষী পুনরায় বলেন, ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে।
প্রশ্ন ঃ জানুয়ারী মাসের কোন তারিখে?
উত্তর ঃ সম্ভবতঃ তৃতীয় অথবা চতুর্থ সপ্তাহে।
প্রশ্ন ঃ কোথায় আপনি তাকে এই টাকা প্রদান করেন?
উত্তর ঃ তার কারসাজের বাড়ীতে।
প্রশ্ন ঃ আপনি কি পুলিশের নিকট বলেছিলেন যে, "জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে উক্ত টাকা আমি প্রদান করেছি"।
(সাক্ষীর বিবৃতি হতে কৌসুলী উক্ত অংশ উদ্ধৃত করেন।)
উত্তর ঃ একথা বলেছি কিনা, আমার মনে পড়ছে না।
প্রশ্ন ঃ টাকা প্রাপ্তির কয়দিন পর তা মোয়াজ্জেমের নিকট প্রদান করেন?
উত্তর ঃ নূর মোহাম্মদ ও আমি বাহকের নিকট হতে টাকা এনে ঐদিনই লেঃ মোয়াজ্জেমের নিকট প্রদান করি।
সাক্ষী আরও বলেন, এই টাকা স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এবং এল এস সুলতানউদ্দীন শেখ মুজিবর রহমানের নিকট হতে সংগ্রহ করে করাচী পাঠিয়েছেন।
প্রশ্ন ঃ যে তিন হাজার টাকা সংগ্রহ ছিল?
উত্তর ঃ একখানা অথবা দুখানা পত্রও এসেছিল।
প্রশ্ন ঃ যে তিনখানার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল উক্ত অর্থ হতেই এই ২২ শ' টাকা পাঠান হয়েছে তাই না?
উত্তর ঃ হ্যাঁ।
প্রশ্ন ঃ আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিতে কি এই টাকার কথা বলেছিলেন?
উত্তর ঃ আমার বিশ্বাস যে আমি বলেছি।
এরপর ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এই টাকা সম্পর্কিত যে উক্তি সাক্ষী করেছেন তা পড়ে শোনান হলে সাক্ষী বলেন, টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে স্বীকারোক্তিতে চিঠির উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বড় ভাই (শেখ মুজিবর রহমান) টাকা পাঠিয়েছে এমন কোন কথা পত্রে লেখা নেই।
আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টায় পুনরায় শুনানী শুরু হবে।

দৈনিক পাকিস্তান

১৪ই আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

আমীর হোসেন মিয়ার জেরা অব্যাহত

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দুই নম্বর একরারী সাক্ষী আমির হোসেন মিয়ার জেরা গতকাল মঙ্গলবার অব্যাহত থাকে। গতকাল ছিল তার জেরার ৫ম দিন। বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব আবদুস সালাম খান গতকালও সাক্ষীকে সারাক্ষণ জেরা করেন। গতকাল জেরা অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় মামলার শুনানী শেষ হয়। আজ বুধবার আজাদী দিবস উপলক্ষে এই মামলার শুনানী অনুষ্ঠিত হবে না। আগামীকাল বৃহস্পতিবার পুনরায় শুনানী শুরু হলে জনাব সালাম খান সাক্ষীকে জেরা শুরু করবেন।

প্র-আপনি ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশের কাছে যে জবানবন্দী দিয়েছেন আদালতে আসার আগে কি কখনও সেগুলি দেখেছেন?

উ-না।

প্র-আদালতে আসার আগে কি বাদীপক্ষের কোন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করেছে?

উ-না। আদালতে আসার আগে আমার সঙ্গে কারো আলাপ হয়নি। আজ সকাল সাড়ে ৮টায় আমাকে এখানে আনা হয় এবং আমাকে এই আদালত কক্ষের পাশের ঘরে রাখা হয়েছিল।

প্র-আপনি পাশের ভবনে কেন গিয়েছিলেন?

উ-বাথরুম ব্যবহারের জন্য আমি ওখানে গিয়েছিলাম।

প্র-ওই ভবনটি কি বাদীপক্ষের কৌশলীদের জন্য বরাদ্দ নয়?

উ-তা আমার জানা নেই।

প্র-আপনি যখন ওখানে গিয়েছিলেন তখন কি ওখানে কেউ ছিল?

উ-না।

প্র-আপনার বক্তব্যে আপনি উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৬৫ সালের নবেম্বর মাসে নূর মোহাম্মদ আপনাকে কে জি আহমদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং পরে কে জি আহমদ আহমদ ফজলুর রহমানের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু আপনি পুলিশের কাছে বলেছেন যে, নূর মোহাম্মদই এই দুজনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেন।

উ-না। তেমন কথা পুলিশের কাছে বলিনি। কিন্তু পুলিশের কাছে প্রদত্ত জবানবন্দীতে লিপিবদ্ধ আছে।

প্র-কতদিন থেকে আপনি কে জি আহমদকে চেনেন?

উ-আমি তাঁকে প্রথমে ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা হোটেলে দেখি।

প্র-দ্বিতীয়বার কবে আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়?

উ-করাচীতে।

প্র-আহমদ ফজলুর রহমানকে কবে থেকে জানেন?

উ-১৯৬৫ সালেই তাঁকে প্রথম আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

প্র-আহমদ ফজলুর রহমান তখন অর্থ দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারী ছিলেন। আপনার বেতন ও টিএ ইত্যাদি অর্থ দফতরই মঞ্জুর করতো। আপনার বদলী মঞ্জুর হওয়ার পরে অর্থ বিভাগ কি আপনাকে টিএ দিতে আপত্তি জানিয়েছিল?

উ-জি হ্যাঁ। কারণ আমি নিজের ইচ্ছায় বদলী হই।

প্র-আপনি কি এই টিএ'র মঞ্জুরীর জন্য জনাব ফজলুর রহমানের কাছে গিয়েছিলেন?

উ- না।

প্র-এটা কি সত্য যে, আপনি বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন?

উ-না, এ কথা সত্য নয়।

প্র-আপনাকে তো বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আপনি কি জনাব সবুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন?

উ- না।

প্র-কিন্তু আপনাকে তো এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল?

উ-আমি তা করতে পারিনি।

প্র-আপনি কি কোন প্রকার চেষ্টা করেছিলেন?

উ- না।

প্র-ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করেছিলেন?

উ-না। তবে আমি একবার মানিক চৌধুরীকে ভারতীয় দূতাবাসের অফিসারের সঙ্গে আমার বৈঠকের ব্যবস্থা করার জন্য বলেছিলাম।

প্র-আপনি চীনা দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন?

উ- না।

প্র-চীন-ভারতের মধ্যেকার সম্পর্কের ব্যাপারে কি আপনি অবগত ছিলেন?

উ-জি হ্যাঁ। চীন-ভারত সম্পর্ক ভালো ছিল না।

প্র-করাচীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্ট-এর সঙ্গে কি আপনি যোগাযোগ করেছিলেন?

উ- না।

প্র-কর্পোরাল সামাদ কতদিন ঢাকায় ছিল?
উ-আমি যখন ঢাকায় ছিলাম সেসময় ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সে এখানে ছিল।
প্র-আপনি নিজে কখনও বিদেশী দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি?
উ- না। আমি মানিক চৌধুরীকে বিদেশী দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা ছাড়া আর কিছুই করিনি। তবে, একবার জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ হয়েছিল।
প্র-আপনি কি ন্যাভাল এ্যাটাচির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন?
উ- হ্যাঁ, একবার।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলী এই সময়ে উল্লেখ করেন যে, পুলিশের কাছে প্রদত্ত জবানবন্দীতে সাক্ষী বলেছিলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেম জর্জ বল ও নোবলসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।
আদালতের চেয়ারম্যান প্রশ্নটি সাক্ষী আমীর হোসেনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান যে, তিনি পুলিশের কাছে এ কথা বলেননি।
প্র-আপনি জর্জ বলকে চিনতেন?
উ-না। লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে একবার তার কথা বলেছিলেন।
প্র-জর্জ বল কে?
উ- একজন আমেরিকান অফিসার।
প্র-তিনি কি ছিলেন?
উ-জানি না।
প্র-তিনি কি কখনো ঢাকায় নিযুক্ত ছিলেন?
উ-আমার জানা নেই।
প্র-আপনি বলেছিলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেমের একটি স্কুটার ছিল? এটি কি?
উ-এটি একটি মোটর সাইকেল।
প্র-এটার রং কি ছিল?
উ-হালকা সবুজ রং-এর। লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি এটা ১৯৬৩ সালে কিনেছিলেন।
প্র-আপনি কি জোহার সঙ্গে দেখা করেছিলেন?
উ-হ্যাঁ। ১৯৬৬ সালে তাঁর সঙ্গে ঢাকায় আমার দেখা হয়।
প্র-তাকে কোন কাজ দেওয়া হয়েছিল কি?
উ-না। কোন টাকা-পয়সাও তাকে দেওয়া হয়নি।
প্র-জোহা কি বিমান বাহিনীতে কাজ করতেন?
উ-জি হ্যাঁ।

প্র-আপনি পূর্ব পাকিস্তানের কোন ক্যান্টনমেন্টে কখনো গিয়েছিলেন?
উ-কেবলমাত্র ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া আর কোন ক্যান্টনমেন্টে যাইনি।
প্র-ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সর্বত্র কি আপনি ঘুরে দেখেছেন?
উ-না।
প্র-আনলিস্টেড টেলিফোন মানে কি?
উ-যেসব টেলিফোন রেজিস্ট্রি করা হয়নি বা টাকা দেওয়া হয়নি।
প্র-এসব টেলিফোনের নম্বর ছিল কি?
উ-না।
প্র-ট্রাঙ্ককল বুক করতে বা বাইরে থেকে ট্রাঙ্ককল পেতে হলে তো নম্বর টেলিফোন অফিসে দিতে হয়?
উ- তা হয়। এই সময় সাক্ষী নিজে থেকে বলেন, আমাকে বস্তুতঃপক্ষে কোন আনলিস্টেড টেলিফোন দেওয়া হয়েছিল না।
প্র-আপনি যখন ২-২-৬৬ তারিখে ঢাকা এসেছিলেন তখন ঢাকা হোটেলের রেজিস্টারে নিজের নামই তো লিখেছিলেন তাই না?
উ-আমি ঢাকায় বদলী হয়ে চলে আসার পর ঢাকা হোটেলে নিজের নামই রেজিস্ট্রি করেছিলাম।
এই সময় ঢাকা হোটেলের রেজিস্টার সাক্ষীর সামনে দিয়ে তাঁর নাম, ও তারিখ বের করতে বলা হয়। রেজিস্টার পরীক্ষা করে তিনি বলেন, ৪-২-৬৬ তারিখে ঢাকা ত্যাগের ব্যাপারে তাঁর নাম ঢাকা হোটেলে রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। সময় দেওয়া হয়েছে সকাল ৭টা।
প্র-আপনি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় কিসে এসেছিলেন?
উ-বিমান না ট্রেনে ঠিক মনে পড়ছে না।
প্র-চট্টগ্রামের মিসকা হোটেলে আপনার সঙ্গে হক ও পেটি অফিসার রহমানের দেখা হয়?
উ-তাদের সঙ্গে চট্টগ্রামেই প্রথম দেখা হয়। এর আগে তাদের চিনতাম না।
প্র-আপনার সঙ্গে তাদের লেঃ হক ও পেটি অফিসার রহমান বলেই পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়?
উ-হ্যাঁ। তাঁরা আমাকে বলেছিলেন যে, তারা চট্টগ্রামে পোস্টেড।
প্র-আপনি উল্লেখ করেছেন যে, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান বলেছিলেন কাজকর্ম সব সমাপ্ত। এখন তাঁরা বর্ষাকালের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। এই বর্ষাকালের অর্থ কি?
উ-এর অর্থ হচ্ছে, সামরিক ঘাঁটির উপর আক্রমণ পরিচালনা করে ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতি। বর্ষাকালে সৈন্য সমাবেশ ও আনা নেওয়া অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে বলে বর্ষাকালকেই উত্তম সময় বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

প্র-পূর্ব পাকিস্তানে, কতগুলি ক্যান্টনমেন্ট আছে?
উ-চারটি। ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও যশোর।
প্র-ঢাকা-কুমিল্লা, চট্টগ্রামের মধ্যে যোগাযোগের জন্য সাংবৎসরিক পাকা সড়ক আছে বলে জানেন?
উ-পাকা রাস্তা আছে জানি, তবে সেটা সাংবৎসরিক কিনা তা জানি না।
প্র-আপনি সড়কপথে ঢাকা থেকে কখনও চট্টগ্রামে গেছেন?
উ-না।
প্র-আপনি কি জানেন যে, সারা বৎসরই মানুষ ঢাকা থেকে বাসে, ট্রাকে বা মোটরে চট্টগ্রাম যায়?
উ-জী হ্যাঁ, জানি। এটা আমি ১৯৬৭ সনে জানতে পারি।
প্র-আপনি কি পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক অবগত রয়েছেন?
উ-না। যদিও আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য ১৯৬৬ সালে ঢাকা পাঠান হয়েছিল, তবু আমি পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতাম না। ঢাকা-চট্টগ্রাম পথ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৩৯ সাল থেকে কাঁচা রাস্তা দিয়ে যে সামরিক যানবাহন চলাচল করতো তা আমার জানা ছিল না।
প্র-আপনি কি জানেন, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুরের মধ্যে সুন্দর পাকা সড়কের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান?
উ-না, আমার জানা নেই।
প্র-আপনার বাড়ী কোন জেলায়?
উ-ফরিদপুর জেলায়।
প্র-কুষ্টিয়া ও ফরিদপুরের মধ্যে পাকা সড়ক যোগাযোগ সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন?
উ-না।
প্র-গোয়ালন্দ-বরিশাল এর মধ্যে বিদ্যমান সড়ক-এর কথা জানেন?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-আপনি কি জানেন, এখন যে কেউ সড়ক পথে ঢাকা থেকে ফরিদপুর, বরিশাল, কুষ্টিয়া ও যশোর-এ কোচ অথবা ট্রাকে যেতে পারে?
উ-জী হ্যাঁ, জানি।
প্র-ডি-ডেতে মিলিটারী ক্যান্টনমেন্টের সামরিক লোকজন ছাড়া আর কি করার প্ল্যান ছিল?
উ-গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর বেসামরিক লোকদেরও আক্রমণ করার প্ল্যান ছিল।

প্র-সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান বলতে কি বোঝেন?
উ-এর অর্থ গবর্নমেন্ট হাউস, সেক্রেটারিয়েট, রেলওয়ে বিভাগ, থানা সদর দফতর ইত্যাদি।
এই সময়ে বিবাদী কৌসুলী সাক্ষীর হাতে তার অফিসের দৈনিক হাজির বহি দেন। সাক্ষী সেখানে নিজের নাম রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।
প্র-আচ্ছা, আপনার ব্যক্তিগত ডায়েরীতে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান একটিনামের তালিকা দিয়েছিলেন?
উ-হ্যাঁ। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের কথা অনুসারে এ বি খুরশিদ তালিকাটি লেখেন।
সাক্ষীর ব্যক্তিগত ডায়েরী বলে কথিত একটি ডায়েরী আদালতে দাখিল করা হয়। বিবাদীপক্ষের কৌসুলী ডায়েরীটি পরীক্ষা করেন।
প্র-লেঃ মোয়াজ্জেম আপনাকে তো তিনটি ডায়েরী দিয়েছিলেন?
উ-হ্যাঁ। তার মধ্যে একটি ডায়েরী এই ট্রাইব্যুনালে আমাকে দেখান হয়েছে।
প্র-(ডায়েরীটি দেখিয়ে)এটি কি সেই তিনটি ডায়েরীর একটি?
উ-না।
এই সময় অপর একটি ডায়েরী আদালতে পেশ করা হয়। বিবাদী কৌসুলী দ্বিতীয় ডায়েরীটি পরীক্ষা করে জানতে চান যে, এটা লেঃ মোয়াজ্জেম প্রদত্ত কিনা।
উ-না, এ দু'টো আমার ব্যক্তিগত ডায়েরী।
বিবাদী কৌসুলীর এক প্রশ্নের জবাবে একরারী সাক্ষী জানান যে, চট্টগ্রামে যাওয়ার সময় এই দুটি আমার ব্যক্তিগত ডায়েরীর সঙ্গে ছিল।
প্র-এই ব্যক্তিগত ডায়েরী দুটি কোন সালের?
উ-ঠিক বলতে পারি না। ১৯৬৫/৬৬ সালের হবে।
প্র-যে লোকদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল তাদের নামের তালিকাটি কি এই ডায়েরী দুটির মধ্যে লেখা আছে?
উ-ঠিক বলতে পারি না কোন ডায়েরীতে এই তালিকাটি রয়েছে।
প্র-এই দুটি ডায়েরীতেই কি খুরশীদ সেই তালিকা লিখেছিল?
উ-আমার ঠিক মনে নেই।
বিবাদী কৌসুলী জনাব কাজী জালালউদ্দিন আহমদ সিএসপির নাম উল্লেখ করে বলেন, এই নামটি সেই তালিকাভুক্ত কি না? সাক্ষী জানান যে, সেই তালিকায় এই নামটা নেই।
কৌসুলী তখন সাক্ষীর ডায়েরীর একটি পাতা দেখিয়ে সাক্ষীকে কাজী জালালউদ্দিন আহমদের লেখা নাম দেখিয়ে জানতে চান যে, লেখাটা কার? সাক্ষী জানান যে, হস্তাক্ষরটি তাঁর নয়।

প্র-অশোক সেনগুপ্ত কে?
উ-উনি আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ।
প্র-এর নামটি আপনার ডায়েরীতে কে লিখেছে?
উ-আমার মনে হয় আমিই লিখেছি।
প্র-ইনি কি আপনার ঢাকার বন্ধু?
উ-চট্টগ্রামে থাকেন। ইনি একজন ব্যবসায়ী।

ডায়েরীতে লেখা জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর নাম দেখে কৌশলী জানতে চান ইনি কে এবং হস্তাক্ষর কার?

মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীকে চেনেন সাক্ষী জানান যে, তিনি মোয়ানা এবং হস্তাক্ষরটি কার তাও জানেন না।

কৌসুলী তখন দ্বিতীয় ডায়েরীটি সাক্ষীর হাতে দেন। ডায়েরীতে লিখিত কয়েকটি নাম তাকে পড়তে বলা হয়। সাক্ষী তখন পড়েনঃ কাজী জালালউদ্দিন আহমদ, সিএসপি ; মতিউল ইসলাম, সিএসপি ; সালাহউদ্দীন সিএসপি ; সানাউল হক, সিএসপি ; ও নুরুল ইসলাম সিএসপি।
প্র-আপনি কি এদের কাউকে চেনেন?
উ-না।

এই সময় আদালতের এক প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী জানান যে, ডাঃ সায়ফুর রহমান এদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য নামগুলি দিয়েছিলেন। নামগুলি তিনি চট্টগ্রামে লিখেছিলেন।
প্র-যোগাযোগ কি জন্য?
উ-আন্দোলনে শরিক হওয়ার জন্য এদের দীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

কৌশলীর অপর এক প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী জানান, এই অফিসারদের মামলার সঙ্গে জড়িত করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই নামগুলি লেখেননি।
প্র-একমাত্র সালাহউদ্দিন বাদে অন্য সবাইতো সিনিয়ার পূর্ব পাকিস্তানী সিএসপি তাই না?
উ-হ্যাঁ।
প্র-সালাহউদ্দিনও একজন পূর্ব পাকিস্তানী?
উ-আমাকে তাই বলা হয়েছে, আমি তাকে চিনি না।

কৌশুলী ডায়েরীতে একস্থানে কাজী জালালউদ্দিন সিএসপির নাম লিখে তার পাশে 'চাকুরীর জন্য' কথাটা লেখার কারণ জানতে চাইলে সাক্ষী জানান, এদের দীক্ষা দেওয়ার প্রশ্নটি গোপন রাখার জন্যই তিনি এইভাবে ডায়েরীতে উল্লেখ করেছিলেন। আন্দোলনের গোপনীয়তা যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য এই সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছে।

অপর এক প্রশ্নের জওয়াবে তিনি জানান যে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত জবানবন্দীতে তিনি যেসব সিএসপি অফিসারদের দীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ পেয়েছিলেন, সেসব সিএসপি অফিসারদের নাম তিনি জানাননি।
প্র-রাজারবাগে পুলিশ কি আপনার কথাবার্তা লিপিবদ্ধ করেছিল?
উ-রাজারবাগে ইনভেস্টিগেটিং অফিসার তাকে জেরা করার সময় কি লিখেছেন তা তিনি জানেন না।
প্র-এই তালিকার মধ্যে থেকে কোন অফিসারের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করেছিলেন?
উ-খুরশীদের লিখিত তালিকার মধ্যে থেকে কারোর সঙ্গে আমি যোগাযোগ করে থাকতে পারি। এদের মধ্যে একজনের কথা মনে আছে। ফ্লাইট সার্জেন্ট হক মহাখালীতে আমার বৈঠকে যোগদান করে। অন্য কারো কথা তালিকাটা একবার না দেখে বলতে পারবো না।
সাক্ষী জানান যে, তালিকার মধ্যে চট্টগ্রামের কারো নামও থাকতে পারে।
প্র-আপনার ব্যক্তিগত ডায়েরীতে কি আপনি ব্যক্তিগত কিছু লেখেন?
উ-হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত বিষয়ে টুকেছি।
প্র-আপনার এই চাকুরী ছাড়া অন্য কোন ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল নাকি?
উ-না।
প্র-হোসেন ফ্লাওয়ার মিল সম্পর্কে কিছু জানেন কি?
উ-আমার নিজের একটি ফ্লাওয়ার মিল স্থাপন করার ইচ্ছে ছিল।
এজন্য আমি হোসেন ফ্লাওয়ার মিলের নামে প্যাডও ছাপিয়ে ছিলাম।
প্র-এই ব্যাপারে কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন?
উ-প্যাড ছাপানো ছাড়া আর কিছু করেছি বলে তো মনে পড়ে না।
প্র-মিলটি কোথায় স্থাপন করবেন বলে ঠিক করেছিলেন?
উ-কোন জায়গা ঠিক হয়নি। তবে ঢাকাতে করাই আমার ইচ্ছে ছিল। প্যাডে ১০৭ নম্বর দীননাথ সেন রোডের ঠিকানা দেওয়া ছিল।
প্র-এতে কত টাকা ব্যয় করার কথা ছিল?
প্র-প্রথমে আমি ভেবেছিলাম ২/৩ হাজার টাকায় এটা করা যাবে। কিন্তু পরে আইডিবিপির সঙ্গে আলোচনা করে জানতে পারি কয়েক লক্ষ টাকা লাগতে পারে।
প্র-আপনার ব্যক্তিগত ডায়েরী দুটো কি অফিসের স্টোর রুমে আপনার ব্যাগে রাখতেন?
উ-হ্যাঁ।
প্র-আপনার ডায়েরীর সব পাতা কি লেখা ভর্তি ছিল?
উ- ঠিক মনে নেই।

প্র-করাচীতে থাকার সময়ে কি এতে কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোন কিছু টুকেছিলেন? খরচপত্র ইত্যাদির কথা?
উ-আমার ঠিক মনে নেই, তবে প্রথম ৪ পৃষ্ঠা আমার লেখা দেখতে পাচ্ছি।
এই সময়ে বিবাদী কৌশলী ডায়েরীটি সাক্ষীর হাতে দেন। সাক্ষী ডায়েরী ফেরৎ দেওয়ার পর কৌশলী ডায়েরী থেকে সাতজনের নাম পড়ে শোনানঃ এন, এইচ, খান গিয়াসউদ্দিন, আনোয়ার হোসেন, মিসেস তালুকদার, আবুল হোসেন সরকার ও কাজী আলাউদ্দিন।
প্র-এদের মধ্যে কেউ এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন কি?
উ-না।
প্র-আপনি ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে হোসেন ফ্লাওয়ার মিলের নামে ১০ হাজার টাকা জমা দিয়ে ছিলেন?
উ-আমি ৭,০০০ টাকা জমা দিয়েছিলাম। মিলের জন্য আমি আর কি করেছি কিনা জানতে চাওয়ার সময় আমি এই টাকার কথা ভুলে গিয়েছিলাম।
প্র-আপনি ৪-৭-৬৬ তারিখে আবার চার হাজার টাকা জমা দিয়েছিলেন?
উ-হ্যাঁ।
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার বই দেখিয়ে কৌশলী জিজ্ঞেস করেন যে, আগে সাত হাজার টাকা জমা দেওয়ার কথাটা সত্যি কিনা।
উ-এমন হতে পারে, আমি একবার ৬ হাজার এবং আর একবার ৪ হাজার টাকা জমা দিয়েছি। আমি ব্যাঙ্ক থেকে একবার ৪ হাজার টাকা তুলে বরিশাল গবঃ কলেজের অধ্যাপক বাকের আলীকে ঋণ দেই।
প্র-টাকাটা আপনি কোথায় পেয়েছিলেন?
উ-এটা আমার ব্যক্তিগত টাকা এবং এটা আমি কাছেই রাখতাম।
প্র-কত বছর এই টাকাটা আপনার কাছে ছিল?
উ-আমি পাকিস্তান বিমান বাহিনী অফিসারের কাছে ৫ হাজার টাকা জমা রাখি। আমি যখন বিমান বাহিনী থেকে চাকুরী ছেড়ে দেই, সেসময়ে এই টাকাটা নিয়ে আসি। এই ৫ হাজার টাকার সঙ্গে আমার নিজের কিছু টাকা যোগ দিয়ে আমি সেটা ব্যাঙ্কে জমা দেই।
প্র-আপনি চাকরী করে আর ব্যবসা নিয়েই তো বেশী ব্যস্ত থাকতেন। সুতরাং বৈপ্লবিক কাজকর্ম করার জন্য অবসর থাকতো না তাই না?
উ-না, একথা ঠিক নয় ।
প্র-আপনার ব্যক্তিগত টাকা কার কাছে জমা রেখেছিলেন?
উ-ফ্লাইট লেঃ তামারীর কাছে। ১৯৬৪ সালে বিমান বাহিনীর চাকুরী ছেড়ে আসার সময়ে টাকাটা নিয়ে আসি।

প্র-পশ্চিম পাকিস্তানে আপনার বন্ধু-বান্ধব ছিল?
উঃ-হ্যাঁ।
প্র-আপনার পিতার নাম কি?
উঃ মরহুম ফজল মোল্লা।
প্রঃ আপনার পিতা মোল্লা আর আপনি মিয়া হলেন কিভাবে?
উঃ আমি মোল্লা পরিবর্তন করে নামের সঙ্গে 'মিয়া' যুক্ত করেছি।
প্রঃ আপনি মোল্লার চেয়ে মিয়াকে উৎকৃষ্ট উপাধি মনে করেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ উৎকৃষ্টতর করার জন্য আপনি আমির হোসেন মিয়া না লিখে "মিয়া আমির হোসেন" লিখেননি কেন?
প্রঃ আপনি যখন বিমানবাহিনীতে যোগ দেন তখন আপনি কত টাকা মাইনে পেতেন?
উঃ আমি যখন প্রথম রিক্রুট হই তখন ৪৭ টাকা বেতন পেতাম।
প্রঃ বিমান বাহিনীতে এয়ারম্যান হিসেবে আপনি কত বছর চাকুরী করেন?
উঃ আমি বলতে পারব না।
প্রঃ তারপর আপনি কর্পোরাল পদে উন্নীত হয়েছিলেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ কোন সালে?
উঃ আমার মনে নেই।
প্রঃ বিমানবাহিনীতে থাকাকালে আপনি ব্যক্তিগত ডায়েরীতে কিছু নোট করতেন?
উঃ আমার মনে পড়ছে না।
প্রঃ কর্পোরাল হিসেবে সব মিলিয়ে আপনি মাসিক কত টাকা পেতেন?
উঃ ১৭৫ টাকা।
প্রঃ আপনি কর্পোরাল হিসেবে অবসরগ্রহণ করেছিলেন কি?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ করাচীতে কি আপনার কোন ব্যাঙ্ক একাউন্ট ছিল?
উঃ হ্যাঁ, ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে একটি একাউন্ট ছিল।
প্রঃ আপনার পশ্চিম পাকিস্তানী বন্ধু যে পাঁচ হাজার টাকা ধার শোধ করেছিল ঐ টাকা এই একাউন্টে জমা দিয়েছিলেন?
উঃ না।
প্রঃ বিমানবাহিনীতে থাকাকালে আপনি যখনই কোন অর্থ সঞ্চয় করতে চাইতেন তা কি ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের একাউন্টে জমা দিতেন?
উঃ না।

সাক্ষী আরও বলে, ঢাকায় ইউবিএল-এর একাউন্টে ৬ হাজার টাকা জমা দেওয়ার পর আমি একবার ৪ হাজার টাকা উঠিয়ে নেই।
প্রঃ দ্বিতীয়বার ৪ হাজার টাকা জমা দেওয়ার আগে এই টাকা উঠান?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ প্রথমবার টাকা জমা দেওয়ার কতদিন পর এবং দ্বিতীয়বার জমা দেওয়ার কতদিন পূর্বে এই টাকা উঠিয়ে নেন?
উঃ আমার মনে নেই।
প্রঃ কি জন্য ব্যাঙ্কে এই টাকা জমা দিয়েছিলেন?
উঃ টাকা জমা দিলে ওভার ড্রাফট পাব এই আশায় ।
প্রঃ ৪ হাজার টাকা কেন ব্যাঙ্ক হতে উঠিয়েছিলেন?
উঃ বরিশালের অধ্যাপক বাকের আলীকে ধার দেয়ার জন্য।
প্রঃ পুলিশের মারফত অফিসের চৌকিদার রহমত আলীর নিকট আপনি যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাতে লেঃ মোয়াজ্জেম প্রদত্ত ডায়েরী পাঠাবার জন্যইত আপনি বলেছিলেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ আপনার ব্যক্তিগত ডায়েরী পাঠাতে বলেছিলেন?
উঃ না।
প্রঃ ঢাকায় ইউবিএল ব্যতীত আপনার অন্য কোন ব্যাঙ্কে কোন একাউন্ট আছে?
উঃ হ্যাঁ, ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনে আছে।
প্রঃ করাচীতে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে আপনি কবে একাউন্ট খুলেছিলেন?
উঃ সম্ভবতঃ ১৯৫৬ সালে অথবা তার পরে।
প্রঃ আপনারা যে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাতে পশ্চিম পাকিস্তানী বন্ধুদের সাথেও কি সম্পর্ক ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন?
উঃ পূর্ব পাকিস্তানে আলাদা রাষ্ট্র স্থাপন করতে পশ্চিম পাকিস্তানের বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রশ্ন ওঠে না।
প্রঃ পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে আপনার যে ধারণা তাতে অন্যান্য দেশের নাগরিকদের কি আপনারা এখানে থাকতে দিতেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ পশ্চিম পাকিস্তানী সকলই ছিলেন?
উঃ ডাঃ সায়েদুর রহমান, মানিক চৌধুরী, বিধান সেন ও সুবেদার রাজ্জাক।
প্রঃ এদের সকলকেই কি আপনি দলে নতুন দেখেছেন?
উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ জবানবন্দীতে আপনি বলেছেন যে, মানিক চৌধুরী আপনাকে ৩ হাজার টাকা দিয়েছেন, আপনি কি ঐ বৈঠকে টাকা চেয়েছিলেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ ঐ সভায়ই তিনি সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে টাকা দিয়েছেন?
উঃ না। পরদিন সকালে তিনি বিধানকে সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং আমাকে টাকা দেন।
কৌঁসুলী সালাম খান তখন সাক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, তিনি আগের জবানবন্দীতে বলেছেন যে, মানিক চৌধুরী উক্ত বৈঠকেই তাকে টাকা দিয়েছেন।
তখন সাক্ষী বলেন, হয়তবা আমি আদালতে তাই বলেছিলাম।
প্রঃ এই সময় আপনার কাছে আর কত টাকা ছিল?
উঃ ১৯৬৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মানিক চৌধুরীর দেওয়া ৩ হাজার টাকা ছাড়া আমার কাছে পার্টির তহবিলে আর কোন টাকা ছিল না।
প্রঃ চট্টগ্রামে "মিসকা" হোটেল ছাড়া আর কোন স্বল্প ভাড়ার হোটেল আছে?
উঃ আছে।
প্রঃ মিসকায় একটি রুমের ভাড়া কত?
উঃ শুধু রুম ভাড়া দৈনিক আমি ৯ টাকা দিয়েছি। আমি বাইরে খেতাম।
প্রঃ আপনি কি সিঙ্গেল সিটের রুমে না ডবল সিটের রুমে ছিলেন?
উঃ সিঙ্গেল সিটের রুমে।
প্রঃ আপনি শুধু পার্টির কাজেই চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ সেখানে হোটেলের রেজিস্টারে কি আপনি নিজের প্রকৃত নাম এনট্রি করেছিলেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ নামের সঙ্গে আপনি আপনার সরকারী পদবী লিখেছিলেন?
উঃ সে কথা আমার মনে নেই।
প্রঃ আপনি হোটেলের রেজিস্টারে আপনার ঢাকার ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন?
উঃ ঢাকার কি ঠিকানা দিয়েছিলাম তা মনে নেই।
কৌঁসুলী সালাম খান তখন হোটেল রেজিস্টার পড়ে শোনান যে, সেখানে সাক্ষীর অফিসের ঠিকানা সিএসও রিজিওনাল অফিস নয়া পল্টন, ঢাকা লেখা আছে।
প্রঃ ১৯৬৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামে মানিক চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে আপনার সাথে তার আর কখনও দেখা হয়েছিল?
উঃ না–তবে আমি তার নাম শুনেছিলাম।

প্রঃ একখানা পত্রে জনৈক কামালের নাম উল্লেখ আছে। তিনি কে?
উঃ আমি তাকে কখনও দেখিনি।
প্রঃ আপনি কি আহমদ ফজলুর রহমানকে দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মনে করতেন?
উঃ হ্যাঁ। দলের কাজ-কর্মের ব্যাপারে তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন।
প্রঃ ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জনাব আহমদ ফজলুর রহমান কি ঢাকা এসেছিলেন?
উঃ হয়ত তিনি করাচী হতে ছুটি নিয়ে এসেছিলেন।
প্রঃ শেখ মুজিবর রহমান ও আহমদ ফজলুর রহমানের মধ্যে কোন মতানৈক্য বা বিবাদ ছিল কি?
উঃ একবার শেখ মুজিবর রহমান আমাকে বলেছিলেন যে, জনাব আহমদ ফজলুর রহমান তহবিলের অর্থ অপব্যয় করছেন।
প্রঃ কখন শেখ মুজিব আপনাকে একথা বলেছিলেন?
উঃ ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকের পর আমি একদিন তার অফিসে গেলে তিনি একথা জানান।
প্রঃ পার্টির টাকাকড়ি জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের নিকট রাখা হত একথা আপনি কখন জানলেন?
উঃ শেখ মুজিবর রহমান যে তহবিলের কথা বলেছেন সেটা পার্টির তহবিল নয়–তা আওয়ামী লীগের তহবিলের কথা তিনি বলেছেন।
প্রঃ একথা কি আপনি ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশের নিকট বিবৃতিতে বলেছেন?
উঃ না।
প্রঃ একথা আপনার মাথায় কখন এল–এখনি?
উঃ আপনি আমাকে একথা এখুনি জিজ্ঞেস করায় তাই আমি এখুনি বলছি।
প্রঃ এই মতভেদের কথা কি আপনি লেঃ মোয়াজ্জেমকে জানিয়েছিলেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ আপনি রেজিসটেন্স কোর্স বা সিক্রেট আর্মড রিভুলুশান সম্পর্কে কোন বইপত্র পড়েছেন?
উঃ না।
প্রঃ মোয়াজ্জেম আপনাকে একটি পত্রে বলেছিলেন যে, তিনি ঢাকা আসা পর্যন্ত আপনি যেন কোন বাড়ী ভাড়া না করেন। তা সত্ত্বেও আপনি বাড়ী ভাড়া করেছিলেন তাই না?
উঃ হ্যাঁ।
প্র ঃ ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী হতে মার্চ পর্যন্ত সময়ে আপনি ঢাকার কোথায় ছিলেন?
উঃ আরজু হোটেলে।

প্রঃ আপনি এখানে যখন অফিসে যোগ দেন তখন অফিসকে আপনার অবস্থান সম্পর্কে কোন ঠিকানা দিয়েছিলেন?
উঃ ঢাকা হোটেলের ঠিকানা।
প্রঃ কোন তারিখে দিয়েছিলেন?
উঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে।
প্রঃ চট্টগ্রাম হতে ফিরে এসে আপনি কোথায় উঠেন?
উঃ আরজু হোটেলে।
প্রঃ তখন আপনি অফিসকে আপনার এই ঠিকানা বদলের কথা জানিয়েছিলেন কি?
উঃ হ্যাঁ–আমি মুখে বলেছিলাম ।
প্রঃ অফিসে কি আপনি আরজু হোটেলের ভুয়া নাম আবদুর রহিমই জানিয়েছিলেন?
উঃ না।
প্রঃ যদি অফিস আপনাকে হোটেলের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে চাইত তবে কোন নামে তারা যোগাযোগ করত?
উ-আমার আসল নামে। যদিও আরজু হোটেলে আমার নাম ছিল আবদুর রহিম।
প্র-আপনি যে এই ভুয়া নামে হোটেলে ছিলেন সেকথা অন্যান্যদের জানিয়েছিলেন?
উ-পার্টির সদস্য ছাড়া একথা আমি আর কাউকেও জানাইনি।
প্র-আরজু হোটেলে থাকাকালে আপনি কোন চিঠিপত্র পেয়েছিলেন?
উ-না, তখন ২০/৩ গোপীবাগের ঠিকানায় আমার পত্র আসত।
প্র-গোপীবাগের ঠিকানায় আপনার যেসব পত্র আসত তাতে সাংকেতিক নাম থাকত না প্রকৃত নাম থাকত?
উ-কখনও সাংকেতিক কখনও প্রকৃত নাম থাকত।
প্র-আরজু হোটেলে থাকাকালে আপনি মোয়াজ্জেমকে আপনার অবস্থানের কথা জানিয়েছিলেন?
উ-হ্যাঁ, তাকে আমি আমার এই ভূয়া নামের কথাও জানিয়েছিলাম।
প্র-ভূয়া নামে আরজু হোটেলে আপনার কাছে কোন চিঠিপত্র আসেনি?
উ-না।
প্র-জবানবন্দীতে আপনি বলেছেন, শেখ মুজিব ও লেঃ মোয়াজ্জেমের মধ্যে মতভেদ হয়েছিল। কারণ শেখ সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা আগেই কার্যকরী করতে চেয়েছিলেন। আপনি কি মনে করেন অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ছাড়া তিনি এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে (এই পরিকল্পনা কার্যকরী করাও) পারতেন?

উ-শেখ মুজিবর রহমান আগেই এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তিনি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীতই তা কার্যকরী করতে চেয়েছিলেন।
প্র-আপনি যতদিন দলে ছিলেন সেসময় কোন অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সংগ্রহ করা হয়েছিল কি?
উ-না।
প্র-দলে আপনার কাজ ছিল সমন্বয় সাধন, তাই না?
উ-দলে নতুন লোক সংগ্রহ করাও আমার কাজের একটা অংশ ছিল।
প্র-আপনি কোন লোককে দলভুক্ত করেছিলেন?
উ-না।
প্র-কোন লোককে মতবাদে দীক্ষিত করা দ্বারা আপনি কি বুঝাতে চেয়েছেন?
উ-আমাদের আন্দোলনের আদর্শ ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে কোন লোককে দলে আনা একথাই আমি 'দীক্ষিত করার' দ্বারা বুঝাতে চেয়েছি।
প্র-আপনাদের দলের আদর্শ ও লক্ষ্য কি আমাকে বলুন?
উ-পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা।
প্র-আমি যদি আপনার কাছে দীক্ষিত হতে চাই আপনি আমাকে কিভাবে দীক্ষা দেবেন তা একটু বলুন?
উ-আমি আপনাকে সে কথা গোপনে বলতে পারি।
প্র-এর অর্থ কি এই যে, আপনি সত্য কথা ব্যক্ত করতে রাজী নন?
উ-একথা ঠিক নয়।
প্র-তাহলে আপনি গোপন করছেন কেন?
উ-গোপনে বলার মত কিছুই নেই। আমি সবকথাই আদালতে বলেছি।
প্র-আপনাদের আন্দোলনের ইডিওলজি ও স্পীরিট ব্যাখ্যা করুন।
উ-পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বৈষম্য রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র হতে যদি পৃথক করা যায় তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা যাবে।
প্র-অপরকে দীক্ষিত করার জন্য এছাড়া আপনার আর কোন পয়েন্ট জানা নেই?
উ-দলভুক্ত নতুন লোকদের আর যেসব কথা বলা হত তা হল পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃক অর্জিত বিদেশী মুদ্রা– পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানে যে সমস্ত শিল্প স্থাপিত হয়েছে সে তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে এর সংখ্যা খুবই কম।
প্র-এই নয়া রিক্রুটরা কি সবই শিক্ষিত ব্যক্তি?
উ-হ্যাঁ।

প্র-তারা কি আপনার নিকট হতে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা কিভাবে কার্যকরী হবে, তা জানতে চাইত?
উ-আমি তাদের বলেছি যে, সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এই লক্ষ্য হাসিল হবে।
প্র-কি পদ্ধতিতে তা হাসিল হবে সেকথা বলেছিলেন?
উ-হ্যাঁ।
প্র- সেটা কি?
উ- সেই পরিকল্পনা হচ্ছে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের সামরিক অফিসারদের আক্রমণ করে ক্ষমতা দখল করা।
প্র- কোন সময় এই কাজ করবেন তা বলেছিলেন?
উ-না।
প্র-আপনি কি বর্ষার মওসুম ও 'ডি-ডে'র কথা বলেননি?
উ-হ্যাঁ, বলেছিলাম।
প্র-বর্ষা মওসুম বলতে কোন সময়ের কথা বলেছিলেন?
উঃ ১৯৬৬ সালের জুন ও জুলাই মাস।
প্র-ডি-ডে অর্থ কি?
উ- ডে অব এ্যাকশন।

সংবাদ

১৫ই আগস্ট ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

জেরার পঞ্চম দিবসে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন বলেনঃ

পাঁচজন সিনিয়র পূর্ব পাকিস্তানী সিএসপিকে দলে টানার জন্য

তাঁহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাঁহাদের কাহাকেও চিনেন না

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (মঙ্গলবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি জনাব আবদুস সালাম খানের এক প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া জানান যে, তাঁহার ব্যক্তিগত ডাইরীতে লিখিত পাঁচজন সিনিয়র পূর্ব পাকিস্তানী সি,এস, পি, অফিসারকে তাঁহাদের আন্দোলনে টানার জন্য তাঁহার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ওই অফিসারগণ হইতেছেন– কাজী জালালুদ্দীন সি,এস,পি,জনাব মতিউল ইসলাম সি,এস,পি,জনাব সালাহ্উদ্দীন সি,এস,পি,জনাব সানাউল হক সি,এস,পি,ও জনাব নূরুল ইসলাম সি,এস,পি। সাক্ষী বলেন যে,তিনি তাঁহাদের কাহাকেও চিনেন না এবং কাহারো সহিত যোগাযোগ করেন নাই।

উল্লেখিত অফিসারগণ (জনাব সালাহউদ্দীন ব্যতীত) সকলেই পূর্ব পাকিস্তানের সিনিয়র সি,এস,পি, অফিসার এবং তাঁহাদেরকে এই ষড়যন্ত্র মামলায় জড়াইবার উদ্দেশ্যেই তদন্তকারী অফিসারদের নির্দেশে তিনি ব্যক্তিগত ডাইরীতে তাঁহাদের নাম লিখিয়া রাখিয়াছেন কিনা, উহা বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জানিতে চাহিলে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া তাহা অস্বীকার করেন।

গতকাল বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান পূর্বদিনের জের টানিয়া রাজসাক্ষী আমীর হোসেনকে জেরা করিতে থাকেন। আগামী বৃহস্পতিবারও তিনি জেরা অব্যাহত রাখিবেন।

সাক্ষী জেরার উত্তরদান প্রসঙ্গে জানান যে, তিনি তাঁহার পিতৃপদবী 'মোল্লা' পরিবর্তন করিয়া নিজের পদবী 'মিয়া' করিয়াছেন। তাঁহার উপর নির্দেশ থাকিলেও তিনি কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জনাব সবুর এবং ভারত, চীন ও মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন নাই। তিনি আরও জানান যে, তাঁহার উপর বিপ্লবী আন্দোলনের দায়িত্ব অর্পণ করা হইলেও তিনি প্রদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন ধারণা রাখেন না।

জেরা শুরু করার পূর্বে জনাব সালাম খান জিজ্ঞাসা করেন যে,আদালত কক্ষে প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তে তিনি কোথায় ছিলেন, এবং পাশের ঘরে তাঁহাকে কেহ ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিসের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দী পড়িয়া শুনাইয়াছেন কিনা। সাক্ষী জানান যে, তাঁহাকে সাড়ে আটটার সময় আদালতে আনয়ন করা হয় এবং তিনি পাশের ঘরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব দিকের একটি ঘরে ১০/১৫ মিনিটের জন্য গিয়াছিলেন কিন্তু সেখানে বাদীপক্ষের কাহারো উপস্থিতি লক্ষ্য করে নাই।

অতঃপর জনাব সালাম খান সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন।

প্র ঃ ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে আপনি কি আপনার বিবৃতিতে বলেছিলেন যে, নূর মোহাম্মদ আপনাকে কে,জি,আহমদের সঙ্গে এবং কে,জি,আহমদ আপনার সঙ্গে জনাব এ,এফ,রহমানের পরিচয় করিয়ে দেন?

উত্তর ঃ জী হ্যাঁ।

প্র ঃ পুলিসের কাছে কি আপনি বলেননি, নূর মোহাম্মদই ঐ দু'জনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেন?

উ ঃ না,আমি বলিনি।

অবস্থার প্রেক্ষিতে সময়ে সময়ে উক্ত নীতি পুনঃ পর্যালোচনা করা হয়। তিনি বলেন যে, দেশের উন্নয়নের গতির প্রতি সর্বাধিক নজর দেওয়া ষ্টেট ব্যাঙ্কের চূড়ান্ত লক্ষ্যের অন্তর্ভূক্ত। তিনি বলেন, এই লক্ষ্য অর্জনে ষ্টেট ব্যাঙ্কের ঋণদানের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হইতেছে।

প্র ঃ জনাব কে,জি,আহমদের সঙ্গে আপনার প্রথম কখন সাক্ষাৎ হয়?

উঃ ১৯৬৫ সালের আগষ্ট কি সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা হোটেলে।

প্র ঃ দ্বিতীয় বার?

উ ঃ করাচীতে।

প্র ঃ প্রথমবার কে পরিচয় করিয়ে দেন?

উ ঃ কেউ না।

প্র ঃ জনাব এ,এফ,রহমান সি, এস,পি'র সঙ্গে আপনার কখন পরিচয় হয়?

উ ঃ ১৯৬৫ এর নভেম্বর মাসে।

প্রঃ জনাব রহমান তখন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারী ছিলেন এবং আপনার বেতন ও যাতায়াত ভাতা বরাদ্দের ব্যাপারে আপনি তাঁর সাহায্য চাননি?

উত্তর ঃ না,সেটা ঠিক নয়।

এই সঙ্গে সাক্ষী বলেনঃ "আমার নিজের অনুরোধে আমাকে বদলি করা হয় বলে আমাকে করাচী থেকে ঢাকা বদলি করার সময় সরকার আমার রাহা খরচা মঞ্জুর করেননি।

এসময় আমি আমার নিজের ও পরিবারবর্গের রাহা খরচ মঞ্জুরীর জন্যে জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের কাছে যাইনি। আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম, আর তিনি আমার অনুরোধ রাখেননি, একথা ঠিক নহে।

অপর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী আরও বলেন ঃ আমি কখনও জনাব সবুরের সাথে যোগাযোগ করিনি। আমি তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হই। এমনকি আমি এর চেষ্টাও করিনি। একবার আমি মানিক চৌধুরীকে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারীদের সাথে আমার একটা বৈঠকের ব্যবস্থা করতে বলি। আমি কখনও চীনা দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করিনি। ভারত ও চীনের মধ্যকার সম্পর্ক ভাল নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনও ঢাকায় অথবা করাচীতে মার্কিন দূতাবাসের কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করিনি।

সাক্ষী বলেনঃ আমি যখন ঢাকায় ছিলাম তখন ১৯৬৬ সনের ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিলের শেষ নাগাদ কর্পোরাল সামাদও ঢাকায় ছিলেন। বিদেশী দূতাবাসগুলোর সাথে আমার যোগাযোগের ব্যবস্থা করার কথা আমি মানিক চৌধুরী ছাড়া আর কাউকেও বলিনি। অবশ্য এ ব্যাপারে জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের সাথে একবার আমার আলাপ হয়। আমি মিঃ জর্জ বলকে জানতাম না। তবে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন একবার আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি মার্কিন দূতবাসের একজন কর্মচারী। মিঃ জর্জ বল একজন মার্কিন কর্মচারী। তিনি কী পদে ছিলেন তা আমি জানি না। তিনি এখন কোথায় তা আমি জানি না। আমি জানি না যে, মিঃ জর্জ বল এখন ঢাকায় নিযুক্ত রয়েছেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, লেঃ মোয়াজ্জেমের স্কুটারটি হালকা সবুজ রঙের ছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি সেটা ১৯৬৩ সনে ক্রয় করেন। ১৯৬৬ সনে ঢাকায় আমি জনাব জোহার সাথে সাক্ষাৎ করি। আমার জন্য কোন কাজ বা টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করা হয়নি। এই জোহা বিমান বাহিনীতে কাজ করতেন। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া আমি পূর্ব পাকিস্তানের আর কোন ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম না। আমি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের গোটা এলাকাজুড়ে ছিলাম না।

প্র ঃ আপনি একটি 'আনলিষ্টেড' টেলিফোনের কথা বলেছেন। তার মানে কি?

উ ঃ তার মানে যেটার কোন রেজিষ্ট্রেশন নাম্বার নেই এবং যার জন্যে কোন টাকা দিতে হয় না।

প্র ঃ ট্রাংকল করতে হলে বা কোন ট্রাংকল পেতে হলে তাতে তো নাম্বার লাগে?

ইহার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে কোন টেলিফোন দেয়াই হয়নি।

বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী আরও জানানঃ

আমি যখন বদলি হয়ে ঢাকায় আসি এবং ঢাকা হোটেলে অবস্থান করি তখন আমি ঢাকার আন্দোলনের জন্যে নিয়োজিত থাকলেও হোটেল রেজিষ্টারে আমি নিজের নামই দিয়েছিলাম। আমার হাতে দেওয়া ঢাকা হোটেলের এই রেজিষ্টারে আমার হোটেল ত্যাগের তারিখ লেখা আছে ৪-২-১৯৬৬ সকাল ৭টা (Ext PW 3/28 চিহ্ন সম্বলিত)।

প্রশ্নঃ আপনি ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে কীসে করে গিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ ট্রেনযোগে।

সাক্ষী তারপরেই আবার বলেনঃ না,আমি ঠিক স্মরণ করতে পারছি না, আমি ট্রেনে গিয়েছিলাম, না বিমানে গিয়েছিলাম। আমি চট্টগ্রামের মিসকা হোটেলে পেটি অফিসার রহমান ও লেঃ হকের সাথে সাক্ষাৎ করি। এর আগে তাঁরা আমার সাথে পরিচিত ছিলেন না। তাঁদেরকে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় এবং আমাকে বলা হয় যে, তাঁরা চট্টগ্রামে নিযুক্ত আছেন। ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁরা বর্ষা মৌসুম অর্থাৎ 'ডি-ডে'র জন্য তৈরী। ডি-ডে বর্ষা মৌসুমের জন্য নির্ধারিত ছিল। পরিকল্পনা ছিল যে, আমরা ক্যান্টনমেন্টগুলোতে আকস্মিকভাবে মিলিটারী পারসোন্যাল দল আক্রমণ করবো এবং তাঁদের কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে নিব। ধারণা করা গিয়েছিল যে, ঐসময় বন্যার দরুন মিলিটারী পারসোন্যালরা বাধাগ্রস্ত হবেন। পূর্ব পাকিস্তানে ৪টি মিলিটারী ক্যান্টনমেন্ট আছে। সেগুলো হচ্ছে ঢাকা,

কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও যশোর। ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের সাথে পাকা রাস্তা সংযুক্ত রয়েছে। আমি জানি না সারা বছর ধরে এই রাস্তাগুলো ব্যবহার করা যায় কি না। সড়ক পথে আমি কোনদিন ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাইনি। আমি জানি ই পি আর টি সি বাস, প্রাইভেট বাস, গাড়ী ইত্যাদি সড়ক যান ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাতায়াত করে। আমি বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য ঢাকায় নিযুক্ত হই, তথাপি ঐ বছরেই আমি প্রদেশের যোগাযোগে ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হইনি। আমি জানি না ১৯৫৯ সন থেকেই চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় সড়ক পথে মিলিটারী ট্রাক ও বাস চলাচল করে আসছে–যদিও ঐসময় পাকা রাস্তা ছিল না। আমি এটা ১৯৬৭ সনে জানতে পারি। যদিও ১৯৬৬ সনে আমি জানি না খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহীর ভেতর দিয়ে পাকা রাস্তা গেছে। আমার বাড়ী ফরিদপুর। কুষ্টিয়া থেকে ফরিদপুরে কোন রাস্তা সম্পর্কে আমার জানা নেই। আমি জানি, গোয়ালন্দ ও বরিশালের মধ্যে একটা পাকা রাস্তা আছে। হতে পারে ঢাকা থেকে ট্রাক অথবা কোচ যোগে ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও বরিশাল যেতে পারা যায়। 'ডি-ডে'তে মিলিটারী ক্যান্টনমেন্টগুলোতে মিলিটারী পারসোন্যালদের ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহের (ষ্ট্রাটেজিক পয়েন্ট) বেসামরিক পারসোন্যালদেরকেও আক্রমণ করার কথা ছিল। গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বলতে ঢাকা গভর্ণর হাউস, সেক্রেটারীয়েট বিল্ডিং, রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট, পুলিস হেডকোয়ার্টার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো বোঝান হয়।

সাক্ষীকে অফিসের হাজিরা বইটি দেওয়া হয়। তারপর সাক্ষী বলেন, Ext D B/11 চিহ্ন সম্বলিত পৃষ্ঠাটিতে আমি আমার স্বাক্ষর দেখছি। ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের কথা অনুসারে জনাব এ,বি,খুরশীদ যোগাযোগ করা হয়েছে এমন লোকদের নাম যে ডাইরীটিতে লিপিবদ্ধ করেন সেটিও আদালতেই রয়েছে। লেঃ মোয়াজ্জেম কর্তৃক প্রদত্ত ৩টি ডাইরীর মাত্র একটিই আমি আদালতে দেখেছি। আদালতে অপর যে দু'টো ডাইরী রয়েছে, সেগুলো ঐ ৩টির মধ্যে নয়। এই অপর ডাইরী দুটো আমার ব্যক্তিগত। যখন আমি চট্টগ্রামে যাই এ দু'টো ডাইরীই আমার কাছে ছিল। আমি বলতে পারছি না এই ডায়রী দু'টো কোন বছরের। তবে এ দু'টো ডাইরী আমার নিকট ছিল ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ যোগাযোগ করা হয়েছে এমন লোকদের নামের তালিকা একটি ডাইরীতে না দুটো ডাইরীতেই লিপিবদ্ধ করা হয়, তা আমি বলতে পারছি না। তারপরেই আবার সাক্ষী বলেনঃ 'না, দুটো ডাইরীতেই লেখা হয়। দুটো ডাইরীতেই জনাব এ,বি, খুরশীদ, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের কথা অনুসারে নামের তালিকাটি লিপিবদ্ধ

করেন। আমি স্মরণ করতে পারছি না, এসব নামের মধ্যে বিমানবাহিনীর লোকজন এবং সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের নাম আছে কিনা। আমি অশোক সেনগুপ্তকে চিনি। তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। আমার মনে পড়ে, আমি নিজেই ডাইরীতে তার নাম লিখি। তিনি চট্টগ্রামে থাকেন। অশোক সেনগুপ্ত একজন ব্যবসায়ী। আমি মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীকে স্মরণ করতে পারছি না।

এই সময় কৌঁসুলি ডি বি /১২ চিহ্নযুক্ত ১৯৬৬ সালের ডাইরীর একটি পাতার প্রতি সাক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ডাইরীর সাক্ষী আমীর হোসেনের ব্যক্তিগত বলিয়া জানান হয়।

প্রশ্ন ঃ মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী সম্পর্কে যেটা লেখা আছে, সেটা কার লেখা?

উ ঃ তা, আমি বলতে পারি না।

অতঃপর সাক্ষীকে ডি বি/১৩ চিহ্নযুক্ত ১৯৬৫ সালের আরও একটি ডাইরীর পাতা দেখান হয়।

প্রশ্ন ঃ এটা কার হাতের লেখা?

উ ঃ আমার নিজের বলেই মনে হয়।

প্র ঃ এই পাতায় কোন্ কোন্ নাম লেখা আছে?

উঃ তাতে লেখা আছে–(১) কাজী জালালুদ্দীন আহমদ সি,এস,পি, (২) জনাব মতিউল ইসলাম সি,এস,পি, (৩) জনাব সালাহউদ্দীন সি,এস,পি, (৪) জনাব সানাউল হক সি,এ,পি,এবং পরের পাতায় সাবেক কাষ্টম কালেক্টর জনাব নূরুল ইসলাম সি,এস,পি।

প্র ঃ এগুলো কি সবই আপনার হাতের লেখা?

উ ঃ জী হ্যাঁ।

প্র ঃ তাঁদের আপনি চেনেন?

উঃ না, চিনি না।

চেয়ারম্যান ঃ কেন তা'হলে আপনি আপনার ব্যক্তিগত ডাইরীতে ওই ৫ জনের নাম লিখে রেখেছেন?

উঃ ওই নামগুলো আমাকে ডঃ সাইদুর রহমান দিয়েছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে আমাদের আন্দোলনে তাঁদের টেনে আনার জন্য বলেছিলেন।

প্র ঃ সি এস পি অফিসারদের আন্দোলনে টেনে আনাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন?

উ ঃ হ্যাঁ।

প্রঃ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন?

উ ঃ না।

প্র ঃ নামগুলো কোথায় বসে লিখেছিলেন?

উ ঃ চট্টগ্রামে।

প্র ঃ এখন আমি যদি বলি যে, জনাব সালাহউদ্দিন ছাড়া এই অফিসাররা সবাই সিনিয়র সি এস পি অফিসার এবং পূর্ব পাকিস্তানের সিনিয়র সি এস পি অফিসারদেরকে এই ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানোর জন্যেই তদন্তকারী অফিসারদের নির্দেশে আপনি ডাইরীতে তাঁদের নাম লিখেছেন। এ কথা কি সত্যি নয়?

উ ঃ না, তা সত্য নয়।

প্র ঃ আপনি জানতেন তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের সিনিয়র সি এসপি অফিসার?

উ ঃ জানতাম।

প্র ঃ জনাব সালাহউদ্দীন সি এস পি যে পূর্ব পাকিস্তানী তা জানেন?

উ ঃ সেটা আমি শুনেছি। তবে তাঁকে আমি চিনি না।

এই সময় বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অন্যতম সদস্য বিচারপতি জনাব মুকসুমুল হাকিম সাক্ষী আমীর হোসেনকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ

"কাজী জালালুদ্দীন সি এস পি– এই নামের পাশে 'ফর জব' (চাকুরীর জন্যে) কথাটি কি উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে?"

জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই সমস্ত লোককে আন্দোলনে টানার ব্যাপারে যোগাযোগের যে প্রচেষ্টা চলছে তা গোপন করার উদ্দেশ্যেই উহা লেখা হইয়াছে।

প্র ঃ আপনি কি আন্দোলনের গোপনতা রক্ষার ব্যাপারে খুব সজাগ ছিলেন?

উ ঃ হ্যাঁ, কোন খবর যাতে বাইরে না বেরোতে পারে সে ব্যাপারে সজাগ ছিলাম।

প্র ঃ তাহলে যেসব কাগজপত্র থেকে আপনাদের দলের গোপন খবরাখবর ফাঁস হতে পারে সেগুলিকে পুড়িয়ে ফেলা উচিত ছিল না?

উ ঃ হ্যাঁ, ছিল।

প্র ঃ উচ্চপদস্থ সি,এস,পি ও অন্যান্য অফিসারকে দলে টানার ব্যাপারে আপনাদের প্রচেষ্টার কথা কি ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিসের কাছে প্রদত্ত জবানবন্দীতে বলেছেন?

উ ঃ না, বলিনি।

প্র ঃ আপনি বলেছেন, আপনার কাছে নামের তালিকা ছিল। ওই তালিকা অনুযায়ী তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?

উত্তর ঃ কারো কারো সঙ্গে যোগাযোগ করা হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ও'রকম এক আধজনের নাম বলুন?

উ ঃ যেমন ধরুন ফ্লাইট সার্জেন্ট হক। আর কোন নাম আমার মনে নেই।

প্র ঃ তালিকায় চট্টগ্রামের কোন লোকজনের নাম ছিল?
উ ঃ কেউ কেউ ছিলেন।
প্র ঃ ৬ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত কথিত সভায় আপনি তাঁদের কাউকে আনার জন্যে আপনার বন্ধুদের বলেছিলেন?
উ ঃ না।
প্র ঃ আপনার ব্যক্তিগত ডাইরীতে ব্যক্তিগত কথাবার্তাও লিখে রাখতেন?
উ ঃ কখনো কখনো লিখতাম।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের এক প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী আমির হোসেন মিয়া বলেন যে, সরকারী চাকুরী ছাড়া তাহার ব্যক্তিগত কোন ব্যবসায়-বাণিজ্য নাই।

এই জবাব শ্রবণের পর কৌসুলী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "হোসেন ফ্লাওয়ার মিল" চেনেন?
উ ঃ জি হ্যাঁ, ওই নামের আটার কলটি শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে স্থাপন করার ইচ্ছা আমার ছিল। এবং সেজন্য আমি কিছু প্যাড ছাপিয়েছিলাম।
প্রশ্ন ঃ আটাকলের জন্য ছাপানো প্যাডগুলোর ব্যবহার ছাড়া আপনার ওই বিরাট পরিকল্পনার কতটুকু বাস্তবায়ন করেছিলেন ?
উ ঃ মনে নেই।
প্র ঃ প্যাডে আপনার নাম ঠিকানা ছিল?
উ ঃ হ্যাঁ, ১০৭নং ডি,এন,সেন রোড।

ইহার পর প্রস্তাবিত আটাকলের জন্য কত টাকা প্রয়োজন হইতে পারে জিজ্ঞাসা করা হইলে সাক্ষী বলেন যে, তাহার ধারণায় দুই/তিন হাজার টাকা হইবে।

অতঃপর কৌসুলী জিজ্ঞাসা করেনঃ আপনি কিছু করেননি বলছেন ... কিন্তু আটাকলের জন্য আপনি কি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ এ ১০ হাজার টাকা জমা রাখেন নি?
উ ঃ ১০ হাজার নয়, ৭ হাজার টাকা জমা রেখেছিলাম।
প্র ঃ আর ৭ হাজার টাকা যে জমা করেছেন, সেটাও আপনি ভুলে বসে আছেন?
উ ঃ হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম!
প্র ঃ তারপরে ৪/৭/৬৬ এই তারিখে আপনি কি আরো ৪ হাজার টাকা জমা রাখেন নি?
উ ঃ হ্যাঁ, এই একই এ্যাকাউন্টে ... তবে ...

এই সময় সাক্ষী টাকা জমা দেওয়া সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা দিতে চাহিলে কৌসুলী আপত্তি জানান।

চেয়ারম্যান (কৌসুলীর প্রতি) আপনিতো ৭ হাজার টাকার কথাই জিজ্ঞাসা করেছেন।
জনাব সালাম খান ঃ না, আমি ১০ হাজার টাকার কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম।
বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিম ঃ আপনি ১০ হাজার টাকার কথাই জিজ্ঞাসা করেন–জবাবে সাক্ষী ৭ হাজার বলেছে।
প্র ঃ আসলে আপনি প্রথমে ৬ হাজার টাকা, পরে ৪ হাজার টাকা জমা দিয়েছেন, তাই না?
উ ঃ জী হ্যাঁ। তবে ১০ হাজার টাকা থেকে ৪ হাজার টাকা আমি একবার তুলেছিলাম পরে সেটাই জমা দিই।
প্র ঃ কোথা থেকে টাকাটা নিয়ে আপনি জমা দিলেন?
উ ঃ ওটা আমার ব্যক্তিগত টাকা, আমার কাছেই ছিল। বিমান বাহিনী ছেড়ে আসার সময় আমার জমা টাকা নিয়ে আসি, তার সঙ্গে আরো কিছু যোগ দিয়ে ৭ হাজার টাকা হয়।
প্রঃ তাহলে বলুন, আপনি আসলে আপনার চাকরী ও আটার কল নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন–আন্দোলন করার জন্য আপনার হাতে কোন সময়ই ছিল না?
উ ঃ ঠিক বটে।

প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী আরো জানান যে, তিনি ফ্লাইট লেঃ কামাল নামের জনৈক পশ্চিম পাকিস্তানীর নিকট ওই টাকা জমা রাখিয়াছিলেন এবং ১৯৬৪ সালে টাকাটা ফেরত নেন।

প্র ঃ পশ্চিম পাকিস্তানে তাহলে আপনার অনেক বন্ধু ছিল?
উ ঃ জী হ্যাঁ।

ইহার পর ট্রাইব্যুনাল অধিবেশন কিছুক্ষণের জন্য বিরতি ঘোষণা করা হয়।

বিরতির পর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান রাজসাক্ষী জনাব আমির হোসেন মিয়াকে পুনরায় জেরা করিতে থাকেন।

প্র ঃ আপনার নাম আমির হোসেন মিয়া– আপনার আব্বার নাম কি?
উ ঃ মৌলভী ফাজিল মোল্লা।
প্র ঃ আপনি তাহলে বাবার পদবীটা বদলে নিজের নামে 'মিয়া' রেখেছেন?
উ ঃ জী হ্যাঁ।
প্র ঃ আপনার কি ধারণা মোল্লার চেয়ে মিয়া পদবী ভাল?
উ ঃ তা ঠিক।
প্র ঃ বিমান বাহিনীতে এয়ারম্যান হিসেবে ঢুকে আপনি কত টাকা বেতন পেতেন?
উ ঃ ৪৭ টাকা।

প্র ঃ কতদিন এয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছেন?
উ ঃ বলতে পারি না।
প্র ঃ তারপর বুঝি করপোরাল পদে উন্নীত হন?
উ ঃ জী হ্যাঁ।
প্র ঃ সেটা কবে?
উ ঃ মনে নেই।
প্র ঃ আপনার ডায়েরী অথবা অন্য কোন কাগজে কি ওই পদোন্নতির রেকর্ড লিখে রেখেছেন?
উ ঃ না।
প্রশ্ন ঃ করপোরাল হিসেবে চাকুরী থেকে অবসরগ্রহণের সময় আপনার মাইনে কি মাসে ১৭৫ টাকা ছিল?
উত্তর ঃ জী হ্যাঁ।
কৌসুলীর পরবর্তী প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানান যে, শুধুমাত্র তখন ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে একটি একাউন্ট ছিল। কিন্তু বিমান বাহিনীতে চাকুরীর সময় ব্যাঙ্কে তিনি টাকা জমা রাখেননি। অনেক পরে তিনি ব্যাঙ্কে টাকাটা জমা রেখেছিলেন। সাক্ষী আরো বলেন যে, ওভারড্রাফট গ্রহণের সুবিধার জন্য তিনি পরে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেন। কিন্তু আটারকল স্থাপনের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা লাগতে পারে জেনে তিনি সে পরিকল্পনাটি পরিত্যাগ করেন।
প্র ঃ ব্যাঙ্ক থেকে ৪ হাজার টাকা আপনি তুলেছিলেন কি জন্যে?
উ ঃ একজনকে ধার দেওয়ার জন্যে।
প্র ঃ যখন আপনি ডায়েরী দুটো উদ্ধারের জন্য পুলিসকে একটি চিরকূট দেন তখন কি আপনার ব্যক্তিগত ডায়েরীর কথাও বলতে চেয়েছেন?
উ ঃ না।
প্র ঃ আর কোন ব্যাঙ্কে আপনার টাকা জমা আছে?
উ ঃ হ্যাঁ, ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্কিং করপোরেশনে।
প্র ঃ না, আপনি আর একটা এ্যাকাউন্ট অর্থাৎ পোষ্টাল সেভিংস এ্যাকাউন্টস এর কথা চেপে যাচ্ছেন?
উ ঃ না, পূর্ব পাকিস্তানে আর নেই, করাচীতে আছে।
প্র ঃ সুতরাং দেখা যাচ্ছে, করাচীতে আপনার দুটো এ্যাকাউন্ট–ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক আর পোষ্টাল সেভিংস-এ এক্যাউন্ট রয়েছে–
উ ঃ না, সেখানে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ইউনিভারসিটি ব্রাঞ্চে একটা এ্যাকাউন্ট ছিল।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলন চালাইয়া তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী বন্ধুদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করার কোন ইচ্ছা করেন নাই।

প্র ঃ ইণ্ডিয়ান ইলিমেণ্টস বলতে আপনি কি বোঝেন?
উঃ ভারতীয় নাগরিক বোঝাই।
প্রঃ পশ্চিম পাকিস্তানী ইলিমেণ্টস বলতে কি বোঝেন?
উ ঃ পাকিস্তানের যে সমস্ত লোক পূর্ব পাকিস্তানে বাস করে।
প্র ঃ এই আদালতেই আপনি বলেছিলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিব নাকি পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে বিতাড়িত করতে চান বলে জানান ;... এর মানে কি তিনি পূর্ব পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানীদের শত্রুভাবাপন্ন করে তুলতে চেয়েছিলেন?
উ ঃ হ্যাঁ, তাই বটে।
প্রঃ ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের মিসকা হোটেলে অনুষ্ঠিত কথিত মিটিং-এ নাকি লেঃ মোয়াজ্জেম বলেছিলেন (আপনার কথামতো) শেখ মুজিবুর রহমান ভারত থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও টাকা-পয়সা আনার ব্যবস্থা করবেন। ওই মিটিংয়ে লেঃ হক বলে একজন নবাগত উপস্থিত ছিলেন; কাজেই আগের কথাগুলো সেখানে বলে গুরুত্বপূর্ণ গোপন খবর ফাঁস করে দেয়া হলো না?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, হয়েছে।
ইহার পর সাক্ষী বলেনঃ সুলতানউদ্দীনের সঙ্গে ষ্টুয়ার্ড মুজিব ও খুরশীদের মতানৈক্যের কথা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দীতে বলেছি কিনা মনে নেই। পরবর্তী সভা সম্পর্কে এই একই মিটিং-এ আলোচনা হয়। পরের দিনের অর্থাৎ ৬ই ফেব্রুয়ারীর সভায় অন্যান্যদের সঙ্গে ডঃ শহীদুর রহমান, মানিক চৌধুরী, বিধান সেন ও সুবেদার রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই আমি মানিক চৌধুরীর কাছে তিন হাজার টাকা চাই। মানিক চৌধুরী আমাকে পরের দিন ৭ই ফেব্রুয়ারী সকালে ঐ টাকাটা দেন।
প্র ঃ ইতিপূর্বে না আপনি বলেছিলেন, মানিক চৌধুরী আপনাকে ওই সভাতেই টাকা দিয়েছেন?
উ ঃ না, ওই সভাতে আমি টাকাটা চাই, পরের দিন তিনি আমাকে দেন।

সাক্ষী আরো জানান যে, ঐ সময় তাহার কাছে তিন হাজার টাকা ছাড়া আর টাকা ছিল না। মিসকা হোটেলে তিনি একবেড বিশিষ্ট ধরে রোজ ৯ টাকা করে ভাড়া দিতেন। চট্টগ্রামে তিনি পার্টির কাজেই গিয়েছিলেন। হোটেল রেজিষ্টারে তাঁহার নিজের নামই লেখা হয়, তবে তিনি কোন ঠিকানা এবং তাঁহার সরকারী পরিচয় দিয়াছিলেন কিনা, মনে করিতে পারেন না।

এই সময় কৌসুলী মিসকা হোটেলের রেজিষ্টার বইয়ের একটি পাতা খুলিয়া সাক্ষীর নাম, রুমনং ও ঠিকানা পড়িয়া শোনান। উহাতে সাক্ষীর সরকারী পদ ও অফিসের ঠিকানা দেওয়া রহিয়াছে।

প্র ঃ মানিক চৌধুরীকে আগে চিনতেন?
উ ঃ এই সভার আগে চিনতাম না, তবে তাঁর নাম শুনেছি।
ইহার পর সাক্ষী জানান যে, তিনি চট্টগ্রাম হইতে ঢাকা ফিরিয়া লেঃ মোয়াজ্জেমকে টেলিগ্রাম করেন পরে আরজু হোটেলে ওঠেন।
সাক্ষী অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেনঃ জনাব এ,এফ, রহমান দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন এবং তাঁহার সহিত শেখ মুজিবের সম্পর্ক কিছুটা তিক্ত ছিল বলিয়া তিনি শেখ মুজিবের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন; কিন্তু উহা তিনি লিঃ মোয়াজ্জেমকে জানান নাই। সাক্ষী জানান, জনাব এ, এফ, রহমানের কাছে আওয়ামী লীগের তহবিল রাখা হইত এবং তিনি এই তহবিলের অপব্যবহার করিয়াছে বলিয়া শেখ মুজিবর রহমান অভিযোগ করেন।
প্র ঃ এ খবরটি আপনি মেজিস্ট্রেটের কাছে বলেছিলেন?
উ ঃ না।
প্র ঃ তার মানে চিন্তাটা আপনার মাথায় এখুনি ঢুকেছে?
উ ঃ না। আপনি জিজ্ঞাসা করায়ই এটা আমি বললাম।
প্র ঃ প্রতিরোধ বাহিনী বা সশস্ত্র বিপ্লব সম্পর্কে কোন বইপত্র পড়েছেন?
উ ঃ না।
কৌসুলীর অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী স্বীকার করেন একপত্রে লেঃ মোয়াজ্জেম তাঁহাকে বারণ করা সত্ত্বেও তিনি ঢাকায় ঘর ভাড়া লইয়াছিলেন। তিনি আরও জানান যে,ঘর ভাড়া লইবার পূর্বে তিনি এক কিম্বা দুমাস আরজু হোটেলে ছিলেন কিনা উহা তাঁহার মনে নাই। তিনি '৬৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তাঁহার অফিসে ঢাকা হোটেলের ঠিকানা দেন। কিন্তু ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ফিরিয়া আসিয়া আরজু হোটেলে ওঠেন।
প্র ঃ আরজু হোটেলে কতদিন ছিলেন?
উ ঃ মনে নাই।
প্র ঃ আপনার নতুন ঠিকানা অফিসকে বলেছিলেন?
উ ঃ হ্যাঁ, বলেছি।
প্র ঃ মুখে,না কাগজে লিখে?
উ ঃ মুখে।
প্র ঃ অফিসে আপনার কি নাম ছিল?
উ ঃ আমার আসল নাম।
প্র ঃ কিন্তু 'আরজু হোটেলে' আপনার নাম আবদুর রহিম বলে লেখা ছিল ! তাহলে অফিস কিভাবে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করত?
উ ঃ আমার নিজের নামে।

প্রশ্ন ঃ এই সময় কোন চিঠিপত্র পেতেন? কোন ঠিকানায়?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, ২০/৩ গোপীবাগের ঠিকানায়।
প্রশ্ন ঃ কোন নামে?
উত্তর ঃ কখনো আমার সাংকেতিক নামে। কখনো আসল নামে।
প্রঃ ঠিকানা বদলানোর কথা লেঃ মোয়াজ্জেমকে জানিয়েছিলেন?
উ ঃ হ্যাঁ, জানিয়েছিলাম।
কৌসুলীর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী স্বীকার করেন যে, অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ছাড়া বিপ্লবের সাফল্য সম্ভব নয় এবং দিনক্ষণ লইয়া শেখ মুজিবুর রহমান ও লেঃ মোয়াজ্জেমের সহিত মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়।
প্র ঃ অস্ত্র ছাড়াই কি শেখ মুজিব বিপ্লব করতে চেয়েছিলেন?
উ ঃ না।
প্র ঃ সেসময় কোন অস্ত্রশস্ত্র আপনার দল সংগ্রহ করেছিল?
উ ঃ যতদিন আমি দলে ছিলাম, ততদিন কোন অস্ত্রই সংগ্রহ করা হয়নি।
সাক্ষী পরে অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, নতুন সদস্য ভর্তি করা তাহার অন্যতম কাজ হইলেও তিনি কাহাকেও দলে ভর্ত্তি করেন নাই। সাক্ষী জবাবদান প্রসঙ্গে এক জায়গায় "ইনডক্টিনেশন" দীক্ষাদান কথাটি ব্যবহার করেন।
প্র ঃ ইনডক্টিনেশন বলতে আপনি কি বোঝেন?
উ ঃ আমাদের 'স্পিরিট', 'ইডিওলজি' ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলনে লোককে টেনে আনাই 'ইনডাক্টিনেশন।'
প্র ঃ কেমন করে আপনি 'ইনডক্টিনেট' করতেন, বলুনত?
উ ঃ এখানে নয়, আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি।
সাক্ষীর এই জবাবে আদালতে মৃদু হাস্যধ্বনি শোনা যায়।
কৌসুলী ঃ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে যা বলতে পারেন আপনি সেটা এখানে বলতে চান না?
তার মানে এখানে আপনি সত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন।
উ ঃ না, স্যার।
প্র ঃ তাহলে বলুন?
উ ঃ পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের স্বাধীনতা চাই ... পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বৈষম্য রয়েছে ... এই আর কি।
প্রঃ অর্থাৎ এর বেশী কিছু জানে না?
উঃ না, আরও আছে।
চেয়ারম্যান ঃ কি সেগুলো বলুন?
সাক্ষীঃ পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হচ্ছে.... পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানে বেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে...। এইসব আর কি।

প্র ঃ এই সব?
উ ঃ জী হ্যাঁ।
প্র ঃ নতুন লোককে রিক্রুট করার সময় আপনি পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য শুধু এটাই বলতেন?
উত্তর ঃ না, আমি তাদের সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও বলতাম।
প্রশ্ন ঃ কিভাবে এ সশস্ত্র বিপ্লব করতে হবে সে কথা বলতেন?
উ ঃ হ্যাঁ। বলতাম। ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করার পরিকল্পনা ...।
প্র ঃ আপনি তাদেরকে বর্ষা মৌসুমে ডি-ডে'র কথা বলেছেন?
উ ঃ হ্যাঁ, বলেছি।
প্র ঃ বর্ষা মৌসুম বলতে ষ্টুয়ার্ড মুজিব আপনাকে কোন মাসের কথা বলেছিলেন?
উ ঃ ১৯৬১ সালের জুন ও জুলাই মাস।
প্র ঃ সেটা কি 'ডি-ডে', না 'ডি-ডেসমূহ' একবচন না বহুবচন?
উ ঃ সেটা ডি-ডে–অর্থাৎ দি ডে ফর এ্যাকশন।

ইহার পর কৌসুলির অপর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি তাঁর জবানবন্দীতে 'সার আবদুর রাজ্জাক' কথাটি বলেননি।

নতুন সদস্য বলে উল্লেখিত আশরাফ আলী খান আমাকে ক্যান্টনমেন্টের একটি স্কেচ ম্যাপ দেন। তবে তা ব্যাখ্যা করার জন্য আমি তাকে বলিনি।

অতঃপর চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এফ,এ,রহমান আগামী বৃহস্পতিবার সকাল নয়টা পর্যন্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করেন।

সংবাদ

১৬ই আগস্ট ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

জেরার ৬ষ্ঠ দিবসে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া স্বীকার করেন– ১৯৫০-৫১ সালে তিনি আমীর মোল্লার মেয়ে হাজেরাকে প্রথম বিবাহ করিয়াছিলেন

(নিজস্ব বার্ত্তা পরিবেশক)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আতাউর রহমান খানের জেরার উত্তরে স্বীকার করেন যে, ১৯৫০-৫১ সালে মেট্রিক পাশের পর জনৈক আমীর মোল্লার কন্যা মোসাম্মৎ হাজেরাকে তিনি বিবাহ করেন এবং ১১

বৎসর পর তাহাকে তালাক দেন। উপরোক্ত স্ত্রীর গর্ভে একটি সন্তান হইয়া পরে মারা যায়। ইতিপূর্বে বিবাদীপক্ষের কৌসুলির জেরার উত্তরে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া ১৯৬৭ সালে তাহার পরবর্তী বিবাহকে প্রথম ও একমাত্র বিবাহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। জেরার উত্তরে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া চাকুরীকালে গম ও পাটের ব্যবসা করিতেন বলিয়াও স্বীকার করেন।

গতকাল বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে ষড়যন্ত্র মামলার শুনানিকালে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব ইসমাইল, জনাব নাজিরউদ্দীন ও সর্বশেষে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান রাজসাক্ষী আমীর হোসেনকে জেরা করেন।

পূর্বদিনের জের টানিয়া গতকাল বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়াকে জেরা শুরু করেন। কৌসুলির বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ "আমি জানি, ভারতে মুসলিম সংখ্যালঘুরা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করছে। আমি ইহাও জানি যে, ভারত তার আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি লংঘন করে কাশ্মীরে বেআইনীভাবে দখল অব্যাহত রেখেছে। আমি জানি সেপ্টেম্বর যুদ্ধকালে কুর্মিটোলা, যশোর ও রংপুরে ভারতীয় বিমান বোমা বর্ষণ করে।"

বিবাদীপক্ষের কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ

"আমি চট্টগ্রাম সম্পর্কে স্মরণ করতে পারছি না। আমি জানি না পূর্ব পাকিস্তানীদের দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল ও অপ্রতুল হবে কি না। আমি জানি না যদি ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার বা পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক পারসোন্যালদের সাহায্য ব্যতিরেকে দেশের এই অংশ অসহায় হয়ে পড়বে কিনা। ভারতের সাথে সেপ্টেম্বর যুদ্ধের পর ভারতের সাথে সম্পর্কের প্রশ্নে আমাদের দলীয় বৈঠকে কোন আলোচনা হয়নি। এটা ঠিক নয় যে, এই আদালতে চিঠি ও ডাইরী সম্পর্কে আমি যে সাক্ষ্য দিয়েছি, তা' সত্য নয়। এটা ঠিক নয় যে, এসব দলিল জাল।"

ইহার পর কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান আদালতের অনুমতিক্রমে কিছু সময়ের জন্য বাহিরে যান এবং তদস্থলে জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল জেরা শুরু করেন।

জনাব আবদুস সালাম খানের পর বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলি খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন।

প্রশ্ন ঃ ঢাকা বিমান বন্দরে আপনার গ্রেফতারকালে একজন ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিস অফিসার ছাড়াও ২ জন সাদা পোশাক পরিহিত লোক উপস্থিত ছিলেন বলে ইতিপূর্বে আপনি জানিয়েছেন তাঁদের পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন?
উ ঃ জী হ্যাঁ। তাঁরা দু'জনেই স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক বলে আমাকে বলেন।
প্র ঃ বিমান বন্দরে তাঁরা আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?
উ ঃ না।
প্র ঃ স্বেচ্ছায় তাঁদের কাছে কোন জবানবন্দী দিতে চেয়েছিলেন ?
উ ঃ না।
প্র ঃ আপনাকে কখন জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়?
উ ঃ ১৯৬৭-এর ১৩ই ডিসেম্বর রাত্রি ৮টা থেকে ১১টা রাজারবাগ পুলিস কেন্দ্রে।
প্র ঃ রাজারবাগ কখন আপনাকে নেয়া হয়?
উ ঃ ওইদিন বেলা আড়াইটা থেকে তিনটের মধ্যে।
প্র ঃ ওই সময় আপনি কোথায় ছিলেন এবং আপনাকে কেউ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?
উ ঃ আমি রাজারবাগেই ছিলাম এবং কেউ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি।

এই প্রসঙ্গে কৌসুলির অন্যান্য প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, তাঁহাকে রাজারবাগ পুলিস কেন্দ্রের একটি ঘরে রাখা হয়। ঘরের ভিতর শুধু একজন ওয়াচার ছিল এবং তখন বহু লোককে তিনি রাজারবাগ পুলিস কেন্দ্রে আসতে-যেতে দেখেন; কিন্তু কেহ তাঁহাকে এই সময় জিজ্ঞাসাবাদের চেষ্টা করে নাই।

প্রশ্ন ঃ ডিএসপি মান্নাফকে আপনি আসতে দেখেছিলেন?
উ ঃ না।
প্র ঃ ঘরে বসে আপনি কি করছিলেন?
উ ঃ বসে বসে ধূমপান করছিলাম।
প্র ঃ মধ্যাহ্ন ভোজ করেন কখন?
উ ঃ ওখানেই বিকেল চারটেয়।
প্র ঃ খাওয়ার সময় মিঃ মান্নাফ কি সেখানে এসেছিলেন?
উ ঃ না।

সাক্ষী আরও বলেন, আমি সেদিন বিমানে নাস্তা খাই, কিন্তু আমি নাস্তা খাওয়ার ঠিক সময় বলতে পারি না। বিমানখানি বেলা ১২টা কিম্বা সাড়ে ১২টা নাগাদ ঢাকা পৌঁছে। আমি বেলা ৪টার আগে মধ্যাহ্নের খাওয়ার ফরমায়েশ দেই নাই। তাঁরা আমাকে রোজা আছি কিনা জিজ্ঞাসা করলে আমি তাঁদের রোজা নাই বলে জানাই। এরপর তাঁরা আমাকে খাবার এনে দেন।

আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় আমি বসেই ছিলাম। সেসময় আমার সামনে একটা টেবিল ছিল। যাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, তাঁরা টেবিলের আর এক পাশে বসেছিলেন। কেবলমাত্র জনাব মান্নাফই আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন আর দুজন তাঁর পাশে বসা ছিলেন। ওই দুজন লোক আমাকে কোন প্রশ্ন করেননি। আমাকে প্রশ্ন করার সময় জনাব মান্নাফের কাছে একটি বিরাট বড় ডাইরী ছিল। আমি প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দিলে তিনি তাঁর ডাইরীতে কি সব লিখে রাখছিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় জনাব মান্নাফ সাদা পোশাকে ছিলেন। তিনি আমার কাছে তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন।

১৮ই জানুয়ারী তারিখে আমাকে সেন্ট্রাল জেল থেকে সামরিক হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৬৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর থেকে আনুমানিক ২৩শে ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে রাখা হয়, আর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকে। এরপর আমাকে সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এই অন্তর্বর্তীকালের মধ্যে জনাব মান্নাফ ছাড়া আরো দুজন কিম্বা তিনজন লোক আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আমি তাঁদের কারু নাম জানি না। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাঁরাও কি সব বিষয় লিখে নেন। ১৩ই ডিসেম্বর থেকে ২৩ শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে আমাকে কতবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, তা আমি বলতে পারি না। ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ১৯ শে জানুয়ারী তারিখের মধ্যে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেননি।
প্র ঃ সিগন্যাল মেসে আপনার জবানবন্দী কে নেন?
উ ঃ ইন্সপেক্টর আহসানউল্লাহ নামের জনৈক তদন্তকারী অফিসার ১৯৬৮-এর ১৯শে জানুয়ারী সিগন্যাল মেসে আমার জবানবন্দী রেকর্ড করেন।
প্র ঃ কতক্ষণ ধরে সেটা চলে?
উ ঃ সারাদিন ধরে।
প্র ঃ কিভাবে তিনি রেকর্ড করছিলেন?
উ ঃ তিনি আমাকে প্রশ্ন করছিলেন আমি জবাব দিচ্ছিলাম।
প্র ঃ রাজারবাগে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছিল, তদন্তকারী অফিসার সেই সব প্রশ্নই করছিলেন?
উ ঃ না, একই রকম না। বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন তিনি করছিলেন।
প্র ঃ ১৯৬৮-এর ১৯ শে জানুয়ারী থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আর কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?
উ ঃ না।
প্র ঃ আপনি স্বীকারোক্তি করার জন্য কবে মনস্থির করেছিলেন?
উ ঃ ১৮ই জানুয়ারীর রাতে জেল থেকে আমাকে নিয়ে আসার পরই স্বীকারোক্তি করার সিদ্ধান্ত করি।

প্র ঃ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি দেওয়ার আগে আপনি যে ঘরে বসেছিলেন সেখানে কি করছিলেন?
উ ঃ বসে বসে সিগারেট খেতে খেতে ভাবছিলাম।
প্র ঃ আপনি কি স্বীকারোক্তি করার জন্যে চিন্তা করছিলেন?
উ ঃ না, সে সিদ্ধান্ত আমি আগেই নিয়েছিলাম।
প্র ঃ লেঃ শরীফকে ঐ সিদ্ধান্ত জানাবার পূর্বে আপনি তা আর কাউকে জানিয়েছিলেন?
উ ঃ না।
প্র ঃ লেঃ শরীফকে আপনার সিদ্ধান্তের কথা কখন বলেন?
উ ঃ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নেওয়ার আগের দিন।
প্রশ্ন ঃ মেজর নাসের আপনার সঙ্গে দেখা করতেন?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, তিনি রোজই আসতেন। তিনি আমার এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ছিলেন।
প্র ঃ তিনি আপনাকে কবে রাজসাক্ষী হতে বলেন?
উ ঃ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আমার জবানবন্দীর কয়েকদিন আগে।
প্র ঃ ম্যাজিস্ট্রেট আপনার জবানবন্দী যা লিখেছেন, তা কি আপনিই বলেছেন? মৌখিক, না লিখিত ভাবে?
উ ঃ মৌখিকভাবে।
কৌসুলির অপর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ "এটা ঠিক যে, ১৯৬৫ সনের ২৮শে অক্টোবর আমরা যখন ঢাকায় আসি ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও এল,এস,সুলতানউদ্দিন বিমানবন্দরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও এল এস সুলতানউদ্দিন ঢাকা হোটেলে অবস্থান করেছিলেন বলে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আমি যে জবানবন্দী করে ছিলাম তা মিথ্যা নয়। তাঁরা আমাকে বলেন যে,তাঁরা ২৮শে অক্টোবরের পূর্ব থেকেই সেখানে অবস্থান করছিলেন। আমি ঢাকা হোটেলে থাকতাম বলে পুলিসের নিকট যে জবানবন্দী করি তা মিথ্যা নয়। এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল যে, ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমার সমস্ত সাক্ষ্য মিথ্যা। এটা ভুল যে, জনাব রুহুল কুদ্দুস শেখ মুজিবর রহমানের বন্ধু নয়–তাঁর পরিচিত মাত্র। শেখ মুজিবর রহমান আমাকে বলেছিলেন যে, ১৯৪১ সনে তাঁরা একই হোটেলে থাকার সময় থেকেই জনাব রুহুল কুদ্দুস তাঁর বন্ধু।
প্র ঃ ধানমণ্ডীতে জনাব তাজউদ্দীনের বাসায় অনুষ্ঠিত কথিত সভার তারিখ কি আপনি পুলিসকে বলেছিলেন?
উ ঃ মনে পড়ছে না।

প্রঃ পুলিসের কাছে প্রদত্ত প্রথম বিবৃতিতে আপনি কি একথা বলেননি যে, ১৯৬৬-এর এপ্রিল মাসের পয়লা সপ্তাহে জনাব তাজউদ্দীনের বাসায় সভা হবে বলে লেঃ মোয়াজ্জেম আপনাকে বলেছিলেন?
উ ঃ না, বলিনি।
প্রঃ পুলিসের কাছে আপনার দ্বিতীয় বিবৃতিতে ১৯৬৬-এর মার্চ/এপ্রিলে এই সভা হয়েছিল বলে বলেননি?
উঃ না, বলিনি।
১৯৬৬-এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত।
প্র ঃ আপনার এই মত বদলানোর কারণ কি?
উঃ কায়েদে আজমের জীবনী পড়ে বুঝলাম–আমি আমার মত বদলাই।
প্রঃ কায়েদে আজমের জীবনী আপনি কবে পড়েছেন?
উঃ ১৯৬৭-এর ১৫ই কিম্বা ১৬ই এপ্রিল।
প্রশ্নঃ বইটির নাম কি? কে লিখেছেন?
উঃ বইয়ের নাম ও লেখকের নাম ভুলে গেছি। তবে লেখক একজন ইংরেজ ছিলেন।
প্রঃ কত পৃষ্ঠার বই?
উ ঃ তাও বলতে পারি না।
প্রঃ কোথায় পেয়েছিলেন?
উঃ কিনেছিলাম। নিউ মার্কেটের একটা বইয়ের দোকান হতে।
প্রশ্নঃ ওই বই পড়ার আগে কায়েদে আজমের জীবনী আপনি পড়েননি?
উ ঃ না।
প্রঃ কায়েদে আজমই যে পাকিস্তানের স্বাধীনতা এনেছেন তা জানেন?
উঃ জানি।
প্রঃ লাহোর প্রস্তাবের কথা শুনেছেন?
উ ঃ শুনেছি।
প্র ঃ কিভাবে ওই বইটা আপনার ওপর প্রভাব বিস্তার করল?
উ ঃ ভারত মুসলমানদের সহিত যে আচরণ করছে, ওই বইয়ে তার বিবরণ ছিল তাতেই আমার সব মত বদলে যায়।
প্র ঃ মোয়াজ্জেম আপনার কাছে যে যুক্তি দিয়েছিলেন তা কি করে আপনি বাদ দিলেন?
উ ঃ ওই বইটাই সে যুক্তি খণ্ডন করতে আমাকে সাহায্য করেছিল।

বিবাহ প্রসঙ্গ–

প্রঃ হামিদ মোল্লাকে চেনেন? তার ভাই সামাদ মোল্লা?
উ ঃ হ্যাঁ, দুজনকেই চিনি।

প্রঃ জামালউদ্দীন মাল কে?
উঃ আমার ভগ্নিপতি।
প্রঃ ওমর?
উঃ তাঁর ছেলে। ওমর হলো ডাক নাম, তার ভালো নাম আবদুস সামাদ।
প্রঃ গ্রামে আপনার জমি-জমা আছে?
উঃ আছে।
প্রঃ ওই জমি-জমা কি বর্গায় দেন?
উঃ জী হ্যাঁ।
প্রঃ আপনি ম্যাট্রিক পাসের পরে আমীর মোল্লার মেয়ে মোসাম্মৎ হাজেরাকে বিয়ে করেছিলেন?
উঃ হ্যাঁ, আমি ১৯৫০/৫১ সালে আমীর মোল্লার মেয়ে হাজেরাকে বিয়ে করি।
প্রশ্নঃ আপনি কি ১৯৬১ সালে তাকে তালাক দেন?
উত্তরঃ জী হ্যাঁ, আমি হাজেরাকে '৬০ কি ৬১' সালে তালাক দিই।
প্রঃ আপনার প্রথম স্ত্রীর দুই ভাই হলেন হামিদ মোল্লা ও সামাদ মোল্লা?
উ ঃ জী হ্যাঁ।
প্রঃ তাহলে এ আদালতে আপনি জেরার সময় বলেছিলেন যে, ১৯৬৭ সালের আগে আপনার কোন বিয়েই হয়নি, তা মিথ্যে কথা?
সাক্ষী এই প্রশ্নের জবাবে বলেনঃ আমি মিথ্যা বলিনি। ১৯৬৭ সালের বিয়েকে আমি এই আদালতে প্রথম বিয়ে বলেছিলাম এজন্যে যে, এই বিয়েই একমাত্র আমি নিজে করেছি। আর আগের বিয়ে আমার বাপ করিয়েছিলেন।

কৌঁসুলি জনাব আতাউর রহমান খান এই সময় সাক্ষীর স্ত্রী হাজেরার নিকট লিখিত সাক্ষীর একখানি চিঠি আদালতের সামনে পেশ করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ
"এই চিঠি আপনার লেখা?"
উ ঃ হ্যাঁ, আমার লেখা।
চেয়ারম্যানঃ (কৌঁসুলির প্রতি) এ প্রশ্নের সঙ্গে মামলার সম্পর্ক কি?
কৌঁসুলি ঃ মাননীয় বিচারপতি সাক্ষী ১০/১১ বছর যাবৎ এই মহিলার সঙ্গে বিবাহিত জীবনযাপন করে তাকে তালাক দিয়েছেন এবং সে সম্পর্কে তাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি।
প্র ঃ বিমান বাহিনীতে কি আপনার ৭১১৪৯, বিলেট নম্বর ৫২/৩ ছিল?
উ ঃ জী হ্যাঁ।
প্রশ্ন ঃ আপনার প্রথমা স্ত্রী হাজেরার গর্ভে একটি সন্তান হয়?
উঃ হ্যাঁ ছিল। সে মারা যায়।

প্রঃ আপনি হাজেরাকে তালাক দিলেন কেন?
উঃ মতানৈক্যের জন্যে। আর তাছাড়া তাকে আমি পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম সে রাজী হয়নি।
প্রঃ ওই মতানৈক্য কবে শুরু হয়?
উঃ ১৯৫৬ সালে।
প্রঃ কতদিন ছিল?
উঃ তালাক দেয়া পর্যন্ত।
প্রঃ কবে থেকে তার প্রতি আপনার ভালোবাসায় ঘুন ধরতে থাকে?
উ ঃ তা আমার মনে নেই।
প্রঃ তারপরেও ১৯৫৮ সালের নভেম্বরে লেখা এই চিঠিতে আপনি আপনার স্ত্রীকে 'প্রিয়তমা' বলে সম্বোধন করেছেন?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমার স্ত্রীকে আমিত তাই বলে সম্বোধন করব।
চেয়ারম্যান (কৌঁসুলির প্রতি) ঃ এই মামলায় আপনার এই প্রশ্ন কিভাবে প্রাসঙ্গিক আমাকে বলুন।
কৌঁসুলিঃ মাননীয় বিচারপতি, রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া যে আদালতে সর্বক্ষণ অসত্য সাক্ষ্য দিয়েছেন , তিনি যে কত বড় মিথ্যুক, ঘন ঘন যে তার মত বদলান সেটাই আদালতে প্রমাণ করা এই মামলায় প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছি।
প্রশ্নঃ (সাক্ষীর প্রতি) আর সেই সময় (১৯৫৮) আপনার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা ছিলেন, ঠিক নয় কি?
উঃ আমার মনে পড়ছে না।
প্রঃ সেজন্য তাকে ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ সাবধান হতে বলেছিলেন?
উঃ হতে পারে।
প্র ঃ আপনি প্রত্যেক রাতেই তাকে স্বপ্নে দেখেন এ কথা বলেননি?
উঃ তা আমার মনে পড়ছে না।
কৌঁসুলি সাক্ষীর হাতে স্ত্রীর কাছে লেখা তাঁর চিঠিটি তুলিয়া দিয়া বলিলেনঃ শেষের দু'লাইন পড়ুন দেখি।
সাক্ষী উহা পড়িয়া বলিলেন, হ্যাঁ চিঠিতে আমি দেখছি যে, আমি প্রত্যেক রাতে আমার স্ত্রীকে স্বপ্ন দেখতাম বলে লিখেছি।
প্রঃ চিঠির তারিখটা পড়ুনতো?
উঃ ২১শে নভেম্বর ১৯৫৮ সাল, ইহার পর কৌঁসুলি তাহার হাতে বাংলায় লিখিত কয়েকটি লাইনের একটি অনুচ্ছেদ দিয়া উহা ইংরেজীতে অর্থ করিতে বলেন।

চেয়ারম্যান (সাক্ষীর প্রতি) আপনি ওটা পড়ুন।

সাক্ষী ইংরেজীতে উহা পড়িতে শুরু করিলেনঃ এর অর্থ ঃ "সিরাজউদ্দৌলা বলেছিলেন, যুগে যুগে মীরমদন ও মোহনলালের মত লোক স্বাধীনতার জন্য জন্মগ্রহণ করবেন। তাদের পাশে তাদের ধ্বংসের জন্য মীরজাফর, উমীচাদ থাকবে। আমি নিজেও একজন বাঙ্গালী। আমিও শেষ দলের একজন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।"

কৌঁসুলি জনাব আতাউর রহমান খান পুনরায় প্রশ্ন করিলেনঃ ইয়াসিন আখন্দের ছেলে নূরুল হককে চেনেন?

উ ঃ হ্যাঁ চিনি।

প্রঃ লাউফলী বাজারে তার সঙ্গে আপনি পাটের ব্যবসা করতেন?

উঃ জী হ্যাঁ, গত বছরে আমি তার সঙ্গে পাটের ব্যবসা করতাম, তবে তা দু'তিন মাস যাবৎ ছিল।

প্রঃ নুরুল হক আপনার খুব ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন?

উঃ না, তেমন বন্ধু নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনার পরামর্শ মতই নুরুল হককে শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে এই মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করার উদ্দেশ্যে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আনা হয়নি কি?

উ ঃ না।

প্রঃ নুরুল হক তা সত্ত্বেও মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজী হয়নি?

উঃ তা জানি না।

প্রশ্নঃ সেন্ট্রাল ষ্টাটিষ্টিক্যাল অফিসে চাকুরী করার সময় আপনার গমের ব্যবসা ছিল না?

উঃ জী হ্যাঁ, ছিল।

প্র ঃ আপনি ১০৭ নম্বর ডি,এন, সেন রোডে আপনার বাসায় গম রেখেছিলেন না?

উঃ জী, হ্যাঁ রাখতাম।

প্রঃ ও বাড়ীতে কটা ঘর?

উঃ পাঁচ ছটা হবে।

প্রঃ অনুমতি না নিয়ে গম রাখার জন্য বাড়ীর মালিক আপনাকে ওই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন কি?

(অসমাপ্ত)

সংবাদ

১৬ই আগস্ট ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা সংক্রান্ত রীট
৩০শে অক্টোবর শুনানীর তারিখ ধার্য করা হইবে

ঢাকা,১৫ই আগষ্ট (পিপিআই)।– রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যের ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ টাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া যে রীট আবেদন পেশ করা হয়, আগামী ৩০শে অক্টোবর উহার শুনানীর দিন ধার্য করা হইবে বলিয়া অদ্য ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বি,এ,সিদ্দিকী, বিচারপতি জনাব সালাহ উদ্দীন ও বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম সমবায়ে গঠিত স্পেশ্যাল বেঞ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়ামস গত ৫ই আগষ্ট আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে উপরোক্ত রীট আবেদন পেশ করেন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিশেষ ট্রাইব্যুনালের গঠন কেন অবৈধ ঘোষণা করা হইবে না উহার কারণ দর্শাইবার জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি রুলনিসি জারী করেন।

অদ্য আদালতের অধিবেশন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটি এটর্নী জেনারেল জনাব নূরুল হুদা রাষ্ট্রের পক্ষে আদালতে এই আবেদন করেন যে, যেহেতু সমস্ত সমন এখনও ফেরত পাওয় যায় নাই সেহেতু হাইকোর্টের ছুটির পর শুনানীর তারিখ ধার্য করা হউক। ডেপুটি এটর্নী জেনারেল তাঁহার আবেদনে বলেন, অবশ্য ইতিমধ্যে যত শীঘ্রই সম্ভব সমনাদি ফেরত পাওয়া যাইতে পারে।

স্পেশাল বেঞ্চ বিবাদীপক্ষকে বাদীপক্ষের আবেদনের জবাব অদ্য হইতে চার সপ্তাহের মধ্যে এবং বাদীপক্ষকে বিবাদীপক্ষের সেই জবাব দাখিলের দিন হইতে তিন সপ্তাহের মধ্যে উহার জবাব দাখিলের অনুমতি দেন।

ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম, ব্যারিষ্টার মঈনূল ইসলাম ও ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ আবেদনকারীর পক্ষে আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক পাকিস্তান

১৬ই আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
একরারী সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার জেরা অব্যাহত

(স্টাফ রিপোর্টার)

"আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার" দু'নম্বর একরারী সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার জেরা গতকাল বৃহস্পতিবারও অব্যাহত থাকে। গতকাল ছিল বিবাদীপক্ষের জেরার ষষ্ঠ দিবস।

গতকাল বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান কিছুক্ষণ জেরা করার পর তার জেরা অসমাপ্ত রাখেন ও ট্রাইব্যুনালের অনুমতি নিয়ে পরে আবার জেরা করার অধিকার রেখে বিবাদীর পক্ষের অন্যান্য কৌসুলীদের জেরার সুযোগ দেন।এরপর খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল, খান বাহাদুর নাজিরুদ্দীন এবং জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীকে জেরা করেন। জনাব ইসমাইল, জনাব নাজিরুদ্দীন ও জনাব আতাউর রহমান খান গতকাল তাঁদের জেরা সমাপ্ত করেন। জনাব আবদুস সালাম খান আজ শুক্রবার তাঁর অসমাপ্ত জেরা আবার শুরু করবেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়াকে জিজ্ঞেস করেন যে, ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানগণ যে করুণ অবস্থার মধ্যে বসবাস করছেন সে খবর তিনি রাখেন কিনা।

সাক্ষী জানান যে, তিনি সে খবর জানেন।

প্র–কে জি আহমদ যে এই মামলার একজন সাক্ষী সেকথা আপনি জানেন কি?

উ–জি হ্যাঁ।

প্র–আপনি কি জানেন যে, কে জি আহমদ বলেছিলেন যে, তিনি উভয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না।

উ–না, আমার জানা নেই।

এরপর বিবাদী কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান সাক্ষীকে জেরা করতে শুরু করেন।

আতাউর রহমান খান

প্র–আপনি যে একজন আসামী না হয়ে একরারী সাক্ষী হয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন এর জন্য কি আপনি খুশী?

উ–হ্যাঁ।

প্র–স্বীকারোক্তি করার অর্থ কি আপনি কি তা জানতেন?

উ–হ্যাঁ।

প্র–আপনি কি ঠিক জানতেন যে, কোথায় আপনাকে স্বীকারোক্তি করতে হবে?

উ–না, তা আমার জানা ছিল না।

প্র–আপনি স্বীকরোক্তি করার জন্য নিজেই কি বিবৃতিটা তৈরী করেছিলেন?

উ–না, কোন লিখিত বিবৃতি তৈরী করিনি।

প্র–আপনার কাছে কি স্বীকারোক্তির সময় কোন কাগজপত্র ছিল?

কোন নোট?

উ–না। আমার কাছে কোন কাগজপত্র ছিল না।

প্র–স্বীকারোক্তির সবকিছুই আপনার মনে ছিল?

উ–হ্যাঁ।

প্র–আপনার স্বীকারোক্তি রেকর্ড করতে ম্যাজিস্ট্রেটের কতক্ষণ সময় লেগেছিল?

উ–সকাল ৯টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত।

প্র–এর মধ্যে কি কোন বিরতি ছিল?

উ–না।

প্র–কত পৃষ্ঠা হয়েছিল আপনার স্বীকারোক্তি?

উ–আমার ঠিক মনে নেই।

প্র– ম্যাজিস্ট্রেট কি আপনার স্বীকারোক্তি নিজে হাতে লিখে নেন, না টাইপ করা হয়েছিল?

উ–নিজে হাতে লিখে নেন।

প্র–সব পৃষ্ঠায়ই কি আপনার স্বাক্ষর ছিল?

উ–স্বীকারোক্তি লেখার পর তা আমাকে পড়ে শোনানো হয় এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আমি স্বাক্ষর করি।

বিবাদী কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খানের অপর এক প্রশ্নের জওয়াবে তিনি জানান যে, তাঁর স্বীকারোক্তি করা ও একরারী সাক্ষী হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে কয়েকদিন ব্যবধান ছিল।

প্রঃ–আপনাকে কি কর্নেল নাসের বলেছিলেন যে, আপনি অভিযুক্ত হবেন না একরারী সাক্ষী হবেন– এ দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতে?

উঃ–একরারী সাক্ষী হওয়ার পর কর্নেল নাসের আমাকে বলেছিলেন যে, আমাকে অভিযোগ হতে মুক্তি দেওয়া হবে।

প্রঃ–আপনি কোন বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন?

উঃ-ঢাকা জেলার লৌহজং থানার ব্রাহ্মণগাঁও স্কুল হতে।

প্রঃ–কোন সালে?

উঃ–১৯৪৮ সালে।

প্রঃ–ম্যাট্রিক পাস করার পর আপনি স্বাস্থ্য বিভাগে কি কিছুকাল চাকুরী করেছিলেন?

উঃ- ম্যাট্রিক পাস করার পর আমি স্বাস্থ্য বিভাগে লীভ ভ্যাকান্সিতে তিন-চার মাস হেলথ এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছি।

প্রঃ–হেলথ এ্যাসিস্ট্যান্ট মানে আপনি ভেকসিনেটার ছিলেন?

উঃ–হ্যাঁ।

প্রঃ–কোন সালে?

উঃ–সম্ভবতঃ ১৯৪৯ বা ১৯৫০ সালে।

প্রঃ–কোন সালে আপনি বিমান বাহিনীতে যোগ দেন?
উঃ–আমি ১০-৭-৫৪ তারিখে বিমান বাহিনীতে যোগ দেই।
প্রঃ–বিমান বাহিনীতে যোগ দেয়ার পূর্বে এই কয় বছর আপনি কি করেছিলেন?
উঃ–আমি কিছুই করিনি।
প্রঃ–আপনি কোন সালে ইন্টারমেডিয়েট পাস করেছেন?
উঃ–১৯৬০ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয় হতে।
প্রঃ- ইন্টারমিডিয়েটে আপনার পাঠ্যসূচীতে কি কি বিষয় ছিল?
উঃ– ইংরেজী, বাংলা, সিভিক্স ও ইকনমিক্স, ইসলামিক ইতিহাস এবং ইসলামিক স্টাডিজ।
প্রঃ–বি- এ আপনি কোন সালে কোথা হতে পাস করেন?
উঃ–১৯৬৩ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয় হতে আমি বি-এ-অনার্স পাস করি।
প্রঃ–কি বিষয় নিয়ে আপনি অনার্স পড়েছিলেন?
উঃ–ইকনমিক্স।
প্রঃ- অনার্স পরীক্ষায় আপনি কোন ক্লাস পেয়েছিলেন?
উঃ–সেকেন্ড ক্লাস।
প্রঃ- অনার্সে আপনার পাঠ্য তালিকায় কি কি বিষয় ছিল?
উঃ- ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক্স, মানিটারী ইকনমিক্স, ইকনমিক থট। এছাড়াও ইংরেজী এবং ইসলামিক ইতিহাস।
প্রঃ–আপনার সাব-সিডিয়ারী বিষয় কি ছিল?
উঃ–রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইসলামিক ইতিহাস।
সাক্ষী আরও বলেন, আমি ১৯৬৪ সালে এম-এ ক্লাসে ভর্তি হই। আমি রেগুলার ছাত্র হিসেবে ইন্টারমিডিয়েট হতে এম-এ পর্যন্ত পড়াশুনা করেছি। সকালে আমি ক্লাস করতাম এবং দুপুরে একটা হতে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত অফিস করতাম। উপরস্থ অফিসারের অনুমতি নিয়েই আমি দ্বিতীয় শিফটে অফিস করতাম।
প্রঃ–এম-এ'তে আপনি কি কি বিষয় নিয়েছিলেন?
উঃ–মানিটারি ইকনমিক্স, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ও ইকনমিক্স থট।
প্রঃ–মোট কয় পেপার ছিল?
উঃ- ছয় পেপার।
সাক্ষী আরও বলেন, এম-এ'তে তার স্ট্যাটিসটিক্সও ছিল।
প্রঃ- এলডার ব্রাদারকে বাংলায় আপনি কি বলেন?
উঃ–বড় ভাই বা বড়া ভাই।
প্রঃ–সাধারণতঃ কি বলে সম্বোধন করেন?
উঃ– বড় ভাই।

প্রঃ –শেখ মুজিবের সাংকেতিক নাম কি ছিল?
উঃ–পরশ।
কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীকে বাংলায় পরশ বানান করতে বলেন। সাক্ষী সঠিকভাবে তা বানান করেন।
প্রঃ–অভিযুক্ত নূর মোহাম্মদের সাংকেতিক নাম কি ছিল?
উঃ–সবুজ।
এই শব্দটিও তিনি কৌসুলীর নির্দেশে বানান করেন।
প্রঃ– আপনি জবানবন্দীতে ও বিভিন্ন বিবৃতিতে "পারছ" ও "ছাবুজ" উচ্চারণ করেছেন তাই না?
উঃ–হ্যাঁ।
সাক্ষী বলেন, একথা ঠিক যে, আমি পশ্চিম পাকিস্তানী উচ্চারণে এদের সাংকেতিক নাম বলেছি। সেখানকার কথোপকথনের প্রভাব এই উচ্চারণে রয়েছে। সাক্ষী আরও বলেন যে, বাংলা ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান আছে।
প্রঃ–আপনার সবসময়ই মনে ছিল যে, স্টোর রুমে ব্যাগে আপনার ডাইরী আছে?
উঃ–হ্যাঁ।
প্রঃ–আপনি করাচী গমনের সময় চৌকিদারকে ব্যাগের কথা বলে গিয়েছিলেন?
উঃ–হ্যাঁ। তবে এ ভেতরে কি ছিল তা বলিনি।

সাক্ষী আরও বলেন, স্টোর রুমের চাবি আমার কাছে থাকত। আমি অন্য একজন কেরানীর কাছে এই চাবি রেখে যাই। এই ব্যাগের কথা সে জানত কিনা তা আমি বলতে পারব না। স্টোর রুমে রেকের উপর আমার ব্যাগ ছিল। সেখানে একটা অথবা দুটা রেক ছিল।

প্রঃ– করাচীতে একটি সভায় মোয়াজ্জেম আপনাকে পূর্ব পাকিস্তানের দুর্দশার কথা বলেছিল বলে আপনি বর্ণনা করেছেন। সেই দুর্দশা কি তা বলুন তো?
উঃ– লেঃ মোয়াজ্জম পূর্ব পাকিস্তানের যে দুর্দশার কথা বলেছেন, তা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে বৈষম্য। তিনি বলেছেন, বড় বড় সব কল-কারখানা পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করা হয়েছে। অপরপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের খুব সামান্য পরিমাণে কল-কারখানা স্থাপিত হয়েছে।

তিনি বলেছেন যে, সশস্ত্রবাহিনীর তিনটি সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা খুবই কম। কোন বাঙালীকে আজ পর্যন্ত সিইনসি নিযুক্ত করা হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের পাটের দ্বারা যে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা হয় তা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়।
প্রঃ–আপনি এ সমস্ত বিশ্বাস করেছিলেন?
উঃ–হ্যাঁ।

প্রঃ– পূর্ব পাকিস্তানের দুর্দশা সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা আছে?
উঃ–হ্যাঁ।
প্রঃ–আপনাকে কি একথা বলা হয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তান শোষণ করে নিচ্ছে?
উঃ- হ্যাঁ।
প্রঃ– পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা আপনি কখনও তুলনা করে দেখেছিলেন?
উঃ–না।
প্রঃ–আপনাকে কি লেঃ মোয়াজ্জম একথাও বলেছিলেন যে, সকল ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে সীমাবদ্ধ এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কোন ক্ষমতা নেই?
উঃ–হ্যাঁ।
প্রঃ–সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের কোন মেজর জেনারেল আছেন?
উঃ–হ্যাঁ। আমি একজনের কথা জানি।
প্রঃ–তিনি কে?
উঃ–তিনি খাজা শাহাবুদ্দীন সাহেবের ছেলে।
সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, বিমানবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের একজন প্রাক্তন উইং কম্যান্ডারের কথা আমি জানি। তাঁর নাম হচ্ছে বাকী। তিনি কখন অবসরগ্রহণ করেছেন তা আমি বলতে পারব না। বিমানবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য এটাই হচ্ছে উর্ধ্বতম পদ।
প্রঃ–বিমান বাহিনীতে কতজন উইং কম্যান্ডার আছেন?
উঃ–তা আমি বলতে পারব না।
প্রঃ–উইং কম্যান্ডারের ওপরে আর কয়টি পদ আছে?
উঃ–চারটি।
সাক্ষী আরও বলেন, নৌবাহিনীতে জনৈক চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি কমোডর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমাদের এই আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন তিনি চাকুরীতে বহাল ছিলেন না।
প্রঃ –আপনি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর নাম জানেন?
উঃ–হ্যাঁ।
প্রঃ-আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, পিডিএম এবং ন্যাপ-এর নাম আপনি শুনেছেন ?
প্রঃ-হ্যাঁ।
প্রঃ- পিডিএম কি?
উঃ–পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্ট।

প্রঃ–আপনি কি জানেন যে, ১৯৪৮ সালে আওয়ামী লীগ গঠিত হয়েছিল?
উঃ–জনাব সোহরাওয়ার্দীর সময় এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল বলে আমি জানি। ১৯৪৯ সালে হয়েছিল কিনা, বলতে পারব না।
প্রঃ–প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আওয়ামী লীগের অন্যতম দাবী একথা আপনি জানতেন?
উঃ- হ্যাঁ, জানতাম। এর দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের সকল দুর্দশার অবসান হবে বলে বলা হয়েছিল।
প্রঃ–আপনি কি মনে করেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এই প্রদেশকে পৃথক করার ব্যাপারে সাহায্য করবে?
উঃ–হ্যাঁ–তখন এরূপ মনে করা হয়েছিল।
প্রঃ- বৈষম্যের কারণ আপনি জানেন?
উঃ–না।
প্রঃ–আপনি কি মনে করতেন যে, এই বৈষম্য কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্টি?
উঃ- একটি বৈঠকে এই কথা বলা হয়েছিল।
প্রঃ–আপনি কি তা বিশ্বাস করেছিলেন?
উঃ–হ্যাঁ।
প্রঃ–কেন্দ্র হতে পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হলে আপনি কি খুশী হবেন?
উঃ–তখন যদি হত তবে খুশী হতাম।
জেরার জবাবে সাক্ষী আরও বলেন, আমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সাফল্য লাভ করেনি বলে আমি এখন মোটেও অখুশী নই। প্রকৃতপক্ষে আমি আনন্দিত যে, পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যায়নি।
প্রঃ–আপনার এই মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে কখন?
উঃ–আমি প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করার পর।
প্রঃ–আপনি নীতিগত প্রশ্নে দলত্যাগ করেছিলেন?
উঃ–নীতির প্রশ্নে ত্যাগ করিনি।

সাক্ষী বলেন, হিসেবের ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয়ায় আমি প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করি। তবে পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হউক এটা আমি চাইনি।

সাক্ষী আরও বলেন, দলত্যাগ করার কারণ সম্পর্কে পুলিশ প্রশ্ন করেছিল। তবে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এ সম্পর্কে আমি কিছু বলিনি।

সাক্ষী বলেন, পুলিশের নিকট তিনি ১৯-১-৬৮ তারিখে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে রাজনৈতিক মতানৈক্যের কথা আমি বলিনি।

প্রঃ- দলত্যাগ করার পর এ সম্পর্কে কারুর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছিল?
উঃ–না।
প্রঃ–কেউ আপনাকে এ ব্যাপারে কখনও প্রশ্ন করেছিল?
উঃ–না।

প্রঃ- পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক একাডেমী স্থাপন, নৌ-বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন এবং অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থাপনের জন্য আওয়ামী লীগ দাবী করেছিল একথা আপনি জানেন?
উঃ–আমি জানি না।
প্রঃ–আপনি ইত্তেফাকের কথা শুনেছেন?
উঃ–এটা একটা বাংলা দৈনিক পত্রিকা— তবে আমি এ কাগজ পড়তাম না।
প্রঃ–আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীর কথা আপনি শুনেছেন?
উঃ–হ্যাঁ।
প্রঃ– উর্ধ্বতন সরকারী মহলে এই ৬-দফাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করা হত এ কথা আপনি শুনেছেন?
উঃ– আমি কখনও শুনিনি।
প্রঃ আপনাদের আন্দোলন সম্পর্কে আপনার মনোভাবের পরিবর্তন হল কেন?
উঃ ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে কায়েদে আজমের জীবনী পড়ার পর এই আন্দোলন সম্পর্কে আমার মনোভাব আমি পরিবর্তন করি।
প্রঃ কবে আাপনি এই জীবনী পড়েছেন?
উঃ ১৫ই অথবা ১৬ই এপ্রিল।
প্রঃ উক্ত পুস্তকের নাম কি এবং তার লেখক কে?
উঃ পুস্তকের নাম আমি ভুলে গেছি। তার লেখক একজননংরেজ।
প্রঃ উক্ত পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা কত?
উঃ সে কথা আমি বলতে পারব না।
প্রঃ কোথা হতে আপনি ঐ পুস্তক সংগ্রহ করেছিলেন?
উঃ নিউ মার্কেটের একটি লাইব্রেরী হতে।
প্রঃ এর আগে আপনি কায়েদে আজমের জীবনী সম্পর্কে কোন পুস্তক পড়েছিলেন?
উঃ না।
প্রঃ কায়েদে আজম পাকিস্তান হাসিল করেছেন, এ কথা আপনি জানেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ লাহোর প্রস্তাবের কথা আপনি জানেন?
উঃ আমি শুনেছি।
প্রঃ কায়েদে আজম সম্পর্কিত পুস্তকে আপনাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি ছিল কি?
উঃ ভারতে মুসলমান সংখ্যালঘুদের দুর্দশার কাহিনী উক্ত পুস্তকে পড়ে আমি প্রভাবিত হই। ঐ পুস্তক আমাকে লেঃ মোয়াজ্জমের যুক্তির অসারতা প্রমাণে সাহায্য করেছে।

প্রঃ আপনি আমির মোল্লাকে চেনেন?
উঃ হ্যাঁ, তিনি হচ্ছেন সামাদ মোল্লার পিতা।
প্রঃ জামালুদ্দিন মাল কে?
উঃ তিনি আমার ভগ্নীপতি।
প্রঃ আপনি তাকে কি বলে ডাকেন?
উঃ দাদা বলে।
প্রঃ গ্রামের বাড়ীতে আপনার জমিজমা আছে?
উঃ আছে।
প্রঃ অন্যের নিকট আপনি এই জমি বর্গা দিতেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ বাশার ও রমিজ মল্লিক আপনার বর্গাদার তাই না?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ ম্যাট্রিক পাশ করার পর ১৯৪৮ অথবা ৪৯ সালে হাজেরার সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়েছিল কি?
উঃ ১৯৫০ অথবা ৫১ সালে আমির মোল্লার মেয়ে হাজেরার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। পরে ১৯৬০ অথবা ৬১ সালে আমি তাকে তালাক দেই।
প্রঃ সামাদ মোল্লা ও হামিদ মোল্লা কে?
উঃ এরা হচ্ছেন হাজেরার ভাই।
প্রঃ সেদিন জেরার সময় আপনি আদালতে বলেছেন যে, ১৯৬৭ সালে আপনি প্রথম বিয়ে করেছেন। এই উক্তি দ্বারা আপনি কি আদালতে মিথ্যা কথা বলেননি?
উঃ আগের বিয়ে আমার পিতা ঠিক করেছিলেন এবং পরের বিয়ে আমি নিজে করেছি। সেজন্যই আমি বলেছি যে, ১৯৬৭ সালে আমি প্রথম বিয়ে করেছি। কাজেই একথা বলে আমি আদালতে মিথ্যা কথা বলিনি।
প্রঃ আপনি আপনার প্রথম স্ত্রীর কাছে পত্র লিখেতেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ প্রথম স্ত্রীর গর্ভে আপনার কোন সন্তান হয়েছিল?
উঃ হ্যাঁ, তবে সে মারা গেছে।
প্রঃ ঐ স্ত্রীকে আপনি কেন তালাক দিয়েছিলেন?
উঃ আমি তাকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে রাজী হয়নি। আমি কয়েকবার চেষ্টা করি। ১৯৫৬ সাল হতে তালাক দেওয়া পর্যন্ত তার সাথে আমার মনোমালিন্য চলতে থাকে।
প্রঃ আপনার স্ত্রীর প্রতি কখন থেকে আপনার ভালবাসা হ্রাস পেতে থাকে?
উঃ আমি বলতে পারব না।

প্রঃ ১৯৫৮ সালে আপনি স্ত্রীকে লেখাপত্রে "প্রিয়তমা" বলে সম্বোধন করেছিলেন কি?
উঃ তাকে এরূপ সম্বোধন করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক।
এই সময় আদালত কৌসুলীর কাছে জানতে চান যে, এই সকল প্রশ্নের সঙ্গে মামলার কি সম্পর্ক আছে।
কৌসুলী বলেন, সাক্ষী জেরার সময় বলেছে যে, এখানে তার কোন আত্মীয়স্বজন নেই। তার এই উক্তি যে সত্য নয় এবং সে যে একজন মিথ্যাবাদী একথা প্রমাণ করার জন্যই আমি এসব প্রশ্ন করছি।
প্রঃ ঐ সময় আপনার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন কি?
উঃ আমি বলতে পারব না।
প্রঃ আপনি তাকে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ও অন্যান্য ব্যাপারে সাবধানে চলাফেরা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন কি?
উঃ হয়তবা দিয়েছিলাম।
প্রঃ একটি পত্রে আপনি স্ত্রীকে লিখেছিলেন যে, আপনি তাকে সারারাত স্বপ্নে দেখেন–সত্যি কিনা?
উঃ কোন পত্রে এ কথা আমি লিখেছি কিনা, মনে নেই।
প্রঃ স্ত্রীকে আপনি লিখেছেন কিনা যে "তোমাকে প্রায়ই স্বপ্নে দেখি, স্বপ্নে কথাবার্তা বলি"–এ কথা চিঠিতে আছে কিনা?

এই সময় কৌসুলী সাক্ষীর হাতে তার স্ত্রীকে লেখা তার একখানা পত্র প্রদান করেন। সাক্ষী উক্ত পত্রের ঐ অংশ পড়ে বলেন, আমি লিখেছিলাম যে, রাত্রে আমি তাকে স্বপ্নে দেখি।

এরপর কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীর হাতে বাংলায় লিখিত একখানা কাগজ দিয়ে তাকে তার ইংরেজী অনুবাদ করতে বলেন।
সাক্ষী ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে যে অনুবাদ করেন তার বাংলা নিম্নরূপঃ

"সিরাজউদ্দৌলা বলেছেন, মীরমদন, মোহনলাল যুগে যুগে আবার জন্মাবে, তার পাশে মীর জাফর, উমিচাঁদও।
আমি নিজেও একজন বাঙালী। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।"
প্রঃ নূরুল হককে আপনি চেনেন?
উঃ হ্যাঁ। তিনি হচ্ছেন ইয়াসিন আখন্দের ছেলে।
প্রঃ তার সঙ্গে আপনার কোন ব্যবসা ছিল?
উঃ ১৯৬৭ সালে নাওখোলা বাজারে তার সাথে আমি পাটের ব্যবসা করি।
প্রঃ এই ব্যবসা কতদিন চলেছিল?
উঃ ২/৩ মাস।
প্রঃ সে আপনার একজন বন্ধু?
উঃ তার সাথে আমার খাতির ছিল। কিন্তু তাকে বন্ধু বলা যায় না।

প্রঃ এ কথা কি সত্য যে, আপনার ইঙ্গিতে উক্ত নূরুল হককে শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার জন্য এই ক্যান্টনমেন্টে আনা হয়েছিল?
উঃ এ কথা সত্য নয়।
প্রঃ আপনি কি জানেন যে, নূরুল হক উক্ত মিথ্যা বিবৃতি দিতে অস্বীকার করেছেন?
উঃ আমি জানি না।
জেরার জবাবে সাক্ষী আরও বলেন, তার গমের ব্যবসা ছিল এবং ১০৭নং দীননাথ সেন রোডের বাড়ীতে তিনি গম রেখেছিলেন। বাড়ীওয়ালার বিনা অনুমতিতে গম রাখার জন্য তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এ কথা সত্য নয়। তিনি বলেন, উক্ত বাড়ীতে ৬টি কামরা আছে। বাড়ীতে গম রাখার জন্য আমি বাড়ীওয়ালার অনুমতি নিয়েছিলাম।
প্রঃ বিমান বন্দর হতে মহাখালী কতদূর?
উঃ আধা মাইল।
প্রঃ মহাখালী যক্ষ্মা হাসপাতাল আপনি চেনেন?
উঃ হ্যাঁ, আমি চিনি।
প্রঃ মহাখালীতে আপনাদের যে বৈঠক হয়েছিল উক্ত স্থান যক্ষ্মা হাসপাতাল হতে কত দূরে অবস্থিত?
উঃ এক হতে দেড় মাইল।

সাক্ষী জেরার জবাবে আরও বলেন, উক্ত স্থান হাসপাতালের দক্ষিণে অবস্থিত। একটা উন্মুক্ত স্থানে তাদের বৈঠক হয়েছিল। উন্মুক্ত স্থানের উত্তর দিকে একটি কাঁচা ঘর আছে। আমরা ঘাসের উপর বসে সভা করেছি। মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চাঁদনী রাত ছিল। তবে সেদিন পূর্ণিমা ছিল না। এই বৈঠক আধ ঘণ্টা চলে। কর্পোরাল সামাদ এই সভার আয়োজন করেছিলেন। অন্যান্যদের খবর দেওয়ার দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন। যারা এই সভায় যোগদান করেছিল তাদের আমি আগে দেখিনি। আমি ও সামাদ একত্রে গিয়েছিলাম। আমার পরিচিত ব্যক্তি নহে এরূপ ১০/১২ জন উক্ত সভায় যোগ দিয়েছিলেন। তাদের আমি চিনি না। আমার সাথে এদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। তাদের সামাদ চেনেন বলে আমাকে জানান। তারা সেনাবাহিনীর লোক।
প্রঃ ফ্লাইট সার্জেন্ট হকের সঙ্গে আপনার কখন দেখা হয়েছিল?
উঃ ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে।
প্রঃ কোথায় আপনাদের সাক্ষাৎ হয়?
উঃ সার্জেন্ট হক ও জেড এইচ চৌধুরী জে টি আমার সঙ্গে আরজু হোটেলে দেখা করেন।

প্রঃ সার্জেন্ট হক কি তখন কোন সভায় যোগ দিয়েছিলেন?
উঃ না।
সাক্ষী আরও বলেন, মহাখালীর বৈঠকের কয়েকদিন আগে সার্জেন্ট হক হোটেলে আমার কামরায় এসে আমাকে তার নাম বলেন।
প্রঃ সার্জেন্ট হকের কাজ কি আপনি জানেন?
উঃ ছেলেদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তার কাজ।
প্রঃ তিনি যে লাইব্রেরীতে কাজ করেন এবং সেখানে তার হাজিরা বই রয়েছে সে কথা আপনি জানেন?
উঃ না। তা আমি জানি না।
এই সময় কৌসুলী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তির প্রতি সাক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সাক্ষী বলেন, আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছি যে, মহাখালীর বৈঠকে যারা যোগ দিয়েছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ফ্লাইট সার্জেন্ট এম এ হক। তিনি হচ্ছেন, এডুকেশন ইনস্ট্রাক্টর। জেড এইচ চৌধুরী তাকে এম এ হক বলে আমার নিকট পরিচয় করিয়ে দেয়। আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এ কথা বলিনি যে, তিনি হচ্ছেন ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক।
প্রঃ জেড এইচ চৌধুরীকে আপনি কবে হতে চেনেন?
উঃ ১৯৬৫ সাল হতে তিনি প্রথমে ছিলেন এল এ সি লীডিং এয়ার ক্র্যাফটম্যান। ১৯৬৬ সালে তিনি জে টি নামে জুনিয়র টেকনিশিয়ান পদে উন্নীত হন। তিনি আমাদের দলের একজন সদস্য ছিলেন।
সাক্ষী আরও বলেন, আমি পুলিশের নিকট বলেছিলাম যে, মহাখালীর বৈঠকে যারা যোগ দিয়েছিলেন তারা তাদের সহযোগিতা দানের কথা আমাদের বলেছিল। (এরূপ কোন রেকর্ড বিবৃতিতে নেই)

Morning News
17th August 1968
Amir Hossain deposes before Tribunal
Progress achieved by organisation discussed at Sk. Mujib's house
(By our staff Reporter)

On the fourth day of cross-examination by the defence yesterday the prosecution witness Mr. Amir Hossain told the Special Tribunal hearing Agartala conspiracy case that in the meeting held at the residence of Sheikh Mujibur Rahman, Awami League leader, the progress achieved by the organisation in carrying on their movement had been discussed.

The three-member special Tribunal headed by the former Chief Justice of Pakistan Mr. Justice S.A. Rahman is trying Sheikh

Mujibur Rahman and 34 others including three CSP officers and a Naval Commander for allegedly conspiring for the separation of East Pakistan from the Centre by an armed revolt with arms and ammunitions from India.

Mr. Amir Hossain said that in the meeting held at Sheikh Mujibur Rahman's house it was mentioned that large number of people had been inducted into the movement. In that meeting Sheikh Mujibur Rahman had also promised to get funds from India.

Replying to a question by the defence counsel, the prosecution witness said that he had not been to the house of Sheikh Mujibur Rahman before August 29, 1965. After that he visited the house of Sheikh Mujibur Rahman thrice but every time he was accompanied by somebody else. He also said that he had once an exclusive talk with Sheikh Mujibur Rahman at his office in Jinnah Avenue. He said Sheikh Mujibur Rahman did not object to his going to his office to meet him.

Mr. Amir Hossain said that he was asked by Lt. Moazzem Hossain to prepare a budget of Rs. 50 to 60 lacs.

The witness said when he went back to Karachi after his stay in Dacca, he delivered an amount of Rs. 4100 to Lt. Moazzem Hossain. He said he did not take with him any member of the party. He delivered the money to Lt. Moazzem Hossain at his house in the evening before sunset. He said he did not know if any part of this money was ever sent to Dacca from Karachi.

The trial resumes today at 9 a. m.

TEXT

The following is the text of the Record of proceedings:
12/8/68:
Present : Mr. Justice S. A. Rahman, HPK, Chairman
Mr. **Justice M. R. Khan S.PK, Member.** Mr. Justice Maksum-ul-Hakim, Member.
For the Prosecution : As before for the Defence:
As before
The witness on oath:
As before
To Mr. Abdus Salam khan.
I had not been to the house of Sheikh Mujibur Rahman before the 29th August, 1965. After this date. I had been to the house of Sheikh Mujibur Rahman three times. Both during day time and night time. I was not taken after my arrest, anywhere near the

house of Sheikh Mujibur Rahman. I do not know where Roxy Hotel is every time when I went to Sheikh Mujibur Rhaman House. I was accompanied by somebody else. I had once an exclusive talk with him in his office in Jinnah Avenue. There was none else with me on that occasion. He had not objected to my going alone to him.

I had kept list of arms and ammunitions with me. I cannot myself explain the contents of that arms list. In the meeting held on the 29th August, 1965. In Sheikh Mujibur Rahman's house, there was no mention as to who the other important or unimportant members of the organisation were. I had not prepared the budget, but I had suggested that budget should be prepared for our movement, to Lt. Moazzem Hossain, in a letter. I did not prepare any budget myself. It is correct that I was asked by Lt. Moazzem Hossain to prepare a budget for 50/60 lacs of rupees. (The witness was asked whether he did anything in pursuance of that demand). The witness says, 'I did nothing'. (After the attention of the witness was drawn to his police statement which mentions an estimate prepared by him): The witness says, "I did prepare the estimate', I can name some words which were agreed to be used in particular senses. Lt. Moazzem Hossain and I agreed to use one word for only one meaning. The word 'patient' used in some letters, was used for East Pakistan. It was agreed between me and Lt. Moazzem Hossain that the word 'patient' would be used for 'East Pakistan'. I have also stated in this Court that the word 'mother' also stands for East Pakistan. For 'money' the term used sometimes was 'medicine.' I forget what other word was used for 'money'. For arms and ammunition the terms used were "materials" and "tools" and sometimes 'things'. (The learned counsel suggested that the term 'good' was used for arms and ammunttions in some letters). The witness answers, 'Yes'. The term prescribed 'medicine' has been used for arms and ammunitions and funds. It is, therefore corrcet that more than one word has been used for one meaning in the letters. The word 'movement' is described in the letters as 'business'. I have also said that the word 'trade' in these letters stands for 'movement'. I have similarly stated that the term 'contract business' stands for 'movement'. The statement that it was agreed between me and Lt. Moazzem Hossain that we would use a particular word in a particular sense, is not false I do not know if Lt. Moazzem Hossain had circulated to other members of the party these terms with the senses they carry.

Besides the persons who attended the meeting at Sheikh Mujibur Rahman's house on the 29th August, 1965. I do not know the name of any other person in Dacca, who might have joined the movement. At that time I did not know of any attempt being made to bring Mr. A. F. Fazlur Rahman from Karachi to Dacca by coordination I mean coordination between different members of the organisation. There was a discussion of this meeting, Sultanuddin and Std. Mujibur Rahman, was either not sent to Lt. Moazzem Hossain or not properly spent. If Std Mujibur Rahman had alone gone to Sheikh Mujibur Rahman, the latter would have given him the money as he was one of the nominess for the purpose. What I meant by saying that when Steward Majibur Rahman went to SK. Majibur Rahman for getting the money and I accompanied him but remained outside the house. I only meant to say that I waited in the drawing room while he went inside a room while I was wating in the drawing room. I did not meet any one. It was Steward Mujibur Rahman who had asked me to stay in the drawing room. I had not asked Steward Mujibur Rahman not to tell Sk. Mujibur Rahman that I was waiting in the drawing room. On coming out Steward Mujibur Rahman told me that he had got Rs. 700 from Sk. Mujibur Rahman but he actually handed over the money to me when we reached the hotel. Nothing was spent on that day out of this Rs. 700.

If even on the 9th September, Steward Mujibur Rahman alone had gone to Sk. Mujibur Rahman I had no suspicion that he would not be given the money. On that occasion Sultanuddin and I however had accompanied him and on this occasion I had stood just outside the house while Sultanuddin and Steward Mujibur Rahman went in. There had been no objection to my sitting in the drawing room on the first occasion. I had Just stood by the side of the road outside the house. On this occasion Rs. 4,000 were paid but these were not for arms and ammunitions but were itended to be sent to Lt. Moazzem Hossain for party expenses. Party expenses meant party expenses both for Karachi and Dacca. Out of Rs. 4,700, Rs. 4,100 was taken to Karachi only Rs. 300 was left with Steward Mujibur Rahman in East Pakistan for his own expenses and that of Sultanuddin for the work of the movement on that occasion. This was not money for personal expenses. I did say when examined by the prosecution in this court that this money was given to them for personal expenses. The other Rs. 300 were opent by me for the expenses of the three of us at Dacca, when we stayed

here, (Mr. Manzur Qadir points out that the statement made by the witness in examination-in-chief was not that he had given Rs. 300 to Steward Mujibur Rahman and Sultanuddin for "personal expenses" but that the words are for their expenses). I did say however, to the Magistrate in my confession that I had paid Rs. 300 to these two persons for their personal expenses. I do not remember if I stated to the police that I had paid this money to them for their personal expenses (so recorded). The expenses of my stay during this time were met out of the party funds. I smoke, I generally smoke Capstan Cigarettes here. I only smoke half a packet of cigarettes daily. I had stayed on in Dacca from the 29th of August, 1965 to about the last week of September, 1965; but this did not wholly cover my leave. The leave was only for 10 days. I did not go out for any party work during this time. But I had visited several places within Dacca like going to office and meeting friends. I sometimes went in a baby taxi and sometimes in a rickshaw. It is incorrect that the statement I made that I accompanied Steward Mujibur Rahman and Sultanuddin to the house of Sk. Mujibur Rahman on the 9th of September, 1965 for collection of funds is false.

When I went back to Karachi and delivered the amount of Rs. 4,100 to Lt. Moazzem Hossain. I did not take with me any other party member. I did not know if any part of this amount was ever sent to Dacca from Karachi. I had delivered this money to Lt. Moazzem Hossain at his house in the evening before sunset. It is incorrect that in those days, due to emergency, Lt. Moazzem Hossain could not be at his house at that time.

I made a mistake while stating in Court that the two meetings that took place at the house of Lt. Moazzem Hossain and the house of Mr. A. F. Rahman at Karachi were in November, 1965. Actually they were in December, 1965. I made a correct statement to the Magistrate in that respect probably the first meeting at Lt. Moazzem's House was in the second week of December and the other meeting at Ahmad Fazlur Rahman's house was in the last week. Again said–this first meeting was I think in the third week of December and that at Ahmed Fazlur Rahman's house in the fourth week of December. A.B. Samad had also attended the first meeting at Lt. Moazzem Hosain's house but not the second one. It is incorrect that corporal Samad was not at Karachi on the day of the meeting. This first meeting was held after sunset. The second meeting at Ahmad Fazlur Rahman's house took place at about 8 or

9 p.m. The two meetings were separated by 2 to 3 days. I am not aware of any visitors who might have been kept at the house of Lt. Moazzem Hossain in those days. I did not see any such visitors at his house. When Lt. Moazzem Hossain said in the first meeting that work should hence forward be concentrated in East Pakistan. I was not aware how far the movement had progressed in West Pakistan. I did not give any report at any of these two meetings as to how far the work in East Pakistan had progressed, at the time of those meetings. I was only aware that there were two whole time workers, namely Std. Mujibur Rahman, and L.S. Sultanuddin Ahmed in East Pakistan. I was not aware if there was any such whole time worker in West Pakistan in those days. I was taken into confidence in respect of the movement. No payment was fixed for Std. Mujibur Rahman and Sultanuddin Ahmed per month but they were given money from time to time as required. I cannot say how much money was paid to Std. Mujibur Rahman and Sultanuddin Ahmed for the period from 1st of January, 1965 to December, 1965. I had also drawn some money while at Karachi from party funds. I had been paid Rs. 2000 on one occasion and Rs. 2000 on another occasion by Lt. Moazzem Hossain for that purpose at Karachi. During this period I had however recruited no new member at Karachi nor did I collect any funds. I had not undertaken any journey outside Karachi in that period. This Rs. 4000 was given to me for transport expenses for attending the two meetings and for other visits to Lt. Moazzem Hossain's house. Sometimes I used to visit Lt. Moazzem Hossain alone and sometimes other people also used to be present. We were in fact, discussing the party matters on daily basis. What I mean by daily basis is that I used to go every day to his house. There was sometimes break of 2/3 days in between our meetings while I was at Karachi my house at Jahangir Road would be 3½ miles away from the house of Lt. Moazzem Hossain at Karsaz.

I do not remember when I applied for my transfer to East Pakistan. I had applied for this transfer before these two meetings tooks place. I had been asked to give up my job at Karachi but I did not tender my resignation. Nothing was mentioned as to how much money would be given to me while. I would be staying at Dacca, for my maintenance. I was only told that a job would be provided for me at Dacca but it was not specified what kind of job. It is not false that I was asked to quit my job at Karachi and go to Dacca. I did not agree to give up my job.

When Mr. Ahmed Fazlur Rahman wrote the letter to his younger brother in London for transmitter he did not mention any price in the letter nor was the price discussed at that time. I did not tell the police that it was at the house of K.G. Ahmed where I met Mr. Fazlur Rahman that he wrote a letter then and there for the transmitter. (So recorded). I did not state to the police that Mr. Fazlur Rahman wrote a letter then and there and handed over the same letter to Lt. Moazzem Hossain at his residence at Karsaz. (So recorded). Lt. Moazzem Hossain himself was friendly with Mr. A. F. Rahman. There was a telephone in the house of Mr. A.F. Rahman Ilaco House and not in the house of Lt. Moazzem Hossain. I do not know if Lt. Moazzem Hossain had a telephone in his office. I do not remember if I stated before the Magistrate in my confession that Lt. Moazzem Hossain had asked me to go and collect letter from Mr. A. F. Rahman. I had stated go to the police. (Not so recorded).

Ilaco House may be 5/6 miles from Karsaz. There was emergency in Naval Headquarters when meetings were held in December 1965. I do not know if Lt. Moazzem Hossain was supposed to be on war duty in those days. In December, 1965 also, Lt. Moazzem Hossain was working as Liaison Officer at Naval Headquarters. I do not know if he was Chief Liaison Officer. When I met Lt. Moazzem Hossain in those days he used to wear Khaki uniform. A.B. Khurshid was for 3 years at Chittagong before I recived the letter written in his hand on behalf of Std. Mujibur Rahman. (The witness was told that according to Lt. Moazzem he used to wear blue uniform and not Khaki uniform in December, 1965 witness says, "That is correct").

(Note:- At this stage the learned Counsel for the prosecution has brought to the notice of the Court that in the original police statement of the witness it is recorded as follows:- "He, Mr. A. F. Rahman wrote a letter there and then and handed over the same to me and I gave the same letter to Lt. Moazzem Hossain at his residence at Karsaz". This should be noted in connection with the alleged contradiction of the witness statement in court with his police statement.)

I know Mr. Anwar Zahed I met him several times at 20/13. Gopibagh where he lives. I had gone to his house several times. I went there to collect letters sent by Lt. Moazzem Hossain care of him, and addressed to me. I cannot specify the land in which this house is situated. This address was given to me by Lt. Moazzem Hossain. He gave me this address orally, later on I gave my own

address to Lt. Moazzem Hossain for the letters to be sent. This was when I shifted from Arzoo Hotel to D.N. Sen Road. In the letter Ext. PW 3/39 it is mentioned by Lt. Moazzem Hossain that he had sent two telegrams and two latters to my given address (20/3 Gopibagh). It is correct that I had given this address to him. I was not very friendly with Mr. Zahed. I did go on other occasions to his house besides those on which I went to collect letters. This does not, however, show my friendliness with him for a long time. It is mentioned in this letter that Nur Mohammad was going to Dacca. He did actually meet me at Dacca. The letter says that I would learn everything from him, however, he met me but gave me no information. I never paid any money to Mr. Shafi of Barabakunda. He was not a member of our organisation. (The witness's attention was drawn to a sentence in the letter Ext. PW 3/9 where in Steward Mujibur Rahman had mentioned that he had met shafi but he was not inclined. This means that Steward Mujibur Rahman tried to induct him into the movement but he was not willing, to join. I did not tell the police that I had also paid him Rs. 700-as bait to join our movement (so recorded). There is a reference in the letter PW 3/6 saying 'you people remain unanimous'. This does not mean that we had any previous disagreement. There is a refernce to one Gulam Mohammad in the letter sent to me by Steward Mujibur Rahman. I knew him: but he was not connected with the movement at that time. I had no difference with Ghulam Mohammad. When I was in Karachi he was not connected with the movement. The letter Ext. PW 3/6 was received by me at Karachi. (The English translation of the letter PW 3/6 is now marked PW 3/6-A for identification).

(The English translation of the Bengali letter Ext. PW 3/7 is now marked PW 3/7A for identification). I did not mention to the Magistrate in my confession that I had received the letter addressed to Nuru Bhai, along with another letter addressed to me. I don't remember if I mentioned it to the police in my statement made on 19th January (not so recorded). I cannot remember if I mentioned having received the letter dated 6.12.65, Ext. PW 3/11, from Steward Mujibur Rahman, in my statement to the Magistrate. (The English translation of this letter is marked for identification as PW 3/11A). This is a letter dated 6th December 1965 from Steward Mujibur Rahman. I don't remember if I mentioned this letter in my statement to the police on 19th January, 1966. (not so recorded).

The witness was handed over the letter Ext. PW 3/12, the English translation of which is now Marked Ext. PW 3/12A. The words in Ext. PW 3/12 reading "after completing all kinds of word in that country" do refer to our contact with the personnel of the United States. I still insist that my answer in this Court interprating "that country" as referring to the United States is correct. The amount of Rs. 2,200/- which had been received by L.S. Noor Mohammad through a carrier of a ship was received through a person whom I can identify; that carrier had come with Noor Mohammad to me. I do not remember his name. Probably the ship by which he came was 'Shams'. He belonged to that ship either as a Steward or as a member of the crew. The police never took me to identify that carrier. Noor Mohammed was a faithful worker of the movement. If Noor Mohammed alone had gone to deliver the money to Lt. Moazzem Hossain, the latter would not have disliked it.

I cannot remember the exact month in which Noor Mohammed and I went with this Rs. 2,200-to Lt. Moazzem Hossain. Again says, "I now recollect that it was in January, 1966. It was probably in the 3rd or 4th week of January. The money was delivered to Lt. Moazzem Hossain at his house in P.N.S. Karsaz. I do not remember if, I stated to the Magistrate that the money was delivered in the 1st week of January. Nor do I remember if I said to the police that I went with the money to Lt. Moazzem Hossain in the first week of January. Noor Mohammad and I went to Lt. Moazzem Hossain with the money the same day when the carrier had come to me. This money had been collected by Sultanuddin Ahmed and Std. Mujibur Rahman from Sk. Mujibur Rahman and sent by carrier. One or two letters also came with this money. I do not remember the dates of those letters. The money was received by Std. Mujibur Rahman and Sultanuddin Ahmed in January, 1966. I believed I did mention to the Magistrate that this money had been received from SK. Mujibur Rahman through Sultanuddin Ahmed and Std. Mujibur Rahman. The letter which I received in the first week of January, 1966 to which reference has been made in my statement to the Magistrate, is this letter marked Ext. PW 3/6. I find that there is a reference to money having been arranged in this letter wherein it is referred to as 'medicine' but there are no specific words saying that this money had been supplied by 'Bara Bhai'.

সংবাদ

১৭ই আগস্ট ১৯৬৮

জেরার সপ্তম দিবসে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া স্বীকার করেন–
মিস্‌কা হোটেলে অবস্থানকালে তিনি নিজেকে 'ফ্লাইট লেঃ' বলিয়া
পরিচয় দিয়াছিলেন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (শুক্রবার) ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান জেরা প্রসঙ্গে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার বিরুদ্ধে আদালতে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা ভাষণ ও অসত্য বিবৃতি প্রদানের অভিযোগ আনয়ন করিলে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলেন যে, সাক্ষী ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কথা বলিতেছেন কিনা তাহা একমাত্র তাঁহারাই বিচার করিবেন। তিনি কৌসুলিকে সাক্ষীর প্রতি হুমকি প্রদান না করার জন্য নির্দেশ দেন।

জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার উত্তরে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন হোটেল রেজিষ্টার দেখিয়া স্বীকার করেন যে, চট্টগ্রামের 'মিস্‌কা হোটেলে' অবস্থানকালে তিনি একবার নিজেকে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর 'ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট' এবং অপর একবার 'ষ্টাটিষ্টিকাল অফিসার'–এই পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উহার কোনটাই নন। এই প্রসঙ্গে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব সালাম খান ট্রাইব্যুনালকে জানান যে, তিনি রাজসাক্ষী আমীর হোসেনের বিরুদ্ধে মিথ্যা বিবৃতি প্রদানের অভিযোগে সোপর্দ করার জন্য আদালতে একটি দরখাস্ত পেশ করিবেন।

গতকাল ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরুর পর বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলি ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান পূর্ব দিনের জের টানিয়া সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন।

ট্রাইব্যুনালের ডিবি। ২০ চিহ্নযুক্ত ১৯৫৮ সালের ২১শে নভেম্বর স্ত্রীর নিকট সাক্ষীর লেখা একখানি চিঠির একটি অংশ পাঠ করিতে বলিয়া কৌসুলি জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেনঃ

"ওখানে যে লেখা আছে, আপনি তা পড়ুন।"

সাক্ষী ঃ এতে লেখা আছে যে, "আমি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, ক্লাসে ভর্তি হয়েছি।"

প্রশ্নঃ এটা কি সত্য যে, এই সময় আপনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম,এ, ক্লাসের ছাত্র ছিলেন?

উঃ না, এটা ঠিক নয়।

প্রঃ তাহলে ১৯৬৪ সালে আপনি এম,এ ক্লাশে ভর্তি হন বলে আদালতে যা বলেছিলেন সেটাও কি সত্য?
উঃ জী হ্যাঁ।
প্র ঃ আমার খবর হলো আপনি আদৌ এম,এ,ডিগ্রী পাননি। ঠিক নয় কি?
উঃ না, ঠিক নয়।
প্রঃ আপনি সার্টিফিকেট দেখাতে পারেন?
উঃ আমার অন্তর্বর্তীকালীন এম,এ,সার্টিফিকেট আমার ঘরে আছে। ঘরে যেতে দিলে আমি তা নিয়ে আসতে পারি।
প্রঃ বলতে পারেন আপনার এম, এ, পরীক্ষার ফল কোন বছরের গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে?
উঃ যতদূর মনে হয় ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

অতঃপর কৌসুলি জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীকে তাঁহার জেরা সমাপ্ত করেন।

ইহার পর বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব নাজিরউদ্দীন আহমদের প্রশ্নের উত্তরে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন জানান যে, জনাব কে, জি, আহমদও ঢাকায় দলীয় কাজের জন্যে তহবিল সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন কিনা, তাঁহার স্মরণ নাই।

জনাব নাজিরউদ্দীনের সংক্ষিপ্ত জেরার পর জনাব সালাম খান সাক্ষীকে তাঁহার পূর্বদিনের অসমাপ্ত জেরা শুরু করেন।

প্রশ্ন ঃ ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে আপনি কোথায় ছিলেন?
উত্তরঃ ঢাকায়।
প্রশ্ন ঃ ওই সময় ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন চলছিল, জানতেন?
উত্তর ঃ মনে পড়ছে না।
প্রশ্ন ঃ জাতীয় পরিষদের ওই নভেম্বরের অধিবেশনে বিরোধী দল পরিষদ বর্জন করে এবং আর্মি এ্যাক্ট সংশোধন করে আইন পাস করা হয়–যাতে সামরিক বিভাগের লোকদের সঙ্গে বেসামরিক লোকদের একসঙ্গে বিচার করা যায়। সেটা আপনার মনে আছে?
উ ঃ আমি জানি না।
প্র ঃ ওই সময় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে খুলনা ও চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন, তা আপনার মনে আছে?
উ ঃ হতে পারে।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের তখন জনাব সালাম খানের 'ওই সময়' কথাটির ব্যাখ্যা জানিতে চাহেন।

জনাব সালাম খান জনাব মঞ্জুর কাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলেনঃ "নভেম্বর মাস–তা আমি আগেই বলেছি"।
চেয়ারম্যান ঃ হ্যাঁ। হ্যাঁ। আপনি প্রশ্ন করতে থাকুন।
প্র ঃ ওই সময় প্রেসিডেন্টের জীবননাশের প্রচেষ্টা হয়েছিল বলে বিদেশী সংবাদপত্রে একটি খবরও বেরিয়ে ছিল–স্মরণ করতে পারেন?
উ ঃ না, তা আমি জানি না।
প্র ঃ আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসুচী সম্পর্কে আপনি কখন জানতে পারলেন?
উ ঃ ১৯৬৬-এর মার্চ কিম্বা এপ্রিলে–আসলে বকর-ঈদের দিনে আমি ৬ দফা সম্পর্কে কয়েকখানি, প্যামফলেট পাই।
প্রঃ আপনি কি জানতেন যে, এই ৬ দফা কর্মসুচী প্রকাশ হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।
উঃ হতে পারে।
প্রঃ আপনি কি শুনেছেন যে, ৬-দফা কর্মসুচীকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন' বলে অভিহিত করে প্রেসিডেন্ট ও সরকারের অন্যান্য বড় বড় নেতারা এই আন্দোলনকে ধ্বংস করার কথা ঘোষণা করেছিলেন?
উঃ তা আমি জানি না।
প্রঃ আপনি কি জানতেন যে, সরকারী নেতাদের ওইসব ঘোষণার পরই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে এ মামলা শুরুর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সংগ্রহের চেষ্টা শুরু হয়?
উঃ তা ঠিক নয়।
প্রঃ এখন আমি যদি বলি, সেই মামলা সাজানোর জন্য আপনি তদন্তকারীদের সাহায্য করেছিলেন?
উঃ না,তাও ঠিক নয়। সাক্ষী অপরাপর প্রশ্নের জবাবে বলেনঃ "এটা ঠিক নয় যে, পুলিস যে ব্যাগটি সিজ করে সেটি আমি আমার সাথে করে করাচী নিয়েছিলাম এবং সেটি সাথে করেই ঢাকায় আসি। এটা ঠিক নয় যে, আমার ব্যাগে আমার ব্যক্তিগত ডাইরী ও জিনিসপত্র ছাড়া আর কিছু ছিল না। এটা ভুল যে, আদালতে আমি যেসব ডাইরী ও চিঠিপত্র প্রমাণ করেছি, সেগুলো আমি পেয়েছিলাম না। আদালতে এগুলো প্রমাণের সময়ই আমি এগুলোর প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করি। আমি যখন দল ছাড়ি তখন এসব ডাইরী ও চিঠিপত্র সম্পর্কে আমার পক্ষ থেকে কোন প্রশ্ন করা হয়নি।"
সাক্ষী আরও বলেনঃ
আমার মনে হয়, ১৫ই মার্চের পরে হয়ত আমি ১০৭, ডি,এন,সেন রোডস্থ বাড়ীতে উঠি। ঐ সময়েই আমি বাড়ীটি ভাড়া নেই। বাড়ীটার ভাড়া ছিল

মাসে আড়াই শত টাকা। শেখ মুজিবর রহমান, জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রহুল কুদ্দুস ও মানিক চৌধুরী ছাড়া দলীয় তহবিলে অর্থদান করতে পারেন এমন আর কারো নাম আমি জানি না। যে ৪ জনের নাম আমি উল্লেখ করেছি তাঁরা ছাড়াও অন্যান্যের কাছ থেকে হয়ত আমি ২৪ হাজার টাকা পেয়েছিলাম। এই টাকাটা সংগ্রহ করেন ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও এল, এস, সুলতানউদ্দীন, তবে এটা আমার কাছে আনা হয়। পুলিসের কাছে আমার জবানবন্দীতে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, ওই ৪জন ছাড়াও অন্যান্যের কাছ থেকে আমি ২৪ হাজার টাকা গ্রহণ করি। অবশ্য, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আমার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে আমি একথা উল্লেখ করিনি। আমার ঢাকায় আসার পর আমার কাছে এই ২৪ হাজার টাকা আসে। মানিক চৌধুরীর কাছ থেকে যে ৩ হাজার টাকা নেয়া হয়, তা করাচী পাঠান হয়নি। এই ৩ হাজার টাকা এবং জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের কাছ থেকে পাওয়া সাড়ে ৫ হাজার টাকার মধ্যে আমার কাছে গচ্ছিত ৫ শত টাকার সমুদয় আমরা ঢাকায় খরচ করি।

আমি যখন দল ছেড়ে চলে যাই সেসময়ে বাড়ী ভাড়া বাবদ আমাকে দেড় হাজার টাকা দেয়া হয়।

প্র ঃ পার্টি ফান্ড সংক্রান্ত এইসব পত্রের কোন বই লেঃ মোয়াজ্জেমের কাছে দেখেছিলেন?

উ ঃ হ্যাঁ, দেখেছিলাম।

প্র ঃ আপনাদের মতানৈক্যের সময় লেঃ মোয়াজ্জেম কি আপনাকে হিসাবপত্র দেখিয়েছিলেন?

উ ঃ না।

প্র ঃ কোন মিটিংয়ে লেঃ মোয়াজ্জেম কি হিসাবপত্রের খাতা দেখান?

উ ঃ না।

প্রঃ হিসেবপত্র নিয়ে লেঃ মোয়াজ্জেমের সহিত আপনার তর্কাতর্কির সময় আপনি কি তাঁকে আপনার হিসেব দেখিয়েছিলেন?

উ ঃ জী হ্যাঁ।

প্রঃ পার্টি তহবিল ঠিকমত খরচ হচ্ছে না বলে আপনার যে সন্দেহ সেটা দলের আর কাউকে বলেছিলেন?

উত্তরঃ দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের আগে আমি শুধু ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও সুলতানউদ্দীনকে বলেছিলাম। এ প্রসঙ্গে সাক্ষী আরও বলেনঃ

"এই দুই ব্যক্তির সাথে যে সময় আমার এই আলাপ হয় সেসময় আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের হিসাবপত্র দেখিনি। এটা বলা ঠিক নয় যে, হিসাবপত্রের ব্যাপার নিয়ে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সাথে কোন কথা হয়নি

বলে আমি যা বলেছি, তাঁ কাল্পনিক ও মিথ্যা। পুলিসের কাছ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য অথবা তথাকথিত দল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য আমি এটাকে একটা চাতুরী মনে করিনি। এটা ঠিক নয় যে, পুলিস এবং আমার নিজের দ্বারা এ বক্তব্য ঠিক করা হয়েছে।

অতঃপর কৌসুলি মহাখালীতে অনুষ্ঠিত কথিত সভা সম্পর্কে রাজসাক্ষীকে কতিপয় প্রশ্ন করেন।

প্রঃ এল,এ,সি, এম,এ নওয়াজ, জুনিয়র ট্রেনার জেড, এইচ, চৌধুরী ও সার্জেন্ট মিয়াকে ত আপনি চেনেন? তাঁরা তখন কোথায় ছিলেন?

উত্তর ঃ ঢাকায়।

প্র ঃ মহাখালীর সভায় আপনি কি ব্যাখ্যা করেছিলেন?

উ ঃ দলের অগ্রগতি ব্যাখ্যা করেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ এই মিটিংয়ের সময় ভারত থেকে টাকা-পয়সা, অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ আসার কথাটি কি দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোপন বিষয় ছিল না?

উঃ হ্যাঁ, তা বটে।

প্রঃ খোলা মাঠেও সভা হয়েছিল, না?

উ ঃ হ্যাঁ।

এই সম্পর্কে কৌসুলির জেরার উত্তরে সাক্ষী আরও বলেনঃ

"আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একথা বলেছিলাম যে, আরজু হোটেলের বৈঠকে যোগদানকারীদের যাতায়াত খরচ দেওয়ার জন্য আমি সামাদকে বলেছিলাম। এটা ঠিক যে,আমি পুলিসকে বলেছিলাম যে, আমি সামাদকে যাতায়াতের খরচ দিতে বলি। আমি স্মরণ করতে পারছি না যাতায়াতের জন্য কত টাকা দিতে হয়েছিল। যাতায়াত খরচ বাবদ টাকাটা সামাদ দিয়েছিলেন আমার অনুপস্থিতিতে। কাজেই আমি বলতে পারছি না প্রকৃতপক্ষে তিনি কাকে কাকে এই টাকা দেন।"

সাক্ষী বলেনঃ Ext, P, W, 3/11 (অনুবাদ Ext, P, W, 3/11 A) চিহ্ন সম্বলিত পত্রে "বড় ভাই সাহেবের আমাকে ভুল বোঝা, উচিত নয়" বাক্যটি একথা বুঝায় না যে, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ভারতের সাথে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সম্পর্কে শেখ মুজিবর রহমানের চেষ্টা তদবির অনুমোদন করেননি। সামনে যা পাঠ করা হয়েছে আমি তাই বলেছি। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে চিঠিতে জানান যে, তিনি ১৯৬৬ সনের ১২ই অথবা ১৩ই মার্চে ঢাকায় আসছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি আসেন ১২ তারিখে। আমার মনে হয় তিনি এখানে দুপুরের দিকে আসেন। আমি বলতে পারছি না সেদিন কি বার ছিল। আমি স্মরণ করতে পারছি না ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে আমি একথা বলেছিলাম কিনা যে, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আসার পর আমি

বিমানবন্দর থেকে তাঁকে একটি ট্যাক্সী ভাড়া করে ধানমণ্ডীর 'আলেয়া'য় যাই অথবা ঐ সময় আমাদের সাথে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ছিলেন।"

সাক্ষী আরও বলেন, আমি স্মরণ করতে পারছি না ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে আমি একথা বলেছিলাম কিনা যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আসেন এবং তাঁকে শেখ মুজিবর রহমানের কাছে পাঠান হয় বৈঠকের সময় ঠিক করার জন্য। আমি স্মরণ করতে পারছি না–আমি একথা বলেছিলাম কিনা যে, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও আমি বাসষ্ট্যাণ্ডে যাই এবং সেখান থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার সময় শেখ মুজিবর রহমান আমাদেরকে তাঁর গাড়ীতে করে নিয়ে যান। আমি পুলিসের কাছে বলেছিলাম যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও আমি ঢাকা বিমান বন্দরে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে অভ্যর্থনা জানাই এবং একটি ট্যাক্সীতে করে তাঁকে ধানমণ্ডীর আলেয়ায় নিয়ে যাই এবং পরে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে শেখ মুজিবর রহমানের কাছে পাঠান বৈঠকের সময় ঠিক করার জন্য এবং তারপরে আমরা বাসষ্ট্যাণ্ডে যাই ও সেখান থেকে শেখ মুজিবর রহমান আমাদেরকে গাড়ীতে করে নিয়ে যান।

অতঃপর কৌসুলি প্রশ্ন করেনঃ

"তাজউদ্দীন সাহেবের বাসায় অনুষ্ঠিত কথিত সভায় দলের কোন নতুন সদস্য উপস্থিত ছিল?"

উ ঃ না।

প্র ঃ আপনি বলেছেন, ওই সভায় লেঃ মোয়াজ্জেম নাকি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ছাড়া তিনি আর কিছু মেনে নেবেন না। হঠাৎ তাঁর এই কথা বলার কারণ কি?

উ ঃ তেমন কোন কারণ নাই।

ও রকম কথা সব মিটিংয়ে বলা হত।

প্র ঃ তার মানে আপনি সব মিটিংয়ের ক্ষেত্রে ও কথাটা না বললে এই ষড়যন্ত্র মামলাই টিকে না?

উ ঃ না, তা ঠিক নয়।

প্র ঃ ও সভার কি কর্মসুচী ছিল, বলুন তো?

উ ঃ কোন কর্মসুচীই ছিল না।

প্রঃ আপনি বলেছেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেম ও শেখ মুজিবর রহমান মিটিং চলাকালে পাশের ঘরে গিয়ে কথা বলেন, এর কি কারণ হতে পারে?

উ ঃ তা বলতে পারি না।

প্র ঃ ওই সভায় জয়দেবপুর থেকে জনৈক ক্যাপ্টেন ও দলিলউদ্দীন উপস্থিত ছিলেন?

উ ঃ না, ছিলেন না।

প্র ঃ সভায় কোন নোট নেয়া হয়েছিল?

কৌসুলির এই প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলিয়া উঠিলেন– কোন ষড়যন্ত্রকারীই এরকম জিনিস লিখে রাখবে না। সাক্ষীর এই কথাটি বিশেষ অর্থবহ বলিয়া ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে সাক্ষী পুনরায় উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, " আমি তা' ওই মিটিং সম্পর্কেই বলেছি।"

প্র ঃ জনাব তাজউদ্দীনের বাসায় অনুষ্ঠিত কথিত মিটিংয়ে ঘোষণা করা হয়–হাবিলদার দলিলউদ্দীন ও সুলতানউদ্দীন রাঙ্গামাটি পার্বত্য এলাকার গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দিবেন– ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত আপনার জবানবন্দীতে আপনি কি একথা বলেছিলেন?

উ ঃ না বলিনি।

প্র ঃ ওই সভায় ভারত থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও টাকাপয়সা আনার কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল?

উ ঃ হ্যাঁ হয়।

প্র ঃ কোন সময় অস্ত্রশস্ত্র আসিয়া পৌছানোর কথা?

উ ঃ তা কিছু ঠিক হয়নি।

প্র ঃ গেরিলা যুদ্ধের জন্য ত কিছু অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন হত?

উ ঃ জী হ্যাঁ।

সাক্ষী আরও বলেনঃ লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের প্রাক্তন ব্যক্তিগত ভৃত্য শফী করাচী থেকে ঢাকায় কোন অস্ত্র বহন করে আনেনি। লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম ১৯৬৬ সনের ১৯শে মে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তাতে শফী অস্ত্র বহন করে আনবে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু সে কোন অস্ত্র বহন করে আনেনি।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী আরও বলেন, হতে পারে ১৯৬৩ সন থেকেই লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম বদলি হওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন।

অপর একটি প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী আরও বলেনঃ ১৯৬৬ সনের ৩০শে মার্চ লেঃ মোয়াজ্জেম লিখিত একটি চিঠির সাক্ষ্যে একটি কিংবা দুইটি চিরকুট ছিল কিনা আমি তা ঠিক মনে করতে পারছি না। এই দুইটি চিরকুট আমি আমার সাথেই রেখেছিলাম। পুলিস এই চিরকুট আটক করেছে। আমি এই আদালতে সাক্ষ্যদানকালে এই দুটো চিরকুটের একটি দেখেছি।

১৯৬৬ সনের ৩০শে মার্চ লিখিত পত্রটি আমি জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের কাছে অর্পণ করেছি বলে পুলিসের কাছে উল্লেখ করেছি।

সাক্ষী আরও বলেন যে,পুলিস যে চিঠি ও চিরকুট আটক করেছে তা যদি আমাকে দেখান হয় তা হলে আমি সনাক্ত করতে পারবো বলে আমি পুলিসের কাছে উল্লেখ করিনি। ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে লেফটেন্যান্ট

মোয়াজ্জেমকে যে ৫ সহস্র টাকা পাঠানো হয়েছে তা জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের কাছ থেকে সংগৃহীত ৫ সহস্র ৫ শত টাকার মধ্য থেকে নয়, সেটা অন্য টাকা। লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের কাছে আমি যে অর্থ পাঠিয়েছি তা বেআইনী কাজের জন্য এটা সত্য নয়। ঘটনা জোরালো করার জন্যই এই চিরকুটের কথা সাজানো হয়েছে, একথা সত্য নয়।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ শেখ মুজিবর রহমান আমার উপস্থিতিতে ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে যে ৪ সহস্র টাকা প্রদান করেন, কি জরুরী প্রয়োজনে তা তিনি নিচ্ছেন সে সম্পর্কে তাঁকে কোন প্রশ্ন করা হয়নি। ঐ অর্থ তাঁকে ড্রইং রুমে প্রদান করা হয়।

সাক্ষী আমীর হোসেন বলেন, প্রাক্তন কমোডর জামিল করাচীতে বাস করেন কিনা আমি জানি না। আমি করাচী ড্রিগ রোডে ৮ বছর বসবাস করেছি। সাবেক কমোডর জামিল ড্রিগ রোডে বাস করেন কিনা আমি জানি না। আমি কখনও তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করিনি।

সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেমকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপজাতীয় এলাকা থেকে অস্ত্র ক্রয় করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন বলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দী দিয়েছেন কিনা মনে নেই।

তিনি আরও বলেন যে, তিনি গোলাম মোহাম্মদকে চেনেন। তিনি গোলাম মোহম্মদকে চেনেন না বলে পুলিসের কাছে উল্লেখ করেননি।

প্র ঃ ডাঃ সাঈদুর রহমান ও শ্রী বিধান চন্দ্র সেনকে আপনি আগে থেকে চিনতেন?

উ ঃ তাঁদের সঙ্গে আমার একবার মাত্র চট্টগ্রামে দেখা হয়েছিল।

প্র ঃ তা হলে শুধু একবার মাত্র?

উ ঃ না, না একবার নয়। অনেকবার।

প্র ঃ অনেকবার? কোথায়?

উ ঃ তাঁরা দু'জনেই ঢাকায় আমার কাছে মাঝে মাঝে আসতেন।

প্র ঃ কোন্ তারিখে এসেছিলেন?

উ ঃ তারিখ বলতে পারি না। তবে দু'তিনবার এসেছিলেন।

প্র ঃ কোন্ মাসে এসেছিলেন সেটা অন্ততঃ বলুন?

উ ঃ তাও মনে নেই।

প্র ঃ তাঁরা কি জন্যে আসতেন?

উঃ এমনি আসতেন।

প্র ঃ একা আসতেন, না দু'জনে মিলে।

উ ঃ কখনো একা, কখনো দু'জনে মিলে।

প্র ঃ আপনি বুঝি তখন তাঁদের চা-রসগোল্লা খাওয়াতেন?

উ ঃ হ্যাঁ।

প্র ঃ ঢাকায় কোথায় তাঁরা উঠতেন ?

উ ঃ ২৩শে এপ্রিল একবার ঢাকায় এসে গ্রীন হোটেলে উঠেছিলেন বলে আমার মনে পড়ে। তবে অন্যরা কোথায় ছিলেন, বলতে পারি না।

প্র ঃ আপনি ঢাকায় আসতে বলতেন?

উ ঃ না।

সাক্ষী আরও বলেনঃ ঐ সময় আমি ১০৭, ডি এন সেন রোডে থাকতাম। ১৯৬৬ সনের এপ্রিল মাসের আগে তাঁরা আমার অফিসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন, তাঁদেরকে চা-পানে আপ্যায়িত করি। তাঁরা আমার কক্ষে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আমার কক্ষে আর কোন কর্মচারী ছিলেন না। আমার কক্ষে আমি একাই বসতাম। পিওন চা ও মিষ্টি নিয়ে আসে। সে আমার অফিস পিওন ছিল।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জিজ্ঞাসা করেনঃ পিওনের নাম কি?

উ ঃ না, আমি তার নাম বলতে পারছি না।

তারপর আদালত সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সাক্ষী কেন তাঁহার পিওনের নাম বলিতেছেন না। উত্তরে সাক্ষী বলেন, "আমি তার নাম স্মরণ করতে পারছি না।"

বিবাদীপক্ষের কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ ওই সময় আমি আমাকে টাকাপয়সা দেওয়ার জন্য তাঁদেরকে বলিনি। অন্য সময়ে আমার সাথে তাঁদের সাক্ষাতের কথা আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত আমার জবানবন্দীতে উল্লেখ করিনি এবং আমার মনে হয় পুলিসের কাছে তা আমি উল্লেখ করিনি। তাঁদের সাথে সাক্ষাতের আগে আমি একবার জয়দেবপুর যাই। সেবার আমার সাথে সুলতানউদ্দীন ছিলেন এবং এক অথবা দুইজনের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁদের নাম বলতে পারছি না। সুলতানউদ্দীন তাঁদেরকে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন; কিন্তু আমি তাঁদের নাম স্মরণ করতে পারছি না। এই সাক্ষাৎটি ঘটে ১৯৬৬ সালের মার্চে। ঐ সময় সুলতানউদ্দীন চট্টগ্রামে চাকুরীরত ছিলেন।

প্র ঃ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপনি কি বলেননি যে, ১৯৬৬ সালের ২৫শে এপ্রিল আপনারা জয়দেবপুর গিয়েছিলেন?

উ ঃ না, বলিনি।

এই সময় বাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের বলেন যে, ওই বাক্যের পূর্বে 'সম্ভবতঃ' শব্দটি রহিয়াছে।

প্র ঃ আপনি কি পুলিসকে বলেননি যে, '৬৬ সালের ২৫শে এপ্রিল আপনি, ডাঃ সাইদুর রহমান ও শ্রী বিধান সেন জয়দেবপুরে গিয়েছিলেন?
উ ঃ না, বলিনি।
প্র ঃ মিঃ আমীর হোসেন, আপনি কি জানেন আদালতে মিথ্যা কথা বললে তাঁকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে?
উ ঃ জী হ্যাঁ, জানি।
কৌঁসুলি তখন সাক্ষীকে বলেনঃ আপনি আপনার প্রথম বিবাহের কথা অস্বীকার করেছিলেন। আপনার বিরুদ্ধে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলার অভিযোগ আনব।
প্র ঃ বলুনত আপনারা কিসে করে জয়দেবপুর গিয়েছিলেন ?
উ ঃ দুটো বেবীট্যাক্সী করে।
প্র ঃ আপনিত সবসময় জীপটিপের নাম্বার মনেই রাখেন। বলুনতঃ বেবীট্যাক্সীর নাম্বার কি?
উত্তর ঃ বলতে পারি না।
প্র ঃ ঢাকা থেকে জয়দেবপুরের দূরত্ব কত?
উত্তর ঃ বলতে পারি না।
প্রশ্ন ঃ ভাড়া দিয়েছিলেন কত?
উত্তরঃ ১৬ টাকা– যেতে আসতে।
একসময় ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানকে কৌঁসুলির সহিত কতিপয় বিষয় আলোচনা করিতে শোনা যায়।
প্র ঃ কতক্ষণ সেখানে আপনারা ছিলেন?
উ ঃ কয়েক মিনিট।
প্র ঃ শুধু কয়েক মিনিট?
উ ঃ হ্যাঁ।
প্র ঃ জয়দেবপুর আপনারা কোথায় গিয়ে থামলেন?
উ ঃ আর্মী ষ্টেশনের গেটের কাছে। ওখানে আমরা কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা করি।
প্র ঃ ডাঃ সাইদুর রহমান ও শ্রী বিধান সেনকে তারা কি আগে থেকে চিনত?
উ ঃ না।
প্র ঃ জয়দেবপুরে আপনাদের জন্যে ক'জন অপেক্ষা করছিল?
উ ঃ ২/৩ জন।
প্র ঃ আপনারা যে যাচ্ছেন, সে খবর কি আগেই লোক মারফত তাদের জানিয়েছিলেন?
উ ঃ না।

প্র ঃ তারা কোথায় অপেক্ষা করছিল?
উ ঃ গেটের কাছে।
প্র ঃ গেটে কোন প্রহরী ছিল?
উ ঃ হ্যাঁ, ছিল।
প্র ঃ তারপর ওখান থেকে কোথায় গেলেন?
উ ঃ ওখান থেকে বাজারে গিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় বসে চা খেলাম।
প্র ঃ গেট থেকে রেস্তোরাঁটা কতদূর?
উ ঃ প্রায় ৫০ গজ দূরে।
প্র ঃ রেস্তোরাঁর মালিক ছিল সেখানে?
উ ঃ হ্যাঁ, ছিল।
প্র ঃ সেখানে আর কত লোক ছিল?
উ ঃ তা বলতে পারি না।
প্র ঃ তাদের কাউকে সনাক্ত করতে পারবেন?
উ ঃ না, তা পারবো না। তবে রেস্তোরাঁটা দেখাতে পারি।
এই সময় সাক্ষী আমীর হোসেন ট্রাইব্যুনালের নিকট বাথরুমে যাওয়ার অনুমতি চাহেন। চেয়ারম্যান বলেন, 'না'।
প্র ঃ দলের তহবিল থেকে ঢাকা থাকাকালে আপনি নিজের জন্যে ও অন্যান্যদের জন্যে কত টাকা খরচ করেছিলেন?
উ ঃ তা বলতে পারি না।
প্রঃ জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের স্ত্রীর পেট্রোল পাম্পে আপনি কখনো গিয়েছিলেন?
উ ঃ হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।
প্র ঃ আপনি জানেন, পেট্রোল পাম্পের আশেপাশে কয়েকটি দূতাবাস ও দূতাবাসের কর্মচারীদের বাসস্থান রয়েছে?
উ ঃ তা আমি জানি না।
প্র ঃ সামাদ সেখানে কতদিন চাকুরী করেছে?
উ ঃ যতদূর মনে পড়ে '৬৬-এর এপ্রিল পর্যন্ত, তারপর আমার জানা নেই।
প্র ঃ বেকার ছিল বলে কি সামাদ সেখানে চাকুরী পেয়েছিলেন?
উ ঃ তা ঠিক–তবে দলের কাজের জন্যও বটে।
প্র ঃ জোহা এখন কোথায় থাকে?
উত্তর ঃ বগুড়ায়।
প্রশ্ন ঃ '৬৬-এর মে ও জুন মাসে আপনি চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন?
উত্তর ঃ যেতে পারি।

প্র ঃ সরকারী না ব্যক্তিগত কাজে?
উ ঃ মনে পড়ছে না।
প্র ঃ ওখানে গিয়ে দলের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন?
উ ঃ শুধু এ,বি,খুরশীদ একবার আমার সঙ্গে দেখা করেন।
প্র ঃ আপনাদের 'মহান আন্দোলন' ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সে কথা আপনি কি তার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন?
উ ঃ না।
প্র ঃ আপনি একবার '৬৬-এর ১৭ই এপ্রিল ও একবার ১০ই জুন চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন?
উ ঃ মনে পড়ে না।
প্র ঃ চট্টগ্রামের হোটেল মিসকায় 'দুবারই উঠেছিলেন কি? উঠে থাকলে হোটেলে কি নিজের নাম ও সরকারী পদ পরিচয় দিয়েছিলেন?'
উ ঃ উঠে থাকলে নিশ্চয়ই তা দিয়েছি।
প্র ঃ আপনি কি হোটেলে নিজেকে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বলে পরিচয় দেননি?
উ ঃ হয়ত দিয়েছিলাম।
প্র ঃ আপনি কি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট?
সাক্ষীর হাতে এই সময় হোটেল মিসকার রেজিষ্টার বই তুলিয়া দিয়া কৌসুলি জিজ্ঞাসা করেন যে, রেজিষ্টার বইয়ে তাঁহার নাম তাঁহারই হাতে লেখা ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে কিনা?
সাক্ষী ঃ হ্যাঁ, এটা আমারই লেখা এবং আমি নিজেকে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বলে লিখেছি।
অতঃপর সাক্ষীকে মিসকা হোটেলের '৬৬-এর ১০ই জুন তারিখের রেজিষ্টার বই দেখান হয়। এই দিনও সাক্ষী মিসকা হোটেলে অবস্থান করিয়াছিলেন।
প্রশ্ন ঃ ওখানে আপনি নিজের কি পরিচয় লিখেছেন?
উ ঃ ষ্টাটিষ্টিক্যাল অফিসার হিসাবে।
প্র ঃ আপনার আসল পদ পরিচয় কি?
উ ঃ ষ্টাটীষ্টিক্যাল ইনভেষ্টিগেটর!
ইহার পর জনাব সালাম খান রাজসাক্ষী আমীর হোসেনকে জেরা সমাপ্ত করেন। জনাব সালাম খানের পর বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলি মীর্জা গোলাম হাফিজ সাক্ষীকে জেরা আরম্ভ করেন। তিনি সাক্ষীর জন্ম তারিখ ও ম্যাট্রিক পাস সংক্রান্ত বিষয়ে কতিপয় প্রশ্ন করেন। জবাবে সাক্ষী জানান যে, তাহার জন্ম তারিখ হইল ১৯৩৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারীতে এবং নিয়মিত ছাত্র হিসেবে তিনি ১৯৪৮ সালে তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন।

প্রশ্ন ঃ বলুনত আপনার মাট্রিক পরীক্ষার ফল কোন্ মাসে বেরোয়?
উ ঃ আমি তা বলতে পারি না।
প্র ঃ ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে কখন আপনার টেষ্ট পরীক্ষা হয়?
উ ঃ সম্ভবতঃ '৪৭-এ ডিসেম্বর মাসে।
প্র ঃ ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আপনি কি কোন ফর্ম পূরণ করেছিলেন?
উ ঃ জী হ্যাঁ।
প্র ঃ আপনার মনে আছে কি, ওই ফর্মে পরীক্ষার্থীর বয়স লেখার জন্য একটি 'ঘর' নির্দিষ্ট ছিল?
উ ঃ তা আমার মনে নেই।
প্র ঃ ফর্মে আপনার জন্ম তারিখ উল্লেখ করেছিলেন?
না আদৌ করেননি?
উ ঃ উল্লেখ করেছিলাম।
প্র ঃ কোন্ বছর ম্যাট্রিক পাস করেন?
উ ঃ ১৯৪৮ সালে।
প্রঃ তাহলে এখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করি–আপনি কি জানতেন, ওই সময় সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের নিয়ম ছিল যে, ১৫ বছরের কম বয়স্ক কেউ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারে না?
উত্তর ঃ না, তা আমি জানি না।
অতঃপর ট্রাইব্যুনাল আজ (শনিবার) সকাল নয়টা পর্যন্ত মূলতবী ঘোষণা করা হয়। বিবাদীপক্ষের কৌসুলি মীর্জা গোলাম হাফিজ আজ আবার জেরা করিবেন।

দৈনিক পাকিস্তান

১৭ই আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

একরারী সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার জেরা অব্যাহত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শুক্রবার "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" দু'নম্বর একরারী সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার জেরা অব্যাহত থাকে। এইদিন বিবাদীপক্ষের জেরার সপ্তম দিন অতিবাহিত হয়।

এইদিন প্রথমে কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন। পরে খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন আহমদ, জনাব আবদুস সালাম খান ও জনাব মীর্জা গোলাম হাফিজ জেরা করেন। এইদিন কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান তাঁর অসমাপ্ত জেরা সমাপ্ত করেন। মীর্জা গোলাম হাফিজের জেরা গতকাল অসমাপ্ত থাকে। তিনি আজ শনিবার পুনরায় জেরা শুরু করবেন।

আতাউর রহমান খান

কৌসুলী আতাউর রহমান খান সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া কর্তৃক তার স্ত্রীকে ২৯-১১-৫৮ তারিখে লিখিত পত্রে "এমএ ক্লাসে ভর্তি হয়েছি" বলে যে কথা উল্লেখ রয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

প্রঃ–আপনার এই চিঠি কি অসত্য?

উ–এই সময়ে আমি এমএ ক্লাসে ভর্তি হয়েছি এ কথা সত্য নয়।

প্র–আপনি যে এমএ পাস করেছেন, তার কোন প্রমাণ আছে?

উ–আমি প্রভিশনাল সার্টিফিকেট দেখাতে পারব। এটা আমার বাসায় রয়েছে।

প্র–এমএ'র ফল কবে প্রকাশিত হয়েছিল?

উ–১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বরে।

এই সময়ে কৌসুলী খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন সাক্ষীকে কয়েকটি প্রশ্ন করার অনুমতি চাইলে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান তা মঞ্জুর করেন।

নাজিরউদ্দীন

প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আপনার স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করেছিলেন যে, ঢাকায় দলীয় কাজের জন্য কে জি আহমদ টাকা সংগ্রহ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?

উ–ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এ কথা বলেছি কি না তা আমার মনে নেই।

এরপর কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান তাঁর অসমাপ্ত জেরা শুরু করেন।

আবদুস সালাম খান

প্র–১৯৬৭ সালের নবেম্বর মাসে আপনি কোথায় ছিলেন? আপনি কি জানেন যে,এই সময়ে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন চলছিল?

উ–না, আমি জানি না।

প্র–আপনি কি জানেন যে, বিরোধী দলের সদস্যগণ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জন করেছিলেন?

উ–না, আমার জানা নেই।

প্র–এই অধিবেশনে আমি এ্যাক্ট এর সংশোধন করে সেই আইনে বেসামরিক ব্যক্তিদের বিচারের ব্যবস্থা করা হয় তাকি আপনি জানেন?

উ– এমন কোন আইন গৃহীত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

প্র–এই সময়ে প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন এবং তিনি খুলনা ও চট্টগ্রাম সফর করেছিলেন?

উ–হতে পারে যে, তিনি খুলনা ও চট্টগ্রাম সফর করেছিলেন।

প্র–আপনি কি অবগত আছেন যে, বিদেশী সংবাদপত্রে এই মর্মে গুজব প্রকাশিত হয়েছিল যে, প্রেসিডেন্ট এর জীবনহানি করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল?

উ–না, আমার জানা নেই।

প্র–শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামী লীগের ৬-দফা দাবী কখন ঘোষণা করেছিলেন?

উ–১৯৬৬ সালের মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে। এই সম্পর্কে একটি পুস্তিকা আমার হস্তগত হয়েছিল।

প্র–৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণার পর প্রেসিডেন্টসহ বড় বড় সরকারী নেতাদের মধ্যে বিপুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, সেকথা কি জানেন?

উ–না।

প্র–বড় বড় সরকারী নেতারা এই আন্দোলনকে ধ্বংস করতেই হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন কি?

উ–আমার জানা নেই।

প্র–সেসময় থেকেই এদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা হচ্ছিল, তাই না?

উ–না, এটা আদৌ সত্য নয়।

প্র– এই মামলা সাজাতে আপনি সরকারকে সাহায্য করেছেন কি?

উ–না।

প্র–পুলিশ আপনার কাছ থেকে বিমানবন্দরে যে ব্যাগটি আটক করে, তাতে কেবলমাত্র ডায়েরী ও চিঠিপত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না?

উ–না, একথা সত্য নয়।

প্র–ব্যাগে যে চিঠিপত্র ও ডায়েরী ছিল সেগুলি আপনি কখন পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন? তখন আসলে আপনি তা পান নি, পরে আপনার ব্যাগে ভরে দেওয়া হয়েছিল, তাই না?

উ–না, এটা ঠিক নয়।

প্র–আপনি যখন দলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন, তখন এইসব চিঠিপত্র বা ডায়েরী নিয়ে কোন কথাবার্তা হয় নি?

উ-না।

প্র-আপনি দীননাথ সেন রোডের বাসায় কবে থেকে থাকতে শুরু করেন?

উ-মার্চ অথবা এপ্রিল থেকে।

প্র–কোন সঠিক তারিখ দিতে পারেন কি না?

উ–সম্ভবতঃ ১৫ই মার্চের পর থেকে–তখনই আমি বাসাটা ভাড়া করি।

প্র–কত ভাড়া ছিল?

উ–মাসিক ২৫০ টাকা।

প্র–আচ্ছা, দলের কাজে শেখ মুজিবর রহমান, আহমদ ফজলুর রহমান, রুহুল কুদ্দুস ও মানিক চৌধুরী ব্যতীত অন্য কোন লোক টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতো?

উ–আরো কেউ কেউ করতো। তবে, আমি তাদের নাম জানি না।

প্র–আপনার হাতে যে টাকা এসেছে, সেটা কি এই চারজনের কাছ থেকেই না অন্য কেউ টাকা দিয়েছেন?
উ–না, অন্যান্যরাও টাকা দিয়েছেন।
প্র–তাঁরা কে? এবং কত টাকা তাদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন?
উ–তাদের আমি চিনি না। কারণ স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও সুলতানউদ্দিন তাদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করেছে। মোট এদের কাছ থেকে ২৪ হাজার টাকা আমি পেয়েছি।
প্র-দলের টাকা-পয়সা যে ঠিকমত ব্যয় করা হচ্ছে না, এ সম্পর্কে আপনার সন্দেহের কথা দলের আর কাউকে বলেছিলেন?
উ–আমি স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও সুলতানউদ্দিনকে এ কথা জানিয়েছিলাম।
প্র–কখন বলেছিলেন?
উ–দলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের আগেই বলেছিলাম?
প্র–দলত্যাগের সময় কি আপনি লেঃ মোয়াজ্জেমের হিসেব পরীক্ষা করেছিলেন?
উ–না।
প্র–এই কথাগুলি কি আপনি পুলিশের সহযোগিতায় সাজিয়েছিলেন?
উ–না, মোটেই নয়।
প্র–আপনি যখন জানতে পারলেন যে, আপনাদের দলের পেছনে পুলিশ লেগেছে, তখন নিজেকে বাঁচানোর জন্য আপনি এই সব তৈরী করেছেন?
উ–না।
কৌসুলী তখন মহাখালীতে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কথা উল্লেখ করে জেরা করতে থাকেন।
প্র–আপনি কি জানেন এনএসি এম এ নওয়াজ, এটি জেড এ চৌধুরী ও সার্জেন্ট ভুঁইয়া কোথায় চাকুরী করতেন?
উ-তাঁরা তখন ঢাকা পি এ এফ কেন্দ্রে চাকুরী করতেন।
প্র–এই বৈঠকে আপনি দলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন?
উ–জি হ্যাঁ।
প্র-বৈঠকটি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উ–ফাঁকা মাঠে।
প্র–কতজন লোক যোগদান করে?
উ–১০/১২ জন।
প্র–আচ্ছা, ভারতের কাছ থেকে টাকাপয়সা ও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার কথাটা তো আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন বস্তু তাই না?
উ–হ্যাঁ।

প্রঃ–উপজাতীয় এলাকা হতে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয়ের কথা আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিতে বলেননি কেন? আপনি একটি পত্রে মোয়াজ্জমকে উক্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।
উঃ–লেঃ মোয়াজ্জমের নিকট এরূপ কোন প্রস্তাব আমি দিয়েছি বলে আমার মনে পড়ে না।
প্রঃ– আপনি সাদেক ও গোলাম মোহাম্মদকে চেনেন?
উঃ–গোলাম মোহাম্মদকে আমি চিনি।
প্রঃ–পুলিশের নিকট বিবৃতিতে আপনি বলেছেন যে, এদের কাউকেই আপনি চেনেন না?
উঃ–একথা আমি বলিনি।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ডাঃ সাইদুর রহমান ও বিধান সেন ঢাকায় কয়েকবার তার কাছে এসেছেন।
প্রঃ– আপনার সঙ্গে জয়দেবপুর যাওয়া ছাড়া আর কোন কোন তারিখে তারা ঢাকা এসেছেন?
উঃ–সঠিক তারিখ আমার মনে নেই। তবে দু'-তিনবার এসেছেন।
প্রঃ– কোন মাসে এসেছেন?
উঃ–তা বলতে পারব না।
প্রঃ–কি কারণে এসেছেন?
উঃ–এমনিই খোশ গল্প করার জন্য।
প্রঃ–দুজন কি একত্রে এসেছিলেন?
উঃ–আমি বলতে পারব না।
প্রঃ–ঐ সময় আপনি কোথায় থাকতেন?
উঃ–১০৭নং দীননাথ সেন রোডে।
প্রঃ–এপ্রিল মাসে তারা কোথায় আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেন?
উঃ–আমার অফিসে।
প্রঃ–তাদের আপনি চা-নাস্তা খাইয়েছিলেন?
উঃ–তাদের চা-পানে আপ্যায়িত করেছিলাম।
প্রঃ–তাদের কোথায় বসিয়েছিলেন?
উঃ–আমার কক্ষে।
প্রঃ–ঐ কক্ষে আর কে ছিলেন?
উঃ–ঐ কক্ষে আমি ছাড়া আর কেউ বসেন না।
প্রঃ–কে চা-নাস্তা এনে দিয়েছিল?
উঃ–অফিসের পিওন।
প্রঃ– তার নাম কি?
উঃ–তার নাম আমি জানাতে পারব না।

বিচারপতি এস এ রহমান– কেন?
সাক্ষী–নাম আমার মনে নেই।
কৌঁসুলী–তখন কি তাদের নিকট আপনি টাকা চেয়েছিলেন?
উঃ– না।
প্রঃ- আর কোন কোন সময় তারা এসেছিলেন? ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিতে আপনি কি একথা বলেছিলেন?
উঃ–না।
প্রঃ–আপনি ডাঃ সায়েদুর রহমান ও বিধানের সঙ্গে গমন করা ছাড়া আর কখনও জয়দেবপুর গিয়েছিলেন?
উঃ–হ্যাঁ, একবার গিয়েছিলাম।
প্রঃ– সেখানে কার কার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?
উঃ–একজন বা দুজন লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।
প্রঃ- তাদের নাম কি?
উঃ–আমি জানি না।
প্রঃ–সুলতানউদ্দীন কি সেখানে তাদেরকে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়নি?
উঃ–তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছিল–তবে তাদের নাম আমার মনে নেই।
প্রঃ–কোন সময় আপনি জয়দেবপুর গিয়েছিলেন?
উঃ–১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে।
প্রঃ–তখন সুলতানউদ্দীন কোথায় ছিল?
উঃ–সেসময় সুলতানের চট্টগ্রাম পোস্টিং ছিল।
সাক্ষী জেরার জবাবে আরও বলেন, আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলছি যে, ডাঃ সাইদুর রহমান ও বিধান সেনসহ আমি ২৫শে এপ্রিল জয়দেবপুর গিয়েছি। পুলিশের নিকট আমি বলিনি যে, সম্ভবতঃ ২৫শে এপ্রিল আমি জয়দেবপুর গিয়েছি।
প্রঃ–আপনি কি জানেন যে, যদি কোন মিথ্যা সাক্ষী দেয় তবে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়?
আদালতের নিকট আর্জি পেশ করব।

কৌঁসুলী সালাম খান তখন সাক্ষীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি একথা জেনেও আপনার প্রথম বিয়ে সম্পর্কে ইচ্ছাপূবর্ক মিথ্যা কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে আমি আদালতের নিকট মর্জি পেশ করব।

বিচারপতি এস এ রহমান বলেন যে, এটা কোন প্রশ্ন হল না। মাননীয় কৌঁসুলীর উচিত পরবর্তী প্রশ্ন করা।

জনাব সালাম খান বলেন, "আমি তাকেই প্রশ্ন করছি যে, সে ইচ্ছা করে মিথ্যা কথা বলেছে।"
বিচারপতি এস, এ, রহমান–ঠিক আছে, আপনি আপনার পরবর্তী প্রশ্ন করুন।
প্রঃ আপনি কিভাবে জয়দেবপুর গিয়েছিলেন?
উঃ দুখানা বেবীট্যাক্সি ভাড়া করে।
প্রঃ ঐ বেবীট্যাক্সির নম্বর কত?
উঃ আমার মনে নেই।
প্রঃ ঢাকা হতে জয়দেবপুরের দূরত্ব কত?
উঃ আমি বলতে পারব না।
প্রঃ ঢাকায় বড় ট্যাক্সি ভাড়া পাওয়া যায় একথা আপনি জানেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ ঐ বেবীট্যাক্সি করে কি আবদুর রহমান ও বিধান সেনকে চিনছিলেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ কত টাকা ভাড়া দিয়েছিলেন?
উঃ ১৬ টাকা।
প্রঃ আপনি জানেন ঢাকা হতে জয়দেবপুরের দূরত্ব ২৪ মাইল?
উঃ না।
প্রঃ সেখানে আপনারা কতক্ষণ ছিলেন?
উঃ কয়েক মিনিট।
প্রঃ একথা কি আপনি জানেন ঢাকা হতে ট্রেনে এবং বাসে জয়দেবপুর যাওয়া যায়?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ সেখানে যাদের সঙ্গে আপনাদের দেখা হয়েছে তারা ডাঃ সায়েদুর রহমান ও বিধান সেনকে চিনতেন?
উঃ না।
প্রঃ সেখানে লোকজনের সঙ্গে আপনাদের কোন জায়গায় সাক্ষাৎ হয়েছে?
উঃ আর্মি স্টেশন।
প্রঃ আপনারা যে সেখানে যাবেন এ খবর পৌঁছানোর জন্য কোন লোক আগে পাঠিয়েছিলেন?
উঃ না।
প্রঃ সেখানে কতজন লোক আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন?
উঃ ২/৩ জন।
প্রঃ কোথায় অপেক্ষা করছিল?
উঃ আর্মী স্টেশনের গেটের বাইরে ।

প্রঃ গেটে কোন প্রহরী ছিল?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ সেখান হতে কোথায় গমন করেন?
উঃ সেখান হতে আমরা বাজারে একটা রেস্টুরেন্টে গমন করি। সেখানে কথাবার্তা শেষ করে ফিরে আসি।
প্রঃ গেট হতে রেস্টুরেন্ট কত দূরে?
উঃ ৫০ গজ দূরে। চা খাওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে ছিলাম।
প্রঃ সেখানে চা দোকানের মালিক ছিলেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ আর কতজন লোক সেখানে ছিলেন?
উঃ আমি বলতে পারব না।
প্রঃ চা দোকানের মালিককে আপনি সনাক্ত করতে পারবেন?
উঃ না–তবে দোকান সনাক্ত করতে পারব।
প্রঃ ঢাকায় বদলী হয়ে আসার পর আপনি দলের তহবিল হতে নিজে কত টাকা ব্যয় করেছেন?
উঃ আমি বলতে পারব না।
প্রঃ অন্যান্যদের জন্য কত ব্যয় করেছেন?
উঃ বলতে পারব না।
প্রঃ আপনি জনাব এ,এফ,রহমানের স্ত্রীর পেট্রোল পাম্পে কখনও গিয়েছেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ আপনি কি জানেন, ঐ রাস্তার আশেপাশে কয়েকটি দূতাবাস রয়েছে এবং দূতাবাসের কর্মচারীরা বাস করেন?
উঃ না।
প্রঃ সামাদ ঐ পেট্রোল পাম্পে কতদিন কাজ করেছিল?
উঃ ১৯৬৬ সালের এপ্রিলের শেষ নাগাদ তারপরের খবর আমি জানি না।
প্রঃ সামাদের চাকুরী ছিল না বলেই সে সেখানে কাজ করেছিল তাই না?
উঃ সে পার্টির প্রয়োজনে সেখানে কাজ করেছিল।
প্রঃ যে জোহার কথা আপনি বলেছেন সে এখন কোথায়?
উঃ বগুড়ায় আছে।
প্রঃ–আপনি ১৯৬৬ সালের মে এবং জুন মাসে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন?
উঃ–হয়ত গিয়েছি।
প্রঃ–কি প্রয়োজনে?
উঃ–অফিসের কাজে না ব্যক্তিগত কাজে তা বলতে পারব না।
প্রঃ–দলীয় কোন লোকের সঙ্গে তখন আপনি দেখা করেছিলেন?
উঃ–না।

প্রঃ–কেউ আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল?
উঃ–এ বি খুরশীদ আমার কাছে এসেছিল।
প্রঃ–আপনি তাকে বলেছিলেন যে, আমাদের মহৎ আন্দোলন বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে?
উঃ–আমি এ সম্পর্কে তার সাথে কোন আলোচনা করিনি।
প্রঃ– আপনি কি মে ও জুনে একবারই চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন?
উঃ–হ্যাঁ।
প্রঃ- তখন আপনি কোথায় ছিলেন?
উঃ- আমি জেটি ইন্সপেক্টর সালাহউদ্দীনের বাড়ীতে ছিলাম।
প্রঃ–আপনি কি ১৭ই এপ্রিল এবং ১০ই জুন চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন?
উঃ- আমার মনে পড়ছে না।
প্রঃ–এই দুবারই কি আপনি মিসকা হোটেলে ছিলেন না?
উঃ– আমার মনে নেই।
প্রঃ– আপনি যখন হোটেলে থাকতেন তখন কি আপনার নাম ও অফিসের পদবী লিখতেন?
উঃ–যদি থেকে থাকি তবে নিশ্চয়ই আমার নাম ও পদবী সেখানে লিখেছি।
প্রঃ-আপনি হোটেলের রেজিস্টারে নিজেকে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বলে উল্লেখ করেছেন?
উঃ–হ্যাঁ। যদিও আমি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নই, তবুও মাঝে মাঝে আমি তা লিখেছি।

এরপর সাক্ষীর হাতে মিসকা হোটেলের রেজিস্টার প্রদান করা হয়। তিনি তা দেখে বলেন যে, তিনি নিজ হাতে ১৯৬৬ সালে নিজেকে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বলে উল্লেখ করেছেন।

সাক্ষী হোটেলের রেজিস্টার দেখে আরও বলেন যে, ১০-৬-৬৬ তারিখে আমি আমার নাম দেখতে পাচ্ছি। ঐদিন আমি মিসকা হোটেলে ছিলাম। আমি নিজেকে স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিসার বলে লিখেছি। আসলে আমি একজন স্ট্যাটিসটিকাল ইনভেসটিগেটার।

মীর্জা গোলাম হাফিজের জেরা

প্রঃ–আপনার জন্মের তারিখ বলুন?
উঃ–১-২-১৯৩৪ সন।
প্র- আপনি কোন বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেছেন?
উঃ–তৃতীয় বিভাগে।
প্রঃ–কোন মাসে আপনার পরীক্ষার ফল বেরিয়েছিল?
উঃ–আমি বলতে পারব না।
প্রঃ–কোন মাসে আপনি পরীক্ষা দিয়েছিলেন?
উঃ–সম্ভবতঃ ডিসেম্বর মাসে।

প্রঃ– আপনি প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন পূরণ করেছিলেন?
উঃ–হ্যাঁ।
প্র- তাতে বয়সের একটা ঘর আছে তা আপনি জানেন?
উঃ–আমার মনে নেই। তবে আমার জন্মের তারিখ তাতে লিখেছিলাম।
প্রঃ–আপনি কত বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করেছেন?
উঃ–১৪ বছর বয়সে।
প্র- আপনি জানেন যে, ১৫ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত কেউ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারে না। এই নিয়ম সম্পর্কে আপনি অবহিত আছেন?
উঃ–না।
মীর্জা গোলাম হাফিজের জেরা অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় মামলার শুনানী গতকালের মত শেষ হয়।
আজ শনিবারও মামলার শুনানী চলবে।

সংবাদ

১৮ই আগস্ট ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

রাজসাক্ষী আমীর হোসেনের সওয়াল জবাব অব্যাহত

অষ্টম দিবসে বিবাদীপক্ষের ছয়জন কৌসুলির জেরা

(নিজস্ব বার্ত্তা পরিবেশক)

গতকাল (শনিবার) ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়াকে লিখিত একখানি চিঠি ও সাক্ষীর দুইটি ব্যক্তিগত ডাইরী আদালতে পেশ করেন। জনাব মঞ্জুর কাদের জানান যে, ইতিপূর্বে ভুলবশতঃ চিঠিখানি আদালতে পেশ করা হয় নাই। জনাব মঞ্জুর কাদের ওই দলিলগুলি সম্পর্কে নূতন করিয়া জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করিলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান আপত্তি করেন। কিন্তু ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান তাঁহার আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া জনাব মঞ্জুর কাদেরকে 'রি-একজামিনেশনে'র অনুমতি দেন।

গতকাল বিবাদীপক্ষের ৩-জন কৌসুলি রাজসাক্ষীকে জেরা করেন। বিবাদীপক্ষের কৌসুলি মীর্জা গোলাম হাফিজের এক প্রশ্নের জবাবে অর্থনীতিতে এম,এ, রাজসাক্ষী জনাব আমীর হোসেন মিয়া বলেন যে, তিনি "ডায়ালেক্টি টিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম" কথাটি কখনো শোনেন নাই।

এক প্রশ্নের জবাবে জনাব আমীর হোসেন জানান যে,তিনি "থিউরীর অব মার্জিন্যাল ইউটিলিটি" ও "ডিমিনিশিং রিটার্ণস"-এর মধ্যে কি পার্থক্য

তাহা জানেন না। তিনি জানান যে, গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড (স্বর্ণমান) কি তাহা তিনি জানেন বটে, তবে এক্ষণে উহা ভুলিয়া গিয়াছেন।

গতকাল বিবাদীপক্ষের কৌসুলি মীর্জা গোলাম হাফিজ, জনাব ফজলুল করীম,জনাব জুলমত আলী খান, জনাব বদরুল হায়দার চৌধুরী, পুলিসের প্রাক্তন ইন্সপেক্টর জেনারেল জনাব আবদুল্লাহ ও জনাব আবদুল মালেক রাজসাক্ষী আমীর হোসেনকে জেরা করেন।

জেরার বিবরণ

গতকাল সকাল নয়টায় ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি মীর্জা গোলাম হাফিজ পূর্বের জের টানিয়া রাজসাক্ষী আমীর হোসেনকে জেরা শুরু করেন।

মীর্জা গোলাম হাফিজঃ আমি যদি বলি, ইতিপূর্বে সাক্ষ্যদানকালে আপনি ম্যাট্রিক পাস করেছেন বলে যা জানিয়েছেন তা মিথ্যা?

আমীর হোসেনঃ না, মিথ্যা নয়।

প্রশ্ন ঃ ম্যাট্রিক পাসের পরে আপনি কি করেন?

উত্তর ঃ ১৯৪৮ সালে ম্যাট্রিক পাসের পর আমি জনস্বাস্থ্য বিভাগে চাকুরী নেই।

প্রশ্ন ঃ তখন আপনার বয়স কত?

উ ঃ পনের কিম্বা ষোল।

প্র ঃ কোন সরকারী বা আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে যোগদানের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর, এটা ঠিক?

উ ঃ হ্যাঁ, ঠিক।

প্র ঃ আপনি অর্থনীতিবিদ লর্ড কিন্‌স্– এর নাম শুনেছেন?

উ ঃ হ্যাঁ শুনেছি।

প্র ঃ তাঁর কোন বই পড়েছেন?

উ ঃ এম এ ক্লাশে তাঁর একখানা বই পড়েছি–তবে বইয়ের নাম ভুলে গেছি।

প্র ঃ 'ডায়ালেক্টিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম'-এর কথা শুনেছেন?

উ ঃ না, শুনিনি।

প্র ঃ গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড কি জানেন?

উ ঃ গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড কি তা আমি জানি, তবে এখন মনে করতে পারছি না।

প্র ঃ থিউরী অব মার্জিন্যাল ইউটিলিটি ও ডিমিনিশিং রিটার্ণস-এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উ ঃ তা আমি জানি না।

এক প্রশ্নের জবাবে আমীর হোসেন মিয়া বলেন যে, করাচীতে তিনি ফরিদপুর জনকল্যাণ সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ এ সমিতির উদ্দেশ্য ছিল কি?
উ ঃ বেকার পূর্ব পাকিস্তানীদের চাকুরীর সংস্থান!
প্র ঃ টাকা-পয়সার হিসেব দিতে না পারায় আপনাকে সমিতি হতে বহিষ্কার করা হয়েছিল, এটা কি ঠিক?
উ ঃ ঠিক নয়।
প্র ঃ আপনি কি জানেন চীনের সহিত পাকিস্তানের বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক বিদ্যমান?
উ ঃ হ্যাঁ, তা জানি।
বিবাদীপক্ষের অপর কৌসুলি জনাব ফজলুল করীম অতঃপর সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন। জনাব ফজলুল করীমঃ অপনাদের বিপ্লবী সংস্থার কোন নাম দেয়া হয়েছিল?
উ ঃ না।
প্রঃ সংগঠনের কোন প্রচারপত্র ছিল ?
উঃ না।
প্র ঃ আপনারা পার্টির কোন হ্যাণ্ডবিল প্রকাশ করেছিলেন?
উ ঃ না।
কৌসুলির বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী বলেন যে, তাঁহাদের বিপ্লবী সংস্থায় তাঁহারা শেখ মুজিবর রহমান ও লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমকে পার্টির 'আদর্শ নেতা' বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা নাগা নেতা ডঃ ফিজোর নিকট হইতে কোনরকম অনুপ্রেরণা লাভ করেন নাই।
প্র ঃ দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্যে বর্তমান শাসনতন্ত্রে ব্যবস্থা রয়েছে, এটা আপনি জানেন?
উ ঃ জী হ্যাঁ, জানি।
প্রঃ বিপ্লবী সংগঠনে থাকাকালে এই ব্যবস্থাকে আপনি কি যথেষ্ট মনে করতেন?
উ ঃ না।
প্র ঃ আপনি তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা পড়েছেন?
উত্তর ঃ হ্যাঁ পড়েছি।
প্রশ্ন ঃ ১৯৫৮ সালের মধ্যে বৈষম্য নিরসন করা হবে বলে তাতে বলা হয়েছে, একথা আপনি জানেন?
উত্তর ঃ আমার মনে পড়ছে না।
এক প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন বলেন যে, বিপ্লবী সংগঠনে থাকাকালে তিনি মনে করিতেন যে, স্বাধীনতাই বৈষম্য নিরসনের একমাত্র উপায়।

প্র ঃ বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের সঙ্গে লাহোর প্রস্তাবের কোন মিল রয়েছে?
উ ঃ তা' আমি জানি না।
কৌসুলির অপরাপর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, দুই অর্থনীতি ও দুই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিতে দুই প্রদেশের মধ্যে নূতন ফেডারেশন গঠনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি রাজনৈতিক দল প্রস্তাব করিয়াছিল–একথা তিনি পত্রিকা পাঠ করিয়া জানিতে পারেন। এই জাতীয় নূতন ফেডারেশন গঠনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে কোন অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল কি না তাহা তিনি বলিতে পারেন না বলিয়া জানান।
কৌসুলির পরবর্তী প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানান যে, অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের অর্থ কি তাহা তিনি বলিতে পারেন না।
প্র ঃ লেঃ মোয়াজ্জেম মার্কিন দূতাবাসের মিঃ নোবেলের সঙ্গে সাক্ষৎ করেছিলেন কি উদ্দেশ্যে?
উ ঃ অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের জন্য।
প্র ঃ আপনি কি জানেন যে, ১৯৬৬ সালে মার্কিন সরকার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন?
উ ঃ তা জানি না।
প্র ঃ আপনি কি জানেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছুতেই স্বাধীন বাংলা সৃষ্টির ব্যাপারে কোনরূপ সাহায্য করতে পারে না?
উ ঃ তা শুনিনি।
প্র ঃ আপনি এ আদালতে বলেছেন যে, আপনাদের দল পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র–অর্থাৎ পাকিস্তানের মধ্যে আর একটি পাকিস্তান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে আর একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে ভারত সাহায্য করবে– এটা কি হাস্যকর নয়?
উ ঃ তা জানি না তবে আমাদের নেতারা তা-ই ভেবেছিলেন।
প্রশ্ন ঃ আমি যদি বলি যে, আপনি পাকিস্তানের ভিতরের এবং বাইরের শত্রুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কয়েকটি বিদেশী শক্তিকে এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়াতে চাচ্ছেন–যাতে এইসব বিদেশী শক্তির কাছ থেকে আর কোন সাহায্য না পায়?
উ ঃ এটা সত্য নয়।
ইহার পর কৌসুলি প্রশ্ন করেনঃ এখন বলুন তো মহাখালী টি-বি হাসপাতালের দক্ষিণে কোন খোলা মাঠ নেই– সেখানে একটি খাল রয়েছে কিনা?
উ ঃ না, সভার সময় মাঠে কোন পানি ছিল না।
প্র ঃ মহাখালীর ম্যালেরিয়া ইন্সটিটিউটটি চেনেন? কোন্ দিকে?
উ ঃ তা বলতে পারি না।

প্রঃ মহাখালীর রেলক্রসিংটা টি,বি, হাসপাতালের কাছে, না ম্যালেরিয়া ইন্সটিটিউটের কাছে?
উ ঃ তা মনে পড়ছে না।
প্র ঃ আপনি সার্জেন্ট শামসুল হক বলে কাউকে চেনেন?
উ ঃ তা মনে পড়ছে না।
প্র ঃ আপনি সার্জেন্ট শামসুল হক বলে কাউকে চেনেন?
উ ঃ সার্জেন্ট শামসুল হক বলে কাউকে চিনি না তবে অভিযুক্তদের মধ্যে সার্জেন্ট হক বলে একজনকে চিনি।
প্র ঃ অভিযুক্ত সার্জেন্ট হকের পুরো নাম কি?
উ ঃ তা জানি না। তবে তাকে আমি সনাক্ত করেছি।
এই প্রসঙ্গে কৌসুলির অপরাপর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ আদালতে অভিযোগকালে শামসুল হকের নাম বাদ দিয়ে অপর কারু নাম বসানোর ব্যাপারটি আমি আদালতে হাজির হওয়ার আগে তদন্তকারী অফিসার আমার সাথে আলোচনা করেছেন বলে কথা ভুল। সেসময় ঢাকাস্থ পি,এ,এফ,এ কতজন হক ছিলেন তা আমার জানা নেই। আমাদের বৈঠকে যোগদানকারী দু'জন হককেই আমি চিনি। আমি পি,এ,এফ-এর তৃতীয় আর একজন হককে চিনি না। আমাদের বৈঠকে যোগ দেওয়ার সময় শামসুল হক মাত্র একজন কর্পোরাল ছিল কথা ঠিক নয়।
তিনি ১৯৬৬ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে সার্জেন্ট পদে উন্নীত হয়ে থাকবেন। তাঁকে সার্জেন্ট হিসেবে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি বললে ভুল হবে। মহাখালীর সভায়ই তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। আমি পুলিসের কাছে আমার জবানবন্দীতে তাঁদের দু'জনেরই উল্লেখ করি। আমি কেবলমাত্র সার্জেন্ট ফজলুল হকই সভায় যোগ দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছি বললে ঠিক হবে না।

আবদুল্লাহ

জনাব ফজলুল করীমের পর বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুল্লাহ সাক্ষীকে জেরা করেন।
আপনি যখন পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগ দেন তখন কি আপনার এই রকম কণ্ঠস্বর ছিল?
উ ঃ জী হ্যাঁ।
চেয়ারম্যান ঃ (কৌসুলির প্রতি) আপনি সাক্ষীকে মামলার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করছেন কি?
কৌসুলি ঃ মাননীয় বিচারপতি আমার বক্তব্য হল, সাক্ষী কবে ও কোথায় তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর হারিয়েছেন সেটা আমি বের করতে চাই।

প্র ঃ আপনি কি জানেন যে, সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদানের ব্যাপারে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর একটা অযোগ্যতার প্রমাণ?
উ ঃ আমার ধারণা তা ঠিক নয়।
প্র ঃ রিক্রুট করার সময় তারা আপনার কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করেছিলেন?
উ ঃ আমার মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়েছিল তবে তাঁরা আমার কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করেননি।
প্র ঃ আপনি কি জানেন যে, 'কম্যাণ্ড' করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের ভালো কণ্ঠস্বর থাকা দরকার এবং ভর্তির সময় তা পরীক্ষা করে দেখা হয়?
উ ঃ আমি জানি না।
প্র ঃ আপনার কোন অধঃস্তন কর্মচারী ছিল যাদের আপনি কম্যাণ্ড করতেন?
উ ঃ হ্যাঁ ছিল এবং আমার এই বর্তমানে কণ্ঠস্বর নিয়েই কম্যাণ্ড করতাম।
প্রঃ এখন আমি যদি বলি যে, আপনি সত্য কথা বলছেন না, আসলে আপনি পরবর্তীকালে অতি সম্প্রতি পূর্বের কণ্ঠস্বর হারিয়েছেন?
উঃ এটা ঠিক নয়।

জুলমত আলী খান

অতঃপর বিবাদীপক্ষের অপর কৌসুলি জনাব জুলমত আলী খান জেরা শুরু করিলে রাজসাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া জানান যে, জয়দেবপুরে তাঁহার সহিত যাহাদের দেখা হইয়াছিল তাঁহাদেরকে সূলতানউদ্দীন পরিচয় করাইয়া দেন বলিয়া সাক্ষী পুলিসের নিকট বলিয়াছিলেন কিনা তিনি স্মরণ করিতে পারিতেছেন না।
প্র ঃ আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তা কি বলেছিলেন?
উ ঃ তাও মনে নেই।
প্র ঃ আপনি কি '৬৬-এর ৩রা ফেব্রুয়ারীর পরের রাতে চট্টগ্রামে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে ফোন করেছিলেন বলে পুলিসকে জানান?
উ ঃ তা মনে পড়ছে না।
প্র ঃ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছিলেন?
উ ঃ বলতে পারি না।
প্র ঃ পুলিসকে কি আপনি বলেছিলেন যে, মানিক চৌধুরী ও বিমান সেন চট্টগ্রামে '৬৬-এর ৭ই ফেব্রুয়ারী আপনার কাছে এসে ৩ হাজার টাকা দিয়েছিলেন?
উ ঃ হ্যাঁ, বলেছিলাম।
প্র ঃ ও কথা কি আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে বলেছিলেন?
উত্তর ঃ তা মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন ঃ জয়দেবপুর থেকে আপনারা কখন ফেরেন?
উত্তর ঃ দুপুর দুটো আড়াইটে।
প্র ঃ কখন জয়দেবপুর গিয়ে পৌঁছান?
উ ঃ মনে নেই।
প্র ঃ চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় কিসে ও কটায় ফেরেন?
উ ঃ সকালে– প্লেনে করে।
প্র ঃ ঢাকা থেকে চাটগাঁ যাবার পথে কোন চেনা লোকের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?
উ ঃ মনে পড়ছে না।
প্র ঃ চট্টগ্রামে গিয়ে?
উ ঃ শুধু জেটি ইন্সপেক্টর সালাহউদ্দীন আহমদের সঙ্গে তার কোয়ার্টারে দেখা হয়।
প্র ঃ সেটা কোন তারিখে?
উ ঃ বলতে পারি না।
ইহার পর কৌসুলির অপর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী আরও বলেনঃ কোন তারিখে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি তা আমি বলতে পারছি না। ১৯৬৬ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত বৈঠক সমাপ্তীর পর সবাই চলে গেলে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান থেকে যান এবং তিনি ১৯৬৬ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী পরবর্তী বৈঠকের প্রস্তাব করেন। ১৯৬৬ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারীর বৈঠক রাত্রি ৯টা অথবা ১০টায় শেষ হয়। ৬ তারিখের বৈঠক সুর্যাস্তের পর অনুষ্ঠান করার কথা ঠিক হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারীর বৈঠকে যারা যোগদান করেন, তাঁরা একজন একজন করে আসেন। সবার আগে আসেন ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান। ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান বৈঠকে যোগদানকারীদের সবাইকে এক এক করে পরিচয় করিয়ে দেন।
প্র ঃ মিটিংটা কখন শুরু হয়?
শেষ হয় কখন?
উ ঃ কোনটাই বলতে পারি না।
প্র ঃ যদি আমি বলি যে, '৬৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মানিক চৌধুরী ও বিধান সেনের উপস্থিতিতে হোটেল মিসকায় আসলে কোন মিটিং-ই হয়নি।
উ ঃ তা ঠিক নয়।
প্র ঃ আপনি আপনার নাম 'হোসেন' লেখার আগে কি লেখেন?
উ ঃ কখনো "এ,এম", কখনো "এম,এ"।
প্র ঃ 'এ,এম' বলতেই কি বোঝান, আর 'এম,এ' বলতেই বা কি?
উ ঃ 'এ,এম' বলতে আমি শুধু 'আমীর' বোঝাই,

কৌসুলি জনাব জুলমত আলী খানের অপর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী আরও বলেন যে, ষ্টুয়ার্ডদের ডিউটি কখন শুরু হয়, ডিউটি থাকিলে ২৪ ঘণ্টা ও ছুটি থাকিলেও ২৪ ঘণ্টা কিনা তাহা তিনি জানেন না।
প্র ঃ আপনি কি 'কমব্যান্টাটা' ছিলেন?
সাক্ষী 'কমব্যাটান্ট' শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারায় কৌসুলি তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন। পরে সাক্ষী জবাব দেনঃ
"বিমান বাহিনীর সবাই যুদ্ধ করতে পারেন।"
প্র ঃ আপনি হাতবোমা ছুঁড়তে জানেন?
উ ঃ জানি।
প্র ঃ আপনি কি জানেন যে, লাহোর আক্রমণের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের পার্শ্বে পূর্ব পাকিস্তানীরাও দাঁড়ায়।
উ ঃ জানি।
প্র ঃ ওই সময় এখানকার লোকেরা অস্ত্র চাচ্ছিলেন, জানেন?
উ ঃ তা সত্য।
প্র ঃ লাহোরের প্রতিরক্ষার জন্য বেঙ্গল রেজিমেন্ট কী ভূমিকা পালন করেছিল তা জানেন ?
উ ঃ জানি।
প্র ঃ আপনি কি এটা জানেন যে, তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরের পরে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি এমন আচরণ করতে শুরু করলেন যাতে এখানকার জনসাধারণ হতাশ হয়েছিল?
উ ঃ না, জানতাম না।
প্র ঃ মিয়া সাব, এখন বলুন তো ড্রিগ রোডের 'নাট্য সমিতি'তে আপনি যোগ দিয়েছিলেন কি?
উ ঃ হ্যাঁ, আমি ওই সমিতির সদস্য ছিলাম।
প্র ঃ কবে থেকে তবলা বাজাচ্ছেন?
উ ঃ মনে পড়ছে না ।
প্র ঃ শিখলেন কোথায়?
উ ঃ বিমান বাহিনীতে থাকার সময়।
প্রঃ তখনই কি নাটক করতে শিখেছেন?
উঃ আমি কখনো নাটকে অভিনয় করিনি।
প্রঃ যুদ্ধের সময় ভারতের বিরুদ্ধে লোকজনের মনোভাব দেখেই বুঝি আপনি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও বিপ্লবী সংগঠনের প্রতি আপনার মত বদলে ফেলেন?
উ ঃ তা ঠিক নয়।

প্র ঃ বলুন ত শেয়ার হোল্ডার্স বলতে আপনি যে শেখ মুজিবর রহমান, জনাব এ, এফ রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও মিঃ মানিক চৌধুরীর নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন–তা' একেবারে মিথ্যে কথা?
উ ঃ সেটা ঠিক নয়।

দৈনিক পয়গাম
১৮ই আগস্ট ১৯৬৮
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দুই নম্বর রাজসাক্ষী এবং তিন নম্বর সাক্ষী জনাব আমীর হোসেন মিয়া গতকল্য (শনিবার) ট্রাইব্যুনালে বলেন যে, সেপ্টেম্বর যুদ্ধের সময় ভারত পাকিস্তান জয় করুক, বিপ্লবী দলের সদস্যবৃন্দ ইহা চাহে নাই। তাহারা ভারতের সাহায্যে কেবল পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করিতে চাহিয়াছিল।

গতকল্য বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মনজুর কাদের সাক্ষীকে পুনরায় প্রশ্ন করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, কেন তাহারা (বিপ্লবী দল) আন্দোলন সার্থক করিবার জন্য সেপ্টেম্বর যুদ্ধকে সুবিধাজনক সময় হিসাবে গণ্য করিয়া ইহার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই?

বাদীপক্ষের সওয়াল-জওয়াবের পূর্বে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী মীর্জা গোলাম হাফিজ, জনাব ফজলুল করিম, জনাব এম, এ, আবদুল্লা, জনাব জুলমত আলী খান, জনাব বদরুল হায়দর চৌধুরী এবং জনাব আবদুল মালেক জেরা করেন।

অদ্য (রবিবার) শুনানী মুলতবী থাকিবে।

সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান , ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম, আর, খান এবং বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিম সমবায়ে এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছে।

(বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের পুনরায় সাক্ষী আমীর হোসেনের জবানবন্দী গ্রহণকালে উল্লেখ করেন যে, বিবাদীপক্ষের কৌসুলিগণ সাক্ষীকে জেরা করার জন্য কতগুলি রেকর্ড তলব করেন। সাক্ষী আমির হোসেন বলেন যে, আমি যদিও সেই সময় ঢাকা হোটেলে অবস্থান করিতেছিলাম তবুও করাচীতে প্রেরিত টেলিগ্রামে আমি ১০৭, ডি এন, সেন রোড এই ঠিকানা উল্লেখ করি। আমি ঢাকা হোটেলে রেসিডেন্ট হিসাবে নাম লিখাই নাই বলিয়া সুলতানউদ্দিন আমাকে চিঠিপত্র লেখার জন্য এই ঠিকানা প্রদান করেন।)

(বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান এই প্রশ্নের এবং সাক্ষীর ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেন। তাঁহার আপত্তি প্রত্যাখ্যাত হয়)।

(সাক্ষীকে বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের জিজ্ঞাসা করেন, তাহাদের আন্দোলন আগাইয়া লওয়ার জন্য কেন তাহারা ভারতের সহিত যুদ্ধকালীন সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। জনাব আবদুস সালাম খান এই প্রশ্নের আপত্তি জানান। তাঁহার আপত্তি প্রত্যাখ্যাত হয়)।

সাক্ষী বলেন যে, ভারত পাকিস্তান জয় করুক ইহা আমরা চাই নাই। আমরা শুধুমাত্র ভারতের সহায়তায় স্বাধীন হইতে চাহিয়াছিলাম।

সাক্ষীর পুলিশের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে শফিকে ৭০০ টাকা প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া যে তথ্য উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে জনাব মঞ্জুর কাদের সাক্ষীকে একটি প্রশ্ন করিতে চাহিলে তারা প্রত্যাখ্যাত হয়।

(রেকর্ডের ১৭৩ পৃষ্ঠার নীচের অংশে যে বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে উহার প্রসঙ্গে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন কি অনুমোদন করেন নাই সাক্ষীকে তাহা জিজ্ঞাসা করা হয়)।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহিত সরাসরি যোগাযোগ করুক লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন তাহা চান নাই।"

(বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী এই পর্যায়ে বলেন যে, সাক্ষীর ব্যাগ হইতে যে বাংলা চিঠিখানি উদ্ধার করা হইয়াছিল ভুলবশতঃ তিনি উহা আদালতে দলিল হিসাবে পেশ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। এখন উহা পেশ করার অনুমতিদানের জন্য তিনি আবেদন জানান। তিনি বলেন যে, এই চিঠিখানিকে আটক দ্রব্যের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল এবং ইহার ক্রমিক নম্বর ৪০। ইহাকে একটি নূতন দলিল হিসাবে পেশ করা যাইতে পারে এবং ইহার উপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের সাক্ষীকে জেরা করার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। এ ব্যাপারে সাক্ষীকে জেরা করার অনুমতি দেওয়া হয়)।

সাক্ষী জনাব আমীর হোসেন মিয়া জনাব মনজুর কাদেরের নিকট প্রদত্ত পুনঃ জবানবন্দীতে বলেন যে, ১৯৬৬ সালের ২২শে মার্চ তারিখের যে বাংলা চিঠিখানি এখন আমাকে দেখান হইল উহা আমি পূর্বে দেখিয়াছি। ইহা 'আলো' অর্থাৎ লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের চিঠি এবং আমি ইহা পাইয়াছিলাম। ইহা তাহার হাতের লিখিত। (পত্রখানি আদালতের দলিলরূপে পি, ডব্লিউ ৩/৬৪ চিহ্নিত করা হইয়াছে।)

যে খামের মধ্যে এই পত্রখানি পাওয়া গিয়াছিল তাহাকে আদালতের দলিল হিসাবে পি, ডব্লিউ ৩/৬৫ চিহ্নিত করা হইয়াছে। (সাক্ষী আরও বলেন যে, এই পত্রখানি প্রথম সামাদ পায় এবং পরে তাহার হাতে দিয়াছিল। পত্রখানি সামাদের কেয়ার অবে আমার নামে লিখা হইয়াছিল)। আমি পত্রখানির ইংরেজী অনুবাদ দেখিয়াছি। ইহা পত্রখানির সঠিক অনুবাদ। এই চিঠির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ব্যবসাটি চালাইবার জন্য কাহাকেও ম্যানেজার

হিসাবে নিয়োগের যে কথা উল্লেখ রহিয়াছে, তাহার দ্বারা আমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংস্থার প্রধানকে বুঝানো হইয়াছে।

(জনাব মনজুর কাদের অনুরোধ জানান যে, সাক্ষীর যে দুইটি ব্যক্তিগত ডাইরী বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জেরার জন্য তলব করিয়াছিলেন এবং জেরার সময় সাক্ষীকে যেগুলি সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করা হইয়াছিল, সেইগুলি এখন প্রমাণ করিতে দেওয়া হউক।

বিশেষতঃ জনাব এ, বি খুরশীদ ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের কথা অনুযায়ী ডাইরীতে যে তালিকাটি নিজ হাতে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং ডাইরীতে সংস্থা সদস্যদের মধ্যে ব্যয় বাবদ যে অল্পস্বল্প অর্থ বিতরণের কথা লেখা রহিয়াছে তাহা প্রমাণের অনুমতির জন্য জনাব মনজুর কাদের অনুরোধ জানান। তিনি বলেন যে, এই দলিল বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলীর পেশ করা উচিত ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা করা হয় নাই। আদালত এখন তাঁহাকে সেই ডাইরীগুলিও উহার অন্তর্ভুক্ত তালিকাসমূহ প্রমাণের জন্য তাহাকে (বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলীকে) অনুমতি প্রদান করিতেছে। কিন্তু আদালত উক্ত অল্পস্বল্প ব্যয় বাবদ অর্থ বিতরণের ব্যাপারটি সাক্ষীর নিকট হইতে প্রমাণ করার প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া মনে করেন না। বিবাদীপক্ষের কৌসুলীকে দলিলে যাহা পেশ করা হইবে তাহার ব্যাপারে সাক্ষীকে জেরা করার অনুমতি দেওয়া হইবে।) (সাক্ষীকে তখন আদালতের পি, ডব্লু ৩/৬৬ এবং পি, ডব্লু ৩/৬৭ দলিল হিসাবে চিহ্নিত ডাইরী দুইটি প্রদান করা হয় এবং সেইগুলি কি তাহা জিজ্ঞাসা করা হয়।) সাক্ষী বলেন, "এইগুলি আমার ব্যক্তিগত ডাইরী।

(সাক্ষীকে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের কথা অনুযায়ী জনাব এ, বি, খুরশীদের হাতে ডাইরীতে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত সংযোগ স্থাপন সম্পর্কিত তালিকাসমূহ উল্লেখ করার জন্য বলা হয়। সাক্ষী পি, ডব্লু ৩/৬৬ তালিকা হিসাবে চিহ্নিত ছয়টি পৃষ্ঠা দেখাইয়া দেন। ইহা অভিযুক্ত এ, বি, খুরশীদের বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। পি, ডব্লু ৩/৬৭ রূপে চিহ্নিত ডাইরীতেও এ, বি, খুরশীদের হাতে লেখা অনুরূপ দুইটি পৃষ্ঠা আছে এবং উহা পি, ডব্লু ৩/৭৪ ও পি, ডব্লু ৩/৭৫ দলিল রূপে চিহ্নিত হইয়াছে।)

(জনাব মঞ্জুর কাদেরও সাক্ষীর ১৯৬৭ সালের অফিসের হাজিরা খাতা হইতে এইসব এন্ট্রি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর জন্য এইসব দলিল আনয়ন করা হয়; কিন্তু প্রমাণিত হয় নাই। তিনি বলেন যে, জেরার সময় যাহা বলা হইয়াছে ডাইরীতে উল্লিখিত বিষয়ের সহিত তাহার সঙ্গতি রহিয়াছে এবং এ ব্যাপারে পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে তাহাকে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। তাহাকে উহা করিতে অনুমতি দেওয়া হয় এবং এই সাক্ষ্য সম্পর্কে জেরা করার ব্যাপারে বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর অধিকার থাকিবে)।

সাক্ষী বলেন, আমাকে প্রদত্ত ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসের হাজিরা খাতা আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। ১৯৬৭ সালের ১৬ই নভেম্বর আমাকে উপস্থিত চিহ্নিত হইয়াছে এবং ১৭ই হইতে ২৮শে নভেম্বর পর্যন্ত আমাকে অনুপস্থিত চিহ্নিত করা হইয়াছে, পুনরায় এই হাজিরা খাতায় ২৯শে ও ৩০শে নভেম্বর আমাকে উপস্থিত চিহ্নিত করা হইয়াছে।

অপর পৃষ্ঠায় ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাস সম্পর্কিত যেসব এন্ট্রি আছে, অপর পৃষ্ঠায় আমি তাহাও দেখিতে পাইতেছি। ১লা, ২রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাকে অফিসে উপস্থিত দেখানো হইয়াছে এবং ৫ই ডিসেম্বর হইতে আমার নামের পাশে লেখা হইয়াছে "করাচী গিয়াছে; সাময়িকভাবে বরখাস্ত।"

সাক্ষী বলেন, যখনই আমি অফিসে হাজির হইতাম, তখনই হাজিরা খাতার সংশ্লিষ্ট কলামে আমার স্বাক্ষর দিতাম। আমার দ্বারা প্রমাণিত দুইটি এন্ট্রির সংশ্লিষ্ট কলামে আমার হাজিরার চিহ্ন সম্বলিত আমার স্বাক্ষর রহিয়াছে। ডিসেম্বরের এন্ট্রিতে যাহা নোট করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে– আমি করাচী যাত্রা করিয়াছিলাম। ইহার অর্থ সরকারী কাজে আমাকে করাচী ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। ডিলিং ক্লার্কের ইহাতে স্বাক্ষর ছিল।

বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী মীর্জা গোলাম হাফিজ গতকল্য (শনিবার) রাজসাক্ষী জনাব আমীর হোসেন মিয়াকে জেরা করেন।

প্রশ্ন–আপনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছেন?

উত্তর–হ্যাঁ।

প্রশ্ন–কোন সালে?

উত্তর–১৯৪৮ সালে।

প্রশ্ন–আপনি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কয়টি বিবৃতি দিয়াছেন?

উত্তর–একটি।

প্রশ্ন–ম্যাজিষ্ট্রেট কি আপনাকে কোন প্রশ্ন করিয়াছিলেন?

উত্তর–না।

প্রশ্ন–ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিপূর্ণ বিবৃতি কি আপনাকে দেখান হইয়াছিল?

উত্তর–জী হ্যাঁ।

প্রশ্ন–স্বীকারোক্তি রেকর্ডের পর আপনাকে যখন ইহা পড়িয়া শোনান হয়,তখন কি আপনি ইহার কোনরূপ সংশোধন অথবা ইহাতে কিছু যোগ করিয়াছিলেন?

উত্তর– আমার মনে নাই।

প্রশ্ন–রাজসাক্ষী হওয়ার ব্যাপারটি কি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বলিয়াছেন?

উত্তর–না।

প্রশ্ন–১৯৪৮ সালে হেলথ এসিসটেন্টের চাকুরী আপনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা কি সরকারী চাকুরী ছিল?
উত্তর–সম্ভবতঃ আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের চাকুরী।
প্রশ্ন–তখন আপনার বয়স কত ছিল?
উত্তর–১৫ অথবা ১৬ হইবে।
প্রশ্ন–সরকারী অথবা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বৎসর। ইহা আপনি জানেন কিনা?
উত্তর–জানি।
প্রশ্ন–আপনার কাছে কি ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট আছে?
উত্তর–হ্যাঁ। ফরিদপুর দেশের বাড়ীতে আছে।
প্রশ্ন–আমি বলিতেছি যে, আপনি আদৌ ম্যাট্রিক পাস করেন নাই। ইহা কি সত্য নয়?
উত্তর–মিথ্যা।
প্রশ্ন–ম্যাট্রিক পরীক্ষা কোন্ সেন্টার হইতে দিয়াছিলেন?
উত্তর–মুন্সীগঞ্জ শহর।
প্রশ্ন–আপনার ক্রমিক নম্বর কত ছিল?
উত্তর–আমার মনে নাই।
প্রশ্ন–কোন সালে এম, এ, পাস করিয়াছেন?
উত্তর–১৯৬৪ সালে।
প্রশ্ন–বিমান বাহিনীতে চাকুরীর সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনে ক্লাস করার জন্য আপনাকে কে অনুমতি প্রদান করিয়াছিল?
উত্তর–উইং কম্যান্ডার এ, এম, খাজা।
প্রশ্ন–এম, এ, পাসের সময় বিমান বাহিনীতে আপনার প্রকৃত কাজ কি ছিল?
উত্তর–একটি সেকশনের সুপারভাইজর।
প্রশ্ন–বিমানবাহিনীতে দুই শিফ্‌টে কাজ হয় বলিয়াছেন। এই জাতীয় কোন সার্কুলার আছে কি?
উত্তর–দুই শিফ্‌টে কর্মচারীদের কাজের ব্যবস্থা আছে। প্রথম শিফ্‌ট সকাল ৭টা হইতে ১টা এবং দ্বিতীয় শিফ্‌ট তখন হইতে শুরু করিয়া সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়।
প্রশ্ন–আমি বলি যে, এই জাতীয় শিফ্‌টের কোন ব্যবস্থা নাই?
উত্তর–আপনার বক্তব্য সত্য নয়।
প্রশ্ন–আপনি অর্থনীতি শাস্ত্রে এম, এ পাস করেন নাই?
উত্তর–ইহা সত্য নয়।
প্রশ্ন–বি, এ (অনার্স)-ও পাস করেন নাই?
উত্তর–ইহা সত্য নয়।

প্রশ্ন–আই, এ-ও পাস করেন নাই?
উত্তর–ইহা সত্য নয়।
প্রশ্ন–আপনি আদালতে বলিয়াছেন যে, এম, এ এবং বি, এ-তে "অর্থনৈতিক চিন্তাধারা" (ইকনমিক থট) শীর্ষক একটি বিষয় ছিল। আপনি কি প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কীনস-এর নাম শুনিয়াছেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আপনি কি এম, এ-তে লর্ড কীনস-এর বই পড়িয়াছেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–বইটির কি নাম ছিল?
উত্তর–আমি ভুলিয়া গিয়াছি।
প্রশ্ন–চাকুরী বিনিয়োগ সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁহার থিওরি কি ছিল?
উত্তর–আমার মনে পড়িতেছে না।
প্রশ্ন–দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ থিওরী সম্পর্কে আপনি কি কিছু শুনিয়াছেন?
উত্তর–আমি শুনি নাই।
প্রশ্ন–স্বর্ণ মূল্যমান কাহাকে বলে?
উত্তর–আমি এই থিওরী জানি; কিন্তু এখন ভুলিয়া গিয়াছি।
প্রশ্ন–প্রান্তিক উপযোগ (মারজিনাল ইউটিলিটি) এবং ক্রমহ্রাসমান আয়ের (ডিমিনিশিং রিটানর্স) মধ্যে পার্থক্য কি?
উত্তর–আমার মনে নাই।
প্রশ্ন–একটি আধুনিক রাষ্ট্র কিভাবে ইহার পরিকল্পনার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করিয়া থাকে?
উত্তর–আমার মনে নাই।
প্রশ্ন–আপনি কি জানেন যে, চীনের সহিত পাকিস্তানের গভীর বন্ধুত্ব রহিয়াছে এবং ভারতের সহিত চীনের সম্পর্ক অবন্ধুসুলভ?
উত্তর–হ্যাঁ, আমি জানি।
প্রশ্ন–আপনি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন?
এই পদ কি আপনি গ্রহণ করিয়াছিলেন না তাহারা আপনাকে এই পদ দিয়াছিল?
উত্তর–কোষাধ্যক্ষ ছিলাম। তাহারাই আমাকে এই পদ দিয়াছিল।
প্রশ্ন–অর্থনীতি শাস্ত্রে এম, এ পাস করিয়াছেন দেখিয়াই কি এই পদ আপনাকে দেওয়া হইয়াছিল?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–করাচী ফরিদপুর কল্যাণ সমিতির নাম আপনি জানেন কি?
উত্তর–হ্যাঁ।

প্রশ্ন–আপনি সে প্রতিষ্ঠানের কি ছিলেন?
উত্তর–যুগ্মসম্পাদক।
প্রশ্ন–সে প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি ছিল?
উত্তর–দরিদ্রদের সাহায্য করা এবং করাচীতে বেকার পূর্ব পাকিস্তানীদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা।
প্রশ্ন–সে সমিতির তহবিল সংগ্রহের দায়িত্ব কি আপনার ছিল?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–কতদিন সে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন?
উত্তর–১৯৬৪ সালের শেষভাগ হইতে করাচী ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত।
প্রশ্ন–সমিতির তহবিলে সুষ্ঠু হিসাব প্রদান করিতে ব্যর্থ হওয়ায় আপনাকে কি বহিষ্কৃত করা হয় নাই?
উত্তর–ইহা সত্য নয়।

ফজলুল করিম

বিবাদীপক্ষের অপর কৌসুলী জনাব ফজলুল করিম রাজসাক্ষী জনাব আমীর হোসেন মিয়াকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–বিপ্লবী পার্টির কি কোন নাম ছিল?
উত্তর–না। কোন নাম ছিল না।
প্রশ্ন–আপনি বলিয়াছেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেম আপনাদের দলের নায়ক ছিল–তাই নয় কি?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–দলে আপনার পজিশন কি ছিল?
উত্তর–পার্টির একজন সাধারণ কর্মী।
প্রশ্ন–পার্টির কি কোন মুদ্রিত পত্রপত্রিকা ছিল?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–পার্টির জন্য কি কোনরূপ প্রচারপত্র মুদ্রিত করা হইয়াছিল?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–কাহাকে আপনারা পার্টির আদর্শ নায়ক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন?
উত্তর–লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম এবং শেখ মুজিবুর রহমান।
প্রশ্ন–আপনারা কি নাগা নেতা ডঃ ফিজো দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনি বলিয়াছেন যে, আঞ্চলিক বৈষম্য রহিয়াছে। আপনি কি জানেন যে, বর্তমান শাসনতন্ত্রে বৈষম্য দূর করিবার ব্যাপারে একটি বিধান রহিয়াছে?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–এই ব্যবস্থাকে যুথোপযুক্ত বলিয়া কি মনে করেন নাই?
উত্তর–আমি যখন বিপ্লবী দলে ছিলাম, তখন ইহাকে যথোপযুক্ত মনে করি নাই।

প্রশ্ন–তৃতীয় পরিকল্পনার উপর প্রকাশিত পুস্তক কি আপনি পড়িয়াছেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–১৯৮৫ সালের মধ্যে এই বৈষম্য সম্পূর্ণ দূর করা হইবে বলিয়া পুস্তকে লেখা রহিয়াছে। ইহা কি আপনি পড়িয়াছেন?
উত্তর– আমার স্মরণ হইতেছে না।
প্রশ্ন–এই বৈষম্য দূর করার জন্য স্বাধীনতাই একমাত্র সম্ভাব্য পথ বলিয়া কি আপনি চিন্তা করিয়াছিলেন?
উত্তর–বিপ্লবী দলে থাকাকালে আমি তাহাই মনে করিয়াছিলাম।
প্রশ্ন–আপনি আদালতে অনেক রাজনৈতিক দলের নাম করিয়াছেন। পাকিস্তানে যে সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলও রহিয়াছে, তাহা কি আপনি জানেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনি কি লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে জানেন? লাহোর প্রস্তাবের সহিত বর্তমান শাসনতন্ত্রের কি কোন সামঞ্জস্য আছে?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–পাকিস্তানের কোন কোন রাজনৈতিক দলে বৈষম্য দূর করার জন্য দুই অর্থনীতি এবং দুই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিতে দুই অঞ্চলের নূতন ফেডারেশন গঠনের জন্য একসময় প্রস্তাব করিয়াছিলেন– ইহা আপনি জানেন কিনা?
উত্তর–আমি সংবাদপত্রে ইহা পাঠ করিয়াছি।
প্রশ্ন– এই জাতীয় নূতন ফেডারেশন গঠনের উদ্দেশ্য সার্থক করিবার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে অহিংস এবং অসহযোগিতাভিত্তিক আন্দোলনের খবর কি আপনি জানেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনি বলিয়াছেন যে, (অভিযুক্ত) লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন পাকিস্তানস্থ মার্কিন দূতাবাসের নৌ-এটাচী মিঃ নোবলের সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন। যোগাযোগের উদ্দেশ্য কি ছিল?
উত্তর– (বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ।
প্রশ্ন–আপনি জানেন কি যে, এমনকি ১৯৬৬ সালেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্ভাব্য কম্যুনিষ্ট হামলা প্রতিরোধের জন্য পাক-ভারত যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগ্রহণ প্রচেষ্টায় অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল?
উত্তর–না, আমি জানি না।
প্রশ্ন–আপনি জানেন কি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনো স্বাধীন বাংলা সৃষ্টির জন্য সাহায্য করিবে না?
উত্তর–আমি জানি না।

প্রশ্ন–আপনি আদালতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনই এই বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে কিভাবে হিন্দু ভারত হইতে সাহায্যের আপনারা আশা করিয়াছিলেন?
উত্তর–বিপ্লবী আন্দোলনের নেতারা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ভারত হইতে সাহায্য লাভে সক্ষম হইবে না।
প্রশ্ন–ইহা কি সত্য নয় যে, আপনি পাকিস্তানের ভিতরের এবং বাহিরের শত্রুদের নির্দেশে ষড়যন্ত্র মামলায় বিদেশী রাষ্ট্রের যোগসাজশের কথা বলিতেছেন যাহাতে পাকিস্তান এই সকল রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য না পায়?
উত্তর–না, ইহা সত্য নয়। জনাব ফজলুল করিমের জেরার জবাবে সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া বলেনঃ
"মহাখালি যক্ষ্মা হাসপাতালের নিকট পানির নীচে ডুবা ছাড়া অন্য কোন খালি ময়দান ছিল না একথা বলা সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে সভার সময় ঐ মাঠে পানি ছিল না। মহাখালিতে ম্যালেরিয়া ইনষ্টিটিউটও রহিয়াছে। মহাখালির কোন পার্শ্বে এই ইনষ্টিটিউট অবস্থিত তাহা আমি বলিতে পারি না। মহাখালি রেলওয়ে ক্রসিং যক্ষ্মা হাসপাতালের নিকট না ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউটের নিকট অবস্থিত তাহা আমার স্মরণ নাই। এই আদালতে আমি অভিযোগকারীর আবেদন পাঠ করি নাই। আমি একজন অভিযুক্তকে সার্জেন্ট হক বলিয়া জানি, সার্জেন্ট শামসুল হক নয়। তাঁহার পুরা নাম সম্পর্কে আমি অবহিত নই। কাঠগড়ায় আমি তাঁহাকে সনাক্ত করিয়াছিলাম। আদালতের নিকট যে অভিযোগ করা হইয়াছে উহাতে অন্য একজনের নামের পরিবর্তে শামসুল হকের নাম দেওয়া হইয়াছে এই বিষয় আমার আদালতে হাজির হওয়ার পূর্বে তদন্তকারী অফিসার আমার সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন, এ কথা হওয়ার পর আপনাকে অধীনস্থ লোকদের কম্যান্ড করিতে হইত? এই ক্ষীণ কণ্ঠস্বরের জন্য কি কোন অসুবিধা হইত না?
উত্তর–না। আমি এই কণ্ঠস্বর দ্বারাই কম্যান্ড করিতে পারিতাম।
প্রশ্ন–আমি বলি যে, আপনি সম্প্রতি আপনার কণ্ঠস্বর হারাইয়াছেন–ইহা কি সত্য নয়?
উত্তর–না।

জুলমত আলী খান

বিবাদীপক্ষের অপর কৌসুলী জনাব জুলমত আলী খান রাজসাক্ষীকে জেরা করেন।

প্রশ্ন–আপনি আদালতে বলিয়াছেন যে, ১৯৬৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী আপনি টেলিফোন করিয়া ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে চট্টগ্রাম হইতে ঢাকা আসিতে বলিয়াছিলেন। পুলিশের নিকট বিবৃতিতে কি আপনি ইহা বলিয়াছেন?
উত্তর–আমার মনে নাই।
প্রশ্ন–আপনি কখন জয়দেবপুর হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন?
উত্তর–অপরাহ্ন দুইটা-আড়াইটার মধ্যে।
প্রশ্ন–কখন জয়দেবপুরে পৌঁছিয়াছিলেন?
উত্তর–ঠিক সময় বলিতে পারিব না।
প্রশ্ন–৬ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের হোটেল মিসকায় সভা করিবার সিদ্ধান্ত কখন নেওয়া হইয়াছিল?
উত্তর–৫ই ফেব্রুয়ারী (অভিযুক্ত) ষ্টুয়ার্ড মুজিবের সহিত আলোচনার পর ৬ই ফেব্রুয়ারী সভার তারিখ ঠিক করা হইয়াছিল।
প্রশ্ন–সময় কখন নির্ধারিত হইয়াছিল?
উত্তর–সূর্যাস্তের পর।
প্রশ্ন–৬ই ফেব্রুয়ারীর সভায় যোগদানকারীরা কি একসঙ্গে আসিয়াছিল ?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–কে প্রথম আসিয়াছিল?
উত্তর–ষ্টুয়ার্ড মুজিব।
প্রশ্ন–দ্বিতীয় ব্যক্তি কে আসিয়াছিল?
উত্তর–আমি মনে করিতে পারিতেছি না।
প্রশ্ন–৬ই ফেব্রুয়ারী হোটেল মিসকায় কোন সভাই হয়নি যেখানে অন্যান্যদের সহিত মানিক চৌধুরী এবং বিধান সেনও যোগদান করিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। তা কি জানতেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–ষ্টুয়ার্ড মুজিব সেজন্যই ৫ই এবং ৬ই ফেব্রুয়ারীতে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সভায় পরপর দুইদিন যোগদান করিতে পারে নাই–ইহা কি সত্য নয়?
উত্তর–না, সত্য নয়।
প্রশ্ন–১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর যুদ্ধের সময় আপনি যুদ্ধের অগ্রগতি জানার জন্য কি উদ্বিগ্ন ছিলেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আপনি কি সেসময়ে রেডিও শুনিতেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আপনি কবে আপনার আত্মজীবনী লেখার সিদ্ধান্ত নেন?
উত্তর–বিপ্লবী দল পরিত্যাগের পর।

প্রশ্ন–আত্মজীবনী লিখিতে হইলে যে বাল্যকালসহ সব সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী তাহাতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তাহা আপনি জানিতেন কি?
উত্তর–হ্যাঁ। আত্মজীবনী লিখিলে বাল্যকাল হইতে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই লিপিবদ্ধ করিতাম।
প্রশ্ন–আপনি কতদিন হইতে ডাইরী লিখিতে শুরু করেন?
উত্তর–১৯৬৫ সাল হইতে। আত্মজীবনীর জন্য আমি বাল্যকালের ঘটনাসমূহ স্মরণ করিয়া লইতাম।
প্রশ্ন–আপনার জীবনে ১৯৫১ সালে কি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছিল?
উত্তর–আমি বলিতে পারি না।
প্রশ্ন–১৯৬১ সালের?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–আপনার প্রথম স্ত্রীর সহিত বিবাহ বিচ্ছেদকে কি আপনি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া মনে করেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনার প্রথম সন্তানের জন্ম?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আত্মজীবনী লেখার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভুয়া?
উত্তর–না, ভুয়া নয়।
প্রশ্ন–ডাইরী উদ্ধারের ব্যাপারটি সামঞ্জস্যপূর্ণ করিবার জন্যই আপনি আত্মজীবনী লেখার কাহিনী বলিয়াছেন– ইহা কি সত্য নয়?
উত্তর–না।
আগামীকল্য (সোমবার) হইতে পুনরায় শুনানী শুরু হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান
১৮ই আগষ্ট ১৯৬৮
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
আমীর হোসেনের জেরা অব্যাহত: আদালতে মোয়াজ্জেমের আরো একটি পত্র পেশ
(স্টাফ রিপোর্টার)

"আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার" দু'নম্বর একরারী সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার জেরা গতকাল শনিবারও অব্যাহত থাকে। এই দিন ছিল তার জেরার অষ্টম দিন।

গতকাল বিবাদীপক্ষের কৌসুলী মীর্জা গোলাম হাফিজ, জনাব ফজলুল করিম, জনাব আবদুল্লাহ, জনাব জুলমত আলী খান, জনাব বদরুল হায়দর চৌধুরী ও জনাব আবদুল মালেক সাক্ষীকে জেরা করেন। বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের জেরা শেষ করার পর বাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর

কাদের কতিপয় ব্যাপারে পুনরায় সাক্ষীর জবানবন্দী নেন। একটি নতুন চিঠিও এই দিন আদালতে পেশ করা হয়। এই পত্রটি আটক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাক্ষীর নিকট লেঃ মোয়াজ্জেম এই পত্র লিখেছেন বলে সাক্ষী জানিয়েছেন।

আদালত জনাব মঞ্জুর কাদেরকে পুনরায় সাক্ষীর জবানবন্দীর অনুমতি দিয়ে ঐসব প্রশ্ন বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের জেরারও অনুমতি দেন।

সাক্ষীর পুনরায় জবানবন্দী গ্রহণের পর গতকালকের মামলার শুনানী শেষ হয়। আগামীকাল সোমবার শুনানী শুরু হলে পুনরায় আমীর হোসেন মিয়ার জেরা শুরু হবে।

মীর্জা গোলাম হাফিজের জেরা

প্র–আপনি কবে ম্যাট্রিকের টেস্ট পরীক্ষা দেন?
উ–১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে।
প্র–এই সময়ে ফরম পূরণ করার সময় বয়স লেখার স্থানটা পূরণ করেছিলেন কি?
উ–আমার ঠিক মনে নেই।
প্র–আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে স্বীকারোক্তি করে কটা বিবৃতি দিয়েছেন?
উ–একটা।
প্র–সিগন্যাল মেসে নিয়ে আসার জন্য আপনাকে কখন ঢাকা জেল থেকে নিয়ে আসা হয়?
উ–১৮ই এপ্রিল রাত দেড়টার দিকে আমাকে নিয়ে আসা হয়।
প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপনাকে কখন নিয়ে যাওয়া হয়?
উ–সকাল নয়টায়।
প্র–কিসে করে আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যান?
উ–ম্যাজিস্ট্রেট একই স্থানে ছিলেন।
প্র–সেখানে কোন কোন অফিসার উপস্থিত ছিলেন?
উ–কেবলমাত্র ম্যাজিস্ট্রেটই ছিলেন সেখানে।
প্র–ম্যাজিস্ট্রেট কি আপনাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন?
উ–না।
প্র– আপনার স্বীকারোক্তির পর সেটা কি আপনাকে পড়ে শোনানো হয়?
উ–হ্যাঁ, আমাকে পড়ে শোনানো হয়।
প্র–আপনি কোন সংশোধন করেন কি তাতে?
উ–আমার মনে নেই।
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছিলেন যে, আপনি একরারী সাক্ষী হতে চান?
উ–না।

প্র– আপনি জনস্বাস্থ্য বিভাগে ১৯৫০-৫১ সালে হেলথ ভ্যাকসিনেটরের চাকুরী গ্রহণ করেন তাই না?
উ–হ্যাঁ। এটা সম্ভবতঃ তখন কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিভাগ ছিল।
প্র–তখন আপনার বয়স কত?
উ–১৫/১৬ বছর হবে।
প্র–আপনি কি জানেন যে, যে কোন সরকারী আধা-সরকারী অফিসে চাকুরী পেতে হলে অন্যূন ১৮ বছর বয়স হতে হবে?
উ–হ্যাঁ।
প্র– আপনার ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট আছে?
উ– হ্যাঁ, বাড়ীতে রয়েছে।
প্র–আমার মনে হয়, আপনি ১৯৪৮ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করেননি ঠিক নয়?
উ–না, এটা ঠিক নয়।
প্র–আপনি আদৌ ম্যাট্রিক পাস করেননি?
উ–না, এটাও ঠিক নয়।
প্র–১৯৪৮ সালে কোন কেন্দ্রে আপনি পরীক্ষা দেন?
উ–মুন্সীগঞ্জ কেন্দ্রে।
প্র–আপনার রোল নম্বর কত ছিল?
উ–আমার মনে নেই।
প্র–কত সালে আপনি এম-এ পাস করেন?
উ–১৯৬৪ সালে।
প্র- আই-এ, বি-এ ও এম-এ পড়ার জন্য কে আপনাকে অনুমিত দিয়েছিলেন? তার পদমর্যাদা কি?
উ–উইং কম্যান্ডার এ এম খাজা।
প্র–এম-এ পরীক্ষা দেওয়ার সময় আপনার পদ কি ছিল?
উ–কর্পোরাল।
প্র–এটা কি ধরনের কাজ?
উ–আমি একটি সেকশনের সুপারভাইজার ছিলাম।
প্র–আপনি কিভাবে চাকুরী করে নিয়মিত পড়াশোনা করতেন?
উ-ওখানে শিফট ডিউটি ছিল। প্রথম শিফট সকাল সাতটা থেকে একটা ও দ্বিতীয় শিফট একটা থেকে সাতটা পর্যন্ত।
প্র-ওখানে কোন শিফট ডিউটি ছিল না বলে আমার মনে হয়?
উ–না, ঠিক নয়।
প্র–আপনি ১৯৬৫ সালে এম-এ পাস করেননি?
উ–না, এটা ঠিক নয়।

প্র–আপনি বি-এও পাস করেননি?
উ–না, এটা ভুল।
প্র–আপনি তো বলছেন যে, আপনি অর্থনীতিতে এম-এ পাস করেছেন। আপনি লর্ড কীন্স-এর নাম শুনেছেন?
উ–হ্যাঁ, শুনেছি।
প্র–অর্থনীতিতে কীন্সিয়াল থিওরীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কি? আপনি কি তাঁর বই পড়েছেন?
উঃ আমি লর্ড কীন্স-এর বই পড়েছি। তবে তার নামটা এখন ঠিক মনে পড়ছে না।
প্র- তাঁর থিওরীটা কি?
উ–আমার মনে পড়ছে না।
প্র–আপনি কি ডায়েলেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম-এর কথা শুনেছেন?
উ–না।
প্র-গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড কাকে বলে জানেন?
উ–জানি। তবে এখন ঠিক মনে পড়ছে না।
প্র– আপনি কি মার্জিন্যাল ইউটিলিটি ও ল' অব ডিমিলিসিং রিটার্ন ব্যাখ্যা করতে পারেন?
উ–আমার মনে নেই।
প্র–একটি আধুনিক দেশের অর্থনীতি কিভাবে প্রণয়ন করা হয়, তা কি আপনি জানেন?
উ–না।
প্র–আপনি কি জানেন, চীন পাকিস্তানের একটি অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাষ্ট্র?
উ–হ্যাঁ।
প্র– আপনাকে কি অর্থনীতিতে একজন এম-এ হিসেবে দলে গ্রহণ করা হয়েছিল?
উ–না, সেজন্য নয়।
প্র–করাচীর ফরিদপুর সমিতিকে জানেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র–আপনি কি কখনও এর কর্মকর্তা ছিলেন?
উ-জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলাম।
প্র–এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল কি?
উ–পূর্ব পাকিস্তানের দরিদ্র লোকদের সাহায্য করা এবং যারা চাকুরী করতে যায়, তাদের চাকুরী ঠিক করে দেওয়া।
প্র–সমিতির খরচপত্র চলতো কিভাবে?
উ–চাঁদা সংগ্রহ করে।

প্র–এই চাঁদা সংগ্রহের দায়িত্ব ভার কি আপনার ওপর ছিল?
উ–না।
প্র–কতদিন আপনি জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন?
উ–১৯৬৪ সালের শেষদিক থেকে আমার করাচী ত্যাগ করা পর্যন্ত।
প্র–সমিতির টাকা-পয়সা ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ করতে না পারার জন্য আপনাকে কি সমিতি থেকে বহিষ্কার করা হয়?
উ-না, একথা সত্য নয়।
প্র–আপনি কি ১৯৬০ সালে আই-এ ক্লাসে ভর্তি হন এবং ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত একটানা পড়াশোনা করেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র–এর জন্য বিমানবাহিনী থেকে কি একবারই অনুমতি নিয়েছিলেন?
উ–না, আই-এ, বি-এ ও এম-এ'র জন্য পৃথকভাবে অনুমতি নিতে হয়েছিল।
প্র–আপনি যে বিভাগে কাজ করতেন তখন সেখানে শিফট ডিউটি ছিল না–একথা কি ঠিক?
উ–না, ঠিক নয়।
এরপর কৌসুলী জনাব ফজলুল করিম সাক্ষীকে জেরা করতে শুরু করেন।
ফজলুল করিমের জেরা
প্র-আমীর হোসেন মিয়া আপনার নামে শুরুতে না শেষে মিয়া লাগানো হয়?
উ–মিয়া দিয়ে শেষ হয়।
প্র–গ্রামের বাল্যকালের কথাবার্তা কি আপনার মনে পড়ে?
উ–হ্যাঁ।
প্র–ইলিশ মাছ ধরেছেন কি কখনো?
উ-মাঝে মাঝে ধরেছি।
প্র–আপনারা কি দলের কোন নাম দিয়েছিলেন?
উ–না।
প্র–পার্টিতে আপনার স্থান কোথায় ছিল?
উ–আমি একজন কর্মী ছিলাম।
প্র-দলের কোন বইপত্র পেয়েছিলেন কি?
উ-না। আমরা কোন পুস্তিকা বা হ্যান্ডবিল প্রকাশও করিনি।
প্র–সদস্যদের মধ্যে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কোন কিছু বিতরণ করা হত?
উ–না।
প্র–আপনারা কাকে পূর্ব পাকিস্তানের নেতা বলে মনে করতেন?
উ-লেঃ মোয়াজ্জেম, শেখ মুজিবর রহমান প্রমুখকে।

প্র–আপনারা কি নাগাদের নেতা ফিজের কাছ থেকে কোন রকম উৎসাহ-উদ্দীপনা সংগ্রহ করেছেন?
উ–না।
প্র-আপনি কি জানেন, শাসনতন্ত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে?
উ–হ্যাঁ।
প্র-সেসময় আপনি কি মনে করেছিলেন অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য এটা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা?
উ–না, তখন মনে করিনি।
প্র-আপনি পাঁচসালা পরিকল্পনা পাঠ করেছেন?
উ–না।
প্র–আপনি কি জানেন যে, পরিকল্পনায় উল্লেখ করা আছে যে, ১৯৮৫ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সমাপ্তি ঘটবে?
উ–না, আমি জানি না।
প্র–সেসময় আপনি কি মনে করেছিলেন যে, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জন ব্যতীত অন্য কোন পন্থা নেই?
উ–হ্যাঁ। তাই মনে করেছিলাম।
প্র-আপনি কি মনে করেন, বর্তমান শাসনতন্ত্রের সঙ্গে লাহোর প্রস্তাবের কিছুটা মিল রয়েছে?
উ-আমি জানি না।
প্র–লেঃ মোয়াজ্জেম আমেরিকান এজেন্ট নোরল-এর সঙ্গে কেন দেখা করেছিলেন?
উ–অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার জন্য।
প্র–আপনি জানেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে একটি যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্ভাব্য কম্যুনিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধের একটি পরিকল্পনা নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিল?
উ–আমার জানা নেই।
প্র–আপনি কি কখনও শুনেছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্ত বঙ্গ সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে না?
উ–না।
প্র–আপনারা যে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন সেটা কি একটি স্বাধীন মুসলিম দেশ হত?
উ–হ্যাঁ।

প্র–তাহলে মুসলিম পূর্ব পাকিস্তান স্থাপনে হিন্দু ভারতের সাহায্যের কথা কিভাবে চিন্তা করেছিলেন?
উ–আমি জানতাম না। আমাদের নেতারা প্রস্তাব করেছিলেন।
মহাখালীতে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কথা উল্লেখ করে কৌসুলী প্রশ্ন করেন মহাখালী টিবি হাসপাতালের কাছে কোন ফাঁকা মাঠ নেই এবং যেটা আছে সেটাও পানি ভর্তি।
উত্তরে সাক্ষী জানান যে, এটা ঠিক নয়। বৈঠকের সময় মাঠে পানি ছিল না।
প্র–মহাখালীর কোন দিকটা বৈঠকের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন?
উ-ঠিক জানিনে।
প্র–রেলক্রসিংটা মহাখালী টিবি হাসপাতালের কাছে না ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউটের কাছে?
উ–আমার মনে নেই।
প্র–কতজন হক ঢাকায় পিএএফ স্টেশনে কাজ করতেন?
উ–জানি না।
প্র-মহাখালীর বৈঠকে তিনজন হক অংশগ্রহণ করেন?
উ–আমি দুজন হককে বৈঠকে যোগদান করতে দেখেছি। তৃতীয় হকের কথা জানি না।
প্র–সার্জেন্ট হকের সঙ্গে প্রথম কবে আপনার দেখা হয়?
উ–মহাখালীতেই প্রথম দেখা হয়।
প্র–সার্জেন্ট শামসুল হক এই বৈঠকে কখনও উপস্থিত ছিলেন না?
উ–না, এটা ঠিক নয়।
প্র–মহাখালীর বৈঠকে যারা উপস্থিত ছিলেন বলে পুলিশের কাছে আপনি যে নামের তালিকা দিয়েছিলেন তাতে কেবলমাত্র ফজলুল হকের নাম ছিল?
উ-না, এটা ঠিক নয়।
কৌসুলী জনাব ফজলুল করিমের জেরা শেষ হওয়ার পর কৌসুলী জনাব এম এ আবদুল্লাহ জেরা শুরু করেন।

এম এ আবদুল্লার জেরা

প্র–আপনি কি ১৯৫২ সালে পিএএফ-এ যোগদান করেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র–আপনার কণ্ঠস্বর কবে থেকে এত খাটো?
উ–বরাবরই আমার কণ্ঠস্বর এই রকম ছিল।
প্র– আপনাকে চাকুরীতে বহালের সময়েও কি এই কণ্ঠস্বরের জন্য কোন অসুবিধা হয়নি?
উ–না।

প্র–কর্পোরাল হিসেবে কাজ করার সময় নিশ্চয় আপনার অধীনে কিছু লোক কাজ করতো?
উ–হ্যাঁ।
প্র–তাদের কম্যান্ড করার জন্য আপনার কোন অসুবিধা হত না?
উ–না।
এরপর কৌসুলী জুলমত আলী খান জেরা করেন।

জুলমত আলী খানের জেরা

প্র–আপনি কি পুলিশের কাছে আপনার জবানবন্দীতে বলেছেন যে, ১৯৬৬ সালে ৩রা ফেব্রুয়ারী রাতে আপনি স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে ঢাকা আসার জন্য ফোন করেছিলেন?
উ–আমার ঠিক মনে নেই।
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছেন যে, আপনি চট্টগ্রাম নৌঘাঁটিতে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের কাছ ফোন করেছিলেন?
উ–আমার ঠিক মনে নেই।
প্র–জয়দেবপুর থেকে কখন আপনারা ফিরে আসেন?
উ–প্রায় দুটা কি আড়াইটার সময়।
প্র–ওখানে গিয়েছিলেন কখন?
উ–সঠিক সময়টা বলতে পারবো না।
প্র–আপনি চট্টগ্রাম থেকে কিসে ঢাকায় আসেন?
উ–প্লেনে। সকালে ঢাকা পৌঁছাই।
প্র–ঢাকায় আসার সময় চট্টগ্রামে কারো সঙ্গে দেখা হয়?
উ–মনে নেই।
প্র–চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে কারো সঙ্গে দেখা হয়?
উ–মনে নেই।
প্রশ্ন–কবে চট্টগ্রামে ৬ই ফেব্রুয়ারী বৈঠকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন?
উ–৫ই ফেব্রুয়ারীর বৈঠকের শেষে।
প্র–৫ই ফেব্রুয়ারীর বৈঠক কখন শেষ হয়?
উ–৫ই ফেব্রুয়ারীর রাত ৯/১০-টার সময়।
প্র–৬ই ফেব্রুয়ারীর বৈঠকের সময় কখন ধার্য করা হয়?
উ–সূর্যাস্তের পর।
প্র–যারা এই বৈঠকে যোগদান করেন, তারা কি সবাই একসঙ্গে আসেন?
উ–না, একে একে।
প্র–আগে আসে কে?
উ–প্রথমে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আসে, পরে অন্যান্যরা প্রবেশ করে।

প্র–সার্জেন্ট মুজিবর রহমান নতুন সদস্যের কি আপনার সঙ্গে একসাথে না একে একে পরিচয় করিয়ে দেন?
উ–একে একে।
প্র–কখন বৈঠক শুরু হয়?
উ–ঠিক বলতে পারব না কখন যে শেষ হয় তাও মনে নেই।
প্র–আমার মনে হয়, ৬ই ফেব্রুয়ারীতে এমন কোন বৈঠকই হয়নি যেখানে মানিক চৌধুরী বা বিধান সেন উপস্থিত ছিলেন?
উ–না, একথা ঠিক নয়।
অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানান যে, তিনি নিজের নাম কখনও কখনও এম এ হোসেন এবং কখনও কখনও এ এম হোসেন লিখে থাকেন।
প্র–স্টুয়ার্ডদের যখন ডিউটি থাকে তখন ২৪ ঘণ্টা একটানা ডিউটি থাকে আবার ২৪ ঘণ্টা ছুটি থাকে–একথা কি জানেন?
উ–আমার জানা নেই।
এই সময় কৌসুলী বদরুল হায়দার চৌধুরী জেরা শুরু করেন।

বদরুল হায়দার চৌধুরীর জেরা

প্র–বিমানবাহিনীতে আপনার কাজ কি ছিল?
উ–সাপ্লাই এ্যাসিস্ট্যান্ট-এর।
প্র–আপনি কি যোদ্ধা ছিলেন?
সাক্ষী প্রশ্নটি বুঝতে না পারলে আদালত তাঁকে বুঝিয়ে দেন। তখন তিনি বলেন যে, সশস্ত্র বাহিনীর সবাই যোদ্ধা।
প্র–কেমন করে গ্রেনেড ছোঁড়ে? আদালতকে একটু দেখান তো?
সাক্ষী তখন গ্রেনেড ছোঁড়ার কায়দা দেখান।
প্র–আপনি কি জানেন যে, ভারতের আক্রমণের সময় পূর্ব পাকিস্তানীরা ভারতের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানীদের পাশাপাশি যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র দাবী করেছিল?
উ–হ্যাঁ, জানি।
প্র–আপনি কি জানেন, এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানীরা পর্বতের মত কঠিন ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল?
উ–হ্যাঁ।
প্র–আপনি কি জানেন, বেঙ্গল রেজিমেন্ট লাহোরে চরম শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছে?
উ–হ্যাঁ, জানি।
প্র– আপনি কি জানেন, বাঙালী সৈনিকদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে বিশিষ্ট পশ্চিম পাকিস্তানী কবি শোরেশ কাশ্মিরী কবিতা লেখেন?
উ–না, আমার জানা নেই।

প্র–এটা কি জানেন শেখ মুজিবর প্রমুখ পূর্ব পাকিস্তানী নেতারা যুদ্ধবিরতি সমর্থন করেন?
উ–না।
প্র–তাসখন্দ ঘোষণার পর কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবে পূর্ব পাকিস্তানী নেতারা হতাশ হয়ে পড়েন সেকথা জানেন কি?
উ-না, জানি না।
কৌসুলীর এক প্রশ্নের জবাব সাক্ষী জানান যে, তিনি করাচী ড্রিগ রোড ড্রামাটিক ক্লাবের সদস্য ছিলেন এবং তিনি তবলা বাজাতে জানেন।
প্র–আপনি কবে তবলা বাজাতে শেখেন?
উ–বিমান বাহিনীতে থাকার সময়েই।
প্র–পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখার পর কি আপনার মুডের পরিবর্তন হয়?
উ–না, এটা ঠিক নয়।

আবদুল কাদেরের জেরা

প্রঃ আপনি কি জানেন যে, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান একদিন পুরা কাজ করেন পরদিন পুরা ছুটি নেন?
উঃ আমি জানি না।
প্রঃ একথা কি ঠিক যে, স্টুয়ার্ড মুজিব ৫ই ফেব্রুয়ারী এবং ৬ই ফেব্রুয়ারীর বৈঠকে যোগদান করেনি?
উঃ ঠিক নয়।
প্রঃ আপনি ঢাকায় কোনদিন চাকুরীতে যোগ দিয়েছেন?
উঃ যেদিন করাচী হতে ঢাকা এসেছি সেদিনই।
প্রঃ ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধের সময় যুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে খবর জানার জন্য আপনি কি উদ্বিগ্ন থাকতেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ আপনি কি বেতারের খবরাখবর শুনতেন?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ পশ্চিম পাকিস্তানে কয়টি ফ্রন্টে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর সংঘর্ষ চলছিল তা আপনার মনে আছে?
উঃ না।
প্রঃ কাশ্মীর পাকিস্তান বাহিনী কয়টি ফ্রন্টে লড়াই করছিল তা বলতে পারেন?
উঃ না।
প্রঃ স্টুয়ার্ড মুজিব ও সুলতান কোন তারিখে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম রওয়ানা হন?
উঃ ৯ই সেপ্টেম্বর সম্ভবতঃ রাত ৮ টায়।

প্রঃ তারা এর আগেই ঢাকা ত্যাগ করে চলে গেছেন একথা কি ঠিক?
উঃ না।
প্রঃ এখানে আপনার অফিসের সময় কয়টা হতে কয়টা পর্যন্ত?
উঃ সকাল ৭টা হতে বেলা ১টা পর্যন্ত।
প্রঃ শেখ মুজিবর রহমানের বাসায় আপনি টাকা আনার জন্য কোন সময় গিয়েছিলেন?
উঃ সঠিক সময় আমার মনে নেই। তবে বেলা ১২ টার পরে গিয়েছি।
প্রঃ আপনি আত্মচরিত লেখার সিদ্ধান্ত কখন গ্রহণ করেন?
উঃ উক্ত প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করার পর।
প্রঃ আপনি আত্মচরিতে কি আপনার জীবনের সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করতেন?
উঃ যদি আমি তা লিখতাম তবে সকল ঘটনাই লিপিবদ্ধ করতাম।
প্রঃ আপনি কি কোন ডায়েরী লেখেন?
উঃ না।
প্রঃ তবে কিভাবে আপনি আপনার জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করতেন?
উঃ আমার স্মরণশক্তির সাহায্যে বিভিন্ন ঘটনা মনে করে লিপিবদ্ধ করতাম।
প্রঃ ১৯৫১ সাল হতে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কি?
উঃ আমি বলতে পারব না।
প্রঃ স্ত্রীকে তালাক দেওয়া কি আপনার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা?
উঃ না–আমি তা মনে করি না।
প্রঃ সন্তানের মৃত্যুকে কি আপনি আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করেন?
উঃ না।
প্রঃ আপনি কি আমার সঙ্গে একমত হবেন যদি আমি বলি যে, আত্মচরিত রচনার কোন ইচ্ছাই আপনার ছিল না?
উঃ না–আপনার এ কথা সত্য নয়।

সাক্ষীর পুনরায় জবানবন্দী

এরপর জনাব মঞ্জুর কাদির কতিপয় প্রশ্নে সাক্ষীকে পুনরায় জেরা করেন।

জনাব মঞ্জুর কাদির সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন, জেরার সময় বলেছিলেন যে, সেপ্টেম্বরের পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার যে সুযোগ এসেছিল তা তারা গ্রহণ করেনি কেন?

মঞ্জুর কাদিরের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, আমরা চাইনি যে, ভারত পাকিস্তান জয় করুক। আমরা চেয়েছি ভারতের সাহায্য নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করতে।

মঞ্জুর কাদিরের এই প্রশ্নের সময় বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান আপত্তি উত্থাপন করেন বলেন, তাহলে জেরার পর প্রত্যেকটি বিষয়েরই একটা ব্যাখ্যা দেয়া যায়।

জনাব মঞ্জুর কাদিরের অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, ১৯৬৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি করাচীতে প্রেরিত তারবার্তায় ১০৭, দীননাথ সেন রোডের যে ঠিকানা দিয়েছিলেন তার কারণ হচ্ছে এই যে, ঢাকা হোটেলের রেজিস্টারে তার নাম ছিল না। তাই সুলতানউদ্দীন পত্র যোগাযোগের জন্য তাকে উক্ত ঠিকানা ব্যবহার করতে বলেছিল।

জনাব সালাম খান এতে আপত্তি উত্থাপন করে বলে, বিবাদীপক্ষের বক্তব্য হচ্ছে সাক্ষী ঐ ঠিকানা হতে কোন তারবার্তাই পাঠাতে পারে না। এমতাবস্থায় এ ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হলে জেরাই বরবাদ হয়ে যাবে।

আদালত এই আপত্তি অগ্রাহ্য করেন।

সাক্ষী বাদীপক্ষের কৌসুলীর অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ভারত হতে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে লেঃ মোয়াজ্জম স্টুয়ার্ড মুজিবের কতিপয় বিষয় অনুমোদন করেননি বলে যে কথা তিনি আদালতে বলেছেন তা হচ্ছে এই যে, মোয়াজ্জম এটা পছন্দ করেননি যে স্টুয়ার্ড মুজিব ও সুলতানউদ্দীন সরাসরিভাবে অস্ত্রশস্ত্রের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করুক।

এরপর জনাব মঞ্জুর কাদির বলেন যে, অসাবধানতাবশতঃ একখানা পত্র প্রমাণের জন্য আদালতে উপস্থিত করা হয়নি। এই পত্রখানা আদালতে প্রমাণ করার জন্য তখন জনাব মঞ্জুর কাদিরকে অনুমতি দেয়া হয়।

লেঃ মোয়াজ্জমের পত্র

পত্রখানা সাক্ষীর হাতে তুলে দেয়া হলে তিনি তা দেখে বলেন, এটা ১৯৬৬ সালের ২২শে মার্চ তারিখে লেখাপত্র।

মোয়াজ্জম নিজ হাতে এ পত্র লিখেছেন।

সামাদের কেয়ার অব-এ এই পত্র এসেছে। সামাদ আমার নিকট উক্ত পত্র প্রদান করেন।

এই পত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাক্ষী বলেন– "ব্যবসায় চালাবার জন্য একজন ম্যানেজার নিয়োগ" করার যে কথা পত্রে রয়েছে তার অর্থ হচ্ছে আমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কথা বুঝান হয়েছে।

তারপর সাক্ষীকে তার ব্যক্তিগত ডায়েরী দুটি দেয়া হলে তিনি বলেন, এতে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য একটা তালিকা রয়েছে। স্টুয়ার্ড মুজিবের নির্দেশে এ, বি, খুরশীদ এগুলো লিখেছেন।

অপর ডায়েরীতেও খুরশীদের ২ পৃষ্ঠাব্যাপী হাতের লেখা রয়েছে বলে সাক্ষী উল্লেখ করেন।

এরপর বাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীর ঢাকা অফিসের হাজিরা বই তার হাতে দিলে তিনি বলেন, ১৯৬৭ সালের নবেম্বর মাসের ১৬ তারিখে অফিসে হাজির ছিলাম, খাতায় আমার সই আছে। তারপর ১৭ হতে ২৮শে নবেম্বর পর্যন্ত অনুপস্থিত এবং ২৯ ও ৩০শে আবার উপস্থিত ছিলাম।

ডিসেম্বর মাসের পাতায় ১লা, ২রা ও ৪ঠা আমার হাজিরা রয়েছে। ৫ তারিখ হতে আমার করাচী যাত্রার কথা লেখা আছে।

আমি করাচী রওয়ানা হয়েছি বলে যে কথা লেখা আছে তার অর্থ হচ্ছে আমাকে সেখানে ডেকে পাঠান হয়েছে। ডিলিং ক্লার্ক নিজ হাতে একথাগুলো লিখেছেন।

দৈনিক পাকিস্তান

২০শে আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

আমীর হোসেন মিয়ার জেরা সমাপ্ত ও সার্জেন্ট শামসুদ্দীনের জেরা আরম্ভ

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল সোমবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দু'নম্বর একরারী সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার জেরা সমাপ্ত হয়েছে। বিগত ১লা আগস্ট তারিখে আমীর হোসেন মিয়ার জবানবন্দী শুরু হয়। তিনি তেরদিনে প্রায় ৪৪ ঘণ্টা কাঠগড়ায় ছিলেন। তার জবানবন্দীতে ৪ দিন লাগে এবং বাকী ৯ দিন তাকে বিবাদীপক্ষের কৌসুলীরা জেরা করেন। বিবাদীপক্ষের মোট ১১ জন কৌসুলী তাকে জেরা করেন।

গতকাল আমীর হোসেন মিয়ার জেরা সমাপ্ত হলে এই মামলার চতুর্থ ও তিন নম্বর একরারী সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয় ও জেরা শুরু হয়।

এইদিন বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান, খান বাহাদুর নাজিরুদ্দীন, জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব জুলমত আলী খান প্রমুখ সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়াকে আদালতে উপস্থাপিত নতুন চিঠি সম্পর্কে নতুন করে জেরা করেন।

এইদিন আদালতের কাজ শুরু করার আগে জনাব আবদুস সালাম খান মরহুম মওলানা আকরম খাঁর জানাজায় যোগদানের সুযোগ দেওয়ার জন্য ট্রাইব্যুনালের কাজ আধ ঘণ্টা আগে শেষ করার অনুরোধ জানান।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান মরহুম মওলানা আকরম খাঁকে "একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি" বলে উল্লেখ করে বেলা ১২-৩০টায় অধিবেশন মুলতবী রাখতে সম্মত হন। এইদিন ট্রাইব্যুনাল কোনরূপ বিরতি না দিয়ে সকাল ৯টা থেকে একটানা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত চলে।

আবদুস সালাম খান

বিবাদী কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী জানান, তাঁর ডায়েরীতে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের কথানুসারে এ বি খুরশীদ কয়েক ব্যক্তির নাম লিখেছিলেন, সে কথা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তিনি উল্লেখ করেছেন কিনা তা ঠিক মনে পড়ছে না।

এ কথাটা পুলিশের কাছে বলেছে কিনা তাও মনে পড়ছে না বলে সাক্ষী জানান।

ডায়েরীতে কি সব লেখা হয়েছে, সে সম্পর্কে সাক্ষী নিজে বেশী ওয়াকিফহাল নয় বলে প্রশ্ন করা হলে সাক্ষী জানান যে, একথা ঠিক নয়।

যে নতুন চিঠিটা গত শনিবার আদালতে পেশ করা হয়েছে সেটা সাক্ষীকে দেখিয়ে কৌসুলী জিজ্ঞেস করেন যে, এই চিঠির কথা তিনি পুলিশকে জানিয়েছিলেন কিনা। তার জবাবে সাক্ষী জানান যে, তিনি ঠিক মনে করতে পারছেন না। তিনি আরো জানান যে, পুলিশকে এ ব্যাপারে জানিয়েছেন কিনা মনে নেই। (১৯শে জানুয়ারী পুলিশের কাছে প্রদত্ত প্রথম বিবৃতিতে এর কোন উল্লেখ নেই)।

কৌসুলী চিঠিটা দেখিয়ে এটা পুলিশ আটক করেছিল কিনা, জানতে চাইলে সাক্ষী হ্যাঁ সূচক উত্তর দেন। চিঠিতে টাকার কথা কোন স্থানে উল্লেখ করা আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি নেতিবাচক উত্তর দেন।

চিঠিতে প্রদত্ত ঠিকানার কথা উল্লেখ করে কৌসুলী জিজ্ঞেস করেন, এই একটাই চিঠি তিনি সামাদের কেয়ার অবে পেয়েছিলেন, না একাধিক চিঠি পেয়েছিলেন?

সাক্ষী জানান, তিনি একটিই চিঠি পেয়েছেন।

সাক্ষী হোটেল আরজুতে থাকার সময় গোপীবাগের ঠিকানায় তাঁর চিঠিপত্র আসার কথা ছিল এবং এই চিঠিতে আরো যে দুটি চিঠির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল সে দুটির কথা কৌসুলী জানতে চাইলে সাক্ষী তাঁর অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কৌসুলী বলেন যে, সাক্ষীকে যখন অফিসের হাজিরা বই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তাতে তিনি (সাক্ষী আমীর হোসেন) যে ঢাকায় নবেম্বরের শেষে ছিলেন না, সেটা প্রমাণ করে না। সুতরাং তাঁর (কৌসুলীর) মনে হয়, পরবর্তীকালে হাজিরা খাতায় তাঁর নামের পাশে হাজিরা বসানো হয়েছে। এর জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এটা সত্য নয়।

কৌসুলী আরো প্রশ্ন করেন যে, ১৯৬৬ সালের ১৭ই নবেম্বর থেকে ১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সাক্ষী আমীর হোসেন করাচী ছিলেন বলে আদালতে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, হাজিরা বইতে তা প্রমাণিত না-ও হতে পারে কিনা, জবাবে সাক্ষী জানান যে, হাজিরা বইতে অন্যরূপ আছে বলে তাঁর জানা নেই।

কৌসুলী সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার হাতে তাঁর হাজিরা খাতা দিয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, ১৯৬৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি যে ঢাকায় ছিলেন তা প্রমাণিত হয় কিনা। হাজিরা বইতে ৫ই ফেব্রুয়ারী তাঁর স্বাক্ষর দেখা যায়।

আদালত তখন সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন যে, কিভাবে ৫ই ফেব্রুয়ারী হাজিরা খাতায় তার স্বাক্ষর থাকে।

সাক্ষী জানান যে, তিনি তাঁর উপরস্থ অফিসারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে ঢাকা ত্যাগ করেন। যাওয়ার সময় তিনি ৫ই ফেব্রুয়ারী স্বাক্ষর করে যান। তাঁর উপরস্থ অফিসার তাঁকে ৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে ছুটি নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

প্র–এটা কি পরে ভেবেচিন্তে কথা বলছেন?

উ–না।

প্র–আসামীদের সনাক্ত করার জন্য কি আপনাকে তাদের ফটো দেওয়া হয়েছে?

উ–না।

জুলমত আলী খান

প্র–হোটেল রেজিস্টারে 'কোথায় যাবেন' বলে যে কলম রয়েছে, সেখানে আপনি গত ৪-২-৬৬ তারিখে কি লেখেন?

(সাক্ষীকে ঢাকা হোটেল রেজিস্টার দেখানো হয়)।

উ–যে কলমে লেখা রয়েছে করাচী যাওয়ার কথা, সেটা আমার কলম নয়। আমি যখন স্বাক্ষর করি, তখন এই কলমটা শূন্য ছিল।

প্র–হোটেলে কি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি কোথায় যাবেন?

উ–না।

প্র–'এনট্রি' ও 'ডিপারচার' কলামে যে কথা লেখা রয়েছে, সেটা কি আপনার নিজের হাতের লেখা?

উ–না।

এরপরে সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়ার জেরা সমাপ্ত হয়।

সার্জেন্ট শামসুদ্দীন আহমদের সাক্ষ্য

একরারী সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দীন তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে করাচীতে বিমানবাহিনীর পোস্টিং ও ট্রান্সফার বিভাগে সুপারভাইজার-এর কাজ করতেন। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি করাচীতে মৌরীপুর সার্জেন্টস মেসে সার্জেন্ট মফিজ উল্লার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সার্জেন্ট মফিজকে তিনি ১৯৫১ সাল থেকে চিনতেন। সার্জেন্ট মহফিজউল্লার সঙ্গে অপর একজন সার্জেন্ট ছিলেন। সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ

তাঁর সঙ্গীকে কোরাঙ্গী থেকে অন্যত্র বদলী না করার জন্য সাক্ষীকে অনুরোধ করেন। সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ তার সঙ্গীকে কোরাঙ্গীতে রাখার জন্য কেন আগ্রহ প্রকাশ করেন, তা জানতে চাওয়া হলে সাক্ষী বলেন যে, মফিজউল্লাহ তাকে বলেছিলেন যে, তার সঙ্গী তাঁর (মফিজউল্লাহ) মতের লোক এবং বিশেষ কোন দরকারে এটি প্রয়োজন হতে পারে।

সাক্ষীকে মফিজউল্লাহ বলেছিলেন যে, সামরিক বাহিনীতে চাকুরীর ক্ষেত্রে বাঙালীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয় না এবং ন্যায্য সুযোগ-সুবিধে থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। মফিজউল্লাহ আরো বলেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের প্রতি মনোযোগী নয়। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সাক্ষী জানান যে, তিনি এসব কথাবার্তায় সায় দিয়েছিলেন।

সাক্ষী জানান যে, ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় পক্ষে 'একমতাবলম্বী' ব্যক্তিদের একটি বৈঠক মফিজউল্লার কোরাঙ্গী ফ্রীকের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

ইতিপূর্বে বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের সার্জেন্ট মফিজউল্লাকে সনাক্ত করতে বললে সাক্ষী আসামীদের কাঠগড়ার কাছে এসে নির্ভুলভাবে দেখিয়ে দেন।

বাদীপক্ষের কৌসুলীর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি (সার্জেন্ট শামসুদ্দীন) জানান যে, এই বৈঠকে ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, মফিজউল্লাহ এবং তিনিসহ (সাক্ষী) আরো ৪/৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

এই সময় বাদীপক্ষের কৌসুলীর অনুরোধে সাক্ষী সার্জেন্ট ফজলুল হককে দেখিয়ে দেন।

তিনি জানান যে,বৈঠকে পাকিস্তানের উভয় অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সাক্ষী আরো জানান যে, এই বৈঠকে সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ বলেন যে, সামরিক বাহিনীতে চাকুরীরত বাঙ্গালীদের কর্তব্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলসমূহের সহযোগিতায় একটি শক্তিশালী যুক্তফ্রন্ট গঠন করে তোলা। জনাব মফিজউল্লাহ বিরোধীদলীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেন। মফিজউল্লাহ এই আদর্শ সামরিক বাহিনীতে কার্যরত বাঙালী অফিসারদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। সাক্ষী বলেন, 'আমরা সবাই তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করি এবং আন্দোলনের স্বার্থে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করি।'

সাক্ষী বলেন, 'এরপর ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত আমি অন্য কোন বৈঠকে যোগদান করিনি বা কোন যোগাযোগ রক্ষা করিনি। এই সময়ে মাঝে মাঝে সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আমাকে জানাতেন।'

১৯৬৭ সালের মে মাসে কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম মফিজউল্লার কাছ থেকে একটি মেসেজ নিয়ে আসেন। তিনি (মফিজ উল্লাহ) তাঁকে (সাক্ষী) কারসাজে লেঃ এম এম রহমানের বাসভবনে একটি বৈঠকেও অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সময়মত কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম একটি... সাক্ষী বলেন যে, এরপর ১৯৬৭ সালের জুন মাসের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সপ্তাহে লেঃ রহমানের বাসভবনে আবার একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠক লেঃ রহমান, মফিজউল্লাহ, এস এ সি বারী, মোঃ মাহবুবউদ্দীন চৌধুরী, কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম ও আরো তিনজন অংশগ্রহণ করেন। এই বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে লেঃ রহমানের কাছ থেকে জানার জন্যই সবাই জমায়েত হন। লেঃ রহমান এই বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানে দলীয় তৎপরতা বিশ্লেষণ করতে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন। লেঃ মোয়াজ্জেম কেবলমাত্র তাঁকে লোক সংগ্রহ বন্ধ রাখার খবর পাঠিয়েছেন–এর বেশী কোন খবর তিনি জানাননি। লেঃ রহমান আরো জানান যে, লেঃ মোয়াজ্জম যদি কয়েক দিনের মধ্যে করাচী না আসেন , তবে পূর্ব পাকিস্তানে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানার জন্য তিনি স্বয়ং ঢাকা যাবেন।

সাক্ষী জানান যে, এই সময়ে তাঁর (সাক্ষী) ঢাকা বদলীর কথা উল্লেখ করে এস এ সি বারী ও মাহবুবউদ্দীন চৌধুরী উল্লেখ করেন যে, তিনি (সাক্ষী) ঢাকায় থাকাকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁদের করাচীতে খবরাখবর জানাতে পারবেন। লেঃ রহমান এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। লেঃ রহমান সাক্ষীকে জানান যে, লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম যদি তাঁকে (লেঃ রহমান) ঢাকা আসতে বলেন, তবে যেন তিনি (সাক্ষী) তাঁকে কেন্দ্রীয় ঠিকানায় এই বলে টেলিগ্রাম করেনঃ 'বজলু গুরুতর অসুস্থ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে।'

কৌঁসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের এখন জানতে চান যে, সাক্ষীর সঙ্গে ঢাকায় যোগাযোগ করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল?

সাক্ষী জানান, 'আমি আমার গ্রামের ঠিকানা দিয়েছিলাম।' তিনি জানান যে, তিনি ১৯৬৭ সালের ১লা জুলাই ঢাকা আগমন করেন। এখানে পৌঁছানোর পরের দিন তিনি টেলিফোনে লেঃ মোয়াজ্জেমের সঙ্গে যোগাযোগ করে লেঃ রহমানের সব কথা জানান। লেঃ মোয়াজ্জেম তাঁকে লেঃ রহমানকে ঢাকা চলে আসার জন্য খবর দিতে বলেন। তিনি ৩রা জুলাই করাচীতে লেঃ রহমানের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেন। এরপর তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ীতে চলে যান।

এরপর দেশের বাড়ীতে ছুটিভোগ করার সময় তিনি লেঃ রহমানের কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পান। টেলিগ্রাম তাঁকে ২৯/৩, নম্বর আউটার সার্কুলার রোডে রিপোর্ট করতে বলা হয়। পরে তিনি জানতে পারেন যে, এটা সুলতান আহমদের ভগ্নীপতি কামালুদ্দিনের বাড়ী। সেই বাড়ীতে গিয়ে কড়া নাড়তেই সুলতান আহমদ দরজা খুলে বেরিয়ে এসে নিজের পরিচয় দেন।সাক্ষীও তখন নিজের নাম বলেন। সাক্ষী জানান যে, এরপর ন্যাভাল ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে লেঃ রহমানকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠাতে হয়। লেঃ রহমান বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জম তাঁকে জানিয়েছেন তিনি সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিকদের দলে রাখতে চান না। লেঃ রহমান তখন তাঁকে (সাক্ষী) বলেন, লেঃ মোয়াজ্জমকে অনুসরণ করার কোন প্রয়োজন নেই। সাক্ষী তখন তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি লেঃ মোয়াজ্জমকে চেনেন না, তিনি তাঁকে (লেঃ রহমান) নেতা হিসেবে মানেন। লেঃ রহমান তখন তাঁকে সাবেক ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাকের গ্রুপে যোগদান করতে বলেন।

লেঃ রহমান আরো বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জম দলের বহু টাকা আত্মসাৎ করেছেন এবং এখন দলের নিঃস্বার্থ কর্মীদের এড়িয়ে চলছেন।

সাক্ষী শামসুদ্দিন আহমদ জানান যে, তিনি সাবেক সার্জেন্ট রাজ্জাকের সঙ্গে তাঁর আওলাদ হোসেন মার্কেটের ঔষধের দোকানে দেখা হয়। কিন্তু, রাজ্জাকের দলে যোগদানের পূর্বে তিনি এক মাসের ট্রেনিং-এ কোহাটে চলে যান।

সাক্ষী কৌঁসুলী মঞ্জুর কাদিরের প্রশ্নের জওয়াবে সার্জেন্ট রাজ্জাককে আসামীদের মধ্যে থেকে সনাক্ত করেন।

সাক্ষী জানান যে, কোহাট থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে কয়েকদিনের জন্য করাচী গমন করেন। সময়টা ছিল অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ। তিনি করাচীতে ড্রিগ রোডে মফিজুল্লার পাশের কামরায় ছিলেন। করাচীতে যাওয়ার তৃতীয় দিনে দলের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে লেঃ রহমান, লেঃ রউফ, লেঃ মাহবুবুদ্দিন, মফিজুল্লাহ ও কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে লেঃ রহমান পূর্ব পাকিস্তানে দলীয় কর্মীদের কাজ-কর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন যে, যখন তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে কর্মীদের গাফলতিতে মুষড়ে পড়লে চলবে না।

সাক্ষী জানান, সে বৈঠকে লেঃ রউফ জানান যে, তিনি সুলতানুদ্দিনকে দলীয় কথাবার্তা বলার জন্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে দু'জন লোককে আনার জন্য বলেছেন। যদি ঢাকা থেকে লোক না আসে তবে তিনি (লেঃ রউফ) নিজেই দলকে সংগঠিত করার জন্য ঢাকা যাবেন।

সাক্ষী জানান যে, তিনি ১৯৬৭ সালের ৬ই অক্টোবর করাচী থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। এর কয়েকদিন পরে তিনি সুলতানুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করে জানতে পারেন যে, দলীয় কর্মীরা কেউ করাচী যেতে চান না। সেই মাসেই সার্জেন্ট ফজলুল হক, ও রাজ্জাক সাক্ষীকে ডেকে পাঠান। রাজ্জাকের বাসায় যাওয়ার পর তারা অপর একটি বাসায় যান এবং সেখানে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বাসাটা কার সে কথা তিনি জানেন না। বৈঠকে রাজ্জাক, সার্জেন্ট ফজলুল হক, জাকের আহমদ প্রমুখ অংশগ্রহণ করে।

বৈঠকে রাজ্জাক বলেন যে, প্রদেশে আন্দোলন সাবেক স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। রাজ্জাক তাঁদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে, প্রতিটি পূর্ব পাকিস্তানীকে খাদ্য, ঔষধ, বস্ত্র ইত্যাদি সরবরাহ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। কিন্তু, বর্তমান পর্যায়ে সেটা সম্ভব নয়। তাঁদের দল সাবেক সেনাদের দলে ভর্তি করছেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র এই আদর্শের কথা প্রচার করা হচ্ছে। এখন একটি শক্তিশালী গ্রুপ যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।

সাক্ষী শামসুদ্দিন জানান যে, ১৯৬৭ সালের নবেম্বর অথবা ডিসেম্বরে লেঃ রউফ, মাহবুবুদ্দিন, কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম করাচী থেকে ঢাকা আগমন করেন। লেঃ রউফ সাক্ষী শামসুদ্দিনকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর কাছ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে দলের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে জানতে চান। তিনি সার্জেন্ট রাজ্জাকের বাসভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কথা তাঁকে জানান।

কৌঁসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির জিজ্ঞেস করেন যে, সাক্ষী কবে স্বীকারোক্ত করেন। উত্তরে সাক্ষী জানান যে, ১৯৬৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি করেন। অপর একজন ম্যাজিস্ট্রেট সম্ভবতঃ ১৯৬৮ সালের ২৩শে মে তাঁকে জানান যে, সাক্ষীকে ক্ষমা করা হয়েছে।

সাক্ষীর বিবৃতি শেষ হওয়ার পর বিবাদী কৌঁসুলী জনাব আবদুস সালাম খান তাঁকে জেরা শুরু করেন।

আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী শামসুদ্দীন আহমদ বলেন, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাসের পর ১৯৪৯ সালে এয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন।

সাক্ষী বলেন, বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা অবস্থায় তিনি বিএ পাশ করেন। এ হলো করাচীর ইসলামীয়া কলেজের কথা এবং এই কলেজ থেকেই তিনি বিএ পাশ করেন। সেখানে কয়েকজন এয়ারম্যানসহ কতিপয় বাঙ্গালী ছেলে ছিল। তবে তিনি আন্দোলন সম্পর্কে তাদের কারো সাথে আলাপ-আলোচনা করেননি। তাছাড়া তিনি সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত বা কোন প্রাক্তন সৈনিকের সাথে যোগাযোগ করেননি বা অর্থও সংগ্রহ করেননি।

এরপর সাক্ষী শামসুদ্দীন কিভাবে তিনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট তার কক্ষে একা বসবাস করতেন তা বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, সামরিক বাহিনীর লোকেরা তাকে খাদ্য সরবরাহ করত কিন্তু এর জন্য তাকে কোন মূল্য দিতে হয়নি।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৭ সালের জুন পর্যন্ত তিনি করাচী ছিলেন। ১৯৬৭ সালের জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি ঢাকা ছিলেন। তবে এর মাঝে তিনি ৩৫ দিনের জন্য ময়মনসিংহে তার বাড়ীতে কাটিয়েছেন। তাছাড়া ১৯৬৭ সালের আগস্টে কোর্সে যোগদানের জন্য তিনি কোহাটেও গিয়েছিলেন।

সাক্ষী শামসুদ্দীন বলেন, ১৯৬৭ সালের নবেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে লেফটেন্যান্ট রউফের সাথে শেষ বৈঠকের পর বিপ্লবী সংস্থার সাথে তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তিনি বলেন, লেফটেন্যান্ট রউফের সাথে বৈঠক এবং সংস্থার সাথে সম্পর্ক ত্যাগের ২০ দিনেরও অধিক সময় পরে ১৯৬৭ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তিনি গ্রেফতার হন এবং তাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়।

সাক্ষী বলেন, সংস্থা ত্যাগের পর তিনি দলের কোন সভায় যোগদান করেননি এবং তিনি নিজেই দল ত্যাগ করেছেন। তাকে কেউই বলেনি যে, দলের সদস্যরা খুব শীঘ্রই গ্রেফতার হবেন। লেফটেন্যান্ট রউফের সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি যে দল ত্যাগ করবেন এটা তাকে বলেননি।

শামসুদ্দীন বলেন, যখন তাকে হাজতে আনা হয় তখন তাকে বলা হয়নি যে, তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শামসুদ্দীন বলেন, গ্রেফতারের পর তাকে দু'দিন (বিপ্লবী) সংস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এ সময় তার যতটা জানা ছিল তা বলেছেন। যারা জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তারা তাকে বলেছেন, তিনি ষড়যন্ত্র মামলার সাথে জড়িত এবং এর পরিণাম মারাত্মক হবে। তিনি বলেন, জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার উপর কোন চাপ দেওয়া হয়নি বা কোন পরামর্শ দেওয়া হয়নি। তারা তাকে বলেননি যে, তিনি যা কিছু করছেন সেজন্য সামরিক আদালতে তার বিচার হবে।

তিনি জানেন না আইনানুগ কোন সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলে তার কি শাস্তি। তিনি জানেন না যে, এই অপরাধের জন্য বিমান বাহিনীর আইন অনুসারে কি শাস্তির ব্যবস্থা আছে। সাক্ষী বলেন, এখনো পর্যন্ত জানেন না তিনি যে অপরাধ করেছেন তার শাস্তি কি।

সাক্ষী শামসুদ্দীন বলেন, ঢাকা ক্যাটেনমেন্টে আটক থাকা অবস্থায় ফেব্রুয়ারী মাসের কোন এক সময়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, ম্যাজিস্ট্রেটের

সম্মুখে তিনি দোষ স্বীকার করবেন। কারণ সেসময় তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন। তিনি বলেন, ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে বিবৃতি দিতে কেউ তাকে পরামর্শ দেয়নি।

তিনি বলেন, ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে গ্রেফতারের পর থেকে আজ পর্যন্ত তাকে নির্জনে আটক রাখা হয়েছে এটাকেই তিনি একা একটি কক্ষে বসবাস বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

তিনি বলেন, আটক থাকা অবস্থায় তার সুখ-সুবিধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জন্য লেফটেন্যান্ট শরীফ এবং মেজর নাসের প্রায়ই তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। গ্রেফতারের পর আটক থাকা অবস্থায় তার পরিবারবর্গের কেউ এ পর্যন্ত তার সাথে সাক্ষাৎ করেননি।

তিনি তার বাপের চিঠিতে জানতে পেরেছেন যে, তিনি দুবার চেষ্টা করেও তার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারেননি। তার বাপ ঢাকা ত্যাগ করে যাওয়ার পর তিনি এই খবর পান।

এর আগে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সরকারী পক্ষের সাক্ষী আমির হোসেন মিয়াকে জেরা করার সময় বলেন, তিনি তার অফিসের হাজিরা খাতায় দেখেছেন যে, ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তাকে তার ঢাকা অফিসে হাজিরা দেখান হয়েছে।

আদালত সাক্ষীকে বলেন, তিনি বলেছেন ঐদিন তিনি চট্টগ্রামে ছিলেন,তাহলে তিনি কিভাবে ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী অফিসে হাজির ছিলেন।

সাক্ষী বলেন, উর্ধতন অফিসারের কাছে তিনি ৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে ছুটি চেয়েছিলেন। তিনি ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিকেলে অফিস ত্যাগের জন্যও অনুমতি চান। অফিসার তাকে অনুমতি দেন এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিকেলে তাকে ৫ই ফেব্রুয়ারীর জন্য হাজিরা খাতায় স্বাক্ষরের অনুমতি দেন। সাক্ষী বলেন, এই অফিসার হলেন সার্ভে অফিসার সিদ্দিকুর রহমান।

আগামীকাল পুনরায় শুনানী শুরু হবে।

দৈনিক পাকিস্তান

২২ শে আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

বুধবারেও সার্জেন্ট শামসুদ্দীনের জেরা অব্যাহত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বুধবার "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার" ৩নং একরারী সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দীন আহমদের জেরা অব্যাহত থাকে।

এইদিন বিবাদীপক্ষের কৌসুলী আবদুস সালাম খান ছাড়াও জনাব আতাউর রহমান খান, খান বাহাদুর নাজিরুদ্দীন ও খান বাহাদুর ইসমাইল সাক্ষীকে জেরা করেন।

ট্রাইব্যুনালে এ দিনের শুনানী শুরুর প্রাক্কালে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মনজুর কাদির "ষড়যন্ত্র মামলার" সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতার পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে "প্রকৃত অবস্থা" জানান।

গত মঙ্গলবার বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীকে ঢাকাস্থ পিএএফ-এর ভিআইপি হাউসে সাক্ষী যেসব বিবৃতি দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে জেরার জন্য রেকর্ড পরীক্ষা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন।

আদালতের নির্দেশক্রমে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী গতকাল বুধবার আদালতে বলেন যে, দেশরক্ষা আইনে গত ডিসেম্বর মাসে যেসব ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের সঙ্গীদের সম্পর্কে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সামরিক বাহিনীর লোকদেরও সদর দফতরের নির্দেশক্রমে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়–এর জন্য তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করা হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জনাব মনজুর কাদির জানান যে, যাদের ব্যাপারে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন, তাদের সম্পর্কিত তথ্যাদি লেখা হয়েছিল। ঐ পর্যায়ে কোন অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করা হয়নি এবং অপরাধ করার সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সংক্রান্ত বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়নি। গত ৮ই জানুয়ারী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৬(খ) ধারাবলে তদন্তের নির্দেশ পাওয়া যায়। পরে এই একই ধারাবলে তদন্ত করার জন্য কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়।

বাদীপক্ষের কৌসুলী যথার্থের খাতিরে গোয়েন্দা ব্যুরো এবং আন্তঃ সার্ভিস গোয়েন্দা ডাইরেক্টরেটের কথা উল্লেখ করেন। এগুলোই হলো সংশ্লিষ্ট ডাইরেক্টরেট।

প্র–আপনি আপনার গ্রামের বাড়ীতে যাবার জন্য ৩রা জুলাই (১৯৬৭) ঢাকা ত্যাগ করেন?

উ–হ্যাঁ।

প্র–আপনার গ্রামের বাড়ীতে আপনি লেঃ রহমানের টেলিগ্রাম পান?

উ–হ্যাঁ।

প্র–আপনি কি বলতে পারেন কবে আপনি টেলিগ্রামটি পান?

উ–ঠিক মনে নেই। তবে টেলিগ্রাম পেয়ে আমি ২০শে জুলাই এর আগেই ঢাকা আসি।

প্র–মগবাজারের ৩৯২/২, নম্বর বাড়ীটি কি আপনি চেনেন?

উ–না।

বিবাদী কৌঁসুলীর অপর এক প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী শামসুদ্দীন আহমদ জানান যে, বৈঠকের জন্য তিনি যে বাড়ীতে যান সেটার মালিক কে, তা তিনি জানিতেন না। তিনি আরো জানান যে, বৈঠকে সাক্ষী কামালউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। লেঃ এস এম রহমানের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল বলে তিনি জানান।

প্র–আপনি যে গোলাম মোহাম্মদের কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁকে কি আপনি চিনতেন?

উ–তাঁকে আমি আগে চিনতাম না।

অপর এক প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী জানান যে, গোলাম মোহাম্মদ লেঃ রহমানকে আনতে যাওয়ার জন্য বাড়ী থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে কি কোন যানবাহনযোগে গিয়েছিলেন? তা তিনি বলতে পারেন না।

প্র–এই বৈঠকের পর আপনি ঢাকায় কোথায় ছিলেন?

উ–আমি ঢাকায় পি এ এফ সার্জেন্টস মেসে ছিলাম।

প্র-আমার মনে হয় লেঃ রহমান ১৮ই জুলাই থেকে ২০শে জুলাই ঢাকা ছিলেন না?

উ–আমি জানি না।

প্র–আপনার করাচী থেকে ঢাকা আসার সময় এটা কি ঠিক হয় যে, ঢাকায় কোন খবরাদি না পেলে লেঃ রহমান ঢাকায় চলে আসবেন এবং আপনাকে লেঃ মোয়াজ্জমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয় কি?

উ–আমি লেঃ মোয়াজ্জমের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করি তবে তাঁর (লেঃ মোয়াজ্জমের) করাচী যাওয়া সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করিনি।

প্র–লেঃ মোয়াজ্জম দলে নতুন লোক গ্রহণ না করতে নির্দেশ দিয়েছেন বলে কি আপনি লেঃ মোয়াজ্জমকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?

উ–না।

বিবাদী কৌঁসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের এক প্রশ্নের জওয়াবে একরারী সাক্ষী শামসুদ্দীন আহমদ জানান, লেঃ রহমান কতদিন ঢাকায় ছিলেন সে কথা তিনি (লেঃ রহমান) আমাকে বলেছিলেন কিনা আমার মনে নেই। তবে লেঃ রহমান বলেছিলেন যে, তিনি ২/১ দিনের মধ্যেই করাচী চলে যাবেন।

দলে নতুন লোক গ্রহণ বন্ধ করার ব্যাপারে লেঃ মোয়াজ্জম যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, সে বিষয়ে লেঃ মোয়াজ্জমের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা কেউ উল্লেখ করেছিলেন কিনা জানতে চাইলে সাক্ষী বলেন যে, কেউ করেননি।

কৌঁসুলীর অপর এক প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী জানান যে, লেঃ রহমান তাঁকে গোপনে জানিয়েছিলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জম দলের তহবিল তছরূপ

করেছেন। এ ব্যাপারে লেঃ এস এম রহমান কোন বিস্তারিত আলোচনা করেননি, বা কত টাকা তছরূপ হয়েছে, তাও জানাননি। দলের তহবিল কত টাকা ছিল, সে বিষয়ে আমার কোন ধারণা ছিল না।

প্র–লেঃ মোয়াজ্জমের সঙ্গে আপনার দলের কোন সম্পর্ক থাকবে না সে কথা কে আপনাকে বলেছিলেন?

উ–বৈঠকের আলোচনা থেকেই আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম।

প্র–দলের মধ্যে যে গোলযোগ দেখা দিয়েছিল, সে সম্পর্কে আপনি কারো কাছে খোঁজ করেছিলেন কি?

উ–না।

প্র–এটাকে কি দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেছিলেন?

উ–হ্যাঁ।

প্র–লেঃ রহমানকে আনার জন্য গোলাম মোহাম্মদকে পাঠানো হয় বলে আপনি বলেন। লেঃ রহমানের সঙ্গে কি তিনি ফিরে এসেছিলেন?

উ–আমার মনে নেই। তবে তিনি আমাদের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না।

প্র–বৈঠকটা কোথায় হয়?

উ–একটি ছোট বৈঠকখানায়।

প্র–এল এস সুলতানুদ্দীন কি বৈঠকে সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন?

উ-সুলতানউদ্দীন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, তবে তিনি সর্বক্ষণ ছিলেন কিনা আমার মনে নেই।

তিনি এক প্রশ্নের জওয়াবে জানান যে, লেঃ রহমানের এই বৈঠকের পর তিনি দলের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে কোন খবর রাখেন না।

প্র–আপনি যখন করাচী যান, তখন সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ কোথায় থাকতেন?

উ–করাচীর পিএএফ ব্যারাকে।

প্র–আপনি সাবেক ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাকের সঙ্গে কবে দেখা করেন?

উ–১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে তাঁর আওলাদ হোসেন মার্কেটের ঔষধের দোকানে তাঁর সঙ্গে একা দেখা করি। এরপরেই কোহাট চলে যাই।

প্র–আপনার সঙ্গে রাজ্জাকের কি কথাবার্তা হয়েছিল?

উ–আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তিনি লেঃ রহমান ও সার্জেন্ট মফিজউল্লাহকে চেনেন কিনা।

প্র–আর কোন বিষয়ে কি আলোচনা করেছিলেন?

উ–না।

প্র–সার্জেন্ট রাজ্জাক কি আপনার কাছে লেঃ মোয়াজ্জমের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেন?

উ–না।

প্র–কোহাট থেকে করাচী যাওয়ার জন্য কতদিনের ছুটি নিয়েছিলেন?
উ–ছুটি নেইনি।
কৌসুলী এই সময় রেলওয়ে কনসেশনের কাউন্টারফয়েল-এর বই সাক্ষীর হাতে দেন।
প্র–এটা কার হাতের লেখা?
উ–আমার নয়–অফিসের একজন কেরানীর। তবে, অপর পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর রয়েছে।
প্র–এই কাউন্টারফয়েল কি অন্য কারোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে?
উ–হ্যাঁ।
প্র–এই কাউন্টারফয়েল কোথায় রাখা হয়?
উ–এটা ঢাকাস্থ পিএএফ-এর অফিসে রাখা থাকে। আয়রন সেফের মধ্যে।
প্র–কোহাট থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে করাচী যাওয়ার জন্য কি কারো কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলেন?
উ–না।
প্র–করাচীতে আপনি কতদিন ছিলেন?
উ-চারদিন।
প্র–ঢাকায় আপনার অফিসে কাজে কবে যোগদান করেন?
উ–১৯৬৭ সালের ৬ই অক্টোবর।
প্র–করাচীতে আপনি ছিলেন কোথায়?
উ–করাচীতে পিএএফ ব্যারাকে সার্জেন্ট মফিজউল্লাহর গেস্ট হিসেবে ছিলাম।
প্র–আপনার নাম সার্জেন্টস মেসে রেজিস্ট্রি করা হয়?
উ–যার গেস্ট ছিলাম তিনি বলতে পারেন।
প্র–আমার মনে হয়, বিমান বাহিনীর লোকদের মেসে থাকতে গেলে রেজিস্ট্রারে নাম লেখাতে হয়?
উ-যদি কেউ সরকারী কাজে যান এবং নিজে তা প্রকাশ করেন, তবে লেখাতে হয়।
প্র–তার মানে আপনার করাচী যাওয়ার কোন রেকর্ড নেই।
উ–সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ নিজে কাউন্টারে গিয়ে আমার জন্য অতিরিক্ত খাবারের অর্ডার দিতেন। তিনি রেজিস্টারে আমার নাম উঠিয়েছেন কিনা জানা নেই।
প্র–আমার মনে হয় প্রত্যেক গেস্টকে নাম লেখাতে হয়।
উ–না, তা হয় না।

প্র–তবে কিভাবে গেস্টকে সনাক্ত করা যাবে?
উ–পরিচিত গেস্ট-এর জন্য এটা দরকার নেই। গেস্ট যদি বিমান বাহিনীর চাকুরে হন, তবে তার জন্য তিনি যাঁর গেস্ট হবেন, তাঁকে কোন অনুমতি নিতে হয় না।
এই সময়ে কৌসুলী উল্লেখ করেন যে, নিয়ম অনুসারে সবাইকে অনুমতি নিতে হয়। সাক্ষী তাঁর জওয়াবে জানান যে, সার্জেন্ট-এর নীচের পদের কর্মচারীদের তা করতে হয়।
প্র– বিমান বাহিনীর অফিসারদের এই অনুমতি নিতে হয়, তা আপনি জানেন কি?
উ–আমার জানা নেই।
প্র-করাচীতে থাকার সময় কি আপনি স্টেশন ওয়ারেন্ট অফিসারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন?
উ–না।
প্র–কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করাটাই তো নিয়ম?
উ–আমি যদি ডিউটিতে যেতাম, তবে আমিও তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম।
প্র–আপনার সঙ্গে প্রয়োজন হলে করাচীতে যোগাযোগ করার জন্য ঢাকা অফিসে কি কোন ঠিকানা রেখে গিয়েছিলেন?
উ–না।
প্র–কোহাট থেকে করাচী যাওয়ার সময় সেখানে কোন ঠিকানা রেখে যান?
উ–না।
প্র–সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ কি বিবাহিত?
উ–জানি না। তিনি অবিবাহিতও থাকতে পারেন।
প্র–করাচীতে যে বাড়ীতে... বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেটা কি সরকারী কোয়ার্টার?
উ–জানি না।
প্র–মাহবুবুদ্দিন কি সরকারী কর্মচারী ছিলেন?
উ–মাহবুবুদ্দিন একজন মিল ম্যানেজার ছিলেন বলে জানতাম।
প্র–মাহবুবুদ্দিন কি সরকারী কোয়ার্টারে থাকতেন?
উ–জানি না।
প্র–মাহবুবুদ্দিন যে মিলটিতে কাজ করতেন, সেটা কি সরকারী মিল?
উ–আমার জানা নেই।
প্র–বৈঠকটা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উ- একটা বারান্দায়।
প্র–মাহবুবুদ্দিনের ভগ্নিপতি সরকারী কর্মচারী ছিলেন কি?
উ–জানি না।

প্র–আপনি তাঁর নাম জানেন?
উ–না।
প্র–আপনি কি জানেন যে, মাহবুবুদ্দিনের ভগ্নিপতি মাহবুবুদ্দিনের মিলেই কাজ করতেন?
উ–আমি তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না।
প্র–তিনি যে বাড়ীতে থাকতেন সেটা বেসরকারী লোকের?
উ–জানি না।
প্র-বাড়ীর মালিকও কি বাড়ীর একদিকে বাস করতেন?
উ-জানি না।
প্র-লেঃ রউফের সঙ্গে আপনার কখন দেখা হয়?
উ–সেই বৈঠকেই প্রথম পরিচয় হয়।
বিবাদী কৌসুলীর এক প্রশ্নের জওয়াবে তিনি জানান যে, সেই বৈঠকে লেঃ রহমান তাঁকে লেঃ রউফের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। বৈঠকে সাক্ষী ঢাকায় তাঁর সাবেক ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাকের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বর্ণনা করেন। এছাড়া, তিনি আর কিছু বলেননি।
সাক্ষী আরো বলেন যে, এই বৈঠকে লেঃ রহমান দলের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন।
প্র–বৈঠকে আপনি কিছু বলেছিলেন?
উ–না।
প্র–দলীয় মতানৈক্য সম্পর্কে বৈঠকে কিছু আলোচনা করা হয় কি?
উ–না।
প্র–বৈঠকে কে সভাপতিত্ব করেন?
উ–লেঃ এম এম রহমান।
প্র–লেঃ রউফ কিভাবে সভাপতিকে সম্বোধন করেন?
উ-তিনি কোনরকম সম্বোধন না করেই বক্তৃতা করেন।
প্র–লেঃ রউফ লেঃ রহমানের চেয়ে কি সিনিয়র ?
উ–জানি না।
প্র–এই সময় সুলতানউদ্দিন কোথায় চাকুরীতে ছিলেন?
উ–আমার জানা নেই।
প্র–আচ্ছা বলতে পারেন কি কারণে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দুজন লোককে পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়?
উ–দলীয় সংগঠনের ব্যাপারে অনুরূপ আলোচনার জন্য। কিন্তু, সেকথা কাউকে বলা হয়নি।
প্র–এর কারণ কি বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে?
উ–না।

প্র–কি ধরনের দলীয় কথাবার্তা খুব গুরুত্বপূর্ণ কি?
উ–তা জানানো হয়নি।

সাক্ষী অতঃপর জানান যে, সেই মাসেই তাঁদের আরো একটা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তবে, কার বাড়ীতে বৈঠকটা হয়, সেটা তাঁর জানা নেই। বাড়ীটা কোথায় তা বলতে পারবেন; কিন্তু রাস্তার নাম বা এলাকাটা তাঁর মনে নেই। কৌসুলী স্থানটা তেজকুনীপাড়া কিনা জানতে চাইলে তিনি জানান যে, তাঁর মনে পড়ছে না।
প্র–আপনি কি জাকের আহমদকে আগে চিনতেন?
উ–না।
প্র–এই বৈঠকের পরে তাঁর সঙ্গে আপনার অন্য কোথায়ও দেখা হয়েছে?
উ–না।
প্র–বৈঠকে লেঃ মোয়াজ্জমের নেতৃত্বে পরিচালিত গ্রুপ সম্পর্কে কি আলোচনা হয়েছে?
উ–না।
প্র–আপনি কি জানেন যে, সাবেক স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী আসলে লেঃ মোয়াজ্জম নিজেই?
উ–না।

কৌসুলীর অপর এক প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী বলেন যে, বৈঠকে রাজ্জাক জানান, তাঁর প্রতিষ্ঠান সাবেক সামরিক কর্মচারীদের সংগ্রহ করেছে এবং সামরিক বাহিনীতে চাকুরীরত ব্যক্তিদের দলে গ্রহণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই কাজ সাবেক স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে করা হচ্ছে বলে রাজ্জাক উল্লেখ করেন। সাক্ষী স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী সম্পর্কে রাজ্জাককে জিজ্ঞেস করলে রাজ্জাক তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি (সাক্ষী) চৌধুরীকে দেখার সুযোগ পেতে পারেন। কিন্তু সাক্ষীর সঙ্গে পরে আর চৌধুরীর দেখা হয়নি। স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী তখন করাচীতে না ঢাকায় কোথায় থাকতেন সাক্ষী তা জানেন না। চৌধুরী এই মামলার একজন সাক্ষী কিনা, সাক্ষী তাও জানেন না।
প্র–আচ্ছা, এই বৈঠকে সার্জেন্ট রাজ্জাক জনগণকে খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ ও বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়ার কথা কেন বলেন?
প্র–তেমন কি বিশেষ কোন কারণ ঘটেছিল?
উ-তিনি দলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে এইসব কথা বলেছিলেন।
প্র–এই ধরনের কোন কথা কি এখানে উত্থাপন করা হয়?
উ–আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়েই এসব কথা বলা হয়।

প্র–আচ্ছা, এই স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা কেমন হবে , সেসব কথা কি কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন?
উ–না।
প্রশ্ন–আচ্ছা, এইসব পণ্য খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ, শিক্ষা ইত্যাদি কি এখন পাওয়া যায় পাকিস্তানে?
উ–হ্যাঁ। তবে বিনামূল্যে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই।
প্র–কেন দেশে কি বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয় না?
উ-হয়, তবে প্রাথমিক অবস্থাতেই।
প্র–সেই সভায় কি কেউ উল্লেখ করেছিল যে, এইসব জিনিস তো পাকিস্তানে পাওয়া যায়, সুতরাং তার জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দরকারটা কি?
উ–না।
প্র–আপনি?
উ–না, আমিও না।
প্র–এসব বিষয়ে কি আগের কোন বৈঠকে উল্লেখ করা হয়েছে?
উ–না।
অপর এক প্রশ্নের জওয়াবে তিনি জানান যে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এসব জিনিস পাওয়া সম্ভব নয়, একথা কেউ বলেননি। বৈঠকের পরে ফিরে এসে তিনি এই বিষয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেন এবং পরে এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমার ধারণা, সবাইকে বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, অন্যান্য জিনিস তো পাওয়াই যাচ্ছে। এই ভেবেই তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করেন।
প্র–এই বৈঠকটাতো ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হয়?
উ–হ্যাঁ।
প্র–আপনার সিদ্ধান্তের কথা কি আপনি জানিয়েছেন?
উ–না। কিন্তু এরপর থেকে দলের কোন বৈঠক অথবা কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত থাকিনি।
প্র–করাচীর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কি আপনার যোগাযোগ অব্যাহত থাকে?
উ–এই সময়ে আমি তাদের সঙ্গেও সম্পর্ক ত্যাগ করার কথা চিন্তা করছিলাম।
অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী জানান যে, তিনি নীতিগত কারণে ঢাকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন।
তিনি আরো জানান যে, যারা পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার জন্য কাজ করছিলেন, তিনি তাদের সে কাজ থেকে বিরত হওয়া বা ফিরিয়ে আনার কোন চেষ্টা করেনি।

প্র–আন্দোলন থেকে সরে আসার বিষয়ে কি আপনি লেঃ রউফকে জানিয়েছিলেন?
উ–জী, না। তবে প্রথমে আমি যে গ্রুপের সাথে জড়িত হয়ে পড়ি সেখান থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে আমার বেশ সময় লাগে।
প্র–আপনি কি অন্য কোন মিটিং-এ যোগদান করেছিলেন?
উ–আওলাদ হোসেন মার্কেটে অনুষ্ঠিত সভা ছাড়া আমি দলের আর কোন সভায় যোগ দেইনি।
জনাব আবদুস সালাম খানের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, লেঃ রউফের বাসাতেই তাঁর সাথে লেঃ রউফের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সে বাসাটি লেঃ রউফের নিজস্ব কিনা তিনি জানেন না। তবে এটা লেঃ রউফের বাসা বলে তাঁকে বলা হয়েছিল।
প্র–কে আপনাকে সে বাসায় নিয়ে যায়?
উ–জনাব মালেক আমাকে সে বাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন।
প্র–আপনাদের একটি সংগঠন ছাড়া অন্য নতূন কোন সংগঠন ছিল?
উ–জী না।
প্র–লেঃ রউফের পূর্বের কার্যকলাপ সম্পর্কে আপনি কি জানতেন?
উ–জী না। লেঃ রউফের পূর্বের কোন কার্যকলাপ আমার জানা ছিল না।
প্র–আন্দোলন ত্যাগ করবেন বলে লেঃ রউফকে আপনি কিছু জানিয়েছিলেন?
উ–জী না। এছাড়া আমার মনে যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল সে সম্পর্কেও আমি তাঁকে কিছু বলিনি।
প্র– এরপর আপনি কি লেঃ রহমানের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন?
উ–জী না। আমি লেঃ রহমান বা দলের অন্য কাহারও সাথে সাক্ষাত করিনি।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী শামসুদ্দিন আহমদ বলেন যে, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহর বাড়ীর নম্বর আমার জানা নেই। এছাড়া তাঁর বাড়ীর টাইপ কি রকম ছিল তাও আমি জানি না। তবে ওয়ারেন্ট অফিসার্স টাইপ কোয়ার্টার ও এয়ারম্যান টাইপ কোয়ার্টার–এই দু'ধরনের বাড়ী আছে বলে আমি জানি।
প্র–নির্যাতনের ভয়ে আপনি এই আদালতে সাক্ষ্য দিচ্ছেন–এটা কি ঠিক?
উ–জী না। একথা সত্য নয়।
এই পর্যায়ে জনাব আবদুস সালাম খান জেরা সমাপ্ত করেন এবং বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌঁসুলী খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন একরারী সাক্ষী সার্জেন্ট সামসুদ্দিন আহমদকে জেরা শুরু করেন।
প্র–সার্জেন্ট মফিজউল্লাহর সাথে মেসে অপর যে সার্জেন্ট ছিলেন তিনি কে?
উ–তিনি ছিলেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর অপর একজন সার্জেন্ট। তাঁর নাম আমি জানতাম। তবে এখন আমি তাঁর নাম ভুলে গেছি।

প্র–এরপর আজ পর্যন্ত তাঁর সাথে আপনার আর সাক্ষাত হয়েছে?
উ–জী না। এছাড়া তিনি এই মামলার আসামী বা সাক্ষী কিনা তাও আমার জানা নেই।
প্র–আমার মনে হয় গ্রেফতারের পূর্বেই আপনি পুলিশের নিকট গিয়ে এসব বলেছেন?
উ–জী না। এই কথা সত্য নয়।
প্র–এটা কি সত্য যে, লেঃ রহমানের নিকট প্রেরিত টেলিগ্রামের অর্থ বানোয়াট?
উ–জী না। এই অনুমান সত্য নয়।
এরপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী খান বাহাদুর ইসমাইল একরারী সাক্ষীকে জেরা করেন। তাঁর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদ বলেন যে, ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে তাঁকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। তবে ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি স্বীকারোক্তি করার মনস্থ সনাক্ত করেন। কিন্তু এর সঠিক তারিখ তাঁর মনে নেই।
প্র–স্বীকারোক্তি করার কত দিন আগে এ ব্যাপারে আপনি কর্নেল শরীফকে জানিয়েছিলেন?
উ–স্বীকারোক্তির চারদিন আগে আমি কর্নেল শরীফকে অবহিত করেছিলাম।
প্র–১৮ই ফেব্রুয়ারী সেনাবাহিনীর কেহ আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?
উ–জী না।
এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নেওয়ার আগে তাঁকে কেউ বলেননি যে, তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নেওয়া হবে।
প্র–ম্যাজিস্ট্রেট আপনার যে জবানবন্দী রেকর্ড করেছেন তা কি আপনাকে তখন দেখান হয়েছিল?
উ–জী না। আমার রেকর্ড করা জবানবন্দী তখন আমাকে দেখান হয়নি। এছাড়া পুলিশের নিকট জবানবন্দীর আগে আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দী দেখি নাই।
প্র-ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আপনাকে কি হ্যান্ড গ্রেনেড দেখানো হয়েছিল?
উ–জী না।
খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরার পর জনাব আতাউর রহমান খান একরারী সাক্ষী সার্জেন্ট সামসুদ্দিনকে জেরা শুরু করেন।
জনাব আতাউর রহমান খান প্রশ্ন করেন–আপনি কি সজ্ঞানে এই আদালতে সাক্ষ্য দিচ্ছেন?
উ- জী হ্যাঁ। সম্পূর্ণ সজ্ঞানে আমি আদালতে সাক্ষ্য দিচ্ছি।
প্র–আন্দোলনের সদস্য থাকার সময় কি আপনার বিবেক সচেতন ছিল?
উ–জী হ্যাঁ। আমি তখনও সচেতন ও সুস্থ বিবেকে ছিলাম।

প্র–স্বীকারোক্তির অর্থ কি তা আপনি জানেন?
উ–জী হ্যাঁ। স্বীকারোক্তির অর্থ আমি জানি।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, স্বীকারোক্তি না করলে তাঁকে সাজা দেওয়া হবে এ সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না। তবে তাঁর জবানবন্দী রেকর্ড করার সময় ম্যাজিস্ট্রেট বলেছিলেন যে, তাঁর জবানবন্দী সত্য না হলে তাঁর ক্ষতি হবে।
প্র–আপনি কি জানেন যে, আপনার উর্ধ্বতন অফিসারের অনুমতি ছাড়া আপনাকে স্বীকারোক্তি করতে বলা যায় না?
উ–জী না।
প্র–বিমান বাহিনীর কোন অফিসার কি আপনাকে স্বীকারোক্তি করতে বলেছিলেন?
উ–জী না।
প্র–আপনার জবানবন্দী রেকর্ড করতে কত সময় লেগেছিল?
উ–তিন ঘণ্টা। সকাল ১০টায় রেকর্ড করা শুরু হয় এবং দুপুর একটায় তা শেষ হয়।
প্র–জবানবন্দী রেকর্ড করার সময় আপনি কি কোন নোট-এর সাহায্য নিয়েছিলেন?
উ–জী না। এছাড়া ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করার আগে 'আমি কোন রিহার্সেল'ও দেই নাই।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁর নিজের ভাষায় বক্তব্য বলেছেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর ভাষায় তা রেকর্ড করেছেন। অতঃপর তাঁকে পড়ে শোনানো হলে তিনি তাতে দস্তখত করেন।
প্র–ম্যাজিস্ট্রেট কি কোন খসড়া তৈরী করে আপনাকে দিয়েছিলেন?
উ–জী না।
এরপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী একরারী সাক্ষীর জবানবন্দী থেকে কতিপয় ইংরেজী শব্দের অর্থ তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তার উত্তর দেন এবং বলেন যে, এইসব শব্দের অর্থ তিনি আগে থেকেই জানেন। তবে জবানবন্দীতে লিখিত এসব শব্দ ম্যাজিস্ট্রেটের না কি তাঁর এটা তাঁর স্মরণ নেই।
প্র–আপনি কি 'এপ্রুভার' শব্দের অর্থ আগে জানতেন?
উ–জী না। ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে এই শব্দের তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন।
প্র–ম্যাজিস্ট্রেট আপনাকে আর কি বলেছিলেন?
উ–ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে বলেছিলেন যে, আমি সত্য কথা বললে সাজা থেকে আমাকে রেহাই দেওয়া হবে।
প্র–আপনার পিতা কি জীবিত এবং তিনি কি করেন?
উ–জী হ্যাঁ। তিনি আমাদের চাষের জায়গা-জমি দেখাশুনা করেন।

প্র–আপনাদের কি পরিমাণ সম্পত্তি আছে?
উ–আমাদের ৪/৫ একর জমি আছে।
প্র–আপনি বিবাহিত?
উ–জী হ্যাঁ। আমি বিবাহিত এবং আমার দুটি মেয়ে আছে।
প্র- গ্রেফতার হবার পর আপনি কি আপনার স্ত্রীর থেকে কোন চিঠিপত্র পেয়েছেন?
উ–গ্রেফতারের তিন মাস পর আমি আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি এবং আমার স্ত্রীর নিকট থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি।
প্র–গ্রেফতারের পর আপনাকে কি তৃতীয় পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক মেসে রাখা হয়েছিল?
উ–জী। আমাকে একটি ব্যারাকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেটা তৃতীয় পাঞ্জাব রেজিমেন্টের মেস কি না তা আমার জানা নেই।
অপর কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে একরারী সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদ বলেন, ব্যারাকের কাউকে আমি চিনতাম না। এছাড়া ব্যারাকের সাথে কোন বাথরুমও সংশ্লিষ্ট ছিল না। ব্যারাক থেকে প্রায় একশ' গজ দূরে গোসলখানা ও পায়খানা ছিল। সেখানে গোসল করার সময় তিনি এই মামলার কোন আসামীকে দেখেন নাই।
প্র-আপনি মোশাররফ হোসেন শেখকে চেনেন?
উ–জী না।
প্র–পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অধীনতা বলতে আপনি কি বুঝেন?
উ–পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অধীনতা বলতে আমি রাজনৈতিক দলসমূহকে কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয় না বুঝি।
প্র–বিমান বাহিনীর কর্মচারীদের কোন ধর্মঘট সম্পর্কে আপনার জানা আছে কি?
উ–১৯৬০ সালের আগে বিমান বাহিনীর কর্মচারীরা ধর্মঘট করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কোন দাবী সম্পর্কে আমি জানতাম না।
প্র–আপনি কি সে ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন?
উ–জী না।
প্র–আপনাকে কি কোন সময় বন্দী করে রাখা হয়েছিল?
উ–জী না। আমাকে কখনও আটক করে রাখা হয় নাই।
প্র–এটা কি সত্য যে, আপনার ঘরে বিমান বাহিনীর কিছু জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছিল?
উ–জী না। এটা সত্য নয়।

প্র–আন্দোলনের 'নিউক্লিয়ার্স' বলতে আপনি কি বুঝাতে চেয়েছেন?
উ–'নিউক্লিয়াস' বলতে আমি কেন্দ্র সৃষ্টি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ বোঝাতে চেয়েছি। এছাড়া দলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রোপাগান্ডা করার জন্যেও বলা হয়েছিল। কিন্তু আমি নিউক্লিয়ার্স গঠন করি নাই।
প্র–১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে কতবার আপনি সার্জেন্ট মফিজউল্লার সাথে সাক্ষাত করেছেন?
উ-তা আমার স্মরণ নাই।
প্র– যে বাড়ীতে মিটিং হয়েছিল সেটা কি সার্জেন্ট মফিজউল্লার?
উ-সার্জেন্ট মফিজউল্লার নামে উক্ত বাড়ীটি বরাদ্দ ছিল। কিন্তু তিনি পরিবার নিয়ে সেখানে থাকতেন না। সে বাড়ীতে অন্য কেউ থাকতেন। কিন্তু তাঁকে আমি চিনি না। তবে সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ সার্জেন্ট মেসে থাকতেন।
প্র– সে বাড়ীতে কয়টি কামরা ছিল?
উ–বাড়ীর কামরা কয়টি ছিল তা আমি জানি না।
প্র–আপনি কি বিমান বাহিনীর কোন কর্মচারীর কাছে আপনাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছিলেন?
উ–জী না।
আগামীকালও সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদকে জেরা করা হবে।

সংবাদ

২৩শে আগস্ট ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

৩ নম্বর রাজসাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদের জেরার চতুর্থ দিবস অতিবাহিত

(নিজস্ব বার্ত্তা পরিবেশক)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) কুর্মিটোলায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব এবং অন্যান্যদের ষড়যন্ত্র মামলায় ৪নং সরকারী সাক্ষী ও তৃতীয় রাজসাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দীন আহমদের জেরা ৪র্থ দিনেও অব্যাহত থাকে। এইদিন বিবাদীপক্ষের অন্যতম প্রধান কৌঁসুলি জনাব আতাউর রহমান খান, মীর্জা গোলাম হাফিজ, ডঃ আলীম আল-রাজী ও জনাব আসাদুজ্জামান খান জেরা করেন। এইদিন জনাব আসাদুজ্জামানের জেরা শেষ না হইতেই ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। আগামীকাল সকাল নয়টায় পুনরায় ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

আতাউর রহমান খানের জেরা

জনাব আতাউর রহমান খান তাঁহার পূর্বদিনের জেরা পুনরায় শুরু করেন। কৌঁসুলির কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, সাবেক ফ্লাইট সার্জেন্ট

রাজ্জাকের মেডিক্যাল শপ ঢাকা এয়ারপোর্ট রোডে অবস্থিত। শহরের দিকে যাইতে উহা বাঁদিকে পড়িবে। এই শপের উভয় দিকে আরও কতিপয় শপ আছে।

প্র ঃ সাবেক ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাকের বাড়ী কোন্ দিকে অবস্থিত? আপনি কিভাবে তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছিয়াছেন?

উ ঃ ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হকের নিকট হইতে উক্ত বাড়ীতে যাওয়ার গতিপথ জানিয়া লইয়া উক্ত বাড়ীতে যাই।

প্র ঃ আপনি একা গিয়াছিলেন?

উ ঃ আমি একা গিয়াছিলাম।

প্র ঃ রাজ্জাকের 'শপ' হইতে বাড়ীর দূরত্ব কতদূর?

উ ঃ 'শপ' হইতে পশ্চিম দিকে ৫ শতাধিক গজ দূর হইবে। আরও কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, সার্জেন্ট রাজ্জাকের বাড়ীর আশেপাশে আরও বাড়ী আছে। সার্জেন্ট ফজলুল হককে তাঁহার সহিত যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয় নাই।

সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি মাগরেবের নামাজের পর তথায় গিয়াছিলেন। ইহার আগে তিনি আর কখনও উক্ত এলাকায় যান নাই বলিয়া স্বীকার করেন।

সাক্ষী অপর প্রশ্নের উত্তরে বাড়ীর নম্বর বলিতে অসমর্থ হন। সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি উক্ত বাড়ীতে কোন সাইনবোর্ড দেখেন নাই।

প্র ঃ আপনি কিরূপে বাড়ী চিনিতে পারিয়াছেন?

উ ঃ সার্জেন্ট ফজলুল হক বলিয়া দিয়াছেন যে, রাস্তা হইতে উহার দূরত্ব প্রায় ৫ শত গজ হইবে।

প্র ঃ আপনি আর কাহাকেও বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন?

উ ঃ না।

প্র ঃ বাড়ীর মুখ কোন্ দিকে অবস্থিত?

উ ঃ আমি এখন উহা মনে করিতে পারিতেছি না।

সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি যখন উক্ত বাড়ীর নিকটে পৌঁছান ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, জাকীর আহমদ ও সুপারিনটেণ্ডেন্ট হালিম আগে হইতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া আসেন। উহার কিছু পরে রাজ্জাক বাহির হইয়া আসেন। রাজসাক্ষী এক প্রশ্নের উত্তরে ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাকের বাড়ী কত তলা উহা বলিতে অক্ষম হন। অবশ্য অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি আদৌ ও বাড়ীতে প্রবেশ করেন নাই। সাক্ষী অপর প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, রাজ্জাক তথা হইতে তাহাকে লইয়া প্রায় ৫০ গজ দূরে অপর এক বাড়ীতে পৌঁছান।

প্র ঃ এই বাড়ীতেই যে সভা হয় উক্ত সভায় রাজ্জাকের বক্তৃতা আপনাকে আশ্চর্য্যজনকভাবে নাড়া দেয় আর আপনি উহাতে উদ্বুদ্ধ হন নাই কি?

এই পর্যায়ে সাক্ষীর উত্তর রেকর্ড করা হয় নাই। অতঃপর জনাব আতাউর রহমান প্রশ্ন করেন উহার কতদিন পরে আপনি পার্টি হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত করেন।

উ ঃ আমি সঠিক তারিখ বলিতে পারি না। তবে উক্ত সভা অনুষ্ঠানের ১০/১৫ দিন পরে এই 'গ্রুপ' হইতে আমি সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত করি।

প্র ঃ উক্ত সভা কত সময় পর্যন্ত চলিয়াছিল?

উ ঃ আধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা। সাক্ষী আরও বলেন যে, উক্ত সভা ভঙ্গ হওয়ার পর তিনি একাকী ব্যারাকে প্রত্যাবর্তন করেন।

অতঃপর জনাব আতাউর রহমান প্রশ্ন করেন, তেজগাঁও থানা কোথায় অবস্থিত?

উ ঃ আমি এয়ারপোর্ট রোডে একটি থানা দেখিয়াছি। কিন্তু উহা তেজগাঁও থানা কিনা উহা আমি মনে করিতে পারিতেছি না।

সাক্ষী আরও বলেন যে, থানা হইতে রাজ্জাকের দোকান কতদূরে তাহাও তিনি বলিতে পারেন না।

কৌঁসুলি বলেনঃ আমি যদি বলি উহা ৫০ গজ দূরে অবস্থিত?

উ ঃ উহা ৫০ গজ দূরে কিনা এ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নাই।

থার্ড পাঞ্জাব ব্যারাক

সাক্ষী বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বলেনঃ থার্ড পাঞ্জাব ব্যারাকে আটক থাকাকালে তাঁহাকে দুই জায়গায় রাখা হইয়াছিল। প্রথমে তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে রাখা হয় ও পরে ব্যারাকে স্থানান্তরিত করা হয়। সাক্ষী বলেন যে, ব্যারাকের পশ্চিম দিকে একটি বড় বারান্দা আছে। বারান্দার পরেই একটি খোলা জায়গা আছে। এক ব্যারাক হইতে অপর ব্যারাকে যাওয়ার জন্য ইটের রাস্তা আছে। এই রাস্তা ধরিয়া তাঁহাকে গোসলখানায় যাইতে হইত। তাঁহার কক্ষ সবসময়ে বন্ধ রাখা হইত এবং বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলেই দরজা খোলা হইত। সাক্ষী বলেন যে, তাঁহার কক্ষটি ব্যারাকের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত ছিল। কিন্তু তাঁহার কক্ষের উভয় দিকে কয়টি করিয়া কক্ষ ছিল তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

তাহার কক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বের কক্ষে কাহাকে রাখা হইয়াছিল সাক্ষী উহা বলিতে পারেন না। কারণ পূর্বদিকের দরজী সবসময় বন্ধ রাখা হইত এবং কোন সময় উহা খোলা হইত না। তিনি কাহারো নিকট হইতে লোটা ধার করিয়া ব্যবহার করার কথা অস্বীকার করেন এবং হাবিলদার আজিজের মাধ্যমে সিরাজুল ইসলামের লোটা ফেরৎ দিয়াছেন বলিয়াও অস্বীকার করেন।

তিনি বলেন যে, তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। তিনি ময়মনসিংহের জুলমত আলী নামে কোন আইনজীবীকে বা কোন রাজনীতিককে চিনেন না। তবে তিনি জনাব আবদুল মোনায়েম খানের নাম জানেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর। তিনি বলেন যে, ১৯৫০ সালে ময়মনসিংহে আওয়ামী লীগের কোন সভায় জনাব আবদুল মোনায়েম খানের উস্তানিতে ভোলা, জববার, প্রমুখের সাহায্যে যোগাযোগ সৃষ্টির কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, উক্ত সময়ে তিনি পেশোয়ারে ছিলেন।

প্রঃ লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে যখনই ঢাকা আগমন করিয়াছেন তখন তিনি আলেয়ায় না থাকিয়া সিদ্ধেশ্বরী রোডে তাঁহার পিতার সঙ্গে থাকিতেন, উহা আপনি জানেন কিনা?

উ ঃ আমি জানি না।

মালেকের সহিত সাক্ষাৎকার

জনাব আতাউর রহমানের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, মালেকের সহিত কিছুকাল হইতে তাঁহার পরিচয় ছিল। ঢাকায় অবস্থানকাল হইতে কোহাটে ট্রেনিং এর জন্য যাওয়ার সময়কালের মধ্যে তিনি বায়তুল মোকাররমে মালেকের সহিত দেখা করিয়াছিলেন।

প্র ঃ আপনি কেন বায়তুল মোকাররমে মালেকের সহিত দেখা করিতে গেলেন?

উ ঃ কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম আমাকে বলিয়াছিলেন যে, মালেক তাঁহার একজন বন্ধু এবং তাঁহার (সিরাজুল ইসলামের) পক্ষে তাঁহাকে তাঁহার শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের জন্য তথায় গিয়াছিলাম। সাক্ষী আরও বলেন যে, বায়তুল মোকাররমে একটি লাইব্রেরীর পার্শ্বে মালেকের অফিস রহিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে জানানো হয়। কিন্তু উহা কি ধরনের অফিস সাক্ষী উহা বলিতে পারেন না। তিনি কোন্ মাসে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান উহাও বলিতে অক্ষম হন। এমনকি কয়টার সময়ে তিনি দেখা করিতে যান উহা বলিতেও পারেন না, অবশ্য সাক্ষী বলেন যে, বেলা ৫টা বাজার আগেই তিনি তথায় গিয়াছিলেন।

সাক্ষী আরও বলেন যে, কেবলমাত্র কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের সুবাদে তিনি মালেকের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং মালেক পার্টি সদস্য কিনা, উহাও তিনি জানেন না।

প্র ঃ মালেকের অফিস কোন্ দিকে অবস্থিত?

উঃ বায়তুল মোকাররম মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে এই অফিস অবস্থিত। সাক্ষী আরও বলেন যে, মালেকের অফিসটি যেখানে অবস্থিত উহা একটি একতলা ভবন। এই অফিসের সঙ্গে একটি লাইব্রেরী আছে। তিনি লাইব্রেরীর নাম বলিতে পারেন না।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, লাইব্রেরী ও অফিস ঘর ঠিক মসজিদের সংলগ্ন মসজিদ ভবনের সহিত উহা সংশ্লিষ্ট। অফিসের বামপার্শ্বে লাইব্রেরীটি অবস্থিত। সাক্ষী বলেনঃ আমার মনে হয়, লাইব্রেরীর দক্ষিণ পার্শ্বে অফিসটি অবস্থিত।

লেঃ রউফ সম্পর্কে

অতঃপর জনাব আতাউর রহমান খানের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ লেঃ রউফের বাড়ী ধানমণ্ডীতে অবস্থিত। উহা ধানমণ্ডী লেকের ধারে অবস্থিত। সাক্ষীর রাস্তার নাম অথবা বাড়ীর নম্বর বলিতে পারেন না। সাক্ষী বলেন যে, ধানমণ্ডী লেক একটি বড় লেক। এই লেকের কোন্ ধারে লেঃ রউফের বাড়ী অবস্থিত উহা বলাও তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া রাস্তা কোন দিকে উহাও সাক্ষী বলিতে পারেন না। সাক্ষী বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, তিনি রাত ৯/১০টার দিকে বেবীট্যাক্সিযোগে উক্ত বাড়ীতে যান। সাক্ষী বলেন যে, মালেক তাহার সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষী অপর প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, উপরোক্ত বাড়ীটি লেঃ রউফের কিনা উহা তিনি বলিতে পারেন না। তবে উক্ত বাড়ীতে লেঃ রউফ ছিলেন। সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি লেঃ রউফের সহিত ৩/৪ জন লোককে দেখিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহাদের চিনেন না।

সাক্ষী বলেন যে, তাহারা উক্ত বাড়ীতে পৌঁছানোর অব্যবহিত পরে ঐ সকল লোক চলিয়া যায়। সাক্ষী বলেন যে, তিনি বাড়ীর বাহিরে একখানা কার ও একটি স্কুটার দেখিতে পাইয়াছেন। বাড়ীটি কত তলা উহা তিনি বলিতে পারেন না। কিন্তু উহা একাধিক তলাবিশিষ্ট হইবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

বাড়ীর মুখ কোন্ দিকে সাক্ষী উহা বলিতেও অক্ষম।

(অসমাপ্ত)

সংবাদ

২৩শে আগস্ট ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

ডক্টর আলীম আল-রাজীর জেরার বিবরণ

(নিজস্ব বার্ত্তা পরিবেশক)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাজসাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দীন আহমদকে বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলি ডঃ আলীম আল-রাজী জেরা করেন। এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী স্বীকার করেন যে, তিনি ১৯৬৭ সালে সেন্ট্রাল ল' কলেজে ভর্তি হইয়াছিলেন। অন্যান্য প্রশ্নোত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

প্র ঃ আপনি ভর্ত্তির ফরম পূরণ করিয়াছিলেন?

উ ঃ হ্যাঁ।

প্র ঃ ভর্তির ফরমে আপনি বয়সের ঘরে নিজের বয়স ৩২ বৎসর ৬ মাস উল্লেখ করিয়াছেন?
উ ঃ আমার স্মরণ নাই।
প্র ঃ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে আপনার বয়স ৩৯ বছর উল্লেখ করিয়াছেন?
উ ঃ আমার মনে নাই।
প্র ঃ আপনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্র্যাজুয়েট বলিয়া দাবী করিতেছেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন অনুযায়ী নিয়মিত ছাত্রের জন্য শতকরা ৬০ ভাগ হাজিরা প্রয়োজনীয় জানেন কি?
উ ঃ আমি উক্ত নিয়মকানুন সম্পর্কে অবহিত নহি।
প্র ঃ করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য আপনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছেন কি?
উ ঃ আমি অনুমতি গ্রহণ করি নাই।
প্র ঃ আপনার কি কি বিষয় ছিল?
উ ঃ বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবেনংরাজী, বাংলা, ইসলামিক ইডিওলজি, তাহা ছাড়া ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে অতিরিক্ত বাংলা ও ইকনমিক্স।
প্র ঃ আপনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম কানূন সম্পর্কে অবহিত আছেন কি?
উ ঃ আমি অবহিত নহি।
প্র ঃ করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম কি ছিল?
উ ঃনংরাজীর ক্ষেত্রেনংরাজী ও বাংলার ক্ষেত্রে বাংলা।
প্র ঃ করাচী বিশ্ববিদ্যালয়েনংরাজী ও উর্দু ছাড়া অন্য কোন মাধ্যম স্বীকৃত নহে (এমনকি বাংলার ক্ষেত্রেও) উহা আপনি অবগত আছেন কি?
এই সময়ে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান উহাতে হস্তক্ষেপ করেন এবং বলেন যে, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেনংরাজী মাধ্যমের প্রশ্ন অবান্তর।
প্র ঃ ১৯৬৪ সনে কোরাঙ্গীতে গঠিত তথাকথিত বেঙ্গল লিবারেশন আর্মির আপনি সদস্য ছিলেন কি?
উ ঃ ছিলাম।
প্র ঃ সদস্যদেরও চাঁদা ধার্য ছিল কি?
উ ঃ না।
প্র ঃ তথাকথিত বেঙ্গল লিবারেশন আর্মিতে আপনার ব্যক্তিগত আর্থিক কোন দান ছিল কি?
উ ঃ না।
প্র ঃ বিপ্লব বলিতে আপনি কি বুঝেন?
উ ঃ অস্ত্রের সাহায্যে সরকার উৎখাত।

প্র ঃ ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে আপনি কোথায় ছিলেন?
উ ঃ আমি করাচীর মৌরীপুর পি এ এফ কেন্দ্রে ছিলাম।
প্র ঃ ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে পাকিস্তান বিপ্লব সংঘটনের বিষয় আপনি জানেন কি? সাক্ষী উত্তরে প্রথমে বলেন, না। পরে সংশোধন করিয়া বলেন, আমি শুনিয়াছি।
প্র ঃ state শব্দের সংজ্ঞা কি?
উ ঃ আমি বলতে পারি না।
প্র ঃ ১৯৬৪ সালে কোরাঙ্গীতে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় বেঙ্গল লিবারেশন আর্মি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয় উহা আপনি পুলিসের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে বলিয়াছেন কি?
উ ঃ বলিয়াছি।
প্র ঃ উক্ত সভায় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান গঠনের সিদ্ধান্ত অর্থে আপনি কি বুঝিয়াছিলেন?
উ ঃ পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন।
প্র ঃ সভায় কথিত পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রের সরকার কি ধরনের হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়?
উঃ এ সম্পর্কে কোন আলোচনা হয় নাই।
প্র ঃ পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ কি আপনাদের উদ্দেশ্য ছিল?
উ ঃ পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করাই লক্ষ্য ছিল।
প্র ঃ আপনি কোন পুস্তক-পুস্তিকা, প্রচারপত্র ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন কি?
উ ঃ না।
প্র ঃ আপনি রাজনৈতিক দল বলিতে শুধু আওয়ামী লীগকে চিনেন?
উ ঃ আমি নাম শুনিয়াছি।
প্র ঃ আপনি কি জানেন যে, শেখ মুজিবর রহমান ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে লাহোরে তাঁহার ৬-দফা কর্মসুচীর কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন?
উ ঃ আমি জানি না।
প্র ঃ তখন আপনি কোথায় ছিলেন?
উ ঃ পি,এ,এফ,রেকর্ড অফিস, মৌরীপুর, করাচী।
প্র ঃ আপনি ইংরেজী খবরের কাগজ ছাড়া বাংলা দৈনিক 'ইত্তেফাক' কখনও পড়িয়াছেন কি?
উ ঃ সময়ে সময়ে পড়িয়াছি।

প্র ঃ দৈনিক 'ইত্তেফাকে' ৬-দফা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ছিল। উহা আপনার নজরে পড়িয়াছে কি?

উ ঃ আমি মনে করিতে পারিতেছি না।

সাক্ষী আরও বলেন যে, ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৬৭ সালের মধ্যে তিনি দৈনিক 'ইত্তেফাক' দেখেন নাই।

প্র ঃ আপনি পুলিসের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে বলিয়াছেন কি যে, ১৯৬৪ সালে ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহর গৃহে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় পাকিস্তানে 'Political servility' সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়?

উ ঃ বলিয়াছি।

প্র ঃ আপনি পুলিসের নিকট বলিয়াছেন কি উক্ত সভায় 'কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে বিরোধীদলসমুহের সহায়তায় শক্তিশালী ফ্রন্ট গঠন করা উচিত"

এইরূপ আলোচনা হইয়াছে?

উ ঃ বলিয়াছি।

প্র ঃ আপনি পুলিসের নিকট বলিয়াছেন কি উক্ত সভায় সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ আপনাদের নিকট পূর্ব পাকিস্তানে কার্যরত সামরিক লোকদের নিকট আন্দোলনের ভাবধারা প্রচারের জন্য আহবান জানাইয়াছেন।

উ ঃ বলিয়াছি।

প্র ঃ আপনি পুলিসের নিকট বলিয়াছেন কি যে, ১৯৬৭ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত সভায় লেঃ এম,এম,রহমান বলিয়াছেনঃ আমরা শপথ গ্রহণ করিয়াছি অস্ত্র প্রয়োগে আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিব?

উঃ বলিয়াছি।

সাক্ষী কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, কর্মরত অবস্থায় সামান্য দোষ-ত্রুটির জন্য তাহার প্রতি ৪-দফা শাস্তি প্রদত্ত হয়। এই সকল অপরাধের জন্য প্রথমদফা তাঁহাকে দুইদিনের অতিরিক্ত প্যারেডের সাজা দেওয়া হয়। দুইদফা সরকারীভাবে কঠোর ভৎর্সনা করা হয়। আর একদফা মৃদু ভৎর্সনা করা হয়।

ডঃ রাজীর অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতিদানের পরে 'আল্লাহ আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে' এই মর্মে কোন পত্র আমার পিতার নিকটে প্রেরণ করিয়াছি কিনা উহা আমার মনে নাই।

ডঃ রাজী সাক্ষীকে পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে যোগদানের পর হইতে তাহার পদ মর্যাদা, ট্রেনিং ডিউটি প্রভৃতি সম্পর্কে বহুসংখ্যক প্রশ্ন করেন। তিনি সাক্ষীকে বহু 'মিলিটারী টার্ম' সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। অবশ্য সাক্ষী 'Frontal assault', 'Flank Movement' প্রভৃতি বলিতে কি বুঝায় উহা বলিতে অক্ষম হন। তিনি 'Combatant', 'Formation' প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যা করেন।

সাক্ষী বলেন যে, বিগত পাক-ভারত সেপ্টেম্বর যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি করাচী মৌরীপুর বিমান বাহিনীর ঘাঁটিতে ছিলেন। তখন তিনি পাকিস্তানের রক্ষাকার্যে নিজের জীবন উৎসর্গ ও সকল ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত রহিয়াছিলেন বলিয়া দাবী করেন।

দৈনিক পয়গাম

২৩শে আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

সার্জেন্ট সামসুদ্দীন আহমদের জেরার ৪র্থ দিবস অতিবাহিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার তিন নম্বর রাজসাক্ষী এবং বাদীপক্ষের চার নম্বর সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদের জেরার চতুর্থ দিন অতিবাহিত হয়।

গতকল্য সাক্ষীকে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খান, মীর্জা মোহাম্মদ গোলাম হাফিজ, ডঃ আলীম-আল-রাজী এবং জনাব আসাদুজ্জামান জেরা করেন। জনাব খানের জেরা চলাকালে আদালতের অধিবেশন অদ্য (শুক্রবার) পর্যন্ত মুলতবী হইয়া যায়।

সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমানকে চেয়ারম্যান এবং ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম, আর, খান এবং বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিম সমবায়ে এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছে।

ষড়যন্ত্র মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, তিনজন সি, এস, পি অফিসার, নৌ-বাহিনীর একজন লেঃ কম্যাণ্ডারসহ সর্বমোট ৩৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারত কর্তৃক সরবরাহকৃত অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাইয়া পাকিস্তানকে ইহার এক অংশ হইতে বঞ্চিত করিবার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

জনাব আতাউর রহমানের জেরার জবাবে রাজসাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদ বলেন যে, অভিযুক্ত সাবেক ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাকের ঔষধের দোকান বিমানবন্দর রোডে অবস্থিত।

প্রশ্ন–আপনি কি কোন রাজনৈতিক দলের সহিত সংযুক্ত ছিলেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনি কি ময়মনসিংহে মুসলিম লীগের জন্য কাজ করিয়াছিলেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–রাজনৈতিক কর্মী ভোলা এবং জব্বারকে কি আপত্তি জানেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–ময়মনসিংহের উকিল জনাব জুলমত আলী খানকে কি আপনি জানেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনার বাড়ী ময়মনসিংহ শহর হইতে কত দূরে?
উত্তর–মিউনিসিপ্যাল এলাকা হইতে দেড় মাইল দূরে।
প্রশ্ন–আপনি ময়মনসিংহের কোন রাজনৈতিক নেতার নাম বলিতে পারেন?
উত্তর–না।
সাক্ষী বলেন, আমি শুধু জানি যে, জনাব আবদুল মোনায়েম খান ময়মনসিংহের লোক এবং তিনি প্রাদেশিক গভর্ণর।
প্রশ্ন–১৯৫০ সালে ময়মনসিংহে জনাব আবদুল মোনায়েম খানের পরামর্শে আপনি, ভোলা এবং জব্বার আওয়ামী লীগের একটি সভা পণ্ড করিতে গিয়াছিলেন ইহা সত্য কি-না?
উত্তর–সত্য নয়। সেসময়ে আমি পেশোয়ারে ছিলাম।
প্রশ্ন–১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবরে আপনি তখন ছুটিতে আগমন করিয়াছিলেন, ইহা কি সত্য নয়?
উত্তর–জী না।
প্রশ্ন–অভিযুক্ত লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৬৭ সালে বরিশালে ছিলেন এবং ঢাকা আগমনের পর তিনি "আলেয়া" গৃহে না উঠিয়া ধানমণ্ডির সিদ্ধেশ্বরীস্থ তাঁহার পিতার বাসভবনে যে উঠিতেন তাহা আপনি জানেন কিনা?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–আপনি কি অন্ধ ইনষ্টিটিউটের মালেককে জানেন?
উত্তর–হ্যাঁ। কিছুদিন হইতে জানি।
প্রশ্ন–তাঁহার সহিত প্রথম আপনার কোথায় সাক্ষাৎ হয়?
উত্তর–বায়তুল মোকাররমে তাঁহার অফিসে।
প্রশ্ন–তাহার বয়স কত হইবে?
উত্তর–৪০ বৎসরের বেশী হইবে না।
প্রশ্ন–তিনি কি পার্টির সদস্য ছিলেন?
উত্তর–আমি জানি না।

প্রশ্ন–তিনি কি কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামের আত্মীয়?
উত্তর–কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম তাহাকে বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল।
প্রশ্ন–(অভিযুক্ত) লেঃ রউফের গৃহ কোথায়?
উত্তর–ধানমণ্ডী।
প্রশ্ন–ইহার অবস্থান কোথায়?
উত্তর–ধানমণ্ডী লেকের নিকট।
প্রশ্ন–কোন রোডে অবস্থিত এবং বাড়ীর নম্বর কত?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–ইহা কি তাহার নিজের বাড়ী ছিল?
উত্তর–আমি জানি না। কিন্তু তাহার সহিত আমার তথায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

মীর্জা গোলাম হাফিজ

বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌঁসুলী মীর্জা মোহাম্মদ গোলাম হাফিজ রাজসাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–আপনি এয়ারম্যান হিসাবে বিমান বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। কোন সালে কর্পোরাল পদে আপনার উন্নতি হয়?
উত্তর–১৯৫৬ সালে।
প্রশ্ন–কর্পোরাল এবং সার্জেন্ট পদে যথাসময়ে কি আপনার পদোন্নতি হইয়াছিল?
উত্তর–জী হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আপনার ইউনিটে আপনার অপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে কোন পশ্চিম পাকিস্তানীর কি এই পদে পদোন্নতি হইয়াছিল?
উত্তর–আমার জানা নাই।
প্রশ্ন–করাচীতে থাকাকালে পশ্চিম পাকস্তানী কোন অফিসাররা কি আপনার সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছিল?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–করাচীতে থাকাকালে পশ্চিম পাকিস্তানীদের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানী হিসাবে আপনি কি পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের নিকট হইতে সমান ব্যবহার লাভ করিয়াছেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আপনি কি ময়মনসিংহ হইতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য ডঃ আলীম-আল-রাজীর নাম শুনিয়াছেন?
উত্তর–হ্যাঁ। সংবাদপত্রে পড়িয়াছি।
প্রশ্ন–জাতীয় পরিষদে বৈষম্য সম্পর্কে আপনি কি তাঁহার কোন বক্তৃতা পড়িয়াছেন?
উত্তর–পরিষদে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়াছি তবে বিষয়বস্তু আমার মনে নাই।

প্রশ্ন–আপনি কি পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের বিরোধীদলের নেতা জনাব আসাদুজ্জামান খানের নাম শুনিয়াছেন?
উত্তর–আমি সংবাদপত্রে পড়িয়াছি। তবে তাহার বাড়ী যে ময়মনসিংহ তাহা আমি জানি না।

ডঃ রাজী

বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী ডঃ আলীম আল-রাজী রাজসাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দীন আহমদকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–মোমেনশাহীর নিজকল্লা গ্রামের ইউসুফ আলী মণ্ডলের কন্যা হালিমা খাতুনকে কি আপনি বিবাহ করিয়াছিলেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–কোন সালে বিবাহ করিয়াছিলেন?
উত্তর–১৯৫৯ সালে।
প্রশ্ন–আপনার বাবা কি দর্জি?
উত্তর–পূর্বে তাহার 'টেইলারিং বিজিনেস' ছিল। এখন নাই।
প্রশ্ন–আপনার প্রথম কন্যা কবে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল?
উত্তর–১৯৬১ সালের ৩০শে অক্টোবর।
প্রশ্ন–আপনার স্ত্রী কি শিক্ষিতা?
উত্তর–ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াছে।
প্রশ্ন–ইহা কি সত্য যে, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতিদানের পর আপনি আপনার পিতাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন, 'আল্লা আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে'?
উত্তর–আমার মনে পড়িতেছে না।
প্রশ্ন–আপনার কি জীবন বীমা আছে?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনার স্ত্রীর?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–সর্বসমেত আপনার বেতন কি ২৫০ টাকা ছিল না?
উত্তর–সব ভাতা মিলাইয়া তিন শত টাকারও অধিক ছিল।
প্রশ্ন–আপনার সঙ্গে কি পে-বুক আছে?
উত্তর–বর্তমানে নাই।
প্রশ্ন–আপনি কি ঢাকায় সেগুনবাগিচাস্থ সেন্ট্রাল ল' কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন?
উত্তর–জী হ্যাঁ। ১৯৬৭ সালে আমি ভর্তী হই।
প্রশ্ন–আপনি কি ভর্তীর ফরম পূরণ করিয়াছিলেন?
উত্তর–হ্যাঁ। আমার ক্রমিক নম্বর ২০৪ ছিল।

প্রশ্ন–ভর্তীর ফরমে ১৯৬৭ সালের ১লা জুলাই আপনার বয়স ৩২ বৎসর ৬ মাস হইয়াছে তাহা কি উল্লেখ করিয়াছিলেন?
উত্তর–আমার মনে পড়িতেছে না।
প্রশ্ন–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বয়স ৩৯ বৎসর উল্লেখ করিয়াছিলেন?
উত্তর–আমার মনে পড়িতেছে না।
প্রশ্ন–আইন কলেজে কি আপনি রেগুলার ছাত্র হিসাবে ভর্তী হইয়াছিলেন?
উত্তর–জী হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আইন কলেজে ভর্তী হওয়ার জন্য কি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–ম্যাট্রিক কোন বিভাগে পাশ করিয়াছেন?
উত্তর–তৃতীয় বিভাগে।
প্রশ্ন–আই, এ?
উত্তর–তৃতীয় বিভাগ।
প্রশ্ন–বি, এ-তে বাধ্যতামূলক কয়টি বিষয় পড়িয়াছেন?
উত্তর– ইংরেজী, বাংলা এবং ইসলামিক আদর্শ।
প্রশ্ন–ঐচ্ছিক বিষয় কি ছিল?
উত্তর–অতিরিক্ত বাংলা এবং অর্থনীতি।
প্রশ্ন–বি এ ভর্ত্তির ব্যাপারে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন সম্পর্কে কি আপনি অবহিত ছিলেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–কলেজে কোন ভাষায় আপনি শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং বাংলা ও অর্থনীতি পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর কোন ভাষায় দিয়াছেন?
উত্তর–বাংলা পরীক্ষার প্রশ্ন বাংলা ভাষায় এবং অর্থনীতি বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর ইংরেজী ভাষায় প্রদান করিয়াছিলাম। বি-এ'র ফলাফল ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঠিক তারিখ আমার মনে নাই।
প্রশ্ন–আপনার ওজন কি বর্তমানে হ্রাস পাইয়াছে?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–পূর্বে কত ছিল এবং এখন কত?
উত্তর–পূর্বে আমার ওজন ১৮৫ পাউণ্ড ছিল। বর্তমানে তাহা হ্রাস পাইয়া ১৮০ পাউণ্ড হইয়াছে। ১৫ দিন পূর্বে আমি ওজন লইয়াছি।
প্রশ্ন–মানসিক উদ্বেগের জন্য কি আপনার ওজন হ্রাস পাইয়াছে?
উত্তর–না। আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষাকারী ডাক্তার আমাকে ওজন হ্রাসের জন্য পরামর্শ দিয়াছেন।
প্রায় এক মাস হইতে এইজন্য আমি মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছি।

প্রশ্ন–১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে করাচীর কোরাঙ্গীক্রীকে অনুষ্ঠিত সভায় যে বেঙ্গল লিবারেশন আর্মি (বঙ্গীয় মুক্তিবাহিনী) গঠিত হইয়াছিল বলিয়াছেন, আপনি কি তাহার সদস্য ছিলেন?
মাননীয় আদালত তখন কৌসুলীকে বলেন, সাক্ষী পূর্বেই বলিয়াছেন যে, তিনি তাহার সদস্য ছিলেন।
প্রশ্ন–বেঙ্গল লিবারেশন আর্মি-তে কি কোন সদস্য চাঁদা ছিল?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–সে পার্টির জন্য আপনি কি কোন আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–বিপ্লব বলিতে আপনি কি বুঝেন?
উত্তর–অস্ত্রের মাধ্যমে একটি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকেই আমি বিপ্লব বলিয়া মনে করি।
প্রশ্ন–বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের সংবাদ কি আপনি পড়িয়াছেন?
উত্তর–হ্যাঁ। বিদেশের বিপ্লবের খবর পড়িয়াছি। কিন্তু পাকিস্তানের নয়।
প্রশ্ন–১৯৫৮ সালে আপনি কোথায় ছিলেন?
উত্তর–পি, এ, এফ, মৌরীপুর, করাচী।
প্রশ্ন–আপনি কি ১৯৫৮ সালের অক্টোবর বিপ্লব সম্পর্কে জানেন?
এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী প্রথমে বলেন যে, তাহার মনে নাই এবং পরে বলেন যে, তাহার দেশের ১৯৫৮ সালের বিপ্লব সম্পর্কে তিনি অবহিত রহিয়াছেন।
প্রশ্ন–পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য বঙ্গীয় মুক্তি বাহিনী গঠন করা হইয়াছিল–ইহা আপনি পুলিশের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে কি বলিয়াছিলেন?
উত্তর–হ্যাঁ। (রেকর্ড করা হয় নাই)।
প্রশ্ন–কেন পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে?
উত্তর–একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য।
প্রশ্ন–রাষ্ট্রের সংজ্ঞা কি?
উত্তর–আমি ইহার সংজ্ঞা দান করিতে পারিব না।
প্রশ্ন–কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর পূর্ব পাকিস্তানে কি জাতীয় সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত আপনারা গ্রহণ করিয়াছিলেন?
উত্তর–আমাদের সভায় এই সম্পর্কে আলোচনা অথবা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।
প্রশ্ন–আপনারা কি পাকিস্তান না পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে চাহিয়াছিলেন?
উত্তর–আমি যে বৈপ্লবিক সংস্থার সহিত যুক্ত ছিলাম, তাহার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করা।

প্রশ্ন–আপনি কি পার্টির পক্ষে কোন প্রচারপত্র, পুস্তিকা ইত্যাদি মুদ্রণ করিয়াছিলেন?
উত্তর–না। পার্টি প্রকাশ করিয়াছে কি-না তাহা আমার জানা নাই।
প্রশ্ন–আপনি আওয়ামী লীগ সম্পর্কে জানেন কি?
উত্তর–আমি এই দলের নাম শুনিয়াছি।
প্রশ্ন–১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে যে ছয়-দফার ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা আপনি জানেন কিনা?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–আপনি তখন কোথায় ছিলেন?
উত্তর–করাচী পি, এ, এফ, মৌরীপুর অফিস।
প্রশ্ন–আপনি বাংলা না ইংরেজী পত্রিকা পড়েন?
উত্তর–বেশীর ভাগ আমি ইংরেজী পত্রিকা পড়ি।
প্রশ্ন–তা হইলে কিছু বাংলা পত্রিকাও পড়েন?
উত্তর–১৯৬৪ হইতে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হয়ত আমি বাংলা পত্রিকাও পড়িয়াছি।
প্রশ্ন–আপনি কি এই সময়ে ইত্তেফাক পত্রিকা দেখিয়াছেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে করাচীতে অনুষ্ঠিত আপনাদের প্রথম সভায় অভিযুক্ত ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ যে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিল বলিয়া আদালতে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করিয়াছিলেন?
উত্তর–হ্যাঁ। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আমি ইহা বলিয়াছিলাম (অনুরূপ রেকর্ড করা হয় নাই)।
প্রশ্ন–সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগিতায় একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের জন্য সভায় যে আলোচনা হইয়াছিল ইহা কি আপনি পুলিশের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করিয়াছিলেন?
উত্তর–বলিয়াছি (অনুরূপ রেকর্ড করা হয় নাই)।
প্রশ্ন–১৯৬৭ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর আইনে যে সংশোধন করা হইয়াছে তাহা কি আপনাদিগকে জানান হইয়াছে?
উত্তর–আমি তখন কোহাটে ট্রেনিংরত ছিলাম। আমি এ সম্পর্কে জানি না।
প্রশ্ন–আপনি কি একজন যোদ্ধা?
উত্তর–হ্যাঁ।

প্রশ্ন–যুদ্ধের কি ট্রেনিং নিয়াছেন?
উত্তর–হ্যাঁ। প্রথম প্রাথমিক ট্রেনিংকালে ক্ষুদ্র অস্ত্র ব্যবহার এবং কুচকাওয়াজ শিক্ষালাভ করিয়াছি।
প্রশ্ন–সেসব কি জাতীয় অস্ত্র ছিল?
উত্তর–৩০৩ রাইফেল, হাল্কা মেসিনগান, ষ্টেনগান এবং হাতবোমা ছোড়ার ট্রেনিং গ্রহণ করিয়াছি।
প্রশ্ন–আপনি কি প্যারাসুট জাম্পার?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–সেপ্টেম্বর যুদ্ধের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?
উত্তর–পি, এ, এফ, মৌরিপুর, করাচী।
প্রশ্ন–ভারত কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর আপনি কি পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য আপনার জীবন এবং সমস্ত সম্পত্তি আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–১৯৪৯ হইতে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত আপনি পশ্চিম পাকিস্তানের কয়টি পি, এ, এফ ষ্টেশনে চাকুরী করিয়াছেন?
উত্তর–৪/৫টি।
প্রশ্ন–প্রতিটি ষ্টেশনে আপনার পশ্চিম পাকিস্তানী বন্ধু কি ছিল না?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–এইসব ষ্টেশনে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা যে নগণ্য ছিল তাহা কি আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন?
উত্তর–সাবেক সীমান্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের ষ্টেশনসমূহে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল, তবে করাচী ষ্টেশনে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা বেশ ছিল।
প্রশ্ন–করাচী ষ্টেশনে পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার কত ছিল?
উত্তর–তাহা আমি বলিতে পারিব না।
প্রশ্ন–আপনি উর্দু জানেন?
উত্তর–জানি। তবে লিখিতে জানি না।

বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব আসাদুজ্জামান খানের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদ বলেন, ইহা সত্য নয় যে, আমার পিতা এখনও মোমেনশাহী শহরের একটি দর্জির দোকানে দর্জিগিরি করিতেছেন। ফয়েজউদ্দিন সরকার আমার দাদা ছিলেন। তিনি মোমেনশাহী কালেক্টরেটের একজন অর্ডারলি ছিলেন। মফিজুদ্দিন আমার চাচা। তিনি একজন দারওয়ান হিসাবে কাজ করিতেছেন কি-না আমি জানি না। তবে আমি ইহা অবগত আছি যে, তিনি মোমেনশাহীর বোম্বাই কলোনীতে কাজ করিতেন। আমার চাচাত ভাই হইতে পারে এবং সে ঢাকা কোর্টে একজন

কনষ্টেবল হিসাবে কাজ করিতেছে। এইরূপ আকবর নামক কোন ব্যক্তিকে আমি চিনি না। আমার পিতা আফতাবউদ্দিনের আকবর নামক একজন চাচা ছিলেন। তিনি একজন কনষ্টেবল ছিলেন। বর্তমানে তিনি মৃত। আকবর নামক আমার এক মামা আছেন। তাঁহার বাড়ী মোমেনশাহীর বাকেরকান্দায়। একখণ্ড জমির ব্যাপারে আমার মামা আকবরের সহিত আমার মামলা আছে। এখন কোন আদালতে মামলা মুলতবী নাই বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। আমার মামা আমার বিরুদ্ধে কোন আদালতে প্রতারণার অভিযোগ করিয়া মামলা দায়ের করিয়াছেন একথা আমার জানা নাই। বিরোধপূর্ণ জমিখণ্ড আমাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে–এই মর্মে ময়মনসিংহের ডেপুটি কমিশনারের প্রতি কোন নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে কি-না সে বিষয়ে আমি কিছু জানি না। ১৯৬৫ সালে যখন এই জমিখণ্ড লইয়া বিরোধ দেখা দেয় তখন আমি করাচীর মৌরিপুরে আমার কম্যান্ডিং অফিসারের নিকট এ-বিষয়ে লিখিত আবেদন জানাই। কম্যান্ডিং অফিসার তখন ময়মনসিংহের ডেপুটি কমিশনারের নিকট কতিপয় রিপোর্ট প্রেরণ করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমাকে আইনের আশ্রয় গ্রহণের জন্য বলা হয়।

আলোচ্য জমিখণ্ডটুকু আমার মামার বাড়ীর পার্শ্বে অবস্থিত। মূলতঃ প্রজা হিসাবে উহা তাঁহার দখলে ছিল এবং আমি দখল হইতে বঞ্চিত ছিলাম। আমি এখনও উহার দখল হইতে বঞ্চিত। এই সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারের জন্য আমি এখন পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের করি নাই। এই জমির দখল আমাকে দেওয়ার জন্য আমার সদর দফতর হইতে আমার মামার উপর চাপ প্রয়োগ করা হইতেছে–এ কথা সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে আমার মামা এই বিরোধের মধ্যস্থতা করিতে অর্থাৎ তিনি বিরোধের আপোষ-মীমাংসা করার জন্য আমার নিকট প্রস্তাব দিয়াছিলেন। ১৯৬৭ সালে আমি যখন ছুটিতে বাড়ী গিয়াছিলাম তখন প্রথমবারের মত এই প্রস্তাব আমাকে দেওয়া হইয়াছিল। ট্রেনিং-এর জন্য আমাকে কোহাটের উদ্দেশে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করিতে হইয়াছিল বলিয়া আমি এই আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাবের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারি নাই।

আমার বাড়ীর পার্শ্বে আইচ বাড়ী নামে একটি হিন্দু বাড়ী আছে। আমি আমার পিতাকে লইয়া বলপূর্বক এই বাড়ী দখল করিয়াছি–এ কথা সত্য নয়।

আমার পিতার বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে কোন ফৌজদারী মামলা ছিল–এ কথা বলা ভুল। প্রকৃতপক্ষে আমার পিতার বিরুদ্ধে হিন্দু মালিকদের কোন অভিযোগ ছিল না।

আমার মোমেনশাহীর বাড়ীতে আমার পরিবার বাস করিতেছে। একথা ঠিক নহে যে, আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা আমার শ্বশুর ইউসুফ মণ্ডলের সহিত বাস করিতেছে। তাহারা আমার বাড়ীতেই রহিয়াছে এবং এই ব্যাপারে

মাত্র দুইদিন পূর্বে আমার পিতার নিকট হইতে একটি চিঠি পাইয়াছি। ইহা বলা ঠিক নহে যে, আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা সবসময়ই আমার শ্বশুরের সহিত বাস করিতেছে যেহেতু আমি তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা করিয়াছি।

পি এ এফ এ আমার চাকুরী ২৪ বছরের। আমি জানি না, পি এ এফ-এ এমন কোন নিয়ম রহিয়াছে কি-না যে, কোন ব্যক্তি তাঁহার চাকুরীর শেষ ৩ বৎসরের মধ্যে ছাড়া অন্য কোন সময় পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে পারিবে না। করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সময় আমাকে একটি ফরম পূরণ করিতে হইয়াছে। সে ফরমে প্রার্থীর পেশা উল্লেখের জন্য একটি কলম রহিয়াছে। সেই কলমে আমি নিজেকে একজন কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরে বা দেশরক্ষা বিভাগীয় লোক বলিয়া উল্লেখ করি। করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কোন নিয়ম-কানুন রহিয়াছে কি-না আমি জানি না যে, কোন সামরিক লোককে নিয়মিত ছাত্র হিসাবে ভর্তি হইতে হইলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন। আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমার ইসলামিক কলেজের ক্লাশে যোগদানের ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। যেহেতু কেবলমাত্র রবিবারে আমাকে ক্লাশ করিতে হইত, সেইজন্য আমার সরকারী কর্তব্যের কোন অসুবিধা হইত না। এমতাবস্থায় আমার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের এ বিষয়ে তাহাদিগকে অবহিত করানোর প্রয়োজন উপলব্ধি করি নাই। সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের মে অথবা জুন মাসে আমি বি-এ পরীক্ষা দেই। পরীক্ষার সঠিক তারিখ আমি স্মরণ করিতে পারিতেছি না। ১লা মে হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত পরীক্ষা চলিয়াছিল কি না তাহা আমার মনে পড়িতেছে না। তবে পরীক্ষা এক মাস কিম্বা তার চাইতে কিছু বেশী সময় পর্যন্ত চলে। একথা সত্য নহে যে, এই দুই মাস চাকুরী কিম্বা অন্যান্য কাজ-কর্ম ছাড়িয়া আমি গভীরভাবে লেখাপড়ায় আত্মমগ্ন ছিলাম। এই দুই মাসে আমি অফিসের কাজে যোগদান করি, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি এবং বৈঠকসমূহেও অংশগ্রহণ করি যাহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। পরীক্ষাসমূহের তারিখ সাপ্তাহিক কাজের দিনেই পড়ে, রবিবারে নহে। ২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত পরীক্ষা চলে। কতিপয় পরীক্ষার দিন আমি অফিস হইতে ছুটি গ্রহণ করি। অন্যান্য পরীক্ষার দিন আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর নিকট বিশেষ কয়েকটি ঘণ্টার জন্য সদর দফতর হইতে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র অনুমতি গ্রহণ করি। এই উদ্দেশ্যে আমি ১৫ দিনের বেশী ছুটি গ্রহণ করি। এই ছুটি এক নাগাড় ছিল কিনা তাহা আমার মনে পড়িতেছে না। পাক বিমানবাহিনীতে 'অর্জিত ছুটি' (আর্নড লিভ) বলিয়া কিছু নাই। তবে আমরা বার্ষিক ও নৈমিত্তিক ছুটি পাইয়া থাকি। কোন কারণে

আমি উক্ত ছুটি পাইয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ নাই। ছুটি লওয়ার ব্যাপারে আমি পরীক্ষাকে কারণ হিসাবে দেখাইতে পারি। তবে সঠিকভাবে আমি তাহা মনে করিতে পারিতেছি না।

অদ্য (শুক্রবার) সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদের জেরা অব্যাহত থাকিবে।

দৈনিক পাকিস্তান

২৩শে আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

সার্জেন্ট শামসুদ্দীন আহমদের জেরা অব্যাহত

(স্টাফ রিপোর্টার)

"আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার" বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ তিন নম্বর একরারী সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দীন আহমদ-এর জেরা গতকাল বৃহস্পতিবারও অব্যাহত রাখেন। গত সোমবার থেকে সার্জেন্ট আহমদের জেরা শুরু হয়েছে।

গতকাল বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খান, মীর্জা গোলাম হাফিজ, ডঃ আলীম-আল-রাজি ও জনাব আসাদুজ্জামান খান সাক্ষীকে জেরা করেন।

আদালতের কাজ শুরুর আগে ২নং একরারী সাক্ষী আমীর হোসেন মিয়া তার জেরার বিবরণী পাঠ করে স্বাক্ষরদানের পূর্বে কিছু কিছু সংশোধনের আবেদন করলে তা সংশোধন করার অনুমতি দেওয়া হয়।

জনাব আতাউর রহমান খান

প্র-আপনি বলেছেন, আওলাদ হোসেন মার্কেটে সার্জেন্ট রাজ্জাকের ঔষধের দোকান ছিল–এটা কি বড় রাস্তার ওপরে?

একরারী সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দীনঃ-হ্যাঁ, এটা এয়ারপোর্ট রোডের ওপরে। এয়ারপোর্ট থেকে শহরের দিকে যেতে হাতের বাঁদিকে পড়ে।

প্র-আপনি রাজ্জাকের বাসা চিনলেন কি করে?

উ-আমি বাসাটা কোথায় তার মোটামুটি বিবরণ জেনে নিয়েছিলাম।

সেখানে আমি একাই গিয়েছিলাম।

প্র-রাজ্জাকের দোকান থেকে বাসা কতদূর?

উ-হাঁটাপথে প্রায় ৫ মিনিট লাগে যেতে।

প্র-এটা বড় রাস্তার কোন দিকে?

উ-দোকান যেদিকে তার বিপরীতে পাশে।

প্র-আপনি কখন যান সেখানে?

উ-মাগরেবের নামাজের পরে।

কৌসুলীর অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানান যে, তিনি এর আগে কোনদিন সাবেক সার্জেন্ট রাজ্জাকের বাসায় যাননি। সার্জেন্ট রাজ্জাক তাকে (সাক্ষীকে) তার বাড়ীর নম্বর দেয়নি। তিনি সেখানে কোন সাইনবোর্ড দেখতে পাননি।

প্র-কিন্তু তাহলে আপনি সেখানে গেলেন কিভাবে?

উ-সার্জেন্ট রাজ্জাক আমাকে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন কিভাবে বাসায় যেতে হবে। বাসাটা দোকান থেকে প্রায় পঁচিশ গজ দূর হবে।

প্র-বাসা কি আপনি আকস্মিকভাবে পেয়ে গেলেন, না কাউকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?

উ-না, কাউকে জিজ্ঞেস করিনি। এটা একটা দ্বিতল বাড়ী।

প্র-বাড়ীটি কোন মুখো?

উ-আমার মনে নেই।

প্র-কিভাবে দেখা হল রাজ্জাকের সঙ্গে?

উ-আমার পেছন পেছন সার্জেন্ট ফজলুল হক, জাকের আহমদ এসে উপস্থিত হন। এই সময় আমি রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এরপরেই সার্জেন্ট রাজ্জাক বাসা থেকে বের হয়ে আসেন।

প্র-তখন কি আপনারা সবাই বাসায় গেলেন?

উ-না, আমি রাজ্জাকের বাসায় আদৌ যাইনি। যখন সবাই জমা হল তখন আমরা সবাই রাজ্জাকের বাড়ী থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে অপর একটি বাড়ীতে যাই।

প্র-এই বৈঠকের কতদিন পরে আপনি এই দলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন?

উ-দশ-পনর দিন পরে আমি এদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের সিদ্ধান্ত করি।

প্র-এই বৈঠক কতক্ষণ পর্যন্ত চালু ছিল?

উ-আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত।

প্র-সভা থেকে কি আপনি একা বের হয়ে আসেন?

উ-না। সবাই একসঙ্গে বের হয়ে আসি। তারপর সবাই চলে গেলে আমি একা ফিরে আসি আমার ব্যারাকে।

প্র-দোকানটা থেকে তেজগাঁও থানা কতদূর?

উ-আমি বলতে পারবো না। আমি থানা দেখেছি।

প্র-আমার মনে হয় প্রায় পঞ্চাশ গজ হবে।

উ-কতদূর হবে সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই।

কৌসুলীর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, গ্রেফতার হওয়ার পর প্রথমে তিনি তৃতীয় পাঞ্জাব ব্যারাকে থাকতেন তার পশ্চিম দিকে একটি

বারান্দা ছিল। তার পাশেই একটা পার্ক ছিল। সেখানে সাক্ষী প্রায়ই বেড়াতে যেতেন।

প্র-আপনার ঘরের পাশে সার্জেন্ট ফজলুল হক থাকতো জানেন?

উ-জানিনে।

প্র-আপনার ঘরের পেছনে পূর্বদিকে একটা করিডোর ছিল?

উ-ছিল তবে সেটা সবসময় বন্ধ থাকতো। আমি কখনও সেখানে যাইনি।

প্র-কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম আপনার একই ঘরে থাকতো?

উ-না।

প্র-আপনি কর্পোরাল ইসলামের কাছ থেকে একবার একটা 'লোটা' ধার নিয়েছিলেন কি?

উ-না।

প্র-এটা কি সত্য যে, আপনি হাবিলদার আজিজের হাতে একটা 'লোটা' দিয়ে কর্পোরাল সিরাজুল ইসলামকে দিতে বলেছিলেন?

উ-না, এটা সত্য নয়।

কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানান যে, তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না বা কখনও মুসলিম লীগের পক্ষে কাজ করেননি। তিনি ময়মনসিংহের রাজনৈতিক কর্মী জব্বার ও ভোলাকে চেনেন না। ময়মনসিংহের এ্যাডভোকেট জুলমত আলী খানের নাম তিনি কখনও শোনেননি। তিনি আরো জানান যে, তিনি ময়মনসিংহের কোন রাজনীতিককে চেনেন না। তবে তিনি জনাব মোনেম খানের নাম জানেন।

সাক্ষী কৌসুলীর অন্যান্য প্রশ্নের জবাবে জানান যে, ১৯৫০ সালে ময়মনসিংহে আওয়ামী লীগের সভা ভাঙ্গার জন্য জনাব মোনেম খান কর্তৃক তাকে, (সাক্ষীকে), জব্বার ও ভোলাকে নিয়োগ করা হয়েছিল একথা সত্য নয়। সেসময় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে বিমান বাহিনীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

প্র-১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নবেম্বর-এর মধ্যে আপনি কি ছুটি নিয়ে বাড়ীতে এসেছিলেন?

উ-না।

প্র-আপনি বলেছেন, লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন জুলাই মাসে আলেয়াতে ছিলেন। কিন্তু, তিনি ঢাকায় আসলেই তাঁর পিতার সিদ্ধেশ্বরীর বাসায় থাকতেন।

উ-তিনি ঢাকায় এলে কোথায় থাকতেন তা আমার জানা ছিল না।

প্র-আপনি মালেককে চিনতেন?

উ-হ্যাঁ, কিছুদিন থেকে জানতাম।

প্র-কবে দেখা হয়?
উ-আমি তার সঙ্গে তাঁর বায়তুল মোকাররমের অফিসে দেখা করি। আমার করাচী থেকে ঢাকা আসা ও ট্রেনিং-এর জন্য কোহাটে যাওয়ার সময়ের মধ্যে আমি তার সঙ্গে দেখা করি।
প্র-কি কারণে দেখা করেন?
উ-কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।
প্র-কিসের অফিস সেটা?
উ-জানি না। আমি তাকে অফিসে বসে থাকতে দেখি। সেখানে তার একটা চাপরাসীও ছিল।
প্র-সেটা কোন মাস?
উ-আমার ঠিক মনে নেই।
প্র-এটা আপনার কোহাট যাওয়ার কতদিন আগেকার ঘটনা?
উ-আমার মনে নেই। তাঁর সঙ্গে বেলা পাঁচটার আগে আমার দেখা হয়।
প্র-তার বয়স কত হবে?
উ-প্রায় চল্লিশ বছর হবে। বিপ্লবী দলের তিনি কোন সদস্য ছিলেন কিনা জানি না। তিনি কর্পোরাল ইসলামের একজন বন্ধু তাই জানতাম।
প্র-বায়তুল মোকাররমের কোন তলায় তার অফিস?
উ-বায়তুল মোকাররম মসজিদের পাশে একটি একতলা বাড়ীতে এই অফিসটা। একটা লাইব্রেরীও আছে এখানে।
প্র-মসজিদের পশ্চিম দিক থেকে অফিসটা কতদূর?
উ-অফিস ও লাইব্রেরীটা একই বাড়ীতে। বাড়ীটা মসজিদের সংলগ্ন কিনা জানি না। লাইব্রেরীটা মসজিদের বামদিকে। আমার মনে হয়, অফিসটা লাইব্রেরীর দক্ষিণ দিকে।
প্র-লেঃ রউফ-এর বাড়ী কোথায়?
উ-ধানমন্ডিতে লেকের কাছে। বাড়ীর নম্বর বা রাস্তার নম্বর জানি না। আমি সেখানে মালিকের সঙ্গে গিয়েছিলাম।
প্র-লেকের কোন দিকে বাড়ীটা?
উ-বলতে পারি না। আমি সেখানে যাই রাত্রে– প্রায় ন'টা হবে।

কৌঁসুলীর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানান যে, তিনি লেঃ রউফ-এর বাসায় গিয়ে আরো তিন-চারজনকে বসে থাকতে দেখেন। তবে তাঁরা সেখানে যাওয়ার একটু পরেই সে লোকগুলি চলে যায়। বাড়ীটা কোনমুখে তা তিনি বলতে পারেন না।

এরপর মীর্জা গোলাম হাফিজ সাক্ষীকে জেরা করতে শুরু করেন।

মীর্জা গোলাম হাফিজ

প্র-আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভিআইপি হাউসে নিয়ে যাওয়ার পর আপনাকে কেন সেখানে নিয়ে যাওয়া হল সেকথা কি কাউকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?
উ-না।
প্র-কেউ আপনার সম্পর্কে পুলিশকে খবর দিয়েছে বলে কি আপনার সন্দেহ হয়?
উ-না।
প্র-বিমান বাহিনীতে কাজে যোগদানের পর ট্রেনিংদানের সময় কি শৃঙ্খলা ইত্যাদি ও পিএএফ এ্যাক্ট সম্পর্কে কিছু জানানো হয়?
উ-কিছু কিছু জানানো হয়।

কৌঁসুলীর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানান যে, কাজের পর তাঁরা ব্যক্তিগত কাজে সময় ব্যয় করতে পারতেন। তিনি আরো বলেন যে, আই-এ বা বি-এ পরীক্ষা দিতে বা ভর্তি দিতে কারো অনুমতি প্রয়োজন হয় না? তিনিও কোন অনুমতি গ্রহণ করেননি।

তিনি জানান যে, প্রতি রোববারে ক্লাসে যোগদান করলেই পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হত।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে, তিনি ১৯৫৬ সালে কর্পোরাল পদে উন্নীত হন। তাকে ডিঙ্গিয়ে অন্য কোন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারের পদোন্নতি করা হয়নি। তাছাড়া, কোন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার তাঁর প্রতি কোন রকম বিরূপ অথবা বৈষম্যমূলক ব্যবহার করেননি।

তিনি জানান যে, তিনি যখন ১৯৬১ সালে সার্জেন্ট মফিজুল্লার সঙ্গে দেখা করেন তখন তিনি একজন কর্পোরাল ছিলেন।

সাক্ষী বলেন যে, তিনি ডঃ আলীম-আল-রাজি এমএনএ ও পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের বিরোধীদলের নেতা জনাব আসাদুজ্জামান খানের বক্তৃতা কাগজে পাঠ করেছেন। তবে তার বিষয়বস্তু এখন তাঁর মনে নেই।

এরপর ডঃ আলীম-আল-রাজি জেরা শুরু করেন।

ডঃ আলীম-আল-রাজি

প্র-আপনি কি ময়মনসিংহ জেলার নিজকলপাড়া গ্রামের ইউসুফ আলী মণ্ডলের কন্যা হালিমা খাতুনকে বিবাহ করেন?
উ-হ্যাঁ।
প্র-কবে বিয়ে করেন?
উ-১৯৫৯ সালে।
প্র-কত দেনমোহর ছিল?
উ-৩০০০ টাকা।

প্র-আপনার পিতা কি দর্জি ছিলেন?
উ-আমার পিতার আগে দর্জির দোকান ছিল। এখন নেই।
প্র-আপনার প্রথম কন্যার জন্ম হয় কবে?
উ-১৯৬১ সালের ৩০ শে অক্টোবর।
প্র-আপনার স্ত্রী কি লেখাপড়া জানেন?
উ-ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন।
প্র-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপনার স্বীকারোক্তির আগে কি আপনি কোন আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন?
উ-না।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানান যে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তির পরে তিনি তার পিতার কাছে লিখিত চিঠিতে "আল্লাহ আমার জীবন রক্ষা করেছেন" বলে লিখেছেন কিনা তা মনে করতে পারছেন না। তাঁর বা তাঁর স্ত্রীর কোন লাইফ ইন্সিওরেন্স পলিসি নেই বলে তিনি জানান।
তিনি বলেন যে, বর্তমানে এ্যালাউন্সসহ তার বেতন তিনশ' টাকার বেশী। তার কাছে এখন কোন পে-বুক নেই। তিনি ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে সেন্ট্রাল ল' কলেজে আইন পড়ার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন বলে জানান।
কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য তাকে একটা ফরম পূরণ করতে হয়। কলেজে তাঁর রোল নম্বর ছিল ২০৪। কলেজে তিনি তার বয়স ৩২ বছর ৬ মাস লিখেছেন কিনা তার ঠিক মনে নেই।
প্র-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তির সময় আপনি আপনার বয়স ৩৯ বলেছিলেন?
উ-আমার মনে নেই।
প্র-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের কোর্স কি নিয়মিত কোর্স?
উ-হ্যাঁ। আমি নিয়মিত কোর্সেই ভর্তি হই।
কৌসুলীর অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে, পরীক্ষা দিতে গেলে শতকরা ষাটদিন কলেজে উপস্থিত থাকার নিয়ম সম্পর্কে তিনি অবহিত নন।

তিনি জানান যে, তিনি ম্যাট্রিক ও আই-এ তৃতীয় বিভাগে পাস করেন। বি-এ'তে তিনি ইংরেজী, বাংলা ও ইসলামিক আদর্শ বাধ্যতামূলক বিষয় এবং বাংলা ও অর্থনীতি অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ক্লাসে ভর্তি হওয়ার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন বলে জানান।

তিনি জানান যে, তিনি বাংলা পরীক্ষা বাংলাতেই উত্তর দিয়েছেন। অর্থনীতির উত্তর তিনি ইংরেজীতে দিয়েছেন। করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে সব বিষয়ের পরীক্ষার উত্তর উর্দু অথবা ইংরেজীতে দেওয়ার কথা তিনি জানেন না।

প্র- আপনাকে আটক করার সময় আপনার শরীরের ওজন কত ছিল?
উ-১৮৫ পাউন্ড।
প্র-এখন কত?
উ-পনর দিন আগে দেখেছি ১৮০ পাউন্ড। চিকিৎসকের পরামর্শে মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দিয়েই এই পাঁচ পাউন্ড ওজন কমিয়েছি।
অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানান যে, বেঙ্গল লিবারেশন আর্মীতে ভর্তির জন্য কোন চাঁদা দিতে হয়নি। তারাও বিএলএ'র জন্য কোন রকম টাকা-পয়সা চাঁদা দেননি।
তিনি বলেন যে, বিপ্লব বলতে তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহ বোঝেন। এই ধরনের সশস্ত্র বিদ্রোহের কথা তিনি অন্য দেশে হয়েছে বলে খবরের কাগজে পাঠ করেছেন।
তিনি জানান যে, ১৯৫৮ সালে তিনি করাচীতে বিমানবাহিনীর চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। পাকিস্তানে কোন রকম বিপ্লবের কথা তিনি জানেন না।
তিনি আরো জানান যে, তিনি পুলিশের কাছে প্রদত্ত প্রথম বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন যে, বিএলএ'র প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা।
স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানে কি ধরনের শাসনব্যবস্থা চালু করা হবে, সে সম্পর্কে কোন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি বলে তিনি জানান।
প্র-আপনারা কি পাকিস্তান রাষ্ট্র না পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চেয়েছিলেন?
উ-পাকিস্তানের একটি অংশকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করাই আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল।
এক প্রশ্নের উত্তরে স্বাক্ষী বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনেই পাকিস্তানের দুটি প্রদেশ সংযুক্ত।
প্র-আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে আপনি কি কোন প্রচারপত্র বা পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন?
উ-ব্যক্তিগতভাবে আমি কোন প্রচারপত্র বা পুস্তিকা প্রকাশ করিনি। দলের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন প্রচারপত্র বা পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে কিনা তাও আমি জানি না।
প্র-আপনি কি কোন রাজনৈতিক দলের নাম শুনেছেন?
উ-আমি আওয়ামী লীগের নাম শুনেছি।
প্র-আপনি কি জানেন যে, শেখ মুজিবর রহমান ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে লাহোরে আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন?
উ-জী, না। সেসময় করাচীর মৌরীপুরস্থ পাকিস্তান বিমান বাহিনীর অফিসে ছিলাম।

প্র-সেসময়ে আপনি কি কোন ইংরেজী অথবা বাংলা সংবাদপত্র পড়তেন?
উ-জী, হ্যাঁ। আমি সেসময় ইংরেজী সংবাদপত্র পড়তাম। তবে বাংলা সংবাদপত্র পড়তাম কিনা আমার স্মরণ নেই, সম্প্রতি বাংলা সংবাদপত্রও আমি পড়ে থাকতে পারি।
প্র-সেসময়ে বাংলা দৈনিক ইত্তেফাক আপনি পড়েছিলেন?
উ-জী না। সেসময় আমি ইত্তেফাক পড়িনি।
প্র-পুলিশের নিকট জবানবন্দীতে আপনি কি পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক অধীনতার কথা বলেছিলেন?
উ-জী হ্যাঁ। বলেছিলাম। পুলিশের নিকট স্বাক্ষীর জবানবন্দীতে তার উল্লেখ নেই।
অপর এক প্রশ্নের উত্তরে একরারী সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদ বলেন যে, ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত দলের সভায় সরকারের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ফ্রন্ট গঠন করা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং পুলিশের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দিতে তিনি এই কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া পুলিশের নিকট জবানবন্দীতে সাক্ষী বেঙ্গল লিবারেশন আর্মি গঠনের কথাও বলেছিলেন। কিন্তু জবানবন্দীতে এসবের উল্লেখ নেই।
প্র-সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ সামরিক বাহিনীর লোকদের মধ্যে আন্দোলনের আদর্শ প্রচার করতে আপনাদেরকে বলেছিলেন– একথা কি আপনি পুলিশের নিকট বলেছিলেন?
উ-জী, বলেছিলাম। (জবানবন্দীতে তা নেই)
এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, আমি পুলিশের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দীতে বলেছিলাম ১৯৬৭ সালের অক্টোবরের মিটিং-এ লেঃ এম এম রহমান বলেছিলেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার শপথ গ্রহণ করছি। পূর্ব পাকিস্তানের কিছু সংখ্যক সদশ্যের অসাধুতায় আমাদের ভীত হওয়ার কারণ নেই।
(জবানবন্দীতে একথা নেই)।
অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, পুলিশের নিকট তিনি একথা বলেন নাই যে, মালিকের মারফত লেঃ রউফ তাকে (সাক্ষীকে) লেঃ রউফের ধানমন্ডীর বাড়ীতে ডেকে নিয়েছিলেন।
প্র-বিমান বাহিনীতে কোথায় আপনার ট্রেনিং শুরু হয়?
উ-কোহাটে প্রথমে আমার ট্রেনিং দেয়া হয় এবং এই ট্রেনিং-এর মেয়াদ ৩ মাস।
প্র-কর্পোরাল কি কমিশন অফিসার?
উ-জী না। কর্পোরাল পাকিস্তান বিমান বাহিনীর নন-কমিশনড জুনিয়র অফিসার।

প্র-বিমান বাহিনীতে আপনাকে আর কি ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল?
উ-১৯৫২ অথবা ১৯৫৩ সালে আমাকে বিমান বাহিনীর প্রশাসনিক বিষয়ে ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল।
প্র-বিমান বাহিনীর আইন-কানুনের কোন পরিবর্তন করা হলে তা কি আপনাদের জানানো হত?
উ-জী হ্যাঁ। বিমান বাহিনীর আইন-কানুন পরিবর্তন করা হলে অফিসিয়াল লেটারের মাধ্যমে আমাদেরকে জানানো হত। এসব লেটারকে আমরা পলিসি লেটারও বলতাম।
প্র-১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পিএএফ এ্যাক্ট বিমান বাহিনীর আইন-কানুনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়। এসব পরিবর্তন সম্পর্কে আপনাদের কি অবহিত করা হয়েছিল?
উ-জী না। এসব পরিবর্তন সম্পর্কে আমাকে জানানো হয় নাই। কারণ আমি তখন কোহাটে ট্রেনিং নিচ্ছিলাম।
এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, বিমান বাহিনীর কর্মচারীদের অপরাধ ও সাজাদান সম্পর্কে পিএএফ এ্যাক্ট পরিবর্তন করা হয়েছে কিনা তা তিনি জানেন না।
প্র-বিমানবাহিনীতে আপনি কি কখনও সাজাভোগ করেছিলেন?
উ-জী হ্যাঁ। বিমান বাহিনীতে চারটি সামান্য অপরাধের জন্যে আমাকে বিভাগীয় সাজাভোগ করতে হয়েছিল।
প্র-আপনি কি পিএএফ-এর একজন 'কমব্যাটেন্ট'?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-এজন্যে আপনাকে কি ধরনের ট্রেনিং দেয়া হয়েছে?
উ-কমব্যাটেন্ট হিসাবে আমাকে ছোটখাটো অস্ত্র ব্যবহার ও প্যারেডের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে।
প্র-আপনি কি কি অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে জানেন?
উ-আমি রাইফেল, লাইট মেশিনগান ও গ্রেনেডের ব্যবহার জানি।
প্র-আপনি কি একজন প্যারাস্যুট জাম্পার?
উ-জী না।
প্র-ফ্রন্টাল এসল্ট কাকে বলে?
উ-ফ্রন্টাল এসল্ট বলতে কি বোঝায় তা আমি জানি না। এছাড়া ক্লাঙ্ক মুভমেন্টও আমার জানা নেই।
প্র-১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত যখন পাকিস্তান আক্রমণ করে তখন আপনি কোথায় ছিলেন?
উ-আমি সেসময় করাচীর মৌরীপুর অফিসে ছিলাম।

প্র-ভারতীয় হামলার সময় আপনি কি দেশরক্ষার জন্যে জীবন দিতে তৈরী ছিলেন?
উ-জী হ্যাঁ। দেশের জন্যে আমি জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলাম।
প্র-পূর্ব পাকিস্তানে বিমান বাহিনীর কোন দফতর আছে কি?
উ-হ্যাঁ, পূর্ব পাকিস্তানে বিমান বাহিনীর তিনটি অফিস আছে। এর মধ্যে দুটি রিক্রুটিং অফিস।
প্র-পশ্চিম পাকিস্তানে আপনি কয়টি পিএএফ স্টেশনে চাকুরী করেছেন?
উ-চার-পাঁচটি স্টেশনে আমি চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলাম।
প্র-সেসব স্টেশনে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা নেহায়েত নগণ্য– এটা কি আপনি লক্ষ্য করেছেন?
উ-করাচীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা বেশ বড় রকমের। কিন্তু সাবেক সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা কম।
প্র-করাচীতে বিমান বাহিনীর কর্মচারীদের শতকরা কতজন পূর্ব পাকিস্তানী?
উ-তা আমার জানা নেই।
প্র-আপনি ত দীর্ঘদিন পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন। আপনি উর্দু বলতে পারেন?
উ-জী হ্যাঁ। আমি উর্দু ভাষায় কথা বলতে পারি। তবে আমি লিখতে জানি না।
প্র-একজন সাধারণ নাগরিক কিভাবে বিমান বাহিনীর স্টেশনে ঢুকতে পারেন?
উ-বিমান বাহিনীর স্টেশনে ঢুকতে হলে তাঁকে গার্ড রুমে গিয়ে দরখাস্ত করে অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হবে।
প্র-বিমান বাহিনীর লোকেরা কিভাবে ঢুকেন?
উ-বিমান বাহিনীর লোকের পরনে ইউনিফরম থাকলে অনুমতি দরকার হয় না।
প্র-১৯৬৭ সালে করাচীতে থাকাকালে বিমানবন্দরে ঢুকার সময় আপনার পরনে কি ইউনিফরম ছিল?
উ-জী না। আমি সাধারণ নাগরিকের পোশাকে ছিলাম।
প্র-তবে কিভাবে আপনি বিমান বাহিনীর করাচী স্টেশনে ঢুকলেন?
উ-আমার সাথে তখন আমার 'আইডেনটিটি কার্ড' ছিল। সেজন্যে অনুমতি নেওয়ার দরকার হয়নি।
প্র-এখন আপনার নিকট আইডেনটিটি কার্ড আছে?
উ-জী না।
প্র-সেপ্টেম্বর যুদ্ধের পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা কড়াকড়ি করা হয়েছিল এটা কি আপনি জানেন?
উ-জী হ্যাঁ। সেপ্টেম্বর যুদ্ধের পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই কড়াকড়ি করা হয়েছিল। তবে পরিচয় কার্ড দেখানো হলে পিএএফ স্টেশনে প্রবেশ করতে দেয়া হয়।

প্র-পিএএফ স্টেশনে ঢুকতে পরিচয় কার্ড ছাড়াও কোড্ নম্বর বলা কি আবশ্যক?
উ-বিমান বাহিনীর কর্মচারীদের পিএএফ স্টেশনে প্রবেশের জন্যে পরিচয় কার্ডই যথেষ্ট। কোড্ নম্বর-এর দরকার হয় না।
প্র-সার্জেন্ট কোয়ার্টারে কারা থাকতে পারেন?
উ-পিএএফ-এর সার্জেন্ট কোয়ার্টারে সার্জেন্ট, ফ্লাইট সার্জেন্ট ও কমিশনড্ অফিসাররা থাকেন।
প্র-আপনাকে কি কোন ফ্যামিলি কোয়ার্টার দেয়া হয়েছিল?
উ-জী হ্যাঁ।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী শামসুদ্দিন আহমদ বলেন যে, মৌরীপুরে থাকাকালে আমি আমার স্ত্রীকে সেখানে নিয়ে যাই তবে তখন আমি এক বন্ধুর বাসায় পরিবার নিয়ে থাকতাম।
প্র-ঢাকায় কবে আপনি সর্বশেষ রেশন সার্টিফিকেট নিয়েছিলেন?
উ-১৯৬৭ সালের ২৮ অথবা ২৯ শে আগস্ট।
প্র-১৯৬৭ সালে কোহাটে আপনাকে কি ধরনের ট্রেনিং দেয়া হয়?
উ-আমাকে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কোর্সে ট্রেনিং দেয়া হয়।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এটা সত্য নয় যে ছুটিতে না গেলে কনসেশন টিকেট ব্যবহার করা যায় না।
এই পর্যায়ে ডাঃ আলীম আল রাজীর জেরা সমাপ্ত হয় এবং বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব আসাদুজ্জামান খান একরারী সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিনকে জেরা শুরু করেন।

জনাব আসাদুজ্জামান

জনাব আসাদুজ্জামানের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এটা সত্য নয় যে আমার পিতা এখনও ময়মনসিংহ শহরের একটি সেলাইর দোকানে চাকুরী করছেন।
প্র-আপনার দাদার নাম কি এবং তিনি কি কাজ করতেন?
উ-আমার দাদার নাম ফয়েজউদ্দিন সরকার। তিনি ময়মনসিংহ কলেক্টরেটের আর্দালী ছিলেন।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তার কাকার নাম মফিজউদ্দিন। তবে তিনি ময়মনসিংহের একটি কলোনীর দারোয়ান ছিল বলে তিনি জানেন না।
প্র-আপনার পিতা আফতাব উদ্দিনের কাকা আকবর ঢাকা কোর্টের কনস্টবল কি না?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-আকবর নামে আপনার এক মামা আছেন কি?
উ-জী । তিনি ময়মনসিংহ জেলার বাকেরকন্দ গ্রামের অধিবাসী।

প্র-তার সঙ্গে আপনার কোন মামলা মোকদ্দমা হয়েছিল?
উ-একখণ্ড জমি নিয়ে মামার সাথে আমার মামলা হয়েছিল।
সাক্ষী পরে তাঁর জবাব সংশোধন করে বলেন যে, মামার সাথে তাঁর মামলা কোন আদালতে হয় নাই। তবে জমি নিয়ে বিরোধ ছিল।
প্র-আপনার মামা কি আপনার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছিল?
উ-তা আমার জানা নেই।
প্র-সেই বিরোধ সংক্রান্ত জমিটি আপনাকে দেওয়ার জন্যে ময়মনসিংহের ডেপুটি কমিশনার আপনার মামাকে কি নির্দেশ দিয়েছিলেন?
উ-জী না। এইরূপ কোন নির্দেশের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।
এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, জমির বিরোধ সম্পর্কে আমার কমান্ডিং অফিসার ডি,সিকে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পরে আমাকে আদালতের আশ্রয় নেওয়ার জন্যে উপদেশ দেওয়া হয়।
প্র-উক্ত জমিটি কোথায় অবস্থিত?
উ-জমিখণ্ড আমার মামার বাড়ীর পার্শ্বেই এবং জমি এখনও তার ভোগ দখলে আছে।
প্র-জমির দখল নেওয়ার জন্যে আপনি কি কোন মামলা করেছেন?
উ-জী না।
প্র-জমিটি আপনার দখলে যেতে দেওয়ার জন্যে 'দফতর' থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে একথা কি সত্য?
উ-জী না। তবে আপোশে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্যে মামা প্রস্তাব করেছিলেন।
উ-১৯৬৭ সালে আমি ছুটিতে বাড়ী আসলে তিনি এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন।
প্র-আপনি কি উক্ত প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছিলেন?
উ-ছুটি শেষে কোহাটে ট্রেনিং-এ চলে যাওয়ার ফলে আমি এ নিয়ে মামার সাথে আলোচনা করতে পারিনি।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তার বাড়ীর সন্নিকটেই 'আইজ' বাড়ী। কিন্তু এ কথা সত্য নয় যে ,সাক্ষী ও তার পিতা আইজদের সম্পত্তি জবর দখল করে নিয়েছিল।
প্র-আইজ বাড়ীর হিন্দুরা আপনার পিতার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করেছেন?
উ-জী না।
প্র-আপনার স্ত্রী কোথায় থাকেন?
উ-আমাদের বাড়ীতে।

প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি বরাবরই আপনার স্ত্রীকে অবহেলা করে আসছেন এবং আপনার স্ত্রী সবসময়েই আপনার শ্বশুর বাড়ীতে থাকেন?
উ-জী না। একথা সত্য নয়। কিছুদিন আগে আমি আমার পিতার থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তাতেও তিনি আমার স্ত্রী আমাদের বাড়ীতে আছেন বলে লিখেছেন।
প্র-পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে আপনার চাকুরীর মেয়াদ কত বছর?
উ-২৪ বছর।
এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, চাকুরীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ৩ বছর পূর্বে ছাড়া কোন পরীক্ষা দেওয়া যায় না বলে তিনি জানেন না।
প্র-করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এ ক্লাশে ভর্তি হওয়ার সময় ফরমে আপনার কি পরিচয় দিয়েছিলেন?
উ-তা আমার সঠিক মনে নেই। তবে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের এমপ্লয়ী অথবা ডিফেন্স পার্সোনেল বলে উল্লেখ করেছি।
প্র-বিমান বাহিনীর কর্মচারীদের নিয়মিত ছাত্র হিসাবে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ আছে কি?
উ-সেটা আমার জানা নেই।
প্র-আপনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন এটা কি আপনার সুপিরিয়র অফিসার জানতেন?
উ-জী না। আমার সুপিরিয়র অফিসার এটা জানতেন না।
প্র-এ ব্যাপারটা কি আপনি তার নিকট গোপন রেখেছেন?
উ-জী না। আমি তা গোপন রাখিনি। কারণ আমি শুধু রবিবারে ক্লাশ করতাম। এছাড়া আমি তাঁর অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
প্র-আপনার বি এ পরীক্ষা কখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উ-১৯৬৭ সালের মে-জুন মাসে। তবে সঠিক তারিখ আমার মনে নেই।
প্র-পরীক্ষা দিতে কত মাস সময় লেগেছিল?
উ-এক মাসের মত।

এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, এ কথা সত্য নয় যে, পরীক্ষার সময় দু'মাস যাবৎ তিনি লেখাপড়া নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি এই সময়ে অফিস করেছেন, পরীক্ষা দিয়েছেন এবং আন্দোলনের বৈঠকে যোগ দিয়েছেন।

প্র-আপনার বি এ পরীক্ষা কি শুধু রোববারে হত?
উ-জী না। সপ্তাহের অপরাপর দিন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হত। বিকেল ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত পরীক্ষার সময় ছিল।

প্র-পরীক্ষার জন্যে আপনি কি ছুটি নিয়েছিলেন?
উ-কয়েক বিষয়ের পরীক্ষার জন্যে আমি ছুটি নিয়েছি। আবার কোন কোন বিষয়ের পরীক্ষার জন্যে অফিসারের অনুমতি নিয়ে অফিস থেকে চলে গেছি।
প্র-আপনি কত দিনের ছুটি নিয়েছিলেন?
উ-মোট ১৫ দিনের ছুটি নিয়েছিলাম। তবে একত্রে কোন ছুটি নেই নাই।
প্র-এই ছুটির জন্যে কোন কারণ উল্লেখ করেছিলেন?
উ-কি কারণ উল্লেখ করে ছুটি নিয়েছিলাম তা আমার স্মরণ নেই।
প্র-এটা কি সত্য যে, আপনি ছুটির দরখাস্তে পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেন নাই?
উ-সম্ভবতঃ আমি পরীক্ষার কারণ দেখিয়ে ছুটি নিয়েছিলাম।
এই পর্যায়ে জনাব আসাদুজ্জামানের জেরা অসমাপ্ত থাকে।

সংবাদ

২৪শে আগস্ট ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

সার্জেন্ট শামসুদ্দীনের জেরা সমাপ্তঃ

চতুর্থ রাজসাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমানের জবানবন্দী শুরু

(নিজস্ব বার্ত্তা পরিবেশক)

গতকল্য (শুক্রবার) কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল মেসে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যের ষড়যন্ত্র মামলায় ৫ম সরকারী সাক্ষী এবং চতুর্থ নম্বর রাজসাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান চৌধুরীর সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়।

পূর্বাহ্নে বিচারপতি জনাব এস,এ,রহমানের সভাপতিত্বে গঠিত ৩ সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ৪নং সরকারী সাক্ষী ও তৃতীয় রাজসাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দীন আহমদের জেরা সমাপ্ত হয়।

এইদিন মেসার্স আসাদুজ্জামান খান, জুলমত আলী খান, আবদুল্লাহ, বদরুল হায়দার চৌধুরী, আবদুল মালেক, ফজলুল করিম, ভি আই চৌধুরী ও আবদুল হাই সাক্ষীকে জেরা করেন। মোট ৫ দিন এই সাক্ষীকে বিবাদীপক্ষের কৌসুলিগণ জেরা করেন।

চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি

ডাঃ সাইদুর রহমান চৌধুরী সাক্ষ্যদানকালে অভিযুক্তদের ডকে অভিযুক্ত মানিক চৌধুরী, বিধান কৃষ্ণ সেন, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, এ, বি, খুরশিদ, লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমদ এবং শেখ মুজিবর রহমানকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

রাজসাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান সাক্ষ্যদানকালে এক পর্যায়ে বলেন যে, তিনি ব্যক্তিগত ব্যবসায় উপলক্ষে সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের ২৩শে এপ্রিল ঢাকায় আগমন করিয়া হোটেল গ্রীনে অবস্থান করেন। এই পর্যায়ে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের তাঁহার নিকট হোটেল গ্রীনের রেজিষ্টার অর্পণ করিয়া ১১৭নং পৃষ্ঠায় একটি এনট্রি দেখার আহবান জানান।উহা দেখার পর সাক্ষী একটি এনট্রির উল্লেখ করিয়া বলেন (Ext PW 5/1) এই এনট্রি তাঁহার সম্পর্কিত (পুরা রেজিষ্ট্রারকে Ext PW 5/2 হিসাবে চিহ্নিত করা হয়)।

সাক্ষী বলেন, ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, আমি ১৯৬৬ সালের ২৪শে এপ্রিল এই হোটেলে ছিলাম। কিন্তু আমার হোটেল ত্যাগের তারিখ উহাতে দেওয়া হয় নাই। 'Purpose of visit' এবং পরবর্তী কলামেও সাক্ষীর নামের আগে কোন এনট্রি নাই বলিয়া তিনি জানান। সাক্ষী আরও বলেন যে, এই এনট্রি বিধান কৃষ্ণ সেন করিয়াছেন। আমি তাঁহার হাতের লেখা চিনি, কিন্তু তিনি উহা আমার উপস্থিতিতে লিখিয়াছেন কিনা উহা আমার স্মরণ নাই।

এই পর্যায়ে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান এইরূপ পদ্ধতিতে হস্তলিপি প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর সাক্ষী বলেনঃ এনট্রিতে আমার নামের উপরে 'বি,কে,সেন এণ্ড পার্টি' লিখিত আছে এবং উহাও বিধান কৃষ্ণ সেনের হাতেরই লেখা (Ext P W 5/3)। সাক্ষী আরও বলেনঃ এই এনট্রিতে "এণ্ড পার্টি" শব্দ পরে কলম দিয়া "কাটা" হইয়াছে এবং আমার নাম উহার নীচে লেখা রহিয়াছে।

বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি এই পর্যায়ে পুনরায় আপত্তি উত্থাপন করেন এবং বলেন, তাঁহারা সংশ্লিষ্ট 'এনট্রি'র যে 'সার্টিফায়েড কপি' পাইয়াছেন উহাতে ডাঃ সাইদুর রহমানের নাম নাই।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিবাদীপক্ষের আপত্তি শ্রবণের আশ্বাস দান করেন। অতঃপর সাক্ষী আরও বলেন,"আমি হোটেল গ্রীনে বি, কে, সেনের সহিত মিলিত হই। তিনিও উক্ত হোটেলে অবস্থানের জন্য আগমন করেন। সাক্ষী বলেন, তিনি স্বীয় ব্যবসায় উপলক্ষে ঢাকা আগমন করেন। তিনিও একই হোটেলে অবস্থান করেন।

রাজসাক্ষীর জবানবন্দী শেষ না হইতেই গতকালের মত অধিবেশন শেষ হইয়া যায়। আগামী সোমবার সকাল ৯টায় ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইবে।

আসাদুজ্জামান খান

গতকাল (শুক্রবার) বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলি জনাব আসাদুজ্জামান খান তাঁহার পূর্বদিনের জেরার জের টানিয়া রাজসাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দীনকে

আরও জেরা করেন। এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফরমে এমন কোন কলামের কথা আমার মনে নাই যাহাতে পি এ এফ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূরণ করার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট উহা প্রেরণ করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

প্রঃ পরীক্ষা দানের জন্য ছুটির দরখাস্তে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকটে আপনি কি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন?

উ ঃ আমার মনে নাই।

প্র ঃ আমি যদি বলি যে, আপনি বিনা অনুমতিতে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়া ডিপার্টমেন্টের সহিত প্রতারণা করিয়াছেন?

উ ঃ ইহা ঠিক নহে।

প্র ঃ ভর্তি ফরমে আপনি পি এ এফ-এ কাজ করেন উহা উল্লেখ না করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত প্রতারণা করিয়াছেন?

উ ঃ উহা ঠিক নহে।

প্রঃ আন্দোলনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করার পর আপনি কি মনে করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য ইত্যাদি দূরীভূত হইয়াছে?

উ ঃ এ ব্যাপারে আমার কোন ধারণা নাই।

প্র ঃ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে স্বীকারোক্তিকালে আপনি কি বলিয়াছেন যে, আপনি স্বীয় কর্মফলের জন্য অনুতপ্ত এবং নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন?

উ ঃ বলিয়াছি উহা বিবৃতিতে রেকর্ড করা হয় (নাই)।

প্র ঃ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতি দানের জন্য গমনের সময় সিরাজুল ইসলাম কি আপনার সঙ্গে ছিল?

উ ঃ না।

প্র ঃ আর কারো বিবৃতি ম্যাজিস্ট্রেট ঐদিন রেকর্ড করিয়াছিলেন কি?

উ ঃ আমি বলিতে পারি না।

প্র ঃ মফিজউল্লাহ প্রথম কখন এবং কোথায় আপনার সহিত দেখা করেন?

উ ঃ করাচীতে সার্জেন্ট মেসে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্যারাকে আমার কক্ষে আমার সহিত দেখা করেন। সাক্ষী আরও বলেন যে, আমার কক্ষের দিকে আগমনকালে কেহ তাঁহার উপর নজর রাখিয়াছিল কিনা উহা আমি বলিতে পারি না।

প্র ঃ কোরাঙ্গী ক্রীকে কখন সভার সময় ঠিক করা হয়?

উ ঃ পূর্বাহ্নে সভার সময় নির্দিষ্ট ছিল না। সাক্ষী আরও বলেন যে, মফিজউল্লাহ তাঁহাকে মোটামুটি একটা ধারণা দিয়াছিলেন। তিনি কোন সময় উল্লেখ না করিয়া শুধু বলিয়াছেন যে, পরবর্তী রবিবারে সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রঃ আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে বলিয়াছেন যে, নির্দিষ্ট সময়ে আপনি মফিজউল্লাহর কোয়ার্টারে গিয়া দরজার কড়া নাড়িয়াছেন?

উ ঃ বলিয়াছি।

এই পর্যায়ে কৌসুলি তাঁহাকে নির্দিষ্ট সময় 'Appointed time' শব্দের ব্যাখ্যা করিতে বলিলে সাক্ষী বলেন যে, তিনি মফিজউল্লাহকে বলিয়াছেন যে, তিনি রবিবারে ক্লাস শেষ করিয়া তাঁহার গৃহে আগমন করিবেন।

প্র ঃ আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলিয়াছেন কি,মফিজউল্লাহ আলোচনার সমাপ্তি ভাষণে বলিয়াছেন "পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আলাদা করার জন্য আমাদের বিপ্লবী দল গঠন করা বান্ছনীয়?"

উ ঃ বলিয়াছি (অবশ্য উহা এইভাবে রেকর্ড করা হয় নাই)।

সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি পুলিসের নিকটেও অনুরূপ তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন (কিন্তু এইভাবে রেকর্ড করা হয় নাই)।

প্র ঃ ১৯৬৭ সালের এপ্রিল-মে মাসে মফিজউল্লাহ কি আগের মত একই অফিসে কাজ এবং একই কোয়ার্টারে বাস করিতেন?

উ ঃ এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নহি।

প্র ঃ মাহবুবউদ্দিন কি একজন প্রাক্তন সৈনিক?

উঃ করপোরাল সিরাজুল আমাকে বলিয়াছেন যে, মাহবুবউদ্দিন একজন প্রাক্তন সৈনিক।

সাক্ষী আরও বলেন যে, সিরাজুল ইসলাম তাহাকে ক্লেটন রোডের সভা অনুষ্ঠানের ৭ দিন আগে উক্ত সভার কথা বলিয়াছেন। সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি তাঁহাকে সভার তারিখ জানান নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন যে, শীঘ্রই সভা হইবে এবং তিনি 'আমার' কোয়ার্টার হইতে 'আমাকে' লইয়া যাইবেন। সাক্ষী অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, তাঁহারা উভয়ে একই অফিসে কাজ করিতেন বিধায় ইতিমধ্যে তাহাদের মধ্যে প্রত্যহ দেখাসাক্ষাৎ হইত।

প্র ঃ আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে বলিয়াছেন যে, সিরাজুল ইসলাম নির্দিষ্ট তারিখে আপনাকে একটি ট্যাক্সিযোগে লইয়া যান?

উ ঃ বলিয়াছি।

সাক্ষী আরও বলেন যে, সিরাজুল ইসলামের সহিত ইতিপূর্বে দেখা-সাক্ষাৎ বা আলোচনাকালে তিনি তাঁহাকে কোথায় সভা অনুষ্ঠিত হইবে, উহা জানান নাই।

প্র ঃ আপনি কি পুলিসের নিকটে বলিয়াছেন যে, ক্লিফটন রোডে সার্জেন্ট জলিলের কোয়ার্টারে অপর একটি সভায় যোগদানের জন্য সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ আপনাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন?

উ ঃ আমি পুলিসের নিকট উহা বলিয়াছি কিনা উহা আমার স্মরণ নাই। অবশ্য এইভাবে রেকর্ড করা হয় নাই।

সাক্ষী আরও কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, মফিজউল্লাহ বেলা ২টা হইতে ৩টার মধ্যে তাঁহাকে লইয়া যাওয়ার জন্য আসেন। তাঁহারা উভয়ে রাস্তায় উঠিয়া ট্যাক্সিযোগে জলিলের গৃহে পৌছান। এই সভা অর্ধঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা সময় পর্যন্ত চলে। সাক্ষী আরও বলেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে জলিলকে সনাক্ত করার জন্য কোন সময়ে তাঁহাকে বলা হয় নাই।

অপর কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তিনি উক্ত ট্যাক্সি বা ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে সনাক্ত করিতে পারিবেন না। সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় সর্বপ্রথম সার্জেন্ট জলিলকে সনাক্ত করিয়াছেন।

সাক্ষী আরও বলেন যে, তৃতীয় পাঞ্জাব ব্যারাকে সার্জেন্ট জলিলকে আটক রাখা হইয়াছিল কিনা উহা তিনি জানেন না।

কৌসুলির এক প্রশ্নে সাক্ষী বলেন যে, সার্জেন্ট জলিলকে তাহার পিছনের কক্ষে আটক রাখার কথা ঠিক নহে। সাক্ষী বলেন, একথাও ঠিক নহে যে, মেজর নাসের তাঁহাকে (সার্জেন্ট জলিল) দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

কৌসুলি জনাব আসাদুজ্জামান সাক্ষীকে উদ্দেশ্য করিয়া যখন বলেন যে, সার্জেন্ট জলিল আদৌ ক্লেটন রোডে বাস করিতেন না, তখন সাক্ষী উহাকে সঠিক নহে বলিয়া দাবী করেন। অবশ্য সাক্ষী ক্লেটন রোডে অবস্থিত কথিত বাড়ীর নম্বর বলিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। অতঃপর কৌসুলি বলেন, আমি বলি, সিরাজুল ইসলাম আপনাকে কখনও সার্জেন্ট জলিলের বাড়ীতে লইয়া যায় নাই। উত্তরে সাক্ষী উহাকে ভুল বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

জনাব আবদুলাহ

অতঃপর কৌসুলী জনাব আবদুল্লাহ সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র ঃ আপনি গান জানেন?

উ ঃ আমি জানি না।

প্র ঃ আপনি গান ভালবাসেন?

উ ঃ গান শুনিতে ভালবাসি।

প্র ঃ আপনি কিভাবে পাঠ তৈরি করেন?

উ ঃ প্রথমে আমি বই পড়ি। তারপরে বুঝিতে চেষ্টা করি এবং প্রয়োজন দেখা দিলে উহা স্মরণ করিতে চেষ্টা করি।

প্র ঃ আপনি বই হইতে কোন গদ্য বা পদ্যের অংশবিশেষ মুখস্থ বলিতে পারেন?

উ ঃ আমার মনে নাই।

প্র ঃ আপনি "আমার সোনার বাংলা" গানটি শুনিয়াছেন?

উ ঃ আমি শুনিয়াছি।

প্র ঃ আপনি উহা আবৃত্তি করিতে পারেন?

উ ঃ না।

প্র ঃ আপনি জাতীয় সঙ্গীত আবৃত্তি করিতে পারেন?

উঃ আমি পারি না। অতঃপর কৌসুলি জনাব আবদুল্লাহ বলেনঃ আপনি যে হাতবোমার কথা বলিয়াছেন, উহা সম্পূর্ণ আজগুবী গল্প।

উঃ উহা ঠিক নহে।

বদরুল হায়দার চৌধুরী

অতঃপর কৌসুলি জনাব বদরুল হায়দার চৌধুরী সাক্ষী শামসুদ্দীন আহমদকে সংক্ষিপ্ত জেরা করেন। তিনি প্রশ্ন করেনঃ আপনি কি পুলিসের নিকটে বলিয়াছেন যে, ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাক সভায় বলিয়াছেন যে, বর্তমান পরিবেশ এবং অবস্থার মধ্যে আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিল হইতে পারে না।

উঃ বলিয়াছি (অবশ্য এভাবে রেকর্ড করা হয় নাই)।

জনাব আবদুল মালেক

কৌসুলি জনাব আবদুল মালেকের এক প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দীন আহমদ বলেন, "আমি যখন 'আর্মী' বলি, তখন বিমান বাহিনীকে তার অন্তর্ভুক্ত করি না।

প্রশ্ন ঃ এ আদালতে প্রথম দিন বাদীপক্ষের বিবৃতি, সাক্ষী ও অভিযুক্তদের যেসব নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিবরণ সম্বলিত কোন পত্রিকা কি আপনি দেখেছেন?

উত্তর ঃ জী না।

প্র ঃ এ মামলার সকল সাক্ষীর নাম আপনি কি পত্রিকা পড়ে জেনেছেন?

উ ঃ জী না, তা সত্য নহে।

প্রঃ পত্রিকায় আপনার ও স্কোয়াড্রন লীডার মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর নাম সাক্ষী হিসেবে বের হয়েছিল, তা কি আপনি পড়ছেন?

উ ঃ আমার মনে নেই।

প্রঃ এ মামলায় সাক্ষী হিসেবে স্কোয়াড্রন লীডার মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর নাম পত্রিকায় বের হইয়াছে, তা কি আপনি দেখেননি?

উ ঃ আমি স্মরণ করতে পারছি না।

প্র ঃ আপনি কি আজকের পত্রিকা দেখেছেন?

উ ঃ জী না।

প্র ঃ কালকের পত্রিকায় কি আপনার জবানবন্দী দেখেছেন?

উ ঃ আদালতে এসে কালকের পত্রিকায় আমার জবানবন্দীর কিছুটা পড়েছি।

প্র ঃ আপনি যা পড়েছেন তা কি বলতে পারেন?

উ ঃ আমার মনে হয়, তা হুবহু পুনরুল্লেখ করতে পারব না। পত্রিকায় যেভাবে লেখা হয়েছে তার সঙ্গতি ঠিক রেখে বলতে পারব না।

প্র ঃ ভি, আই,পি হাউসে নেওয়ার পর আপনার কোন ছবি তোলা হয়েছিল?

উ ঃ জী না। থার্ড পাঞ্জাব ব্যারাকে নেওয়ার পর আমার ছবি তোলা হয়।

জনাব জুলমত আলী খান

প্রঃ এ আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আপনি কি বিড় বিড় করছিলেন?

উ ঃ জী না, আমি কিছু বিড় বিড় করছিলাম না।

প্র ঃ আপনার পিতা আপনার নামে তাঁর কোন জমি হস্তান্তর করেছেন?

উ ঃ ১৯৬৫-৬৬ সনে তিনি তাঁর কিছু জমি আমার নামে হস্তান্তর করেছেন।

প্র ঃ আপনারা কয় ভাই? আপনি সকলের বড় ?

উ ঃ আমাদের তিন ভাই-এর মধ্যে আমি সবের বড়।

প্র ঃ আপনাদের পরিবার কি একান্নবর্তী পরিবার?

উ ঃ জী হ্যাঁ।

কৌঁসুলির কতিপয় প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এ সম্পত্তি তাঁহার পিতা ক্রয় করিয়াছিলেন এবং পরে তাহা তাঁহার নামে হস্তান্তর করেন। বিক্রয়ের মাধ্যমে তাহা হস্তান্তর করা হয়। সাক্ষী বলেন যে, তাঁহার ভাইবোনদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাঁহার নামে জমিটি হস্তান্তরের জন্য তিনি পিতাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন তাহা সত্য নহে।

প্র ঃ জনাব নুরুদ্দিনের নাম শুনেছেন?

উ ঃ আমি ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নুরুদ্দিনের নাম শুনেছি।

প্র ঃ আপনাদের ইউনিয়ন কাউন্সিলের নাম কি?

উ ঃ খরদহ।

প্র ঃ চেয়ারম্যান নুরুদ্দিনের সাথে কোন সময় আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল?

উ ঃ একবার মাত্র সাক্ষাৎ হয়েছে। তা প্রায় ১৫ বছর আগে। তাঁর ভাগ্নীর বিয়ের ব্যাপারে তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম।

প্র ঃ সর্বশেষ কখন আপনি আপনার গ্রামের বাড়ী গিয়েছিলেন?

উঃ ১৯৬৭ সনের ডিসেম্বরের প্রথম ভাগে। ঐসময় আমি জানতে পারি যে, জনাব নুরুদ্দিন আমাদের ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান।

প্র ঃ নূরুদ্দিন আহমদ ও মঈনুদ্দিন আহমদ কে?

উ ঃ তাঁরা আমার দুই ভাই।

প্র ঃ আপনার নামে আপনার পিতা যে জমি হস্তান্তর করেছেন সে ব্যাপারে আপনার ভাইদের উদ্যোগে কোন সালিস হয়েছিল?

উ ঃ জী না।

প্র ঃ আমি যদি বলি এ ব্যাপারে সালিস হয়েছিল এবং আপনি আপনার পিতার নামে জমি ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন?

উ ঃ তা সত্য নহে।

প্র ঃ কম্পিউটার সেকশন কি, জানেন ? কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম কি ঐ সেকশনে কাজ করেন?

উ ঃ কম্পিউটার সেকশন কি তা জানি, তবে কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম কম্পিউটার সেকশনে কাজ করেন কি-না, তা বলব না। কারণ, আমি মনে করি, এটা একটা গোপন তথ্য।

প্র ঃ কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম পি,এ,এফ/রেকর্ড অফিসে কখন কাজ করেন?

উ ঃ ১৯৬৭ সনে। (কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম কম্পিউটার সেকশনে কাজ করেন কি-না,কৌঁসুলি প্রশ্ন করিলে সাক্ষী তাহার জবাবদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন)।

প্র ঃ অপর ইউনিটের কোন এয়ারম্যানকে রেকর্ড অফিসে ঢুকিতে দেওয়া হয়?

উঃ এমনকি ইউনিফরম পরিহিত থাকিলে অপর ইউনিটের কোন এয়ারম্যানকে রেকর্ড অফিসে ঢুকিতে দেওয়া হয় না।

প্র ঃ রেকর্ড অফিসে কয়টি সেকশন আছে?

উ ঃ অনেক সেকশন।

প্র ঃ রেকর্ড অফিসের কোন বিশেষ সেকশনের কর্মচারীকে বিনা অনুমতিতে উক্ত অফিসের অন্য সেকশনে ঢুকিতে দেওয়া হয় না, এটা কি ঠিক?

উ ঃ এটা ঠিক নয়।

প্র ঃ যেদিন আপনার জবানবন্দী গ্রহণ করা হয় সেদিন ম্যাজিষ্ট্রেট আর কারো জবানবন্দী রেকর্ড করেছিলেন?

উ ঃ আমি বলতে পারি না।

প্রঃ আপনি কখন ভি আই পি কোয়ার্টার ত্যাগ করেন?

উ ঃ বেলা ১টা হইতে ২ টার মধ্যে।

প্র ঃ জবানবন্দী রেকর্ড করার আগে ম্যাজিষ্ট্রেট আপনাকে কোন প্রশ্ন করেছিলেন?

উ ঃ তিনি আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। এ মামলার সত্যতা সম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেট কোন প্রশ্ন করেননি।

প্র ঃ আপনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়েছেন?

উ ঃ জী না।

প্র ঃ এ উপমহাদেশের ইতিহাস জানেন?

উ ঃ আর্য অভিযান হতে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত এ উপমহাদেশের ইতিহাসের কিছুটা জানি।

প্র ঃ যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটোর প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে পড়েছেন?

উ ঃ পড়েছি কিনা মনে নেই।

কৌঁসুলির কতিপয় প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, মুক্তি আন্দোলনে যোগদানের পূর্বে তিনি সুভাষ চন্দ্র বোস কর্তৃক ভারতের জাতীয় সেনাবাহিনী গঠনের কথা শুনিয়াছেন এবং উহার বিভিন্ন দিক ভাবিয়া দেখিয়াছেন।

বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানের পূর্বে তিনি অপর বিকল্প পন্থা যেমন অহিংস অসহযোগিতা আন্দোলনের কথা ভাবেন নাই। আন্দোলনে যোগদানের পূর্বে তিনি দুই অর্থনীতি ও দুই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিতে অপর ফেডারেশনের বিকল্প চিন্তা করেন নাই।

সাক্ষী আরও বলেন যে, ১৯৬৭ সনের জুন মাসে জলিলের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যখন জানানো হয় যে, লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ভারতীয় অস্ত্র সাহায্যের অঙ্গীকার লাভে সমর্থ হইয়াছেন তখন তিনি বেশ সন্তুষ্ট হন।

১৯৬৫ সনে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ১৯৬৭ সনে ভারত হইতে অস্ত্র সাহায্য লাভ হইলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। কারণ এই আন্দোলন পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।

প্রঃ ভারত হইতে অস্ত্র লাভের ব্যাপারে সার্জেন্ট শামসুল হকের তথ্য সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন, আমি যদি বলি তাহা মিথ্য?

উ ঃ তাহা সত্য নহে।

প্র ঃ আমি যদি বলি, পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মীদের একটা তালিকা সার্জেন্ট শামসুল হকের পকেটে কখনও ছিল না?

উ ঃ তাহা সত্য নহে।

সংবাদ

২৪শে আগস্ট ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

ডাঃ সাইদুর রহমানের জবানবন্দীর বিবরণ

গতকাল (শুক্রবার) কুর্মিটোলা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ৫নং সরকারী সাক্ষী ও ৪নং রাজসাক্ষী ডাঃ সায়ীদুর রহমান চৌধুরী তাঁহার জবানবন্দীতে বলেনঃ

আমি ভূপতি ভূষণ চৌধুরীকে চিনি। তিনি মানিক চৌধুরী নামেও পরিচিত। (সাক্ষী কাঠগড়ায় আসামী মানিক চৌধুরীকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করেন)। ১৯৬৬-৬৭ সালে আমি চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ছিলাম। মানিক চৌধুরী ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ। আমি এবং মানিক চৌধুরী প্রায়ই পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া এবং সেগুলি কিভাবে আমরা আদায় করিব তাহার সম্ভাব্য পদ্ধতি নিয়া আলাপ-আলোচনা করিতাম।

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এই ধরনের এক আলোচনায় আমি মানিক চৌধুরীকে বলি যে,এত এত সভা ও মিছিল হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া পূরণ হইল না। মানিক চৌধুরী আমাকে বলেন, নিয়মতান্ত্রিক পন্থা ব্যর্থ হইয়াছে এবং আমাদের তাই এখন অনিয়মতান্ত্রিক

পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি কিভাবে তাহা করা যায়। জবাবে তিনি আমাকে বলেন, বল প্রয়োগ করিয়া প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা দখল করিতে হইবে। তিনি আরও ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, সামরিক কর্মচারীরা যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনে যোগ দিয়াছে আমাদের দাবী-দাওয়া নিশ্চিতভাবেই পূরণ হইবে। অতঃপর আমি তাঁহাকে ঐসব সামরিক কর্মচারী কাহারও সহিত তাঁহার পরিচয় আছে কিনা জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন, শীঘ্রই তিনি এই রকম একজন কর্মচারীর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিবেন।

সেই মাসেই এক সন্ধ্যায় তিনি এক ভদ্রলোককে নিয়া চট্টগ্রামে আমার ডিসপেনসারিতে আসেন। আমার নিকট তিনি সেই ভদ্রলোকের ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান বলিয়া পরিচয় দেন। তিনি আমাকে আরও বলেন, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে শেখ মুজিবর রহমান চেনেন। (সাক্ষী কাঠগড়ায় আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করেন)। ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান অতঃপর এইসব সামরিক কর্মচারীর জন্য একটি বৈঠকের স্থান জোগাড় করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে আমার সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমি তাঁহাকে ইহার জবাবে বলি যে, পরে আমি এ সম্পর্কে তাঁহার সহিত কথা বলিব। এই আলাপ-আলোচনার পর ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমার ডিসপেনসারী ত্যাগ করেন।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান পুনরায় আমার ডিসপেন্সসারীতে আসেন। ঐ সময় তিনি আমাকে জানান যে, বিপ্লবী দলটির নেতা ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম আসিয়াছেন। তিনি আমার আরও জানান যে, এই নেতা হোটেল মিসকায় উঠিয়াছেন। সন্ধ্যায় তিনি আমাকে তাঁহার সহিত দেখা করার অনুরোধ জানান। আমি সেই কথামতো হোটেল মিসকায় যাই।

সেখানে গিয়া আমি ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, জনাব মানিক চৌধুরী, শ্রী বিধান কৃষ্ণ সেন এবং আমার অপরিচিত আরও ৩ জনের দেখা পাই। (সাক্ষী কাঠগড়ায় আসামী বিধান কৃষ্ণ সেনকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করেন।) ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান তাঁদের আমীর হোসেন, এল,এস,সুলতানউদ্দীন আহমদ এবং এ,বি, খুরশীদ বলিয়া আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। (সাক্ষী কাঠগড়ায় এল,এস, সুলতানউদ্দীন আহমদ এবং এ, বি, খুরশীদকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করেন। এই বৈঠকে আমীর হোসেন আমাকে সংগঠনটিকে সাহায্য করার জন্য এবং উহার বৈঠকের একটি স্থান জোগাড় করিয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। আমি আমীর হোসেনকে জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি সত্য যে সামরিক কর্মচারীরা এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছে। জবাবে আমীর হোসেন আমাকে জানান, আমি যদি ঢাকায় যাই তাহা হইলে সামরিক কর্মচারীদের

উপর তাহার কিরূপ কন্ট্রোল, তাহা তিনি আমায় দেখাইতে পারিবেন। অতঃপর আমীর হোসেন আমাকে তাঁহার ঢাকার ঠিকানা দেন। ঐ বৈঠকেই আমীর হোসেন মানিক চৌধুরীকে এই আন্দোলনের জন্য ৩ হাজার টাকা চাঁদা প্রদানের অনুরোধ জানান। মানিক চৌধুরী উক্ত টাকার বন্দোবস্ত করিতে সম্মত হন। তিনি আরও জানান যে, শেখ মুজিবর রহমান তাঁহাকে আন্দোলনে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়াছেন।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহের দিকে চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবর রহমান সেই জনসভায় বক্তৃতা দেন। (সাক্ষী নির্ভুলভাবে কাঠগড়ায় শেখ মুজিবর রহমানকে চিহ্নিত করেন)। ঐ সভার পর শেখ মুজিবর রহমান একরাত্রে, হয় সেই দিনই অথবা তার পরের দিন আমার ঘরে আসেন। ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান সেসময় আগে থেকেই আমার ঘরে ছিলেন। মানিক চৌধুরী এবং ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমাকে আগেই শেখ মুজিবর রহমানের এই আমার ঘরে আসার খবরটি দিয়াছিলেন। শেখ মুজিবর রহমান যখন আমার ঘরে আসেন সেই সময় ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ছাড়া অন্য আর কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান সেসময় শেখ মুজিবর রহমানের কানে চুপি চুপি কি যেন বলিয়াছিলেন। ইহাতে শেখ মুজিবর রহমান আমাকে সামরিক কর্মচারীদের জন্য একটি বৈঠকের জায়গা জোগাড় করিয়া দেওয়ার এবং সংগঠনকে সাহায্য করার নির্দেশ দেন। ইহার কিছুক্ষণ পর শেখ মুজিবর রহমান চলিয়া যান।

দৈনিক পয়গাম

২৪শে আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

সার্জেন্ট শামসুদ্দীন আহমদের জেরা সমাপ্তঃ

রাজসাক্ষী ডঃ সাইদুর রহমানের জবানবন্দী শুরু

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৪ নম্বর রাজসাক্ষী এবং বাদীপক্ষের ৫ নম্বর সাক্ষী চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ডঃ সাইদুর রহমান চৌধুরী গতকল্য (শুক্রবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দী দানকালে ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরও কতিপয় ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে উল্লেখ করেন।

সাদা হাফসার্ট এবং সাদা প্যান্ট পরিহিত ৩৮ বৎসর বয়স্ক ডঃ সাইদুর রহমান গতকল্য প্রায় অর্ধ ঘণ্টাকাল আদালতে সাক্ষ্যদান করেন।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদিরের প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দীতে বলেন যে, অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তাহাকে বিপ্লবী আন্দোলনকে সহায়তা করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়ছিলেন।

গতকল্য তিন নম্বর রাজসাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদের সাক্ষ্যগ্রহণ সমাপ্ত হইয়াছে। গতকল্য আড়াই ঘণ্টাসহ সার্জেন্ট আহমদ ৫ দিনে প্রায় ১৭ ঘণ্টা সাক্ষীর কাঠগড়ায় ছিলেন। সাক্ষী আহমদকে গতকল্য বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আসাদুজ্জামান খান, জনাব আবদুল মালেক, জনাব এম, আবদুল্লাহ, জনাব বদরুল হায়দর চৌধুরী, জনাব জুলমত আলী খান, জনাব ভি, আই, চৌধুরী এবং জনাব এইচ, কে, আবদুল হাই জেরা করেন।

সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদের জেরা সমাপ্ত হওয়ার পর অপর রাজসাক্ষী ডঃ সাইদুর রহমান চৌধুরীকে পূর্বাহ্ন সাড়ে ১১টায় আদালতে আনয়ন করা হয়। অধিবেশন মধ্যাহ্ন ১২টার সময় আগামী সোমবার পর্যন্ত মুলতবী হইয়া যায়।

৪নং রাজসাক্ষী ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদেরের প্রশ্নের জবাবে সর্বপ্রথম তাঁহার নাম, ঠিকানা প্রভৃতি উল্লেখ করেন। তাঁহার পিতার নাম (মৃত) মৌলবী আবদুল খায়ের চৌধুরী এবং তিনি চট্টগ্রাম জেলার কোতওয়ালী থানার এনায়েত বাজারের ১২, রফিউদ্দিন সিদ্দিকী বাই-লেনের অধিবাসী।

প্রশ্ন–আপনি কি (অভিযুক্ত) ভুপতি ভূষণ চৌধুরীকে চিনেন?

উত্তর–জী হ্যাঁ।

প্রশ্ন–তিনি কি অন্য নামেও পরিচিত?

উত্তর–হ্যাঁ, মানিক চৌধুরী নামেও পরিচিত।

প্রশ্ন–আপনি কি কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন?

উত্তর–জী হ্যাঁ। ১৯৬৬-'৬৭ সালে আমি চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ছিলাম।

প্রশ্ন–মানিক চৌধুরী কি কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন?

উত্তর–জী হ্যাঁ। তিনি চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

প্রশ্ন–মানিক চৌধুরী কি আপনার সহিত কোন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিত?

উত্তর–জী হ্যাঁ। আমি এবং মানিক চৌধুরী প্রায়ই পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া এবং ইহা আদায়ের সম্ভাব্য পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করিতাম।

প্রশ্ন–আপনাদের মধ্যে ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে কি কোনরূপ আলোচনা হইয়াছিল?

উত্তর–হ্যাঁ। এইরূপ এক আলোচনায় আমি মানিক চৌধুরীকে বলিয়াছিলাম যে, অসংখ্য জনসভা এবং শোভাযাত্রা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের দাবী এখন

পর্যন্তও পূরণ হয় নাই। মানিক চৌধুরী তখন আমাকে বলেন যে, শাসনতান্ত্রিক পন্থা ব্যর্থ হওয়ায় আমাদিগকে এখন অশাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা কিভাবে সম্ভব আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। জবাবে মানিক চৌধুরী আমাকে বলেন যে, জোরপূর্বক প্রাদেশিক সরকারকে দখল করা উচিত। তিনি আমাকে আরও ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, যেহেতু সামরিক কর্মচারীবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন, সেহেতু আমাদের দাবী অবশ্যই পূরণ হইবে। তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, সেসব সামরিক কর্মচারীদের কাহারও সহিত তাহার যোগাযোগ রহিয়াছে কিনা। ইহার জবাবে তিনি বলেন যে, শীঘ্রই তিনি অনুরূপ একজন সামরিক কর্মচারীর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিবেন।

প্রশ্ন–তিনি কি আপনার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন?

উত্তর–জী হ্যাঁ। একই মাসের এক রাত্রিতে তিনি জনৈক ভদ্রলোকসহ আমার ডাক্তারখানায় আগমন করেন। তিনি সে ভদ্রলোককে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান বলিয়া আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। (রাজসাক্ষী পূর্বে মিঃ মানিক চৌধুরী এবং এই পর্যায়ে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে আসামীদের কাঠগড়ায় সঠিকভাবে সনাক্ত করেন)।

প্রশ্ন–তাহারা কি শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে কিছু বলিয়াছিল?

উত্তর–জী হ্যাঁ। মানিক চৌধুরী আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিব শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত পরিচিত। (সাক্ষী সঠিকভাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে সনাক্ত করেন)।

প্রশ্ন–তারপর তাহারা কি কিছু বলিয়াছিল?

উত্তর–জী হ্যাঁ। ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান সামরিক কর্মচারীদের সভা করিবার জন্য একটি স্থান ঠিক করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে আমার সহায়তা কামনা করেন। ইহার জবাবে আমি বলি যে, আমি এই ব্যাপারে তাহার সহিত পরবর্তী সময়ে আলোচনা করিব। এই কথাবার্তার পর ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান আমার ডাক্তারখানা ত্যাগ করেন।

প্রশ্ন–সে সভায় কি হইয়াছে তাহার বর্ণনা দিবেন কি?

উত্তর–আমীর হোসেন সংস্থাকে সাহায্য করিবার এবং একটি সভার জায়গা প্রদানের জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আমি আমীর হোসেনকে জিজ্ঞাসা করি যে, সামরিক কর্মচারীরা এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে–ইহা সত্য কিনা?

ইহার জবাবে আমীর হোসেন আমাকে বলেন যে, আমি ঢাকা গেলে সামরিক কর্মচারীদের উপর তাহার কি ক্ষমতা রহিয়াছে তাহা দেখাইতে পারিবেন। ইহার পর আমীর হোসেন আমাকে তাহার ঢাকার ঠিকানা দেন।

প্রশ্ন–সভায় আর কিছু ঘটিয়াছিল?

উত্তর–একই সভায় আমীর হোসেন আন্দোলনের জন্য মানিক চৌধুরীকে তিন হাজার টাকা প্রদান করিতে বলেন। মানিক চৌধুরী এই টাকার ব্যবস্থা করিয়া দিতে স্বীকৃত হন। তিনি আরও বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান এই আন্দোলনকে সাহায্য করিবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিয়াছেন।

প্রশ্ন– ফেব্রুয়ারী মাসে লালদীঘিতে কি কোন সভা হইয়াছিল?

উত্তর–জী হ্যাঁ। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে লালদীঘি ময়দানে একটি সভা হইয়াছিল। শেখ মুজিবুর সে সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

প্রশ্ন–সভার পর কি হইয়াছিল?

উত্তর–সভার পর একরাত্রে শেখ মুজিবুর রহমান আমার গৃহে আসিয়াছিলেন। হয় সভার রাত্রে না হয় পরবর্তী রাত্রে। ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান পূর্বেই আমার গৃহে ছিলেন। মানিক চৌধুরী এবং ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান পূর্বাহ্নে শেখ মুজিবুর রহমানের আমার গৃহে আগমন সম্পর্কে আমাকে অবহিত করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন–আপনার গৃহে তখন আর কে ছিল?

উত্তর–শেখ মুজিবুর রহমান যখন আমার গৃহে আগমন করেন তখন ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর ব্যতিরেকে অপর কেহ ছিল না।

প্রশ্ন–কি কথাবার্তা হইয়াছিল?

উত্তর–ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান তখন শেখ মুজিবুর রহমানের কানে কানে কিছু কথা বলেন। শেখ মুজিবুর রহমান তখন আমাকে সামরিক কর্মচারীদের সভা করিবার একটি জায়গা এবং প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিবার জন্য আমাকে নির্দেশ দেন। ইহার কিছুক্ষণ পর শেখ মুজিব আমার গৃহত্যাগ করেন।

প্রশ্ন–আমীর হোসেনের আমন্ত্রণে আপনি কি ঢাকা আসিয়াছিলেন?

উত্তর–সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের ২৩শে এপ্রিল আমি ঢাকা আগমন করিয়াছিলাম।

প্রশ্ন–আপনি কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন?

উত্তর– হোটেল গ্রীনে।

(সাক্ষীকে এই সময় হোটেল গ্রীনের রেজিষ্ট্রার দেখান হয় এবং ইহার ১১৭ পৃষ্ঠায় একটি এন্ট্রি দেখিবার জন্য বলা হয়। সাক্ষী তাহা দেখিবার পর বলেন, "এই এন্ট্রি আমার সম্পর্কিত")

প্রশ্ন–রেজিষ্টারে কি দেখান হইয়াছে?

উত্তর–১৯৬৬ সালের ২৪শে এপ্রিল আমি হোটেলে ছিলাম বলিয়া দেখানো হইয়াছে। এন্ট্রিতে আমার হোটেল ত্যাগের তারিখ নাই। "সফরের উদ্দেশ্য" কলাম হইতে পরবর্তী কলামসমূহে আমার নামের পার্শ্বে কোন এন্ট্রি নাই।

প্রশ্ন–কে নাম এন্ট্রি করিয়াছে? এই হাতের লেখা কার?
উত্তর–বিধান কৃষ্ণ সেন (অভিযুক্ত) আমার পক্ষে নাম এন্ট্রি করেন। তাহার হাতের লেখা।
প্রশ্ন–আপনার সামনে কি লিখিয়া ছিল?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–তবে তাহার হাতের লেখা কিভাবে বলিতেছেন?
উত্তর–আমি তাহার হাতের লেখা জানি। আমার নামের পূর্বে এন্ট্রি রহিয়াছে, "বি, কে, সেন এণ্ড পার্টি" এবং ইহাও তাহার হাতে লেখা হইয়াছে। এন্ট্রিতে "এণ্ড পার্টি" শব্দটি কাটিয়া নীচে লিখিয়াছে।
প্রশ্ন–এই ক্ষেত্রে বি, কে, সেন কে?
উত্তর–(অভিযুক্ত) বিধান কৃষ্ণ সেন।
প্রশ্ন–তাহাকে কি আপনি আদালতে সনাক্ত করিয়াছেন?
উত্তর–জী হ্যাঁ। গ্রীন হোটেলে বিধান সেনের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়। তিনিও এই হোটেলে অবস্থানের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। আমি ঢাকায় আমার ব্যাপারে আসিয়াছিলাম। তিনিও একই হোটেলে অবস্থান করিয়াছিলেন।

আসাদুজ্জামান খান

পূর্বাহ্নে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আসাদুজ্জামান খান গতকল্য রাজসাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদকে জেরা করেন। কৌসুলী গত বৃহস্পতিবারও সাক্ষীকে জেরা করিয়াছিলেন।
প্রশ্ন–করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ-তে ভর্তির ফরমে আপনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে চাকুরী করেন, ইহা উল্লেখ করেন নাই?
উত্তর–আমি উল্লেখ করিয়াছি।
প্রশ্ন–আপনি যখন বিপ্লবী আন্দোলন হইতে সরিয়া পড়েন তখন কি মনে করিয়াছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার বিদুরিত হইয়াছে?
উত্তর–আমার জানা নাই।
প্রশ্ন–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী দানের জন্য গমনকালে সিরাজুল ইসলাম কি আপনার সঙ্গে ছিল?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনি আদালতে বলিয়াছেন যে, (অভিযুক্ত) ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া সভা শেষ করিয়াছিলেন। আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ইহা কি উল্লেখ করিয়াছিলেন?
উত্তর– বলিয়াছি বলিয়া আমার মনে হইতেছে। (অনুরূপ রেকর্ড হয় নাই)।

প্রশ্ন–পুলিশের নিকট কি ইহা বলিয়াছেন?
উত্তর– বলিয়াছি বলিয়া আমার মনে হইতেছে। (অনুরূপ রেকর্ড করা হয় নাই)।
প্রশ্ন–১৯৬৭ সালের এপ্রিল-মে মাসে ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ পূর্বের মতই একই কোয়ার্টারে অথবা একই সেকশনে কাজ করিত?
উত্তর–আমি ঠিক বলিতে পারিতেছি না।
প্রশ্ন–(অভিযুক্ত) মাহবুবুদ্দিন চৌধুরী কি সেনাবাহিনীর সাবেক কর্মচারী?
উত্তর–কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম আমাকে তাহাই বলিয়াছে।
প্রশ্ন–থার্ড পাঞ্জাব ব্যারাকে আটক থাকাকালে (অভিযুক্ত) সার্জেন্ট জলিলকে আপনার পশ্চাতের কক্ষে রাখা হইয়াছিল। মেজর নাসের কি সনাক্তকরণের জন্য তাহাকে (জলিল) আপনাকে দেখাইয়াছিল?
উত্তর–না। ইহা সত্য নয়।
প্রশ্ন– আপনি কি করাচীর জাহাঙ্গীর রোড চিনেন?
উত্তর–নাম জানি। কিন্তু কখনও যাই নাই।
প্রশ্ন–জামসেদ রোড?
উত্তর–নাম জানি। কিন্তু কখনও যাই নাই।
প্রশ্ন–আমি বলিতেছি যে, সার্জেন্ট জলিল কখনও (করাচীর) ক্লেটন রোডের গৃহে বাস করে নাই?
উত্তর–অবশ্যই সে বাস করিয়াছে। তবে বাড়ীর নম্বর আমি বলিতে পারিতেছি না।
প্রশ্ন–সে গৃহে কয়টি কক্ষ আছে?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–সে গৃহে কি বারান্দা আছে?
উত্তর–একদিকে বারান্দা আছে।
প্রশ্ন–আটকের পর আপনাকে কি সে গৃহ সনাক্তকরণের জন্য দেখান হইয়াছে?
উত্তর–না।

আবদুল্লাহ

বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব এম, আবদুল্লাহ সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–ম্যাট্রিক পাশের পর উচ্চশিক্ষা গ্রহণ না করিয়া কেন বিমান বাহিনীর চাকুরীতে যোগদান করিয়াছিলেন?
উত্তর–দেশরক্ষা বাহিনীতে কাজ করিবার ব্যাপারে আমি খুবই আগ্রহী ছিলাম এবং সেজন্য বিমানবাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলাম।

প্রশ্ন–বিমানবাহিনীতে আপনার চাকুরী জীবন কি আনন্দদায়ক ছিল?
উত্তর–খুবই আনন্দদায়ক ছিল।
প্রশ্ন–আপনি কি আরামপ্রিয় না কঠোর পরিশ্রমী লোক?
উত্তর–আমি কঠোর পরিশ্রমী।
প্রশ্ন–আপনার হবি কি?
উত্তর–ভারোত্তলনসহ শরীরচর্চা।
প্রশ্ন–আপনি গান গাহিয়া থাকেন কি?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–অন্যের গান শুনিতে কি আপনার ভাল লাগে?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আপনি কি কখনও "আমার সোনার বাংলা" গানটি শুনিয়াছেন?
উত্তর–হ্যাঁ। অনেক বার শুনিয়াছি।
প্রশ্ন–ইহার কোন লাইন বলিতে পারেন?
উত্তর–না।
পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত আবৃত্তি করিতে পারিবেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–নামাজের সুরা মুখস্থ বলিতে পারিবেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তি কি আপনি এখানে শেষদিক হইতে আরম্ভ করিয়া শুরুর দিকে মুখস্থ বলিতে পারিবেন?
মাননীয় আদালত এই প্রশ্নটিও বাতিল করেন এবং বলেন যে, ইহা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়।
প্রশ্ন–আমি বলছি যে, আদালতে বিবৃত আপনার হাতবোমার কাহিনীটি অলীক?
উত্তর–না।

বদরুল হায়দর চৌধুরী

বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব বদরুল হায়দর চৌধুরী সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–(অভিযুক্ত) ফ্লাইট সার্জেন্ট রাজ্জাক বর্তমান অবস্থা এবং পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য অর্জিত হইবে না বলিয়া এক সভায় উল্লেখ করিয়াছিল বলিয়া আপনি বলিয়াছেন। এই কথা কি আপনি পুলিশের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন?
উত্তর–হ্যাঁ।

আবদুল মালেক

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুল মালেক সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–মামলার বিবরণী আপনি সংবাদপত্রে পাঠ করেন বলিয়া আদালতে উল্লেখ করিয়াছেন।
মামলা শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরেই সংবাদপত্রে মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তি, সাক্ষীর তালিকা এবং অভিযোগের বিবরণী যে দিনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কি আপনি পড়িয়াছেন?
উত্তর–সেদিনের সংবাদপত্র আমি পাই নাই।
প্রশ্ন–আমি বলছি যে, আপনি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সকল সাক্ষীর নাম পড়িয়াছেন?
উত্তর–সত্য নয়।
প্রশ্ন–আমি বলছি যে, আপনি সেদিনের সংবাদপত্র পাঠ করিয়াছেন?
উত্তর–সত্য নয়।
প্রশ্ন–সংবাদপত্রের যে সংখ্যায় সাক্ষী হিসাবে সাবেক স্কোয়াড্রন লীডার মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী আপনাকে কোন প্রশ্ন করিয়াছিল?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–স্বীকারোক্তি রেকর্ডিং-এর পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট কি মামলার তথ্যাদি সম্পর্কে আপনাকে কোন প্রশ্ন করিয়াছিল?
উত্তর–না।

ফজলুল করিম

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব ফজলুল করিম রাজসাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–আপনি কি রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বই পড়িয়াছেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–এই উপমহাদেশে আর্যদের আক্রমণ হইতে শুরু করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্তকার ইতিহাস কি আপনি পড়িয়াছেন?
উত্তর–ইতিহাসের কিছু কিছু অংশ আমি পড়িয়াছি।
প্রশ্ন–দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে যুগোশ্লাভিয়ায় নাৎসীদের বিরুদ্ধে মার্শাল টিটোর প্রতিরোধ সংগ্রামের বৃত্তান্ত আপনি কি পড়িয়াছেন?
উত্তর–পড়িয়াছি কিনা মনে নাই।
প্রশ্ন–বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানের পূর্বে সুভাষ বসুর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আই, এন, এ) গঠনের বিষয় কি আপনি শুনিয়াছিলেন?
উত্তর–আমি শুনিয়াছি।

প্রশ্ন–বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানের পূর্বে আপনি কি ইহার সকল দিক সম্পর্কে বিবেচনা করিয়াছিলেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানের পূর্বে অহিংস এবং অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রদেশের দাবী আদায় সম্ভব, এই দিক সম্পর্কে কি চিন্তা করিয়াছিলেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–দুই অর্থনীতি এবং দুই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিতে ফেডারেশন গঠনের বিকল্প বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছেন কি?
উত্তর-না। এই বিষয়েও চিন্তা করি নাই।
প্রশ্ন–কুম্ভকর্ণের কাহিনী জানেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–১৯৬৭ সালের জুন মাসে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ধৃত ব্যক্তিদের সভায় (অভিযুক্ত)
এবং আপনার নাম প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আপনি পড়িয়াছেন?
উত্তর–আমার মনে পড়িতেছে না।
প্রশ্ন–আপনি কি আজকের সংবাদপত্র পাঠ করিয়াছেন?
উত্তর–না। গতকল্যকার সংবাদপত্রে আমার জেরার কিছু অংশ আদালতে আগমনের পূর্বে পাঠ করিয়াছিলাম।
প্রশ্ন–ক্যান্টনমেন্টের ভি, আই, পি হাউসে নেওয়ার পর আপনার ফটো নেওয়া হইয়াছিল কি?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–কোন সময় কি আপনার ফটো তোলা হয় নাই?
উত্তর–থার্ড পাঞ্জাব ব্যারাকে অবস্থানকালে আমার ফটো নেওয়া হইয়াছিল।

জুলমত আলী খান

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব জুলমত আলী খান সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–আপনার কয় ভাই আছে?
উত্তর–তিন ভাই। আমি সবার বড়।
প্রশ্ন–একান্নবর্তী পরিবার?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–(মোমেনশাহীর) খাগদহ ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জনাব নূরুদ্দিনকে আপনি চিনেন?
উত্তর–আমি নাম শুনিয়াছি।

প্রশ্ন–নূরুদ্দিনকে আপনি কখনও দেখেন নাই?
উত্তর–১৫ বছর আগে একবার দেখিয়াছিলাম।
প্রশ্ন–একখণ্ড জমি আপনার নামে হস্তান্তরের পর (আপনার পিতা কর্তৃক) কি আপনার অপর দুইভাই চেয়ারম্যান নূরুদ্দিনকে দিয়া সালিসের ব্যবস্থা করিতে চাহেন নাই?
উত্তর–না। ইহা সত্য নয়।
প্রশ্ন–ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আপনি যেদিন স্বীকারোক্তি করেন সেদিন অপর কাহারও স্বীকারোক্তি কি গ্রহণ করা হইয়াছিল?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–স্বীকারোক্তি রেকর্ড করিবার পূর্বে ম্যাজিষ্ট্রেট কি আপনাকে কোন প্রশ্ন করিয়াছিল?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–স্বীকারোক্তি রেকর্ডিং-এর পূর্বে ম্যাজিষ্ট্রেট কি মামলার তথ্যাদি সম্পর্কে আপনাকে কোন প্রশ্ন করিয়াছিল?
উত্তর–না।

ফজলুল করিম

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব ফজলুল করিম রাজসাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–আপনি কি রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বই পড়িয়াছেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–এই উপমহাদেশে আর্যদের আক্রমণ হইতে শুরু করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্তকার ইতিহাস কি আপনি পড়িয়াছেন?
উত্তর–ইতিহাসের কিছু কিছু অংশ পড়িয়াছি।
প্রশ্ন–দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে যুগোশ্লাভিয়ায় নাৎসীদের বিরুদ্ধে মার্শাল টিটোর প্রতিরোধ সংগ্রামের বৃত্তান্ত আপনি কি পড়িয়াছেন?
উত্তর–পড়িয়াছি কিনা মনে নাই।
প্রশ্ন–বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানের পূর্বে সুভাষ বসুর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আই, ইন, এ) গঠনের বিষয় কি আপনি শুনিয়াছিলেন?
উত্তর–আমি শুনিয়াছি।
প্রশ্ন–বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানের পূর্বে আপনি কি ইহার সকল দিক সম্পর্কে বিবেচনা করিয়াছিলেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানের পূর্বে আপনি কি ইহার সকল দিক সম্পর্কে বিবেচনা করিয়াছিলেন?
উত্তর–হ্যাঁ।

প্রশ্ন–বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানের পূর্বে অহিংস এবং অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রদেশের দাবী আদায় সম্ভব, এই দিক সম্পর্কে কি চিন্তা করিয়াছিলেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–দুই অর্থনীতি এবং দুই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিতে ফেডারেশন গঠনের বিকল্প বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছেন কি?
উত্তর–না। এই বিষয়েও চিন্তা করি নাই।
প্রশ্ন–কুম্ভকর্ণের কাহিনী জানেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–১৯৬৭ সালের জুন মাসে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ধৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে কিছু জানেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ভারত হইতে অস্ত্র প্রাপ্তির ব্যাপারে নিশ্চয়তা লাভ করিয়াছেন, এই মর্মে সংবাদ শ্রবণের পর আপনি কি সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–১৯৬৫ সালে ভারত কর্তৃক পাকিস্তান আক্রান্ত হওয়ার পর জীবন দিয়াও ইহার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, আবার ১৯৬৭ সালে (পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য) ভারত হইতে অস্ত্র আমদানীর সংবাদে খুশী হইয়াছেন–ইহা কি পরস্পর বিরোধী নয়?
উত্তর–১৯৬৫ সালে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এক কথা এবং ১৯৬৭ সালে ভারত হইতে অস্ত্র প্রাপ্তি ভিন্ন ব্যাপার। কারণ, এই আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ছিল।
প্রশ্ন–(অভিযুক্ত) সার্জেন্ট শামসুল হক ভারত হইতে অস্ত্র প্রাপ্তির যে সংবাদ সভায় দিয়াছিল বলিয়া আপনি বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা?
উত্তর–না। মিথ্যা নয়।
প্রশ্ন–আমি বলিতেছি যে, সার্জেন্ট শামসুল হকের পকেটে পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মীদের কোন নামের তালিকা ছিল না?
উত্তর–আপনার বক্তব্য সত্য নয়।

ভি আই চৌধুরী

বিবাদীপক্ষে কৌসুলী জনাব ভি, আই, চৌধুরী সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–১৯৬৭ সালের অক্টোবরে (অভিযুক্ত) মাহবুবুদ্দিন চৌধুরীর করাচী গৃহে অনুষ্ঠিত সভা ঢাকা বারান্দায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আপনি উল্লেখ করিয়াছেন। আমি বলছি , সে গৃহে অনুরূপ বারান্দা ছিল না।

উত্তর–ঢাকা বারান্দা ছিল। তবে তাহা কাঠের এনক্লোজার না অন্য কিছু ছিল তাহা আমার মনে পড়িতেছে না।

এইচ কে আবদুল হাই

বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব এইচ, কে, আবদুল হাই সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–১৯৬৭ সালের ২৯শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৬৮ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎকারী সকল সামরিক কর্মচারী কি পশ্চিম পাকিস্তানী ছিল?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–কেন আপনি লেঃ শরীফের নিকট আপনার স্বীকারোক্তি করিবার সিদ্ধান্ত জানাইয়া ছিলেন?
উত্তর–স্বীকারোক্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সর্বপ্রথম লেঃ শরীফ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করার জন্যই তাহাকে আমি প্রথম এই কথা বলিয়াছি।
প্রশ্ন–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করিবার পূর্বে কি আপনি ক্ষমা পাইবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আদালতে সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে আপনি কি কোন পুরস্কার পাওয়ার প্রত্যাশা করেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–১৯৬৭ সালের ২৯শে ডিসেম্বর সকাল ১০টায় আপনাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে বলিয়া কি আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উল্লেখ করিয়াছেন?
উত্তর–আমার মনে পড়িতেছে না।
প্রশ্ন–এই মামলায় আপনাকে কোন সময়ে কি গ্রেফতার করা হইয়াছিল?
উত্তর–আমি মনে করিতে পারিতেছি না।
ট্রাইব্যুনালের শুনানী আগামী সোমবার হইতে পুনরায় শুরু হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

২৪শে আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

সার্জেন্ট শামসুদ্দীনের জেরা সমাপ্ত : ডাঃ সাঈদুর রহমানের সাক্ষ্য শুরু

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার তিন নম্বর একরারী সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দীন আহমদের জেরা গতকাল শুক্রবার সমাপ্ত হয় এবং চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ দলীয় সাক্ষী শামসুদ্দীন আহমদের জেরা গত সোমবার শুরু হয়।

গতকাল ৪নং একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদেরের পরিচালনায় সাক্ষ্য প্রদান শুরু করেন। গতকাল তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ অসমাপ্ত থাকে।

এইদিন বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আসাদুজ্জামান খান, জনাব এম এ আবদুল্লাহ, জনাব বদরুল হায়দার চৌধুরী, জনাব আবদুল মালেক, জনাব জুলমত আলী খান, জনাব ফজলুল করিম, জনাব ভিখারুল ইসলাম চৌধুরী ও জনাব আবদুল হাই একরারী সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দীন আহমদকে জেরা করেন। গতকাল বেলা ১২টায় আদালতের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। আগামী সোমবার পুনরায় সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমানের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

আসাদুজ্জামান খান

প্র-আপনি কি জানেন যে, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ শ্রেণীতে ভর্তি হতে গেলে যে ফরম পূরণ করতে হয়, তাতে উপরস্থ অফিসারের অনুমতি দেওয়ার একটি ঘর থাকে।

উ-সবসময় পাওয়া যায়?

প্র-বি এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আপনি যথাসময়ের আগে অফিস থেকে চলে যাওয়ার সময় আপনার উপরস্থ অফিসারের কাছে কি কারণ দেখাতেন?

উ-আমার মনে নেই।

কৌসুলীর প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী বলেন যে, বি এ পরীক্ষা দেওয়ার প্রশ্নে তিনি তাঁর অফিসের সঙ্গে প্রতারণা করেননি। তিনি আরো জানান যে, তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে তার পিএএফ-এ কাজ করার খবর গোপন রাখার কথা ঠিক নয়।

প্র-আচ্ছা, যে সময় আপনি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ত্যাগ করলেন, তখন কি পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অবিচার দূর হয়ে গেছে?

উ-আমি তা বলতে পারবো না।

প্র-আপনি এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য যে অনুতপ্ত হয়েছেন, সে কথা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপনার বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন?

উ-হ্যাঁ (রেকর্ড নেই)।

প্র-আপনি যখন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যান, তখন কি কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম আপনার সঙ্গে ছিল?

উ-না, আমি একাই যাই।

প্র-আপনি বাংলা না ইংরেজী ভাষায় নিজেকে বেশী ভালো করে প্রকাশ করতে পারেন?

উ-তা আমি নিজে বুঝতে পারি না।

প্র-১৯৬৪ সালে আপনার সঙ্গে সার্জেন্ট মফিজুল্লার প্রথম দেখা হয়, তখন তিনি কোথায় থাকতেন?

উ-করাচীতে সার্জেন্ট মেসেই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

প্র-তখন কি মফিজুল্লাহকে কেউ লক্ষ্য করেছিল?

উ-আমি জানি না।

প্র-আচ্ছা, কোরাঙ্গী ক্রিকের বৈঠকের ব্যাপারে কেউ কি কোন সময় নির্ধারণ করেছিলেন?

উ-না, বৈঠকের কোন সময় স্থির করা হয়নি।

কৌসুলীর অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানান যে, মফিজুল্লাহ তাকে মোটামুটিভাবে জানিয়েছিলেন যে, বৈঠকটি পরবর্তী রোববার অনুষ্ঠিত হবে।

এই সময় কৌসুলী উল্লেখ করেন যে, তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন যে, "নির্ধারিত সময়ে" তিনি বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই প্রশ্নে আদালত সাক্ষীকে এই "নির্ধারিত সময়" বলতে কি বোঝান তা ব্যাখ্যা করতে বলেন। সাক্ষী তখন বলেন যে, তিনি মফিজুল্লাকে বলেছিলেন, যদি কোন বৈঠক আহ্বান করতে হয় তবে তা যেন রোববার হয়। মফিজুল্লা তাকে রোববার বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা জানালে তিনি বলেছিলেন তিনি (সাক্ষী) কলেজে ক্লাস করে তারপর বৈঠকে যাবেন।

প্র-আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপনার বিবৃতিতে বলেছিলেন?

"বৈঠকের সমাপ্তিতে মফিজুল্লাহ বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পৃথক করার জন্য একটি 'বিপ্লবী গ্রুপ' গঠন করা দরকার?"

উ-হ্যাঁ, বলেছিলাম এরূপ লিপিবদ্ধ নেই।

প্র-একথাটা কি আপনি পুলিশের কাছে আপনার বিবৃতিতে উল্লেখ করেছিলেন?

উ-হ্যাঁ (এরূপ লিপিবদ্ধ নেই)।

প্র-আচ্ছা, মফিজুল্লা আগে যে কোয়ার্টারে থাকতেন এবং যে অফিসে চাকুরী করতেন, ১৯৬৭ সালের এপ্রিল-মে মাসে কি সেখানেই থাকতেন ও চাকুরী করতেন?

উ-আমার জানা নেই।

প্র-মাহবুবউদ্দীন কি এক সাবেক সামরিক কর্মচারী?

উ-কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম আমাকে তাই বলেছিল ।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে একরারী সাক্ষী জানান যে, ড্রিগ রোডের বৈঠকের কথা সিরাজুল ইসলাম তাকে বৈঠকের এক সপ্তাহ আগে জানিয়েছিলেন। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে, সিরাজুল ইসলাম তাকে এই বৈঠকের কোন তারিখ জানাননি, তবে বলেছিলেন যে, শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে এবং তখন তিনি তার (সাক্ষীর) কোয়ার্টারে এসে তাঁকে (সাক্ষীকে) নিয়ে যাবেন।

প্র-সিরাজুল ইসলাম নির্দিষ্ট সময়ে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার কথা কি পুলিশের কাছে জানিয়েছিলেন?
উ-হ্যাঁ।
প্র-বৈঠকের স্থান সম্পর্কে তিনি আপনাকে কিছু জানিয়েছিলেন?
উ-তিনি যখন আগে আমার সঙ্গে দেখা করেন তখন কোথায় বা কখন বৈঠক হবে, তার কিছুই জানাননি।
প্র-মফিজুল্লাহ যে আপনাকে সার্জেন্ট জলিলের বাসায় অপর একটি বৈঠকে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন, সেকথা কি পুলিশকে জানিয়েছিলেন?
উ-আমার মনে নেই।
প্র-জলিলের বাসায় অনুষ্ঠিত বৈঠক কতক্ষণ চালু ছিল?
উ-প্রায় এক ঘণ্টাকাল।
প্র-এই বৈঠকের পরে কি জলিলের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?
উ-হ্যাঁ।
প্র-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কি আপনি জলিলকে সনাক্ত করেছেন?
উ-না, আমাকে তা করতে বলা হয়নি।
প্র-ট্যাক্সি ড্রাইভারকে সনাক্ত করতে পারেন?
উ-না।
প্র-আপনি কি জানে যে, জলিল আপনার ব্যারাকেই থাকতো?
উ-আমার জানা নেই।
প্র-আমার মনে হয় জলিল আপনার কোয়ার্টারের পেছনেই থাকতো এবং মেজর নাসের ও তার সঙ্গীরা আপনাকে জলিলকে সনাক্ত করতে বলেন?
উ-না, একথা সত্য নয়।
প্র-জলিলের বাসাটা কোথায়?
উ-বড় রাস্তার একটু ধারেই।
প্র-করাচীর ক্লিফটন রোড কি গুরুমন্দিরের কাছ থেকে শুরু হয়?
উ-আমার জানা নেই।
প্র-আপনি জাহাঙ্গীর রোড চেনেন?
উ-নাম শুনেছি; কিন্তু কোনদিন যাইনি।
প্র-জামশেদ রোড চেনেন?
উ-নাম শুনেছি; কিন্তু সেখানেও যাইনি কখনও।
প্র-আমার মনে হয় জলিল কোন সময়ে ক্লিফটন রোডের কোন বাসায় ছিল না।
উ-এটা ঠিক নয়।
প্র-তার বাড়ীর নম্বর জানেন?
উ-না, মনে করতে পারছি না।

প্র-এই বাড়ীতে ক'টা ঘর ছিল?
উ-জানি না।
প্র-বারান্দা ছিল কিনা বলতে পারেন?
উ-হ্যাঁ, একদিকে বারান্দা ছিল।
প্র-ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কারোর কাছে কি আপনি এই বাড়ীটি সনাক্ত করেছিলেন?
উ-না, সেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়নি।
কৌসুলীর অপর এক প্রশ্নের জওয়াবে তিনি জানান যে, প্রতি বছর ছোটখাটো আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে তাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়।
এরপর বিবাদী কৌসুলী জনাব এম এ আবদুল্লাহ তাঁর জেরা শুরু করেন।

এম এ আবদুল্লা

প্র-আপনি ম্যাট্রিক পাস করার পরে দারিদ্র্যের জন্য চাকুরী গ্রহণ করেন, না পড়াশোনার প্রতি অনাগ্রহের জন্য?
উ-আমি দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সেবা করার জন্যই পিএএস-এ গ্রহণ করি।
প্র-আপনি আপনার চাকুরী জীবন না ব্যক্তিগত জীবন বেশী আনন্দজনক বলে মনে করেন?
উ-পিএএফ-এ আমার জীবন অত্যন্ত আনন্দের মধ্যে ছিল।
প্র-অধিকাংশ লোকই তো আরাম প্রিয়। আপনি কি নিজেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করেন?
উ-আমি পরিশ্রমী মানুষ আরামপ্রিয় নই।
প্র-আপনার হবি কি?
উ-আমি শারিরীক ব্যায়াম করতে ভালোবাসি, বিশেষ করে ভারোত্তলোন করতে।
প্র-পাঠ্যপুস্তক কি আপনি মুখস্ত করতেন?
উ-আমি প্রথমে পাঠ্যবই পড়ে যেতাম, পরে সেটা বোঝার চেষ্টা করতাম এবং প্রয়োজন হলে কিছু কিছু মুখস্ত করতাম।
প্র-আপনি কখনও "আমার সোনার বাংলা" গান শুনেছেন?
উ-হ্যাঁ, অনেকবার।
প্র-আপনি সেটা আবৃত্তি করতে পারবেন?
উ-না।
প্র-আপনি জাতীয় সঙ্গীত মুখস্ত বলতে পারবেন?
উ-না।
প্র-আপনি 'সুরা' জানেন?
উ-জানি। নামাজ পড়ার সময় পড়তে হয়।
এরপর কৌসুলী জনাব বদরুল হায়দার চৌধুরী সাক্ষীকে জেরা করেন।

বদরুল হায়দার চৌধুরী

প্র-আপনি কি পুলিশকে জানিয়েছেন যে, সার্জেন্ট রাজ্জাক বৈঠকে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সামাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না?

উ-হ্যাঁ, বলেছিলাম।

এরপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুল মালেক সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দীন আহমদকে জেরা করতে শুরু করেন।

আবদুল মালেক

কৌসুলীর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, আর্ম্মী বলতে আমি বিমানবাহিনীকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করি না।

প্র-আপনি কি এই মামলার অভিযোগের বিবরণ ও সাক্ষীদের নাম সংবাদপত্রে দেখেছেন?

উ-জী না। আমি তা দেখি নাই।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সার্জেন্ট শামসুদ্দীন আহমদ বলেন যে, একথা সত্য নয় যে, তিনি সংবাদপত্রে মামলার সাক্ষীদের নাম পাঠ করেছেন। কারণ তখন আমি সংবাদপত্র পেতাম না।

প্র-আপনি কি কোন সংবাদপত্রে আপনার ও স্কোয়াড্রন লিডার এম হোসেন চৌধুরীর নাম সাক্ষীদের তালিকায় দেখেছেন?

উ-এটা আমার স্মরণ নেই। এছাড়া স্কোয়াড্রন লিডার এম হোসেন চৌধুরীর নাম সংবাদপত্রে দেখেছি বলেও আমার স্মরণ নেই।

প্র-আপনি কি সংবাদপত্রে আপনার গত বৃহস্পতিবারে জেরার বিবরণ পাঠ করেছেন?

উ-জী না।

প্র-ভিআইপি হাউসে নেওয়ার পর আপনার ছবি তোলা হয়েছিল?

উ-১৯৬৭ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ভিআইপি হাউসে নেয়ার পর আমার কোন ছবি তোলা হয়নি। তবে যখন পাঞ্জাব ব্যারাকে ছিলাম তখন আমার ফটো নেয়া হয়েছিল।

এই পর্যায়ে জনাব আবদুল মালেকের জেরা সমাপ্ত হয় এবং বিবাদীপক্ষের আর একজন কৌসুলী জনাব জুলমত আলী খান সাক্ষীকে জেরা করেন।

জুলমত আলী খান

প্র-আপনার পিতা কি ১৯৬৫-৬৬ সালে আপনার নিকট কিছু জমি বিক্রয় করেছিলেন?

উ-জী না। আমার পিতা আমার নামে কিছু সম্পত্তি হস্তান্তর করেছিলেন।

প্র-আপনারা কয় ভাই?

উ-তিন ভাইয়ের মধ্যে আমি সকলের বড়। আমরা একান্নভুক্ত পরিবার।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, কেনা-বেচার পদ্ধতিতে তার পিতা তার নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করেছিলেন।

প্র-এটা কি সত্য যে, আপনার ভাইদের বঞ্চিত করে আপনি আপনার পিতার থেকে সম্পত্তি নিয়েছিলেন?

উ-জী না। একথা সত্য নয়।

প্র-আপনি কি চেয়ারম্যান নূরুদ্দীনকে চেনেন?

উ- আমি তার নাম শুনেছি।

প্র-তার সাথে আপনার কি কখনও সাক্ষাৎ হয়েছিল?

উ-বছর পনের আগে এক বিয়ের মজলিসে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

প্র-সর্বশেষ কখন আপনি আপনার ময়মনসিংহের বাড়ীতে গিয়েছিলেন?

উ-১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথমদিকে আমি গ্রামের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তখন জনাব নূরুদ্দীন খান দহুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বলে আমি জানতে পেরেছি।

প্র-আপনার অপর দু'ভাইয়ের নাম কি?

উ-নূরুদ্দীন ও মঈনুদ্দীন।

প্র-জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে আপনার ভাইদের উদ্যোগে কোন সালিস হয়েছিল কি? এবং সেই সালিসে আপনার পরিবারের অন্যান্যদের নিকট পুনরায় সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার জন্যে আপনাকে কি বলা হয়েছিল?

উ-জী না। এই ধরনের কোন সালিস হয় নাই এবং আমাকে অনুরূপ কোন কথা বলা হয় নাই।

প্র-আপনি কি কম্পিউটার সেকশন চেনেন?

উ-জী হ্যাঁ।

প্র-কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম কি সে সেকশনে চাকুরী করতেন?

উ-সামরিক নিরাপত্তার খাতিরে আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না।

প্র-কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম ১৯৬৭ সালে কোথায় চাকুরী করতেন?

যে, বিমানবাহিনীর পোশাক পরা অবস্থায়ও অন্য কোন ইউনিটের কর্মচারী রেকর্ড রুমে যেতে পারেন না।

প্র-ম্যাজিস্ট্রেট যেদিন আপনার জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন সেদিন কি অন্য কোন আসামীর জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়েছিল?

উ-জী না। আমি তা জানি না।

প্র-আপনি কখন ভিআইপি হাউস ত্যাগ করেন?

উ-বিকেল একটার পরে এবং দুটার আগে।

প্র-আপনার জবানবন্দী রেকর্ড করার আগে ম্যাজিস্ট্রেট আপনাকে কি কোন প্রশ্ন করেছিলেন?
উ-জী হ্যাঁ। তিনি আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। তবে তিনি এই মামলা সম্পর্কে আমাকে কোন প্রশ্ন করেন নাই।
এরপর বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব ফজলুল করিম সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন।
প্র-আপনি কি রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়েছেন?
উ-জী না। আমি কখনও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ি নাই।
প্র-আপনি কি এই উপমহাদেশের ইতিহাস জানেন?
উ-জী হ্যাঁ, আমি এই উপমহাদেশের ইতিহাসের কিছু কিছু জানি।
প্র-আন্দোলনে যোগদানের পূর্বে আপনি কি এর সব বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছিলেন?
উ-জী হ্যাঁ। করেছিলাম।
প্র-আপনাদের উদ্দেশ্য হাসেলের জন্যে অন্য কোন পন্থার কথা কি আপনি চিন্তা করেছিলেন?
উ-জী না। উদ্দেশ্য হাসেলের বিকল্প কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি চিন্তা করি নাই।
প্র-অভিযুক্ত বিএলএ'তে যোগ দেয়ার আগে দুই অর্থনীতি ও দেশরক্ষা ব্যবস্থা সম্বলিত ফেডারেশনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের দাবী আদায় সম্ভব এটা কি আপনি চিন্তা করেছিলেন?
উ-জী না।
এক প্রশ্নের জবাবে একরারী সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দীন বলেন যে, সার্জেন্ট জলিলের বাসায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ভারত থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের কথা বললে তিনি খুশী হন।
এতদ সম্পর্কিত অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, ভারতের সাথে যুদ্ধ করা–আর ভারতের অস্ত্র দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।
অতঃপর বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব ভিখারুল ইসলাম চৌধুরী সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র-১৯৬৭ সালের মে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আপনি কখন যোগ দিয়েছিলেন?
উ-লেঃ রহমানের বাসায় আমি পৌঁছলে পরেই বৈঠকের কাজ শুরু হয়।
প্র-কারসাজের বৈঠকের সময় আপনি কি সার্জেন্ট মফিজুল্লার বাড়ীতে অপেক্ষা করেছিলেন?
উ-জী হ্যাঁ। অল্প কিছুক্ষণের জন্যে আমি সেখানে অপেক্ষা করেছিলাম।

প্র-আপনি কি সেখানে দুপুরের খাওয়া খেয়েছিলেন?
উ-জী না। এর আগেই আমি দুপুরের খাওয়া শেষ করেছি।
প্র-আপনার অফিস থেকে বাসা কতদূর?
উ-দু'মাইল।
প্র-আপনি কিসে চড়ে বাসায় গিয়েছিলেন?
উ-অফিসের গাড়ীতে।
প্র-যে শিল্প এলাকায় মাহবুবউদ্দীন কাজ করত সেখান থেকে আপনার অফিসের দূরত্ব কত?
উ-তিন মাইল।
প্র-বৈঠকের দিন আপনার অফিস ক'টায় বন্ধ হয়েছিল?
উ-তা আমি বলতে পারব না। তবে সাধারণত বিকেল ২টায় অফিস বন্ধ হয়।
প্র-লেঃ রহমানের বাসায় অনুষ্ঠিত বৈঠক কখন অনুষ্ঠিত হয়?
উ-সঠিক সময় আমার মনে নেই।
তবে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
প্র-মাহবুবউদ্দিন যে শিল্প এলাকায় কাজ করত সেখান থেকে কারসাজ কত ঘণ্টার পথ?
উ-আধা ঘণ্টার।
এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, বিকেল ২টা ও ৩টার মধ্যে আমি মাহবুবউদ্দিনকে শিল্প এলাকা থেকে তুলে নেইনি–একথা সত্য নয়। আমি নাজিমাবাদ রোড হয়ে কারসাজের মিটিং-এ গিয়েছিলাম একথাও সত্য নয়।
প্র-মিলের কাজ কখন বন্ধ হয় আপনি কি জানেন?
উ-জী না।
প্র-এই মিলের মালিক কি কোন বিদেশী?
উ-তা আমার জানা নেই।
প্র-সার্জেন্ট মফিজউল্লাহর ঘরের বারান্দার বেষ্টনী কি কাঠের?
উ-বারান্দার বেষ্টনী কাঠের কিনা তা আমি জানি না। তবে তাঁর ঘরের বারান্দায় আবেষ্টনী আছে।
জনাব ভি আই চৌধুরীর জেরা শেষ হলে বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব এইচ, কে, আবদুল হাই একরারী সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র-আটক রাখার সময় থেকে স্বীকারোক্তি করার আগ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর কতজন অফিসার আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন?
উ-দু'তিনজন সেনাবাহিনীর অফিসার আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন।
প্র-তাঁরা সবাই কি অবাঙ্গালী?
উ-তাঁরা সবাই নন ইস্ট পাকিস্তানী।

প্র-স্বীকারোক্তি করার সিদ্ধান্তের পর প্রথম কার সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল?
উ-লেঃ শরীফের সাথে।
প্র-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তির আগে আপনাকে ক্ষমা করা হবে বলে আপনি কি আশা করেছিলেন?
উ-জী না। স্বীকারোক্তির আগে আমি তা আশা করিনি।
প্র-স্বীকারোক্তির জন্যে আপনি কি কোন পুরস্কারের আশা করেছিলেন?
উ-জী না।

জেরার এই পর্যায়ে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান একরারী সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদের গ্রেফতার সম্পর্কিত একটি বিতর্কের অবতারণা করে আদালতের নিকট বলেন যে, একরারী সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদের গ্রেফতার সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। সাক্ষী আদালতে বলে আসছেন যে, তাঁকে গ্রেফতার করা হয় নাই। ১৯৬৭ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তাঁকে ভিআইপি হাউসে আনা হয় এবং তখন থেকে তিনি আটক আছেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দীতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস এ রহমান তখন এ ব্যাপারে সাক্ষীকে জেরা করার জন্যে বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের নির্দেশ দিলে জনাব এইচ কে আবদুল হাই তাকে জেরা করেন।
প্র-আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে?
উ-এ কথা আমার স্মরণ নেই।
প্র-১৯৬৭ সালের ২৯শে ডিসেম্বর আপনাকে কি গ্রেফতার করা হয়েছিল?
উ-আমাকে ২৯শে ডিসেম্বর গ্রেফতার করা হয়েছিল কিনা আমি জানি না।
প্র-এই মামলার ব্যাপারে আপনাকে কি আদৌ গ্রেফতার করা হয়েছিল?
উ-এই মামলার ব্যাপারে আমাকে কখনও গ্রেফতার করা হয়েছে কিনা তা আমার স্মরণ নেই।

একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান

এই পর্যায়ে একরারী সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদের জেরা সমাপ্ত হয় এবং বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদেরের পরিচালনায় একরারী সাক্ষী চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ডাঃ সাইদুর রহমান চৌধুরীর সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়।

আদালতে শপথ গ্রহণের পর ডাঃ সাইদুর রহমান চৌধুরী বলেন যে, তাঁর নাম সাইদুর রহমান চৌধুরী। তাঁর পিতা মৃত মওলবী আবুল খায়ের চৌধুরী। চট্টগ্রামের রফিউদ্দিন সিদ্দিকী লেনে তাঁর বাড়ী।

তিনি বলেন যে, তিনি এই মামলার অন্যতম আসামী মানিক চৌধুরীকে চিনেন। এই পর্যায়ে তিনি কাঠগড়ায় সঠিকভাবে মানিক চৌধুরীকে সনাক্ত করেন।

অতঃপর একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান আদালতে বলেন যে, তিনি ১৯৬৬-৬৭ সালে চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। এই সময়ে মিঃ মানিক চৌধুরী চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ও মানিক চৌধুরীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হত। এছাড়া তাঁরা এইসব দাবী-দাওয়া আদায়ের সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কেও আলোচনা করতেন। এই পর্যায়ে জনাব মঞ্জুর কাদেরের এক প্রশ্নের জবাবে ডাঃ সাইদুর রহমান চৌধুরী বলেন যে, ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মানিক চৌধুরীর সাথে তাঁর অনুরূপ এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সেই আলোচনায় মিঃ মানিক চৌধুরী বলেছিলেন যে, সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের দাবী এখনও পূরণ করা হয় নাই। মিঃ মানিক চৌধুরী তাকে আরও বলেছিলেন যে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দাবী আদায় ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই দাবী আদায়ের জন্য আমাদেরকে অনিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

আদালতে সাক্ষ্যদানকালে ডাঃ সাইদুর রহমান চৌধুরী বলেন যে, তিনি মিঃ মানিক চৌধুরীকে অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রাদেশিক শাসন ক্ষমতা দখল করতে হবে। এছাড়া সেনাবাহিনীর কর্মচারীরা পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনের সপক্ষে আছেন এতে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হবে এবং দাবী অবশ্যই পূরণ করা সম্ভব হবে।

একরারী সাক্ষী আরও বলেন যে, সেনাবাহিনীর কর্মচারীদের সাথে তাঁর পরিচয় আছে কিনা জিজ্ঞেস করা হলে মিঃ মানিক চৌধুরী সেনাবাহিনীর একজন কর্মচারীর সাথে সাক্ষীকে পরিচয় করিয়ে দিবেন বলে আশ্বাস দেন।

ডাঃ সাইদুর রহমান চৌধুরী বলেন যে, এরপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় মিঃ মানিক চৌধুরী এক ভদ্রলোককে নিয়ে আমার চট্টগ্রামস্থ ডিসপেনসারীতে আসেন। আগন্তুক ভদ্রলোক পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর এবং তাঁর নাম স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান বলে মিঃ মানিক চৌধুরী তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। মিঃ মানিক চৌধুরী আরও বলেছিলেন যে, স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমানের সাথে শেখ মজিবুর রহমানের পরিচয় আছে।

এই সময় একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান আসামীর কাঠগড়ায় স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমানকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

সাক্ষী বলেন যে, এরপর স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান তাঁদের বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্যে তাঁকে (সাক্ষীকে) একটি জায়গা ঠিক করে দেওয়ার এবং এ ব্যাপারে সাহায্য করার অনুরোধ করেন। সাক্ষী এ ব্যাপারে পরে স্টুয়ার্ড

মজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করবে বলে জানালে স্টুয়ার্ড মজিব সেখান থেকে প্রস্থান করেন।

এ পর্যায়ে বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের প্রশ্ন করেন। এরপর ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর সাথে কি আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল?

ডাঃ সাইদুর রহমান চৌধুরী বলেন যে, জী হ্যাঁ। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান পুনরায় তার নিকট আসেন এবং জানান যে, বিপ্লবী দলের নেতা ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম এসেছেন এবং মিসকা হোটেলে অবস্থান করছেন। বিপ্লবী দলের নেতার সাথে দেখা করার জন্যে তিনি সাক্ষীকে অনুরোধ করেন। তাঁর কথামত সাক্ষী হোটেল মিসকায় যান এবং সেখানে স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান, মিঃ মানিক চৌধুরী, মিঃ বিধান কৃষ্ণ সেন ও অপর ৩ ব্যক্তিকে দেখতে পান। স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান সাক্ষীর নিকট অপর ৩ ব্যক্তিকে জনাব আমির হোসেন মিয়া, এল এস সুলতানউদ্দীন আহমদ ও এ বি খুরশীদ বলে পরিচয় করিয়ে দেন।

সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান চৌধুরী আসামীর কাঠগড়ায় এল এস সুলতানউদ্দীন আহমদ ও এ বি খুরশীদকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

অতঃপর তিনি বলেন যে, সে সভায় জনাব আমির হোসেন তাঁকে (সাক্ষীকে) দলের বৈঠকের জন্যে জায়গা করে দিতে অনুরোধ করেন। সাক্ষী তখন সেনাবাহিনীর কর্মচারীরা আন্দোলনের সাথে আছে কিনা জিজ্ঞেস করলে আমির হোসেন মিয়া সাক্ষীকে জানান যে, কখনও ঢাকা গেলে সেনাবাহিনীর লোকদের উপর তাঁর (আমির হোসেন মিয়ার) কি পরিমাণ প্রভাব আছে তা দেখতে পাবেন। এরপর আমির হোসেন মিয়া ডাঃ সাইদুর রহমান চৌধুরীকে তাঁর ঢাকার ঠিকানা প্রদান করেন।

ডাঃ সাইদুর রহমান তাঁর সাক্ষ্যে আরও বলেন যে, সেই একই বৈঠকে জনাব আমির হোসেন মিয়া মিঃ মানিক চৌধুরীকে আন্দোলনের জন্য তিন হাজার টাকা দিতে বলেন। মানিক চৌধুরী এতে সম্মত হয়। সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তাদের সাহায্য করার জন্যে শেখ মজিবুর রহমান মিঃ মানিক চৌধুরীকে অনুরোধ করেছেন বলেও জানান হয়।

সাক্ষী বলেন যে, এরপর ১৯৬৬ সালের মে মাসে চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে আওয়ামী লীগের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মজিবুর রহমান সে সভায় বক্তৃতা করেন।

এই পর্যায়ে সাক্ষী শেখ মজিবুর রহমানকে সনাক্ত করেন।

তিনি বলেন যে, সেই রাত্রে অথবা পর রাত্রে শেখ মজিবুর রহমান তার বাসভবনে গমন করেন। স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান আগেই সাক্ষীর বাসায় ছিলেন। পূর্বেই মিঃ মানিক চৌধুরী ও স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান সাক্ষীর

বাসভবনে শেখ মজিবুর রহমানের বৈঠকের কথা সাক্ষীকে বলেছিলেন। সেখানে স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান শেখ মজিবুর রহমানকে গোপনে কিছু বলেন। এরপর শেখ মজিবুর রহমান সামরিক বাহিনীর লোকদের বৈঠক অনুষ্ঠানে সাহায্য ও আন্দোলনে সাহায্য করার জন্যে আমাকে অনুরোধ করে চলে আসেন। জনাব মঞ্জুর কাদের তখন সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন– আপনি ঢাকা এসেছিলেন?

একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান তখন বলেন যে, সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের ২৩ শে এপ্রিল আমি ঢাকা এসেছিলাম এবং গ্রীন হোটেলে অবস্থান করেছিলাম।

সাক্ষ্য গ্রহণের এই পর্যায়ে বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের একরারী সাক্ষীর হাতে গ্রীন হোটেলের রেজিস্টার বই দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনি এই বইয়ের ১১৭ পৃষ্ঠায় কি দেখতে পাচ্ছেন?

সাক্ষী এর উত্তরে বলেন যে, এই রেজিস্টারে ১৯৬৬ সালের ২৪শে এপ্রিল তাঁর গ্রীন হোটেলে থাকার কথা উল্লেখ আছে। তবে রেজিস্টার বইয়ে তাঁর হোটেল ত্যাগের দিন-তারিখ উল্লেখ নেই। এছাড়া আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত 'কলামে' কিছু লেখা নেই।

সাক্ষী বলেন যে, গ্রীন হোটেলের রেজিস্টারে মিঃ বি কে সেনের হস্তাক্ষরে তাঁর নাম লেখা আছে। আমার নামের আগের ঘরে লেখা আছে মিঃ বি কে সেন এন্ড পার্টি। পরে পার্টি শব্দ কেটে আমার নাম লেখা হয়। হাতের লেখা দেখে তিনি চিনতে পেরেছেন যে, এটা মিঃ বি কে সেনের হাতের লেখা।

জনাব মঞ্জুর কাদেরের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, গ্রীন হোটেলে আসামী মিঃ বি কে সেনের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষী তাঁর নিজস্ব কাজে ঢাকা এসেছিলেন। তবে সাক্ষাতের পর তারা উভয়ে একই হোটেলে অবস্থান করেন।

এই পর্যায়ে এ দিনের সাক্ষ্য গ্রহণ অসমাপ্ত থাকে।

সংবাদ

২৭ শে আগস্ট ১৯৬৮

রাজসাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমানের জবানবন্দীর পূর্ণ বিবরণ

গতকল্য (সোমবার) কুর্মিটোলায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্যের ষড়যন্ত্র মামলার ৫নং সরকারী সাক্ষী এবং ৪নং রাজসাক্ষী ডাঃ সাঈদুর রহমান চৌধুরীর সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হয়।

বিচারপতি জনাব এম,এ রহমানের সভাপতিত্বে গঠিত তিন সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ ট্রাইব্যুনালে পূর্বাহ্নে গত শুক্রবারে ৫নং সরকারী সাক্ষী এবং ৪নং

রাজসাক্ষী ডাঃ সাঈদুর রহমানের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয় এবং আজ বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি উক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত করেন।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলির নিকট জবানবন্দীদানকালে সাক্ষী বলেন, ২৪শে এপ্রিল মিঃ বি, কে, সেন যখন হোটেল রেজিষ্টারে নাম এন্ট্রি করিতেছিলেন তিনি (সাক্ষী) তখন হোটেল গ্রীনে তাহার রুমে মালপত্র রাখিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বলেন, ঐ একই দিনে তিনি ও মিঃ বি, কে, সেন পুরাতন ঢাকায় মিঃ আমীর হোসেন মিয়ার বাসভবনে গিয়াছিলেন। সাক্ষী বলেন, সামরিক বাহিনীর লোকজনের উপর মিঃ আমীর হোসেন সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের একজন জয়েন্ট সেক্রেটারীর নেতৃত্বে উক্ত বোর্ড গঠন করা হইবে।

প্রস্তাবিত বোর্ড গঠনের অগ্রগতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন যে, এতদ্বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে এবং পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করা হইতেছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন যে, উক্ত বোর্ডের সদর দফতর নীতিগতভাবে পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপিত হওয়া উচিত।

মিয়ার প্রভাব কতখানি রহিয়াছে তাহা জানার জন্যই তাঁহারা পুরাতন ঢাকায় মিঃ আমির হোসেন মিয়ার বাসভবনে গিয়াছিলেন।

সাক্ষী বলেন, সেখানে পৌঁছিলে মিঃ আমীর হোসেন মিয়া তাঁহাদের জানান যে, তিনি তাঁহাদের জয়দেবপুরে লইয়া যাইবেন! তিনি বলেন, আমীর হোসেন মিয়া তাঁহার কথামত তাঁহাদের হোটেলে পরের দিনে আসেন এবং তাঁহাদের জয়দেবপুরে লইয়া যান। তিনি বলেন, জয়দেবপুরের রাজবাড়ীর পথে তাহাদের একটি কক্ষে লইয়া যাওয়া হয়।

সেই কক্ষে তাহারা ইউনিফরম পরিহিত দুই-তিনজনকে এবং অসামরিক পোশাক পরিহিত তিন-চারজনকে দেখিতে পান। তিনি বলেন, আমীর হোসেন মিয়া ঐ সকল ব্যক্তিদের সহিত তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিয়া বলেন যে, তাঁহারা তাহার (আমীর হোসেন মিয়ার) বন্ধু। সাক্ষী বলেন যে, সেই কক্ষে তাহারা মাত্র ১০/১৫ মিনিট ছিলেন।

রাজসাক্ষী ডঃ সাইদুর রহমান তাহার জবানবন্দীতে আরও বলেন যে, গত ১৯৬৬ সালের মে মাসের কোন এক সন্ধ্যায় ষ্টুয়ার্ড মুজিব ও মানিক চৌধুরী তাহার নিকট আসেন এবং সামরিক লোকজনের বৈঠকের জন্য একটি স্থানের ব্যবস্থা করিতে বলেন। তিনি বলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিব তাহাকে জানান যে, আন্দোলনের নেতা করাচী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। রাজসাক্ষী সাঈদুর রহমান বলেন যে ষ্টুয়ার্ড মুজিবরকে তিনি বলেন, তাহার বাহিরের ঘরে বৈঠক ত হইতে পারে! তিনি বলেন, তাহার বাহিরের ঘরে তাহার যে দুই ভাই থাকে বৈঠকের সময় তাহারা বাহিরে চলিয়া যাইবে।

সাক্ষী বলেন, ইহার পর বৈঠকের জন্য একটি তারিখ ধার্য করা হয়। তিনি বলেন যে, তাহার যতদূর মনে পড়ে ইহার দুই অথবা তিনদিন পর উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ষ্টুয়ার্ড মুজিব, সার্জেন্ট এল এস সুলতানুদ্দীন আহমদ, এ বি খুরশীদ, মানিক চৌধুরী ও আরও একজন ভদ্রলোক যাহাকে পরবর্তীকালে তাহার নিকট লেঃ মুয়াজ্জেম বলিয়া পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, বৈঠক শুরু হওয়ার আগে লেঃ মুয়াজ্জেম তাহাকে ও মানিক চৌধুরীকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলেন। তিনি বলেন, তিনি ও মানিক চৌধুরী যেহেতু অসামরিক ব্যক্তি ছিলেন সেই কারণেই তাহাদের বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলা হয় এবং উহারা সামরিক বিষয়ে আলোচনা করিবেন বলিয়া তাহাদের জানান। সাক্ষী বলেন, তিনি ও মানিক চৌধুরী বাহিরে অপেক্ষা করিতে থাকেন এবং অন্যরা সকলেই ভিতরে যান।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সালের ৮ই অথবা ৯ই মে শেখ মুজিবর রহমান গ্রেফতার হন। তাহার আটকের পর ঢাকায় আওয়ামী লীগের এক জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন, সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের ২০শে মে তারিখে ঢাকায় আওয়ামী লীগের উক্ত জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে আরও বলেন, তিনি ১৯৬৬ সালের ১৯শে মে তারিখে ঢাকায় আসেন এবং আরজু হোটেলে অবস্থান করেনত। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের উক্ত জরুরী বৈঠকে যোগদানের জন্য মানিক চৌধুরী আগেই ঢাকায় আসিয়া হোটেল গ্রীনে অবস্থান করিতেছিলেন।

সাক্ষী সাঈদুর রহমান তাহার জবানবন্দীতে বলেন, ২০শে মে বেলা সাড়ে দশটার সময় তাহারা হোটেল ত্যাগ করেন এবং হোটেল গ্রীনে মানিক চৌধুরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহার পর তাহারা একসঙ্গে পুরান পলটনে আওয়ামী লীগের অফিসের পথে বাহির হন কিন্তু পথিমধ্যে মানিক চৌধুরী তাহাকে বলেন যে, মিঃ বি কে সেনের স্ত্রীর জাতীয়তা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তাহাকে ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনে যাইতে হইবে। সাক্ষী বলেন যে, মানিক চৌধুরী তাহাকে তাহার সহিত ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাহার পর তাহারা উভয়ে তথায় পৌঁছিলে মানিক চৌধুরী ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের ফার্ষ্ট সেক্রেটারী মিঃ পি, এন ওঝার নিকট ভিজিটিং স্লিপ পাঠান এবং ইহার অল্পক্ষণ পরেই ফার্ষ্ট সেক্রেটারী মিঃ ওঝা তাহাদের ডাকেন! সাক্ষী আরও জানান যে, মানিক চৌধুরী মিঃ ওঝার সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দেন। তিনি বলেন, ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের স্লিপে সেক্রেটারী মিঃ পি, এন, ওঝা তখন একটি স্লিপে তাহার (সাক্ষীর) নাম ও ঠিকানা নোট করেন। মানিক চৌধুরী মিঃ ওঝার নিকট বি, কে সেনের জাতীয়তা পরিবর্ত্তনের বিষয়ে বলেন। ইহার পর মিঃ

ওঝা সাক্ষীকে পরে কোন একসময় দেখা করার জন্য অনুরোধ করেন। সাক্ষী বলেন যে, মিঃ ওঝার কাছ হইতে তিনি বাহির হন কিন্তু মানিক চৌধুরী আরও কিছু সময় থাকিয়া যান। (অসমাপ্ত)

দৈনিক পাকিস্তান

২৭শে আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

পি এন ওঝা জানান, ইন্দিরা গান্ধীর সরকার অস্ত্র সরবরাহে স্বীকৃত হয়েছেনঃ

ডাঃ সাইদুর রহমানের সাক্ষ্য

(স্টাফ রিপোর্টার)

দুইদিন সপ্তাহ প্রান্তিক বিরতির পর পুনরায় গতকাল সোমবার "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার" শুনানী শুরু হয়। এইদিন বাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মনজুর কাদির কর্তৃক মামলার ৪নং একরারী সাক্ষী চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ডাঃ সাইদুর রহমানের জবানবন্দী গ্রহণের পর বিবাদীপক্ষের কৌসুলীগণ জেরা শুরু করেন।

এইদিন সাক্ষী তার জবানবন্দীতে ভারতীয় দূতাবাসের মিঃ ওঝার সাথে বৈঠকের বিবরণী দেন।

এইদিন প্রথমে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী খান বাহাদুর নাজিরুদ্দীন ও পরে জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীর জেরা করেন।

ডাঃ সাইদুর রহমানের সাক্ষ্য

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন যে, সাক্ষী গত শুক্রবার তার সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে, তিনি এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা এসে হোটেল গ্রীনে উঠেছিলেন। কিন্তু, তিনি নিজের হাতে হোটেলের রেজিস্টারে কেন নাম ওঠালেন না?

উ-আমি হোটেলে পৌঁছেই নিজের রুমে মালপত্র রাখার জন্য চলে যাই। সেসময় বিধান কৃষ্ণ সেন আমার নাম...

প্র-তারপর আপনি কি করলেন?

উ-সেদিন সন্ধ্যায় আমরা আমির হোসেন মিয়ার সঙ্গে দেখা করার জন্য তার বাসাই যাই। সামরিক কর্মচারীদের উপর তার প্রভাব কতখানি রয়েছে সেটা পরীক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমির হোসেন আমাদের জয়দেবপুর নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। পরদিন তিনি আমাকে ও বিধান কৃষ্ণ সেনকে নিয়ে জয়দেবপুরে যান। জয়দেবপুরে বা রাজবাড়ীতে যাওয়ার পথের পাশের একটি ছোট ঘরের মধ্যে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়।

প্র-সেখানে আর কেউ ছিলেন?

উ- আরো ইউনিফরম পরা ২/৩ জন লোক ও বেসামরিক কাপড় পরা ৩/৪ জন ছিল। আমির হোসেন মিয়া আমাকে ও বিধান কৃষ্ণ সেনকে তাঁর বন্ধু বলে পরিচয় করিয়ে দেয়।

প্র-ওখানে কতক্ষণ ছিলেন?

উ-১০/১৫ মিনিট ছিলাম।

প্র-ওখানে আর কি করলেন?

উ-ওখানে আমাদের চা খাওয়ানো হয়। কাছাকাছি একটা দোকান থেকে এই চা আনা হয়।

জনাব মঞ্জুর কাদেরের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানান যে, ১৯৬৬ সালের মে মাসে একদিন সন্ধ্যায় স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান মানিক চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে এসে সামরিক ব্যক্তিদের বৈঠকের জন্য একটা জায়গার ব্যবস্থা করতে বলে। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান সাক্ষীকে বলেন যে, দলের প্রধান নেতা করাচী থেকে এসেছেন এবং তিনিও এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন। সাক্ষী তখন এই বৈঠকের জন্য তাঁর বৈঠকখানা ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বৈঠকখানায় তার দুটি ছোট ভাই থাকে। সুতরাং বৈঠকটি সন্ধ্যার দিকে করতে হবে, কারণ সেসময় তার ভাই দু'জন সেখানে থাকবে না। বৈঠকটির তারিখ সাক্ষীর ঠিক মনে নেই, তবে এই কথাবার্তা যেদিন হয়, তার ২/৩ দিনের মধ্যেই হবে।

প্র-বৈঠকে কে কে উপস্থিত ছিল?

উ-স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, লিডিং সীম্যান (এল এস) সুলতানউদ্দীন, মানিক চৌধুরী, এ বি খুরশীদ, আমি এবং অপর একজন অপরিচিত ব্যক্তি সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। পরে এই অপরিচিত ব্যক্তিকে সুলতানউদ্দীন লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম বলে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

প্র-তারপর কি হয়?

উ-বৈঠক শুরুর আগে লেঃ মোয়াজ্জম আমাকে ও মানিক চৌধুরীকে ঘরের বাইরে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

প্র-কেন?

উ-আমি সে কথা জিজ্ঞেস করাতে লেঃ মোয়াজ্জেম আমাদের জানান, যেহেতু আমরা বেসামরিক ব্যক্তি এবং তিনি সামরিক বিষয়ে আলোচনা করতে চান, সেজন্য আমাদের থাকা যাবে না।

প্র-কতক্ষণ তারা আপনার বৈঠকখানায় ছিলেন?

উ-প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তারা চলে আসেন।

প্র-আপনারা কেউ বৈঠকে ছিলেন?

উ-না। আমি বা মানিক চৌধুরী বৈঠকে ছিলাম না।

প্র-শেখ মুজিবর রহমান কবে গ্রেফতার হন জানেন?
উ-আমার যতদূর মনে পড়ে ১৯৬৬ সালের ৮ই বা ৯ই মে। শেখ মুজিবের গ্রেফতারের পর শেখ মুজিবের বাসভবনে সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের ২০শে মে আওয়ামী লীগের একটি জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
প্র-আপনি বৈঠকে যোগদান করেন?
উ-হ্যাঁ, বৈঠকে যোগদানের জন্য আমি ১৯শে মে ঢাকা আগমন করি এবং হোটেল আরজুতে উঠি। মানিক চৌধুরীও বৈঠকে যোগদানের জন্য ঢাকা আসেন, তবে তিনি হোটেল গ্রীনে ওঠেন।
প্র-এরপর আপনি কি করেন?
উ-পরদিন সকাল আনুমানিক সাড়ে ১০টায় আমি হোটেল গ্রীনে মানিক চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে যাই। সেখান থেকে দু'জনে পুরানা পল্টনে আওয়ামী লীগের অফিসে যাওয়ার জন্য বের হই। পথে মানিক চৌধুরী আমাকে বলেন যে, বিধান কৃষ্ণ সেনের স্ত্রীর নাগরিকত্ব সম্পর্কে একটা কাজের জন্য ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার অফিসে যেতে হবে। তিনি আমাকেও সাথে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। পরে আমরা উভয়েই ভারতীয় হাই কমিশনের অফিসে গমন করি। ওখানে গিয়ে মানিক চৌধুরী ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী মিঃ পি এন ওঝার কাছে একটা চিরকুট পাঠান। চিরকুট পেয়েই মিঃ ওঝা তাকে ভেতরে যাওয়ার জন্য ডেকে পাঠান। মানিক চৌধুরী আমাকেও ভেতরে যেতে বলেন। তিনি আমাকে বন্ধু ও নিজস্ব লোক বলে মিঃ ওঝার কাছে পরিচয় করিয়ে দেন। আমি যে একজন চিকিৎসক, সে কথাও তাকে জানাই। সেসময় তিনি (মিঃ ওঝা) আমার ঠিকানা জিজ্ঞেস করেন এবং সেটা নোট করে রাখেন।
প্র-আপনারা ওখানে কি করেন?
উ-মানিক চৌধুরী মিঃ ওঝার সঙ্গে বিধান কৃষ্ণ সেনের স্ত্রীর নাগরিকত্ব পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করেন।
প্র-আপনারা ওখানে কতক্ষণ ছিলেন?
উ-অল্পক্ষণ পরেই চলে আসি। চলে আসার সময় মিঃ ওঝা আমাকে পরে দেখা করতে বলেন।
এরপর আমরা উভয়েই আওয়ামী লীগ অফিসে এসে উপস্থিত হই।
প্র-বৈঠকের পর কি করলেন?
উ-আওয়ামী লীগের বৈঠকের পরে চট্টগ্রাম ফিরে যাই। বৈঠকের দুটি অধিবেশন হয়। প্রথমটি সকালে ও দ্বিতীয়টি সন্ধ্যায়। মানিক চৌধুরী সকালের অধিবেশনের পর বিমানযোগে চট্টগ্রাম পৌঁছান। আমি দুটি বৈঠকে অংশগ্রহণ করি এবং পরদিন চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্তন করি।

প্র-মানিক চৌধুরী কবে গ্রেফতার হন জানেন?
উ-খুব সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের ২১শে মে– পাকিস্তান রক্ষা আইন বলে।
অপর এক প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী জানান যে, চট্টগ্রাম বদলী হয়ে এসে লেঃ মোয়াজ্জম প্রথমে নাসিরাবাদ হাউসিং সোসাইটিতে একটি বাড়ী ভাড়া করেছিলেন। সাক্ষী আরো বলেন যে, মানিক চৌধুরীর গ্রেফতারের পর তাঁর বাসভবনে বিপ্লবী দলের দুটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দুটি বৈঠকই সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয়।
প্র-প্রথম বৈঠকে কারা উপস্থিত ছিলেন?
উ-লেঃ মোয়াজ্জম, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, এল এস সুলতানউদ্দীন, এ বি খুরশীদ ও আমি নিজে।
প্র-দ্বিতীয় বৈঠকে কারা ছিলেন?
উ-প্রথম বৈঠকে যারা উপস্থিত ছিলেন, দ্বিতীয় বৈঠকেও তারা ছিলেন।
প্র-বৈঠকে কে কি বলেছিল?
উ-উভয় বৈঠকে মোটামুটি একই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা হয়। লেঃ মোয়াজ্জম দলীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে আলাপ করেন। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান দলীয় কর্মতৎপরতায় অগ্রগতি ও নতুন সদস্য সংগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাছাড়া, ক্ষমতা দখলের সম্ভাব্য পদ্ধতি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। লেঃ মোয়াজ্জম বলেন যে, সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতীত বর্তমান অবস্থায় স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। আমরা সবাই তাঁর কথায় সায় দেই।
প্র-লেঃ মোয়াজ্জম কবে ন্যাভাল কোয়ার্টারে যান?
উ-তিনি সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে সেখানে গমন করেন।
প্র-লেঃ মোয়াজ্জমের সঙ্গে কি এই সময়ে আপনার যোগাযোগ ছিল?
উ-আমি প্রায়ই তার নাসিরাবাদের বাসায় যেতাম। পরে তিনি ন্যাভাল কোয়ার্টারে চলে যাওয়ার পরে সেখানেও যেতাম।
প্র-কি বিষয়ে আলোচনা হতো?
উ-আমরা দলীয় সাংগঠনিক বিষয় ও অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করতাম।
প্র-সেখানে অন্য কারোর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হতো?
উ-কখনও স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, কখনও এ বি খুরশীদ, আবার কখনও এল এস সুলতানুদ্দীনের সঙ্গে দেখা হত।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলীর এক প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেম ও স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান মাঝে মাঝে তাঁর ডিসপেনসারী অথবা বাসায় যাতায়াত করতেন। তিনি জানান যে, ১৯৬৬ সালের জুন-জুলাই মাসে লেঃ মোয়াজ্জম সাক্ষীকে জানান যে, মানিক চৌধুরী লেঃ মোয়াজ্জমকে বলেছেন যে, অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা ভারতীয় দূতাবাসে পৌঁছে দেবেন। কিন্তু,

মানিক চৌধুরী গ্রেফতার হওয়ার ফলে সেটা আর সম্ভবপর হয়নি। এরপর মোয়াজ্জম তাঁকে (ডাঃ সাইদুর রহমানকে) অস্ত্রের তালিকাটি ভারতীয় দূতাবাসে মিঃ ওঝার কাছে পৌঁছানোর জন্য বলেন। কিন্তু, সাক্ষী তাকে জানান যে, তিনি একবারই মানিক চৌধুরীর সঙ্গে মিঃ ওঝার কাছে গিয়েছিলেন। এরপরেও লেঃ মোয়াজ্জম মিঃ ওঝার কাছে যাওয়ার জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করেন। তখন সাক্ষী লেঃ মোয়াজ্জমকে জানান যে, এখন অনেক লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে তাই এখন ভারতীয় দূতাবাসে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

সাক্ষী আরো জানান যে, ১৯৬৬ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে মিঃ ওঝা স্বয়ং চট্টগ্রামে তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির হন। মিঃ ওঝাকে দেখে তিনি (সাক্ষী) খুব অবাক হয়ে যান। মিঃ ওঝা তাঁকে মানিক চৌধুরীর গ্রেফতারের কথা বলেন। কি কথা তাঁর (সাক্ষীর) কাছে অনুরোধ করেন যে, বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি ভারতীয় হাইকমিশন অফিসে যাননি। তিনি সাক্ষীর কাছে মানিক চৌধুরীর পরিবারবর্গের কুশল জিজ্ঞেস করলে সাক্ষী জানান যে, তারা সকলই ভালো আছেন। তিনি (সাক্ষী) তখন মিঃ ওঝার হাতে লেঃ মোয়াজ্জমের অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা দেন। মিঃ ওঝা আশ্বাস দেন যে, এগুলি যত শীঘ্র সম্ভব ডেলিভারী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। মিঃ ওঝা পরের দিন চট্টগ্রাম রেলওয়ে রিফ্রেশমেন্ট রুমে দেখা করার জন্য বলেন। সাক্ষী বলেন যে, তিনি তারপরেই লেঃ মোয়াজ্জমকে এসব কথা জানিয়ে দেন। পরদিন সাক্ষী রেলওয়ে রিফ্রেশমেন্ট রুমে সন্ধ্যা ৭টায় গমন করেন। এই সময় মিঃ ওঝা লেঃ মোয়াজ্জমকে নিয়ে ঢাকায় আসার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। সেখানে এই অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। মিঃ ওঝা তাঁকে (সাক্ষীকে) পরামর্শ দেন যে, ঢাকায় তিনি যেন পাবলিক টেলিফোন থেকে তাঁর অফিসে সকাল ১০টার পরে ফোন করেন এবং বলেন যে, "সাইদ কথা বলছি, আমি পাসপোর্ট সম্পর্কে আলাপ করতে চায়।" তারপর শাকুরা রেস্টুরেন্ট-এর নিকটবর্তী রাজপথের আনুষ্ঠানিক তোরণের কাছে যেন রাত ৯টার সময় দাঁড়িয়ে থাকি। তিনি (মিঃ ওঝা) আমাদের পিক আপ করে নেবেন। মিঃ ওঝা একটা দিন ধার্য করেন। তারিখটা তাঁর (সাক্ষীর) ঠিক মনে নেই। তবে, ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসেই হবে।

সাক্ষী অতঃপর বলেন যে, তিনি লেঃ মোয়াজ্জমের সঙ্গে দেখা করে এসব কথা জানিয়ে দেন। আগস্ট মাসে তিনি, লেঃ মোয়াজ্জম ও স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানসহ ঢাকায় আগমন করেন।

প্র-আপনারা কিসে ঢাকা আগমন করেন?

উ-লেঃ মোয়াজ্জমের মোটরে।

প্র-সরাসরি ঢাকায় আসেন, না পথে থামেন?

উ-আমরা কুমিল্লার ক্যাপ্টেন এস আলমের বাসভবনে গিয়ে নামি।

প্র-আপনি কি ক্যাপ্টেন এস আলমকে চিনতেন?

উ-না। লেঃ মোয়াজ্জম বলেছিলেন যে, তিনি মেডিক্যাল রিক্রুটিং অফিসার।

প্র-তারপর কি হল?

উ-আমি এবং স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ক্যাপ্টেন আলমের ড্রইংরুমে বসেছিলাম আর লেঃ মোয়াজ্জম বারান্দায় দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন আলমের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

প্র-আপনি কি ক্যাপ্টেন আলমকে চিনতে পারবেন?

উ-না, আমি তাঁকে ইউনিফরম পরিহিত অবস্থায় মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য দেখেছি।

প্র-তারপর কি হল?

উ-তারপর আমরা সোজা ঢাকায় চলে যাই। লেঃ মোয়াজ্জম ধানমন্ডিতে ডাঃ খালেকের বাড়ীতে ওঠেন। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানও সম্ভবতঃ সেই বাড়ীতে ওঠেন।

প্র-তারপর আপনি কি করলেন?

উ-পরদিন আমি কথামত পাবলিক ফোন থেকে মিঃ ওঝাকে ফোন করি সকালে সাড়ে ১০ টার দিকে। সেইদিনই রাত নয়টায় আমি, লেঃ মোয়াজ্জম সাকুরা রেস্টুরেন্ট-এর নিকটবর্তী আনুষ্ঠানিক তোরণের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মিঃ ওঝা এসে তাঁর গাড়ীতে করে আমাদের তাঁর বাসায় নিয়ে যান।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদিরের অপর প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান বলেন যে, তিনি লেঃ মোয়াজ্জমকে মিঃ ওঝার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তখন মিঃ ওঝা লেঃ মোয়াজ্জমের সঙ্গে অস্ত্র সরবরাহের বিষয়টি আলোচনা করেন। তিনি (মিঃ ওঝা) লেঃ মোয়াজ্জমকে জানান যে, তাঁর সরকারের সমর্থনের জন্য তিনি অস্ত্রশস্ত্রের তালিকাটা ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। লেঃ মোয়াজ্জম তখন মিঃ ওঝাকে জানান যে, তাঁর অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও অর্থনৈতিক সাহায্য দরকার। মিঃ ওঝা তার জওয়াবে জানান যে, সেপ্টেম্বর যুদ্ধের পর টাকাপয়সা দেওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়েছে। তারপর মিঃ ওঝা লেঃ মোয়াজ্জমের কাছ থেকে সামরিক গোপন তথ্য জানতে চান, কিন্তু লেঃ মোয়াজ্জম তাতে আপত্তি জানিয়ে বলেন যে, তিনি এসব তথ্য জানাবেন না, কারণ তিনি গুপ্তচর নন। তিনি বলেন যে, তিনি (লেঃ মোয়াজ্জম) একটি মহান কাজের জন্য তাদের সাহায্য নিতে চাচ্ছেন। তখন মিঃ পি এন ওঝা লেঃ মোয়াজ্জমকে পার্শ্ববর্তী ঘরে নিয়ে যান

এবং বেশ কিছুক্ষণ সেখানে তারা থাকেন। এরপর মিঃ ওঝা তাকে (সাক্ষী) সেই ঘরে নিয়ে যান এবং আন্দোলনের বিস্তারিত খবর জানতে চান। সাক্ষী তখন তাকে জানান যে, লেঃ মোয়াজ্জমই এ ব্যাপারে তাকে ভাল খবর দিতে পারেন। ড্রইংরুমে লেঃ মোয়াজ্জম মিঃ ওঝাকে জিজ্ঞেস করেন যে, কবে নাগাদ অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ শুরু করা হবে।

মিঃ ওঝা তারপর সাক্ষীকে পরবর্তী বৈঠকে আগমনের জন্য আগের মত পিসিও থেকে ফোন করে "সাদেক কথা বলছি, পাসপোর্ট সম্পর্কে আলাপ করতে চাই" বলার পরামর্শ দেন। বৈঠকের পরে মিঃ পি এন ওঝা তাঁদের দ্বিতীয় রাজধানীর কাছে নামিয়ে দেন।

তিনি আরো জানান যে, ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মিঃ ওঝার সঙ্গে পুনরায় আর একবার বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকের তারিখটা তাঁর মনে নেই। তিনি ঢাকায় এসে হোটেল গ্রীনে ওঠেন এবং লেঃ মোয়াজ্জম ডাঃ খালেকের ধানমন্ডির বাসভবনে ওঠেন। পরদিন তিনি (সাক্ষী) যথারীতি সকাল ১০টায় পিসিও থেকে মিঃ ওঝাকে ফোন করেন এবং রাত ৯টায় সাকুরা রেস্টুরেন্টের নিকটবর্তী আনুষ্ঠানিক তোরণের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। মিঃ ওঝা এসে তাদের মোটরে করে উঠিয়ে নিয়ে যান। মিঃ ওঝা তাদের বলেন যে, তাঁর সরকার অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে স্বীকৃত হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, তিনি অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়ার জন্য তাঁর সরকারকে অনুরোধ করবেন।

তিনি (সাক্ষী) বলেন যে, এরপর মিঃ ওঝা লেঃ মোয়াজ্জমকে পাশের ঘরে নিয়ে আলাপ করেন এবং পরে আগের মত দ্বিতীয় রাজধানীর কাছে ছেড়ে দিয়ে যান। তিনি (সাক্ষী) লেঃ মোয়াজ্জমকে জিজ্ঞেস করেন যে, মিঃ ওঝার সঙ্গে কি আলোচনা করেন। জওয়াবে লেঃ মোয়াজ্জম জানান যে, মিঃ ওঝা তাঁর কাছ থেকে সামরিক গোপন তথ্য জানতে চান; কিন্তু তিনি তা জানাতে অস্বীকার করেছেন।

ডাঃ সাইদুর রহমান বলেন যে, মিঃ ওঝার সঙ্গে তাঁদের পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ সালের অক্টোবর-নবেম্বর মাসে। যথারীতি তিনি ঢাকায় এসে পিসিও থেকে মিঃ ওঝাকে ফোন করে বলেন যে, "সাদেক কথা বলছি, পাসপোর্ট সম্পর্কে আলাপ করতে চাই।" লেঃ মোয়াজ্জম গ্রীন হোটেলে এসে তাঁর (সাক্ষী) সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা তখন একত্রে নির্ধারিত সময়ে সাকুরা রেস্টুরেন্টের নিকটবর্তী আনুষ্ঠানিক তোরণের কাছে অপেক্ষা করেন এবং মিঃ ওঝা এসে উঠিয়ে নিয়ে যান। তখন মিঃ পি এন ওঝা জানান যে, ভারত সরকার সাধারণ নির্বাচন নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত, সেজন্য অস্ত্র সরবরাহের কোন নির্দিষ্ট তারিখ স্থির করা যায়নি। মিঃ ওঝা তাঁদের নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত

অপেক্ষা করতে বলেন। এরপর তিনি (ওঝা) লেঃ মোয়াজ্জমকে পাশের ঘরে নিয়ে আলাপ করেন এবং তারপর আগের মত দ্বিতীয় রাজধানীর কাছে নামিয়ে দিয়ে যান।

বাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী জানান যে, মানিক চৌধুরী ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে মুক্তিলাভ করেন। সে সময় লেঃ মোয়াজ্জম চট্টগ্রামেই পোস্টেড ছিলেন। সম্ভবতঃ মার্চ মাসে তিনি (লেঃ মোয়াজ্জম) বরিশালে বদলী হন। এই সময়ে মার্চ মাসে (তারিখটা মনে নেই) স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান তাঁর (সাক্ষী) কাছে এসে বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জম তাঁকে মানিক চৌধুরী ও তাঁর (সাক্ষী) কাছে পাঠিয়েছেন অস্ত্র সরবরাহের বিষয়টি চূড়ান্ত করে ফেলার জন্য।

এর দুই-তিনদিন পর তিনি মানিক চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করলে মানিক চৌধুরী জানান যে, তিনি (সাক্ষী), লেঃ মোয়াজ্জম ও মানিক চৌধুরী ঢাকায় ১০ই মার্চ হোটেলে সকাল ১০টায় মিলিত হবেন। তিনি (সাক্ষী) ট্রেনযোগে ৮ই মার্চ ঢাকা গমন করেন এবং হোটেল গ্রীনে অবস্থান করেন।

এই সময়ে সাক্ষীর হাতে হোটেল গ্রীনের রেজিস্ট্রার নিয়ে ১২৫ নম্বর পাতায় কি আছে পড়তে বলা হলে তিনি পাতায় তাঁর নাম (ক্রমিক নম্বর ২১৩৪) দেখছেন। নামটা তাঁর নিজের হাতে লেখা। তিনি আরো জানান যে, ক্রমিকনং ২১৩৫-এ মানিক চৌধুরীর নাম লেখা রয়েছে। এটা মানিক চৌধুরীর নিজের হাতে লেখা। তিনি জানান যে, মানিক চৌধুরী ৯ই মার্চ ঢাকায় বিমানযোগে আসেন ও হোটেল গ্রীনে এসে ওঠেন।

সেই দিন তিনি (সাক্ষী) হোটেলে বেলা ২টার সময় ফিরে এলে মানিক চৌধুরী জানান যে, পরদিন (১০ই মার্চ) পি এন ওঝার সঙ্গে দেখা করার তারিখ নির্দিষ্ট করেছেন। লেঃ মোয়াজ্জমও ঢাকায় এসেছেন বলে তিনি জানান। ১০ই মার্চ আগের মত তিনি (সাক্ষী) মানিক চৌধুরী ও লেঃ মোয়াজ্জম সাকুরা রেস্টুরেন্টের নিকটবর্তী আনুষ্ঠানিক তোরণের কাছে অপেক্ষা করার পর ওঝার তাঁদের পিক আপ করে নিয়ে যান। মিঃ ওঝা মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর ওঝা প্রথমে লেঃ মোয়াজ্জমকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে আলাপ করেন। পরে মানিক চৌধুরীকে সেখানে নিয়ে যান। মানিক চৌধুরী সে ঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসেন তখন তাঁকে কি একটা পকেটে ভরতে দেখা যায়। ড্রয়িংরুমে বসে আলাপ-আলোচনার সময়ে মিঃ ওঝা আন্দোলনের অগ্রগতি জানতে চান। লেঃ মোয়াজ্জম তাঁকে সব ব্যাখ্যা করেন। এরপর মিঃ ওঝা তাদের দ্বিতীয় রাজধানীর কাছে নামিয়ে দিয়ে যান।

সাক্ষী জানান যে, তিনি হোটেলে ফিরে গিয়ে মানিক চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি কি পকেটে পুরছিলেন। মানিক চৌধুরী জানান যে, মিঃ ওঝা তাঁকে ৫ হাজার টাকা দিয়েছেন। পরের দিন লেঃ মোয়াজ্জম মানিক চৌধুরীর কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে নেন। তিনি আরো জানান যে, ৩১শে মার্চ তিনি লেঃ মোয়াজ্জম ও মানিক চৌধুরী হোটেল গ্রীনে থাকেন। তিনি হোটেলের রেজিস্টারে তাঁর ও মানিক চৌধুরীর নাম দেখিয়ে দেন। তিনি আরো জানান যে, তিনি ৩০শে মার্চ মানিক চৌধুরী ২৯শে মার্চ এবং লেঃ মোয়াজ্জম ৩০শে মার্চ ঢাকা আগমন করেন।

তিনি জানান যে, আগের ব্যবস্থা অনুযায়ী তিনি লেঃ মোয়াজ্জম ও মানিক চৌধুরী তেজগাঁও রেলক্রশিং এর কাছে অপেক্ষা করতে থাকেন এবং মিঃ ওঝা তাঁদের সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যান। মিঃ ওঝার কথা মতই এই স্থান পরিবর্তন করা হয়। মিঃ ওঝা তাঁদের বলেন যে, মিসেস গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন এবং তাঁর সরকার অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহে স্বীকৃত হয়েছেন। তিনি (মিঃ ওঝা) জানিয়েছেন যে, আন্দোলনের কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের একমা বৈঠক হওয়া উচিত। মিঃ ওঝা বৈঠকের জন্য কয়েকটা স্থানের নাম বলেন। তার মধ্যে তাঁর (সাক্ষী) আগরতলার নামটা মনে আছে। মিঃ ওঝা লেঃ মোয়াজ্জমকে প্রতিনিধিদের নাম দিতে বলেন এবং সীমান্ত পার হওয়ার জন্য সাংকেতিক শব্দ নির্বাচন করতে বলেন। লেঃ মোয়াজ্জম জানান যে, তিনি মানিক চৌধুরীর মাধ্যমে এসব জানাবেন। মিঃ ওঝা অতঃপর পাশের ঘরে গিয়ে মানিক চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের দ্বিতীয় রাজধানীর কাছে নামিয়ে দিয়ে আসেন। এই সময় তিনি পরবর্তী বৈঠকের জন্য তাঁদের অপেক্ষা করার স্থান পরিবর্তন করে বলেন যে, তারা যেন দ্বিতীয় রাজধানীর কাছে অপেক্ষা করেন।

সাক্ষী আরো জানান যে, সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের জুন মাসে মানিক চৌধুরী চট্টগ্রামে তাঁকে (সাক্ষী) জানান যে, তিনি আন্দোলনের পক্ষ থেকে যারা ভারতে আলোচনা করতে যাবেন তাদের বিস্তারিত বিবরণ মিঃ ওঝাকে জানিয়ে দিয়েছেন।

সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৭ সনের ৬ই জুলাই তিনি ঢাকা আগমন করেন এবং হোটেল গ্রীনে ওঠেন। মানিক চৌধুরীও হোটেল গ্রীনে ছিলেন। পরের দিন মানিক চৌধুরী তাঁকে আবার গ্রীন স্কোয়ারে যেতে বলেন। দলের পক্ষ থেকে এই বাড়ীটা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল।

সাক্ষী সেখানে গিয়ে লেঃ মোয়াজ্জম, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, সামাদ, এম, মোহাম্মদ ও অপর একজন অচেনা লোককে দেখতে পান। এই বৈঠকে

মানিক চৌধুরী লেঃ মোয়াজ্জমের কাছে দাবী করেন যে, দলের বৈঠকে তাদের উপস্থিত থাকতে দিতে হবে। কিন্তু, লেঃ মোয়াজ্জম জানান যে, তারা যেহেতু বেসামরিক ব্যক্তি, সেহেতু সামরিক অফিসারদের বৈঠকে তাদের থাকা হবে না।

লেঃ মোয়াজ্জম মানিক চৌধুরীকে এই মর্মে আশ্বাস দেন যে, তিনি (মানিক চৌধুরী) যে টাকা এনে দিয়েছেন, সে টাকার সাহায্যে লোক সংগ্রহ করা হচ্ছে। ক্ষমতা দখলের সময় এই লোকদের প্রয়োজন হবে। তিনি আরো জানান যে, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান লেঃ মোয়াজ্জমের কাছ থেকে খবর নিয়ে আসেন যে, মিঃ ওঝার সঙ্গে পুনরায় দেখা করা দরকার। সুতরাং তিনি ও মানিক চৌধুরী ২২শে জুলাই ঢাকা আগমন করেন। তাঁরা উভয়েই হোটেল গ্রীনে অবস্থান করেন। এরপর মানিক চৌধুরী মিঃ ওঝার সঙ্গে সম্ভবতঃ ২২শে জুলাই তারিখে বৈঠকের তারিখ ঠিক করেন। এই অনুসারে তিনি, লেঃ মোয়াজ্জম, মানিক চৌধুরী রাত প্রায় ৯টায় দ্বিতীয় রাজধানীতে অপেক্ষা করেন। মিঃ ওঝা তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার পর বলেন যে, তিনি দু'দলের বৈঠকের ফল এখনও জানতে পারেননি। তিনি কয়েকদিনের মধ্যে এর ফল জানতে পারবেন বলে মনে করেন। মিঃ ওঝা পাশের ঘরে লেঃ মোয়াজ্জম ও মানিক চৌধুরীর সঙ্গে পৃথকভাবে কথা বলেন। তারপর তাঁদের সবাইকে দ্বিতীয় রাজধানীতে ছেড়ে দেন।

সাক্ষী জানান যে, তিনি পুনরায় ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা আগমন করেন এবং হোটেল গ্রীনে অবস্থান করেন। এই সময়ে মানিক চৌধুরী হোটেল ক্যাসরিনায় অবস্থান করেন। তিনি জানান যে, আওয়ামী লীগের বৈঠকে যোগদানের জন্য তাঁরা ঢাকা আগমন করেন। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি হোটেল ক্যাসরিনায় গমন করেন। সেখানে তিনি স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের দেখা পান। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও আলী রেজা দলের পক্ষ থেকে আলোচনার জন্য ভারতে গমন করেছিলেন। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান জানান যে, বৈঠক সফল হয়েছে। বৈঠকটি আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়।

প্র-আপনি কি আলী রেজাকে চেনেন?

উ-আমি তাঁকে সেই মাসেই ১৫/২০ দিন ধানমন্ডিতে সেপ্টম্বরের ১৭ কি ১৮-তে একটি বাড়ীতে রেজাকে দেখেছিলাম। বাড়ীটি দলের কাজের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়।

এই সময়ে সাক্ষীকে হোটেল গ্রীনের রেজিস্টার দেখানো হলে তিনি দেখিয়ে দেন যে, তিনি সেই হোটেলে (ক্রমিকনং ২১৮৬) ৩০শে ও ৩১শে আগস্ট অবস্থান করেন। মানিক চৌধুরীও এই সময়ে হোটেল গ্রীনে অবস্থান করেন (ক্রমিক নম্বর ২১৮৩)। তিনি জানান যে, তিনি ও মানিক চৌধুরী

একসঙ্গে ঢাকা আগমন করেন। তিনি জানান যে, সেইদিন সন্ধ্যায় তিনি (সাক্ষী) ও মানিক চৌধুরী ধানমন্ডির একটি বাড়ীতে গিয়ে রেজা ও সামাদকে দেখেন। এই পর্যায়ে কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী সামাদ ও রেজাকে ঠিকমত দেখিয়ে দেন।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে, সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে তিনি মানিক চৌধুরীকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তিনি (মানিক চৌধুরী) মিঃ ওঝার কাছ থেকে মোট কত টাকা পেয়েছেন এবং তার মধ্যে কত টাকা লেঃ মোয়াজ্জমকে দিয়েছেন।তার জওয়াবে মানিক চৌধুরী জানান যে, তিনি মিঃ ওঝার কাছ থেকে দু'বারে ৫ হাজার টাকা করে এবং একবারে ১০ হাজার টাকা নিয়েছেন। এই মোট ২০ হাজার টাকাই তিনি লেঃ মোয়াজ্জমকে দিয়েছেন।

বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মনজুর কাদেরের এক প্রশ্নের জবাবে একরারী স্বাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান বলেন যে, তাঁর চট্টগ্রামের বাড়ীর বৈঠকখানায় বিপ্লবী দলের মোট দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই দুটি সভাতেই স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন এবং সভার আলোচনাকালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের ক্যান্টনমেন্টগুলোর অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন। এছাড়া ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শেখ মজিবুর রহমানের সাথে মিঃ মানিক চৌধুরীও তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলেন।

প্র-১৯৬৭ সালের ৩১ শে মার্চ পি এন ওঝার সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি আপনাদের কি বলেছিলেন?

উ-মিঃ ওঝার সাথে সাক্ষাতের পর মিঃ মানিক চৌধুরী বেরিয়ে আসেন এবং তার সাথে ১০ হাজর টাকার এক তোড়া নোট ছিল। মিঃ ওঝা এই টাকা আন্দোলনের জন্যে দিয়েছিলেন এবং টাকাগুলো লেঃ মোয়াজ্জমের নিকট দেওয়ার জন্যে ওঝা মানিক চৌধুরীকে অনুরোধ করেছিলেন বলে মানিক চৌধুরী আমাকে বলেছেন।

প্র-আপনি কখনও ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করেছেন এবং আপনাকে কখনও ক্ষমা করা হয়েছিল?

উ-আমি ১৯৬৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী স্বীকারোক্তি করি এবং সে বছরের ২৩শে মে আমাকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়।

এখানেই একরারী সাক্ষী ও চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি ডাঃ সাইদুর রহমানের সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হয়। অতঃপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন চৌধুরী সাক্ষীকে জেরা করেন।

বিবাদী কৌশুলীর জেরা শুরু

প্র-আপনাকে কখন এবং কোথায় গ্রেফতার করা হয়েছিল?

উ-১৯৬৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর আমাকে চট্টগ্রামস্থ বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়।

প্র-আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ কখন আপনার বাড়ীতে গিয়েছিল?

উ-রাত দু'টায় পুলিশ আমার বাড়ীতে গিয়েছিল।

প্র-আপনি কি তখন ঘুমিয়ে ছিলেন না জাগরিত ছিলেন?

উ-তখন ছিল রমজান মাস এবং আমি সেসময় সেহরী খেতে উঠে ছিলাম।

প্র-আপনাকে যে পুলিশ অফিসার গ্রেফতার করেছেন তার নাম বলুন।

উ-সেই পুলিশ অফিসারের নাম আমি জানি না। এছাড়া গ্রেফতারের পর আমি আর তাঁকে কখনও দেখিনি।

প্র-গ্রেফতারের পর আপনাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

উ-গ্রেফতারের পর আমাকে চট্টগ্রামের পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্র-সেখানে কি আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল?

উ-জ্বী না। আমাকে তখন কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি।

প্র-কি অপরাধে আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল?

উ-সেসময়ে কেন আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তা বলা হয়নি। আমাকে শুধু পুলিশের সাথে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তবে এসপি'র অফিসে একজন পুলিশ অফিসার বলেছিলেন যে, আমাকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্র-এস পি'র অফিস থেকে আপনাকে কোথায় নেয়া হয়েছিল?

উ-এস পি'র অফিস থেকে আমাকে চট্টগ্রাম জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

কৌসুলীর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান বলেন যে, সেদিন রাত ৮টা পর্যন্ত তাঁকে চট্টগ্রাম জেলে রাখা হয় এবং পরে চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে নেয়া হয়। রাত্রে চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে গাড়ীতে চড়ে পরদিন সকালে তিনি ঢাকা স্টেশনে পৌঁছেন। এছাড়া জেলেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি।

প্র-ঢাকা আনার সময় আপনার সাথে কে ছিলেন?

উ-আমার সাথে একজন পুলিশ অফিসার ও একজন কনস্টেবল ছিলেন।

প্র-ঢাকা রেল-স্টেশন থেকে আপনাকে কোথায় নেয়া হয়?

উ-ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে।

প্র-ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আপনাকে কতদিন রাখা হয়েছিল?

উ-১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত আমাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়েছিল।

প্র-ঢাকা জেলে আপনাকে কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল?
উ-জী না।
প্র-ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে আপনাকে কোথায় নেয়া হয়েছিল?
উ-১৯৬৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী বিকেল একটায় সেন্ট্রাল জেল থেকে আমাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নেওয়া হয়। তখন থেকে একটি রুমে আমি একাই আছি।
প্র-ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আপনাকে কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল?
উ-ক্যান্টনমেন্টে থাকাকালে আমি স্বীকারোক্তি করি এবং স্বীকারোক্তির পর পুলিশ অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।
প্র-ঢাকা জেলে থাকার সময় কি আপনাকে অন্যত্র নেয়া হয়েছিল?
উ-জী। জেলে থাকার সময় আমাকে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে নেওয়া হয় এবং সেখানে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।
প্র-কতজন পুলিশ অফিসার আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?
উ-তা আমার মনে নেই।
প্র-কতদিন যাবৎ আপনাকে এসবি অফিসে রাখা হয়েছিল?
উ-আমাকে ১৯৬৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর এস বি অফিসে নেয়া হয় এবং ১৯৬৮ সালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত সেখানে রাখা হয়।
প্র-এস বি অফিসে মোট ক'জন পুলিশ অফিসার আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?
উ-আমাকে জিজ্ঞাসাবাদকারী পুলিশ অফিসারের সঠিক সংখ্যা আমার মনে নেই। কারণ জিজ্ঞাসাবাদকালে পর্যায়ক্রমে তাঁরা আসা-যাওয়া করেছিলেন।
প্র-জিজ্ঞাসাবাদকালে আপনার কোন জবানবন্দী রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল কি?
উ-জী না। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় কিছুই রেকর্ড করা হয় নাই।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর এক বক্তব্যের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, একথা সত্য নয় যে, এস বি অফিসে আমার জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়েছে। সেখানে আমাকে শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।
প্র-স্বীকারোক্তি করার জন্যে কখন আপনি মনস্থির করেছিলেন?
উ-আমার গ্রেফতারের পর থেকেই স্বীকারোক্তি করার জন্যে আমি চিন্তা করতে থাকি। এবং স্বীকারোক্তি করার ১০/১২ দিন আগে আমি এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই।
প্র-সর্বপ্রথম কাকে আপনি স্বীকারোক্তি করবেন বলে জানান?
উ-আমি পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর লেঃ শরীফকে সর্বপ্রথম আমার স্বীকারোক্তির কথা জানাই।

এক প্রশ্নের উত্তরে একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান বলেনঃ লেঃ শরীফ মাঝে-মধ্যে আমার কাছে আসতেন এবং আমার কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করতেন। তবে স্বীকারোক্তির ব্যাপারে তিনি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি। আমি নিজেই আমার স্বীকারোক্তির সিদ্ধান্তের কথা তাঁকে জানিয়েছিলাম।
প্র-স্বীকারোক্তি করার সময় আপনি কি কোন নোটের সাহায্য নিয়েছিলেন?
উ-জী না।
প্র-আপনার স্বীকারোক্তি সম্পর্কিত জবানবন্দী রেকর্ড করা হবে বলে আপনাকে কে খবর দিয়েছিলেন?
উ-যেদিন আমার স্বীকারোক্তি রেকর্ড করা হয়েছিল সেদিনই লেঃ শরীফ আমাকে জানিয়েছিলেন।
প্র-স্বীকারোক্তি করবেন বলে আপনি কি কোন দরখাস্ত করেছিলেন?
উ-জী না। আমার মৌখিক অনুরোধেই স্বীকারোক্তি রেকর্ড করা হয়।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া আমি অন্য কারও কাছে জবানবন্দী দেইনি।
প্র-কোন নোট বা খসড়া ছাড়া আপনি কি করে জবানবন্দীর সময়, তারিখ ও ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন?
উ-আমি ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিলাম বলে সকল ঘটনা আমার মনে ছিল এবং নিজ থেকেই ঘটনার তারিখ ও ধারাবাহিকতা উল্লেখ করতে পেরেছি।
প্র-জবানবন্দী রেকর্ড করার পর কি আপনাকে তা পড়ে শোনানো হয়েছিল?
উ-জী হ্যাঁ। জবানবন্দী রেকর্ড করার পর আমাকে তা পড়ে শুনানো হয় এবং আমি তাতে দস্তখত করি।
প্র-আপনার জবানবন্দী রেকর্ড করার পর আপনি কখনও তাহা পড়েছেন? অথবা কেউ কি আপনাকে তা পড়ে শুনিয়েছে?
উ-জী না।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের দাবী কেন্দ্রীয় সরকারকে মেনে নিতে বাধ্য করার জন্যে তাদের সভায় ক্ষমতা দখল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল– এ ধরনের মন্তব্য ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তাঁর জবানবন্দীতে তিনি করেছিলেন কিনা তা তাঁর মনে নেই।
প্র-আপনাদের বৈঠকে কি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বা দুই অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল?
উ-জী না। এটা সত্য নয়।

খান বাহাদুর নাজির উদ্দীনের জেরা করা সমাপ্ত হলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমানকে জেরা শুরু করেন।

জনাব আবদুস সালাম খান তাঁকে প্রশ্ন করেনঃ কদ্দিন যাবৎ আপনি আওয়ামী লীগের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন?
উ-১৯৫২ অথাব ১৯৫৩ সাল থেকে আমার গ্রেফতারের সময় পর্যন্ত আমি আওয়ামী লীগের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলাম।
প্র-এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আপনি কি আওয়ামী লীগের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের কিছু দেখেছেন?
উ-জী না। আওয়ামী লীগের সাথে জড়িত থাকার প্রথম থেকে আমার বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানের সময় পর্যন্ত আমি আওয়ামী লীগের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কিছু দেখিনি।
প্র-সিটি আওয়ামী লীগে ক'জন সহ-সভাপতির পদ আছে?
উ-৩টি সহ-সভাপতির পদ আছে।
প্র-আপনি কি আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র পড়েছিলেন?
উ-জী হ্যাঁ। অনেক আগে আমি আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র পড়েছি।
প্র-আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে কি জেলা ও শহর কমিটিতে ৫ জন করে সহ-সভাপতির পদের উল্লেখ নেই?
উ-জী না। তা আমার স্মরণ নেই।
প্র-আপনাকে গ্রেফতার করার সময় চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী কে ছিলেন?
উ-জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী।
প্র-সেসময়ে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি কে ছিলেন?
উ-জনাব এম আর সিদ্দিকী। তিনি একজন বিত্তশালী ব্যক্তি।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, জনাব এম আর সিদ্দিকী জাতীয় পরিষদের একজন সাবেক সদস্য। এছাড়া জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন।
প্র-জনাব এম আর সিদ্দিকীর চট্টগ্রামস্থ বাড়ীটি কি খুব বড়?
উ-জী না। তাঁর বাড়ী খুব বড় নয়। তবে এটা মাঝারি ধরনের।
প্র-আপনি কি কখনও তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলেন?
উ-জী হ্যাঁ। আমি মাত্র একবার জনাব এম আর সিদ্দিকীর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তাঁর বাড়ীতে একটি বৈঠকখানা আছে। বাড়ীতে মোট কতটি কামরা আছে তা আমি বলতে পারবো না।
প্র-জনাব এম আর সিদ্দিকীর বাড়ীটি কোথায় অবস্থিত?
উ-বাটালী হিলে তাঁর বাড়ীটি অবস্থিত।
প্র-তাঁর বাড়ীতে কি আওয়ামী লীগের কোন সভা হয়েছিল?
উ-আমি যতদূর জানি জনাব এম আর সিদ্দিকীর বাড়ীতে আওয়ামী লীগের কোন সভা হয়নি।

প্র-চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের কয়টি অফিস আছে?
উ-দুটি অফিস। একটি চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের এবং অপরটি সিটি আওয়ামী লীগের।
প্র-আপনি গ্রেফতার হওয়াকালে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী কে ছিলেন?
উ-জনাব এম এ আজিজ। চট্টগ্রামে তাঁর নিজস্ব বাড়ী আছে।
প্র-আপনি কি প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ছিলেন?
উ-জী না।
প্র-গ্রেফতারের আগে কোন পুলিশ অফিসার আপনার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন কি?
উ-জী না।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, পেশাগতভাবে তিনি একজন চিকিৎসক এবং তিনি এলএমএফ ডিপ্লোমাধারী। এছাড়া চট্টগ্রামে তাঁর নিজস্ব একটি ডিসপেনসারী আছে। চট্টগ্রাম থেকে ঔষধ কিনে তিনি বিক্রয় করেন।
প্র-ঢাকা থেকে আপনি ঔষধ কেনেন কি?
উ-জী না।
প্র-ঔষধের ব্যবসা ও ডাক্তারী পেশা ছাড়া আপনার আর কি কি ব্যবসা আছে?
উ-চট্টগ্রামের একটি কয়লার ব্যবসায়ে আমার শেয়ার আছে তদুপরি ঔষধ আমদানীর একটি লাইসেন্স ছাড়াও আমার পাইকারী খুচরা বিক্রয়ের দুটি ঔষধের লাইসেন্স আছে।
প্র-আপনারা কোথেকে কয়লা কেনেন?
উ-সরকারী কয়লার ডিপো থেকে আমরা কয়লা কিনে বিক্রয় করি।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাদের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানটি কয়লার হোলসেল ডিলার এবং সরকার লাইসেন্স দিয়ে কয়লার 'হোলসেল' ডিলার নিযুক্ত করেন।
প্র-ক' বছর থেকে আপনি কয়লার হোলসেল ডিলারী করছেন?
উ-১৯৬৭ সালের জুলাই অথবা আগস্ট মাস থেকে।
সাক্ষী আরও বলেন যে, ১৯৫৬ সাল থেকে তিনি ঔষধের খুচরা, ১৯৬১ সাল থেকে পাইকারী ব্যবসা করছেন এবং ১৯৬১ সাল থেকে তিনি ঔষধ আমদানীর লাইসেন্স পান।
প্র-আপনার কি মসলা আমদানীর লাইসেন্স আছে?
উ-জী না।

সাক্ষী আরও বলেন যে, একথা সত্য নয় যে, তাঁর স্ত্রীর নামে মসলার আমদানী লাইসেন্স আছে। তবে তাঁর কয়েকটি রিকশার রুট পারমিট ও একটি বেবীট্যাক্সি আছে।

প্র-গ্রেফতারের সময় আপনি কি ইউনিয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন?

উ-জী হ্যাঁ। আমি এনায়েত বাজার ইউনিয়ন কমিটির সদস্য ছিলাম।

এক প্রশ্নের জবাবে একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান বলেন, একথা সত্য নয় যে, জনাব এ কে খানের পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী একটি পাহাড় আমি খরিদ করেছি। এছাড়া এটাও সত্য নয় যে, আবদুস সোবাহান সরকারের জমির পার্শ্বে আমার এককানী খরিদা জমি আছে। তবে হাটহাজারীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে আমার একখণ্ড জমি আছে।

প্র-১৯৬৬ সালের ২৪শে এপ্রিল ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনি ঢাকা এসেছিলেন বলে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কি উক্তি করেছিলেন?

উ-জী হ্যাঁ। আমি ড্রাগ লাইসেন্স রিনিউ করার জন্যে ঢাকা এসেছিলাম বলে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছি।

জেরার এই পর্যায়ে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমানের হাতে গ্রীন হোটেলের একটি রেজিস্ট্রারী বই দিয়ে প্রশ্ন করেনঃ রেজিস্ট্রার বই-এর যে জায়গায় 'বি কে সেন এন্ড পার্টি লেখা তার নীচে কি লেখা আছে?'

এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সাক্ষী নিশ্চুপ থাকলে জনাব আবদুস সালাম খান আবার জিজ্ঞেস করেন–এস,ইউ,ডি, ইউ,আর–এই অক্ষরগুলোতে কি শব্দ উচ্চারণ করা যায়।

উ-এই অক্ষর ক'টি দিয়ে গঠিত শব্দ উচ্চারণ করা আমার পক্ষে কঠিন।

প্র-এরপরের ইংরেজী শব্দে রহমান এর লেখার জন্যে 'আর' এরপরে কি একটি 'এ'র দরকার আছে?

উ-জী না।

(কিন্তু রেজিস্ট্রার বইতে তা নেই)।

প্র-সংশ্লিষ্ট লেখা দুটি কি এক রকম কালির ?

উ-জী হ্যাঁ। আমার মনে হয় দুটাই এক রকম কালিতে লেখা।

প্র-আপনি কি মাকিন চৌধুরীর হাতের লেখা চেনেন?

উ-জী হ্যাঁ। আমি তাঁর হাতের লেখা চিনি।

প্র-কতদিন ধরে আপনি মিঃ বি কে সেনকে চেনেন?

উ-১৯৬২ সাল থেকে মিঃ বি কে সেনকে আমি চিনি।

এই পর্যায়ে জনাব আবদুস সালাম খান হাতের লেখা একটি দরখাস্ত সাক্ষীর হাতে দিয়ে প্রশ্ন করেন–

প্র-এই দরখাস্তটি কি আপনি লিখেছিলেন?

উ-জী হ্যাঁ। এই দরখাস্তটি আমার হাতের লেখা।

প্র-দরখাস্তটি কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা?

উ-এই দরখাস্তটি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের 'হোম সেক্রেটারীকে' সম্বোধন করে লেখা হয়েছে।

প্র-আপনি মনে মনে এই দরখাস্তটি একবার পড়ে নিন।

উ-এই দীর্ঘ দরখাস্তটি পড়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে।

সাক্ষীর এই জবাবে ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি জনাব এস এ রহমান বলেন, 'না একটা দীর্ঘ দরখাস্ত নয়' আপনি দরখাস্তটি পড়ুন।

অতঃপর সাক্ষী দরখাস্তটি পড়েন। তাঁর পড়া শেষ হলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান দরখাস্তটি আদালতের সামনে পাঠ করেন।

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের হোম সেক্রেটারীকে সম্বোধন করে লেখা একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমানের দরখাস্তটি নিম্নরূপঃ

আমাকে ১৯৬৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ডিআইজি (এস বি) অফিসে নেয়া হয়। একটি বদ্ধ কোঠায় রেখে কয়েক ব্যক্তি আমাকে এমন সব বিষয়ে অনবরত জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন যা আমার জানা নেই। এই জিজ্ঞাসাবাদ মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলতে থাকে।

তারপর হঠাৎ তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং একযোগে আমাকে লাঠি, চেয়ারের হাতল, কিল, ঘুষি ও চপেটাঘাত করে এলোপাথাড়ীভাবে প্রহার করতে থাকেন। প্রহারের ফলে আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় মারাত্মক আঘাত লাগে। আমি অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত এইভাবে প্রহার করতে থাকে।

'তিনদিন যাবৎ কয়েক-দফায় তারা আমার উপর এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার করেন। এই অমানুষিক নির্যাতনের মাত্রা এত গুরুতর ছিল যে, এই সময়ে আমার জীবন সংশয় হয়ে পড়েছিল। সারাক্ষণ আমাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে এবং যতক্ষণ আমার জ্ঞান ছিল ততক্ষণ আমাকে ঘুমাতে দেওয়া হয়নি। সর্বোপরি সে পরিবেশ ছিল ধমক, বারবার প্রহার ও মৃত্যুর প্রহরে ভীতি-বিহ্বল।'

'এই অমানুষিক নির্যাতন এবং অজ্ঞান ও আধা অজ্ঞান অবস্থায় তারা আমার নমুন দস্তখত নেন।'

'অনবরত ও বেদম প্রহারের মাত্রা এমন গুরুতর ছিল যে, তাঁরা আমাকে জেলে স্থানান্তরিত করতে পারেননি এবং ১৮ দিন যাবৎ আমাকে সেখানে রেখে তাদেরকে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। আমার শারীরিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলে ১৯৬৮ সালের ১লা জানুয়ারী আমাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পুনরায় স্থানান্তরীত করা হয়।'

'চিকিৎসাই আমার একমাত্র পেশা এবং চট্টগ্রামে আমার একটি ডিসপেনসারী আছে। রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়ে আমি আওয়ামী লীগের একজন সদস্য। আমি জানি না কেন আমাকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং জীবন সংশয় করে নির্যাতন করা হয়েছে। আর কেন-ইবা কি কাগজপত্র দস্তখত করার জন্যে আমাকে বলপূর্বক বাধ্য করা হয়েছে। আমি রাষ্ট্রের একজন অনুগত ও নিরপরাধ নাগরিক। আমার উপরে যে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে তার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাকে মুক্তি দেওয়ার অনুরোধ করছি।

দরখাস্তটি পড়া শেষ করে জনাব আবদুস সালাম খান প্রশ্ন করেনঃ এই দরখাস্তের অভিযোগ কি আপনি করেছিলেন এবং এসব অভিযোগ কি সত্য?
উ-জী হ্যাঁ। এসব অভিযোগের দরখাস্তটি আমার লেখা। তবে দরখাস্তের অভিযোগগুলো সত্য নয়।
প্র-আওয়ামী লীগে ছয়-দফা কর্মসূচী আপনার জানা আছে কি?
উ-জী না। ছয়-দফা কর্মসূচী আমার জানা নেই।

এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, ছয়-দফা কর্মসূচী পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলোও ছয়-দফা প্রকাশ করেছিল কি না তাঁর জানা নেই। তিনি আরও বলেন যে, একথা সত্য যে, ছয়-দফা সম্পর্কিত আওয়ামী লীগের হাজার হাজার প্রচারপত্র ও পুস্তিকা তার মাধ্যমে বিলি করা হয়েছে।

এই পর্যায়ে জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা অসমাপ্ত থাকে। আজ মঙ্গলবার আবার জনাব সালাম খান জেরা করবেন।

সংবাদ

২৮শে আগস্ট ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

আমি ৬ দফা কর্মসূচীর পুস্তিকা জনসাধারণ্যে বিতরণ করিয়াছিলামঃ
৪র্থ রাজসাক্ষীর স্বীকারোক্তি

(নিজস্ব বার্ত্তা পরিবেশক)

গতকল্য (মঙ্গলবার) কুর্মিটোলায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী পুনরায় শুরু হইলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান কর্তৃক ৪র্থ রাজসাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান চৌধুরীর জেরা দ্বিতীয় দিনেও অব্যাহত থাকে।

এইদিন জেরার উত্তরে রাজসাক্ষী স্বীকার করেন যে, তিনি দীর্ঘকাল হইতে আওয়ামী লীগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্র ও ৬ দফা কর্মসূচী সম্বলিত অজস্র পুস্তিকা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন।

তিনি আরও স্বীকার করেন যে, আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে জনসাধারণের নিরাপত্তা ও নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ন্যস্ত রাখার বিশ্বাস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, উক্ত ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংহতি, স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি অর্জিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস স্থাপন করা হইয়াছে।

তিনি ইহাও স্বীকার করেন, পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন উক্ত ঘোষণাপত্রের অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

অতঃপর জনাব আবদুস সালাম খান ৬-দফা কর্মসূচী সম্পর্কে রাজসাক্ষীকে প্রশ্ন করেন। তিনি স্বীকার করেন যে, ৬-দফার দ্বিতীয় দফায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দেশিত হইয়াছে। উহাতে 'দেশরক্ষা' ও 'বৈদেশিক নীতি' কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। বাকী সমস্ত বিষয় ষ্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রদেশ) হাতে থাকিবে। একই দফায় 'দুইটি পৃথক অথচ অবাধ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা ব্যবস্থা চালু অথবা বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্য কেবলমাত্র একটি মুদ্রা ব্যবস্থা চালু থাকিতে পারে, বলা হইয়াছে। তবে সেক্ষেত্রেও শাসনতান্ত্রিক এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থায় রাখিতে হইবে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ রুদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাঙ্কিং রিজার্ভের পত্তন হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক বা অর্থ বিষয়ক নীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

অতঃপর সাক্ষী জেরার উত্তরে আরও স্বীকার করেন যে, ৫ম দফায় "বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা" সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে।

সাক্ষী স্বীকার করেন যে, ৫ (গ) দফায় বলা হয় যে, "কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোন হারে অঙ্গ রাজ্যগুলিই মিটাবে।"

সাক্ষী আরও বলেনঃ ৫ (ঘ) দফায় 'অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদি চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোন বাধা নিষেধ থাকিবে না' বলা হইয়াছে।

অপর প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী ৬-দফার ষষ্ঠ দফা ব্যাখ্যা করেন। উক্ত দফায় আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী গঠনের কথা বলা হইয়াছে।
উহার পর জনাব সালাম খান সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেনঃ শেখ মুজিবর রহমান ১৯৬৫ সালে লাহোরে প্রথম ৬-দফা ঘোষণা করিয়াছেন, উহা আপনি জানেন কি?
উ ঃ আমি মনে করতে পারছি না।

প্রঃ আপনি জানেন কি যে, ওই ৬-দফা ঘোষণা করার পরই ক্ষমতাসীন মহলে বিষোদগার শুরু হয় এবং তারা একে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে অভিহিত করতে থাকে?

উ ঃ নির্দিষ্টভাবে না বললে তা আমি স্মরণ করতে পারছি না।

প্র ঃ মন্ত্রী ও সরকারের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এই অভিযোগ করেছেন এবং দেশের বিভিন্ন খবরের কাগজে তা ফলাও করে প্রচার করা হোয়েছে?

উ ঃ আমি খবরের কাগজে এ সমস্ত বিবৃতি পড়েছি কিনা,তা আমার স্মরণ নেই।

প্র ঃ ৬-দফা কর্মসূচী প্রকাশের পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন রূপে অভিহিত করে বলেছিলেন যে, 'এটা দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবে এবং তাকে দাবানোর জন্যে অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করার প্রয়োজন হতে পারে' তা আপনি জানেন কি?

উ ঃ আমার মনে পড়ছে না।

প্র ঃ আপনি জানেন কি এই ৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণার পরেই প্রদেশব্যাপী বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার ও আটক রাখা হয়?

উ ঃ ১৯৬৬ সালের মে মাসের দিকে বহু আওয়ামী লীগ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

পূর্বাহ্নে জনাব আবদুস সালাম খান প্রশ্ন করেনঃ আপনি জানেন কি যে, শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় বহু জনসভায় ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেছিলেন?

উ ঃ শেখ মুজিবর রহমান চট্টগ্রামে একটি জনসভায় ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তিনি তা জানেন।

কিন্তু অন্য কোন জেলায় তিনি অনুরূপ কোন সভায় বক্তৃতা করেছেন কিনা, তা তিনি স্মরণ করতে পারছেন না।

রাজসাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খানের প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করেন যে, ভারতের সহিত ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তানকে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার দাবী উত্থিত হইয়াছিল।

প্র ঃ চট্টগ্রামে নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থাপনের দাবী উঠেছিল কি?

উঃ হ্যাঁ, উঠেছিল।

প্র ঃ পূর্ব পাকিস্তানের মিলিটারী একাডেমী ও অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীর দাবী উঠেছিল?

উ ঃ জী হ্যাঁ।

প্র ঃ আপনি জানেন কি যে, সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্ব দানের দাবীও উত্থিত হোয়েছিল?

উ ঃ হ্যাঁ।

সাক্ষী জেরার উত্তরে আরও স্বীকার করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে পূর্ব পাকিস্তানী সিনিয়র সি এস পি অফিসারদের নিয়োগের দাবীও উত্থিত হয়।

প্র ঃ পূর্ব পাকিস্তানের দাবী অনুযায়ী এখানে নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করা হয় কি?

উ ঃ না।

সাক্ষী আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে মিলিটারী একাডেমী স্থাপনের দাবী পূরণ করা হয় নাই। অবশ্য তিনি বলেন যে, জয়দেবপুরে একটি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী নির্মাণ করা হইতেছে বলিয়া তিনি খবরের কাগজে পড়িয়াছেন।

প্র ঃ আপনি জানেন কি যে, চট্টগ্রামে সামুদ্রিক পানি থেকে লবণ উৎপাদন করা হয়?

উ ঃ হ্যাঁ। করা হয়।

সাক্ষী আরও বলেন যে, উহা একটি কুটির শিল্প।

প্র ঃ আপনি জানেন কি যে, চট্টগ্রামে এই লবণ উৎপাদনের উপর কেন্দ্রীয় সরকার 'শুল্ক' আরোপ করেছেন?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লবণ আমদানীর সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যেই কি এই শুল্ক আরোপিত হোয়েছে?

উ ঃ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লবণ আমদানীর সুবিধার জন্যই এই শুল্ক আরোপ করা হয়েছে কিনা, তা আমি বলতে পারি না।

এই পর্যায়ে সরকারপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের বিবাদীপক্ষের কৌসুলির এই জাতীয় প্রশ্নে আপত্তি জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে কি করিয়াছেন বা করিতেছেন–উহা বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, উহা রাজনৈতিক মঞ্চের জন্য প্রযোজ্য! বর্তমান মামলা অতীতে সংঘটিত ষড়যন্ত্রের সহিত সম্পর্কিত।

জনাব আবদুস সালাম খান– আমি একে 'প্রাসঙ্গিক' প্রমাণ করছি।

বিচারপতি এস, এ, রহমান– ঠিক আছে। আপনি জেরা করুন।

প্র ঃ আপনি জানেন যে, সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্যের দাবী শুধু পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নয় পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও তা প্রযোজ্য?

উ ঃ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য তা প্রযোজ্য ছিল কি না, তা আমার মনে নেই।

প্র ঃ আপনি জানেন কি যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতি সাবেক সিন্ধু বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের জনগণের সমর্থন রয়েছে?

উ ঃ তা আমি জানি না।

প্রঃ ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের কোন অংশকে একত্রীকরণ অথবা ভারতের সংগে সহযোগিতার যে কোন আন্দোলনকে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জনগণ আদৌ পছন্দ করে না, তা আপনি জানেন কি?

উ ঃ তা আমি জানি না। অবশ্য ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা যে 'খারাপ' তা আমি মনে করি।

প্র ঃ পাকিস্তান সৃষ্টির কি উদ্দেশ্য ছিল?

উ ঃ মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমি অর্জন।

সাক্ষী আরও বলেন যে, ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দুর শোষণ, অত্যাচার হইতে মূসলমানদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। অপর প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতে বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং তাতে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়।

জনাব সালাম খান অতঃপর সাক্ষীর উদ্দেশে বলেনঃ ভারতীয় হাইকমিশনের পি এন ওঝার সাথে আপনাদের যোগাযোগের বিষয়টি সম্পূর্ণ বানোয়াট। তাছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে "রাষ্ট্রবিরোধী রূপ" দেবার উদ্দেশ্যেই এ কাহিনী আবিষ্কৃত হয়েছে। আর পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন লাভের দাবীকে নস্যাৎ করার এবং সংখ্যাসাম্যের দাবীকে বানচাল করার মতলবেই এ গল্প ফাঁদানো হয়েছে।

'এই সকল উক্তি সত্য নহে' বলিয়া সাক্ষী জবাব দেন।

অতঃপর জনাব সালাম খানের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী স্বীকার করেন যে, স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট লিখিত তাঁহার উপর শারীরিক নির্যাতন সম্পর্কিত দরখাস্তের বিষয়টি তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিকালে প্রকাশ করেন নাই। সাক্ষী আরও স্বীকার করেন যে, রাজারবাগ পুলিস সেন্টারে আটক থাকাকালে দুইজন ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করেন। কিন্তু কৌসুলির প্রস্তাব অনুযায়ী তাহাদের নাম ডাঃ নূরুল ইসলাম ও ডাঃ ওয়াকিল আহমদ কিনা, উহা তিনি বলিতে পারেন না।

প্রঃ আপনার উপর শারীরিক নির্যাতনের ফলে আপনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বলেই কি এই দু'জন ডাক্তার আপনার চিকিৎসা করেননি?

প্রঃ এটা সত্য নয়।

সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি পীড়িত ছিলেন বলিয়া তাকে চিকিৎসা করা হইয়াছিল। সাক্ষী স্বীকার করেন যে, রাজারবাগ পুলিস কেন্দ্রে তাহাকে ১৮ দিন ধরিয়া আটক রাখা হইয়াছিল।

তিনি বলেন যে, তিনি ঢাকার সিভিল সার্জনকে চিনেন না। তিনি রাজারবাগে তাহার চিকিৎসার জন্যে আসেন নাই বলিয়া জানান। রাজারবাগ

পুলিস হাসপাতালে তাহাকে চিকিৎসার জন্যে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল কিনা, এই মর্মেএক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী নেতিবাচক জবাব দেন।

প্র ঃ আপনি যদি আহত না হবেন তা হলে আপনাকে ষ্ট্রেচারে করে সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হলো কেন?

উ ঃ এটা সত্য নহে। সাক্ষী আরও বলেন যে, জেলে ঢাকার সিভিল সার্জন তাকে পরীক্ষা করেন।

প্র ঃ আপনি ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারেন না কেন?

উঃ ১৯৪৫-৪৭ অবধি আমার বাম উরু সন্ধিতে টি বি হয়েছিল, তাই আমার পায়ে ত্রুটি রয়েছে।

"পুলিসের অত্যাচারেই আপনার শরীর জখম হয় আর আপনার অঙ্গ বিকৃতি ঘটে" এই মর্মে কৌসুলি যে প্রস্তাব করেন সাক্ষী উহাকে ঠিক নহে বলিয়া জানান। সাক্ষী আরও বলেন যে, তাকে জেল হাসপাতালে রাখা হয় নাই।

পি এন ওঝা

অতঃপর বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম খান সাক্ষীর বাসভবনে পি এন ওঝার গমন সম্পর্কে বহুসংখ্যক প্রশ্ন করেন। সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে চট্টগ্রামে রফিউদ্দীন সিদ্দিকী বাই লেনে তাহার নিজের এবং অপর ভাইদের বাসভবনের অবস্থান বর্ণনা করেন।

তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করেন যে, রফিউদ্দীন সিদ্দিকী বাই লেন হইতে তাহার বাড়ী পর্যন্ত একটি মাত্র সরুপথ রহিয়াছে। উক্ত পথে কোন কার প্রবেশ করিতে পারে না। সাক্ষী আরও বলেন যে, তাহার দুইভাই বাহির বাড়ী বা বৈঠকখানার ঘরে বাস করিয়া থাকেন। সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৬ সালের জুলাই-এর শেষ ভাগে অথবা আগষ্টের ১লা অথবা ২রা তারিখে মিঃ ওঝা চট্টগ্রামে তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তাহার (সাক্ষীর) নাম ধরিয়া ডাকেন। সাক্ষী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং মিঃ ওঝাকে লইয়া বৈঠকখানা ঘরে নিয়া পৌছান। এই সময় মিঃ ওঝার সহিত কেহ ছিলেন না। সাক্ষী বলেন যে, তিনি মিঃ ওঝার গাড়ী দেখিতে পান নাই। সাক্ষী বলেন যে, মিঃ ওঝা ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত কথা বলেন। অতঃপর তিনি একাকী চলিয়া যান।

প্র ঃ আপনি পুলিসের নিকটে প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেছেন যে, ১৯৬৬ সালের জুলাইয়ের শেষদিকে অথবা ১লা কি দোসরা আগষ্ট হঠাৎ আপনার ড্রয়িং রুমের সম্মুখে একটি 'কার' আসতে দেখেছিলেন। 'কার' দেখেই আপনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মিঃ ওঝাকে দেখতে পান (পুলিসের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে এভাবেই রেকর্ড হয়েছিল)।

উ ঃ আমি পুলিসের নিকট একথা বলিনি।

মানিক চৌধুরী

অতঃপর জনাব সালাম খান মানিক চৌধুরীর সহিত সাক্ষীর 'কথোপকথন' সম্পর্কে জেরা করেন।

প্র ঃ ১৯৬৫ সালে ডিসেম্বর মাসে মানিক চৌধুরী আপনাকে বলেছিল যে, শক্তি প্রয়োগে প্রাদেশিক সরকার থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হবে। এ সময়ে আপনি কি করে ধরে নিতে পেরেছিলেন যে, একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারকে শক্তি প্রয়োগে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে?

উঃ মানিক চৌধুরী আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে, সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানী কর্মচারীরা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং তারা সকল সামরিক ছাউনী দখল করে নেবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করে নেবে।

প্র ঃ তিনি কি বলেছিলেন যে, সেনাবাহিনীতে শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানীরাই বিদ্রোহ করবে?

উ ঃ হ্যাঁ। তাই বলেছিল।

প্র ঃ সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের হার কত?

উ ঃ আমি বলতে পারি না।

প্র ঃ আপনি মানিক চৌধুরীকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন?

উ ঃ না।

প্র ঃ সেনাবাহিনীতে লেঃ হতে উপরের স্তরের পূর্ব পাকিস্তানী অফিসারের শতকরা হার কত তা কি আপনি মানিক চৌধুরী থেকে জানতে চেষ্টা করেছিলেন?

উ ঃ আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে, আন্দোলনের গোপনীয়তা রক্ষাকল্পে তা বলা যাবে না।

প্র ঃ মানিক চৌধুরী কি নিজেই এ সকল গোপন তথ্য অবগত ছিলেন?

উ ঃ আমি বলতে পারি না।

প্র ঃ আপনি কি স্বীকার করেন যে, সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানী জোয়ানদের হার অনধিক ২৫ জনে একজন মাত্র?

উঃ আমি অবগত নহি।

প্র ঃ আপনি জানেন কি যে, সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানী অফিসারের সংখ্যা প্রতি ৯০ জনে একজনও নাই?

উ ঃ আমি অবগত নহি।

প্র ঃ আপনি আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে কি এ সকল তথ্য জানতে চাননি?

উ ঃ মানিক চৌধুরী আন্দোলনের গোপনীয়তা রক্ষার্থে এ সকল তথ্য প্রকাশ করতে চাননি।

অতঃপর জনাব সালাম খান ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎকার সম্পর্কে জেরা করেন।

প্র ঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিবের সাথে আপনার কখন সাক্ষাৎ হয়?

উ ঃ ১৯৬৫ সনের নভেম্বরে। (পরে সংশোধন করিয়া বলেন ডিসেম্বর)। সাক্ষী বলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিব তাহার ডিসপেন্সারীতে আগমন করেন। তিনি নিজেকে নৌ-বাহিনীর একজন ষ্টুয়ার্ড হিসাবে পরিচিত করেন।

সাক্ষী অপর প্রশ্নের উত্তরে বলেনঃ মানিক চৌধুরী তাঁহাকে নৌবাহিনীর একজন জুনিয়র কমিশণ্ড অফিসার হিসাবে তাহার পরিচয় দান করেন।

সাক্ষী আরও বলেন যে, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা কি ৭টার দিকে তাহারা তাঁহার দোকানে আসেন। এ সময়ে রোগীর ভিড় থাকে বলিয়াও সাক্ষী স্বীকার করেন।

প্র ঃ এই অবস্থায় অন্য সময়ে অপর কোন স্থানে আলোচনার কথা বলেছিলেন কি?

উ ঃ না।

প্র ঃ গ্রেফতারের আগে আপনি কি কাউকে এই সামরিক বিদ্রোহ সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন?

উ ঃ না।

প্র ঃ আপনি ছাড়া অপর কোন গুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগ নেতার সাথে এ সম্পর্কে কোন যোগাযোগ করা হয়েছিল কি?

উঃ আমি অবহিত নহি।

প্র ঃ আপনাকে কখন এবং কোথায় সনাক্তকরণ করা হয়েছিল?

উ ঃ ১৯৬৮ সালের মে মাসে ক্যান্টনমেন্টে।

সাক্ষী বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, চট্টগ্রামের হোটেল মিশকা হইতে কাহাকেও তাহার সনাক্তকরণ প্যারেডে উপস্থিত করানো হইয়াছিল কিনা তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তিনি বলেন, তাহাকে মাত্র একদফা টি,আই, প্যারেড সনাক্তকরণ করা হয়।

সাক্ষী বলেন যে, আমীর হোসেনকেও একই দিনে টি আই প্যারেডের জন্য উপস্থিত করানোর কথা সত্য নহে। সাক্ষী বলেন যে, বিধান কৃষ্ণ সেনকেও উক্ত প্যারেডে আনয়ন করা হইয়াছিল কিনা তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

অতঃপর বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি 'বিপ্লবী' দলের সভা অনুষ্ঠানের প্রশ্নে কতিপয় প্রশ্ন করেন।

(অসমাপ্ত)

সংবাদ

২৮শে আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত সোমবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যের ষড়যন্ত্র মামলার ৪ নম্বর রাজসাক্ষী ডাঃ সাঈদুর রহমান বাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলির প্রশ্নের জবাবে বলেনঃ খুব সম্ভব ১৯৬৬ সনের ২১শে মে মানিক চৌধুরী পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেফতার হন। ঐ সময় লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটিতে একটি বাড়ীভাড়া করে থাকতেন।

সাক্ষী বলেনঃ মানিক চৌধুরীর গ্রেফতারের পর চট্টগ্রামে আমার বাসভবনে বিপ্লবী দলের দুটো বৈঠক হয়। সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সনের জুন মাসে ১৫ দিন অন্তর এই বৈঠক দুটো অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বৈঠকটিতে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, এল, এস, সুলতানুদ্দীন , এ,বি, খুরশীদ ও আমি যোগদান করি। এই লোকগুলোই দ্বিতীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। উভয় বৈঠকের আলোচনা প্রায় একই রকমের ছিল। বিপ্লবী দলের বিভিন্ন সদস্যের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পর্কে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন বৈঠকে আলোচনা করেন। ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আন্দোলনের অগ্রগতি ও দলে নূতন লোক সংগ্রহ সম্পর্কে রিপোর্ট দেন। তিনি সামরিক ইউনিটসমূহে তাঁর গমনের কথা জানান। তিনি আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহের উপায় ও পন্থা সম্পর্কেও আলোচনা করেন। তিনি সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পদ্ধতি সম্পর্কেও বলেন। আমরা লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সাথে একমত হই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বন্ধন থেকে মুক্তি সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া সম্ভব নয়।

সাক্ষী বলেন ঃ সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সনের অক্টোবরে লেঃ মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামের নৌ কোয়ার্টার্স -এর [গত সোমবারের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাজসাক্ষী ডাঃ সাঈদুর রহমানের জেরার আংশিক বিবরণ গতকল্যকার (মঙ্গলবার) পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্য (বুধবার) অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত হইল।]

সন্নিকটবর্তী 'এনকোরেজ'-এ শিফট করেন। আমি নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটিতে লেঃ মোয়াজ্জেমের সাথে সেখানে তাঁর বাসায় গেছি পরে 'এনকোরেজ'-এ শিফট করার পরেও আমি তাঁর কাছে যাই। আমি প্রায়ই তাঁর কাছে যেতাম। আমরা আন্দোলনের অগ্রগতি ও সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। আমি যখনই লেঃ মোয়াজ্জেমের বাসায় গেছি, তখনই কোন কোন সময় ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান কোন কোন সময় এ, বি চৌধুরী ও কোন কোন সময় এল, এস, সুলতানউদ্দীনকে সেখানে দেখেছি। লেঃ

মোয়াজ্জেম হোসেন ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানও আমার ডিসপেনসারী অথবা আমার বাসায় আসতেন।

সাক্ষী আরও বলেনঃ ১৯৬৬ সনের জুন অথবা জুলাই মাসে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে বলেন যে, মানিক চৌধুরী ভারতীয় হাইকমিশনের মিঃ পি, এন ওঝাকে অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু সেটা তাঁর দ্বারা আর হয়নি; কারণ তিনি গ্রেফতার হয়েছিলেন। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে বলেন যে, আমি পি, এন ওঝাকে চিনি কি না। আমি বলি যে, মানিক চৌধুরীর সাথে আমি তাকে একবার দেখেছি। তারপর তিনি আমাকে পি, এন ওঝার সাথে দেখা করার জন্য চাপ দেন এবং পি, এন, ওঝাকে অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকা দিতে বলেন। আমি তাকে বলি যে, আমার পক্ষে ভারতীয় হাই কমিশন অফিসে যাওয়া সম্ভব নয়; কারণ শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক ৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করার পর কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা গ্রেফতার হইয়াছেন। তারপর সাক্ষী বলেনঃ ১৯৬৬ সনের জুলাই অথবা আগষ্টের এক সকালে মিঃ পি,এন ওঝা চট্টগ্রামে আমার বাসায় আসেন। তাঁর আগমনে আমি বিস্মিত হই। তিনি আমাকে বলেন যে, মানিক চৌধুরী গ্রেফতার হয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন যে,তার অনুরোধ সত্ত্বেও আমি ঢাকায় তার সাথে তার বাসায় দেখা করিনি। তারপর তিনি মানিক চৌধুরীর পরিবারের ভালমন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আমি তাকে বলি যে, তারা ভালোই আছেন। আমি অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা সংক্রান্ত লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাণী তাঁকে অবহিত করি। তিনি আমাকে অস্ত্রশস্ত্রের তালিকাটি সংগ্রহ করে পরদিন সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম রেলওয়ে রিফ্রেসমেন্ট কক্ষে যতশীঘ্র সম্ভব তাঁর কাছে দিতে বলেন। তারপর আমি লেঃ মোয়াজ্জেমের কাছে যাই এবং পি, এন, ওঝা আমাকে যা বলেছিলেন, তা তাঁকে জানাই। লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকা দেন। পরদিন সন্ধ্যায় আমি রেলওয়ে ষ্টেশনের রিফ্রেসমেন্ট রুমে যাই এবং তালিকাটি মিঃ ওঝাকে দেই। মিঃ ওঝা ঢাকায় ভারত কর্তৃক যেসব অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করা হবে, সেগুলো সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করার জন্য লেঃ মোয়াজ্জেমকে ঢাকায় নিয়ে যেতে বলেন। তিনি আমাকে পরামর্শ দেন যে, ঢাকায় গিয়ে আমি যেন কোন পাবলিক টেলিফোনে তাঁর সাথে সকাল ১০টার পর যোগাযোগ করি এবং বলি, "সাঈদ কথা বলছি। পাসপোর্ট সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে চাই।" এই কথাগুলোর আলোচনা মাধ্যমে বোঝা যাবে যে, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ও আমি ঢাকায় এসেছি এবং রাত্রি ৯টায় মিঃ ওঝার সাথে দেখা করতে চাই। মিঃ ওঝা বলেন,তারপর তিনি আমাদেরকে সাকুরা রেষ্টুরেন্টের সন্নিকটে সেরেমোনিয়াল আর্চ-এ নিয়ে যাবেন।

তিনি বৈঠকের তারিখ নির্ধারণ করে দেন; কিন্তু এখন আমি তা স্মরণ করতে পারছি না। তবে এই বৈঠকের তারিখ ১৯৬৬ সনের আগষ্ট মাসের কোন একদিনে ধার্য করা হয়। আমি লেঃ মোয়াজ্জেমের কাছে যাই এবং মিঃ ওঝা আমাকে যা বলেন, তা তাঁকে জানাই। তিনি ঢাকায় আমার সাথে যেতে এবং পি, এন ওঝার সাথে সাক্ষাৎ করতে সম্মত হন।

তারপর সাক্ষী বলেন, নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও আমি গাড়ীতে করে ঢাকায় গমন করি। গাড়ীটি ছিল হিলম্যান এবং এটি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের। ঢাকায় যাওয়ার পথে আমরা কুমিল্লায় ক্যাপটেন এস, আলমের বাসায় কিছুক্ষণের জন্য থাকি। আমি আগে তাঁকে চিনতাম না। লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে তাঁর বাড়ী চিনিয়ে দেন এবং বলেন যে, তিনি একজন রিক্রুটিং মেডিক্যাল অফিসার। ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও আমি ড্রইং রুমে থাকি। এই সময় কয়েক মিনিট যাবৎ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন বারান্দায় জনাব এস, আলমের সাথে আলাপ করেন। আমি জনাব এস, আলমকে সামরিক পোশাক পরিহিত অবস্থায় কয়েক মিনিট মাত্র দেখি। কাজেই আমি তাঁকে সনাক্ত করতে সক্ষম হব না। তারপর আমরা ঢাকায় রওয়ানা হই। ঢাকায় গিয়ে আমি হোটেল গ্রীনে ছিলাম। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁর আত্মীয় ডাঃ খালেকের ধানমণ্ডীস্থ বাসায় ছিলেন। আমি যতদূর জানি, ষ্টুয়ার্ড মূজিবর রহমান লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সাথেও থাকতেন। পরদিন আমি মিঃ ওঝাকে একটি পাবলিক টেলিফোনে সকাল সাড়ে দশটার দিকে তাঁর কথামত যোগাযোগ করি। ঐদিন সন্ধ্যা ৯টায় লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ও আমি 'শাকুরা'র সন্নিকটে' 'সেরেমনিরাল আর্চস'–এ যাই এবং মিঃ ওঝার জন্য অপেক্ষা করি। কয়েক মিনিট পর পি, এন, ওঝা একটা গাড়ীতে করে আসেন এবং ধানমণ্ডীতে একটি বাসায় নিয়ে যান। আমি পি, এন, ওঝার কাছে লেঃ মোয়াজ্জেমকে পরিচয় করিয়ে দেই। আমরা ড্রইং রুমে বসি এবং সেখানে মিঃ ওঝা লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সাথে অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এরপর মিঃ ওঝা লেঃ মোয়াজ্জেমকে বলেন যে, অস্ত্রশস্ত্রের তালিকাটি অনুমোদনের জন্য ভারত সরকারের নিকট প্রেরণ করা হবে। লেঃ মোয়াজ্জেম মিঃ ওঝাকে বলেন যে, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও তাঁদের টাকাপয়সা সাহায্যের প্রয়োজন। মিঃ ওঝা বলেন, তাঁর পক্ষে টাকা-পয়সা দেয়া সম্ভব নয়। ১৯৬৫ সনের সেপ্টেম্বর যুদ্ধের পর ভারত সরকারের কাছ থেকে কোন টাকা নিয়ে আসা খুব কষ্টকর। তারপর মিঃ ওঝা লেঃ মোয়াজ্জেমকে কতিপয় সামরিক তথ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, তিনি গুপ্তচর নন; তিনি তার কাছে একজন বন্ধু হিসেবে একটি বৃহৎ কাজের জন্য সাহায্য চেয়েছেন। তারপর পি,এন, ওঝা লেঃ মোয়াজ্জেমকে একটি পার্শ্ববর্তী কক্ষে নিয়ে যান। তাঁরা

সেখানে কয়েক মিনিট যাবৎ ছিলেন। লেঃ মোয়াজ্জেম কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার পর মিঃ ওঝা আমার কাছে আন্দোলন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আমি তাকে বলি যে, এ সম্পর্কে তিনি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের কাছ থেকে জানতে পারবেন। কারণ তিনি এ সম্পর্কে জানেন। এরপর আমরা পি এন ওঝার সাথে তাঁর ড্রইং রুমে ছিলাম। লেঃ মোয়াজ্জেম পি, এন ওঝাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমরা কখন ভারত থেকে অস্ত্র সরবরাহ পাব। মিঃ ওঝা আমাদেরকে প্রায় ১ মাস পর আসতে বলেন এবং জানান যে, তখন তিনি অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের তারিখ বলতে সক্ষম হবেন। মিঃ ওঝা আমাদেরকে আরও বলেন, এবার আমরা যেকোন দিন আসতে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি। তিনি বলে দেন যে, তাঁকে পাবলিক ফোন থেকে যোগাযোগ করতে হবে এবং বলতে হবে, "সাদেক কথা বলছি। আমি পাসপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।" এ থেকে বোঝা যাবে যে, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ও আমি ঢাকায় এসেছি এবং আমরা তার সাথে সন্ধ্যায় দেখা করতে চাই। তারপর পি এন ওঝা সেকেণ্ড ক্যাপিটালের কাছে আমাদেরকে তাঁর গাড়ী থেকে নামিয়ে দেন।

সাক্ষী বলেনঃ ১৯৬৬ সনের সেপ্টেম্বরে আমি ঢাকায় আসি; কিন্তু আমি তারিখটা স্মরণ করতে পারছি না। আমি গ্রীন হোটেলে ছিলাম। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনও ঢাকায় এসেছিলেন এবং তিনি ডাঃ খালেকের বাসায় ছিলেন। আমি নিজে লেঃ মোয়াজ্জেমের নির্দেশে ঢাকায় আসি। পরদিন আমি একটি পাবলিক টেলিফোন থেকে ওঝার সাথে যোগাযোগ করি। ঐদিনই রাত্রি ৯টায় মিঃ ওঝা সেরেমনিয়াল আর্চ থেকে আমাদেরকে গাড়ীতে করে তাঁর বাসায় নিয়ে যান। মিঃ ওঝা আমাদেরকে জানান যে, ভারত সরকার আমাদের আন্দোলনে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বলেন যে, তিনি ভারত সরকারের কাছ থেকে আমাদের আন্দোলনের জন্য টাকাপয়সার ব্যাপারেও চেষ্টা করবেন। মিঃ ওঝা আবার লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে পার্শ্ববর্তী কক্ষে নিয়ে যান এবং সেখানে তাঁরা কয়েক মিনিট ছিলেন। এরপর মিঃ ওঝা সেকেণ্ড ক্যাপিটালের কাছে আমাদেরকে নামিয়ে দেন। তারপর আমি লেঃ মোয়াজ্জেমকে জিজ্ঞাসা করি পার্শ্ববর্তী কক্ষে তারা কী আলাপ করছিলেন। তিনি বলেন যে, মিঃ ওঝা তার কাছে কতিপয় সামরিক তথ্য জানতে চান কিন্তু তিনি তাকে তা দেন নি।

সাক্ষী আরও বলেনঃ ১৯৬৬ সনের অক্টোবর অথবা নভেম্বর মাসে পি, এন ওঝার সাথে আমাদের বৈঠক হয়। ঢাকায় এসে আমি আবার পাবলিক টেলিফোনে মিঃ ওঝার সাথে যোগাযোগ করি এবং বলি, "সাদেক কথা বলছি, পাসপোর্ট সম্পর্কে কথা বলতে চাই।" লেঃ মোয়াজ্জেম আমার হোটেলে আসেন এবং আমাকে সাথে করে নিয়া যান। আমি গ্রীন হোটেলে

ছিলাম। পি এন ওঝা তাঁর গাড়ীতে করে আসেন এবং আমাদেরকে তার বাসায় নিয়ে যান। মিঃ ওঝা আমাদেরকে বলেন, ভারত সরকার সাধারণ নির্বাচনে ব্যস্ত থাকায় অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের তারিখ নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। তিনি সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে বলেন। এবারও মিঃ ওঝা লেঃ মোয়াজ্জেমকে পার্শ্ববর্তী কক্ষে নিয়া যান এবং কয়েক মিনিট তারা সেখানে থাকেন। এরপর আগের মতই মিঃ ওঝা আমাদেরকে সেকেণ্ড ক্যাপিটালের কাছে নামিয়ে দেন।

সাক্ষী বলেনঃ ১৯৬৭ সনের জানুয়ারীতে মানিক চৌধুরী মুক্তি লাভ করেন। ঐ সময় লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন চট্টগ্রামে ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সনের মার্চে লেঃ মোয়াজ্জেম বরিশালে বদলি হন। ১৯৬৭ সনের মার্চ মাসে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমার বাসায় আসেন। কোন্ দিন আসেন আমার মনে নেই। তিনি আমাকে বলেন যে, তিনি এসেছেন আমাকে এবং মানিক চৌধূরীকে শুধুমাত্র এই কথা বলতে যে, আমরা যেন পি এন, ওঝার সাথে অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা চূড়ান্ত করি। তিনি বলেন, তিনি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের পক্ষ থেকে এই অনূরোধ জানাতে এসেছেন। তিনি আমাকে আরও বলেন যে, তিনি এ ব্যাপারে মানিক চৌধুরীর সাথে কথা বলেছেন। এর দুই বা তিনদিন পর আমি মানিক চৌধুরীর সাথে দেখা করি। তিনি আমাকে বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেম, তিনি নিজে এবং আমি ১৯৬৭ সনের ১০ই মার্চ ঢাকায় পি, এন, ওঝার সাথে দেখা করছি। সে অনুসারে আমি ৮ই মার্চ ট্রেনযোগে ঢাকায় আসি। আমি গ্রীন হোটেলে থাকি।

এই সময় সাক্ষীকে Ext.P.W 5/2 চিহ্ন সম্বলিত রেজিষ্টার দেয়া হয়। সাক্ষী বলেনঃ এটি হোটেলের রেজিষ্টার। তারপর সাক্ষীকে রেজিষ্টারের ১ শত ২৫ নম্বর পৃষ্ঠায় তাকাইতে বলা হয়। সাক্ষী বলেনঃ ২১৩৪ নম্বর সিরিয়ালে আমি দেখছি আমার নাম আছে। এই এন্ট্রি আমি আমার নিজ হাতে করি। (এন্ট্রিতে Ext.P.W 5/4 চিহ্ন দেয়া আছে)। ২১৩৫ নম্বর সিরিয়ালে আমি মানিক চৌধুরীর নাম দেখছি। এটা তারই হাতে এন্ট্রি করা। আমি লেখা সনাক্ত করছি। আমি এই লেখার সাথে পরিচিত। সাক্ষী বলেন, মানিক চৌধূরী এই একই হোটেলে অবস্থান করিতেছিলেন। ৯ই মার্চ মানিক চৌধুরী বিমানযোগে এখানে আগমন করেন। ঐদিন সকালে যখন আমি হোটেলের বাহিরে যাইতেছিলাম তখন মানিক চৌধুরী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, তিনি মিঃ পি, এন, ওঝার সহিত একটি বৈঠকের আয়োজন করিবেন। আমি ঐদিন বেলা দুইটায় হোটেলে প্রত্যাবর্তন করি।মানিক চৌধূরী আমাকে বলেন যে, তিনি ১০ই মার্চ, মিঃ পি এন ওঝার সহিত বৈঠকের সময় ধার্য করিয়াছেন। লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন ঐদিন ঢাকায় ছিলেন। ১০ই মার্চ রাত্রি নয়টার পূর্বেই লেঃ মোয়াজ্জেম,

মানিক চৌধুরী ও আমি সাকুরা হোটেলের সন্নিকটে সেরিমনিয়াল আর্চের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলাম। মিঃ পি,এন, ওঝা মোটরযোগে সেখানে আসিয়া আমাদিগকে তাঁহার গাড়ীতে উঠাইয়া লন। মিঃ ওঝা সেখান হইতে আমাদিগকে তাঁহার বাসভবনে লইয়া যান। মিঃ ওঝা তাঁহার বাসভবনে বলেন যে, আমাদিগকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইতে পারে। তিনি আমাদের আন্দোলনের সম্পর্কে আর কোন কথা বলেন নাই। তবে আমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জানিতে চাহেন। মিঃ পি, এন, ওঝা এই বৈঠকে লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেমকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত কয়েক মিনিট আলোচনা করেন।

লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম এই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসার পর মিঃ ওঝা মানিক চৌধুরীকে ঐ কক্ষে লইয়া যান। মানিক চৌধুরী ঐ কক্ষ হইতে বাহির হইবার সময় তিনি তাঁহার পকেটে কিছু ঢুকাইতেছেন বলিয়া আমি দেখিতে পাই। এই বৈঠকের পর মিঃ পি, এন, ওঝা আমাদিগকে মোটরগাড়ীতে দ্বিতীয় রাজধানীতে নামাইয়া আসেন। মিঃ পি, এন ওঝার গৃহে মানিক চৌধুরী পকেটে কি ঢুকাইয়াছিলেন, হোটেলে পৌঁছিয়া আমি সে সম্পর্কে জানিতে চাই। তিনি তখন তাঁহার পকেট হইতে ৫ সহস্র টাকার এক তাড়া নোট বাহির করেন। সাক্ষী আরও বলেনঃ সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের ৩১শে মার্চ তারিখ আমরা তিনজন আবার ঢাকায় এসে মিঃ ওঝার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হই। আমি নিজে এসেছিলাম ৩০শে মার্চ তারিখে, মানিক চৌধুরী এসেছিলেন ২৯শে মার্চ আর লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম এসেছিলেন বরিশাল থেকে ৩০শে মার্চ তারিখে। আগে থেকে যে ব্যবস্থা করা ছিল মিঃ ওঝা সেই অনুযায়ী আমাদের তেজগাঁও রেল ক্রসিং থেকে তুলে নেন। তারপর সেই বৈঠকে মিঃ ওঝা আমাদের জানান যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন এবং তাঁর সরকার এই আন্দোলনের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করতে প্রস্তুত। মিঃ ওঝা আরও বলেন, ভারতের পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সাথে এই আন্দোলনের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হওয়া প্রয়োজন। মিঃ ওঝা এ ধরনের বৈঠকের জন্য তিনটি স্থানের প্রস্তাব করেন। এই তিনটি স্থানের মধ্যে আমার শুধু আগরতলার কথা মনে আছে।

জনাব মঞ্জুর কাদিরের জেরার উত্তরে সাক্ষী আরও জানানঃ আন্দোলনের কোন্ কোন্ প্রতিনিধি ভারতে যাবেন মিঃ ওঝা তাদের নাম জানতে চান এবং সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য সাংকেতিক শব্দ ঠিক করার অনুরোধ জানান। লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম মিঃ ওঝাকে মানিক চৌধুরীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবেন বলে জানান। মিঃ ওঝা আবার মানিক চৌধুরীকে কয়েক মিনিট আলাদা ডেকে নিয়ে কথা বলেন।

সাক্ষী আরও বলেনঃ ১৯৬৭ সালের জুন মাসে মানিক চৌধুরী আমাকে চট্টগ্রামে জানান যে, আন্দোলনের কোন্ কোন্ প্রতিনিধি ভারতীয় কর্মচারীদের সাথে বৈঠক করতে যাবেন, তাঁদের নাম তিনি মিঃ ওঝাকে দিয়ে দিয়েছেন।

সাক্ষী জানান, সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে আমি ঢাকায় আসি এবং পরদিন মানিক চৌধুরী এবং আমি ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারের বাড়ীতে যাই। বাড়ীটি পার্টি ভাড়া নিয়েছিল। সেখানে আমরা লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম, ষ্টুয়ার্ড মুজিব, এক্স-কর্পোরাল সামাদ, গোলাম আহমদ এবং তার কাছে অপরিচিত অপর একজন লোককে দেখতে পাই।

সাক্ষী বলেনঃ মানিক চৌধুরী এবং লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেমের মধ্যে তখন এক উত্তেজিত কথাবার্তা চলছিল। মানিক চৌধুরী দাবী জানাচ্ছিলেন যে, তাঁকে এবং আমাকে পার্টির উক্ত বৈঠকে যোগদান করতে দিতে হবে। লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম অবশ্য বলেছিলেন যে, আমরা বেসামরিক ব্যক্তি বলে তিনি আমাদের যেতে দিতে পারেন না, বৈঠকটিতে সামরিক কর্মচারীরা যোগ দেবেন।

সাক্ষী বলেন যে, মানিক চৌধুরী ও তিনি ঢাকায় আসেন এবং '৬৭ সালের ২২শে জুলাই হইতে ২৪শে জুলাই পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। তিনি বলেন যে, মানিক চৌধুরী মিঃ ওঝার সহিত বৈঠকের ব্যবস্থা করেন সম্ভবতঃ ২৩শে জুলাই তারিখে। এই সময়ে পূর্ব-সম্মত ব্যবস্থা অনুযায়ী মিঃ ওঝা দ্বিতীয় রাজধানীর একটি নির্দিষ্ট স্থান হইতে লেঃ মোয়াজ্জেম, মানিক চৌধুরী এবং সাক্ষীকে তুলিয়া লইয়া যান। ডাঃ সাইদুর রহমান তাঁহার সাক্ষাতে আরও বলেন, বৈঠকে মিঃ ওঝা জানান যে, ভারতীয় অফিসার ও আন্দোলনের প্রতিনিধিদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোন তথ্য লাভ করেন নাই। তিনি কিছুদিন পরই এই সম্পর্কে খবর পাইবেন বলিয়া জানান। ডাঃ সাইদুর রহমান বলেন যে, তিনি ও মানিক চৌধুরী ১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসে আবার ঢাকায় আসেন। তিনি নিজে হোটেল গ্রীনে অবস্থান করেন, মানিক চৌধুরী অপর একটি হোটেলে অবস্থান করেন। তিনি আওয়ামী লীগের সভায় যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। একদিন মানিক চৌধুরীর সহিত আলোচনার জন্য তিনি হোটেলে যান। সেখানে ষ্টুয়ার্ড মুজিব আসেন। তিনি ভারতে গিয়াছিলেন কিনা, ডাঃ সাইদুর তাঁহাকে প্রশ্ন করেন। ষ্টুয়ার্ড মুজিব তাঁকে জানান যে, তিনি ও মিঃ আলী রেজা ভারতে গিয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্ড মুজিব তাঁহাকে বলেন যে, আগরতলাতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং উহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ডাঃ সাইদুর রহমান বলেন যে, মানিক চৌধুরী প্রশ্ন করিলে তিনি জানান যে, তিনি পার্টির খরচের জন্য মিঃ ওঝার নিকট হইতে প্রথম দুই কিস্তিতে পাঁচ হাজার টাকা

এবং তৃতীয় দফায় ১০ হাজার টাকা লাভ করিয়াছিলেন এবং সমুদয় অর্থই তিনি লেঃ মোয়াজ্জেমকে প্রদান করিয়াছেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসূলি খান বাহাদুর নাজিরউদ্দীন আহমদের জেরার উত্তরে সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান জানান যে, ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামস্থ তাঁহার বাসভবন হইতে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়।

রাত্রি দুইটার সময় পুলিস তাঁহার বাড়ীতে যায় এবং তাহাকে স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে লইয়া যাওয়া হয়।

তিনি জানান যে, গ্রেফতারের সময় তাঁহাকে গ্রেফতারের কারণ বলা হয় নাই। অবশ্য পরে স্পেশাল ব্রাঞ্চের জনৈক অফিসার তাঁহাকে জানান যে, দেশরক্ষা আইনে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

ডাঃ সাইদুর রহমান বলেন যে, পুলিস অফিস হইতে তাঁহাকে চট্টগ্রাম জেলে স্থানান্তর করা হয়। সেদিন রাত্রি আটটা পর্যন্ত উক্ত জেলে অবস্থান করেন। সেই রাত্রেই তাঁহাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয় এবং ১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত তথায় রাখা হয়। ১৮ই জানুয়ারী তারিখে তাঁহাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তর করা হয়।

দৈনিক পয়গাম

২৮শে আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

ডাঃ সাইদুর রহমানের জেরা অব্যাহত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (মঙ্গলবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার চার নম্বর রাজসাক্ষী এবং ৫ নম্বর বাদী-সাক্ষী ডঃ সাইদুর রহমানের জেরা অব্যাহত থাকে। বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান গতকল্যও সাক্ষীকে জেরা করেন।

সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমানকে চেয়ারম্যান, ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম, আর, খান এবং বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিমকে সদস্য করিয়া এই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছে।

ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হওয়ার পরই বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষী জনাব সাইদুর রহমান চৌধুরীকে ছয়-দফা ঘোষণা সম্বলিত আওয়ামী লীগের একটি ম্যানিফেষ্টো প্রদান করেন। জনৈক নূরুল ইসলাম চৌধুরী এই ম্যানিফেষ্টোর প্রকাশক এবং ইহার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমদের একটি ছোট 'মুখবন্ধ' রহিয়াছে।

সাক্ষী প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ইহা আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো এবং ছয়দফা ঘোষণাও এই পুস্তিকায় রহিয়াছে।

কৌসুলী ম্যানিফেস্টোর চতুর্থ পৃষ্ঠায় "শাসনতান্ত্রিক আদর্শ" শিরোনামায় লিখিত একটি অনুচ্ছেদ পাঠ করেন। ইহাতে লেখা রহিয়াছেঃ "আওয়ামী লীগ গণপ্রতিষ্ঠান। ইহা বিশ্বাস করে যে, জনগণ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধিকারী এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পরিচালিত হইবে।"

প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, ম্যানিফেস্টোতে ইহা লিখিত রহিয়াছে।

কৌসুলী অপর একটি অনুচ্ছেদ পাঠ করেনঃ "উল্লিখিত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শাসনকার্যে এবং দেশরক্ষা ব্যাপারে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, পাকিস্তানের সংহতি, স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধি এই রূপ শাসনতন্ত্রের মাধ্যমেই সম্ভব বলিয়া আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে।"

ইহাও আওয়ামী লীগ ম্যানিফেস্টোতে রহিয়াছে বলিয়া সাক্ষী উল্লেখ করেন।

পুস্তিকার ১২ পৃষ্ঠায় "ছয়দফা" শিরোনামায় প্রকাশিত দুই নম্বর প্রস্তাব কৌসুলী পাঠ করেন।

ইহা হইতেছে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা "কেবলমাত্র দু'টি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে– যথাঃ দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।"

সাক্ষী ইহাকে ছয় দফার দ্বিতীয় দান বলিয়া উল্লেখ করেন।

অতঃপর কৌসুলী ৩-দফা প্রস্তাব পাঠ করেন। ইহাতে লিখিত রহিয়াছেঃ 'মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দুইটির যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারেঃ (ক) সমগ্র দেশের জন্য দুইটি পৃথক, অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে অথবা (খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্য কেবলমাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাঙ্কিং রিজার্ভেরও পত্তন হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক বা অর্থ বিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।"

সাক্ষী বলেন যে, ছয়-দফায় এই দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে।

কৌসুলী জনাব সালাম খান ৫-দফার 'গ' এবং 'ঘ' দফাও পাঠ করেন। 'গ' ধারায় রহিয়াছেঃ "কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোন হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোই মিটাবে" এবং 'খ' ধারায় অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদি চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর

জাতীয় কোন বাধানিষেধ থাকবে না। সাক্ষী ইহাও ছয়দফায় অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করেন।

কৌসুলী অতঃপর পুস্তিকার ১৪ পৃষ্ঠায় ৬নং দফা পাঠ করেন। ইহাতে লিখিত রহিয়াছেঃ আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।" সাক্ষী ইহাও ছয়-দফার অন্যতম দফা বলিয়া উল্লেখ করেন।

প্রশ্ন–এই ছয়দফা কি ১৯৬৬ সালে প্রথম লাহোরে প্রকাশিত হয় নাই?

উত্তর–আমার মনে পড়িতেছে না।

প্রশ্ন–এই ছয়দফা ঘোষণা প্রকাশের পর উজির এবং সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিগণ যে ইহাকে বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, তাহা আপনি সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন কিনা?

উত্তর–আমার স্মরণ হইতেছে না।

প্রশ্ন–বিভিন্ন জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান যে ছয়দফা ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আপনি জানেন কি?

উত্তর–চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের এক সভায় শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা বিশ্লেষণ করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি। অন্যান্য এলাকার খবর আমি জানি না।

প্রশ্ন–ছয়দফাকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন, ইহা গৃহযুদ্ধের সূচনা করিবে এবং ইহা দমনের জন্য অস্ত্রের ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা হইতে পারে বলিয়া যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আপনি জানেন কিনা?

উত্তর–আমার মনে পড়িতেছে না।

প্রশ্ন–ইহার পর বহুসংখ্যক আওয়ামী লীগ কর্মী যে গ্রেফতার হইয়াছে তাহা জানেন কি?

উত্তর–হ্যাঁ, জানি। ১৯৬৬ সালের মে মাসের দিকে বহুসংখ্যক কর্মী গ্রেফতার হইয়াছিল।

প্রশ্ন–সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধের পর হইতে পূর্ব পাকিস্তানকে দেশরক্ষা ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য আওয়ামী লীগ দাবী জানাইয়া আসিতেছিল কিনা?

উত্তর–হ্যাঁ।

প্রশ্ন–আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে নৌ-বাহিনীর সদর দফতর স্থাপনের জন্য কি দাবী জানায় নাই?

উত্তর–হ্যাঁ।

প্রশ্ন–পূর্ব পাকিস্তানে একটি সামরিক একাডেমী এবং অস্ত্র কারখানা স্থাপনের দাবী কি জানায় নাই?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–কেন্দ্রীয় চাকুরীতে সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব দানের জন্য কি দাবী জানায় নাই?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–সিনিয়র পূর্ব পাকিস্তানী সি এস পি অফিসারদের কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের জন্য কি দাবী জানায় নাই?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–চট্টগ্রামে কি নৌ-বাহিনীর সদর দফতর স্থাপিত হইয়াছে?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক একাডেমী কি স্থাপিত হইয়াছে?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–প্রদেশে অস্ত্র কারখানা স্থাপিত হইয়াছে কি?
উত্তর–আমি এক কি দুই মাস পূর্বে ঢাকার জয়দেবপুরে একটি অস্ত্র কারখানা স্থাপনের সংবাদ পাঠ করিয়াছি।
প্রশ্ন–আপনি কি কোন চেম্বার অব কর্মাসের সদস্য?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনি জানেন কি যে, চট্টগ্রামে সামুদ্রিক পানি হইতে লবণ প্রস্তুত করা হয়?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–কারখানা না কুটিরশিল্প ভিত্তিতে লবণ প্রস্তুত হইতেছে?
উত্তর–কুটির শিল্প।
প্রশ্ন–সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার চট্টগ্রামে উৎপাদিত লবণের উপর কি কর ধার্য করিয়াছেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আমদানী সুবিধার জন্য কি এই কর ধার্য করা হয় নাই?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–সকল ক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য বজায় রাখিবার দাবী শুধু পূর্ব পাকিস্তানের নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও যে করা হইয়াছে তাহা আপনি জানেন কিনা?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী বিশেষভাবে সাবেক বেলুচিস্তান, সিন্ধু এবং সীমান্ত প্রদেশের জনগণ কর্তৃক যে সমর্থিত হইয়াছে তাহা আপনি জানেন কিনা?
উত্তর–না।

প্রশ্ন–আপনি সম্মত হইবেন কি যে, পাকিস্তানের কোন অংশকে ভারতের সহিত যুক্ত করা অথবা ভারতের সহিত যোগসাজশের আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মানিয়া লইবে না অথবা পছন্দ করিবে না?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–ভারতের সহিত যোগসাজশের ব্যাপারটি আপনি ব্যক্তিগতভাবে কি পছন্দ করেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যে ইহাকে বিশেষভাবে অপছন্দ করিবে তাহা আপনি উপলব্ধি করেন কিনা?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–কেন পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছিল?
উত্তর–মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য।
প্রশ্ন–মুসলমানরা কেন পৃথক আবাসভূমির দাবী করিয়াছিল? এইজন্য নয় কি, যাতে মুসলমানরা ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দুদের হাতে অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত না হয়?
উত্তর–হ্যাঁ, এইজন্যই মুসলমানরা স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবী করিয়াছিল।
প্রশ্ন–১৯৪৭ সাল হইতে এই পর্যন্ত ভারতে অনুষ্ঠিত অসংখ্য দাঙ্গায় কি হাজার হাজার মুসলমান নিহত হয় নাই?
উত্তর–হ্যাঁ, নিহত হইয়াছে।
প্রশ্ন–আমি বলি যে, ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের ফার্ষ্ট সেক্রেটারী পি, এন, ওঝার সহিত বিপ্লবী আন্দোলনকারীদের যোগসাজশের যে ঘটনা আপনি আদালতে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা মিথ্যা?
উত্তর–না, মিথ্যা নয়।
প্রশ্ন–অভিযুক্তদের রাষ্ট্রবিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করা এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য ভারতীয় কূটনৈতিকের কাহিনী আবিষ্কার করা হইয়াছে, ইহা কি সত্য নয়?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–সকল ক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্যের এবং পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী নস্যাৎ করিবার জন্য এই কাহিনী বানানো হইয়াছে?
উত্তর–না, সত্য নয়।
প্রশ্ন–আপনার উপর দৈহিক নির্যাতন সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র (স্পেশাল) দফতরের সেক্রেটারীর নিকট লিখিত অভিযোগ যে সত্য নয়, তাহা কি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করিয়াছেন?
উত্তর–না।

প্রশ্ন–আপনি স্বরাষ্ট্র দফতরের সেক্রেটারীর নিকট লিখিত দরখাস্ত সম্পর্কে পুলিশকে কিছু বলিয়াছেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনি কি মনে করেন যে, এই দরখাস্তের বিবরণ সত্য বলিয়া মত প্রকাশ করিলে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তি আপনার বিরুদ্ধে যাইবে?
উত্তর–আমি তাহা মনে করি না।
প্রশ্ন–রাজারবাগে পুলিশ ক্যাম্পে থাকাকালে আপনাকে ডঃ নূরুল ইসলাম এবং ডঃ ওয়াকিল আহমদ নামক দুইজন চিকিৎসক কি পরীক্ষা করে নাই?
উত্তর–পরীক্ষা করিয়াছেন। তবে আমি তাঁহাদের নাম জানি না। আমি অসুস্থ ছিলাম বলিয়া চিকিৎসকরা পরীক্ষা করিয়াছেন।
প্রশ্ন–আপনার দেহে ক্ষতের জন্যই কি তাঁহারা আপনার চিকিৎসা করে নাই?
উত্তর–না।
প্রশ্ন– রাজারবাগ কেন্দ্রে কতদিন ছিলেন?
উত্তর–প্রায় ১৮ দিন।
প্রশ্ন–ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নেওয়ার পর আপনাকে ঢাকার সিভিল সার্জন কি পরীক্ষা করে নাই?
উত্তর–হ্যাঁ। আমি ১৯৪৫ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অস্থির যক্ষ্মায় (বোন টিবি) ভুগিয়াছিলাম। সেজন্য আমার পায়ে একটু খুঁৎ আছে।
প্রশ্ন–আমি বলি যে, পুলিশের নির্যাতনের ফলে আপনার রোগ-ব্যথা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে?
উত্তর–সত্য নয়।
প্রশ্ন–আপনাকে কি জেলা হাসপাতালে রাখা হয়েছিল?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–সিভিল সার্জন ছাড়া অন্য কোন ডাক্তার কি আপনাকে দেখিয়াছিল?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনাকে ষ্ট্রেচারে করিয়া নেওয়া হয় নাই?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–(অভিযুক্ত) মানিক চৌধুরী কি একজন ব্যবসায়ী?
উত্তর–হ্যাঁ। কমিশন এজেন্সীর একটি প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে।
প্রশ্ন–(অভিযুক্ত) বিধান কৃষ্ণ সেন কি সে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার?
উত্তর–আমি ঠিক জানি না। বিধান মানিক চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
প্রশ্ন–গ্রীন হোটেলের রেজিষ্টারে আপনার লিখিত নাম বিধান কৃষ্ণ সেনের হাতের লেখা নয়?
উত্তর–বিধান হোটেলের এন্ট্রিতে আমার নাম লিখিয়াছে।

প্রশ্ন– আপনার সহিত কি বিধানের ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–এই মামলার জন্য আপনি এই হাতের লেখাকে বিধানের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আপনি তাহার হাতের লেখা যে চিনেন না, ইহা কি সত্য নয়?
উত্তর–আমি বিধানের হাতের লেখা জানি।
প্রশ্ন–গ্রীন হোটেলের রেজিষ্টারের হাতের লেখা যে বিধানের ইহা কি আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলিয়াছেন?
উত্তর–আমার মনে নাই। (অনুরূপ রেকর্ড করা হয় নাই)।
প্রশ্ন–পুলিশের নিকট কি বলিয়াছেন?
উত্তর–আমি জানি না। (অনুরূপ রেকর্ড করা হয় নাই)।
প্রশ্ন–আপনার গৃহে (রফিউদ্দিন সিদ্দিকী বাই-লেন) কি কোন গাড়ী যাইতে পারে?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনি আদালতে বলিয়াছেন যে, পি, এন, ওঝা আপনার গৃহে গমন করিয়াছিল?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–ওঝা আপনার আবাসে গমন করিয়াছিল। তিনি কি আপনার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন?
উত্তর–আপনার দুই অবিবাহিত ছোটভাই বাহিরের বাড়ীর যে গৃহে বাস করে আমি তাহাকে সেখানে লইয়া গিয়াছিলাম।
প্রশ্ন– দুই ভাই কি করে?
উত্তর–এক ভাই একটি সরকারী অফিসে কাজ করে আর অপর ভাইয়ের একটি ছোট দোকান আছে।
প্রশ্ন–আপনার দুই ভাই বাহির বাড়ীর যে ঘরে বাস করিত ওঝা কি সে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল?
উত্তর–ওঝা আমার বাড়ীর প্রান্ত সীমানার একটি সঙ্কীর্ণ গলিপথে দাঁড়াইয়া আমার নাম ধরিয়া ডাকে। তখন আমি বাহির হইয়া আসিয়া পি, এন, ওঝাকে বাহির বাড়ীর গৃহে লইয়া যাই।
প্রশ্ন–আপনার গৃহ পর্যন্ত কি কোন মোটরগাড়ী যাইতে পারে?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–সেসময়ে বিধান কৃষ্ণ সেন কি জেলে ছিল?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–ওঝা যে মোটরগাড়ীতে আসিয়াছিল তাহা কোথায় ছিল?
উত্তর–আমি তাহার গাড়ী দেখি নাই। তিনি একলা আসিয়াছিলেন।

প্রশ্ন–বিদায় নেওয়ার সময় তাহার সহিত কি কিছুদূর গিয়াছিলেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনি পুলিশের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে অথবা ১লা অথবা ২রা আগষ্ট হঠাৎ একটি মোটরগাড়ী আগমন করে। আমার ড্রয়িংরুমের সম্মুখে আসিয়া থামিয়া যায় এবং ওঝা সে গাড়ী হইতে অবতরণ করে। ইহা কি আপনি পুলিশের নিকট বলেন নাই?
উত্তর–আমি পুলিশের নিকট ইহা বলি নাই।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলী আবদুস সালাম খান ট্রাইব্যুনালকে বলেন যে, পুলিশের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে ইহা রেকর্ড করা হইয়াছে।

দৈনিক পাকিস্তান
২৮শে আগস্ট ১৯৬৮
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমানের জেরা অব্যাহত
(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল মঙ্গলবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার চার নম্বর একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমানকে বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের জেরার দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হয়।

গতকাল বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশনের শুরুতে তিন নম্বর একরারী সাক্ষী সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদ তার সাক্ষ্যের বিবরণী পাঠ করে কিছু সংশোধনের পর সাক্ষরদান করেন।

গতকাল বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমানকে জেরা করেন।

জনাব আবদুস সালাম খান

প্র–আপনি বলেছেন যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। (এই পর্যায়ে কৌসুলী সাক্ষীকে আওয়ামী লীগের কর্মসূচী ও ৬ দফা কর্মপন্থার একটি প্রকাশিত পুস্তিকা প্রদান করেন।)।
পুস্তিকাটির দু'নম্বর পাতায় যে তাজুদ্দিন আহমদের নাম রয়েছে, তাঁকে কি আপনি চেনেন?
উ–হ্যাঁ। তাজুদ্দিন আহমদ তখন আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। এরপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী আওয়ামী লীগের এই পুস্তিকার 'শাসনতান্ত্রিক আদর্শ' শীর্ষক অংশ পড়ে শোনান। বাংলায় লিখিত পুস্তিকাটি কৌসুলী ইংরেজী অনুবাদ করে আদালতকে শোনান। আদালত বলেন যে, পুস্তিকাটির একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পেশ করতে হবে।

পুস্তিকাটিতে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ একটি জনগণের প্রতিষ্ঠান এবং এটি জনগণের সার্বভৌমত্বের ওপর বিশ্বাস করে। শাসনব্যবস্থার সমস্ত ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে। পুস্তিকাটিতে আরো বলা হয় যে, পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্যে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী আদায় আওয়ামী লীগের অন্যতম লক্ষ্য।

৬-দফা সম্পর্কে পুস্তিকাটিতে বলা হয় যে, কেন্দ্রের হাতে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র দফতর ছেড়ে দেওয়া হবে। ৬-দফা কর্মসূচীর তিন নম্বর দফায় দেশের উভয় অংশের জন্য দুটি পৃথক মুদ্রা প্রচলন অথবা বর্তমানের মত সমগ্র দেশের জন্য একই মুদ্রা প্রচলন থাকতে পারে, তবে সেজন্য শাসনতান্ত্রিকভাবে এই মর্মে আশ্বাস দিতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের মূলধন প্রেরণ বন্ধ করা যায় এবং উভয় প্রদেশের জন্য পৃথক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করতে হবে।

পুস্তিকাটিতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও দেশরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ৬-দফা কর্মসূচীর বক্তব্য রয়েছে। দেশরক্ষা সম্পর্কে বলা হয় যে, শাসনতন্ত্রে উভয় প্রদেশের আঞ্চলিক প্রতিরক্ষার জন্য আধা-সামরিক বাহিনী (প্যারা মিলিটারী) গঠনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
প্র–আপনি কি জানেন যে, ৬-দফা কর্মসূচী প্রথমে লাহোরে প্রকাশিত হয়?
উ–আমার ঠিক মনে নেই।
প্র–আপনি কি জানেন যে, ৬-দফা কর্মসূচীকে মন্ত্রীরা ও সরকারী ব্যক্তিরা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে উল্লেখ করেছিলেন?
উ–আমার ঠিক মনে নেই।
প্র–আপনি কি জানেন, এই ছয়-দফা কর্মসূচী প্রচারের জন্য শেখ মুজিবর রহমান প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভায় বক্তৃতা দেন?
উ–আমি কেবল চট্টগ্রামের একটি জনসভার কথাই জানি। সেখানে শেখ মুজিব ৬-দফা কর্মসূচীর কথা বলেন।
প্র–আপনি কি জানেন যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টও ৬-দফাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে উল্লেখ করেন এবং এর ফলে দেশকে গৃহযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেওয়া হবে এবং সেজন্য এই আন্দোলনকে ধ্বংস করা দরকার বলে মন্তব্য করেন। তিনি প্রয়োজন হলে "অস্ত্রের ভাষা" ব্যবহারের কথাও বলেছিলেন?
উ-আমার মনে নেই প্রেসিডেন্ট এসব কথা বলেছিলেন কি না।
প্র-আপনি কি জানেন যে, ছয়দফা কর্মসূচী প্রকাশের পর আওয়ামী লীগের বহুসংখ্যক কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়?
উ-হ্যাঁ, আমি জানি।

প্র-ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তানকে দেশরক্ষা ব্যবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করার একটা যে দাবী উঠেছিল তা কি আপনি জানেন?
উ–হ্যাঁ, জানি।
প্র–পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থানান্তরের দাবীও উত্থাপন করা হয় তা জানেন কি?
উ–জানি।
প্র–পূর্ব পাকিস্তানে একটা মিলিটারী একাডেমী ও অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থাপনের জন্য এদেশের জনসাধারণ দাবী জানিয়েছিলেন কি?
উ–হ্যাঁ।
প্র–কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে পূর্ব পাকিস্তানের সিনিয়র সিএসপি অফিসারদের ন্যায্য অংশ দেওয়ার দাবীর কথা কিছু জানেন?
উ–না, এটা আমার জানা নেই।
প্র-পূর্ব পাকিস্তানে কি নৌবাহিনীর সদর দফতর অথবা সামরিক একাডেমী স্থাপন করা হয়েছে?
উ–হয়নি।
প্র–অস্ত্র নির্মাণ কারখানা কি স্থাপন করা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে?
উ–জয়দেবপুরে স্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
প্র–আপনি যখন জয়দেবপুরে যান তখন কি অস্ত্র নির্মাণ কারখানা নির্মাণের কিছু দেখেন?
উ–না। এই অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থাপনের খবর আমি মাত্র মাস দুয়েক আগে খবরের কাগজে দেখি।
প্র–আপনি কি কোন চেম্বার অব কমার্স-এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন?
উ–না।
প্র–চট্টগ্রামে লবণ উৎপাদন হয় জানেন?
উ–হ্যাঁ, সমুদ্রের পানি থেকে লবণ উৎপাদন করা হয়।
প্র–এটা কি ধরনের শিল্প?
উ–কুটিরশিল্প।
প্র–আপনি কি জানেন, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এই লবণ উৎপাদনের ওপর কর ধার্য করেছেন? পশ্চিম পাকিস্তানী লবণ প্রদেশে বিক্রির সুবিধের জন্যই কি এটা করা হয়েছে?
উ–পশ্চিম পাকিস্তানী লবণ বিক্রির জন্যই এটা করা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।
(এই পর্যায়ে বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের আপত্তি জানিয়ে বলেন যে, প্রশ্নটির সঙ্গে মামলার কোন যোগসূত্র নেই। সুতরাং এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা উচিত নয়।)

প্র–আপনি জানেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে প্রচারিত হচ্ছিল?
উ–আমার জানা নেই।
প্র–পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনের দাবী পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু, বেলুচিস্থান সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ও সমর্থিত হচ্ছিল একথা জানেন কি?
উ–না।
প্র–আপনি জানেন কি যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যে কোন অংশ ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করে অথবা ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা করার কোন আন্দোলনই জনসাধারণের সমর্থন লাভ করতে পারে না?
উ–আমার জানা নেই।
প্র–ভারতের সঙ্গে যোগসাজস করা কি আপনি খারাপ মনে করেন না?
উ–হ্যাঁ। আমার মনে হয় এটা খারাপ।
প্র–আপনার কি মনে হয় যে, এই কাজের জন্য দেশবাসী তীব্র ঘৃণা করবে?
উ–আমার তা জানা নেই।
প্র–পাকিস্তানের জন্ম কি জন্য হয়?
উ–মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমির জন্যই পাকিস্তানের সৃষ্টি।
প্র–এটা কি সত্য নয় যে, সংখ্যাগুরু হিন্দুদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্যই পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয়েছে?
উ–হ্যাঁ, তাই।
প্র–দেশ বিভাগের পর থেকে এ পর্যন্ত ভারতে বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে ও বহু মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে, তাই নয় কি?
উ–হ্যাঁ, হাজার হাজার মুসলমান এসব দাঙ্গায় নিহত হয়েছে।
প্র–আমি মনে করি, ভারতীয় দূতাবাসের মিঃ পি এন ওঝার সঙ্গে আপনার যোগাযোগের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বানোয়াট?
উ–না, এটা বানোয়াট নয়।
প্র–আমি মনেকরি, পূর্ব পাকিস্তানদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের সহানুভূতি নষ্ট করার জন্যই এই মামলা তৈরী করা হয়েছে?
উ–না, একথা সত্য নয়। আসামীদের দেশদ্রোহী রূপে চিহ্নিত করার জন্য এটা করা হয়নি।
প্র–পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া চাপ দেওয়ার জন্য এটা করা হয়েছে, তাই না?
উ–না, একথা সত্য নয়।

প্র–স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর কাছে লেখা চিঠির কথা কি আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছিলেন?
উ–না।
প্র–পুলিশের কাছে?
উ–না।
প্র–আপনার কি মনে হয়েছিল যে, যদি আপনি চিঠির কথা স্বীকার করেন তবে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়া আপনার বিবৃতির অর্থের কোন পরিবর্তন হয়ে পড়বে?
উ–না, তেমন কিছু হত বলে আমার মনে হয় না।
প্র–রাজারবাগে থাকাকালীন আপনাকে যে দুজন চিকিৎসক পরীক্ষা করেন, তাদের নাম জানেন? কেন তাঁরা আপনাকে পরীক্ষা করেন?
উ–তাঁদের আমি চিনি না। আমি অসুস্থ ছিলাম বলে তাঁরা আমাকে পরীক্ষা করেন।
প্র–আচ্ছা, আপনাকে কি ডাঃ নূরুল ইসলাম ও ডাঃ ওয়াকার আহমদ পরীক্ষা করেন?
উ–আমি বলতে পারি না।
প্র–আমার মনে হয়, আপনার ওপর শারীরিক অত্যাচার করার ফলেই আপনি অসুস্থ হন এবং সেজন্যই চিকিৎসকরা আপনাকে পরীক্ষা করেন তাই না?
উ–না, এটা ঠিক নয়।
প্র–আপনি রাজারবাগ সেন্টারে মোট কতদিন ছিলেন?
উ–আঠার দিন।
প্র–আপনি কি সিভিল সার্জেন্টকে চেনেন?
উ–না।
প্র–আপনার কি অসুখ?
উ–আমি ১৯৪৫-৪৭ সাল থেকে কোমরের বেদনায় ভুগছি।
প্র–আমার মনে হয়, আপনার ওপর শারীরিক অত্যাচার করার ফলে আপনার এই অসুখটা আরো বেড়ে যায়?
উ–না, একথা ঠিক নয়।
প্র–জেলখানায় আপনাকে কে পরীক্ষা করেন?
উ–জেল ডাক্তার আমাকে এবং অন্যান্য বন্দীদের পরীক্ষা করেন।
প্র–আপনাকে কি কখনও স্টেচারে করে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়?
উ–না।
প্র–মানিক চৌধুরী কি ব্যবসায়ী?
উ–তাদের একটি পারিবারিক কমিশন এজেন্ট-এর ব্যবসা আছে।

প্র–বিধান কৃষ্ণ সেন কি মানিক চৌধুরীর পার্টনার?
উ–আমি জানি না।
প্র-আমার মনে হয় যে, হোটেল গ্রীনের রেজিস্টারে বিধানকৃষ্ণ সেন আপনার নাম লেখেনি?
উ–না, একথা ঠিক নয়।
প্র–বিধান কৃষ্ণ সেনের সঙ্গে কি আপনার কোন ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে?
উ–না।
প্র-আপনি কি কখনও তাঁর সঙ্গে স্কুলে পড়েছেন?
উ–না।
প্র-আপনার বাড়ী থেকে বিধান কৃষ্ণ সেনের বাড়ী কত দূর?
উ–প্রায় ৪/৫ মাইল হবে।
প্র–আমার মনে হয়, আপনি কোনদিন বিধান কৃষ্ণ সেনের হাতের লেখা চিনতেন না?
উ–না, একথা ঠিক নয়।
প্র-১৯৬৬ সালের ২৪শে এপ্রিল গ্রীন হোটেলের রেজিস্টারে বিধান কৃষ্ণ সেন যে আপনার নাম লিখেছেন, সে কথা কি আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছেন?
উ–আমার মনে পড়ছে না।
প্র–পুলিশের কাছে কি এই কথা বলেছেন?
উ-তাও মনে পড়ছে না।
প্র-মানিক চৌধুরীর বাড়ী আপনার বাড়ী থেকে কত দূর?
উ–প্রায় ৬/৭ মাইল হবে।
প্র–মানিক চৌধুরীর বাড়ীতে কি ড্রইংরুম আছে?
উ–হ্যাঁ, তাঁর বাড়ীতে বসার ঘর আছে আর একটা পৃথক ঘর আছে, সেখানে ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে লোকজন যাতায়াত করে।
প্র-আপনার বাড়ী যে এলাকায়, সেখানে তো রিয়াজউদ্দিন রোডই সবচেয়ে বড় রাস্তা?
উ–না, এর চেয়েও বড় রাস্তা রয়েছে।
প্র–আপনার বাড়ীটা কোন রাস্তার ওপরে?
উ–রফিউদ্দিন সিদ্দিকী বাইলেনে।
প্র–আপনার বাড়ীটা বাইলেনের কোন দিকে?
উ–পূর্বদিকে।
প্র–আপনার পিতার মাজার তো বাইলেনের পাশেই?
উ–হ্যাঁ।

প্র–মাজারের পাশে আপনার যে আউটার হাউস রয়েছে তার পাশে তো আর একটা বাড়ী রয়েছে?
উ–হ্যাঁ।
প্র-আপনার বাড়ীর পরে একটা ছোট জায়গা, তারপর মুজিবর রহমান নামে এক ব্যক্তির বাড়ী, তাই না? তিনি সপরিবারে থাকেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র– রফিউদ্দিন সিদ্দিকী বাইলেন থেকে আপনার বাড়ী যেতে আর একটা লেন পড়ে?
উ–আমার বাড়ীতে মুজিবর রহমানের বাড়ী ছাড়িয়ে যেতে হয়। রফিউদ্দিন সিদ্দিকী বাইলেন থেকে আমার বাড়ী যেতে কোন বাইলেন পড়ে না–ওটা একটা ছোট ফাঁকা জায়গা।
প্র–আপনি বলেছেন যে, মিঃ ওঝা আপনার বাসভবনে এসে উপস্থিত হলে আপনি অবাক হয়ে যান?
উ–মিঃ ওঃঝা আমার বাসায় এসে আমার নাম ধরে ডাকতে শুরু করেন। আমি বেরিয়ে এসে তাঁকে নিয়ে আমার আউট হাউসে গমন করি, যেখানে আমার দুটি ছোট ভাই থাকে।
প্র–আপনারা কয় ভাই?
উ–চার ভাই। পাশের বাড়ীর মুজিবর রহমান আমার ভাই।
প্র–বিধান কৃষ্ণ সেন কি তখন কারাগারে ছিলেন?
উ–না।
প্র–আপনি কি মিঃ ওঝার গাড়ী দেখেন?
উ–না, আমি মিঃ ওঝার গাড়ী দেখিনি।
প্র–আউটার হাউসে কোথায় বসে আপনারা কথাবার্তা বলেন?
উ–দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলি।
প্র–মিঃ ওঝাকে আপনি গাড়ীতে তুলে দেন?
উ–না, আমি তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেই। তারপর তিনি একাই চলে যান।
প্র–আপনি কি পুলিশের কাছে বলেছেন যে, হঠাৎ একটি গাড়ী এসে আপনার ড্রইং রুমের সামনে থামে এবং মিঃ ওঝা এসে ঘরে প্রবেশ করেন?
উ–আমি পুলিশের কাছে এমন কথা বলিনি।
প্র–১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসের বৈঠকে কিভাবে একটা প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করা হবে সে সম্পর্কে আপনি কি মানিক চৌধুরীকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন?
উ–জী না। এ সম্পর্কে বৈঠকে আমি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু পরে তিনি আমাকে বলেছেন যে, সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত পূর্ব পাকিস্তানীরা বিদ্রোহ করবে এবং বলপূর্বক সরকারী ক্ষমতা দখল করবে।

প্র–মানিক চৌধুরী আপনাকে আর কিছু বলেছিলেন?
উ–জী না। তিনি শুধু সামরিক বাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানী কর্মচারীদের বিদ্রোহের কথাই আমাকে বলেছিলেন।
প্র–সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যার হার কত?
উ–তা আমার জানা নেই।
প্র–সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার সম্পর্কে আপনি কি মানিক চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?
উ-জী না।
প্র–পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে লেফটেনেন্টের উপরের পদসমূহে পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার কত–এ সম্পর্কে তিনি আপনাকে কি কিছু বলেছেন?
উ-জী না। ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করা হত বলে আমার জিজ্ঞাসা সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি।
প্র–সামরিক বাহিনীর অফিসারের পদসমূহে পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার মানিক চৌধুরীর জানা ছিল কি?
উ-এ ব্যাপারে তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছি। তবে তিনি বলেছেন যে, এসব ব্যাপার গোপনীয়। এছাড়া অফিসার পদে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা তাঁর জানা ছিল কিনা তা আমি জানি না।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানীদের আনুপাতিক হার ২৫ঃ১ এবং অফিসার পদে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানীদের হার ৯০ঃ১ কিনা তাঁর জানা নেই।
প্র–আন্দোলনের জন্যে এসব তথ্য যে গুরুত্বপূর্ণ সেটা আপনি উপলব্ধি করেছিলেন কি?
উ-জী হ্যাঁ। আমি এসবের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম। গোপনীয়তা রক্ষার কারণ দেখিয়ে তিনি আমাকে এসব বলেননি।
প্র–আন্দোলন সম্পর্কে আপনি কি আপনার রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী বন্ধুদের নিকট কোন কিছু বলেছিলেন?
উ–জী-না।
প্র–আন্দোলনের জন্যে আপনি কি অর্থ সাহায্য করেছিলেন?
উ-জী-না।
প্র–আপনি কি আন্দোলনের জন্যে সদস্য সংগ্রহ বা এ ব্যাপারে কারও সাথে যোগাযোগ করেছিলেন?
উ–জী-না।

এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তাঁর ডিসপেনসারী–চট্টগ্রামের বাটালী রোডের পাশে অবস্থিত। ডিসপেনসারীতে ৩টি কামরা আছে। এর মধ্যে একটিতে ঔষধের স্টক, অন্যটিতে চেম্বার ও অপরটিতে রোগী দেখা হয়।

প্র–১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান কি একাই আপনার ডিসপেনসারীতে গিয়েছিলেন?

উ–জী হ্যাঁ।

প্র–তাঁর সাথে কখন এবং কোথায় আপনার প্রথম সাক্ষাৎ হয়?

উ–১৯৬৫ সালের নবেম্বর মাসে আমার ডিসপেনসারীতে স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

এরপর সাক্ষী আবার বলেন যে, ১৯৬৫ সালের নম্বেবর মাস বলতে তিনি ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর বুঝতে চেয়েছেন।

প্র–আপনার নিকট তাঁর পরিচয় কি বলে দেওয়া হয়?

উ–তাঁকে স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান বলে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। পরে মানিক চৌধুরী আমাকে বলেছেন যে, তিনি নৌবাহিনীর জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার।

প্র–মানিক চৌধুরী পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান আপনাকে কিছু বলেছিলেন কি?

উ– জী না।

প্র–কোন সময়ে তাঁরা প্রথম আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন?

উ–বিকেল সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে। এটা আমার রোগী দেখার সময় ছিল।

প্র–আপনি কি তাঁদের বলেছিলেন যে, এটা আপনার রোগী দেখার সময় এবং পরে আপনি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন?

উ–জী না।

প্র–১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরের আগে কি আপনাকে মানিক চৌধুরী সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলেছিলেন?

উ–জী না। এর আগে তিনি কখনও সশস্ত্র বিপ্লবের কথা আমাকে বলেননি।

প্র–আপনার সাথে যোগাযোগ করার আগে আপনার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন আওয়ামী লীগ কর্মীর সাথে আন্দোলনের ব্যাপারে যোগাযোগ করা হয়েছিল কি?

উ–আমি জানি না।

প্র–আপনাকে কি কোন সময় টিআই প্যারেডের সম্মুখীন হতে হয়েছিল?

উ–জী হ্যাঁ। ১৯৬৮ সালের মে মাসে আমাকে টিআই প্যারেডের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

প্র–মিসকা কি চট্টগ্রাম শহরের একটি নামকরা হোটেল?

উ–হ্যাঁ।

প্র–সেখানে আপনার যাতায়াত ছিল কি?

উ-জী হ্যাঁ। আমি মাঝে-মধ্যে সেখানে গিয়েছি এবং খানা খেয়েছি।

প্র–আপনাকে কোথায় টিআই প্যারেডের সম্মুখীন হতে হয়েছিল?

উ-ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আমার টিআই প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।

প্র–মিসকা হোটেলের কাউকে কি আপনাকে সনাক্ত করার জন্যে আনা হয়েছিল?

উ–আমি জানি না।

প্র–ক'বার আপনার টিআই প্যারেড হয়েছিল?

উ–একবার মাত্র।

প্র–এটা কি সত্য যে, মিসকা হোটেল থেকে যাঁকে আনা হয়েছিল তিনি আপনাকে সনাক্ত করেননি?

উ-তা আমার জানা নেই।

প্র–একথা কি সত্য যে, টিআই প্যারেডে আমীর হোসেন মিয়া আপনার সাথে ছিলেন?

উ–জী না। একথা সত্য নয়।

প্র–মিঃ বিধান কৃষ্ণ সেনকে কি টিআই প্যারেডে ফেলা হয়েছিল?

উ-আমি তা জানি না।

প্র–স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান কাদের মিটিং-এর জন্যে আপনার নিকট জায়গা চেয়েছিল?

উ–স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান সামরিক বাহিনীর ও বেসামরিক লোকদের বৈঠকের জন্যে জায়গা করে দিতে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন।

প্র–আপনি কি আগে বলেছিলেন যে, শুধু সামরিক বাহিনীর কতিপয় কর্মচারীর সভা অনুষ্ঠানের জন্যে জায়গা চাওয়া হয়েছিল?

উ–মানিক চৌধুরী আমাকে বলেছিলেন যে, সামরিক বাহিনীর কয়েকজন কর্মচারী আসবেন এবং বৈঠক করবেন।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত তাঁর বাড়ীতে ৪জন সামরিক বাহিনীর কর্মচারী এসেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে, তাঁর বাড়ীতে তাঁদের ৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই চারজন সামরিক কর্মচারীর মধ্যে ৩জন নৌ-বাহিনীর বেসে থাকতেন। আর লেঃ মোয়াজ্জম হোসেন নাসিরাবাদে থাকতেন।

প্র–আপনি কি কখনও লেঃ মোয়াজ্জমের নাসিরাবাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন?

উ–জী না।

প্র–অপর ৩ জন নেভাল বেসের কোন জায়গায় থাকতেন?
উ–তা আমার সঠিক জানা নেই।
প্র–বিপ্লবীদের কটি বৈঠকে আপনি যোগ দিয়েছিলেন?
উ-মোট তিনটি বৈঠকের মধ্যে দুটিতে আমি যোগ দিয়েছিলাম।
কারণ,তাদের প্রথম বৈঠকে বেসামরিক লোক বলে আমাকে ও মানিক চৌধুরীকে থাকতে দেওয়া হয়নি।
প্র–আপনি যে বৈঠকে প্রথম যোগ দিয়েছিলেন তাতে কি কি আলোচনা হয়েছিল?
উ–সে বৈঠকে বল প্রয়োগে ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা দখলের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এছাড়া স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের ক্যান্টনমেন্টগুলোর অবস্থান সম্পর্কেও আলোচনা করেছিলেন।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জবাবে একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান আরও বলেন যে, এল এস সুলতান, স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান ও আমীর হোসেন মিয়াকে নেভাল বেসে মিটিং-এর জায়গা না করে তাঁর বাড়ীতে করা হয় কেন সে সম্পর্কে সে কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি। এছাড়া তাঁর বাড়ীতে বৈঠক করার সময় তাঁর দু'ভাই সবসময়েই বাহিরে ছিল।
প্র–আপনার ভাইরা কি দৈবাৎ ঘরে থেকে বাহিরে ছিলেন না কি তাদের বাইরে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল?
উ–ঘর থেকে তাঁদের অনুপস্থিতি দৈবাৎও নয় অথবা তাদেরকে বলে-কয়েও বাইরে রাখা হয় নাই। তবে সাধারণত বিকেল বেলায় তারা বাইরে থাকত এবং সে সময়টাতে তাদের থাকার ঘরে বৈঠক হয়েছিল।
প্র–এইসব বৈঠকের কোন আলোচ্যসূচী বা সময় নির্ধারিত ছিল?
উ–জীনা, বৈঠকের আলোচ্যসূচী বা সময় নির্ধারিত করা ছিল না।
প্র–লেঃ মোয়াজ্জমের নাসিরাবাদের বাড়ীটি কি তাঁর নিজস্ব?
উ–জী না। সেটা তাঁর ভাড়াটে বাড়ী ছিল এবং সে বাড়ীতে একটি ড্রইং রুম আছে।
প্র–আপনাদের বৈঠকগুলো অনুষ্ঠানের সময় লেঃ মোয়াজ্জম হোসেন কি নাসিরাবাদে থাকতেন?
উ–তা আমার জানা নেই।
প্র–কোন মাস বা তারিখ থেকে তিনি নাসিরাবাদে থাকতেন?
উ–তাও আমার জানা নেই।
প্র–আপনার বাড়ীতে আন্দোলনের সর্বশেষ বৈঠক কখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উ–১৯৬৬ সালের জুন মাসে। এর আগের মিটিং পনের দিন পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে জুন মাসের কোন তারিখে সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলতে পারছি না।

প্র–আওয়ামী লীগের সভায় যোগদানের জন্য আপনি কবে ঢাকা এসেছিলেন?
উ–১৯৬৬ সালের ২০শে মে আমি আওয়ামী লীগের সভায় যোগদানের জন্যে ঢাকা এসেছিলাম।
প্র–আওয়ামী লীগের সভার কত দিন পর আপনার বাড়ীতে বিপ্লবী দলের বৈঠক হয়েছিল?
উ–আওয়ামী লীগের সভার ১৫/১৬ দিন পর আমার বাড়ীতে আন্দোলনের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
প্র–মিসকা হোটেলের বৈঠকে আমীর হোসেনকে মানিক চৌধুরী যে তিন হাজার টাকা দিয়েছিলেন তা তিনি কোথেকে সংগ্রহ করেছিলেন?
উ–আমি জানি না।
প্র–এই টাকা কি চাঁদা হিসাবে দেয়া হয়েছিল না হাওলাত দেওয়া হয়েছিল?
উ–তাও আমার জানা নেই।
প্র–মিসকা হোটেলের বৈঠকে স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান কি আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন?
উ–তা আমার স্মরণ নেই।
প্র–যাঁরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরকে কি আমীর হোসেন মিয়া কর্মী সংগ্রহ ও আন্দোলনের গতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন?
উ–এ ব্যাপারে আমীর হোসেন মিয়া কিছু জিজ্ঞেস করেননি।
প্র–আপনি কি আমীর হোসেন মিয়াকে এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করেছিলেন?
উ–জী না। আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে আমি তাঁদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করি নাই।
এক প্রশ্নের জবাবে স্বাক্ষী বলেন যে, মিসকা হোটেলে আমীর হোসেন মিয়া তাঁকে বলেছিলেন যে, পুরানো ঢাকায় তিনি একটি বাড়ী ভাড়া করবেন এবং তাঁকে (স্বাক্ষীকে)তার ঠিকানা দিয়েছেন।
প্র–মিসকা হোটেলের বৈঠকের ক'মাস পর আপনি ঢাকা এসেছিলেন?
উ–দু'মাস পর আমি ঢাকা এসেছিলাম।
প্র–এই দু'মাসের মধ্যে আমীর হোসেন মিয়ার সাথে আপনার প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ ছিল?
উ–জী না।
প্র–এই সময়ের মধ্যে ঢাকা আসলে আপনি কি আমীর হোসেন মিয়ার সাথে যোগাযোগ করতেন?
উ–জী না। তাঁর সাথে আমি যোগাযোগ করতাম না।
প্র–এই সময়ের মধ্যে আমীর হোসেন মিয়ার সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল কি?
উ–জী না।

প্র–এটা কি সত্য যে, আপনার চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের কর্মী বন্ধুদের সাথে ঢাকা আসলে আপনি গ্রীণ হোটেলে থাকতেন?
উ–জী না। এ কথা সত্য নয়।
প্র–এপ্রিল মাসে ঢাকা এসে আপনি কোথায় আমীর হোসেন মিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন?
উ-১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় এসে আমীর হোসেন মিয়ার বাড়ীতে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি।
প্র–জয়দেবপুরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কখন হয়েছিল?
উ–আমীর হোসেন মিয়ার বাড়ীতে তাঁর সাথে আলোচনার পর আমাদের জয়দেবপুর যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।
প্র–জয়দেবপুরে সামরিক বাহিনীর অফিস আছে বলে আপনি জানতেন কি?
উ–জী না। এর আগে তা আমার জানা ছিল না।
প্র–জয়দেবপুর যাওয়ার আগে আপনি হোটেল গ্রীণ থেকে আমীর হোসেন মিয়াকে কি টেলিফোন করেছিলেন?
উ-জী না। আমি আমীর হোসেন মিয়াকে টেলিফোন করিনি।
এছাড়া তাঁর বাসায় টেলিফোন ছিল বলেও আমার জানা ছিল না।
প্র–পুলিশের নিকট জবানবন্দীতে আপনি টেলিফোন করেছিলেন বলে বলেছিলেন?
উ–জী না। আমীর হোসেন মিয়াকে টেলিফোন করেছি–একথা আমি পুলিশের নিকট বলিনি।
(পুলিশের নিকট ডাঃ সাইদুর রহমানের জবানবন্দীতে আছে "গ্রীন হোটেলে অবস্থানকালে হঠাৎ আন্দোলনের প্রতি সামরিক বাহিনীর কর্মচারীদের কথা আমার মনে পড়ে এবং আমি তখন আমীর হোসেন মিয়াকে টেলিফোন করি"।)
প্র–কোথেকে আপনারা জয়দেবপুর যাত্রা করেছিলেন?
উ–সকাল আটটায় বেবীট্যাক্সিযোগে গ্রীন হোটেল থেকে আমরা জয়দেবপুর যাত্রা করি।
প্র–সেখান থেকে জয়দেবপুর কতদূর?
উ–গ্রীন হোটেল থেকে জয়দেবপুরের দূরত্ব আমার জানা নেই।
প্র–কতক্ষণ পর আপনারা জয়দেবপুর পৌঁছেন?
উ–প্রায় এক ঘণ্টা পর।
প্র–পথে আমীর হোসেন মিয়ার সাথে আপনার আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল কি?
উ–জী না।

প্র–মিসকা হোটেলে আপনার নিকট আমীর হোসেন মিয়া তাঁর কি পরিচয় দিয়েছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী প্রথমে বলেন যে, আমীর হোসেন মিয়া পরিসংখ্যান অফিসার বলে তাঁর পরিচয় দেন নাই। পরে তিনি আবার বলেন যে, আমীর হোসেন মিয়া পরিসংখ্যান অফিসার বলে পরিচয় দিয়েছেন।

প্র–পুলিশের নিকট আপনি কি বলেছিলেন যে, জয়দেবপুর যাওয়ার পথে আমীর হোসেন মিয়া আপনার নিকট পরিসংখ্যান অফিসার বলে তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন?
উ–জী না। আমি তা বলি নাই। (পুলিশের রেকর্ডে তা আছে)।
প্র–জয়দেবপুর গিয়ে আপনারা কোথায় নামলেন?
উ–আমরা গিয়ে একটি রাস্তার পার্শ্বে নামলাম এবং একটি ছোট বাড়ীতে গেলাম।
প্র–সেটা কার বাড়ী?
উ–সে বাড়ীটা ছিল সামরিক বাহিনীর অফিসের অংশ।
প্র–সেই বাড়ীর রুমে কি হয়েছিল?
উ–সে কামরায় ২/৩ জন ইউনিফরম পরা সামরিক কর্মচারী ও সাদা পোশাকের চারজন লোক ছিলেন। আমীর হোসেন মিয়া তাঁদেরকে সামরিক বাহিনীর কর্মচারী বলে আমাদের নিকট পরিচয় করিয়ে দেন এবং আমাদেরকে তাঁর বন্ধু বলে পরিচয় করান।
প্র–পোশাক দেখে আপনি কি সামরিক অফিসারদের পদমর্যাদা বলতে পারবেন?
উ–জী না। আমি তা পারব না।
প্র–সেখানে আন্দোলন সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়েছিল কি?
উ–জী না।

এরপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান আসামীর হাতে গ্রীন হোটেলের একটি রেজিষ্ট্রার বুক দিয়ে জিজ্ঞেস করেন। এই বইয়ের ১১৬ ও ১১৯ পৃষ্ঠায় আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন?
উ– আমি ১৯৬৬ সালের ১৫ই মার্চ ও ১০ই জুলাই আমার গ্রীন হোটেলে অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ আছে বলে দেখতে পাচ্ছি।

এখানেই গতকালকের মত জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা অসমাপ্ত থাকে। আজ বুধবার পুনরায় ডাঃ সাইদুর রহমানকে জেরা করা হবে।

সংবাদ

২৯শে আগস্ট ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

চতুর্থ রাজসাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমানের জেরা অব্যাহতঃ

ভারতীয় হাই কমিশন অফিসে গমন ও মিঃ ওঝার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে–

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (বুধবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে রাজসাক্ষী সাইদুর রহমান বলেনঃ তিনি ১৯৬৬ সালের মে মাসে ঢাকা আসিয়াছিলেন এবং হোটেল আরজুতে অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি হোটেল রেজিষ্টারে তাঁহার নামের এন্ট্রি দেখিতে অসমর্থ হন। অনুরূপভাবে ১৯৬৬ সালের আগষ্ট মাসে তিনি ঢাকায় আগমন করিয়া হোটেল গ্রীনে অবস্থানের কথা প্রকাশ করিলেও রেজিষ্টারে তাঁহার নাম লেখান নাই বলিয়া কোর্টকে জানান। ১৯৬৬ সালের মে মাসে শেখ মুজিবের গ্রেফতারের অব্যবহিত পরে আওয়ামী লীগ কর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড় এবং তাঁহাদের উপর কড়া নজর রাখা সত্ত্বেও ভারতীয় হাই কমিশন অফিসে যাতায়াতকে তিনি বিপজ্জনক মনে করেন নাই বলিয়া রাজসাক্ষী স্বীকারোক্তি করেন।

এইদিন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী পুনরায় শুরু হইলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার উত্তরে সাক্ষী উপরোক্ত তথ্যগুলি প্রকাশ করেন।

গত সোমবার হইতে ৪র্থ রাজসাক্ষীর জেরা চলিতেছে। গতকাল বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম খান কর্তৃক তৃতীয় দিবসে জেরা অব্যাহত রহিয়াছে। আজ (বৃহস্পতিবার) সকাল ৯টায় ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইবে।

জেরার বিবরণ

এইদিন জনাব সালাম খান ১৯৬৬ সালের মে মাস হইতে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ বিভিন্ন সময়ে সাক্ষীর ঢাকা আগমন ও অবস্থান এবং ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের ফার্ষ্ট সেক্রেটারীর সহিত কথিত সভা ইত্যাদির উপর জেরা করেন।

বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি সাক্ষীর হাতে মানিক চৌধুরীর লেখা একখানা দরখাস্ত অর্পণ করেন। উহাতে রাজারবাগ পুলিস কেন্দ্রে তার উপর অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী বিবৃত ছিল।

জনাব সালাম খানের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী স্বীকার করেন যে, উক্ত দরখাস্তখানা মানিক চৌধুরীর এবং দরখাস্তের নীচে মানিক চৌধুরীর স্বাক্ষর রহিয়াছে।

কিন্তু গ্রেফতারের পর রাজারবাগ পুলিস কেন্দ্রে মানিক চৌধুরীর উপর পুলিস যে নির্যাতন চালায় সাক্ষী উহা জানেন না বলিয়া জবাব দেন।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, মানিক চৌধুরীর সহিত তাকে রাজারবাগে একসঙ্গে রাখা হয় নাই বা তাদের উভয়কে একত্রে জেলখানায়ও ফেরত পাঠানো হয় নাই।

অতঃপর কৌসুলি জনাব সালাম খান সাক্ষীকে হোটেল গ্রীনের রেজিষ্টারের ১১৭নং পৃষ্ঠার ১৮২৪নং এন্ট্রি দেখিতে বলেন।এই এন্ট্রিতে বি, কে, সেন এণ্ড পার্টি নামের আগে Departure কলামে ২৬শে এপ্রিল লেখা ছিল।

প্রঃ আপনি কি ২৬ তারিখের উপর কোন কাটাকাটি দেখতে পাচ্ছেন?

উ ঃ হ্যাঁ, আমি ২৬ লেখাটির উপর কাটাকাটি দেখতে পাচ্ছি।

প্র ঃ এই তারিখ পরিবর্ত্তন কে করেছে?

উ ঃ এটা কে করেছে আমি জানি না।

প্র ঃ আমি যদি বলি যে, আপনার জ্ঞাতসারে ইচ্ছাকৃতভাবে আপনাদের জয়দেবপুর যাবার তারিখের সাথে সঙ্গতি রেখে এই তারিখের পরিবর্তন করা হয়েছে?

উ ঃ আমার জানা মতে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ এ পরিবর্ত্তন করেছে তা' সত্যি নয়।

অতঃপর জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীকে ১৯৬৬ সালের মে মাসে ঢাকা আগমন এবং হোটেল আরজুতে অবস্থান সম্পর্কে বহু সংখ্যক প্রশ্ন করেন।

প্র ঃ আপনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিতে বলেছিলেন যে, ১৯৬৬ সালের মে মাসে আওয়ামী লীগের জরুরী সভায় যোগ দেবার জন্য ঢাকায় এসেছিলেন?

উ ঃ না। সাক্ষী বলেন, পুলিসের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতেও তা বলেননি।

প্রঃ আপনি কি আরজু হোটেলে অবস্থান করছিলেন?

উ ঃ হ্যাঁ।

প্র ঃ কয়দিন ছিলেন?

উঃ তিন দিন।

প্র ঃ হোটেল রেজিষ্টারে আপনি নাম এন্ট্রি করেছিলেন?

উ ঃ করেছিলাম।

প্র ঃ আপনি কবে ঢাকায় আগমন করেছিলেন?

উ ঃ ১৯শে মে, ১৯৬৬।

অতঃপর কৌসুলি জনাব সালাম খান হোটেল আরজুর রেজিষ্টার সাক্ষীর হাতে অর্পণ করিয়া তাহাকে হোটেল রেজিষ্টারে তাহার অবস্থা সম্পর্কিত এনট্রি দেখিতে বলেন।

সাক্ষী রেজিষ্টার দেখিয়া বলেন, তিনি রেজিষ্টারে উক্ত সময়ে তার নাম দেখিতে পাইতেছেন না।

প্রঃ আপনি বলেছেন, ১৯৬৬ সালের ২০শে মে সকালে ও বিকেলে আওয়ামী লীগের ২টি অধিবেশন বসেছিল। আর আপনি ছিলেন হোটেল আরজুতে এবং মানিক চৌধুরী ছিলেন হোটেল গ্রীনে। হোটেল আরজু নবাবপুর আর হোটেল গ্রীন ময়মনসিংহ রোডে, তাই না?

উ ঃ হ্যাঁ।

প্র ঃ এ দু' হোটেলের মধ্যে দূরত্ব কত?

উ ঃ এক থেকে ২ মাইল।

প্র ঃ হোটেল আরজু থেকে ১৫ পুরানা পল্‌টনে আওয়ামী লীগ অফিসের দূরত্ব কত?

উ ঃ ১ মাইল।

প্র ঃ আওয়ামী লীগ অফিস থেকে হোটেল গ্রীনের দূরত্ব কত?

উঃ প্রায় এক মাইল।

প্র ঃ হোটেল আরজু থেকে গ্রীন হোটেলে যেতে আওয়ামী লীগ অফিসের নিকটে তোপখানা রোড দিয়ে যেতে হয় কি?

উঃ আমার জানা নেই।

প্র ঃ হোটেল আরজু থেকে নবাবপুর রেল ক্রসিং অতিক্রম করে, গুলিস্তান পার হয়ে প্রাদেশিক সেক্রেটারীয়েট হয়ে কি হোটেল গ্রীনে যেতে হয় না?

উ ঃ হ্যাঁ।

অতঃপর কৌসুলী সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন। সেক্রেটারীয়েটের কোণ থেকে (পুরানা পলটনের মোড়) আওয়ামী লীগ অফিসের দূরত্ব কত?

উ ঃ প্রায় ৪ শত গজ।

প্রঃ মোড়ে অবস্থিত পেট্রোল পাম্প থেকে আওয়ামী লীগ অফিসের দূরত্ব কত?

উঃ প্রায় দুইশত গজ।

সাক্ষী পরে বলেন যে, পেট্রোল পাম্পের পিছনে আওয়ামী লীগ অফিস। মধ্যখানে একটি রাস্তা রহিয়াছে।

প্র ঃ আওয়ামী লীগের জরুরী সভা কয়টায় অনুষ্ঠিত হয়?

প্র ঃ সকাল ১০টা।

প্র ঃ আপনি ঐ তারিখে মিঃ ওঝার অফিস থেকে কখন বেরিয়েছেন?

উ ঃ সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে।

প্র ঃ হোটেল গ্রীনে কখন পৌছান?

উঃ সম্ভবতঃ সকাল সাড়ে ১০টায়।

প্রঃ আপনি কখনও কোলকাতা গিয়েছেন?

উঃ না।

প্রঃ আজমীর শরীফ?

উঃ না।

প্রঃ কিভাবে ছাড়পত্র পেতে হয় জানেন কি?

উঃ জানি।

প্র ঃ ছাড়পত্র (পাসপোর্ট) কোথা থেকে নিতে হয়?

উঃ পাকিস্তানের অফিস থেকে।

প্রঃ ঢাকায় পাকিস্তান পাসপোর্ট অফিস কোথায়?

উ ঃ আমি জানি না।

হোটেল গ্রীনে অবস্থান সম্পর্কে

গতকাল পূর্বাহ্নে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার উত্তরে রাজসাক্ষী ডাঃ সাঈদুর রহমান বলেন যে, তিনি ১৯৬৬ সালের ১০ই জুন হোটেল গ্রীনে অবস্থান করেন। হোটেল রেজিষ্টারের ১২৯ পৃষ্ঠায় এন্ট্রি অনুযায়ী তিনি হোটেলে অবস্থানের কথা স্বীকার করেন। ঐ বছর ২৫শে জুন অপর এক এন্‌ট্রিতেও দেখা যায় যে, সাক্ষী এই হোটেলে ছিলেন। অবশ্য এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী স্বীকার করেন যে, উক্ত এন্‌ট্রি তাহার হাতে লেখা নহে।

রেজিষ্টারের ১২৫নং পৃষ্ঠায় অপর এক এন্‌ট্রি অনূযায়ী সাক্ষী বলেন যে, তিনি ১৯৬৭ সালের ৮ই মার্চ হইতে ১৬ই মার্চ অবধি হোটেল গ্রীনে ছিলেন। ৩০শে মার্চ এক এন্‌ট্রি অনূযায়ী সাক্ষীর হোটেল গ্রীনে অবস্থান এবং ঢাকা সফরের উদ্দেশ্য কলামে মেডিক্যাল রেজিষ্ট্রেশন লাভের কথা রহিয়াছে। রেজিষ্টারের ১২৬নং পাতায় এন্‌ট্রি অনূযায়ী ১৯৬৭ সালের ১৩ই এপ্রিল সাক্ষী হোটেল গ্রীনে ছিলেন বলিয়া স্বীকার করেন। এই সময়ে 'ব্যবসায়' উপলক্ষে ঢাকায় আসিয়াছিলেন বলিয়া লেখা রহিয়াছে।

সাক্ষী হোটেল রেজিষ্টারের ১২৫নং পাতায় ২১৯৪ ক্রমিক নম্বরের ঘরগুলি খালি রহিয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন।

অতঃপর ১৩০নং পাতায় ২৫৯৬ ক্রমিক নম্বরের পরে পরপর তিনটি এন্‌ট্রি রহিয়াছে বলিয়া রেজিষ্টার দেখিয়া তিনি জানান। এই সকল নম্বর হইলঃ ২৫০০, ২৫৯৮ ও ২৫৯৯। কিন্তু প্রতিটি ক্রমিক নম্বরে ৫ অঙ্কটি কাটিয়া ৬ করা হইয়াছে বলিয়া সাক্ষী জানান।

সাক্ষী বলেন যে, ২৫৯৬ ক্রমিক নম্বরের সামনে মানিক চৌধুরীর স্বাক্ষর রহিয়াছে।

আর তাঁহার নামের নীচেই সাক্ষীর নামের এন্‌ট্রি রহিয়াছে বলিয়া জানান। তাহার নীচে রহিয়াছে এম,এম রহমান এবং পরবর্তী এন্‌ট্রি হইলেন মিঃ এবং মিসেস ভূইয়া।

উল্লেখযোগ্য যে, জনাব সালাম খান এই পর্যায় পর্যন্ত আসিয়া প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া অন্যান্য প্রশ্ন করেন। পরে তিনি পুনরায় সাক্ষীকে হোটেল রেজিষ্টারের ১৩০নং পাতার এনট্রিগুলির উপর পুনরায় জেরা করেন এবং সাক্ষীকে যখন তাহার নামের ক্রমিকনং কত জিজ্ঞাসা করেন তখন তিনি বলেনঃ "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত পাতায় ক্রমিক নম্বর ২৫৯৬-এর পর ক্রমিকনং ২৫০০, ২৫৯৮ ও ২৫৯৯ (৫ অঙ্ক কেটে ৬ করা হয়েছে) ছিল।

জনাব সালাম খান পুনরায় হোটেল গ্রীনের রেজিষ্টারের ১৩১নং পাতার উপর সাক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং উহা দেখিয়া সাক্ষী বলেন যে, এন্ট্রি অনুযায়ী তিনি ১৯৬৭ সালের ২২শে জুলাই হইতে ২৪শে জুলাই এ হোটেলে ছিলেন। অতঃপর ১৩৩নং পাতার এন্ট্রি অনুযায়ী সাক্ষী ১৯৬৭ সালের ৩০শে আগষ্ট হইতে ৩১শে আগষ্ট এই হোটেলে ছিলেন বলিয়া জানান। তাঁহার সফরের উদ্দেশ্য 'ব্যবসায়' বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে।

চট্টগ্রাম ষ্টেশনে ওঝা

বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীর নিকট চট্টগ্রাম রেলওয়ে রিফ্রেশমেন্ট রুমে মিঃ ওঝার গমন সম্পর্কে তথ্যাদি অবগত হইবার জন্য বহু সংখ্যক প্রশ্ন করেন।

সাক্ষী জেরার উত্তরে বলেন যে, তিনি চট্টগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনে "রিফ্রেশমেন্ট" রুমে মিঃ ওঝার সাথে সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

প্রঃ এটা কি সত্য যে, চট্টগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনের 'রিফ্রেশমেন্ট' রুমে বিপুলসংখ্যক লোক যাতায়াত করে থাকেন এবং তথায় খানাপিনা করেন?

উঃ এটা সত্য।

প্র ঃ ঢাকার দিকে কয়খানা নৈশ ট্রেন ছাড়া হয়?

উ ঃ দু' খানা।

প্র ঃ কখন কখন ছাড়ে?

উ ঃ একখানা রাত প্রায় ৮টা ও অপর গাড়ীটা রাত সাড়ে ১০টা।

সাক্ষী পরে আরও বলেন যে, তিনি রাত ৮টার ট্রেনের কথা শুনিয়াছেন; কিন্তু তিনি কখনও এ ট্রেনে ভ্রমণ করেন নাই।

প্রঃ আপনি মিঃ ওঝাকে ট্রেনে তুলে দিয়েছিলেন কি?

উঃ না। আমি রিফ্রেশমেন্ট রুমের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে তার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাই। তাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার সময় আমার ছিল না।

প্রঃ অস্ত্রশস্ত্রের যে তালিকা আপনি মিঃ ওঝার হাতে দিয়েছিলেন সেটা কি খামে আবদ্ধ ছিল?

উঃ না। খোলা খামের মধ্যে ছিল।

সাক্ষী আরও বলেন যে, খামের উপর কোন ঠিকানা ছিল না। তাছাড়া তিনি তালিকাটি খুলিয়া দেখেন নাই বা কত পৃষ্ঠার তালিকা ছিল তাহাও তাঁহার জানা নাই।

প্র ঃ আপনাকে কখন খামটি দেওয়া হয়েছিল?

উঃ আগের দিন রাত ৯টা সাড়ে ৯টার দিকে। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁর বাড়ীতে আমাকে খামটি দেন। আর আমি পরদিন সন্ধ্যা প্রায় ৭টার দিকে মিঃ ওঝার হাতে দিই।

প্র ঃ তাহলে খামটি দুদিন ধরে আপনার কাছেই ছিল?

উ ঃ না। আমি আমার আলমারীর মধ্যে রেখেছিলাম।

প্র ঃ মিঃ ওঝা কখন চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন?

উ ঃ আমি জানি না।

আওয়ামী লীগারদের প্রতি পুলিসের কড়া নজরের প্রেক্ষিতে অস্ত্রের তালিকাটি স্বহস্তে প্রদানের জন্য "আপনি লেঃ মোয়াজ্জেমকে বলেননি" এই মর্মে কোর্টের এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, "হ্যাঁ আমি বলেছিলাম"। কিন্তু লেঃ মোয়াজ্জেম বলিয়াছিলেন যে, তাহা তাহার পক্ষে করা বিপজ্জনক হইবে। কেননা তাঁহার পরিচয় ফাঁস হইয়া গেলে আন্দোলনটাই বরবাদ হইয়া যাইবে।

অতঃপর জনাব সালাম খানের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, অপর কারোর মারফতে তালিকাটি প্রেরণের জন্য তিনি লেঃ মোয়াজ্জেমকে বলেন নাই।

প্রঃ আওয়ামী লীগারদের প্রতি পুলিসের কড়া নজরের প্রেক্ষিতে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে আপনাদের মনের অবস্থার কথা জানিয়েছিলেন কি?

উঃ না ।

প্রঃ উক্ত সময়ে তাঁর সাথে ঢাকা যাওয়াকে বিপজ্জনক বলে মনে করেছিলেন কি?

উ ঃ না।

প্র ঃ লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ও মিঃ ওঝা উভয়ের চট্টগ্রাম উপস্থিতির প্রেক্ষিতে তাঁদের চট্টগ্রামে সভায় মিলিত হবার জন্যে বলেছিলেন কি?

উ ঃ না।

প্র ঃ আপনি যখন অস্ত্রের তালিকাটি মিঃ ওঝার হাতে দিয়েছিলেন তখন লেঃ মোয়াজ্জেম কোথায় ছিলেন?

উ ঃ তার নাসিরাবাদ বাসভবনে।

সাক্ষী আরও বলেন যে, নাসিরাবাদ কলোনী থেকে রেলওয়ে ষ্টেশনের দূরত্ব প্রায় ২ মাইল হইবে।

অতঃপর কৌসুলি 'কারযোগে' লেঃ মোয়াজ্জেম ও সাক্ষীর ঢাকা রওয়ানা হওয়ার প্রশ্নে বহুসংখ্যক প্রশ্ন করেন।

প্র ঃ আগষ্টের কোন্ সপ্তাহে আপনি ও লেঃ মোয়াজ্জেম কারযোগে ঢাকা রওয়ানা হয়েছিলেন?
উ ঃ আমি বলতে পারি না। সাক্ষী অনুমান করিয়াও বলিতে পারেন নাই।
সাক্ষী আরও বলেন যে, সকালের নাস্তা না করিয়াই তাহারা ঢাকা রওয়ানা হইয়াছিলেন।
অতঃপর তাহারা ফেনীতে আসিয়া নাস্তা গ্রহণ করেন। সকাল ৮/৯ টার দিকে তাহারা ফেনী পৌঁছান।
প্র ঃ কারটি ২ দরজা অথবা ৪ দরজা বিশিষ্ট ছিল?
উ ঃ আমার স্মরণ নেই।
প্র ঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে আপনি 'হিলম্যান' কারের কথা উল্লেখ করেননি?
উ ঃ আমি স্মরণ করতে পারছি না– আমি বলেছিলাম কিনা। (ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে প্রদত্ত বিবৃতিতে কারের নাম উল্লেখ করা হয় নাই)।
"পুলিসের নিকটে 'হিলম্যান' কারের কথা উল্লেখ করেছিল কিনা"–এই মর্মে এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, "আমার স্মরণ নাই।" (এভাবে রেকর্ড হয়নি)। সাক্ষী আরও বলেন যে,তিনি যে লেঃ মোয়াজ্জেমের কারযোগে ঢাকা গিয়াছিলেন সেকথা পুলিসের নিকট বলিয়াছিলেন কিনা, তাহা তাঁহার মনে নাই। (কারটি কার ছিল পুলিসের নিকট উল্লেখ করা হয় নাই)।
প্র ঃ কখন কুমিল্লায় পৌঁছান?
উ ঃ সকাল ১০টা কি সাড়ে ১০টায়।
প্র ঃ চট্টগ্রামে মিঃ ওঝার সাথে সাক্ষাতের কতদিন পরে আপনারা ঢাকা রওয়ানা হয়েছিলেন?
উঃ আমার মনে নেই।
প্র ঃ আপনি কি পুলিসের নিকটে বলেছিলেন যে, কুমিল্লা পৌঁছানোর পর লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আপনাদের গাড়ীতে বসিয়ে রেখে ক্যাপ্টেন শামসুল আলমের সাথে দেখা করেন?
(পুলিসের নিকট এভাবে রেকর্ড হইয়াছে)।
উঃ আমি বলিনি। সাক্ষী বলেন যে, কুমিল্লা পৌঁছানোর পর তাঁহারা ক্যাপ্টেন শামসুল আলমের ড্রয়িং রুমে যান। তথায় তাঁহাকে আমাদের নিকটে পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সাক্ষীকে পরিচয় করানো হয় নাই।
প্র ঃ কোথায় আপনার দুপুরের খাওয়া হয়?
উ ঃ আমরা একটি হোটেলে দুপুরের খানাপিনা করি।
প্র ঃ সপ্তাহের কোন্ দিনে আপনারা কুমিল্লা পৌঁছান?
উঃ আমার স্মরণ নাই।

সাক্ষী অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, কোন্ হোটেলে তাহারা খানাপিনা করেন তাহা বলিতে পারেন নাই। তিনি কুমিল্লায় ইহার আগে আসিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত হোটলে যান নাই। সাক্ষী আরও বলেন যে, কুমিল্লায় একটি রেষ্ট হাউজ আছে। পরে বলেন, তিনি শুনিয়াছেন রেষ্ট হাউজ আছে।একাধিক রেষ্ট হাউজ আছে কিনা, সাক্ষী বলিতে পারেন না। তিনি অপর প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ইহার আগে একবার মাত্র তিনি কারযোগে ঢাকা গিয়াছিলেন।

আবার হোটেল গ্রীনে

ঢাকা পৌঁছানোর পর সাক্ষী বলেন যে, তিনি হোটেল গ্রীনে উঠিয়াছিলেন। তবে কতদিন এই যাত্রায় হোটেল গ্রীনে অবস্থান করিয়াছিলেন তাহা তিনি বলিতে পারেন না। আরও একাধিক দিন হইবে বলিয়া তিনি জানান।
সাক্ষী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, এই যাত্রায় তিনি হোটেল গ্রীনে আবস্থান করিলেও রেজিষ্টারে নাম এন্ট্রি করেন নাই।
বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান এই পর্যায়ে বলেনঃ "আমি বলছি– আপনি আদৌ এই সময়ে ঢাকায় আসেন নি' বা হোটেল গ্রীনেও অবস্থান করেন নি।"
উ ঃ তা সত্য নহে।
প্রঃ আমি বলছি আপনি ১৯৬৬ সালের ১৯শে মে ঢাকায় আসেন নি এবং হোটেল আরজুতে ছিলেন না?
উঃ তা সত্য নয়।
প্রঃ ১৯৬৬ সালের আগষ্ট মাসে ঢাকায় আগমনের পরে আপনি লেঃ মোয়াজ্জেমের বাসভবনে গিয়েছিলেন?
উঃ না। আমি যাইনি। তবে তিনি ধানমণ্ডিতে যে বাড়ীতে থাকতেন সেটা আমি জানি।
প্রঃ নিউ মার্কেটের নিকটে ধানমণ্ডিতে অবস্থিত বৃহৎ পেট্রোল পাম্প থেকে মিঃ ওঝার বাসভবনের দূরত্ব কত?
উঃ আঁকাবাঁকা পথে রাত্রিকালে আমাদের মিঃ ওঝার বাড়ীতে নেওয়া হয় বলে আমি 'দূরত্ব' কত তা বলতে পারি না।

সাক্ষী আরও বলেন যে, পুলিসের নজর এড়ানোর উদ্দেশ্যে এই আঁকাবাঁকা পথের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছিল বলিয়া তিনি আমাদের জানাইয়াছিলেন। কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং কোথায় লইয়া যাওয়া হয় সাক্ষী তাহাও বলিতে পারেন না– তবে সব কয়টি রাস্তাই বড় ছিল । মিঃ ওঝার বাড়ীটিও একটি বড় রাস্তার উপর বলিয়া সাক্ষী জানান। সাক্ষী বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, তিনি রাস্তার নাম বা বাড়ীর নম্বরও বলিতে পারেন না।

অপর কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, দ্বিতীয় রাজধানী এলাকা হইতে মিঃ ওঝার বাড়ী কোন পথে যাইতে হয় তিনি বলিতে পারেন না। হোটেল সাকুরা থেকেও মিঃ ওঝার বাড়ী কোন পথে যাইতে হয় তাহাও তিনি বলিতে পারিবেন না।

প্রঃ ১৯৬৬ সালের আগষ্ট মাসে মিঃ ওঝার বাড়ীতে সভার পর কখন তিনি আপনাদের দ্বিতীয় রাজধানীতে নামিয়ে রেখে যান?

উ ঃ রাত প্রায় ১০টায়।

সাক্ষী বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেম একখানা রিকশাযোগে তার আত্মীয়ের বাড়ীর দিকে যান। তবে কোন দিক দিয়ে গিয়েছেন সাক্ষী তা বলতে পারেন না।

সাক্ষী বলেন যে, তিনিও একটি অটোরিকশা করে হোটেল গ্রীনে চলে আসেন। অবশ্য লেঃ মোয়াজ্জেম আগে অথবা সাক্ষী আগে রওয়ানা হয়েছেন তাও তিনি বলতে পারেন না। এই পর্যায়ে কৌসুলি বলেনঃ রাত ১০টার দিকে দ্বিতীয় রাজধানী এলাকায় একখানা বেবী ট্যাক্সি পাওয়াও দূরূহ ব্যাপার নয় কি? সাক্ষী তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই।

সাক্ষী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের বাসভবন কোথায় তা তিনি বলতে পারেন না। তিনি উক্ত ভবনে কখনও যাননি বলে জানান।

অতঃপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলি বলেনঃ মিঃ ওঝার সাথে সভা অনুষ্ঠান, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ বা আর্থিক সাহায্য লাভের কাহিনী আপনাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। সাক্ষী উত্তরে বলেনঃ এটা সত্য নয়।

কৌসুলির প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, সাকুরা রেস্তোরাঁর সম্মুখে নির্মিত তোরণের কয়েক গজের মধ্যে দুই দিকে দুইটি বড় রাস্তা রহিয়াছে।

প্রঃ এ রাস্তার সংযোগস্থলে রাতে কি কোন ট্রাফিক কনষ্টেবল থাকে?

উ ঃ জী না, রাতে কোন ট্রাফিক কনষ্টেবল থাকে না।

প্র ঃ ট্রাফিক কনষ্টেবলরা যে রাত ৮টায় চলে যায়, আপনি কি তা জানেন?

উ ঃ জী না, আমি জানি না।

প্র ঃ যে রাস্তায় তোরণটি রয়েছে তাতে কি সবসময় যানবাহনের ভিড় থাকে?

উ ঃ জী, সবসময়েই ভিড় থাকে।

প্রঃ সাকুরা রেস্তোরাঁর সামনের বড় রাস্তা অপেক্ষা ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকায় যানবাহনের ভিড় কি বেশী, না কম?

উঃ ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা তুলনামূলকভাবে শান্ত। সেখানে ভিড় কিছুটা কম।

প্রঃ আমি যদি বলি, ১৯৬৬ সনের সেপ্টেম্বরে আপনি গ্রীন হোটেলে ছিলেন না এবং তখন ঐ হোটেলে আপনাদের কোন বৈঠক হয়নি?

উঃ তা ঠিক নয়।

প্রঃ ১৯৬৬ সনের সেপ্টেম্বরে গ্রীন হোটেলে আপনি যে অবস্থান করেছিলেন, হোটেল রেজিষ্টারে আপনার নাম আছে?

উ ঃ না, রেজিষ্টারে আমার নাম দেখছি না।

প্রঃ পি, এন, ওঝাকে আপনি কোথেকে টেলিফোন করেছিলেন?

উঃ টেলিগ্রাফ অফিসের পাবলিক বুথ থেকে।

প্রঃ ঐ টেলিগ্রাফ অফিসটা কোনখানে?

উঃ গুলিস্তানের কাছে।

প্রঃ গ্রীন হোটেল থেকে গুলিস্তান কত দূরে?

উঃ দু' মাইলের কম হবে।

প্রঃ আপনি কি পায়ে হেঁটে শ্রী ওঝার বাসায় যেতে পেরেছিলেন?

উ ঃ জী না।

প্রঃ এরপর পি, এন, ওঝার সাথে আপনার কবে সাক্ষাৎ হয়?

উ ঃ ১৯৬৬ সনের অক্টোবর বা নভেম্বরে। মাসের নাম আমার ঠিক মনে নেই।

প্রঃ সেপ্টেম্বরের সাক্ষাতের ঠিক এক মাস পরে না তার সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে?

উঃ ঠিক এক মাস পরে কিনা আমি স্মরণ করতে পাচ্ছি না।

প্রঃ তখন আপনি কোথায় অবস্থান করেন?

উঃ গ্রীন হোটেলে।

প্রঃ ১৯৬৬ সনের অক্টোবর বা নভেম্বরে গ্রীন হোটেলে যে আপনি অবস্থান করেছেন হোটেল রেজিষ্টারে আপনার নাম রয়েছে?

উঃ রেজিষ্টারে আমার নাম দেখছি না।

প্রঃ পি, এন, ওঝার সাথে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারের বৈঠকের জন্যে আপনি কি চট্টগ্রাম থেকে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সাথে ঢাকা এসেছিলেন?

উঃ জী না, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সাথে আসিনি।

প্রঃ ঢাকা আসার আগে প্রতিবারই কি আপনি পি, এন, ওঝাকে কোন খবর দিতেন?

উঃ জী না।

প্রঃ পি, এন, ওঝা যখন গোপন আলোচনার জন্যে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে পাশের কক্ষে নিয়ে যান তখন আপনি কি কিছু মনে করেছিলেন?

উঃ না, আমি কিছু মনে করিনি।

প্রঃ লেঃ মোয়াজ্জেম যখন তাদের গোপন আলোচনার বিষয়বস্তু জানান, আপনি কি তা বিশ্বাস করেছিলেন?

উঃ জী, বিশ্বাস করেছি।

প্রঃ তারা গোপনে যা আলোচনা করেছিলেন, আপনি কি মনে করেন তা আপনার সামনেই করা যেতো?
উঃ আমার সামনে করা যেতো না বলে আমি মনে করি না।
প্রঃ কাজের অগ্রগতি এবং ওঝার সাথে এ বৈঠক সম্পর্কে মানিক চৌধুরীকে আপনি কবে জানান?
উঃ ১৯৬৭ সনের জানুয়ারীতে কারাগার থেকে তাঁর মুক্তি লাভের পর।
প্রঃ মানিক চৌধুরীর মুক্তি লাভের পর আপনি কি তাকে বলেছিলেন যে, এখন থেকে পি এন ওঝার সাথে তাঁকে যোগাযোগ করতে হবে?
উঃ না। মানিক চৌধুরীকে আমি একথা বলিনি।
প্রঃ মানিক চৌধুরীর মুক্তির পর মোয়াজ্জেম হোসেন ও ওঝার মধ্যে কথাবার্তা ও যোগাযোগ কি মানিক চৌধুরীর মাধ্যমে চলে?
উ ঃ মানিক চৌধুরীর মাধ্যমে চলে কিনা, আমি জানি না।
প্রঃ মানিক চৌধুরীর মুক্তির পর আপনি মোয়াজ্জেম হোসেন ও পি, এন, ওঝার মধ্যে যোগাযোগ বা বৈঠকের কোন ব্যবস্থা করেছিলো কি?
উঃ না, আমি করিনি।
প্রঃ আমি যদি বলি, এ মামলায় সাক্ষী হওয়ার জন্যেই পি,এন ওঝা, মোয়াজ্জেম হোসেন ও মানিক চৌধুরীর বৈঠকে আপনার উপস্থিতির কথা বানানো হয়েছে?
উঃ না, তা ঠিক নয়।
প্রঃ মিঃ পি, এন, ওঝা আর মোয়াজ্জেম হোসেনের মধ্যে কখনও এবং কোন সময়েই কোন বৈঠক হয়নি, তাই না?
উঃ এ কথা সত্যি নয় যে, পি এন ওঝা আর মোয়াজ্জেম হোসেনের মধ্যে কখনও কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি।
প্রঃ ঢাকায় পি এন ওঝার সহিত আপনি যখন সাক্ষাৎ করতে আসেন তখন হোটেল গ্রীনে অবস্থান করা সত্ত্বেও হোটেলের রেজিষ্টারে আপনার নাম এনট্রি নেই কেন?
উঃ মিঃ পি, এন, ওঝার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলাম বলেই আমি হোটেল রেজিষ্টারে আমার নাম এন্ট্রি করিনি।
ইহার পর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী জানান যে, গত ১৯৬৭ সালের ৮ই মার্চ আমি ঢাকায় আসি এবং হোটেল গ্রীনের রেজিষ্টারে আমার উপস্থিতি রেকর্ড করি।
প্রঃ এই তারিখে আপনি কি উদ্দেশ্যে ঢাকায় এসেছিলেন?
উঃ এবারেও আমি ঢাকায় এসেছিলাম পি এন ওঝার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে।

প্রঃ মানিক চৌধুরী কি আপনার সঙ্গে এসেছিলেন?
উঃ না। ঐদিন অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের ৮ই মার্চ মানিক চৌধুরী আমার সহিত ঢাকায় আসেন নাই।
এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেনঃ লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৬৭ সালের ৮ই মার্চ ঢাকায় ছিলেন।
প্রঃ তিনি আপনাদের সাথে কখন দেখা করেন?
উঃ ১৯৬৭ সালের ১০ই মার্চ রাত ৯টার পূর্বে হোটেল গ্রীনে।
প্রঃ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন কবে ঢাকায় এসেছিলেন জানেন কি?
উঃ লেঃ মোয়াজ্জেম কবে এবং কখন ঢাকায় এসেছিলেন তা আমি ঠিক জানি না।
প্রঃ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সহিত আপনার সাক্ষাতের পূর্বে আপনি কি খোঁজ নিয়ে ছিলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ঢাকায় আছেন কি না?
উঃ না। তাহার সহিত সাক্ষাতের পূর্বে আমি খোঁজ নিয়ে দেখিনি যে, তিনি ঢাকায় এসেছেন কি না।
প্রঃ ওঝার সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা কে করেছিলেন?
উঃ মানিক চৌধুরী ওঝার সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন এবং ৯ই মার্চ বেলা দুটোয় সে (মানিক চৌধুরী) একথা আমাকে জানান।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলির এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান চট্টগ্রামে গিয়া আমাদের জানান যে, সমরাস্ত্র সাহায্যের বিষয়টি চূড়ান্তকরণের জন্য আমাদের ওঝার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। এরপর মানিক চৌধুরী আমাদের জানান যে, আমরা ১০ই মার্চে ওঝার সহিত সাক্ষাৎ করিব। ইহার পর ষ্টুয়ার্ড মূজিবর রহমান মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকটে যান এবং তাহাকে একথা জানান, কোথায় আমি তা জানি না সম্ভবতঃ ঢাকায় কিম্বা বরিশালে।

সাক্ষী বলেন, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান কবে আমাদের সহিত দেখা করেন এবং চট্টগ্রামে এই বৈঠক সম্পর্কে আমাদের বলেন, আমার তা মনে পড়ছে না; সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে।
প্রঃ বৈঠকের তারিখের কথা কে আপনাকে জানাইয়াছিল?
উঃ প্রকৃতপক্ষে মানিক চৌধুরীই আমাকে বৈঠকের তারিখ জানাইয়াছিলেন।
প্রঃ এটা আপনি ঢাকায় আসার কদ্দিন আগে?
উঃ আমি ঢাকায় আসার কদ্দিন আগে মানিক চৌধুরী আমায় একথা জানিয়েছিলেন তা আমার ঠিক মনে পড়ছে না।
প্রঃ ১৯৬৭ সালের ১০ই মার্চ লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আপনার সঙ্গে হোটেল গ্রীনে দেখা করেননি, তাই না?
উঃ না, একথা সত্যি নয়।

প্রঃ ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে আপনি কি সেখানে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের সহিত সাক্ষাৎ করেছিলেন?
উঃ না। ঢাকা থেকে ফিরে গিয়ে আমি লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেমের সহিত সাক্ষাৎ করিনি।
প্রঃ শ্রী পি, এন, ওঝার সাথে সাক্ষাতের পর লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের সাথে কবে, কোথায় আপনার সাক্ষাৎ হয়?
উঃ পরদিন গ্রীন হোটেলে।
প্রঃ সেদিন কি মানিক চৌধুরীর আসার কথা ছিল?
উঃ জী, তিনি সেদিন আসবেন বলেছিলেন।
প্রঃ শ্রী ওঝা কোন্ জায়গা থেকে আপনাদের ছেড়ে যান?
উঃ বৈঠকের পর দ্বিতীয় রাজধানীর নিকট থেকে।
প্রঃ শ্রী ওঝা মানিক চৌধুরীকে যে ৫ হাজার টাকা দিয়েছিলেন, লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনও কি তা জেনেছেন?
উঃ আমি বলতে পারি না।
প্রঃ লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন তখন কোথায় ছিলেন?
উঃ মানিক চৌধুরীর যখন "কিছু একটা" পকেটে রাখছিলেন, লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন তখন একই বৈঠকখানায় ছিলেন। অবশ্য তিনি আমার কাছ থেকে কিছুটা দূরে ছিলেন।
প্রঃ এবারও কি শুধু লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ও শ্রী ওঝার মধ্যেই আলোচনা হয়?
উঃ জী তাদের দু'জনের মধ্যেই শুধু আলোচনা হয়।
প্রঃ মানিক চৌধুরীর পরণে কি ছিল?
উঃ ফুলপ্যান্ট।
প্রঃ দ্বিতীয় রাজধানীর কাছে শ্রী ওঝা আপনাদের নামিয়ে দেয়ার পর আপনাদের মধ্যে কি কোন আলোচনা হয়েছে?
উঃ জী না, আমাদের মধ্যে কোন আলোচনা হয়নি।
প্রঃ সেখান থেকে আপনারা কিসে করে গেলেন?
উঃ আমি আর মানিক চৌধুরী একটা বেবীট্যাক্সী করে আমাদের হোটেলে যাই। লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আর একটা বেবীট্যাক্সী নেন।
প্রঃ ওখানে নামার সাথে সাথেই কি বেবীট্যাক্সী পেয়েছিলেন?
উঃ জী না, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়।
প্রঃ ঐসময় মানিক চৌধুরী টাকা সম্পর্কে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের সাথে কি আলাপ করেন নি?
উঃ আমরা তিনজন একত্রে ছিলাম। কিন্তু তাদের আলাপ করতে দেখিনি।

প্রঃ পরদিন টাকা নিতে এসে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন কিছু বলেন নি?
উঃ জী না, পরদিন তিনি টাকা নিয়ে যান। কিন্তু কিছু বলেন নি।
কৌসুলির প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, ১৯৬৭ সনের ১০ই এবং ৩১শে মার্চ লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ও মানিক চৌধুরীর সঙ্গে যাওয়া ছাড়া ঐ সময় আর কিছু করেন নি।
প্রঃ মানিক চৌধুরী কবে ঢাকা এসেছিলেন?
উঃ ১৯৬৭ সনের ২৯শে মার্চ আমার আগেই তিনি এসেছিলেন।
প্রঃ তখন কি আপনারা হোটেল গ্রীনের রেজিষ্টারে নাম লিখিয়েছিলেন?
উঃ হ্যাঁ, আমরা উভয়েই হোটেল গ্রীনের রেজিষ্টারে নাম লিখিয়েছিলাম।
প্রঃ আমি যদি বলি হোটেল গ্রীনের এন্ট্রির ভিত্তিতেই শ্রী ওঝার সাথে ১০ই ও ৩১শে মার্চ বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বানানো হয়েছে?
উঃ না, এটা ঠিক নয়।
প্রঃ আপনি কবে ঢাকা এসেছিলেন?
উঃ ১৯৬৭ সনের ৩০শে মার্চ।
প্রঃ হোটেল রেজিষ্ট্রারে আপনার ক্রমিক নম্বর কত?
উঃ ১২৬ পৃষ্ঠায় ২১৫২ নম্বর।
প্রঃ ঐ পৃষ্ঠায় পরবর্তী ক্রমিক নম্বর কত?
উঃ ২১৮৩।
প্রঃ ঐ হোটেলের ১২৩ পৃষ্ঠায় ১৯৯১ ক্রমিক নম্বরে কোন এন্ট্রি আছে?
উঃ জী না, কোন এন্ট্রি নাই।
সাক্ষী বলেন, তেজগাঁও রেলক্রসিং তিনটি বড় রাস্তার সংযোগ স্থল।
প্রঃ সেখানে কি কোন ট্রাফিক পুলিস থাকে?
উঃ হ্যাঁ, সেখানে ট্রাফিক পুলিস থাকেন।
সাক্ষী বলেন, আমরা অর্থাৎ আমরা তিনজন হোটেল গ্রীন থেকে একসঙ্গে সেখানে পৌঁছুলাম। মিঃ ওঝার সহিত সাক্ষাতের পর আমরা তিনজন যখন ফিরে আসি তখন আমাদের পরিকল্পিত বৈঠকের তিনটি স্থানের কোনটির ব্যাপারেও আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়নি।
প্রঃ এ ব্যাপারে লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন কোন আলোচনা করেছিলেন কি?
উঃ না। ঐ তিনটি স্থান বৈঠকের উপযুক্ত কি না সে সম্পর্কে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আমাদের সহিত কোন আলোচনা করেন নি।
প্রঃ উক্ত মিটিং বা বৈঠকের কোন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল কি?
উঃ না। এ মিটিংয়ের কোন তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি।

সাক্ষী বলেন, আরও কোন বৈঠকের তারিখ ধার্য করা হইয়াছিল কিনা তাহাও তিনি জানেন না। তিনি বলেন, ভারতীয় অফিসারদের সহিত বৈঠকের স্থান ও তারিখ নির্ধারণের জন্য আর কোন বৈঠকের তারিখ ধার্য করা হইয়াছিল কি না তাহা তিনি (সাক্ষী) জানেন না।

প্রঃ মানিক চৌধুরী এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কোন আলোচনা করেছিলেন কিনা?

উঃ না। মানিক চৌধুরীও এ বিষয়ে পরে আমার সঙ্গে কোন আলোচনা করেন নি।

এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন অথবা মিঃ ওঝা ও আমাদের একথা বলেননি যে, প্রতিনিধিদের নাম ইতিমধ্যেই নির্বাচন করা হইয়াছে।

বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলির এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, একথা বলা ঠিক হবে না যে, একটি মিথ্যা মামলাকে জোরদার করার জন্যই আমি এইসব বৈঠকের কথা বলিতেছি।

সাক্ষী বলেন, আমার মনে পড়ে যে ১৯৬৭ সালের ৬ই জুলাই আমি ঢাকায় আসি।

প্রঃ বিশেষ কি এমন কারণ আছে যেজন্য এ তারিখটা আপনি মনে রেখেছেন?

উঃ না, এই তারিখ মনে রাখার পিছনে বিশেষ কোন কারণ নেই।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৭ সালের ৬ই জুলাই হোটেল গ্রীনে আমার উপস্থিত সম্পর্কিত এন্ট্রির যে ক্রমিক সংখ্যা রহিয়াছে তাহা আমার নিকট খুব স্পষ্ট নহে। আগের ক্রমিক সংখ্যা ২৫৯৬। আমার এন্ট্রির ক্রমিক সংখ্যার পরবর্তী ক্রমিক সংখ্যা ২৫৯৮। সেটাও খুব স্পষ্ট নহে। আমার এন্ট্রির ক্রমিক সংখ্যা দেখিয়া আমি একথা বলিতে পারি না যে, আমার সিরিয়ালনং ২৫৯৭।

সাক্ষী বলেন, ইতিপূর্বে আদালতে আমার ক্রমিক সংখ্যা ২৫৯৭ বলে আমি যে উক্তি করিয়াছে, তাহা এই রূপ ভাবিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে, ইহা এই ক্রমিক সংখ্যা হওয়া উচিত।

কৌঁসুলির অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারে আমি যখন উপস্থিত হই তখন সেখানে অন্যান্যের মধ্যে কি কি আলোচনা হইয়াছে না হইয়াছে সে সম্পর্কে আমি কিছু জানিতাম না। মানিক চৌধুরী লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে বলেন, বৈঠকে আমাদের উভয়কেই অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া উচিত। সাক্ষী বলেন, ১৯৬৭ সালের ৭ই জুলাইয়ে এই বৈঠকের পূর্বে আমি গোলাম আহমেদের সহিত সাক্ষাৎ করি। গ্রীন স্কোয়ার বৈঠকে একজনই মাত্র অপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। সে ব্যক্তি কে তাহা আমরা জিজ্ঞাসা করি নাই। সাক্ষী বলেন যে, ১৩নং গ্রীন স্কোয়ার একটি কোটা বাড়ী কুটির নহে।

প্রঃ সেই বাড়ীতে কতগুলি কামরা ছিল?

উঃ আমি মাত্র দুটি কামরা দেখেছি; কিন্তু সেখানে আরও কামরা থাকতে পারে। সেখানে তিনটি শয্যাও খালি দেখেছি।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি লুৎফুল হুদাকে চেনেন?

উঃ জী না।

প্রঃ ওই সময় রমিজ নামে কাউকে চিনতেন?

উঃ না, চিনতাম না। তবে তার নাম শুনেছি। আমি তাকে প্রথম পুলিস অফিস ও চট্টগ্রাম জেলে দেখি। তার আগে নয়।

প্রঃ আপনি কি জানেন গোলাম আহমদ ও রমিজ এ মামলার আসামী?

উঃ জানি না।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, মোয়াজ্জেম হোসেন মানিক চৌধুরীকে জানান যে, টাকাপয়সা পার্টির কাজে ব্যয় হইতেছে। তবে তিনি উহার বিস্তারিত হিসাব প্রদান করেন নাই। সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি ১৯৬৭ সালের ৭ই জুলাই পুনরায় শ্রী ওঝার সঙ্গে দেখা করেন তখন সঙ্গে মানিক চৌধুরী ও লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন।

প্রঃ এ উপলক্ষে কার সঙ্গে আপনি ঢাকা আসেন?

উঃ মানিক চৌধুরীর সঙ্গে। এই বৈঠকের ব্যবস্থা পূর্বেই করা হয়েছিল।

প্রঃ ১৯৬৭ সালের ২২শে জুলাই মানিক চৌধুরী হোটেল গ্রীনে ছিলেন, হোটেল রেজিষ্টারে তার এন্ট্রি আছে?

উঃ আমি দেখছি না।

প্রঃ রেজিষ্টারে আপনার সিরিয়াল নম্বর কত?

উঃ ২৬২২।

প্রঃ ঢাকা আসার পর কখন আপনি লেঃ মোয়াজ্জেমের সঙ্গে দেখা করেন?

উঃ ঢাকা যেদিন আমি আসি সেদিন সন্ধ্যায়ই আমি লেঃ মোয়াজ্জেমের সঙ্গে দেখা করি।

প্রঃ ওঝার সঙ্গে এবার যখন দেখা করেন তখন আপনি কি কিছু বলেছিলেন?

উঃ না।

প্রঃ মিটিংয়ের ব্যবস্থা কি আপনি করেছিলেন?

উঃ জী না। আমি করিনি।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই সময় তাহাদের দ্বিতীয় রাজধানীর নিকটস্থ "রাউণ্ড সার্কেল" হইতে মোটরে তুলিয়া নেওয়া হয়।

প্রঃ উক্ত "রাউণ্ড সার্কেল" কি কোন উন্মুক্ত স্থান?

উঃ হ্যাঁ। সেটা একটি ট্রাফিক আয়ল্যাণ্ড। এখানেই আগেরবার শ্রী ওঝা আমাদের নামিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রঃ আপনি কি পুলিসের নিকট একথা বলেছিলেন, ওঝা বলেন যে, মিটিংয়ের দিন-তারিখ ঠিক হলে সীমান্ত অতিক্রমের জন্য সাংকেতিক শব্দ বলে দেওয়া হবে? (তাই রেকর্ড করা হয়)
উঃ না, বলিনি।
ইহার পর গতকল্যকার অধিবেশন সমাপ্ত হয়। ট্রাইব্যুনাল আজ (বৃহস্পতিবার) সকাল ৯টায় পুনরায় অধিবেশনে মিলিত হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান
২৯শে আগস্ট ১৯৬৮
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
ডাঃ সাইদুর রহমানের জেরা অব্যাহতঃ
পি এন ওঝার নিকট অস্ত্র তালিকা পেশ সম্পর্কে আরো বিবরণ দান
(স্টাফ রিপোর্টার)

"আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার" চার নম্বর একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমানের জেরা গতকাল বুধবার অব্যাহত থাকে। এই দিনও বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী জনাব আবদুস সালাম খান তাঁর জেরা অব্যাহত রাখেন।

আবদুস সালাম খান

কৌঁসুলী আবদুস সালাম খান সাক্ষীর হাতে হোটেল গ্রীনের রেজিস্টার দিয়ে রেজিস্টারের ১১৯ নম্বর পৃষ্ঠায় তাঁর নিজের নাম আছে কিনা জিজ্ঞেস করেন। সাক্ষী জানান যে, তিনি ১০-৬-৬৬ তারিখে এই হোটেলে অবস্থান করেন এবং রেজিস্টারে তাঁর নাম রয়েছে।
প্র–এই রেজিস্টারে ২৫-৬-৬৬ তারিখে ১৮৭৭ ক্রমিক নম্বরে যে নাম লেখা রয়েছে সেটা কি আপনার নিজের হাতে লেখা?
উ–যদিও আমি এই হোটেলে সেদিন ছিলাম; কিন্তু এনট্রি আমার হাতে লেখা নয়।
প্র–রেজিস্টারের ১২৫ পৃষ্ঠায় ২১৩৪ নম্বর এনট্রিতে কি আছে?
উ–আমি এখানে ৮-৩-৬৭ সাল থেকে ১৬-৩-৬৭ পর্যন্ত ছিলাম।
প্র–রেজিস্টারের ১২৬ পাতায় ২১৫২ নম্বর এন্ট্রিতে ৩০-৩-৬৭ তারিখে আপনার ঢাকায় আসার কি কারণ দেখানো হয়েছে?
উ–মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন সংগ্রহের জন্য এসেছি বলে 'সফরের উদ্দেশ্য' এই শিরোনামায় লেখা রয়েছে।
প্র–রেজিস্টারের ১২৬ পাতায় ১৩-৪-৬৭ তারিখের ২১৯৩ নম্বর এন্ট্রিতে আসার কারণ কি রয়েছে?
উ–আমি এই হোটেলে ১৩-৪-৬৭ তারিখে থাকি, আসার উদ্দেশ্য ব্যবসা লেখা রয়েছে।

প্র–১২৬ পৃষ্ঠায় ২১৯৪ এন্ট্রির জায়গায় কিছুই লেখা নেই, লক্ষ্য করেছেন কি?
উ–হ্যাঁ, কিছুই লেখা নেই।
প্র–১৩০ পৃষ্ঠায় ২৫৯৬ ক্রমিক নম্বরের পর যে ধারাবাহিক তিনটি নম্বর যথা ২৫০০,২৫৯৮ ও ২৫৯৯ এন্ট্রিগুলি দেখেছেন?
উ–হ্যাঁ। আর এই তিনটি ক্রমিক নম্বরের প্রত্যেকটিতে ৫ সংখ্যাটির ওপরে ৬ লেখা রয়েছে।
প্র–২৫৯৬ নম্বর এন্ট্রিতে মানিক চৌধুরীর স্বাক্ষর আছে কি?
উ–হ্যাঁ, রয়েছে। আমি মানিক চৌধুরীর স্বাক্ষর চিনতে পারি।
প্র–আচ্ছা, এই এন্ট্রিগুলিতে কাদের নাম লেখা রয়েছে?
উ–২৫৯৬-এর পরেরটাতে আমার, তারপরে এম এম রহমান এবং তারপরে মিঃ ও মিসেস ভূঞার।
এই সময় কৌঁসুলী একটি লিখিত কাগজ সাক্ষীর হাতে দিয়ে হস্তাক্ষরটা কার জানতে চাইলে সাক্ষী জানান যে, এটা মানিক চৌধুরীর লেখা এবং মানিক চৌধুরীর স্বাক্ষর রয়েছে।
প্র–আপনি কি জানেন যে, গ্রেফতার করার পর রাজারবাগ পুলিশ সেন্টারে মানিক চৌধুরীর উপর অত্যাচার করা হয়েছে?
উ–জানা নাই।
প্র–রাজারবাগ থেকে আপনি ও মানিক চৌধুরী কি একসঙ্গে কারাগারে গমন করেন?
উ–আমি মানিক চৌধুরীর সঙ্গে একত্রে রাজারবাগে ছিলাম না।
প্র–গ্রীন হোটেলের রেজিস্টারের ১১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় ১৮২৪ নম্বর এন্ট্রিতে কার নাম ও হোটেল ত্যাগের কি তারিখ লেখা রয়েছে?
উ-বি কে সেন এন্ড পার্টির নাম। তারা ২৬-৪-৬৬ তারিখে চলে যান।
প্র–তারিখটার উপর কি কাটাকাটি করা হয়েছে?
উ–হ্যাঁ, ২৬ তারিখটার উপর কাটাকাটি করা হয়েছে।
প্র–তারিখটা পরিবর্তন কে করেন?
উ–জানি না।
প্র-আপনাদের জয়দেবপুর যাওয়ার তারিখের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য তারিখটা ইচ্ছাকৃতভাবে কাটাকাটি করা হয়েছে এবং আপনি তা জানেন?
উ-না, এ কথা ঠিক নয়।
প্র–হোটেলের রেজিস্টারের ১৩১ নম্বর পৃষ্ঠায় কি লেখা রয়েছে?
উ-আমি ওখানে ২২-৭-৬৬ থেকে ২৪-৭-৬৬ তারিখ পর্যন্ত ছিলাম, তাই রয়েছে।

প্র–রেজিস্টারের ১৩৩ নম্বর পৃষ্ঠায় ২১৮৬ নম্বর এন্ট্রিতে কি আছে?
উ–হোটেলে ৩০-৮-৬৭ ও ৩১-৮-৬৭ তারিখে আমার থাকার কথাটাই লেখা রয়েছে।
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছেন যে, আপনি ১৯৬৬ সালের মে মাসে ঢাকায় এসেছিলেন হোটেল আরজুতে আওয়ামী লীগের বৈঠকে যোগ দিতে?
উ–না, তা বলিনি।(কিন্তু জবানবন্দীতে তাই লিপিবদ্ধ আছে।)
প্র–আপনি কি হোটেল আরজুতে ছিলেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র–কতদিন ছিলেন?
উ–তিনদিন।
প্র–রেজিস্টারে কি আপনার নাম এন্ট্রি করেছিলেন?
উ–হ্যাঁ, ১৯৬৬ সালের ১৯শে মে তারিখে এনট্রি করেছি।
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপনার স্বীকারোক্তিতে বলেছিলেন যে, আওয়ামী লীগের বৈঠকে যোগদানের জন্যই ঢাকা আগমন করেন?
উ–আমার ঠিক মনে নেই।
প্র–পুলিশের কাছে বলেছিলেন কি?
উ–মনে নেই।
প্র-আওয়ামী লীগের বৈঠকে যোগদানের জন্য এসে আপনি হোটেল আরজুতে ও মানিক চৌধুরী গ্রীন হোটেলে ওঠেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র–হোটেল আরজু তো নবাবপুর রোডে আর হোটেল গ্রীন তো ময়মনসিংহ রোডে, তাই না?
উ–হ্যাঁ।
প্র–এই হোটেল দুটির মধ্যে ব্যবধান কতটা হবে? দুই তিন মাইল?
উ–এক হতে দু'মাইল হতে পারে।
প্র–হোটেল আরজু থেকে আওয়ামী লীগ অফিস এক মাইলের বেশী হবে?
উ–হ্যাঁ।
প্র–হোটেল গ্রীন থেকে আওয়ামী লীগ অফিসের দূরত্ব?
উ–এক মাইলের বেশী হতে পারে।
প্র–হোটেল আরজু থেকে গুলিস্তানে আসতে রেলওয়ে ক্রসিং পার হতে হয় তারপর বায়তুল মোকাররম হয়ে সেক্রেটারিয়েটের কাছে আসতে হয়। সেক্রেটারিয়েটের পূর্বদিকের কোণের উল্টো দিকে পেট্রোল পাম্প দেখেছেন কি?
উ–হ্যাঁ।

প্র–পেট্রোল পাম্প থেকে আওয়ামী লীগ অফিস কত দূরে?
উ–প্রায় ২০০ গজ হবে।
প্র–পেট্রোল পাম্প যে রাস্তার উপর তার বিপরীত দিকেই তো আওয়ামী লীগ অফিস?
উ–না। পেট্রোল পাম্পের পেছনের দিকে আওয়ামী লীগ অফিস।
প্র–আওয়ামী লীগের বৈঠক কখন হওয়ার কথা ছিল?
উ-সকাল ১০টায়।
প্র–আপনারা মিঃ ওঝার অফিস থেকে কখন বের হন?
উ–সাড়ে ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে।
প্র–হোটেল গ্রীনে কখন যান?
উ–সম্ভবতঃ সাড়ে ১০টায়।
এই সময় কৌসুলী সাক্ষীকে হোটেল আরজুর রেজিস্টার দেখিয়ে তাঁর ঢাকা আগমনের তারিখ দেখাতে বলেন। তিনি তাঁর নামের এনট্রি দেখাতে পারেননি।
প্র–কখনও কলকাতা গেছেন?
উ–না।
প্র–আজমীর শরীফে?
উ–না।
প্র–পাসপোর্ট কিভাবে করতে হয় জানেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র–কোথেকে পাসপোর্ট নেওয়া হয়?
উ–নিশ্চয়ই পাকিস্তান পাসপোর্ট অফিস থেকে।
প্র–পাকিস্তান পাসপোর্ট অফিস ঢাকার কোন খানে অবস্থিত?
উ–জানি না।
প্র-১৯৬৬ সালের মে মাসে তো বহু সংখ্যক আওয়ামী লীগ কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয় তাই না?
উ–হ্যাঁ।
প্র–এই সময়ে ভারতীয় হাইকমিশন অফিসে যাওয়া বিপজ্জনক বলে মনে হয়নি আপনার কাছে?
উ–না। কারণ আমি মানিক চৌধুরীর সঙ্গে যাই।
প্র–আপনি মানিক চৌধুরীর সঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনে যাওয়া নিরাপদ মনে করেন, মানিক চৌধুরী একজন হিন্দু তাই না?
উ–আমি যা বলতে চাই, তা হচ্ছে এই যে, মানিক চৌধুরী বিধান কৃষ্ণ সেনের স্ত্রীর নাগরিকত্ব সম্পর্কে আলাপ করতে যান, সুতরাং তাঁর সঙ্গে যাওয়া বিপজ্জনক নয়।

প্র–মিঃ ওঝা কি চট্টগ্রাম গিয়ে রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থান করছিলেন?
উ–না, তিনি তখন স্টেশনে ওঠেননি।
প্র–চট্টগ্রামে অনেকেই তো রিফ্রেশমেন্ট রুমে চা-নাশতা খাওয়ার জন্য যায়?
উ–হ্যাঁ।
প্র–চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসার জন্য কখন ট্রেন ছাড়ে?
উ–রাত্রে ২টা ট্রেন আছে। চট্টগ্রাম থেকে একটা রাত ৮টার দিকে অপরটি রাত সাড়ে দশটায়।
প্র–রাত ৮টার ট্রেনটির নাম কি?
উ–আমি জানি না। আমি কখনও এই ট্রেনে উঠিনি।
প্র–আপনি মিঃ ওঝাকে ট্রেনে পৌঁছে দেন?
উ–না। আমি তাঁকে রিফ্রেশমেন্ট রুমের সিঁড়ির কাছে রেখে চলে আসি।
প্র–অস্ত্রের তালিকাটি কি আপনি দেখেছেন?
উ–না।
প্র–এটা কি সিল করা খামে ছিল?
কোন ঠিকানা লেখা ছিল খামটিতে?
উ–খামটি খোলা ছিল, তাতে কোন ঠিকানা লেখা ছিল না।
প্র–তালিকাটি লেখার সময় কি দেখেছিলেন?
উ–না।
প্র–তালিকাটা ক'পাতা ছিল?
উ–জানি না।
প্র–আপনি দেখেননি কেন?
উ–সময় করতে পারিনি।
প্র–আপনি কখন তালিকাটি নিয়ে আসেন?
উ-লেঃ মোয়াজ্জমের বাসভবনে রাত ৯টা কি সওয়া ৯টার সময় এটা পাই।
প্র–তালিকাটা মিঃ ওঝার হাতে কখন দেন?
উ–পরদিন সন্ধ্যা ৭টায়।
প্র–এই মধ্যবর্তী সময়ে তালিকাটি কোথায় রেখেছিলেন?
উ–আলমারীতে।
প্র–মিঃ ওঝা কখন চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন?
উ–জানি না।
প্র–আপনি কি লেঃ মোয়াজ্জমকে তালিকাটি নিজেই মিঃ ওঝার কাছে পৌঁছে দিতে বলেছিলেন? অথবা অন্য কারোর মাধ্যমে পাঠাতে বলেছেন?
উ–লেঃ মোয়াজ্জমকে নিজে গিয়ে দিয়ে আসতে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি বলেন যে, তাকে চিনে ফেললে আন্দোলনের ক্ষতি হবে। তবে অন্য কাউকে দিয়ে তালিকাটি পাঠানোর কথা বলিনি।

প্র–এই সময়ে আপনার কি মনে হয়নি যে, আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের উপর কড়া পুলিশ পাহারা রয়েছে?
উ–হ্যাঁ, জানতাম।
প্র–আপনি কি আসামী সামাদকে চেনেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র–আচ্ছা, মিঃ ওঝা যখন আপনাকে লেঃ মোয়াজ্জমকে ঢাকা নিয়ে আসার জন্যে বলেন, তখন কি আপনি লেঃ মোয়াজ্জমকে বলেছিলেন যে, যেহেতু আওয়ামী লীগ কর্মকর্তারা গ্রেফতার হচ্ছেন এবং তাদের উপর কড়া পুলিশ পাহারা রয়েছে, সেজন্য আপনার ঢাকায় যাওয়া ও মিঃ ওঝার সঙ্গে দেখা করা বিপজ্জনক হতে পারে?
উ–না, বলিনি।
প্র–আপনি কি মিঃ ওঝাকে বলেছিলেন যে, তিনি এবং লেঃ মোয়াজ্জম যখন চট্টগ্রামে রয়েছেন, তখন তাঁদের বৈঠকটা চট্টগ্রামেই হোক না কেন?
উ–না, এ কথা বলিনি।
প্র–এই সময়ে লেঃ মোয়াজ্জম কোথায় বসবাস করছিলেন?
উ–যখন আমি মিঃ ওঝাকে অস্ত্রের তালিকাটা দেই, তখন লেঃ মোয়াজ্জম নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটিতে ছিলেন।
প্র–রেল স্টেশন থেকে নাসিরাবাদে লেঃ মোয়াজ্জমের বাসা কত দূর?
উ–প্রায় দুই মাইল হবে।
প্র–লেঃ মোয়াজ্জমের সঙ্গে তাঁর মোটরে যখন ঢাকা আসেন, সে সময়টা আগস্ট মাসের কোন সপ্তাহ তা কি বলতে পারেন?
উ–না।
প্র–আপনারা কখন চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন?
উ–সকালে নাস্তা খাওয়ার আগেই। পথে ফেনীতে আমরা নাশতা করি।
প্র–ফেনীতে কখন পৌঁছান?
উ–সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে।
প্র–যে মোটরে আপনি আসেন, সেটা দু'দরজার না চার দরজার?
উ–আমার মনে নেই।
প্র–আপনি কখন জানতে পারলেন যে মোটরে এসেছেন, সেটার নাম হিলম্যান?
উ-কুমিল্লায় ক্যাপ্টেন শামসুল আলমের বাসায় আসার পর মোটর থেকে নেমে সামনে আসার সময় দেখি।
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপনার বিবৃতিতে বলেছেন যে, লেঃ মোয়াজ্জমের সঙ্গে আপনি হিলম্যান গাড়ীতে করে আসেন?
উ–আমার মনে নেই।
(বিবৃতিতে কোন গাড়ীর নাম উল্লেখ করা হয়নি)।

প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কি বলেছিলেন যে, আপনি লেঃ মোয়াজ্জমের গাড়ীতে আগমন করেন?
উ–মনে নেই।
প্র–পুলিশের কাছে কি বলেছেন?
উ–মনে নেই।
প্র–ঢাকা যাওয়ার পথে কুমিল্লায় আপনারা কখন আসেন?
উ-১০টা কি সাড়ে ১০টার দিকে।
প্র–চট্টগ্রামে মিঃ ওঝার সঙ্গে সাক্ষাতের কতদিন পরে আপনারা ঢাকায় আসেন?
উ–মনে নেই।
প্র–আপনি কি পুলিশের কাছে বলেছিলেন যে, কুমিল্লা পৌঁছে লেঃ মোয়াজ্জম আমাদের গাড়ীতে অপেক্ষা করতে বলে ক্যাপ্টেন শামসুল আলমের কাছে যান?
উ–না, একথা বলিনি। (কিন্তু পুলিশের কাছে প্রদত্ত জবানবন্দীতে তাই বলা আছে।)
প্র–ক্যাপ্টেন শামসুল আলমের সঙ্গে আপনাকে কি পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়?
উ–না, আমাকে পরিচয় করে দেওয়া হয়নি বরং ক্যাপ্টেন আলমকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।
প্র–ক্যাপ্টেন আলমের বাসায় কি আপনারা কিছু খাওয়া-দাওয়া করেন?
উ–না। আমরা কুমিল্লার একটা হোটেলেও মধ্যাহ্ন ভোজন করি।
প্র–এটা কি বার ছিল?
উ–মনে নেই।
প্র–হোটেলের নামটা কি?
উ–মনে নেই।
প্র–এর আগে কখনও কুমিল্লায় গেছেন?
উ–গেছি, কিন্তু এই হোটেলে আগে কখনও যাইনি।
প্র-কুমিল্লায় একাধিক রেস্ট হাউস আছে জানেন কি?
উ–জানি না। একটা রেস্ট হাউসের কথাই শুনেছি।
প্র–এর আগে কখনও মোটরযোগে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা এসেছিলেন?
উ–হ্যাঁ, একবার।
প্র–আপনি আগস্ট মাসের কোন একসময় ঢাকায় আসেন এবং হোটেল গ্রীনে থাকেন। কতদিন ছিলেন? একদিন না তার বেশী?
উ–কতদিন ছিলাম মনে নেই। তবে নিশ্চয়ই একদিনের বেশী।

প্র–সেদিন কি আপনি হোটেলে নাম এন্ট্রি করেছিলেন?
উ-না, করিনি।
প্র–আমার মনে হয় আপনি সেসময়ে ঢাকা আসেননি, সেজন্যই বলছেন যে, হোটেলে নাম এনট্রি করেননি?
উ–না, এটা সত্য নয়।
প্র–১৯৬৬ সালের ১৯শে মে আপনার হোটেল আরজুতে থাকার ব্যাপারে এক কথাই প্রযোজ্য, তাই না?
উ-না, তা ঠিক নয়।
প্র–১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে লেঃ মোয়াজ্জমের গাড়ীতে ঢাকায় আসার পর তিনি যেখানে ওঠেন, সেখানে গিয়েছিলেন কি?
উ–না।
প্র–আপনি কি জানেন কোথায় তিনি ওঠেন?
উ–হ্যাঁ, ধানমণ্ডিতে,–বাড়ীতে।
প্র–মিঃ ওঝার বাড়ীটা কোথায় ছিল?
উ–ধানমন্ডিতে।
প্র–মীরপুর রোডের বড় পেট্রোল পাম্প থেকে মিঃ ওঝার বাড়ী কত দূর?
উ–মনে নেই। আমাদের মিঃ ওঝার বাড়ীতে রাতের বেলা নিয়ে যাওয়া হয়।
প্র–কোন রাস্তা দিয়ে আপনারা মিঃ ওঝার বাড়ী যেতেন?
উ–জানি না। তবে দূর পথে যাওয়ার কারণ হিসেবে মিঃ ওঝা বলেছিলেন যে, পুলিশের দৃষ্টি এড়ানোর জন্যই এটা করা হচ্ছে।
প্র–আপনি বড় রাস্তা দিয়ে যেতেন, কত বড় রাস্তা?
উ–সবই বড় রাস্তা।
প্র–মিঃ ওঝার বাড়ীও কি বড় রাস্তার উপরে ছিল?
উ–হ্যাঁ।
প্র–কোন রাস্তার ওপরে ছিল তাঁর বাড়ী? বাড়ীর নম্বর জানেন?
উ–না, জানি না।
প্র–দ্বিতীয় রাজধানী থেকে মিঃ ওঝার বাড়ী কিভাবে যেতে হয়?
উ–আমি জানি না।
প্র-হোটেল সাকুরা থেকে কিভাবে দ্বিতীয় রাজধানীতে যেতে হয়, জানেন?
উ–হ্যাঁ, জানি।
প্র–কিভাবে যেতে হয়?
উ-আমি নিউ মার্কেট থেকে যাই।
প্র–আপনাকে দ্বিতীয় রাজধানীতে ছেড়ে দিলে কি আপনি হোটেল গ্রীনে যেতে পারতেন?
উ–কোন যানবাহনে না গেলে যেতে পারতাম না।

প্র–প্রথম বৈঠকের পর মিঃ ওঝা কখন আপনাদের দ্বিতীয় রাজধানীতে ছেড়ে দেন?
উ–প্রায় রাত ১০টায়।
প্র–সেখান থেকে কিভাবে যান?
উ–লেঃ মোয়াজ্জম একটা বেবীট্যাক্সি আমি অপর একটি বেবীট্যাক্সিতে করে চলে আসি।
প্র–রাত ১০টায় দ্বিতীয় রাজধানীতে বেবীট্যাক্সী পাওয়া রীতিমত কষ্টকর, তাই না?
উ–না, এ কথা ঠিক নয়।
প্র–আপনাদের কোথায় মিঃ ওঝা নামিয়ে দিয়ে যেতেন?
উ–একটা বড় গোলাকার জায়গা আছে, সেখানেই।
প্র–এই সার্কেলটা এয়ারপোর্ট রোড থেকে কত দূর?
উ–প্রায় ২০০ গজ হবে।
প্র–ওখানে কৃষি বিভাগের একটি দ্বিতল ভবন দেখেছেন কি?
উ–না, আমি জানি না।
প্র–আপনি তো বলেছেন যে, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আপনাদের সঙ্গে আসেন, উনি কোথায় ওঠেন?
উ–মিঃ ওঝার সঙ্গে সাক্ষাতের পর লেঃ মোয়াজ্জম আমাকে জানান যে, স্টুয়ার্ড রহমান তাঁর সঙ্গেই থাকছেন।
প্র–স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আপনাদের মধ্যে কি ওঝার বাড়ীতে যাননি?
উ–না।
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছেন যে, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান লেঃ মোয়াজ্জমের সঙ্গে ছিলেন?
উ-আমার মনে নেই এ কথা বলেছি কিনা।(রেকর্ড করা হয়নি)।
প্র–পুলিশের কাছে বলেছিলেন কি?
উ–মনে নেই। (রেকর্ড করা হয়নি)।
প্র–মিঃ ওঝার বাসভবনের সামনে কি আপনি কোন সাইকেল, বেবীট্যাক্সী বা এই ধরনের কিছু লক্ষ্য ছিলেন?
উ–না, দেখিনি।
প্র–আপনি কখনও ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের বাসায় গেছেন?
উ–না।
প্র–আমার মনে হয় যে, ওঝার সঙ্গে সাক্ষাৎকার, অস্ত্রের তালিকা সরবরাহ ইত্যাদির কথা বলার জন্য আপনাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে?
উ–না, এ কথা সত্য নয়।

প্র–আচ্ছা, অস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কে লেঃ মোয়াজ্জম ও মিঃ ওঝার সঙ্গে যে আলাপ হয়, সেটা কি আপনার উপস্থিতিতে হয়?
উ–হ্যাঁ।
প্র-আপনি তো বলেছেন আপনার বাড়ীতে অনুষ্ঠিত বৈঠকেই আপনাকে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হয়নি । কবে থেকে আপনাকে গোপন বৈঠকে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়?
উ–আমার বাড়ীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৈঠকেই আমাকে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হয়।
প্র–এই দুই বৈঠকের মধ্যবর্তী সময়ে কি আপনি দলের জন্য কোন বিশেষ কাজ করেন?
উ–না, তেমন কোন সক্রিয়ভাবে দলে কাজ করিনি।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, শাকুর রেস্টুরেন্টের নিকটস্থ আনুষ্ঠানিক তোরণের উভয় পার্শ্বে দুটি প্রশস্ত রাস্তা আছে। এই রাস্তা দুটির মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন থাকে।
প্র–রাত ৮টার সময় কি এই দুটি রাস্তার মোড় থেকে ট্রাফিক পুলিশ চলে যায়?
উ–সেটা আমি জানি না।
প্র–আনুষ্ঠানিক তোরণের রাস্তাটি কি যানবাহন পূর্ণ ও জনবহুল থাকে?
উ–জী হ্যাঁ। রাস্তাটি জনাকীর্ণ থাকে এবং এতে বহু যানবাহন চলাচল করে।
প্র–ধানমন্ডি এলাকার রাস্তাঘাট কি শাকুরার নিকটস্থ রাস্তা থেকে কম নির্জন?
উ–জী হ্যাঁ।
কৌসুলীর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, একথা সত্য নয় যে, ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি গ্রীন হোটেলে ছিলেন না।
প্র-আপনি কোথেকে পি এন ওঝাকে টেলিফোন করেছিলেন?
উ–গুলিস্তানের নিকটস্থ টেলিফোন অফিস থেকে আমি ওঝাকে টেলিফোন করেছিলাম।
প্র–গ্রীন হোটেল থেকে গুলিস্তান ভবনের দূরত্ব কত?
উ–গ্রীন হোটেল থেকে গুলিস্তানের দূরত্ব দু'মাইলের কম হবে।
প্র–আপনি কি পায়ে হেঁটে ওঝার বাড়ী গিয়েছিলেন?
উ–জী না। আমি পায়ে হেঁটে যাইনি।
প্র–এরপর কখন আপনি পিএন ওঝার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন?
উ–১৯৬৬ সালের অক্টোবর। নবেম্বর মাসে আমি পুনরায় ওঝার সাথে সাক্ষাৎ করি। তবে এই সাক্ষাৎকারের সময় কি অক্টোবর মাস না নবেম্বর মাস ছিল, তা আমার মনে নেই।

প্র–১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরের এক মাস পরে কি আপনি ঢাকা এসেছিলেন?
উ–সেপ্টেম্বর মাসের এক মাস পর ঢাকা এসেছিলাম কিনা তা আমার স্মরণ নেই। তবে আমি ঢাকা এসে গ্রীন হোটেলে অবস্থান করেছিলাম।
এই পর্যায়ে সাক্ষীর হাতে গ্রীন হোটেলের রেজিস্টার বুক দিয়ে জনাব আবদুস সালাম খান প্রশ্ন করেনঃ
প্র–এই সময়ের হোটেল রেজিস্টারে আপনার নাম এন্ট্রি আছে কি?
উ–জী না। হোটেল রেজিস্টার বুকে আমার নাম এন্ট্রি নেই।
প্র–আপনি কি একাই চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা এসেছিলেন?
উ–জী না। অক্টোবর-নবেম্বর মাসে আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সাথে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা এসেছিলাম।
প্র–ঢাকা আসার আগে পিএন ওঝাকে আপনাদের আগমন সংবাদ জানিয়েছিলেন?
উ–জী না। আমরা ঢাকা আসছি বলে, তাঁকে আগে জানাইনি।
প্র– পি এন ওঝা যখন আপনাকে বলেছিল যে, মোয়াজ্জেম হোসেন ওঝার সাথে ভিতরের কামরায় আলোচনা করতে আপনি মনে দুঃখ পাননি?
উ–জী না। পিএন ওঝা লেঃ মোয়াজ্জমকে ভিতরে নিয়ে আলাপ করায় আমি কিছু মনে করিনি।
প্র–তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেঃ মোয়াজ্জম আপনাকে যা বলেছিলেন আপনি কি তা বিশ্বাস করেছিলেন?
প্র–আপনি কি এটা মনে করেছিলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জম যা বলেছিল তা আলোচনা করা হয়নি?
উ–জী না। আমি তা মনে করিনি।
প্র–আপনি কি মনে করেন যে, তারা যা আলোচনা করেছিল তা আপনার সামনে হতে পারত না?
উ–না, তা আমি মনে করি না।
প্র–জেল থেকে মানিক চৌধুরীর মুক্তিলাভের পর আপনি কি তাকে ওঝার সাথে আপনাদের আলোচনার কথা জানিয়েছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ। আমি ওঝার সাথে লেঃ মোয়াজ্জম ও আমার আলাপ-আলোচনার কথা মানিক চৌধুরীকে জানিয়েছিলাম।
প্র–আপনি কি মানিক চৌধুরীকে বলেছিলেন যে, এখন থেকে তিনি ওঝার সাথে আলোচনা চালাবেন?
উ–জী না। মুক্তিলাভের পর মানিক চৌধুরীকে ওঝার সাথে আলোচনা চালাবার জন্যে আমি বলিনি।

প্র–মুক্তিলাভের পর মানিক চৌধুরীর সাথে ওঝার কি আর কোন আলোচনা হয়েছিল?
উ–জী না। আমি তা জানি না।
প্র–মানিক চৌধুরীর মুক্তির পর ওঝার সাথে লেঃ মোয়াজ্জমের সাক্ষাতের কোন ব্যবস্থা আপনি করেছিলেন কি?
উ–জী না। এরপর আর আমি, লেঃ মোয়াজ্জম ও ওঝার বৈঠকের ব্যবস্থা করিনি।
প্র–একথা সত্য যে, এই মামলা আপনাকে সাক্ষী করার জন্যে পি এন ওঝার সাথে মানিক চৌধুরীর মিটিং-এ আপনাকে টেনে আনা হয়েছে?
উ– জী না। একথা সত্য নয়।
প্র–এটা কি সত্য যে, পি এন ওঝা ও লেঃ মোয়াজ্জমের কোন বৈঠকই অনুষ্ঠিত হয়নি?
উ–জী না। একথা সত্য নয়।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ওঝার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে তিনি যতবার ঢাকা এসে গ্রীন হোটেলে উঠেছিলেন তত বারই তিনি হোটেল রেজিস্টার বুকে নাম উঠাননি। কারণ তিনি ষড়যন্ত্রের কাজে ওঝার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন।
প্র–১৯৬৭ সালের ৮ই মার্চ আপনি কি হোটেলে নাম রেজিস্ট্রী করেছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ। এই তারিখে গ্রীন হোটেলের রেজিস্ট্রারে আমার নাম আছে।
প্র–উল্লেখিত ৮ই মার্চ আপনি কি কাজে ঢাকা এসেছিলেন?
উ–আমি ৮ই মার্চ ওঝার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে ঢাকা এসেছিলাম।
প্র–আপনার সাথে কি মানিক চৌধুরীও ঢাকা এসেছিলেন?
উ–জী না। ১৯৬৭ সালের ৮ই মার্চ আমি একাই ঢাকা আসি। মানিক চৌধুরী আমার সাথে আসেননি।
প্র–লেঃ মোয়াজ্জম কখন ঢাকা এসেছিলেন?
উ–সেসময়ে লেঃ মোয়াজ্জম আগে থেকে ঢাকা ছিলেন।
প্র–সে বার লেঃ মোয়াজ্জমের সাথে কোথায় আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল?
উ–১৯৬৭ সালের ১০ই মার্চ লেঃ মোয়াজ্জম সন্ধ্যে ন'টায় গ্রীন হোটেলে আসেন এবং আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই ছাড়া তিনি কখন ঢাকা এসেছিলেন তা আমি জানি না।
প্র–লেঃ মোয়াজ্জমের সাথে সাক্ষাতের আগে ৮ই ও ৯ই মার্চ আপনি তাঁর কোন খোঁজ নিয়েছিলেন?
উ-জী না ।সাক্ষাতের আগে আমি তাঁর কোন খোঁজ নেইনি। এছাড়া তিনি ঢাকা আছেন কিনা এ-খবরও আমি নেইনি।

প্র–১৯৬৭ সালের ১০ই মার্চের বৈঠকের আয়োজন কে করেছিলেন?
উ–মানিক চৌধুরী ওঝার সাথে এই বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন এবং আমাকে ৯ই মার্চ বিকেল ২টায় তা জানিয়েছিলেন।
পরে এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান চট্টগ্রাম গিয়ে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারটা চূড়ান্তভাবে ঠিক করার জন্যে বলেন। পরে মানিক চৌধুরী আমাকে জানান যে, ১৯৬৭ সালের ১০ই মার্চ ওঝার সাথে বৈঠকের তারিখ ঠিক হয়েছে। স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান লেঃ মোয়াজ্জমকে এই তারিখটি জানিয়ে দিয়েছিলেন।
প্র–স্টুয়ার্ড মজিব কোথায় লেঃ মোয়াজ্জমকে এই তারিখ জানিয়েছিলেন–ঢাকায় না বরিশালে?
উ–সেটা আমি জানি না।
প্র-কবে মানিক চৌধুরী আপনাকে ওঝার সাথে মিটিং-এর তারিখটা জানিয়েছিলেন?
উ–তা আমার মনে নেই।
প্র–ঢাকা আসার কদিন আগে আপনাকে মিটিং-এর তারিখ জানানো হয়েছিল?
উ–আমার ঢাকা আসার ক'দিন আগে মানিক চৌধুরী মিটিং-এর তারিখ আমাকে জানিয়েছিলেন তাও আমার মনে নেই।
প্র–এটা কি সত্য যে, লেঃ মোয়াজ্জম গ্রীন হোটেলে আদৌ আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেননি?
উ–জী না। একথা সত্য নয়।
প্র–ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার আগে লেঃ মোয়াজ্জমের সাথে আপনার কি আর সাক্ষাৎ হয়েছিল?
উ–জী না। চট্টগ্রাম যাওয়ার আগে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। তবে ১০ই মার্চের বৈঠকের পরদিন তিনি গ্রীন হোটেলে আসলে আমার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।
প্র–১০ই মার্চ লেঃ মোয়াজ্জম ঢাকা আসবেন বলে আপনাকে কে জানিয়েছিলেন?
উ-মিঃ মানিক চৌধুরী তা জানিয়েছিলেন।
এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, বরাবরের মত এবারও পি এন ওঝা তাদেরকে সেকেন্ড ক্যাপিটেলের সার্কেলটির কাছে নামিয়ে দিয়ে যান।
প্র–পি, এন, ওঝা মানিক চৌধুরীকে ৫ হাজার টাকা দিয়েছিলেন এটা কি লেঃ মোয়াজ্জম জানতেন?
উ–ওঝা, মানিক চৌধুরীকে ৫ হাজার টাকা দিয়েছিলেন এটা লেঃ মোয়াজ্জম জানতেন কিনা তা আমি জানি না।

প্র–পি, এন ওঝার বাসায় যে কামরায় মানিক চৌধুরী তাঁর পকেটে কিছু একটা রাখার সময় আপনি কি সেই একই রুমে ছিলেন?
উ–তখন আমি তাদের সাথে একাই রুমে ছিলাম।
প্র–এই সভায় কি আলোচনা হয়েছিল?
উ-এই সভাতেও ওঝার সাথে লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জমের গোপন আলোচনা হয়।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, পি এন ওঝা তাদেরকে সেকেন্ড ক্যাপিটালে নামিয়ে দেওয়ার পর তাদের নিজেদের মধ্যে কোন কথাবার্তা হয়নি। তাদের মধ্যে কোন কথাবার্তা হয়নি সেখান থেকে তিনি ও মানিক চৌধুরী একটি বেবীট্যাক্সি করে হোটেলে যান। আর লেঃ মোয়াজ্জম অন্য একটি বেবীট্যাক্সিতে যান। এছাড়া সেকেন্ড ক্যাপিট্যালের সার্কেলের নিকট মানিক চৌধুরী ও লেঃ মোয়াজ্জমকে টাকা সম্পর্কে আলোচনা করতে তিনি দেখেননি। তবে আমরা সেখানে এক সাথেই ছিলাম।
প্র–পরদিন হোটেলে এসে টাকা নেওয়ার সময় তিনি কিছু বলেছিলেন?
উ–জী না।
প্র–১৯৬৭ সালের ৩১শে মার্চের বৈঠকে যোগদানের মধ্যে আপনি কি একা এসেছিলেন?
উ-জী হ্যাঁ। আমি একাই এসেছিলাম। মানিক চৌধুরী আমার আগেই এসেছিলেন এবং আমরা দুজনেই গ্রীন হোটেলে নাম রেজিস্ট্রী করেছি।
প্র–এটা কি সত্য যে, এই মামলা তৈরী করার জন্যে গ্রীন হোটেলের রেজিস্টার বই দেখে ১০ই ও ৩১শে মার্চ ওঝার সাথে আপনাদের বৈঠকের তারিখ সাজানো হয়েছে?
উ-জী না। একথা সত্য নয়।
প্র–এইবার আপনি কোন তারিখে এসেছিলেন?
উ–আমি ১৯৬৭ সালের ৩০শে মার্চ ঢাকা আসি।
এই পর্যায়ে গ্রীন হোটেলের সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রার বই সাক্ষীর হাতে দিয়ে জনাব আবদুস সালাম খান জিজ্ঞেস করেন।
প্র–এই রেজিস্ট্রারের সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠায় আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন?
উ-আমি দেখছি যে, রেজিস্টারের ২১৫২ ক্রমিক নম্বরে আমার নাম লেখা আছে। কিন্তু এরপরেই ২১৮৩ ক্রমিক নম্বর লেখা আছে। এছাড়া রেজিস্ট্রার বই-এর ১২৩ নম্বর পাতায় ক্রমিক নম্বর ১৯৯০ ও ১৯৯২ এর মাঝখানে ১৯৯১ ক্রমিক নম্বর লেখা আছে। কিন্তু মধ্যবর্তী এই ক্রমিক নম্বরে নামধাম কিছু লেখা নেই।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তেজগাঁও রেলক্রসিং তিনটি রাস্তার সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং সেখানে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন থাকে।

প্র–৩১শে মার্চের বৈঠকে যোগদানের জন্যে তেজগাঁও রেলক্রসিং-এ কি আপনি একাই গিয়েছিলেন?

উ-জী না। আমি, মানিক চৌধুরী ও লেঃ মোয়াজ্জেম গ্রীন হোটেল থেকে একত্রে গিয়েছিলাম।

প্র-ওঝার সাথে বৈঠক শেষে ফিরে এসে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সাথে অস্ত্রশস্ত্রের আলোচনা বৈঠকের স্থান নির্ণয় সম্পর্কে আপনারা কিছু আলোচনা করেছিলেন?

উ-জী না। এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোন আলোচনা হয়নি।

প্র–উৎকৃষ্ট স্থান নির্ণয়ের ব্যাপারে লেঃ মোয়াজ্জম কি কিছু আলোচনা করেছিলেন?

উ–জী না। স্থান নির্ণয়ের ব্যাপারে লেঃ মোয়াজ্জম আমাদের সাথে আলোচনা করেননি। এছাড়া পি,এন ওঝার সাথেও তিনি এ ব্যাপারে কোন আলোচনা করেননি।

প্র–এই বৈঠকের জন্যে কোন তারিখ ঠিক করা হয়েছিল কি?

উ–জী না। বৈঠকের কোন তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়নি।

প্র–বৈঠকের তারিখ ঠিক করার জন্যে আপনাদের কোন সভা হয়েছিল?

উ–বৈঠকের তারিখ ও স্থান নির্ণয়ের জন্যে কোন সভা হয়েছিল বলে আমার জানা নেই।

প্র–এ ব্যাপারে মানিক চৌধুরী কি আপনার সাথে আলোচনা করেছিলেন?

উ–জী না।

প্র–বৈঠকের স্থান পূর্বেই ঠিক করা হয়েছে বলে লেঃ মোয়াজ্জম আপনাদেরকে অথবা ওঝাকে বলেছিলেন কি?

উ–জী না।

এক প্রশ্নের জবাবে একরারী স্বাক্ষী বলেন যে, একথা সত্য নয় যে ষড়যন্ত্র মামলা তৈরী করার জন্যে তাঁকে এইসব সভায় হাজির দেখানো হয়েছে।

প্র–অপরাপর বৈঠকের তারিখ আপনার মনে নেই অথচ গ্রীন স্কোয়ারের বৈঠকের তারিখ আপনি মনে রাখলেন কি করে?

উ–গ্রীন স্কোয়ারের অনুষ্ঠিত দলের বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্যে আমি ১৯৬৭ সালের ৬ই জুলাই ঢাকা এসেছিলাম। কিন্তু এই তারিখ মনে থাকার কোন কারণ আমি জানি না।

জেরার এই পর্যায়ে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীর হাতে গ্রীন হোটেলের রেজিস্ট্রার দিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করলে তার জবাবে স্বাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৭ সালের ৬ই জুলাই গ্রীন হোটেলে রেজিস্টার বই'র ২৫৯৬ ও ২৫৯৮ ক্রমিক নম্বর দুটির মাঝখানে তাঁর নাম লেখা আছে। কিন্তু এই ক্রমিক নম্বরটির লেখা প্রিন্ট নয়। দেখে তিনি বলতে পারছেন না যে, এটা ২৫৯৭ ক্রমিক নম্বর।

প্র–আদালতে সাক্ষ্যদানকালে আপনি কি বলেছিলেন এটা ২৫৯৭ ক্রমিক নম্বর?

উ–জী হ্যাঁ। বলেছিলাম। কারণ এই ক্রমিক নম্বর ২৫৯৭-ই হওয়া উচিত বলে আমি মনে করেছিলাম।

প্র–১৯৬৭ সালের ৬ই জুলাই ১০ নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কি আলোচনা করা হয়েছিল?

উ–আমার উপস্থিতির পর কি আলোচনা হয়েছিল আমার জানা নেই।

প্র–আপনি সেখানে কি করেছিলেন?

উ–মানিক চৌধুরী লেঃ মোয়াজ্জমকে বলেছিলেন যে, আমাকে ও মানিক চৌধুরীকে বৈঠকে যোগদান ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে।

প্র–গোলাম আহমদের সাথে পূর্বে আপনার কখনও সাক্ষাৎ হয়েছিল?

উ–জী হ্যাঁ। ১৯৬৭ সালের ৭ই জুলাইর বৈঠকের আগে গোলাম আহমদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

প্র–গ্রীন স্কোয়ারের বৈঠকে আপনার কোন অপরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন?

উ–জী হ্যাঁ। সেখানে আমার অপরিচিত এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তবে আমি তার পরিচয় জানতে চাইনি।

এক প্রশ্নের জবাবে স্বাক্ষী বলেনঃ গ্রীন স্কোয়ারের বাড়ীটি ছিল দালান। আমি দুটি রুমে ৩টি বিছানা পাতা দেখেছি।

প্র–আপনি কি লুৎফুল হুদাকে চেনেন?

উ–জী না। লুৎফুল হুদা নামে কাউকে আমি চিনি না।

প্র–সেসময়ে আপনি কি রমীজকে চিনতেন?

উ–রমীজকে আমি তখন চিনতাম না। তবে আমি তাঁর নাম শুনেছিলাম। চট্টগ্রাম থানায় তাঁর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

প্র–গোলাম আহমদ ও রমীজউদ্দিন কি এই মামলার সাক্ষী?

উ–আমি তা জানি না।

প্র–টাকা কি ভাবে খরচ হয়েছিল এটা লেঃ মোয়াজ্জম কি মানিক চৌধুরীকে বলেছিলেন?

উ–লেঃ মোয়াজ্জম মানিক চৌধুরীকে বলেছিলেন যে, টাকার সদ্ব্যবহার করা হয়েছে। তবে তিনি বিস্তারিত হিসাব দেননি।

প্র–গ্রীন স্কোয়ারের বৈঠকের পর আপনি কি আর ওঝার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ। ১৯৬৭ সালের ৬ই জুলাই গ্রীন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর আমি লেঃ মোয়াজ্জম ও মানিক চৌধুরীসহ পি, এন ওঝার সাথে সাক্ষাৎ করি।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এবার তিনি মানিক চৌধুরীর সাথে একত্রে ঢাকা আসেন। এই বৈঠকের তারিখ আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল।
এই সময়ে সাক্ষীর হাতে গ্রীন হোটেলের রেজিস্টার বুক দেয়া হয়। তারপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী তাঁকে প্রশ্ন করেনঃ
প্র–১৯৬৭ সালের ২২শে জুলাই-এর গ্রীন হোটেলের রেজিস্টার বুকে আপনি কি দেখছেন?
উ–উক্ত তারিখে মানিক চৌধুরীর গ্রীন হোটেলের অবস্থান সম্পর্কে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তবে আমরা গ্রীন হোটেলে ছিলাম।
প্র–লেঃ মোয়াজ্জমের সাথে আপনার কখন সাক্ষাৎ হয়েছিল?
উ–আমি যেদিন ঢাকা এসেছিলাম সেদিনই লেঃ মোয়াজ্জমের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এই বৈঠকের পরও ওঝা তাদেরকে সেকেন্ড ক্যাপিট্যালের সার্কেলের নিকট রেখে যান। আগেও ওঝা তাদেরকে বৈঠক শেষে ওখানে রেখে যেতেন। সেই সার্কেলটি একটি ট্রাফিক আয়ল্যান্ড এবং উন্মুক্ত জায়গায় অবস্থিত।
প্র-সীমান্ত অতিক্রম করার জন্যে কোডওয়ার্ড কার বলে দেওয়ার কথা ছিল?
উ–লেঃ মোয়াজ্জমের কোড-ওয়ার্ড দেওয়ার কথা ছিল।
প্র–পুলিশের নিকট আপনার জবানবন্দীতে আপনি কি বলেছিলেন যে, সীমান্ত অতিক্রম করার জন্যে ওঝার কোর্ড ওয়ার্ড দেওয়ার কথা ছিল?
উ–জী না। পুলিশের নিকট আমি তা বলিনি।
(পুলিশের রেকর্ডে তা আছে।)
এ দিন এ পর্যন্ত জেরা হওয়ার পর অধিবেশন মূলতবী রাখা হয়।

সংবাদ

৩০শে আগস্ট ১৯৬৮

চতুর্থ রাজসাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমানের জেরা সমাপ্ত :
৬ষ্ঠ রাজসাক্ষী রমিজের জবানবন্দী গ্রহণ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) কুর্মিটোলায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশনে বাদীপক্ষ ৫ম রাজসাক্ষী (৬নং সরকারী সাক্ষী) ফ্লাইট লেঃ মীর্জা মোহাম্মদ রমিজউদ্দীনকে সাক্ষ্যদানের জন্য পেশ করেন। তার সাক্ষ্যদান অসমাপ্ত

থাকিতেই ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। পূর্বাহ্নে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান চতুর্থ দিনে ৪নং রাজসাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান চৌধুরীর জেরা সমাপ্ত করেন।

এই দিনে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি মেসার্স আতাউর রহমান খান, মীর্জা গোলাম হাফিজ, ফজলুল করিম (ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিযুক্ত) নুরল আলম, জুলমত আলী খান এবং মোমেন সাক্ষীকে জেরা করেন।

গতকাল ৫ম রাজসাক্ষী ফ্লাইট লেঃ রমিজউদ্দীন তাঁহার অসমাপ্ত সাক্ষ্যদানকালে কথিত ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনসহ ১১ ব্যক্তির নাম করেন। বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদেরের আহবানে সাক্ষী এক এক করিয়া লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, এ,বি, খুরশিদকে সাক্ষীর কাঠগড়া হইতেই সনাক্ত করেন। অতঃপর সাক্ষ্যদানকালে সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকটে গিয়া রিসালদার এ,কে,এম শামসুল হক, ক্যাপ্টেন আলম ও ক্যাপ্টেন হুদাকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন। সাক্ষী অবশ্য সার্জেন্ট জলিলকে ক্যাপ্টেন শওকত হিসাবে সনাক্ত করেন। পক্ষান্তরে তিনি হাবিলদার আজিজকে সনাক্ত করিতে অসমর্থ হন।

উল্লেখযোগ্য যে, সাক্ষীর মুখে নাম শুনিয়াই ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন মুতালিব অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় স্ব স্ব আসন হইতে দাঁড়াইয়া গিয়া নিজেদের নাম প্রকাশ করিয়া দেন।

এই পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান অভিযুক্তদের প্রতি সম্বোধন করিয়া কোর্টের নির্দেশ ছাড়া না দাঁড়ানো এবং তাদের পরিচয় প্রকাশ না করার জন্য পরামর্শ দান করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গতকাল ট্রাইব্যুনালের অধিবেশনের শুরুতেই বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের নিকট এক আবেদনে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন গলাফুলা (মাম্‌স) রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে সকলের নিরাপত্তার জন্য তাঁহাকে আলাদা রাখার আবেদন জানান। চেয়ারম্যান উক্ত আবেদন মঞ্জুর করেন এবং লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমকে আলাদা রাখা হয়। অবশ্য পরে তাঁহাকে সনাক্তকরণের প্রয়োজনে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলির আবেদনক্রমে কিছুক্ষণের জন্য অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় আনয়ন করা হয়।

পূর্বাহ্নে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান ৪নং রাজসাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান চৌধুরীকে ৪র্থ দিনের জন্য জেরা করেন। কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, চট্টগ্রাম লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সভা বিকাল ৩/৪ টার দিকে শুরু হয়। শেখ মুজিবর রহমান উক্ত সভার ভাষণদান করেন। রাত ৮/৯ টা পর্যন্ত উক্ত সভা চলে।

প্রঃ সভার অব্যবহিত পরে 'কবি গানের' আসর শুরু হয় কি?
উঃ এটা সত্য নয়।
প্রঃ আপনি সভায় সবসময় উপস্থিত ছিলেন কি?
উঃ ছিলাম।
প্রঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিব উক্ত সভায় ছিলেন কি?
উঃ আমি তাকে দেখিনি।
প্রঃ আওয়ামী লীগের অন্যান্য কর্মকর্তা সভায় ছিলেন কি?
উঃ ছিলেন।
সাক্ষী অপর প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, সভা যখন চলিতেছিল তখন বিকাল সাড়ে ৫টা কি ৬টার সময়ে মানিক চৌধুরী তাঁহাকে বলেন যে, শেখ মুজিব তাঁহার বাসায় যাইবেন।
প্রঃ শেখ মুজিবর রহমান তখন আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন কি?
উঃ ছিলেন।
প্রঃ তিনি কতক্ষণের জন্যে আপনার বাসায় ছিলেন?
উঃ কিছুক্ষণ ছিলেন। পরে সাক্ষী বলেন, কিছুক্ষণ অর্থাৎ ১০/১৫ মিনিট ছিলেন।
প্রঃ আওয়ামী লীগ প্রধান আপনার বাসায় যাবেন বলে আপনি খবর পেলেন। জেলা বা শহর আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের এই উপলক্ষে দাওয়াত করেছিলেন কি?
উঃ না।
অপর কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তিনি এতদুপলক্ষে কিছু চা নাস্তার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন?
প্রঃ আপনার বাড়ীতে আওয়ামী লীগ প্রধানের আগমনকালে আপনার ভ্রাতাগণ তখন উপস্থিত ছিলেন কি?
উঃ তারা তখন বাইরে ছিল।
প্রঃ জাতীয় পরিষদে সরকার দলীয় সদস্য জনাব সুলতান আহমদ আপনার পাশের বাড়ীতে থাকেন। তাঁকে এ উপলক্ষে দাওয়াত করেছিলেন কি?
উঃ না।
পরে সাক্ষী বলেন যে, তাহাদের মধ্যে 'গোপন সভা' ছিল বলিয়া তিনি তাঁহাকে দাওয়াত দেন নাই।
প্রঃ শেখ মুজিবর কখন আপনার বাসায় গেলেন?
উঃ রাত প্রায় সাড়ে ৯টার দিকে।
প্রঃ তিনি কিসে করে গেলেন?
উঃ মানিক চৌধুরীর গাড়ীতে। সাক্ষী পরে বলেন যে, মানিক চৌধুরীর গাড়ীখানা ছোট। শেখ মুজিব ও মানিক চৌধুরী ছাড়া উক্ত গাড়ীতে আর কেহ ছিলেন না।

প্রঃ আপনি পুলিসকে বলেছিলেন কি যে, শেখ মুজিবর রহমান সন্ধ্যার পরে মানিক চৌধুরী সমভিব্যাহারে আপনার বাড়ীতে গিয়াছিলেন? (পুলিসের নিকট তাই রেকর্ড হইয়াছিল)।
উঃ আমার স্মরণ নেই।
প্রঃ পুলিসের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে আপনি উল্লেখ করেছিলেন কি, শেখ মুজিব লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত সভাশেষে আপনার বাড়ীতে গিয়েছিলেন?
উঃ পুলিসের নিকট বলেছি কিনা, আমার স্মরণ নেই। (পুলিসের নিকটে এভাবে রেকর্ড হয় নাই)।
প্রঃ মানিক চৌধুরীর নিজস্ব 'কার' আছে তা আপনি জানেন কি?
উঃ আমি মনে করি, মানিক চৌধুরীর নিজস্ব 'কার' রয়েছে।
সাক্ষী আরও বলেন, তিনি উক্ত কারে বহু দফা ভ্রমণ করেছেন।
এই পর্যায়ে কৌসুলি বলেনঃ "আমি বলছি, মানিক চৌধুরীর কোন 'কার' ছিল না?"
উঃ সেটা সত্য নয়।
প্রঃ গাড়ীর নাম কি?
উঃ আমার মনে নেই।
প্রঃ গাড়ীর নম্বর কত?
উঃ আমার মনে নেই।
এই পর্যায়ে কৌসুলি বলেন, "আমি বলছি, শেখ মুজিবর রহমানকে 'ষড়যন্ত্রে' জড়ানোর উদ্দেশ্যেই আপনি এই কাহিনী আবিষ্কার করেছেন। আমি আরও বলছি যে, শেখ মুজিবর রহমান আদৌ আপনার বাড়ীতে যাননি।"
উঃ এ কথা সত্য নয়।

৭ই জুনের হরতাল প্রসঙ্গে

অতঃপর বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীকে ১৯৬৬ সালের ৭ই জুনের হরতাল সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করেন।
প্রঃ আওয়ামী লীগ ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন প্রদেশব্যাপী হরতালের আহবান জানিয়েছিল কি?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ ঢাকা ও প্রদেশের বড় বড় শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়েছিল কি?
উঃ হ্যাঁ।
প্রঃ এই হরতালের ফলে বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিসের গুলীতে বিপুলসংখ্যক লোক নিহত হয়েছিল, তা কি সত্যি?
উঃ হ্যাঁ সত্যি।

প্রঃ এই হরতাল উপলক্ষে পুলিস ব্যাপক ধরপাকড় এবং অসংখ্য মামলা দায়ের করেছিল তা কি সত্যি?
উঃ হ্যাঁ সত্যি।

পরে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের সাক্ষীকে 'বিপুলসংখ্যক লোক নিহত' বলিতে তিনি কি বুঝিয়াছেন উহা ব্যাখ্যা করার জন্য আহবান জানান।

সাক্ষী উত্তরে বলেন, 'বিপুল সংখ্যক নিহত' বলিতে তিনি '৪০/৫০ জন' নিহত বুঝাইয়াছেন।

অতঃপর কৌসুলি ১৯৬৭ সালে সাক্ষীর কথিত ঢাকা সফরের উপর কতিপয় প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন যে, ১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসে তিনি ঢাকা আগমন করেন এবং হোটেল গ্রীনে অবস্থান করেন। মানিক চৌধুরীও ঐ সময়ে ঢাকা আসেন এবং হোটেল ক্যাসেরিনায় অবস্থান করেন।

সাক্ষী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তিনি হোটেল রেজিষ্টারে নাম উঠাইয়াছিলেন।

সাক্ষী অপর প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তিনি সম্ভবতঃ ৩০শে আগষ্ট ঢাকায় আসেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ অফিসে এক সভায় যোগদানের জন্য তিনি তখন ঢাকায় আসেন। সাক্ষী পরে বলেন যে, তাঁহার নিজের কিছু ব্যবসায় আছে। তাই তিনি হোটেল রেজিষ্টারে সফরের কারণ হিসাবে 'ব্যবসায়' লিখিয়াছিলেন।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, মানিক চৌধুরী ও তিনি একসঙ্গে ঢাকায় আসেন।

সাক্ষীকে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি হোটেল ক্যাসেরিনার রেজিষ্টারে ২৯শে অথবা ৩০শে আগষ্টে মানিক চৌধুরীর নামের এনট্রি দেখানোর জন্য আহ্বান করিলে সাক্ষী দেখিয়া বলেন, তিনি উহাতে মানিক চৌধুরীর নাম খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

প্রঃ আপনি এর আগে বলেছিলেন ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে পি, এন, ওঝার ভবনে ও ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারে দুটি সভা হয়েছিল?
উঃ জুলাই মাসে মিঃ ওঝার বাসভবনে সভা অনুষ্ঠানের ১৪-১৫ দিন আগে ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারে গেলে আমরা সেখানে কিছু লোককে দেখতে পাই।

প্রঃ মিঃ ওঝার বাসভবনে ৬ই জুলাই (১৯৬৭) সভা হয়েছে বলেছেন কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বলেছেন যে, ৬ই জুলাই-এর পরে আপনারা ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারে গিয়েছিলেন (এভাবে রেকর্ড হয়েছিল)?
উঃ আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বলেছিলেম কিনা, তা আমার স্মরণ নেই।

প্রঃ আপনি পুলিসের নিকট বলেছিলেন যে, ৩০শে আগষ্ট (১৯৬৭) আপনি এবং মানিক চৌধূরী একসঙ্গে ঢাকায় এসেছিলেন এবং এক সঙ্গেই হোটেল

গ্রীনে ছিলেন? (তাই রেকর্ড হয়েছিল) এই পর্যায়ে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি পুলিসের নিকট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আগেকার প্যারাগ্রাফে বলা হইয়াছে উহার পর আমি এবং মানিক চৌধূরী উভয়ে আগষ্ট মাসে ঢাকায় আসি এবং আমি হোটেল গ্রীনে ও মানিক চৌধুরী হোটেল ক্যাসিরিনায় ছিলেন। অতঃপর হোটেল ক্যাসিরিনার রেজিষ্টারের ১০নং পাতায় সাক্ষী ৯ই আগষ্ট (১৯৬৭) তারিখে মানিক চৌধূরীর নামের এনট্রি রহিয়াছে বলিয়া দেখান। সাক্ষী অবশ্য স্বীকার করেন যে, উক্ত এনট্রি মানিক চৌধূরীর হাতের লেখা নহে।

অতঃপর সাক্ষীকে ওঝার নিকট হইতে কথিত অর্থের লেনদেনের উপর বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি কতিপয় প্রশ্ন করেন।

সাক্ষী স্বীকার করেন যে, তার জবানবন্দীকালে তিনি বলিয়াছিলেন যে, একটি সভা অনুষ্ঠানকালে মানিক চৌধূরী মিঃ ওঝার নিকট থেকে ৫ হাজার টাকা পাইয়াছেন বলিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সরকারপক্ষের প্রধান কৌসুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন মিঃ ওঝার নিকট হইতে মানিক চৌধূরী মোট কত টাকা পাইয়াছিলেন। তিনি ঐ টাকা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে চাহিয়াছিলেন এবং তখনই সাক্ষী টাকার লেনদেন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলিয়াছেন। অতঃপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলি সাক্ষীকে প্রশ্ন করেনঃ "মানিক চৌধূরী কখন টাকা হস্তান্তর করেছিল?"
উঃ দ্বিতীয় রাজধানীর নিকটে একই স্থানে যেখানে মিঃ ওঝা আমাদের নামিয়ে দিয়েছিলেন।
সাক্ষী বলেনঃ "মানিক চৌধূরী মিঃ ওঝার নিকট থেকে প্রাপ্ত ১০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন।" সাক্ষী আরও বলেন যে, মানিক চৌধূরী কর্তৃক দুই দফা লেঃ মোয়াজ্জেমের হাতে টাকা দেবার সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তৃতীয় দফায় তিনি (সাক্ষী) উপস্থিত ছিলেন না। সাক্ষী আরও বলেন যে, তৃতীয় দফায় টাকা লেনদেনকালে তিনি চট্টগ্রামে ছিলেন। মানিক চৌধূরী তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তিনি উক্ত দফায় ৫ হাজার টাকা দিয়াছিলেন।
কৌসুলি জনাব সালাম খান অতঃপর বলেন, আমি বলিতেছি যে, আপনার উপর শারীরিক নির্যাতন চালানোর ফলে এবং সকল লাইসেন্স বাতিল করিয়া দিবার হুমকি প্রদানের ফলেই আপনি এই কোর্টে মিথ্যা সাক্ষ্যদান করিতেছেন। উত্তরে সাক্ষী বলেন, উহা সত্য নয়।

আতাউর রহমান খানের জেরা

অতঃপর জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্রঃ আপনি কি আওয়ামী লীগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে পার্টিতে যোগদান করেন, না রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যোগদান করেন?
উঃ আমি আওয়ামী লীগের আদর্শে বিশ্বাসী হয়েই সে পার্টিতে যোগদান করেছিলাম, কোন রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নয়।

কৌঁসুলির বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, "আমি আওয়ামী লীগের সভায় তার আদর্শ সম্পর্কিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করতাম। আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে যে সকল দাবী-দাওয়ার বিষয় রয়েছে– তাতে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

প্রঃ আওয়ামী লীগের সেসব দাবী পূরণ হয়েছে বলে কি আপনি মনে করেন?

উঃ না, আমি মনে করি না। তবে আওয়ামী লীগের দাবী-দাওয়া পাকিস্তান সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছিল।

প্রঃ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সম্পাদক নয়–মানিক চৌধূরী কেন আপনাকে আন্দোলনে নিয়ে যান?

উঃ তা আমি কেমন করে বলব–মানিক চৌধূরী তা' বলতে পারেন।

প্রঃ আপনি আন্দোলনের সঙ্গে কখন সম্পর্ক ছিন্ন করেন?

উঃ সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে।

প্রঃ তারপরও কি আপনি এ আন্দোলনের কথা কাউকে বলেছিলেন?

উঃ সম্পর্ক ছিন্ন করার পর আমি আন্দোলনের কথা আর কাউকে বলিনি।

প্রঃ আপনি আপনার দলের উপর ও লেঃ মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বের উপর হতে কেন আস্থা হারিয়ে ফেলেন?

উঃ আমি যখন জানতে পারি যে, লেঃ মোয়াজ্জেম পার্টির তহবিল তসরুফ করেছে ও বরিশাল বদলী হওয়ার পর সে পার্টির জন্যে আর কোন কাজ করেনি, তখন আমি পার্টি ও তার উপর হতে আস্থা হারিয়ে ফেলি।

প্রঃ এ খবর আপনি কখন পান?

উঃ ১৯৬৭ সালের জুলাইয়ের ২/৩ মাস আগে।

প্রঃ ষড়যন্ত্র মামলায় আপনি গ্রেফতার হয়েছেন, এ কথা কখন জানতে পারেন?

উঃ রাজারবাগ পুলিস কেন্দ্রে আমি জানতে পারি।

প্রঃ রাজারবাগে আপনাকে কতদিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়?

উঃ বলতে পারি না।

প্রঃ আপনাকে কি রোজই জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো?

উঃ না।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, রাজারবাগে তাঁহাকে একটি ঘরেই রাখা হইয়াছিল। তিনি ওই ঘরেই শুইতেন ও খাইতেন।

প্রঃ সেখানে রোজ আপনি কত ঘণ্টা ঘুমোতেন?

উঃ ৫/৬ কিম্বা ৭ ঘণ্টা।

প্রঃ আপনি থাকতে সেখানে অন্য কোন অভিযুক্তকে নেয়া হয়েছিল?

উঃ আমি জানি না।

প্রঃ আপনার রুম সংলগ্ন কোন বাথরুম ছিল?

উঃ না। বাথরুম ছিল ২/৩ রুম পরে।

অপর কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, রাতে আমার রুমের বাইরে একজন সেন্টি থাকত। রাতে কেউ আমাকে বিরক্ত করত না। রাতে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদও করত না। আমি নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ইংরেজীতে জবানবন্দী দিই। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী দেওয়ার আগে আমাকে বলা হয় যে, আমি যে জবানবন্দী দিতে যাচ্ছি তা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে ও আমার সাজাও হতে পারে। তা সত্ত্বেও আমি জবানবন্দী দিই।

প্রঃ আপনাকে কে রাজসাক্ষী হতে বলেন?

উঃ আমি স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতিদানের পর একবার মেজর নাসের আমার কাছে আসেন। আমি রাজসাক্ষী হতে চাই কি না, তিনি তা জানতে চান।

প্রঃ আপনার স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতিদানের কতদিন পর মেজর হাসান ওই প্রস্তাব করেন?

উঃ স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতিদানের ২/৩ মাস পর।

প্রঃ আপনি 'রাজসাক্ষী' শব্দের অর্থ জানেন?

উঃ জানি।

প্রঃ এ কথা কি ঠিক যে, আপনি আপনার চামড়া বাঁচাবার জন্যে ও বন্ধুদের সাজা দানের জন্য রাজসাক্ষী হয়েছেন?

উঃ না, ঠিক নয়।

প্রঃ দেশরক্ষা আইনে আপনাকে প্রথম কোথায় গ্রেফতার করা হয়?

উঃ চট্টগ্রামে।

সাক্ষী জানান, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হতে মুক্তিলাভের পর আমাকে আর্মি এ্যাক্টে আবার গ্রেফতার করা হয়। তখন কোন গ্রেফতারপত্র আমি দেখিনি।

প্রঃ মিঃ ওঝার বাড়ী কি রকম?

উঃ দোতলা বাড়ী।

প্রঃ সেটা রাস্তার কোন পাশে?

উঃ বলতে পারি না।

প্রঃ তাঁর বাড়ীতে আপনি কবার যান?

উঃ যদ্দুর মনে পড়ে ছ'বার।

প্রঃ আপনারা কোথায় বসতেন?

উঃ দোতলায় ড্রয়িং রুমে।

সাক্ষী জানান যে, শেষবার মিঃ ওঝার সহিত সাক্ষাতের সময় তিনি বাসা বদল করিয়াছিলেন।

প্রঃ প্রথম বাড়ী হতে ওই শেষের বাড়ীর দূরত্ব কত?
উঃ তা বলতে পারি না।
প্রঃ সে বাড়ী কোন্ রাস্তায়?
উঃ বলতে পারি না। তবে তা গ্রীন রোডের সঙ্গে সংযোগকারী একটি রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত তা বলতে পারি।
প্রঃ দ্বিতীয় বাড়ীটি কিরূপ?
উঃ দোতলা। সে বাড়ীতেও আমরা দোতলায় ড্রয়িং রুমে বসি।
কৌসুলির অপরাপর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, আমরা ড্রয়িং রুমে প্রবেশের পর মিঃ ওঝা ব্যক্তিগত আলাপের জন্য অন্যান্যকে যে রুমে নিয়ে যান তা ডানপার্শ্বে। প্রথম বাড়ীতে সে রুম ছিল ড্রয়িং রুমের ঠিক বিপরীত। প্রথম বাড়ীতে আমাকে পার্শ্বস্থ রুমে নেওয়া হয়। সেখানে আমি ২/৩ খানা চেয়ার ও একটি টেবিল দেখিতে পাই। ওই দুই বাড়ীর দু'পাশেই অনেকগুলো বড় বাড়ী রয়েছে।
প্রঃ ওই দুই বাড়ী হ'তে নিউ মার্কেট কতদূর?
উঃ বলতে পারি না।
প্রঃ ওঝার বাড়ী যেতে আপনাদের নিউমার্কেটের পাশ থেকে যেতে হয়েছিল?
উঃ না।
প্রঃ মিঃ ওঝার বাড়ী হতে ধানমণ্ডির 'আলেয়া' কতদূর?
উঃ দূরত্ব বলতে পারব না।
কৌসুলির অপর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, 'পার্টির অফিস ১৩ গ্রীন স্কোয়ার থেকে ধানমণ্ডির ১৭ কিম্বা ১৮ নম্বর রোডে স্থানান্তর করা হয়েছে এ খবর আমি ১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসে জানতে পারি। আমি ও মানিক চৌধূরী একটি বেবীট্যাক্সিযোগে উক্ত বাড়ীতে গমন করি।
প্রঃ সেখানে আপনারা কখন পৌঁছেন?
উঃ রাত ৮টা কি ৯টায়।
প্রঃ সে বাড়ীটা একতালা না দোতলা?
উঃ দোতলা।
প্রঃ সেখানে আপনাদের আগে কেউ গিয়াছিল?
উঃ আমরা গিয়ে সামাদকে দেখতে পাই।
প্র ঃ সে বাড়ীতে আপনারা কি আলী রেজার ভাই অথবা বাবাকে দেখতে পান?
উঃ না।
প্রঃ আপনি আলী রেজার গ্রেফতারের তারিখ জানেন?
উঃ না।

প্র ঃ ঢাকা জেলে আপনাকে কোনখানে রাখা হত?
উঃ 'পুরান হাজতে'।
প্রঃ ওই রুমে আপনার সঙ্গে আলী রেজা, কামালুদ্দিন, সুলতান উদ্দীন ছিলেন?
উঃ হ্যাঁ ছিলেন।
প্রঃ ১৯৬৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর আলী রেজাকে এস, বি, অফিসে নেয়া হয়েছিল কিনা, আপনি কি তা জানেন?
উঃ আমি জানি না।
প্রঃ তাকে কবে জেল থেকে বাহিরে নেয়া হয়?
উঃ ১৯৬৭ সনের ১১ই ডিসেম্বর।
প্রঃ তিনি কবে ফিরে আসেন?
উঃ আমার মনে নেই।
প্রঃ ১লা জানুয়ারী জেলে ফিরে আপনি কি রেজাকে সেখানে দেখতে পান?
উঃ না, আমি রেজাকে দেখতে পাইনি।
প্রঃ যদি বলি জেলে দেখার আগে আপনি রেজাকে কখনও দেখেন নি?
উঃ এটা ঠিক নয়।
প্রঃ আমি যদি বলি আলী রেজা ১৯৬৭ সনের সেপ্টেম্বরের আগে ধানমণ্ডির বাড়ীতে যাননি?
উঃ তা ঠিক নয়।
প্রঃ ১৯৬৫ সনের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের জন্যে জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী কোন দলের প্রার্থী ছিলেন?
উঃ সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রার্থী ছিলেন।
প্রঃ নির্বাচনে তাঁকে সমর্থনের জন্যে শেখ মুজিবর রহমান একটা সাধারণ নির্দেশ জারী করেছিলেন কিনা আপনি কি তা জানেন?
উঃ আমি জানি না।
প্রঃ উক্ত নির্বাচনে আপনি কাকে সমর্থন করেন?
উঃ আমি জনাব সাইফুদ্দিন সিদ্দিকীকে সমর্থন করি।
প্রঃ দলগুলি হতে প্রার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছিল কি?
উঃ জী না।
প্রঃ সম্মিলিত বিরোধী দল হতে কাকেও মনোনয়ন দেয়া হয়েছিল কিনা, আপনি কি তা জানেন?
উঃ আমি জানি না।
প্রঃ আওয়ামী লীগ থেকে আপনাকে বহিষ্কার করা হবে না কেন, তা ব্যাখ্যা করার জন্য ১৯৬৫ সনের ৫ই এপ্রিল আপনার উপর নোটিশ জারী করা হয়েছিল না?
উঃ জী না, কোন নোটিশ জারী করা হয়নি।

প্রঃ জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী ও জনাব এম, এ, আজিজের কাছে আপনি ক্ষমা চেয়েছিলেন না?
উঃ তাঁদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।
প্রঃ আপনি মিউনিসিপ্যালিটির কি ছিলেন?
উঃ মিউনিসিপ্যাল কমিশনার।
প্রঃ আপনি ২০ হাজার টাকা দিয়ে ইস্পাহানি মিলের কাছে পাহাড়তলীতে জমি কিনেছিলেন?
উঃ এটা ঠিক নয়।
প্রঃ ১৫ হাজার টাকা দিয়ে আপনি ডাবল মুরিংসেও জমি কিনেছিলেন না?
উঃ না, এটাও ঠিক নয়।
প্রঃ এনায়েত বাজার ও অন্যান্য স্থানের লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে প্রচারপত্র ছাপিয়েছিল না?
উঃ আমি জানি না।
প্রঃ মোজাহার আলীকে চেনেন?
উঃ জী না, আমি চিনি না।
প্রঃ জনাব আলীকে চেনেন?
উঃ চিনি, তিনি আমার ইউনিয়ন কমিটির সদস্য।
প্রঃ তিনি কি আপনার বন্ধু?
উঃ তিনি আমার বিশেষ বন্ধু নন, তবে আমি যে ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম তিনি তার সদস্য ছিলেন।
প্রঃ আপনার ডিসপেন্সারী কোন জায়গায়?
উঃ এনায়েত বাজার এলাকায় বাটালী রোডে।
প্রঃ আপনি দু'জায়গায় ভোটার হবার চেষ্টা করেছিলেন না?
উঃ না, আমি চেষ্টা করিনি।
প্র ঃ মতি উল্লাহ খানকে চেনেন?
উঃ জ্বী না।
প্রঃ দুটা ইউনিটে আপনার নাম ভোটার তালিকাভুক্ত করার বিরুদ্ধে অভিযোগ সংক্রান্ত একটা দরখাস্তের ব্যাপারে আপনি একজন অফিসারের সামনে হাজির হয়েছিলেন না?
উঃ আমি স্মরণ করতে পারছি না।
প্রঃ জনাব এস, রহমান কে?
উঃ তিনি চট্টগ্রামে রিটার্নিং অফিসার ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

কৌঁসুলির কতিপয় প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, জনাব রহমানের সামনে হাজির হইলে দুইটা ইউনিটের কোন্‌টায় তিনি ভোটার হিসাবে থাকিতে ইচ্ছুক তাহা জানিতে চাহেন।

সাক্ষী বলেন, তিনি কখনও দুইটা ইউনিটের একটায় তাহার ঠিকানা ইয়াকুব হোসেনের কেয়ার অব-এ দেন নাই।
প্রঃ তখন ইয়াকুব হোসেন কি জনাব রহমানের সামনে ছিলেন?
উঃ জী না।
প্রঃ আপনি ম্যাজিস্ট্রেটকে কি বললেন?
উঃ আমার নাম এক জায়গায় রাখতে বললাম।
প্রঃ অন্য ইউনিটে আপনার নাম কিভাবে তালিকাভুক্ত হলো তার কারণ হিসাবে ম্যাজিস্ট্রেটকে আপনি কি বললেন?
উঃ আমি বললাম, উক্ত ইউনিটে প্রাক্টিস করি বলেই আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
প্রঃ মতিউল্লাহ খান নামে জনৈক ব্যক্তির আবেদনক্রমে তদন্ত করা হয়েছিল কি-না, আপনি কি তা জানেন?
উঃ আমার মনে নেই।
প্রঃ 'ক্রনিকল' কি জানেন?
উঃ একটা 'পত্রিকা' চট্টগ্রাম থেকে বের হয়।
প্রঃ দুটো ইউনিটে তালিকাভুক্ত সম্পর্কে 'ক্রনিকল'-এও আপনার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছিল কি-না,তা কি আপনি জানেন?
উঃ আমি জানি না।

জনাব এম, এম, জি, হাফিজ

প্রঃ ঢাকা হতে জয়দেবপুর যাবার সময় আপনি ট্যাক্সীতে কার সাথে ছিলেন?
উঃ আমীর হোসেনের সাথে এক ট্যাক্সীতে ছিলাম। বিধান সেন অন্য ট্যাক্সীতে ছিলেন।
প্রঃ জয়দেবপুরের পথে আপনাদের ট্যাক্সী কোথাও থেমে ছিল?
উঃ আমার মনে নেই।
প্রঃ টঙ্গীর কাছে একটা বড় সেতু বা পথে আর কোন সেতু অতিক্রম করেছিলেন?
উঃ এখন আমার মনে নেই।
প্রঃ কুদ আদায়ের জন্যে আপনাদের টঙ্গীর সেতুতে থামিয়েছিল না?
উঃ আমি স্মরণ করতে পারছি না।
প্রঃ কুদ আদায়ের জন্যে যাবতীয় গাড়ী সেতুর উত্তর মাথায় থামানো হয় তা কি আপনি জানেন না?
উঃ এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারছি না।
প্রঃ পথে আপনারা কোন রেল লাইন অতিক্রম করেছিলেন?
উঃ আমার স্মরণ নেই।

প্রঃ বেবীট্যাক্সীর ভাড়া আপনি দিয়েছিলেন?
উঃ জী না।
প্রঃ আপনি যে বেবীট্যাক্সীতে ভ্রমণ করেন তার ড্রাইভারকে কত দেয়া হয়?
উঃ আমি জানি না।
প্রঃ আপনার গ্রেফতারের ব্যাপারে আপনার বাসায় কে কে গিয়েছিলেন?
উঃ চট্টগ্রামের কোতোয়ালী থানার ওসি এবং কয়েকজন পুলিস কনষ্টেবল।
কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাঁহার গ্রেফতারের পর সকাল প্রায় ৬টায় পুলিস তাঁহাকে তাঁহার ডিসপেন্সারীতে নিয়া যায় এবং উহাতে তল্লাশী চালায়।
প্রঃ স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি, এস,পি অফিসে আপনাকে কখন নেয়া হয়?
উঃ সকাল প্রায় ৮ টায়।
প্রঃ তল্লাশীর পর আপনার ডিসপেন্সারী হতে কোন দলিলপত্র পাওয়া যায়?
উঃ জী না, কোন দলিলপত্র পাওয়া যায়নি।
প্রঃ যদি বলি, যেসব হিন্দু চলে গেছে তাদের কিছু পুরনো আমদানী লাইসেন্স এবং মুদ্রা পাচার সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র আপনার ডিসপেন্সারী হতে পুলিস আটক করেছে?
উঃ এটা ঠিক নয়।
প্রঃ ডি এস পি'র অফিসে নেবার পর আপনি কাকে কাকে দেখতে পান?
উঃ মানিক চৌধূরী ও রমিজ দুইজনকেই।
প্রঃ ডি এস পি'র অফিস থেকে আপনাকে কোথায় নেয়া হয়?
উঃ চট্টগ্রাম জেলে।
প্রঃ কতক্ষণ পর?
উঃ প্রায় একঘণ্টা পর।
প্রঃ বাকী দু'জনকেও কি আপনার সাথে জেলে নেয়া হয়?
উঃ জী, দু'জনকেই নেয়া হয়।
প্রঃ চট্টগ্রাম থেকে কয়টার ট্রেনে আপনাকে ঢাকা নেয়া হয়?
উঃ রাত সাড়ে ১০ টার ট্রেনে।
প্রঃ উহাকে কি ট্রেন বলে?
উঃ ঢাকা মেল বলে।
প্রঃ মানিক ও রমিজকে কোন ট্রেনে নেয়া হয়?
উঃ ঐ একই ট্রেনে।
প্রঃ আপনি কবে এল,এম,এফ ডিপ্লোমা পাস করেন?
উঃ ১৯৫৫ সনে।
প্রঃ প্র্যাক্টিস করার জন্যে আপনার কোন রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট আছে?
উঃ জী, আছে।

প্রঃ ঐ সার্টিফিকেট কে ইস্যু করেছিল?
উঃ পূর্ব পাকিস্তান ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকালটি ও রেজিষ্টেশন বোর্ড।
প্রঃ এটা কি প্রতি বৎসর রিনিউ করতে হয়?
উঃ জী না।
প্রঃ ১৯৫৫ সন থেকে আপনি নিয়মিত প্র্যাক্টিস করেছেন কি?
উঃ জী হ্যাঁ।
কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, কয়লার ব্যবসায়ের ফার্মের তিনি সক্রিয় পার্টনার নহেন। সাক্ষী বলেন, তিনি মাঝে মাঝে উক্ত ফার্মে গমন করেন।
প্রঃ ডাক্তার হিসাবে প্র্যাকটিস করার সময় ব্যবসা করার জন্যে পারমিশন নেয়া প্রয়োজন তা কি আপনি জানেন?
উঃ প্রয়োজন কি না আমি জানি না।
প্রঃ আপনি কি পারমিশন নিয়েছিলেন?
উঃ জী না।
প্রঃ আপনি এনায়েত বাজার ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন কবে?
উঃ ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত আমি এনায়েত বাজার ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম।
প্রঃ ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্যে আপনার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল?
উঃ আমার বিরুদ্ধে কোন সময় ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল বললে ভুল হবে। ১৯৬৬ সাল থেকে আমি এনায়েত বাজারের একটা ওয়ার্ডেন পোষ্টে ওয়ার্ডেন ছিলাম।
প্রঃ আপনাকে কি সে পদ থেকে সমাজবিরোধী কাজের জন্যে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল?
উঃ সমাজবিরোধী কাজের জন্যে আমাকে সে পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল বললে ভুল হবে। আমি কিছুকাল পোর্ট হজ কমিটিতে সামরিক মেডিকেল অফিসার হিসেবেও কাজ করেছি। আমি কোন্ কোন্ সালে এ কাজ করেছিলাম,তা' বলতে পারব না। আমি এই কাজের জন্যে মাসিক ২০০ থেকে ৩০০ টাকা পেয়েছি।
প্রঃ আপনার ছেলেপুলে কটা?
উঃ আমার চারটি সন্তান। তারা সকলেই নাবালক। আমার আশ্রয়ে সর্বমোট ৭ জন লোক আছে। এই আশ্রিতদের মধ্যে আমার দুইজন ভাইও আছে। গ্রেফতারের আগে আমার মাসিক আয় ছিল ৬শ থেকে ৭শ টাকা। আমার পরিবারের ভরণপোষণের এটাই পর্যাপ্ত ছিল।

প্রঃ আপনি কি আয়কর দিয়ে থাকেন?
উঃ হ্যাঁ, আমি আয়কর দিয়েছি। আমাকে গ্রেফতার করে আটক রাখার পর আমার দু'ভাই আমার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ চালায়। তাদের একজন সরকারী চাকুরে, আর একজন দোকানদার, এছাড়া আমার শ্বশূরও আমার পরিবারবর্গের ব্যয় বহন করেন।
প্রঃ আপনার শ্বশূর কি করেন?
উঃ আমার শ্বশূর একজন ব্যবসায়ী ও ভূ-স্বামী। আমার ভাই সরকারী চাকুরিতে কত বেতন পায় তা আমার জানা নেই। সে চাটগাঁয়ে বিভাগীয় কমিশনারের অফিসে কেরানীর কাজ করেন।
প্রঃ আপনার পরিবারবর্গ তো সরকার থেকে ভাতা পেয়ে থাকেন?
উঃ আমার পরিবারবর্গ সরকারী ভাতা পায় বললে ভুল বলা হবে। আমার মরহুম আব্বাজানও চাটগাঁয়ে কমিশনারের অফিসে ক্লার্কের কাজ করতেন। তিনি ১৯৫৬ সালে এন্তেকাল করেন। আমরা যে ঘরে বাস করতাম সেই ঘরেই তাঁকে কবর দেয়া হয় এবং সেটাকেই বর্তমান মাজার হিসেবে গণ্য করা হয়। মানুষ মাজারে যেয়ে শিন্নি দেয় বলে আমার জানা নেই।
প্রশ্নঃ আপনি আয়ের জন্যে এটাকে মাজার বলে চালিয়েছেন?
উঃ আমি এটা থেকে কিছু আয়ের জন্যে এটাকে মাজার বলে জাহির করেছি বললে ভুল হবে।
প্রঃ আপনাকে ডি,পি, আর এ আটক রাখার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দরখাস্ত করা হয়েছে বলে কি আপনি জানতেন না?
উঃ আমি পরে আমার স্ত্রী আর ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে পারি যে, আমাকে ডিপিআর-এর আটক রাখার বিরুদ্ধে আমার পক্ষ থেকে ঢাকা হাইকোর্টে একটা দরখাস্ত করা হয়েছে। আমাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে সরিয়ে নেয়ার ৭/৮ দিন পরে আমি একথা জানতে পারি। আমি যতদূর শুনেছি তাতে আমার ছোট ভাই এই দরখাস্ত পেশ করে। তাঁর নাম হচ্ছে গোলাম মোস্তফা চৌধুরী। আমার পক্ষে যাঁরা হেবিয়াস কর্পারে দরখাস্ত পরিচালনা করছিলেন, সেই আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে একটা আবেদন করেছিলাম। দু'জন আইনজীবী আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের একজন হচ্ছেন মরহুম আবদুর রব, আর একজন জানান যে, তিনি মীর্জা মোঃ গোলাম হাফিজের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আমি ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে থাকাকালে আমার ওপর ডিপিআর-এর আটকাদেশ জারী করা হয়।
প্রঃ কোন অপরাধে আপনার ওপর আটকাদেশ জারী করা হয়েছিল?
উঃ কোন অপরাধে যে আমার উপর আটকাদেশ জারী করা হয়েছিল, এখন তা' আমার মনে নেই।

প্রঃ মানিক চৌধুরী যুদ্ধ তহবিলে ১০০০ টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন তা আপনি জানেন?
উঃ মানিক চৌধুরী যুদ্ধ তহবিলে ১০০০ টাকা চাঁদা দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।
প্রঃ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনে আপনার বিরুদ্ধে একটা মামলা ছিল, আপনি রাজসাক্ষী হয়ে তা থেকে মুক্তি পান?
উঃ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনে আমার বিরুদ্ধে কোন মামলা ছিল না, কাজেই এই মামলার রাজসাক্ষী হয়ে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।
জনাব মোহাম্মদ ফজলুল করিমের এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, আন্দোলনের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমাকে স্বাভাবিকভাবেই পি,এন,ওঝার সাথে বন্ধুত্ব করতে হয়।
উঃ বাংলায় 'ওঝা' শব্দের অর্থ কি?
উঃ বাংলায় 'ওঝা' শব্দের অর্থ আমার জানা নেই। মিঃ ওঝা আমাদের সাথে ইংরেজী ও উর্দুতে বাতচিত করতেন। তাঁর উচ্চারণের মধ্যে আমি কোন বৈশিষ্ট্য দেখতে পাইনি।
প্রঃ তাঁর মাথায় কোন টিকি ছিল?
উঃ তাঁর টিকি আছে কিনা, তা' আমি লক্ষ্য করিনি।
প্রঃ শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে গঠিত সরকার ছাড়া আর কোন সরকার আপনাদের অস্ত্রশস্ত্র দেবেন না বলে কি মিঃ ওঝা আপনাকে জানিয়েছিলেন?
উঃ মিঃ ওঝা একথা আমাদের বলেন নি।
(ভারতের কাছে কোন সামরিক গোপনীয়তা প্রকাশ না করেও তাঁরা ভারতের কাছ থেকে অস্ত্র পেতে পারেন বলে তাহার প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস করতো কিনা, কৌসুলি সাক্ষীর কাছে বারবার তা' জানতে চান)

সাক্ষী প্রথমে প্রশ্নটি অনুধাবন করতে পারেনি বলে বোঝাবার চেষ্টা করেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলেন যে, কারুর পক্ষেই সামরিক গোপনীয়তা ফাঁস করা সম্ভব নয়। পূর্ব পাকিস্তানে আমরা কি ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তা আমরা মিঃ ওঝাকে জানাইনি। তাছাড়া তিনি আমাদের এ সম্পর্কে কোন প্রশ্নও করেননি। ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানের কিছু উপকার করতে চান বলে মিঃ ওঝা আমাদের কিছু বলেননি। (সাক্ষী ব্যক্তি পূজায় বিশ্বাসী, না যৌথ নেতৃত্বে বিশ্বাসী বলিয়া প্রশ্ন করা হইলে সাক্ষী বলেন যে, ব্যক্তি পূজা এবং যৌথ নেতৃত্ব বলিতে কি বুঝায়, তা তিনি জানেন না।) আমাদের সভায় ব্যক্তি পূজা ও যৌথ নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

এস, এম নূরুল আলমের জেরা

গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলি জনাব এ, এম, নূরুল আলমের জেরার উত্তরে সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমান বলেন, তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে প্রদত্ত বিবৃতিতে লেঃ মোয়াজ্জেম তাঁহার হাতে খামে পুরিয়া টাইপ করা অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকা দিয়েছিলেন, একথা বলেন কিনা, তাহা তাঁহার মনে নাই। (এভাবেই রেকর্ড হইয়াছিল)।

সাক্ষী আরও বলেন যে, পুলিসের নিকটে এমন কথা বলেন কিনা তাহাও তাহার মনে নাই (এভাবেই রেকর্ড হইয়াছিল)।

জুলমত আলী খানের জেরা

বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলি জনাব জুলমত খান সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্রঃ আপনার শ্বশুর বাড়ী কোথায়?

উঃ সীতাকুণ্ডে।

সাক্ষী আরও বলেন, সীতাকুণ্ড একটি রেলওয়ে ষ্টেশন এবং তাহার শ্বশুর বাড়ী ষ্টেশন থেকে আধ মাইল দূরে অবস্থিত।

প্রঃ ১৯৬৬ সালের মে মাসে আপনার পরিবার শ্বশুরালয়ে ছিল কি?

উঃ আমার মনে নেই। সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি উক্ত মাসে শ্বশুরালয় গিয়াছিলেন কিনা, তাহাও তাঁহার মনে নাই।

কৌসুলিঃ আমি বলছি, আপনি ১৯৬৬ সালের ১৮ই মে থেকে ২২শে মে অবধি শ্বশুর বাড়ীতে ছিলেন?

সাক্ষী তদুত্তরে বলেন , তা আমি স্বীকারও করছি না বা অস্বীকার করতেও পারছি না।

প্রঃ আপনার ঔষধের লাইসেন্স নিজের নামে না ফার্মের নামে?

উঃ আমার ফার্মেসীর নামে।

সাক্ষী আরও বলেন, তাঁহার ফার্মেসীর নাম 'নিউ মেডিক্যাল হল'।

প্রঃ ১৯৬৬ সনে আপনি চীন হইতে 'দারুচিনি' আমদানী করেছিলেন কি?

উঃ আমার স্মরণ নেই।

সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি ১৯৬৬ সালে কিছু ঔষধ আমদানী করেন কিন্তু কোন দেশ থেকে আমদানী করেন তাহা তাহার মনে নাই। তাহাছাড়া এতদসম্পর্কিত সকল কাগজপত্র তাহার কারবারের জনৈক বন্ধুর নিকট জমা আছে। কেননা উক্ত বন্ধু এ ব্যবসা দেখাশুনা করে থাকেন।

প্রঃ কত টাকা শূল্ক প্রদান করেছিলেন?

উঃ আমার মনে নেই।

প্রঃ ১৯৬৬ সালে ঔষধ আমদানীকালে অবৈধ কার্যকলাপের জন্য দুর্নীতি দমন বিভাগ আপনার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করেছিল কি?

উঃ উহা সত্য নহে।

প্রঃ পরে চট্টগ্রামের শূল্ক বিভাগীয় কালেক্টর আপনাকে নিয়ম বিরুদ্ধ পদ্ধতিতে ঔষধ আমদানীর জন্য জরিমানা করেছিল কি?

উঃ আমার স্মরণ নেই।

জনাব আবদুল মোনেম

কৌসুলি জনাব আবদুল মোনেমের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী ম্যাজিষ্ট্রেট তার স্বীকারোক্তি গ্রহণের আগে মামলার তথ্যাদি (facts) বা সত্যতা নিরূপণ করেন নাই। "ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত বিবৃতি শিখানো বুলি ছাড়া আর কিছুই নহে এবং উহা স্বেচ্ছাকৃত নহে" বলিয়া কৌসুলি যে মন্তব্য করেন সাক্ষী উহার সত্যতা অস্বীকার করেন।

অতঃপর বিবাদীপক্ষের আর কোন কৌসুলি সাক্ষীকে জেরা করেন না।

মঞ্জুর কাদের

এই পর্যায়ে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের সাক্ষীকে পুলিস নির্যাতন সম্পর্কিত স্বরাষ্ট্র দফতরের সেক্রেটারীর নিকট লিখিত দরখাস্তের প্রশ্নে কারণ ব্যাখ্যা করার আহ্বান জানান।

সাক্ষী বলেনঃ "সেন্ট্রাল জেলে তাদের ফেরৎ পাঠানোর সময়ে গাড়ীতে অভিযুক্ত এ, বি, খুরশিদও ছিলেন। তিনি তাকে উক্ত মর্মে দরখাস্ত লেখার জন্যে পরামর্শ দান করেন। তিনি আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে, আমি যদি এভাবে দরখাস্ত দিই তাহলে আটকাবস্থা থেকে আমার মুক্তি লাভের সুবিধা হবে।"

সালাম খান

জনাব মঞ্জুর কাদের কর্তৃক সাক্ষীকে এভাবে প্রশ্ন করার ফলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান আদালতের বিশেষ অনুমতিক্রমে সাক্ষীকে পুনরায় জেরা করেন।

প্রঃ আপনাদের যখন জেলখানায় নেওয়া হচ্ছিল তখন কোন পুলিস অফিসার আপনাদের সঙ্গে ছিল কি?

উঃ একজন পুলিস অফিসার উক্ত গাড়ীতে (কার) ছিলেন। তিনি সামনের সীটে ছিলেন। আমরা পেছনের আসনে ছিলাম।

দৈনিক পয়গাম

৩০শে আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

ফ্লাইট লেঃ রমিজের জবানবন্দী শুরু : ডাঃ সাইদুর রহমানের জেরা সমাপ্ত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৬ নম্বর রাজসাক্ষী ফ্লাইট লেঃ মীর্জা মোহাম্মদ রমিজের জবানবন্দী শুরু হয় এবং ৫ নম্বর রাজসাক্ষী ডঃ সাইদুর রহমান চৌধুরীর জেরা সমাপ্ত হয়।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদিরের প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ আদালতে শপথ গ্রহণের পূর্বে তাঁহার নাম ও ঠিকানা বিবৃত করেন।

তিনি বলেন, 'আমার নাম মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ, পিতার নাম মরহুম এস, এম, সিরাজ, বয়স ৩৯, মুসলমান এবং ঢাকা জেলার রূপগঞ্জ থানার ধানুর অধিবাসী।" ইহার পর সাক্ষী শপথ গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন–বিমান বাহিনীতে আপনার চাকুরীর বিবরণ দান করুন।

উত্তর–১৯৫২ সালে কমিশণ্ড অফিসার হিসাবে আমি পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগদান করি। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে আমি পি, এ, এফ হইতে অব্যাহতি পাই। ১৯৬২ সালের একই মাসে আমি পি, আই, এ-তে কমার্শিয়াল অফিসার হিসাবে যোগদান করি। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে পি, আই, এ'-র ডিষ্টিক্ট ম্যানেজার হিসাবে আমাকে চট্টগ্রাম বদলী করা হয়। প্রায় ১৫ দিন আমি চট্টগ্রামের ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্ট্রাল অফিসার্স মেসে অবস্থান করি। ইহার পর আমি চট্টগ্রাম শহরের মোহাম্মদ আলী রোডের এক বাড়ীতে যাই। সেখানে আমি প্রায় তিন মাসের মত বসবাস করিয়াছিলাম এবং ইহার পর ১৬ পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকায় বসবাসের জন্য গমন করি। আমি সেখানে একটি ভাড়াটে বাড়ীতে থাকিতে শুরু করি।

প্রশ্ন–আপনি কি ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে চিনেন?

উত্তর–জী হ্যাঁ।

প্রশ্ন–এ, বি, খুরশীদ?

উত্তর–জী হ্যাঁ।

সাক্ষী সঠিকভাবে অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান এবং এ, বি, খুরশীদকে সনাক্ত করেন।

প্রশ্ন–আপনি কি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে চেনেন?

উত্তর–হ্যাঁ। ১৯৬৬ সালের মে মাস হইতে।

প্রশ্ন–লেঃ মোয়াজ্জেমের সহিত কিভাবে আপনার পরিচয় হয়?

উত্তর–১৯৬৬ সালের মে মাসের কোন একদিন লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ষ্টুয়ার্ড মুজিব এবং এ, বি, খুরশীদ সমভিব্যবহারে চট্টগ্রামে আমার ১৬ পাঁচলাইশ আবাসে আগমন করেন। (সাক্ষী লেঃ মোয়াজ্জেমকে অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় সঠিকভাবে সনাক্ত করে)।

প্রশ্ন–আপনাদের মধ্যে কি আলোচনা হইয়াছিল?

উত্তর–লেঃ মোয়াজ্জেম আমার সহিত বিমানবাহিনী এবং নৌ-বাহিনীর সাবেক কর্মচারীদের কল্যাণ সম্পর্ক আলাপ-আলোচনা করেন। আলোচনার সময় ষ্টুয়ার্ড মুজিব এবং এ, বি, খুরশীদও উপস্থিত ছিলেন। যাওয়ার আগে লেঃ

মোয়াজ্জেম আমাকে তাঁহার নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির গৃহে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

প্রশ্ন–লেঃ মোয়াজ্জেম কি আপনাকে ঠিকানা দিয়াছিল?

উত্তর–জী হ্যাঁ।

প্রশ্ন–আপনি কি সে গৃহে গমন করিয়াছিলেন?

উত্তর–জী হ্যাঁ। ১৫ দিন পরে আমি সে গৃহে যাই।

প্রশ্ন–সে গৃহে কি অন্য কেহ উপস্থিত ছিল?

উত্তর–হ্যাঁ। ষ্টুয়ার্ড মুজিব এবং খুরশীদ উপস্থিত ছিল।

প্রশ্ন–কি আলোচনা হইয়াছিল?

উত্তর–এই বৈঠকে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। তিনি আমাকে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য শাসনতান্ত্রিক পন্থায় পরিবর্তন করা যাইবে না এবং প্রচণ্ড ধরনের কিছু করা দরকার।

প্রশ্ন–আপনার প্রতিক্রিয়া কি হইয়াছিল?

উত্তর–আমি ইহাতে সাড়া দেই।

প্রশ্ন–তারপর কি আলোচনা হইতেছিল?

উত্তর–ইহার পর লেঃ মোয়াজ্জেম বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীন করার জন্য তিনি সাবেক সামরিক কর্মচারীদের সহায়তায় একটি প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করিতেছেন।

প্রশ্ন–ইহা শ্রবণের পর আপনার কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল?

উত্তর–তাঁহার চিন্তাধারায় আমি মুগ্ধ হই এবং যতদূর সম্ভব তাঁহাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করি।

প্রশ্ন–ইহার পর কি লেঃ মোয়াজ্জেমের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

উত্তর–জী হ্যাঁ। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে আমি পুনরায় চট্টগ্রামে তাঁহার নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির গৃহে দেখা করিতে যাই।

প্রশ্ন–এইবার লেঃ মোয়াজ্জেম আপনাকে কি বলিয়াছিল?

উত্তর–লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে (বিপ্লবী) সংস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেন।

প্রশ্ন–কি উদ্দেশ্য?

উত্তর–উদ্দেশ্য হইতেছে–শক্তি দ্বারা সরকারকে উচ্ছেদ করা এবং বর্তমান সীমানাযুক্ত পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জন করা।

প্রশ্ন–এই সাক্ষাৎকারের সময় লেঃ মোয়াজ্জেম আপনাকে কি কিছু দেখাইয়াছিল?

উত্তর–জী হ্যাঁ। এই সাক্ষাৎকারকালে তিনি আমাকে একটি ডাইরী, একটি এক্সারসাইজ খাতা ও একটি ফোল্ডার দেখান এবং আমাকে ইহা পড়িতে বলেন এবং ইহা আমি পড়ি।

প্রশ্ন–কি লিখিত ছিল?

উত্তর–প্রস্তাবিত সরকারের রূপরেখা সম্পর্কে আভাস ছিল। এতে লেখা ছিল যে, সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধীনে থাকিবে। সকল শিল্প জাতীয়করণ করা হইবে, মুদ্রাপ্রথা পরিবর্তন করিয়া কুপন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা, দুর্নীতি সমূলে উচ্ছেদ করা হইবে। সংক্ষেপে তাহাতে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা বর্ণিত ছিল।

প্রশ্ন–আপনার প্রতিক্রিয়া কি হইয়াছিল?

উত্তর–এই দলিল পাঠ করিয়া আমি মুগ্ধ হই এবং লেঃ মোয়াজ্জেমকে আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি।

প্রশ্ন–আপনাকে আর কিছু কি দেখাইয়াছিল?

উত্তর–জী হ্যাঁ। প্রস্তাবিত নূতন রাষ্ট্রের একটি পতাকাও তিনি আমাকে দেখাইয়াছিলেন। সবুজ এবং সোনালী রং ছিল পতাকা। যতদূর মনে হয় পতাকায় পাটের একটি প্রতীকও অঙ্কিত ছিল।

প্রশ্ন–বিপ্লবী সংস্থার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আপনার সহিত সাক্ষাৎ ব্যক্তিদের আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে কি হইয়াছে?

উত্তর–নেতৃস্থানীয় কর্ম্মীদের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে অনুরোধ করিয়া আমি লেঃ মোয়াজ্জেমকে আমার পাঁচলাইশ গৃহে তিনি সভা ডাকিতে পারেন বলিয়া প্রস্তাব দিয়াছিলাম। কিছুদিন পরে আমার গৃহে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। লেঃ মোয়াজ্জেম ব্যতিরেকে ষ্টুয়ার্ড মুজিব, খুরশীদ, রিসালদার শামসুল হক, হাবিলদার আজিজসহ আরও ৪/৫ জন সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন–আপনি আজিজ এবং শামসুল হকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের কি আপনি পূর্ব হইতে চিনতেন?

উত্তর–না। লেঃ মোয়াজ্জেম তাহাদিগকে সভায় আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। (সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় এ, কে, এম, শামসুল হককে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন কিন্তু কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর বলেন,"আমি হাবিলদার আজিজকে বাহির করিতে পারিতেছি না।")

প্রশ্ন–সভায় কি হইয়াছিল?

উত্তর–লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে দলে স্বাগত জানান। তারপর নাস্তা খাওয়ার পর সভা শেষ হয়। রাজসাক্ষী মীর্জ্জা মোহাম্মদ রমিজ তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন, আমি ক্যাপ্টেন আলমকে চিনি। ১৯৬৬ সালের জুন অথবা জুলাই মাসের কোন একসময় লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন তাহার গাড়ীতে করিয়া আমাকে কুমিল্লায় ক্যাপ্টেন আলমের বাসায় লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার

পূর্বে আমি তাঁহাকে চিনিতাম না। লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে আমরা নির্দিষ্ট তারিখে কুমিল্লায় পৌঁছিব এ সংবাদ ক্যাপটেন আলমকে দেওয়ার জন্য কুমিল্লায় পাঠাইয়াছিলেন। (সাক্ষী কাঠগড়ায় ক্যাপ্টেন আলমকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন)। ক্যাপ্টেন আলমের গৃহে ঐ সভায় ক্যাপ্টেন মোতালিবও আমাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। (সাক্ষী কাঠগড়ায় ক্যাপ্টেন মোতালিবকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন। বস্তুতপক্ষে ক্যাপ্টেন মোতালিব তাঁহাকে সনাক্ত করা হইবে অনুমান করিয়া দণ্ডায়মান হন)। ঐ সময় প্রথমবার লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ক্যাপটেন মোতালিবের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দেওয়ার পূর্বে আমি ক্যাপটেন মোতালিবকে চিনিতাম না। ক্যাপ্টেন আলমের গৃহে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজ গ্রহণ করি এবং ভোজের পর লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন যে, ডি-ডে'র কর্মসূচী হইবে কুমিল্লাসহ পূর্ব পাকিস্তানের সকল ক্যান্টনমেন্টে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ইউনিটগুলি দখল করা এবং তাহাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা নষ্ট করা। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, ঐ ব্যবস্থা কমান্ডো ধরনের হইবে এবং এই আকস্মিকতা জনশক্তির অপ্রতুলতার ক্ষতিপূরণ করিবে। লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ক্যাপ্টেন আলমকে কুমিল্লায় সামরিক বাহিনীর লোকদের সহিত তাহার যোগাযোগ বৃদ্ধি করিতে বলেন। ইহার উত্তরে ক্যাপ্টেন আলম বলিয়াছিলেন যে, এই সংস্থায় নূতন লোক সংগ্রহের জন্য তিনি সম্ভাব্য সকল কিছু করিতেছেন। ক্যাপ্টেন মোতালেব উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীর লোকদের মধ্যে আমাদের আন্দোলন সংগঠন করিতেছেন এবং সেখানে উৎসাহজনক সাড়া দেখা গিয়াছে। উহার পর আমরা গাড়ী করিয়া ক্যাপ্টেন শওকতের গৃহের উদ্দেশ্যে ক্যান্টনমেন্ট গমন করি। আমি পূর্বে ক্যাপ্টেন শওকতকে চিনিতাম না। লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। (ক্যাপ্টেন শওকতকে সনাক্ত করিতে বলা হইলে সাক্ষী সার্জেন্ট জলিলকে ক্যাপ্টেন শওকত বলিয়া সনাক্ত করেন)। ক্যাপ্টেন শওকতের গৃহে লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ক্যাপ্টেন শওকতকে কুমিল্লায় সামরিক বাহিনীর লোকদের সহিত তাঁহার যোগাযোগ বৃদ্ধি করিতে বলেন। ক্যাপ্টেন শওকত বলেন যে, আন্দোলনের নূতন লোক সংগ্রহের জন্য তিনি তাঁহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং ক্যাপ্টেন আলম ও ক্যাপ্টেন হুদা এই সংস্থা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানিতে চাহিয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন আলম ও ক্যাপ্টেন হুদা সেখানে ছিলেন না; কিন্তু ক্যাপ্টেন শওকত বলেন যে, এই দুইজন অফিসার আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাহিয়াছেন। তখন লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন যে, তিনি শীঘ্রই ঢাকায় একটি সভা আহ্বান করিবেন।

সাক্ষী মীর্জ্জা মোহাম্মদ রমিজ আরও বলেন যে, উক্ত একই সন্ধ্যায় আমরা লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের গাড়ীতে করিয়া চট্গ্রাম গমন করি। ক্যাপ্টেন হুদার সহিত ঢাকার গ্রীন রোডস্থ তাঁহার ফ্ল্যাটে ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ অথবা আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের কোন একসময় আমার সাক্ষাৎ ঘটে। (সাক্ষী কাঠগড়ায় ক্যাপ্টেন হুদাকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন)। ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান আমাকে ক্যাপ্টেন হুদার কথা বলিয়াছিলেন এবং আমি ঢাকা আসিয়া গ্রীন রোডে তাঁহার ফ্যাটে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। ১৯৬৫ সালে আমি যখন ইপিআরসি মেসে অবস্থান করিতেছিলাম সেই সময় ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামানও সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন এবং ইহার ফলে ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামানের সহিত আমি পরিচিত হই। ক্যাপ্টেন হুদার ফ্ল্যাটে আমি ক্যাপ্টেন আলিম এবং ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের সহিত মিলিত হই। লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনও পরে সেখানে আমাদের সহিত মিলিত হন। ক্যাপ্টেন আলিমের সহিত ক্যাপ্টেন হুদার ফ্ল্যাটে আমার সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয়। (সাক্ষীকে কাঠগড়ায় ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামানকে সনাক্ত করিতে বলা হইলে ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান এই পর্যায়ে দাঁড়াইয়া উঠেন এবং তাঁহার নিজের নাম বলেন। ক্যাপ্টেন হুদার ফ্ল্যাটে আমি স্বয়ং এবং লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, ক্যাপ্টেন আলিম ও ক্যাপ্টেন হুদাকে আমাদের আন্দোলনে যোগদানের জন্য দীক্ষিত করি এবং একটি সভার তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়। এখন আমি সেই তারিখ স্মরণ করিতে পারিতেছি না। আমার ফ্ল্যাটকে সভাস্থল হিসাবে ঠিক করা হইয়াছিল এবং আমার বাসা ছিল ঢাকার মোহাম্মদপুর হাউজিং এষ্টেটের ১২ নম্বর বিল্ডিং এর ৮ নম্বর ফ্ল্যাটে।

জবানবন্দী দান অসমাপ্ত অবস্থায় ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন অদ্য শুক্রবার পর্যন্ত মুলতবী হইয়া যায়।

আবদুস সালাম খান

পূর্বাহ্নে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান রাজসাক্ষী এবং বাদীসাক্ষী ডঃ সাইদুর রহমান চৌধুরীকে জেরা করেন।

প্রশ্ন–লালদীঘি ময়দানে (চট্টগ্রামে) শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক জনসভা অনুষ্ঠানের কথা আপনি আদালতে বলিয়াছেন। অপরাহ্নে যে সভা শুরু হইয়াছিল কতক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল?

উত্তর–রাত্রি আটটা-নয়টা পর্যন্ত।

প্রশ্ন–ইহার পর কি সভা এলাকায় কবি-গান হইয়াছিল?

উত্তর–না।

প্রশ্ন–কবি-গান কি, তাহা কি জানেন?

উত্তর–জানি।

প্রশ্ন–আপনি কি সে সভায় উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর–জী হ্যাঁ।

প্রশ্ন–শেখ মুজিবুর কি আপনার বাসায় যাওয়া সম্পর্কে কিছু আপনাকে বলিয়াছিল?

উত্তর–না। (অভিযুক্ত) মানিক চৌধুরী বলিয়াছিলেন।

প্রশ্ন–ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান কি লালদীঘি ময়দানের সভায় উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর–আমি দেখি নাই।

প্রশ্ন–চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের অন্যান্য কর্মকর্তা কি সভায় উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর–হ্যাঁ।

প্রশ্ন– শেখ মুজিবুর যে আপনার গৃহে গমন করিবেন তাহা কোন সময় জানিতে পারেন?

উত্তর–সভা চলাকালে মানিক চৌধুরী অপরাহ্ন ৫-৩০ হইতে ৬টার মধ্যে আমাকে এই কথা বলেন।

প্রশ্ন–শেখ মুজিবুর রহমান তখন কি আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন?

উত্তর–জী হ্যাঁ।

প্রশ্ন–শেখ মুজিবুরের আপনার গৃহে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কি আওয়ামী লীগের অন্যান্য কর্মকর্তাকেও আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন?

উত্তর–না।

প্রশ্ন–শেখ মুজিব কতক্ষণ আপনার গৃহে ছিলেন?

উত্তর–১০ হইতে ১৫ মিনিটের মত।

প্রশ্ন–সেসময়ে চা-নাস্তার কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন?

উত্তর–জী হ্যাঁ।

প্রশ্ন–আপনার ভাইরা তখন কোথায় ছিল?

উত্তর–গৃহের বাহিরে ছিল।

প্রশ্ন–আপনার গৃহ হইতে জনাব সুলতান আহমদ এম, এন, এ'র গৃহ কি খুব কাছে?

উত্তর–জী হ্যাঁ।

প্রশ্ন–তিনি কি সরকারী দলের লোক?

উত্তর–হইতে পারে।

প্রশ্ন–সুলতান আহমদ এম এন এ-কে কি (মুজিবুরের আগমন উপলক্ষে) আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন?

উত্তর–না। কারণ সেটা গোপন সভা ছিল।

প্রশ্ন–শেখ মুজিব কখন আপনার গৃহে আগমন করিয়াছিলেন?

উত্তর–রাত্রি সাড়ে নয়টার সময়।

প্রশ্ন– তিনি বেবীট্যাক্সী না রিক্সাযোগে আপনার গৃহে আগমন করিয়াছিলেন?
উত্তর–মানিক চৌধুরীর মোটরগাড়ীতে করিয়া আগমন করিয়াছিলেন।
প্রশ্ন–বড় মোটরগাড়ী?
উত্তর–না। ছোট মোটরগাড়ী।
প্রশ্ন–আমি বলিতেছি যে, মানিক চৌধুরীর কোন মোটরগাড়ী নাই?
উত্তর–আপনার মন্তব্য সত্য নয়।
প্রশ্ন–আপনি কি সে মোটরে চড়িয়াছেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–তবু কি জাতীয় গাড়ী বলিতে পারিবেন না?
উত্তর–আমি লক্ষ্য করি নাই।
প্রশ্ন–শেখ মুজিবুরকে এই মামলায় জড়িত করিবার জন্য আপনার গৃহে গমনের কাহিনী তৈরী করা হইয়াছে?
উত্তর–আপনার বক্তব্য সত্য নয়।
প্রশ্ন–১৯৬৬ সালের ৭ই জুন আওয়ামী লীগ যে একটি ধর্মঘট আহ্বান করিয়াছিল, তাহা আপনি জানেন কি?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–ঢাকা এবং অন্যান্য এলাকায় পূর্ণ ধর্মঘট কি পালিত হয় নাই?
উত্তর–হইয়াছে।
প্রশ্ন –সেসময়ে গুলীতে বেশকিছু সংখ্যক লোক নিহত এবং বহুসংখ্যক লোকের বিরুদ্ধে কি মামলা শুরু করা হয় নাই?
উত্তর–হইয়াছে।
প্রশ্ন–১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসে আপনি এবং মানিক চৌধুরী উভয়েই চট্টগ্রাম হইতে ঢাকা আগমন করিয়া ক্যাসেরিনা হোটেলে উঠিয়াছিলেন কি?
উত্তর–আমি গ্রীন হোটেলে এবং মানিক চৌধুরী ক্যাসেরিনা হোটেলে উঠিয়াছিল।
প্রশ্ন–হোটেল গ্রীনে আপনার নামে এন্ট্রি আছে কি?
উত্তর–হ্যাঁ।
কৌসুলী এই সময় হোটেল ক্যাসেরিনার রেজিষ্টার সাক্ষীকে প্রদান করিলে ইহার ১০ম পৃষ্ঠায় মানিকের নামে ক্রটি রহিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করেন। তারিখ হইতেছে ৯/৮/৬৭। এন্ট্রি মানিকের হাতের লেখা নয়।
প্রশ্ন–১৯৬৭ সালের ২৯ অথবা ৩০শে আগষ্ট এই হোটেলের রেজিষ্টারে মানিক চৌধুরীর নামে এন্ট্রি আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি?
উত্তর–মানিক চৌধুরীর নামে কোন এন্ট্রি আমি দেখিতেছি না।

প্রশ্ন–১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে আপনি দুইটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। একটি (ঢাকায়) ওঝা'র গৃহে সভা এবং অপরটি গ্রীন স্কয়ারস্থ গৃহে গমন–এই দুই ঘটনা কি একই দিনে হইয়াছিল?
উত্তর–গ্রীন স্কয়ারে গমনের ১৪/১৫ দিন পূর্বে ওঝা'র সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।
প্রশ্ন–আপনি ৭/৭/৬৭ গ্রীন স্কয়ারের গৃহে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া কি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করেন নাই?
উত্তর–আমার মনে পড়িতেছে না। (অনুরূপ রেকর্ড করা হইয়াছে)।
প্রশ্ন–আপনার উপর নির্যাতন এবং আমদানী লাইসেন্স বাতিলের হুমকির ভয়ে আপনি আদালতে এই সাক্ষ্য দিতেছেন?
উত্তর–সত্য নয়।
প্রশ্ন–আপনার কক্ষে কি আপনি সংবাদপত্র পান?
উত্তর–জী হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আপনার কক্ষে কি সকল দিনের সংবাদপত্র আছে?
উত্তর–কিছু কিছু আছে।
কৌসুলী এই সময় সাক্ষীর কক্ষের সংবাদপত্রগুলি আদালতে আনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। ট্রাইব্যুনালের মাননীয় চেয়ারম্যান আবেদন মঞ্জুর করেন।

আতাউর রহমান খান

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–আপনি কি আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন, না রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছিলেন?
উত্তর–আওয়ামী লীগের আদর্শে বিশ্বাসী হইয়াই এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলাম।
প্রশ্ন–আওয়ামী লীগের ম্যানিফেষ্টোতে যে-সকল দাবী করা হইয়াছে, সেগুলি কি পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের দাবী নয়?
উত্তর–আওয়ামী লীগের দাবী পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ লোকের দাবী হইলেও আওয়ামী লীগের কোন দাবী পূরণ হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না।
প্রশ্ন–বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর আপনি কি কাহারও নিকট বিপ্লবী সংস্থার সহিত আপনার সম্পর্কের বিষয়ে কিছু প্রকাশ করিয়াছিলেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনি যখন রাজারবাগে ছিলেন, তখন সেখানে আর কোন অভিযুক্তকে কি নেওয়া হইয়াছিল?
উত্তর–আমি জানি না।

প্রশ্ন–কক্ষের সাথে বাথরুম ছিল কি?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–রাত্রে আপনার কক্ষে প্রহরা থাকিত কি?
উত্তর–কক্ষের বাহিরে থাকিত।
প্রশ্ন–রাত্রে কেউ কি আপনাকে বিরক্ত করিত?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কোন ভাষায় স্বীকারোক্তি প্রদান করিয়াছিলেন?
উত্তর– ইংরেজী।
প্রশ্ন–পুলিশের নিকটে?
উত্তর–বাংলায়। কারণ, তাঁহারা আমাকে বাংলায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন।
প্রশ্ন–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ইংরেজীতে স্বীকারোক্তি প্রদান করিয়াছেন, কারণ তিনি ইংরেজীতে প্রশ্ন করিয়াছিল, এইজন্য কি?
উত্তর–জী হ্যাঁ।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব সালাম খানের জেরার জবাবে সাক্ষী সাইদুর রহমান বলেন, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতিদানের পূর্বে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি যে বিবৃতি দান করিব সাক্ষ্যপ্রমাণের সময় উহা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং আমার শাস্তি হইতে পারে। উহা সত্ত্বেও আমি তাঁহার নিকট আমি আমার স্বীকারোক্তি করিয়াছিলাম। স্বীকারোক্তির পর মেজর নাসের একবার আমার নিকট আসেন এবং আমি রাজসাক্ষী হইতে চাই কি-না তাহা জানিতে চাহেন। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আমার স্বীকারোক্তি দানের ২ অথবা ৩ মাসের পর উহা ঘটিয়াছিল। 'রাজসাক্ষী' বলিতে কি বুঝায় তাহা আমি জানিতাম।
প্রশ্ন–আমি বলিতেছি যে, নিজেকে রক্ষা এবং বন্ধুদের শাস্তি দানের জন্যই আপনি রাজসাক্ষী হইয়াছেন?
উত্তর–সত্য নয়।
প্রশ্ন–আপনাকে কোন ধারায় গ্রেফতার করা হইয়াছিল?
উত্তর–চট্টগ্রামের প্রতিরক্ষা আইনে। ইহার পর ঢাকায় সেন্ট্রাল জেল হইতে আমাকে মুক্তি দিয়া পুনরায় সামরিক আইনে আমাকে জেলগেটে গ্রেফতার করিয়াছিল।
প্রশ্ন–গ্রেফতারী পরোয়ানা কি আপনি দেখিয়াছেন?
উত্তর–না, চট্টগ্রামেও দেখি নাই। পুনরায় ঢাকা জেলগেটে গ্রেফতারের সময়ও দেখি নাই।
প্রশ্ন–ওঝার গৃহ কি দ্বিতল ছিল?
উত্তর–হ্যাঁ।

প্রশ্ন–রাস্তার কোন পার্শ্বে সে বাড়ী ছিল?
উত্তর–আমি বলিতে পারিতেছি না।
প্রশ্ন–সর্বসমেত কতবার ওঝার গৃহে গমন করিয়াছিলেন?
উত্তর–ছয় বার।
সাক্ষী বলেন, ওঝার সহিত শেষবারের সাক্ষাতের সময় তিনি তাহার গৃহ পরিবর্তন করিয়াছিলেন। প্রথম বাড়ী হইতে দ্বিতীয় বাড়ীর দূরত্ব কত হইবে, তাহাও আমি জানি না। দ্বিতীয় বাড়ীও দ্বিতল ছিল।
প্রশ্ন–এই দুই বাড়ীর সম্মুখে কি প্রহরী দেখিয়াছেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–'আলেয়া' লেঃ মোয়াজ্জেমের আত্মীয়ের গৃহ হইতে ওঝার গৃহ কত দূর হইবে?
উত্তর–আমি দূরত্ব বলিতে পারিব না।
প্রশ্ন–(অভিযুক্ত) আলী রেজা ১৯৬৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর যে গ্রেফতার হইয়াছিল, তাহা জানেন কি?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে কি আপনাকে 'পুরাতন হাজত' বলিয়া পরিচিত একটি এলাকায় রাখা হইয়াছিল?
উত্তর–জী হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আলী রেজা, কামালউদ্দিন, সুলতানউদ্দিনসহ কয়েক ব্যক্তি সে কক্ষে ছিলেন কি?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আপনারা সকলে দুপুর এবং রাত্রের খাবার একই সঙ্গেই গ্রহণ করিতেন না?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আলী রেজাকে কি ১১ই ডিসেম্বর স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসে নেওয়া হইয়াছিল?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আলী রেজা কখন ফিরে আসেন?
উত্তর–জানি না।
প্রশ্ন–জেলে ছাড়া আলী রেজাকে আপনি আর কোনদিন দেখেন নাই?
উত্তর–আপনার বক্তব্য সত্য নয়।
প্রশ্ন–জহুর হোসেন চৌধুরী চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান প্রত্যেক আওয়ামী লীগ কর্মীকে তাঁহাকে সমর্থনের জন্য কি নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন?
উত্তর–আমি এই নির্দেশ সম্পর্কে জানি না।

প্রশ্ন–আপনি এই নির্বাচনে সাইফউদ্দিন সিদ্দিকীকে সমর্থন করিয়াছিলেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–সম্মিলিত বিরোধীদল (কপ) কি তাঁহাকে মনোনয়ন দিয়াছিল?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–১৯৬৫ সালের ৪ঠা মে পার্টির ম্যাণ্ডেট অমান্যের অভিযোগে কেন আপনাকে পার্টি হইতে বহিষ্কার করা হইবে না তাহার কারণ প্রদর্শনের জন্য কি আপনাকে একটি নোটিশ প্রদান করা হইয়াছিল?
উত্তর–আমাকে প্রদান করা হয় নাই।
প্রশ্ন–আপনি আপনার আচরণের জন্য জহুর আহমদ চৌধুরী এবং এম, এ, আজিজের নিকট মাফ চাহিয়াছিলেন?
উত্তর–সত্য নয়।
প্রশ্ন–আপনি কি মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন?
উত্তর–জী হ্যাঁ।
প্রশ্ন–পাহাড়তলীর ইস্পাহানী মিলের নিকটে আপনি কি ২০ হাজার টাকা মূল্যের জমি ক্রয় করিয়াছেন?
উত্তর–সত্য নয়।
প্রশ্ন–ডবল মুরিং-এ (চট্টগ্রাম) ১৫ হাজার টাকা মূল্যের জমি কি ক্রয় করিয়াছেন?
উত্তর–মিথ্যা কথা।
প্রশ্ন–আপনি জানেন কি যে, চট্টগ্রামের এনায়েত বাজারের লোকজন আপনার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ করিয়া একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করিয়াছিল?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–মোজাহার আলী ও জোনাব আলীকে কি আপনি চেনেন?
উত্তর–জোনাব আলীকে শুধু চিনি।
প্রশ্ন–জোনাব আলী কি আপনার বন্ধু ছিল?
উত্তর–না। সে যে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য ছিল, আমি তাহার চেয়ারম্যান ছিলাম।
প্রশ্ন–আপনার ডাক্তারখানা কোথায়?
উত্তর–বাটালী রোডে।
প্রশ্ন–আপনি কি দুই জায়গায় ভোটার হওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন?
উত্তর-না।
প্রশ্ন–আপনি কি মলিউল্লা খানকে চিনেন?
উত্তর–না।

মীর্জা গোলাম হাফিজ

বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী মীর্জা গোলাম হাফিজ রাজসাক্ষী ডঃ সাইদুর রহমান চৌধুরীকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–১৯৬৬ সালের ২৪শে এপ্রিল আপনি আমির হোসেন মিয়া এবং বিধান কৃষ্ণ সেন বেবীট্যাক্সিযোগে জয়দেবপুর গমন করিয়াছেন বলিয়া আদালতে বলিয়াছেন। বেবীট্যাক্সিতে কে কাহার সহিত বসিয়াছিলেন?
উত্তর–আমি আমির হোসেনের সঙ্গে বসিয়াছিলাম এবং বিধান অপর বেবীতে একলা ছিল।
প্রশ্ন– জয়দেবপুর গমনের পথে আপনারা কি কোথাও থামিয়াছিলেন?
উত্তর–আমার মনে পড়িতেছে না।
প্রশ্ন–টঙ্গীতে কি একটি বড় পুল পার হইতে হইয়াছিল?
উত্তর–আমি সেদিকে একবার মাত্র গিয়াছিলাম। সেজন্য বিস্তারিত বলিতে পারিব না।
প্রশ্ন–টঙ্গী ব্রীজে শুল্ক দানের জন্য থামিতে হয়। আপনারা থামিয়াছিলেন কি?
উত্তর–আমার মনে পড়িতেছে না।
প্রশ্ন–জয়দেবপুর গমনের পথে কোন রেলওয়ে লাইন কি অতিক্রম করিতে হয়?
উত্তর–আমি মনে করিতে পারিতেছি না।
প্রশ্ন–বেবীটেক্সীর ভাড়া দিয়াছিলেন কি?
উত্তর–আমি দেই নাই।
প্রশ্ন–কত ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–১৯৬৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর রাত্রি দুইটার সময় পুলিশ আপনাকে গ্রেফতারের জন্য আপনার গৃহে গমন করিয়াছিল। কোন পুলিশ অফিসার কি সঙ্গে আসিয়াছিল?
উত্তর–কোতোয়ালী থানার অফিসার ইন-চার্জ আসিয়াছিল। তাহার সহিত কতিপয় কনষ্টেবল ছিল।
প্রশ্ন–কখন পুলিশ আপনাকে আপনার বাসা হইতে স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসে লইয়া গিয়াছিল?
উত্তর–গ্রেফতারে পর প্রথম আমাকে আমার ডাক্তারখানায় নেওয়া হইয়াছিল। সেখানে আমার ডাক্তারখানায় তল্লাশী চালান হইয়াছিল।
প্রশ্ন–ডাক্তারখানায় কখন নেওয়া হইয়াছিল?
উত্তর–সকাল ছয়টায়।
প্রশ্ন–ডাক্তারখানা হইতে স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসে কখন নেওয়া হইয়াছিল?
উত্তর–সকাল ১০টা।

প্রশ্ন–ডাক্তারখানা হইতে কোন দলিল কি উদ্ধার করা হইয়াছিল?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনার ডাক্তারখানায় তল্লাশী চালাইয়া দেশত্যাগী হিন্দু নামের কতিপয় পুরাতন আমদানী লাইসেন্স এবং মুদ্রা পাচার সম্পর্কিত কতিপয় চিঠি কি পুলিশ উদ্ধার করে নাই?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–চট্টগ্রাম স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে মানিক চৌধুরী এবং ফ্লাইট লেঃ রমিজ (এই মামলার ৫ম রাজসাক্ষী) এই দুইজন কি ছিল?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিস হইতে কোথায় আপনাদের নেওয়া হইয়াছিল?
উত্তর–প্রায় এক ঘণ্টা পরে চট্টগ্রাম জেলে।
প্রশ্ন–চট্টগ্রাম হইতে সে রাত্রেই কি আপনাকে ঢাকা আনয়ন করা হইয়াছিল? রাত্রি কয়টার ট্রেনে?
উত্তর–রাত্রি ১০-৩০ মিনিটে। রাতের ট্রেনের ইহা ঢাকা মেল নামে পরিচিত।
প্রশ্ন–মানিক এবং রমিজকে কি একই ট্রেনে, ঢাকা আনয়ন করা হইয়াছিল?
উত্তর–জী হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আপনি একজন এল এম এফ ডাক্তার। কোন সালে পাশ করিয়াছেন?
উত্তর–১৯৫৫ সালে।
প্রশ্ন–চিকিৎসাকার্য পরিচালনার জন্য কোন সার্টিফিকেট কি আপনার নামে ইস্যু করা হইয়াছে?
উত্তর–হ্যাঁ। পূর্ব পাকিস্তান ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি এণ্ড বোর্ড অব রেজিষ্ট্রেশন উক্ত সার্টিফিকেট ইস্যু করেন।
প্রশ্ন–এনায়েত বাজার ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান থাকাকালে আপনার বিরুদ্ধে কি ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা হইয়াছিল?
উত্তর–না। আমি ১৯৬২-'৬৫ সাল পর্যন্ত উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম।
প্রশ্ন– পোর্ট হজ কমিটির ডাক্তার হিসাবে আপনি কি চাকুরী করিয়াছেন?
উত্তর–হ্যাঁ। অস্থায়ী ডাক্তার হিসাবে।
প্রশ্ন–কত পারিশ্রমিক পাইতেন?
উত্তর–মাসিক ২০০ হইতে ৩০০ টাকা পাইতাম।
প্রশ্ন–আপনার কয়জন সন্তান আছে?
উত্তর–চারজন।
প্রশ্ন–সকলেই কি নাবালক?
উত্তর–হ্যাঁ।

প্রশ্ন–আপনার কয়জন পোষ্য আছে?
উত্তর–৭ জন।
প্রশ্ন–গ্রেফতারের পূর্বে আপনার মোট আয় কত ছিল?
উত্তর–মাসিক ৬০০ হইতে ৭০০ টাকা।
প্রশ্ন–এই অর্থ দ্বারা কি আপনার পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিতেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আপনি কি আয়কর দিতেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–গ্রেফতার হওয়ার পর হইতে আপনার পরিবার কিভাবে চলিতেছে?
উত্তর–আমার দুইভাই কিছু কিছু রোজগার করিতেছে। একজন সরকারী অফিসে চাকুরী করে এবং অন্যজনের ছোট দোকান আছে। ইহা ছাড়াও আমার শ্বশুরের অবস্থাও ভাল। তিনি একজন ব্যবসায়ী ও ভূস্বামী।
প্রশ্ন–সরকারী চাকুরে ভাই কত বেতন পায়?
উত্তর–আমি জিজ্ঞাসা করি নাই।
প্রশ্ন–সে কোথায় কাজ করে?
উত্তর–বিভাগীয় কমিশনার অফিসে।
প্রশ্ন–সে কি কেরানী?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আপনার পরিবার কি এখন সরকার থেকে কোন ভাতা পাইতেছে?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনার মরহুম পিতা কি কেরানী ছিলেন?
উত্তর–হ্যাঁ। কমিশনার অফিসের। তিনি ১৯৫৬ সালে মারা যান।
প্রশ্ন–আপনি অর্থ উপার্জনের জন্য আপনার বাবার কবরকে কি মাজার বলিয়া প্রচার করিতেছেন না?
উত্তর–ইহা সত্য নয়।
প্রশ্ন–প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেফতার হওয়ার পর আপনার আটকাদেশ চ্যালেঞ্জ করিয়া কি ঢাকা হাইকোর্টে একটি রীট আবেদন পেশ করা হইয়াছিল?
উত্তর–হ্যাঁ। আমি ইহা আমার স্ত্রী এবং ছোট ভাইর নিকট হইতে শুনিয়াছি। ঢাকা জেলে স্থানান্তরের ৭/৮ দিন পরে ইহা আমি জানিতে পারি।
প্রশ্ন–কে আবেদন করিয়াছিল?
উত্তর–আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোলাম মোস্তফা চৌধুরী।
প্রশ্ন–আপনি হেবিয়াস কর্পাস আবেদন পেশের জন্য একজন আইনজীবীর সাহায্য নিয়েছিলেন?
উত্তর–না।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মনজুর কাদের বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের জেরা সমাপ্তির পর রাজসাক্ষী ডঃ সাইদুর রহমান চৌধুরীর নিকট হইতে পুনরায় জবানবন্দী গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন–আপনি আপনার উপর নির্যাতন সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র (স্পেশাল) দফতরের সেক্রেটারীর নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন। কেন দরখাস্ত করিয়াছিলেন?

উত্তর–রাজারবাগ পুলিশ কেন্দ্র হইতে সেন্ট্রাল জেলে আগমনের সময় (অভিযুক্ত) খুরশীদ আমাকে এইরূপ আভাস দিয়াছিল যে, আমি যদি আমার উপর নির্যাতন এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অভিযোগ করিয়া স্বরাষ্ট্র দফতরের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করি তাহা হইলে আমার মুক্তি ত্বরান্বিত হইবে।

প্রশ্ন–১৯৬৬ সালের ৭ই জুনের আওয়ামী লীগের হরতালে পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে 'বহুসংখ্যক লোক' নিহত হইয়াছে বলিয়া বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর জেরার জবাবে উল্লেখ করিয়াছেন। 'বহুসংখ্যক লোক' বলিতে আপনি কতজনকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন?

উত্তর–৪০/৫০ জন।

ট্রাইব্যুনালের বিশেষ অনুমতি গ্রহণ করিয়া বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন।

প্রশ্ন–যে গাড়ীতে করিয়া খুরশীদসহ ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আগমন করিতেছিলেন সে গাড়ীতে কি কোন পুলিশ অফিসার ছিল?

উত্তর–হ্যাঁ। পুলিশ অফিসার ড্রাইভারের সঙ্গে ছিলেন এবং খুরশীদ ও আমি পশ্চাতে বসিয়াছিলাম।

দৈনিক পাকিস্তান

৩০শে আগস্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

একরারী সাক্ষী মীর্জা রমীজের সাক্ষ্য শুরুঃ

'মোয়াজ্জম জানান সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার জন্য তিনি একটি প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করছেন'

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বৃহস্পতিবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পাঁচ নম্বর একরারী সাক্ষী এবং পিআইএ'র চট্টগ্রাম শাখার সাবেক ম্যানেজার মীর্জা মোহাম্মদ রমীজের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। ইতিপূর্বে একরারী সাক্ষী ডাঃ সায়দুর রহমানের জেরা শেষ হয়।

পাকিস্তানের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস এ রহমানকে চেয়ারম্যান করে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম আর খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিমকে নিয়ে এই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌশলী জনাব মনজুর কাদের গতকাল একরারী সাক্ষী মীর্জা মোহাম্মদ রমীজের সাক্ষ্যগ্রহণ পরিচালনা করেন।

আদালতে আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করে মীর্জা মোহাম্মদ রমীজ বলেন যে, ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে তিনি কমিশনড অফিসার হিসেবে পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে যোগদান করেন। গত ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে তিনি বিমানবাহিনী থেকে অবসরগ্রহণ করেন এবং সে মাসেই কমার্সিয়াল অফিসার হিসেবে পিআইএ যোগদান পর তিনি প্রথমে ১৫ দিন যাবত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্ট্রাল অফিসার্স মেসে ছিলেন। এরপর তিনি চট্টগ্রাম মোহাম্মদ আলী রোডের একটি বাড়ীতে তিন মাস বসবাস করেন। অবশেষে ৬০ নম্বর পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকার একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তিনি বসবাস শুরু করেন। অতঃপর বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদেরের এক প্রশ্নের জবাবে একরারী সাক্ষী মীর্জা রমীজ বলেন যে, ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে তিনি স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান ও এ বি খুরশীদকে চেনেন।

এই পর্যায়ে মীর্জা মোহাম্মদ গতকাল বৃহস্পতিবার 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' চার নম্বর একরারী সাক্ষী ও চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ডাঃ সাইদুর রহমান চৌধুরীর জেরা সমাপ্ত হয়েছে। এই দিন বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান ছাড়াও জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব জুলমত আলী খান, মীর্জা গোলাম হাফিজ, জনাব ফজলুল করিম ও জনাব মোহাম্মদ মোমিন একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমানকে জেরা করেন।

ডাঃ সাইদুর রহমানের জেরা সমাপ্ত হলে গতকাল পাঁচ নম্বর একরারী সাক্ষী পিআইএ'র চট্টগ্রাম শাখার ম্যানেজার মীর্জা মোহাম্মদ রমীজের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদের সাক্ষ্য গ্রহণ পরিচালনা করছেন।

আজ শুক্রবার পুনরায় তাঁর অসমাপ্ত সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হবে।

গতকাল প্রথমে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান চার নম্বর একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমানকে জেরা করেন।

প্র–চট্টগ্রামের লালদীঘিতে অনুষ্ঠিত সভায় শেখ মজিবুর রহমান বক্তৃতা করেন কি?

উ–হ্যাঁ।

প্র–সভা কখন শুরু হয় আর কখনইবা শেষ হয়?

উ–বেলা ৪টে–সাড়ে ৪টের দিকে শুরু হয়ে রাত ৮/৯টা পর্যন্ত চালু থাকে।

প্র–সভার শেষে কি সেখানে কবি গানের (লোকগীতি) আসরের ব্যবস্থা করা হয়?

উ–না।

প্র–আপনি কি সভায় ছিলেন? শেখ মজিবের সঙ্গে কি সভায় এসেছিলেন?
উ–যদিও আমি জনসভায় উপস্থিত ছিলাম; কিন্তু শেখ মজিবের সঙ্গে আসিনি।
প্র–জনসভা চলাকালে কি শেখ মজিব আপনার বাড়ী যাওয়ার কথা বলেন?
উ–না।
প্র–লালদীঘিতে আওয়ামী লীগের জনসভায় আপনি কি স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমানকে দেখেন?
উ–না।
প্র–সভায় দলের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন?
উ–হ্যাঁ।
কৌঁসুলীর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, বেলা সাড়ে ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে মানিক চৌধুরী তাঁকে জানান যে, শেখ মজিব তাঁর বাড়ীতে যাবেন। সাক্ষী আরো জানান যে, শেখ মজিবের তাঁর গৃহে আগমন উপলক্ষে তিনি দলীয় কর্মকর্তাদের কাউকে তাঁর বাড়ী যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাননি।
প্র–তিনি কতক্ষণ ছিলেন আপনার বাড়ীতে?
উ–প্রায় ১০/১৫ মিনিট।
প্র–আপনি তাঁর জন্য চা-পানের আয়োজন করেন কি?
উ–হ্যাঁ, তা করি।
প্র–আপনার যে দু'জন ছোটভাই আপনার আউটার হাউসে থাকতেন, তারা তখন কোথায় ছিল?
উ–তাঁরা তখন বাইরে ছিল।
অপর এক প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী জানান যে, জনাব সুলতানউদ্দিন আহমদ, এমএনএ'র বাড়ী তাঁর বাড়ীর পাশেই। তিনি যতদূর জানেন, জনাব সুলতানউদ্দিন আহমদ সরকারী দলের সদস্য। শেখ মজিব তাঁর বাড়ী যাওয়ার সময় তিনি সুলতানউদ্দিন আহমদকে আমন্ত্রণ জানাননি।
প্র–শেখ মজিব কখন যান আপনার বাড়ীতে?
উ–রাত সাড়ে ৯টার পরে।
প্র–কিসে করে তিনি যান?
উ–মানিক চৌধুরীর গাড়ীতে করে।
প্র–কেমন গাড়ী মানিক চৌধুরীর?
উ– ছোট গাড়ী।
প্র–আর কে ছিল শেখ মজিবের সঙ্গে?
উ–মানিক চৌধুরী ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না।
প্র–আপনি কি পুলিশের কাছে আপনার বিবৃতিতে বলেছিলেন যে, শেখ মজিব আপনার বাড়ীতে সন্ধ্যার পরে গেছেন?
উ–আমার মনে পড়ছে না।

প্র–আপনি পুলিশের কাছে বলেছিলেন যে, যেদিন লালদীঘি ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, সেদিনই শেখ মজিব আপনার বাড়ীতে আসেন?
উ–আমার মনে নেই (রেকর্ড করা নেই)
প্র–মানিক চৌধুরীর কি গাড়ী আছে?
প্র–কি গাড়ী?
উ–আমার মনে নেই কি গাড়ী।
প্র–এটা কি সত্য যে, এর জন্য বহু সংখ্যক লোক পুলিশের গুলীতে নিহত হয় এবং বহু সংখ্যক মামলা দায়ের করা হয়?
উ–হ্যাঁ।
প্র–১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে আপনি মানিক চৌধুরীর সঙ্গে ঢাকা আগমন করেন এবং হোটেল ক্যাসেরিনায় অবস্থান করেন কি?
উ–আমি হোটেল গ্রীনে উঠি আর মানিক চৌধুরী ওঠেন ক্যাসেরিনায়।
প্র–আপনি কি হোটেলে আপনার নাম এন্ট্রি করান?
উ–হ্যাঁ।
প্র–আপনার ঢাকা আগমনের উদ্দেশ্য ছিল কি?
উ-আওয়ামী লীগের বৈঠকে যোগদানের জন্য এসেছিলাম। কিন্তু হোটেল রেজিস্ট্রারে ব্যবসার জন্য অন্য কথা লিখেছিলাম।
প্রশ্ন–আপনি বলেছেন যে, স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান আপনাকে ভারতে যাওয়ার কথা বলেন। এটাই কি প্রথম আপনি একথা শোনেন?
উ– না, কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে মানিক চৌধুরী আমাকে বলেন যে, কিছু লোকের ভারতে যাওয়ার কথা আছে।
প্র–আপনি কি পুলিশের কাছে বলেছেন যে, ১৯৬৭ সালের ৩০শে আগস্ট আপনি ও মানিক চৌধুরী উভয়েই হোটেল গ্রীনে উঠেছিলেন?
উ–না, বলিনি।
কৌঁসুলী হোটেল ক্যাসেরিনার রেজিস্টার সাক্ষীকে দিয়ে ১০ নম্বর পৃষ্ঠায় মানিক চৌধুরীর নাম এন্ট্রি আছে কিনা দেখতে বলেন।
উ–মানিক চৌধুরীর নাম এন্ট্রি করা রয়েছে। তারিখ হচ্ছে ৯-৮-৬৭। এন্ট্রিটা মানিক চৌধুরীর নিজের হাতে করা হয়নি।
প্র–দয়া করে দেখুন, ১১ পৃষ্ঠায় ৩০-৮-৬৭ তারিখে এই রেজিস্ট্রারে মানিক চৌধুরীর নামে কোন এন্ট্রি আছে কিনা?
উ–না, ২৯শে আগস্ট বা ৩০শে আগস্ট, কোন তারিখেই তার নাম এন্ট্রি নেই।
প্র–আপনি জুলাই (১৯৬৭) মাসে ৩টি ঘটনার কথা বলেছেন–একটি মিঃ ওঝার সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে বৈঠকের কথা এবং অপরটি ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারের বৈঠকের কথা। এই বৈঠক দুটো কি একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়?
উ–মিঃ ওঝার সঙ্গে বৈঠকের ১৪/১৫ দিন আগে আমি ১৫, গ্রীন স্কোয়ার যাই।

প্র–আপনি বলেছেন যে, আপনি ৬-৭-৬৭ তারিখে মিঃ ওঝার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছেন যে, ৭-৭-৬৭ তারিখে আপনি ১৫, গ্রীন স্কোয়ারে গমন করেছিলেন?
উ–আমার মনে নেই।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর এক প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী জানান যে, তাঁর সাক্ষ্যদানকালে বলেছেন যে, মানিক চৌধুরী মিঃ ওঝার সঙ্গে থেকে ৫ হাজার টাকা গ্রহণ করেন। বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির যখন জানতে চান যে, ওঝার কাছ থেকে মোট কত টাকা পাওয়া গেছে, সেই সময়ে আদালতের অধিবেশন স্থগিত রাখা হয় বলে তখন তার উত্তর দেওয়া যায়নি। তারপর যখন আদালতের অধিবেশন পুনরায় শুরু হয়,তখন বাদীপক্ষের কৌসুলী জিজ্ঞেস করায় তিনি তাঁর জওয়াব দিয়েছিলেন।

প্র– আপনি বলেছেন যে, মানিক চৌধুরী লেঃ মোয়াজ্জমকে দশ হাজার টাকা দিয়েছেন। এই টাকাটা কোথায় দেওয়া হয়?
উ–দ্বিতীয় রাজধানীর যে জায়গায় মিঃ ওঝা আমাদের নামিয়ে দিতেন, সেখানেই মানিক চৌধুরী লেঃ মোয়াজ্জমকে টাকাটা দিয়েছিলেন।
প্র–যখন টাকা দেওয়া হয়েছে, সব সময়েই কি আপনি উপস্থিত ছিলেন সেখানে?
উ–প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় টাকা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলাম; কিন্তু তৃতীয়বারে ছিলাম না।
প্র–তখন আপনি কোথায় ছিলেন?
উ–চট্টগ্রামে। মানিক চৌধুরী তৃতীয় দফায় আরো ৫ হাজার টাকা দেওয়ার কথা আমাকে বলেছিলেন।
প্র– আমি মনে করি, আপনার ওপর দৈহিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের ফলে এবং আপনার সমস্ত লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়ার ভয় দেখানোর জন্যেই আপনি এসব সাক্ষ্য দিচ্ছেন?
উ–এ কথা সত্য নয়।
প্র–আপনি কি সংবাদপত্র পাঠ করেন?
উ–হ্যাঁ।

এই পর্যায়ে কৌসুলী আদালতের কাছে আবেদন করেন যে, সাক্ষীর বাসস্থান থেকে যেন এই সংবাদপত্রগুলি তাঁর পরীক্ষার জন্য আদালতে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়। আদালত এই আবেদন মঞ্জুর করেন।

এরপর জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা সমাপ্ত হয় এবং জনাব আতাউর রহমান খান জেরা শুরু করেন।

আতাউর রহমান খান
প্র-আপনি কি আওয়ামী লীগের আদর্শে বিশ্বাস করেন?
উ-হ্যাঁ।
প্র–আপনি কি সুযোগ-সুবিধে পাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগে যোগদান করেছিলেন?
উ–না, এ কথা সত্য নয়।
প্র–আওয়ামী লীগের যেসব বৈঠকে আদর্শ সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হতো, সেসব বৈঠকে কি আপনি অংশগ্রহণ করতেন?
উ–হ্যাঁ।

কৌসুলীর অপর প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী জানান যে, আওয়ামী লীগের কর্মসূচীতে যেসব দাবী-দাওয়ার কথা লেখা ছিল, জনসাধারণের অধিকাংশই তা সমর্থন করতেন। তিনি বলেন যে, এসব দাবী-দাওয়া পূরণ হয়েছে বলে তাঁর মনে হয় না।

প্র–আপনি কি ৬-দফা কর্মসূচীতে বিশ্বাস করতেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র–চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদককে ছেড়ে এই আন্দোলনের জন্য কেন আপনাকে বাছাই করা হল? এটাকে কি আপনি কিছুটা অস্বাভাবিক বলে মনে করেন না?
উ–এই কথা মানিক চৌধুরী বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
প্র–আপনি কবে থেকে এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন?
উ–সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের জুলাই মাস থেকে।
প্র–এরপর কি দলের কোন কর্মতৎপরতার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল?
উ–না।
প্র–কেন আপনি এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন?
উ–আমি দলের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলি। কারণ, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, এল এস সুলতানউদ্দীন, এ বি খুরশীদ ও অন্যান্যরা আমাকে জানান যে, লেঃ মোয়াজ্জম দলের তহবিল তছরূপ করেছেন। তাছাড়া, বদলী হওয়ার পর তিনি দলের জন্য কোন কাজই করেননি।
প্র–দলত্যাগ করার কতদিন আগে আপনি এই খবর পান?
উ–১৯৬৭ সালের জুলাই এর ২/৩ মাস আগে।
প্র–আপনাকে গ্রেফতার করার কথা কখন জানতে পারলেন?
উ–রাজারবাগ পুলিশ সেন্টারে এসে আমি বুঝতে পারি যে, এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
প্র–কতদিন আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়?
উ–আমার মনে নেই।

প্র–আপনাকে কি প্রতিদিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হত?
উ–না।
প্র–আপনাকে কি বসার জন্য বিছানা বা খাট দেওয়া হয়েছিল?
উ–হ্যাঁ।
প্র–প্রত্যেক দিন রাত্রে কত ঘণ্টা ঘুমাতে পারতেন?
উ–ছয়-সাত ঘণ্টা।

কৌসুলীর অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানান যে, তিনি রাজারবাগে থাকাকালীন অন্য কোন আসামীকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় কি না তা তাঁর জানা নেই। তিনি বলেন যে, তিনি যে ঘরে থাকতেন, তার সংলগ্ন কোন বাথরুম ছিল না। দু'-তিন কামরা পেরিয়ে তারপর বাথরুমে যেতে হত। ঘরের বাইরে প্রহরি থাকতো। তাঁকে রাত্রে কোন রকম বিরক্ত বা জিজ্ঞাসাবাদ করা হত না।

সাক্ষী আরো বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাঁর স্বীকারোক্তি ইংরেজীতেই করেন। তবে পুলিশের কাছে বাংলাতেই জবানবন্দী দেন। একবার ইংরেজীতে আর একবার বাংলাতে জবানবন্দী দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান যে, ম্যাজিস্ট্রেট ইংরেজীতে প্রশ্ন করেন বলে তিনি ইংরেজীতে জবাব দেন। পুলিশ বাংলাতে প্রশ্ন করেন। তিনি আরো জানান যে, তাঁর স্বীকারোক্তি সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে জানিয়ে দেন যে, এই বক্তব্য তাঁর বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্র–আপনি একরারী সাক্ষী হতে কি নিজে থেকেই সিদ্ধান্ত নেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র–এ ব্যাপারে কেউ আপনাকে কিছু বলে?
উ–মেজর নাসের একবার আমার কাছে এসে জানতে চান যে, আমি একরারী সাক্ষী হতে রাজী আছি কি না।
প্র-মেজর নাসের কবে একথা বলেন?
উ-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আমার স্বীকারোক্তির দু-তিনদিন আগে।
প্র–নিজের চামড়া বাঁচিয়ে বন্ধুদের ফাঁসিয়ে দেওয়ার জন্যই আপনি একরারী সাক্ষী হতে চেয়েছেন?
উ–না, একথা ঠিক নয়।
প্র–আপনাকে প্রথম কোথায় গ্রেফতার করা হয়?
উ–প্রথমে পাকিস্তান রক্ষা আইনে আমাকে চট্টগ্রামে গ্রেফতার করা হয়। পরে ছেড়ে দিয়ে পুনরায় সামরিক আইনে জেল-গেট থেকে গ্রেফতার করা হয়।
প্র–আপনাকে কি গ্রেফতারী পরোয়ানা দেখানো হয়?
উ–না। পুলিশ অফিসার আমাকে জানান।

প্র-মিঃ ওঝার বাড়ীটা কয়তলা ?
উ-দ্বিতল।
প্র-রাস্তার কোনদিকে বাড়ীটা ?
উ-ঠিক বলতে পারি না।
প্র–মিঃ ওঝার সঙ্গে ক'বার বৈঠক করেছেন?
উ–ছয়বার।
প্র–মিঃ ওঝার বাড়ীর ড্রইং রুমটা কোথায়?
উ–দ্বিতলে।
প্র–আপনারা কোথায় বসতেন?
উ–দ্বিতলের ড্রইং রুমেই।
প্র–সবসময়ে কি একই বাড়ীতে বৈঠক হয়েছে?
উ–না। শেষ বৈঠকটা হয় অন্য একটা বাড়ীতে। মিঃ ওঝা বাসা পরিবর্তন করেছিলেন।
প্র–মিঃ ওঝার দ্বিতীয় বাড়ীটা কোন রাস্তার ওপর?
উ–যে রাস্তাটা গ্রীন রোডের ওপর গিয়ে পড়েছে,তার ওপরেই।

তিনি জানান যে, দ্বিতীয় বাড়ীটিও দ্বিতল। ড্রইং রুমটা দ্বিতলে এবং তাঁরা সেখানেই বৈঠক করতেন।

সাইড রুমটা ড্রইং রুমে ঢুকে ডানদিকে। এখানে মিঃ ওঝা একান্তে আলোচনা করতেন। প্রথম বাড়ীটাতে সাইড রুমটা ছিল ড্রইং রুমটার ঠিক বিপরীত দিকে।

তিনি বলেন যে, মিঃ ওঝা তাঁকে প্রথম বাড়ীতে ড্রইং রুমের পাশের রুমে নিয়ে যান, দ্বিতীয় বাড়ীতে নয়।

প্র–দ্বিতীয় বাড়ীটা মীরপুর রোড থেকে কত দূর?
উ–জানি না।
প্র–মিঃ ওঝার বাড়ীর সামনে পুলিশ প্রহরা লক্ষ্য করেছেন কি?
উ–না।
প্র-নিউমার্কেট থেকে মিঃ ওঝার বাড়ী কতদূর?
উ–বলতে পারবো না।
প্র–মিঃ ওঝার বাড়ীতে কখনও নিউমার্কেটের পাশ দিয়ে যাননি?
উ–না।
প্র–মিঃ ওঝার বাড়ী থেকে আলেয়া নামক বাড়ীটি কত দূর?
উ–বলতে পারি না।

তিনি জানান যে, তিনি ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে জানতে পারেন যে, দলীয় অফিস ১৫, গ্রীন স্কোয়ার রোড নম্বর ১৭ কি ১৮তে উঠে গেছে।

আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে মানিক চৌধুরী তাঁকে জানান। মানিক চৌধুরীকে নিয়ে সেখানে সন্ধ্যা ৭টা কি ৮টার সময় পৌঁছান। বাড়ীটা ছিল দোতলা। তাঁরা সেখানে যাওয়ার আগেই সামাদ সেখানে ছিলেন। তাঁরা আলি রেজার পরিবারবর্গকে সেখানে দেখেননি।

তিনি জানান যে, আলী রেজা কবে গ্রেফতার হন, তা তিনি জানতেন না। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে তাঁকে ডিপিআর সেলে রাখা হয়েছিল। আলী রেজা, শামসুদ্দিন, সুলতানুদ্দিন এবং অন্যান্যদেরও সেখানে রাখা হয়েছিল। তিনি জানান যে, জেলে থাকার সময় তাঁরা সবাই একত্রে খাওয়া-দাওয়া করতেন।

তিনি বলেন যে, আলী রেজাকে ১৯৬৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর এসপির অফিসে নিয়ে যাওয়া হয় কি না তিনি জানেন না। তিনি ১৯৬৮ সালের ১লা জানুয়ারীতে ঢাকা জেলে ফিরে আসেন। তিনি জেলে ফিরে আলী রেজাকে দেখেননি। তিনি আলী রেজাকে জেলে দেখার আগে কখনও দেখেননি বলে কৌসুলী প্রস্তাব করলে তিনি তা ঠিক নয় বলে উল্লেখ করেন। আলী রেজা ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরের আগে ধানমন্ডির সেই বাড়ীতে যাননি বলে কৌসুলী উল্লেখ করলে সাক্ষী তা সত্য নয় বলে জানান।

সাক্ষী বলেন যে,১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে জহুর আহমদ 'কপের প্রার্থী' ছিলেন। শেখ মুজিব জনাব চৌধুরীকে সমর্থন করার জন্য কোন নির্দেশ দিয়েছিলেন কি না, তিনি জানেন না। তিনি আরো জানান যে, তিনি দলীয় নির্দেশ অমান্য করে স্বতন্ত্র প্রার্থী জনাব মহিউদ্দিন সিদ্দিকীকে সমর্থন করেন–কারণ তেমন কোন দলীয় ম্যান্ডেট ছিল না তাঁর ওপরে। ৫-৪-৬৫ তারিখে দলীয় ম্যান্ডেট অমান্য করার অভিযোগে তাঁর কাছে কৈফিয়ত চাওয়ার কথা এবং জনাব জহুর আহমদ ও জনাব আজিজের কাছে ক্ষমা চাওয়ার কথা অস্বীকার করেন।

ডাঃ সাইদুর রহমান স্বীকার করেন যে, তিনি একজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার। কিন্তু পাহাড়তলীর নিকট ২০ হাজার টাকা ও ডবলমুরিং-এ ১৫ হাজার টাকা দিয়ে দুটি জমির প্লট কেনার কথা অস্বীকার করেন।

তিনি তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর ইউনিয়নবাসীদের পক্ষ থেকে প্রচারপত্র বিলির কথা অস্বীকার করেন।

ডাঃ সাইদুর রহমান স্বীকার করেন যে, তাঁর চিকিৎসা ব্যবসার সুবিধের জন্য তিনি দুটি ইউনিয়নে ভোটার তালিকায় নাম ঢোকানোর জন্য আবেদন করেন। তিনি জানান যে, চট্টগ্রামে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, দুটি ইউনিয়নের কোনটিতে তাঁর নাম ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিষয়ে মতিউল্লা খান আপত্তি জানিয়েছিলেন কি না জানতে চাইলে তিনি 'জানেন না' বলে জওয়াব দেন।

প্র–আপনি চট্টগ্রামের দৈনিক 'ক্রনিকল'-এর নাম জানেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র–আপনি কি জানেন যে, সেই সংবাদপত্রে আপনার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশিত হয়?
উ– জানা নেই।
এই সময়ে কৌসুলী ক্রনিকল-এর প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত সংবাদটির 'ক্লিপিং' সাক্ষীকে দেখান।

মীর্জা গোলাম হাফিজ

এরপর মীর্জা গোলাম হাফিজ সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন।
প্র–আপনারা কিভাবে বেবীট্যাক্সি করে জয়দেবপুরে যান? কার সঙ্গে কে বসেছিলেন?
উ–যাওয়ার সময় আমি আমীর হোসেনের সঙ্গে যাই। মানিক চৌধুরী অপরটিতে যান।
প্র–কোন বেবীট্যাক্সি আগে যায়?
উ–বলতে পারি না।
প্র–পথে কোথাও নেমেছিলেন কি?
উ–মনে নেই।
প্র–যাওয়ার সময় কি টঙ্গি পুল অতিক্রম করেন?
উ–জানি না।
প্র–অন্য কোন পুল?
উ–মনে নেই।
প্র–টঙ্গি পুলের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় কি সিএ্যান্ডবির টোল দিয়েছিলেন?
উ–বলতে পারি না।
প্র–আমার মনে হয় আপনারা যাওয়ার সময় টঙ্গি পুলের জন্য টোল দিয়েছিলেন?
উ–আমার কিছুই মনে নেই।
প্র–জয়দেবপুর যেতে কোন রেল লাইন ক্রস করেছিলেন কি এবং বেবীট্যাক্সি ভাড়া কত দিয়েছিলেন?
উ–তা আমি জানি না।
প্র–আপনাকে গ্রেফতার করতে কে গিয়েছিলেন?
উ–চট্টগ্রাম কোতোয়ালী থানার ওসি ও কয়েকজন কনস্টবল আমার গ্রেফতারের সময় আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন।
প্র–গ্রেফতার করে আপনাকে কোথায় নেওয়া হয় এবং কখন নেওয়া হয়?
উ–সকাল ছ'টায় আমার ডিসপেনসারীতে নেওয়া হয় এবং সেখানে ডিসপেনসারী তল্লাশী করা হয়।

প্র–ডিসপেনসারী থেকে আপনাকে কোথায় নেওয়া হয়েছিল?
উ–সকাল প্রায় ৮টায় আমাকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিএসপি'র অফিসে নেওয়া হয়।
প্র–আপনার ডিসপেনসারী থেকে পুলিশ কি কিছু ব্যবসা সংক্রান্ত দলিলপত্র আটক করেছিলেন?
উ–জী, না।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, এ কথা সত্য নয় পুলিশ তাঁর ডিসপেনসারী থেকে দেশত্যাগী হিন্দুদের কতিপয় পুরনো আমদানী লাইসেন্স ও মুদ্রা চোরাচালানের কাগজপত্র আটক করেছিল।

প্র–ডেপুটি পুলিশ সুপারের অফিসে আপনি অন্য কাউকে দেখেছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ, মানিক চৌধুরী ও মীর্জা মোহাম্মদ রমিজকে দেখেছি।
প্র–সেখান থেকে আপনাকে কোথায় নেওয়া হয়েছিল?
উ–চট্টগ্রাম জেলখানায়। আমার সাথে মানিক চৌধুরী ও রমিজকেও জেলে নেওয়া হয়।
প্র–চট্টগ্রাম জেল থেকে আপনাকে কোথায় নেওয়া হয়?
উ–রাত সাড়ে দশটার ট্রেনে আমাকে ঢাকায় আনা হয়। রমীজ ও মানিক চৌধুরীকে আমার সাথে একই ট্রেনে ঢাকা আনা হয়েছিল।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৫৫ সালে এল এম এফ পরীক্ষা পাশ করেন এবং সার্টিফিকেট লাভ করেন। তখন থেকে তিনি নিয়মিতভাবে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত আছেন। তবে তাঁর রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বছর বছর রিনিউ করতে হয় না।

প্র–কয়লার ব্যবসা আপনি কখন করেন?
উ–কয়লার ব্যবসায়ে আমি একজন পার্টনার। এজন্যে আমাকে খুব খাটতে হয় না। মাঝে-মধ্যে আমি কয়লার ডিপোতে গিয়ে থাকি।
প্র–চিকিৎসকদের অন্য ব্যবসা করতে হলে কি অনুমতি নিতে হয়?
উ–তা আমি জানি না। আমি এরূপ কোন অনুমতি নেইনি।
প্র–আপনি কি কোন ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ। ১৯৬২-৬৫ সালে আমি এনায়েত বাজার ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম।
প্র–তখন ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে কি অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল?
উ–না। এ কথা সত্য নয়।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৬ সাল থেকে তিনি এনায়েত বাজার ওয়ার্ডেন পোস্টের ওয়ার্ডেন ছিলেন। তবে এ কথা সত্য নয় যে, তাঁকে সমাজবিরোধী কাজের জন্যে ওয়ার্ডেন পোস্ট থেকে অপসারিত করা হয়েছে।

প্র–আপনি কি চট্টগ্রাম পোর্ট হজ কমিটিতে সাময়িক ডাক্তাররূপে কিছুদিন চাকুরী করেছিলেন?
উ–আমি পোর্ট হজ কমিটির মেডিক্যাল অফিসার ছিলাম এবং দু'তিনশ' টাকা মাইনে পেতাম।
প্র–আপনার ছেলেমেয়ে ক'জন?
উ–চারজন এবং তারা সবাই নাবালক।
প্র–আপনাকে পরিবারের ক'জন লোককে ভরণ-পোষণ করতে হয়?
উ–দু'ভাইসহ আমাকে ৭জন লোকের ভরণ-পোষণ করতে হয়।
প্র–গ্রেফতারের আগে আপনার মাসিক আয় কত ছিল?
উ–গড়ে ৬/৭শ' টাকা।
প্র–এই টাকা দিয়ে কি স্বচ্ছন্দে আপনার পরিবার চলত?
উ–জী হ্যাঁ, চলতো।
প্র–আপনি কি আয়কর দিতেন?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–আপনি আটক থাকাকালে আপনার পরিবারের খরচ কে চালায়?
উ–আমার শ্বশুর পরিবারের খরচ চালান। এছাড়া আমার দু'ভাইও কিছু আয় করেন।
প্র–আপনার শ্বশুর ও ভাই কি করেন?
উ–আমার শ্বশুর ব্যবসায়ী। দু'ভাইয়ের একজনের একটি দোকান আছে। আর অপরজন কমিশনার অফিসে চাকুরী করে। তবে সে কত বেতন পায় তা আমি জানি না।
প্র–এ কথা কি সত্য যে,আপনার পরিবার সরকার থেকে ভাতা পাচ্ছে?
উ–জী না। এ কথা সত্য নয়।
প্র–আপনার বাবার পেশা কি ছিল?
উ–আমার পিতা কমিশনার অফিসের কেরানী ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি মারা যান।

বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী গোলাম হাফিজের এক প্রশ্নের জবাবে একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমন বলেন যে, এ কথা সত্য নয় যে, প্রোপাগান্ডা করে তিনি তাঁর বাবার মাজারকে একটি পুণ্য স্থানে পরিণত করেছেন এবং সেটা থেকে আয় করছেন। এছাড়া উক্ত মাজারে কেউ নজরানা দেয় কিনা তাও তাঁর জানা নেই।

প্র–আটক থাকাকালে আপনার স্ত্রী কি ঢাকা হাইকোর্টে কোন রীট আবেদন করেছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ। আমাকে যেন সেন্ট্রাল জেলে নেওয়ার ৭/৮ দিন পর আমার ভাইয়ের নিকট থেকে আমি তা শুনেছি। এজন্যে মরহুম এডভোকেট আবদুর

রব ও মীর্জা গোলাম হাফিজের একজন প্রতিনিধি আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন।
প্র–আপনার উপর কোন গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়েছিল কি?
উ–জী হ্যাঁ। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে থাকাকালে আমি দেশরক্ষা আইনে আমার উপর জারীকৃত গ্রেফতারী পরোয়ানা দেখেছি।
প্র–যুদ্ধ তহবিলে মানিক চৌধুরী কি এক হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন?
উ–আমি তা জানি না।
এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে,এ কথা সত্য নয় যে, আমার বিরুদ্ধে বৈদেশিক মুদ্রা চোরাচালানের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং সেই মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে আমি এই মামলার একরারী সাক্ষী হতে রাজী হয়েছি।

ফজলুল করিম

এরপর বিবাদীপক্ষের আর একজন কৌসুলী জনাব ফজলুল করিম সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র–আপনি কি ওঝা শব্দের অর্থ জানেন?
উ–জী না। ওঝা শব্দের প্রকৃত অর্থ আমি জানি না। তবে বাংলা ভাষায় ওঝা শব্দের অর্থ সাপুড়ে।
প্র–পি এন ওঝা কোন ভাষায় আপনাদের সাথে কথা বলতেন?
উ–তিনি ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় কথা বলতেন। তবে তাঁর উচ্চারণ পদ্ধতি আমি লক্ষ্য করিনি।
প্র–মিঃ ওঝার মাথায় কি টিকি ছিল?
উ–আমি তা জানি না।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, মিঃ পি এন ওঝা তাঁদের একথা বলেননি যে, মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ছাড়া অন্য কারও নেতৃত্বে পরিচালিত ভারত সরকার আন্দোলনের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাব অনুমোদন নাও করতে পারে।
প্র–আপনাদের সংগঠন কি বিশ্বাস করত যে, সামরিক তথ্য ফাঁস না করা হলে ভারত থেকে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাবে না?
সাক্ষীকে বারংবার এই প্রশ্ন করা হয়। তখন সাক্ষী প্রথমে বলেন যে, তিনি প্রশ্ন বুঝে উঠতে পারছেন না। পরে আবার বলেন যে, কেহই সামরিক গোপন তথ্যের অংশীদার হতে পারে না।
প্র–পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হলে এখানে কি ধরনের সরকার হবে সে সম্পর্কে আপনি মিঃ ওঝাকে কিছু বলেছিলেন অথবা তিনি কি এ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?

উ–না। আমিও এ ব্যাপারে তাঁকে কিছু বলিনি। এছাড়া তিনিও কিছু জিজ্ঞেস করেননি।
প্র–মিঃ ওঝা কি পূর্ব পাকিস্তানের উপকার করার কোন সদিচ্ছার কথা বলেছিলেন?
উ–জী না।
প্র–আপনি কি ব্যক্তি-পূজায় না যৌথ নেতৃত্বে বিশ্বাস করেন?
উ–আমি ব্যক্তি-পূজা বা যৌথ নেতৃত্ব সম্পর্কে কিছুই জানি না। কারণ এই ধরনের কোন আলোচনা আমাদের মধ্যে হয়নি।
এই পর্যায়ে জনাব ফজলুল করিমের জেরা সমাপ্ত হয় এবং বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব নূরুল আলম সাক্ষীকে জেরা করেন।

জনাব নূরুল আলম

প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দীতে আপনি কি বলেছিলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেম আপনাকে অস্ত্র-শস্ত্রের টাইপ করা তালিকা দিয়েছিলেন?
উ–আমার মনে নেই।
(রেকর্ডে তাই আছে।)
প্র–পুলিশের নিকটও কি আপনি টাইপ করা তালিকার কথা বলেছিলেন?
উ–তাও আমার স্মরণ নেই।
(পুলিশ রেকর্ডে তা আছে।)

জুলমত আলী

এরপর জনাব জুলমত আলী খান সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র–আপনার শ্বশুরবাড়ী কোথায়?
উ–সীতাকুণ্ডে। সীতাকুণ্ড রেলস্টেশন থেকে তাঁদের বাড়ী আধ মাইল দূরে।
প্র–১৯৬৬ সালের মে মাসে আপনার স্ত্রী কি আপনার শ্বশুরবাড়ী ছিলেন?
উ–তা আমার এখন স্মরণ নেই। এছাড়া সে মাসে আমি শ্বশুরবাড়ী গিয়েছি কি না তা স্মরণ নেই।
প্র–আপনি কি ১৯৬৬ সালের ১৮ই মে থেকে ২২শে মে পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ীতে ছিলেন না?
উ–একথা স্বীকার বা অস্বীকার করতে পারছি না।
প্র–আপনার ঔষধের লাইসেন্স কার নামে?
উ–আমার 'নিউ ফার্মেসীর' নামে।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৬ সালে চীন থেকে তিনি সিরামিন আমদানী করেছেন কি না তা তার স্মরণ নেই। এছাড়া ১৯৬৬ সালে কিছু ঔষুধ আমদানী তিনি করছিলেন। তবে কোন রাষ্ট্র থেকে তা তিনি স্মরণ করতে পারছেন না। কারণ ঔষধ আমদানীর কাজটা তাঁর এক বন্ধু করে থাকেন।

প্র–আপনাকে কত টাকার লাইসেন্স ইস্যু করা হয় এবং আপনার কাস্টম ডিউটি কত দিতে হয়?

উ–তা আমার স্মরণ নেই।

প্র–ঔষধ আমদানী সংক্রান্ত ব্যাপারে দুর্নীতি দমন বিভাগ ১৯৬৬ সালে আপনার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করেছিল কি?

উ–না, একথা সত্য নয়। এছাড়া কাস্টম কালেক্টর আমাকে জরিমানা করেছে কিনা তা আমার স্মরণ নেই।

জনাব এ মোমেন

এরপর বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব মোমেন সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র–আপনার জবানবন্দী রেকর্ড করার আগে ম্যাজিস্ট্রেট এই মামলার সত্যতা সম্পর্কে কিছু যাচাই করেছিলেন?

উ–জী না।

প্র-এটা কি সত্য যে, আপনার জবানবন্দী পুলিশের শেখানো?

উ–জী না। একথা সত্য নয়।

এখানেই চার নম্বর একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমানের জেরা শেষ হয়।

মঞ্জুর কাদিরের নয়া প্রশ্ন

অতঃপর বাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমানকে পুনরায় একটি প্রশ্ন করলে সাক্ষী বলেন যে, এ বি খুরশীদের পরামর্শেই তিনি তাঁর উপর নির্যাতন করার মিথ্যা অভিযোগ করে হোম সেক্রেটারীর নিকট দরখাস্ত করেছিলেন। তিনি বলেন যে, এস বি অফিস থেকে একই মোটর গাড়ীযোগে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে যাওয়ার সময় অভিযুক্ত এ বি খুরশীদ তাঁকে বলেছিলেন যে, নির্যাতনের অভিযোগ করে হোম সেক্রেটারীর কাছে দরখাস্ত করলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। জনাব মনজুর কাদিরের অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, জেরার সময় তিনি বলেছিলেন যে, ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন পুলিশের গুলীতে বহু লোক নিহত হয়েছে। বহু লোক বলতে তিনি ৪০/৫০ জন লোক নিহত হয়েছে বুঝাতে চেয়েছেন।

এই পর্যায়ে বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীকে পুনরায় জেরা করতে গিয়ে প্রশ্ন করেন।

প্র–আপনি এ বি খুরশীদের সাথে মোটরগাড়িতে যাওয়ার সময় আর কে কে ছিলেন?

উ–একজন পুলিশ অফিসার ও কয়েকজন কনস্টেবল। পুলিশ অফিসার মোটরগাড়ীর সামনের সিটে বসেছিলেন আর আমরা বসেছিলাম পেছনের সিটে।

সংবাদ

৩১শে আগস্ট ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজের জবানবন্দী সমাপ্ত : বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি কর্তৃক জেরা শুরু

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (শুক্রবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে ৫ম রাজসাক্ষী ফ্লাইট লেঃ রমিজউদ্দীনের জবানবন্দী গ্রহণ সমাপ্ত হয়। তাহার জবানবন্দী শেষে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন। অবশ্য তিনি এইদিন মাত্র কয়েক মিনিট জেরা করার সুযোগ পান। অতঃপর আগামী সোমবার সকাল ৯টা অবধি ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী হইয়া যায়।

পূর্বাহ্নে রাজসাক্ষী রমিজউদ্দীন কথিত ষড়যন্ত্রের সহিত আরও ৪জন অভিযুক্তকে সনাক্ত করেন। ইহারা হইলেন মেসার্স কে,এম,এস রহমান সি,এস,পি, এক্স-কর্পোরাল সামাদ, হাবিলদার দলিলউদ্দিন ও আলী রেজা। পক্ষান্তরে সাক্ষী অভিযুক্ত কে,বি, খুরশীদকে সনাক্ত করিতে ব্যর্থ হন এবং অভিযুক্ত এল,এস,সুলতান উদ্দীনের পরিবর্তে অভিযুক্ত নূর মোহাম্মদকে সনাক্ত করেন।

উল্লেখযোগ্য যে,বিচারপতি জনাব এস এ রহমান, বিচারপতি জনাব এম আর খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিমকে লইয়া গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অপর ৩৪ ব্যক্তির বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগের বিচার চলিতেছে।

জবানবন্দীর বিবরণ

গতকালের অসমাপ্ত জবানবন্দীর জের টেনে রাজসাক্ষী মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ বলেন যে,কুমিল্লা থেকে ফিরে তিনি ১৯৬৬-এর জুন কিম্বা জুলাই মাসে ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান ও লেঃ মোয়াজ্জেমকে এক ভোজে তার বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানান। তবে আমন্ত্রণের সঠিক তারিখ তাঁর মনে নেই। তিনি বলেন যে,খাওয়া-দাওয়ার পরে তারা একত্রে বসে আলোচনা করেন। সাক্ষী সংগঠনের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেই আলোচনার সূত্রপাত করেন। সাক্ষী বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেমও বিপ্লবী সংগঠনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেন।

ক্যাপটেন নুরুজ্জামান তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হন ও সংগঠনের সদস্য হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। তবে তিনি জানান যে, সরকারী চাকুরীতে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত থাকায় তিনি প্রকাশ্যে দলীয় সভায় যোগদান করতে পারবেন না। সাক্ষী জানান যে, এক সপ্তাহ পর তাঁরা ঢাকা আসেন ও ক্যাপ্টেন হুদার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে সভার দিন স্থির

করা হয় এবং স্থির হয় যে, সাক্ষীর বাসায়ই সভা হবে। সাক্ষী বলেন যে, তিনি জানেন যে, নির্দিষ্ট দিনেই বৈঠক হয় বলেই তিনি জানেন। তবে তিনি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না।

সাক্ষী জানান যে, এ্যালটমেন্টের মাধ্যমে তিনি ঢাকায় তার 'ফ্লাট' লাভ করেন। ফ্লাট 'এ্যালটে'র জন্যে তিনি পুর্ত্ত, গৃহ নির্মাণ ও সেটেলমেন্ট কমিশনারের নিকট একখানি দরখাস্ত পেশ করেছিলেন। সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে তার ফ্লাটের ব্যাপারে উক্ত ডিপার্টমেন্ট একটি নোটিশ প্রদান করেন। সাক্ষী অন্যত্র রয়েছে এবং কিছুসংখ্যক অননুমোদিত লোক তার ফ্লাটে বাস করছে এ অভিযোগে কেন 'এ্যালটমেন্ট' বাতিল করা হবে না তার কারণ দর্শাইবার জন্যে নোটিশে সাক্ষীর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়।

একসময় ক্যাপ্টেন মুজিবের পরিবার ও তার বাবা ঐ ফ্লাটে তাঁর (সাক্ষীর) অনুমতি নিয়ে কিছুদিন ছিল। তার অনুমতি নিয়ে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও জনাব লুৎফুল হুদা ওই ফ্লাটে কিছুকাল ছিলেন।

জবানবন্দীকালে সাক্ষী মীর্জা রমিজ আরও বলেন, 'আমি জনাব কে,এম,এস, রহমান সি,এস,পিকে চিনি। ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে তিনি চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ছিলেন। চট্টগ্রামের বিভিন্ন পার্টিতে আমি তার সঙ্গে মিলিত হই– এছাড়া দু'জনের বাড়ীতেই দু'জনার সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় একদিন তিনি আমার বাড়ীতে আসেন এবং আমাদের দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়। সেবার আমি তাঁর কাছে আমাদের বিপ্লবীদলের লক্ষ্যগুলো বলি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হলে কি টিকে থাকতে পারবে?

তিনি 'হ্যাঁ' বাচক উত্তরদান করেন। এ আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে আমি তার সাহায্য কামনা করি। তিনি সাহায্য দিতে রাজী হন।এই সময় অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় সাক্ষী অভিযুক্ত জনাব শামসুর রহমানকে সনাক্ত করেন।

অতঃপর সাক্ষী তার জবানবন্দীতে আরও বলেন, "১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি লেঃ মোয়াজ্জেমের সঙ্গে চট্টগ্রামে আবার দেখা করি। সেবার আমরা তাঁর বাড়ীতে মিলিত হই,না আমার অফিসে মিলিত হই আমার মনে পড়ছে না। সেবার তিনি আমাকে বলেন যে, নতুন সদস্য যেমন ক্যাপ্টেন আলীম ও ক্যাপ্টেন হুদাকে আমাদের সংগঠনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার জন্য তিনি ঢাকায় দলের একটি সভা আহবান করতে চান। সেপ্টেম্বরের একসময় সভার তারিখ ঠিক করা হয়। তবে সে তারিখ এখন আমার স্মরণ নেই। সভার স্থান নির্ণয় করা হয় আমার ঢাকাস্থ ফ্লাটে। সভায় যোগদানের জন্য আমি নির্দিষ্ট দিনে ঢাকা পৌঁছি। আমি ছাড়া সে সভায়

জনাব কে এম এস রহমান, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ক্যাপ্টেন আলম, ক্যাপ্টেন আলীম, ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন মুতালেব, লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দীন আহমদ ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এই সময় 'ডকে' লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দিনকে সনাক্ত করতে বলা হলে সাক্ষী জনাব নূর মোহাম্মদকে জনাব সুলতানউদ্দীন আহমদ বলে সনাক্ত করেন।

সাক্ষী তার জবানবন্দীতে আরও বলেন, "লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন এ বলে আলোচনা শুরু করেন যে, ভারত আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দিতে সম্মত হয়েছে। তিনি বলেন যে, শুধু বৈঠক ও আলোচনার লক্ষ্য হাসিল হবে না। ক্যাপ্টেন আলীম, ক্যাপ্টেন হুদা ও ক্যাপ্টেন আলম আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রশ্ন তোলেন।

নেতৃত্ব একজন সিনিয়র সামরিক অফিসারকে প্রদানের জন্য তারা প্রস্তাব করেন। এ সময় জনাব কে,এম,এস, রহমান হস্তক্ষেপ করেন ও ওয়াদা করেন যে, এ ব্যাপারে তিনি কর্ণেল ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন তুলে জনাব কে এম, এস, রহমান বলেন যে, ভারত ও তার সমর্থক দেশগুলো নতুন রাষ্ট্রকে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃতি দেবে। তিনি আরও বলেন যে, আন্তর্জাতিক দিক বিচার করে ভারত আমাদের এলাকা লংঘন করতে পারবে না। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আরও বলেন যে, ক্যাপ্টেন মুতালিব বিভিন্ন গ্রুপে প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীদের সংঘবদ্ধ করবেন ও বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং দান করবেন। আমি সভায় যোগদানকারী সকলকে নাস্তায় আপ্যায়িত করি। সভা প্রায় ঘণ্টা খানেক চলে। সভায় যোগদানকারী সকল সদস্যই আহ্বায়ক লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে এরূপ আশ্বাস দেন যে, তারা সভার গোপনীয়তা রক্ষা করবেন ও আন্দোলনের প্রতি একান্ত বিশ্বস্ত থাকবেন।

সাক্ষী জবানবন্দীতে আরও বলেন, "জনাব কে,এম,এস রহমান পরে একদিন কর্ণেল ওসমানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বলে আমাকে জানান। তিনি আমাকে আরও জানান যে, কর্ণেল ওসমানী আগামীতে যখন চট্টগ্রামে আসবেন তখন আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি তাকে বলেন। আমার বাসায় অনুষ্ঠিত সভার এক পক্ষকাল পরে এ খবর আমাকে জানান হয়।"

জনাব রমিজ তাঁর জবানবন্দীতে আরও বলেন, ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসের কোন একসময় কর্ণেল ওসমানী চট্টগ্রাম যান ও আমাকে টেলিফোন করেন। অবশ্য এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে প্রথম কথা বলেন কর্ণেল শেখ। তিনি টেলিফোনে আমাকে জানান যে, কর্ণেল ওসমানী আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। কর্ণেল ওসমানীর কথা বলার কারণ আমি জানতাম বলে

টেলিফোনে কথা বলতে আমি ইতস্ততঃ করি। কর্ণেল শেখ অবশ্য জোর দিতে থাকেন। তিনি বলেন যে, তিনি একজন সিনিয়র অফিসার– আমাকে তার সঙ্গে কথা বলা উচিত। পরে আমি কর্ণেল ওসমানীর সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্ত্তা বলি। আমি তাকে জানাই যে, ঐদিন আমরা সন্ধ্যে সাড়ে চারটায় ক্যান্টনমেন্টে এক বৈঠকে মিলিত হবো বলে জানাই।

সাক্ষী আরও বলেন, ওই দিন দুপুরের পর লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমার অফিসে আসেন। সেখান থেকে আমরা জনাব কে,এম, এস রহমানের বাসায় যাই। কর্ণেল ওসমানী শহরে রয়েছেন বলে তাকে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসভবনে এক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বলি।

সাক্ষী বলেন,'প্রায় ৪টার সময় আমি ও লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন তার গাড়ী "মস্কোভীচে" চড়ে ক্যান্টনমেন্ট যাই। আমরা দেখতে পাই কর্ণেল শেখ ও কর্ণেল ওসমানী কর্ণেল শেখ ও ইপি আর সি অফিসার্স মেসের মধ্যকার রাস্তায় পায়চারি করছেন। আমি কর্ণেল শেখের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন শুরু করেন কর্ণেল ওসমানীর সঙ্গে। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন কর্ণেল ওসমানীকে তার বাসভবন 'এ্যাঙ্কোরেজে' চায়ের আমন্ত্রণ জানান। আমরা তারপর চলে আসি।

সাক্ষী আরও বলেন,"এরপর জনাব কে,এম,এস রহমান, কর্ণেল ওসমানী ও লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং আমি 'এ্যাংকোরেজে' মিলিত হই। আমাদের আন্দোলনের ব্যাপারে সামরিক অফিসারদের প্রতিক্রিয়া যাচাই করাই আমাদের এ বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল। বৈঠকের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এই ধরনের একজন মাত্র অফিসারকে বৈঠকে ডাকা হয়। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন বৈঠকের সূচনা করেন। তিনি দলের মূল বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরও বলেন যে, তিনি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই মর্মে একটি 'ভদ্রলোকের চুক্তিতে পৌঁছেছেন যে, যখন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হবে তখন সমুদ্র ও বিমান পথে পশ্চিম পাকিস্তানের হস্তক্ষেপকে বাধাদানের ব্যাপারে ভারত সাহায্য করবে। তিনি আরও বলেন যে, ভারত অবিলম্বে আমাদের ঋণদানের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। আমার মনে পড়ে কর্ণেল ওসমানী ও জনাব কে, এম, এস, রহমান ধৈর্যের সঙ্গে এ আলোচনা শোনেন–তারা কোন আপত্তি তোলেন নি। কর্ণেল ওসমানীর যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা ছিল না বলে আমি আমার গাড়ী পাঠাই। তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে নামিয়ে দেওয়ার জন্য ড্রাইভার আলী আহমদকে নির্দেশ দিই।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৭ সনের মার্চের দিকে লেঃ মোয়াজ্জেম আই ডব্লুটি এ'র অধীনে বরিশালে চাকুরী নেন। এরপর লেঃ মোয়াজ্জেম লেঃ কমাণ্ডার পদে উন্নীত হন। ১৯৬৭ সনের মার্চ মাসে লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম, ষ্টুয়ার্ড

মুজিব ও সাক্ষী ঢাকায় তার (সাক্ষীর) ফ্লাটে মিলিত হন। এর মধ্যে তিনি লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবের আস্থা অর্জন করেন। লেঃ কম্যাণ্ডার সাক্ষীকে বলেন, তার কাছে পর্যাপ্ত অর্থ রয়েছে। ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের ফার্ষ্ট সেক্রেটারী মিঃ পি এন ওঝাই অর্থদানের মূল উৎস বলে লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম জানান । লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম তাকে আরও বলেন, তিনি (মোয়াজ্জেম) দু'জন সি এস পি অফিসার জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব আহমদ ফজলুর রহমানের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন। ঐ বৈঠকে সাক্ষী বলেন, দলের কাজের জন্যে তারা একটি পৃথক বাড়ী নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দলের সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিছু ব্যবসায় করারও সিদ্ধান্ত করা হয়–যাতে সার্বক্ষণিক কর্মীকে ব্যবসায়ী লোক বলে চালানো যায়।

বাদীপক্ষের কৌঁসুলি সাক্ষীর হাতে একটা টেলিগ্রাম দেন। সাক্ষী মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ বলেন, ১৯৬৭ সনের ২৯শে মার্চ তিনি লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে টেলিগ্রামটি পান। টেলিগ্রামে তাকে বলা হয়, লেঃ কমাণ্ডার বৃহস্পতিবার ঢাকা আসছেন। সাক্ষীও যেন তথায় পৌঁছেন। সাক্ষী বলেন, টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি ঢাকায় যান এবং মার্চের ৩০ বা ৩১ তারিখে তার ফ্ল্যাটে সভা হয়। জনাব কে, এম, শামসুর রহমান, লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, ক্যাপ্টেন মোতালিব, ষ্টুয়ার্ড মুজিব, এক্স কর্পোরাল সামাদ ও সাক্ষী নিজে ঐ সভায় যোগদান করেন। ঐ সভায় তারা ওয়ারলেস সেট সংগ্রহের প্রশ্নটি আলোচনা করেন। ওয়ারলেস সেটের ব্যবহার সম্পর্কে ট্রেনিং গ্রহণের জন্যে তাদের একজনের ভারতে যাবার কথা ছিল। দলের পক্ষ হতে সাক্ষীর হাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্থ দেবারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে সাক্ষী জানান।

সাক্ষী বলেন, ব্যবসার জন্যে লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে দু'তিন দিন পর তিনি ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে বলেন। ষ্টুয়ার্ড মুজিব পঁচিশ হাজার টাকা এনে লুৎফুল হুদার উপস্থিতিতে তার (স্বাক্ষর) হাতে দেন।

সাক্ষী বলেন,১৯৬৭ সনের এপ্রিল মাসে দলের কাজের জন্যে ১৩ নম্বর গ্রীন স্কোয়ারের বাড়ীটি ভাড়া করা হয় এবং ১লা মে বাড়ীর দখল গ্রহণ করা হয়। ১৯৬৭ সনের মে মাসে ঐ বাড়ীতে দলের একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐসব বৈঠকে নতুন সদস্য তালিকাভুক্ত করা এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের প্রশ্নে আলোচনা করা হয়। ঐ মাসে সে বাড়ীতে ৬টির বেশী সভা হয়। এক্স-নায়েব সুবেদার জে, ইউ,আহমদ, এক্স করর্পোরাল সামাদ, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও হাবিলদার দলিলউদ্দিন ঐ বাড়ীতে বাস করতেন। ঐসব

লোক ছাড়া লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, ক্যাপ্টেন মোতালিব এবং সাক্ষী নিজে সেসব সভায় যোগদান করতেন। জনাব লুৎফুল হুদাও ১৩, গ্রীন স্কোয়ারের বাড়ীটাতে থাকতেন। তার নামেই বাড়ীটা নেয়া হয়। (সাক্ষী সঠিকভাবে ডকে হাবিলদার দলিল উদ্দিনকে সনাক্ত করেন)।

সাক্ষী বলেন, সেসব সভায় ক্যাপ্টেন মোতালিব একদিন আলী রেজা নামে একজনকে নিয়ে আসেন। লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন তাকে আগে থেকে চিনতেন। তিনি ভদ্রলোককে সাক্ষীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। (সাক্ষী অভিযুক্ত আলী রেজাকে ডকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন)।

সাক্ষী মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ বলেন, ১৯৬৭ সনের জুন মাসে ১৩, গ্রীন স্কোয়ারে দলের একটা গুরুত্বপূর্ণ সভা ডাকা হয়। লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, রিসালদার শামসুল হক, নায়েব সুবেদার জে,ইউ,আহমদ, হাবিলদার দলিলউদ্দিন, এল, এস, সুলতানউদ্দিন, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, জনাব আলী রেজা, এক্স কর্পোরাল সামাদ, পি আইএ'র জনাব আনোয়ার হোসেন এবং সাক্ষী নিজে সে সভায় যোগদান করেন। সাক্ষী বলেন, জনাব আনোয়ার হোসেন তার সাথে চট্টগ্রাম থেকে আসেন এবং ১৩, গ্রীন স্কোয়ারে উপস্থিত লোকদের সাথে পরিচয়ের পর তাকে বিদায় দেয়া হয়, কারণ তাদের গোপন কিছু আলোচনা করার কথা ছিল। সে সভায় লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন প্রকাশ করেন যে, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপার এবং আর্থিক সাহায্য বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনার জন্যে সংস্থার দু'তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলকে ভারতে পাঠানো হবে । কাকে কাকে পাঠানো হবে তাদের এবং তাদের যোগ্যতা সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন। অভিযানের দিন কুমিল্লা, যশোর ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে কি কি দখল করা হবে। তিনি তাও আলোচনা করেন। ভারত প্রেরণের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্যে এরপর আরও ২/৩টা সভা হয়। পেশোয়ারে ক্যাপটেন মোতালিব এবং ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় জনাব কে,এম,এম রহমানের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাদের ফিরে আসতে বলা হয়। সাক্ষী বলেন, লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন তাকে ভারতে প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করতে বলেন; কিন্তু সাক্ষী তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত জনাব আলী রেজা ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে ভারতে প্রেরণের জন্যে বাছাই করা হয়। ঐ সভার সময় ১৩, গ্রীন স্কোয়ারের একটি কক্ষে কয়েকজনকে নিয়ে একটি ভিন্ন সভা হয়। জনাব আলী রেজা, ক্যাপ্টেন মোতালিব, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, এক্স-কর্পোরাল সামাদ, এক্সনায়েব সুবেদার জে, ইউ, আহমেদ এবং সাক্ষী নিজে সে সভায় যোগ দেন। সে সভায় লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন প্রকাশ করেন যে, প্রতিনিধি দলটি ফেনী সীমান্ত হইয়া

ভারতের আগরতলায় গমন করবে। তিনি (মোয়াজ্জেম) বলেন যে, আগরতলায় সভার সঠিক তারিখ অল্পদিনের মধ্যে ঘোষণা করা হবে।

সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৭ সনের ১১ই জুলাই তিনি ফেনী হতে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের একটা টেলিফোন 'কল' পান। সাক্ষী তার বাসভবনে ৫১৫২ নম্বরে টেলিফোন কলটি পান। টেলিফোনে তাকে ফেনী যেতে বলা হয়। প্রতিনিধিদল ফেনীতে 'ডেনোফা' হোটেলে অবস্থান করবে বলে আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সাক্ষী তার পি আই এ ষ্টাফ কার 'ডজ ডাট"-এ করে ফেনীর পথে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। ফেনী হতে ফিরতে অধিক রাত হবে বলে সাক্ষী পি আই এ'র আনোয়ার হোসেনকেও সঙ্গে নেন। ফেনী হতে প্রতিনিধিদলকে আগরতলার দিকের সীমান্তে বেলুনিয়ায় নিয়ে যাবার জন্যে লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আগেই সাক্ষীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে তিনি জানান। সাক্ষী জানান যে, তিনি তার গাড়ী করে বৈকাল প্রায় ৬টায় ফেনী পৌঁছেন।

সাক্ষী বলেনঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে তিনি ফেনীতে হোটেলের বাইরে অপেক্ষা করতে দেখেন? তিনি বলেনঃ প্রাক্তন নায়েব সুবেদার জে, ইউ, আহমেদ, আলী রেজা, প্রাক্তন কর্পোরাল সামাদ, আর হাবিলদার দলিল উদ্দীনও হোটেলেই উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বলেনঃ তারা সকলেই একসঙ্গে আহার সমাধা করেন। ভোর সাড়ে ৪টায় প্রতিনিধিদল সীমান্ত অতিক্রম করবে বলে স্থির করা হয়।

সাক্ষী বলেনঃ তিনি ঠিক সময়ে গাড়ীতে করে আলী রেজা, ষ্টুয়ার্ড মুজিব, নায়েব সুবেদার জে, ইউ, আহমদ, প্রাক্তন কর্পোরাল সামাদ আর আনওয়ার হোসেনকে ফেনী থেকে ৩০ মাইল দূরে বেলনিয়া সীমান্তে পৌঁছে দেন। তিনি নায়েব সুবেদার জে, ইউ, আহমদ, সামাদ, আলী রেজা, ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে প্রধান সড়কে ছেড়ে দিয়ে তাঁরা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত সেখান অপেক্ষা করেন।

সাক্ষী বলেন, নায়েব সুবদার জে, ইউ, আহমদ প্রতিনিধিদলের সীমান্ত অতিক্রম তদারক, আর এ ব্যাপারে সীমান্ত ঘাঁটির রক্ষীদের ওপর তাঁর প্রভাব খাটাবেন বলে স্থির করা হয়।

সাক্ষী বলেনঃ তিনি যে গাড়ীতে করে প্রতিনিধিদলকে সীমান্তে নিয়ে যান, সেটার নম্বর হচ্ছে কে, এ, ই, ৩১৯৪। তিনি বলেনঃ চাটগাঁ-ফেনী সড়কের ওপর একটা পুল রয়েছে। এটাতে কুদ দিতে হয়। তিনিই কুদ দেন। সাক্ষীর হাতে টোল রেজিষ্টার দেয়া হলে, তিনি সেটা দেখে বলেনঃ কুদ দেয়া সম্পর্কিত এন্ট্রিতে কে এ ই ৩১৯ সহজে পড়া যাচ্ছে। তিনি বলেনঃ এরপর আরো একটা সংখ্যা আছে বলে মনে হচ্ছে, (৯ সংখ্যার ডাইনে) সেটা ৪-ও হতে পারে আবার ৯-ও হতে পারে।

মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ বলেন যে, গ্রীন স্কোয়ারে পার্টির অফিসে এক সীমিত বৈঠকে একবার লেঃ মোয়াজ্জেম বৈঠকে উপস্থিত জনৈক ক্যাপ্টেন খুরশিদের সাথে তাঁর আলাপ করিয়ে দেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ইদানীং ঢাকায় আগত খুরশিদকে পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী বলে পরিচয় দেয়া হয়। বৈঠকে যখন বিপ্লবী প্রতিনিধিদের আগরতলায় গিয়ে ভারতীয় সরকারী কর্মচারীদের সাথে দেখা করার জন্যে সীমান্ত অতিক্রমের ব্যাপার নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিল, সেসময় খুরশিদ অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে তাতে অংশগ্রহণ করেন। সাক্ষী কাঠগড়ায় খুরশিদকে সনাক্ত করতে অক্ষম হন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে,তিনি মাত্র একবার কয়েক মিনিটের জন্যে তাকে দেখেছিলেন।

এরপর মীর্জা রমিজ ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসের কোন একসময় আলী রেজার ঢাকার বাড়ীতে তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিবরণ দেন। এই সময় সাক্ষী তাঁহাকে তাদের আগরতলা যাওয়া ও ভারতীয় সরকারী কর্মচারীদের সাথে কথাবার্তা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন।

সাক্ষী বলেনঃ আলী রেজা তাঁকে বলেন যে, সীমান্তে জনৈক ভারতীয় ক্যাপটেন তাঁকে আর ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জানান। এরপর তাঁদেরকে একটা গাড়ীতে করে আগরতলা নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাঁরা একজন কর্ণেল আর একজন মেজরের সাথে দেখা করেন, এরা দুজন ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন।

সেখানে তাঁকে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আর আর্থিক সাহায্যের দাবী বিবেচনা করা হবে এবং বিবেচনার ফলাফল ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের মাধ্যমে জানান হবে বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এইসব দাবী ছিল পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য আর অস্ত্রশস্ত্র।

এখন আমার স্মরণ হচ্ছে যে, এক সীমিত বৈঠকে লেঃ মোয়াজ্জেম জনাব আলী রেজার কাছে অস্ত্রশস্ত্রের একটা তালিকা দেন। এই তালিকার মধ্যে মেসিন গান, সাব-মেসিন গান, হাতবোমা প্রভৃতির মত অস্ত্রশস্ত্র ছিল। আমি সে তালিকাটা পড়ে দেখেছি। আমি সেই বৈঠকেই আলী রেজাকেও আগরতলা থেকে প্রতিশ্রুত দু'লাখ টাকা এনেছেন কিনা, জিজ্ঞেস করি।

লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে বলেছিলেন যে, প্রতিনিধিদল আগরতলা গেলেই তাঁদেরকে প্রতিশ্রুত দু'লাখ টাকা দেয়া হবে।

জনাব আলী রেজা আমাকে বলেন যে, ভারতীয় দল তাকে ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনের মাধ্যমে উল্লিখিত টাকা পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন। শোনা কথা বিবেচনায় ভারতীয় দলের নিকট হইতে আলী রেজা যে উত্তর পাইয়াছিলেন তাহা গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া জনাব আবদুস সালাম এই পর্যায়ে

আপত্তি উত্থাপন করেন। বাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব মনজুর কাদের ইহার উত্তরে বলেন যে, পাকিস্তানের সীমান্তের পরপার হইয়া এই আদালতের আওতাবহির্ভূত হইলেও সাক্ষ্যদান আইনের ১০ ধারামতে সাক্ষীর প্রদত্ত উত্তর সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

মীর্জা রমিজ বলেন যে, আলী রেজার সাথে তার সাক্ষাতের কিছুদিন পর ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে তিনি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের সঙ্গে গ্রীন স্কোয়ারস্থ দলীয় অফিসে দেখা করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, ভারতীয় কর্মচারীদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি দুই লক্ষ টাকা পেয়েছেন কি-না। সাক্ষী বলেন, তার এই কৌতূহলে (টাকা সম্পর্কে মোয়াজ্জেমকে বিব্রত করে এবং তাদের সম্পর্কে মনোমালিন্য ঘটে।

সাক্ষী বলেন যে, পার্টির কাজের জন্যে তিনি মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা পান। এই টাকা থেকে তিনি নগদ ৫ শত টাকা পার্টির ব্যবসায়ের জন্য লূৎফুল হুদাকে দেবার জন্যে ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে দেন। তিনি বলেন যে, মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে টাকা পাওয়ার দু'একদিন পরই তিনি একাজ করেন। প্রায় এক মাস পর তিনি ষ্টুয়ার্ড মুজিবের নিকট ৫ হাজার টাকার একটি চেক হস্তান্তর করেন, (চেক দেখার পূর্বে তিনি উল্লিখিত টাকার অংক দুই হাজার বলে উল্লেখ করেছিলেন)। পরে তিনি রিসালদার শামসুল হককে একটি স্কুটার কেনার জন্যে ২ হাজার টাকা দেন। তিনি ক্যাপ্টেন মুতালিবকে এক পর্যায়ে ১ হাজার টাকা এবং অপর এক পর্যায়ে ৫ শত টাকা দেন। তিনি নায়েব সুবাদার জে, ইউ, আহমেদকে ১ শত টাকা এবং হাবিলদার আজিজকে ৫০ টাকা দেন। সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে সর্বশেষ পর্যায়ের টাকা দেয়া হয়।

সাক্ষী মীর্জা রমিজ বলেন যে, পার্টির কাজের জন্যে ভ্রমণ ও অন্যান্য ব্যয়ের জন্যে তিনি পার্টি তহবিল থেকে ৩ হাজার টাকা খরচ করেছেন।

সাক্ষী বলেন যে, আগরতলা থেকে ফিরে এসে পার্টি তহবিল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে এবং মোয়াজ্জেম কর্তৃক পার্টি তহবিলের অপচয় সম্পর্কে রুহুল কুদ্দুসকে অবগত করার জন্য লাহোর যেতে চাইলে আলী রেজাও মোয়াজ্জেমের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হন। তিনি বলেন যে, লাহোর যাবার জন্যে তিনি আলী রেজার জন্যে পি আই এ-র একটি টিকেট ইস্যু করেন এবং পার্টি তহবিল থেকে তা' পরিশোধের ব্যবস্থা করেন।

সাক্ষী বলেন যে, ক্যাপ্টেন মুতালিব এবং তার পরিবারের সদস্যদের জন্যে তিনি ১২ শত টাকা মূল্যের বিমান টিকিট বাকীতে ইস্যু করেন। পার্টি তহবিল থেকে এই টাকা পরিশোধ করা হবে বলে মনস্থ করা হয়েছিল।

মিঃ রমিজ বলেন যে, বাকী ২৫ হাজার টাকা তিনি তার ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করেছেন।

রাজসাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম পার্টির কাজের জন্যে তাকে একটি প্রাইভেট কার কেনার জন্যে বলেন এবং তার কথানুযায়ী তিনি একটি ফিয়াট ১১শ-ডি গাড়ী কেনেন। মোয়াজ্জেম গাড়ীর মূল্যের একাংশ নগদ ৫ হাজার টাকা পরিশোধ করেন এবং বাকী ১১ হাজার টাকা তিনি নিজে ব্যাংক থেকে একটি ওভারড্রাফট তোলার পর তা' পরিশোধ করেন।

মীর্জা রমিজ বলেন যে, তিনি যখন ফিয়াট গাড়ীটি কেনেন তখন মোয়াজ্জেমের একটি হিলম্যান সি এন সি গাড়ী ছিল এবং এই 'হিলম্যান' টিও পার্টি তহবিল থেকে কেনা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে মোয়াজ্জেম পার্টির কাজের জন্যে ঢাকায় ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে হিলম্যান গাড়িটি দিয়ে দেন এবং পার্টি তহবিল থেকে তিনি নিজে একটি 'মস্কোভিচ' কারনট গাড়ী কেনেন।

রমিজ বলেন যে, ক্যাপ্টেন মুতালিবের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে এবং আগরতলা বৈঠকের সাফল্যের খবর তাকে জানানোর জন্যে এবং তিনি কখন বদলি হয়ে ঢাকায় আসছেন তা' জানার জন্যে তিনি ১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসে আনোয়ার হোসেনকে পি আই এ বিমানযোগে পেশোয়ার পাঠান। তিনি বলেন যে, পি আই এ'র কর্মচারী বিধায় আনোয়ার হোসেনের বিমান ভ্রমণের জন্যে তিনি তাকে মাত্র ১ শত ২৫ টাকা দিয়েছিলেন।

সাক্ষী মীর্জা রমিজ বলেন যে, সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে দলীয় তহবিলের অর্থে ঢাকা-চট্টগ্রাম বিমান ভ্রমণের একটি টিকিট ক্রয় করে মানিক চৌধুরীকে দেওয়ার জন্য মোয়াজ্জেম তাহাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সাক্ষী বলেন, কুমিল্লায় ক্যাপ্টেন আলমের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় মোয়াজ্জেম বলেন যে, ক্যাপ্টেন আলম কুমিল্লার সেকশন কমাণ্ডার (বিপ্লবী দলের) হিসাবে কাজ করবেন।

দৈনিক পয়গাম

৩১শে আগষ্ট ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

মীর্জা মোহাম্মদ রমিজের জবানবন্দী সমাপ্ত : জেরা শুরু

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (শুক্রবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৫ নম্বর রাজসাক্ষী এবং ৬ নম্বর বাদীসাক্ষী সাবেক ফ্লাইট লেঃ মীর্জা মোহাম্মদ রমিজের জবানবন্দী সমাপ্ত এবং জেরা শুরু হইয়াছে।

সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতি জনাব এস, এ রহমান, ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম, আর, খান এবং বিচারপতি জনাব

মকসুমুল হাকিম সমবায়ে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছে। বিচারপতি জনাব রহমান এই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান।

ষড়যন্ত্র মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, ৩জন সি, এস,পি অফিসার, নৌবাহিনীর একজন লেঃ কম্যাণ্ডার সহ সর্বমোট ৩৫ ব্যক্তি বিচারাধীন রহিয়াছেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে ভারত কর্তৃক সরবরাহকৃত অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাইয়া পাকিস্তানকে ইহার এক অংশ হইতে বঞ্চিত করিবার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। গতকাল অধিবেশন শুরু হইলে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মনজুর কাদিরের আবেদনক্রমে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ঢাকার সান্ধ্য দৈনিক 'আওয়াজ'-এর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার দায়ে কেন তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না উহার কারণ দর্শাইবার জন্য পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকের উপর নোটিশ জারি করার নির্দেশ প্রদান করেন।

ট্রাইব্যুনালের মাননীয় চেয়ারম্যান মন্তব্য করেন, "অভিযোগের প্রাথমিক বিবরণে দেখা যাইতেছে যে, পত্রিকাটি চার নম্বর রাজসাক্ষী ডঃ সাইদুর রহমান চৌধুরীর সাক্ষ্যের একটি প্রধানতম অংশ বাদ দেওয়ার জন্য অপরাধী। আদেশে বলা হইয়াছে, "পাঠকদের মনে ইহার ফলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ রহিয়াছে। আমরা পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নিকট কেন তাহাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার দায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য নোটিশ প্রদানের নির্দেশ জারি করিতেছি।"

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী তাঁহার আর্জিতে বলেন যে, সান্ধ্য দৈনিক 'আওয়াজ' ইহার বিগত ২৬শে আগষ্টের সংখ্যায় রাজসাক্ষী ডঃ সাইদুর রহমানের স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারীর নিকট তাঁহার উপর নির্যাতনের অভিযাগ সম্বলিত আবেদনপত্র তাঁহার নিজের হাতে লিখিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু সাক্ষী ইহার বিবরণ সত্য নয় বলিয়া যে সাক্ষ্য আদালতে দান করিয়াছে, তাহা পত্রিকার রিপোর্ট হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

অপর একটি আবেদনপত্রে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী ঢাকার দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানান। কৌসুলী বলেন, 'সংবাদ' ইহার ২৭শে আগষ্ট সংখ্যায় (২৬শে আগষ্টের কার্যবিবরণী) প্রকাশ করে। অভিযোগ হইতেছে, উক্ত পত্রিকাটি স্বরাষ্ট্র দফতরের সেক্রেটারীর নিকট ডঃ সাইদুর রহমানের উপর নির্যাতনের অভিযোগ সম্বলিত আবেদনপত্রের কথা ফলাও শিরোনামায় প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু তিনি যে আদালতে উক্ত অভিযোগ অসত্য বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা রিপোর্টের মধ্যে কোনরূপ প্রাধান্য না দিয়া প্রকাশ করিয়াছে। ট্রাইব্যুনালের ভবিষ্যতে অনুরূপ ভুলের পুনরাবৃত্তি যাহাতে না করা হয় তজ্জন্য 'সংবাদ' পত্রিকার সম্পাদক এবং মুদ্রাকরকে সতর্ক করিয়া দেওয়ার জন্য

নির্দেশ দেন। সাবেক বিচারপতি মন্তব্য করেন, বর্তমানে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করাই যথেষ্ট বলিয়া আমরা মনে করি।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন, যদি সাক্ষ্যের একদিকের ঘটনাকে প্রাধান্য দিতে হয় তাহা হইলে অন্য ঘটনাকেও সমান প্রাধান্য দেওয়া উচিত। যাহাতে অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকের মনে পক্ষপাতদুষ্ট ধারণার সৃষ্টি না হয়। আমরা আশা করি, এই সতর্কবাণীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইবে এবং ভবিষ্যতে এই জাতীয় ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি হইবে না।

ট্রাইব্যুনালের মাননীয় চেয়ারম্যান ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত 'সংবাদ' প্রতিনিধিকে এই সতর্কবাণী সম্পর্কে পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকরকে অবহিত করার জন্য নির্দেশ দেন।

অতঃপর বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মনজুর কাদির জবানবন্দী গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন–বৃহস্পতিবার দিন আপনি (অভিযুক্ত) ক্যাপ্টেন হুদার ঢাকা ফ্ল্যাটে গমন সম্পর্কে বলিয়াছিলেন। সে সভায় (অভিযুক্ত) ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামানও ছিল। তিনি কি সংস্থার সদস্য ছিলেন?

উত্তর–কুমিল্লা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আমি ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান এবং লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে আমার গৃহে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানাই। ১৯৬৬ সালের জুন-জুলাই মাসে সম্ভবতঃ আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলাম। কিন্তু আমি তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিত নই। নৈশভোজের পর আমরা সকলে বৈঠকে বসি এবং সংস্থার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া আমি আলোচনার সূত্রপাত করি। লেঃ মোয়াজ্জেমও বৈপ্লবিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামানকে অবহিত করেন। ক্যাপ্টেন আমাদের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী হন এবং সংস্থার সদস্য হওয়ার ব্যাপারে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি অবশ্য বলেন, যেহেতু তিনি এখনও চাকুরীতে রহিয়াছেন সেহেতু তিনি প্রকাশ্যে আমাদের কোন সভায় শরীক হইবেন না।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন এবং আমি (মোয়াজ্জেমের) হিলম্যান মোটরে করিয়া (চট্টগ্রাম হইতে) ঢাকা আগমন করি এবং ক্যাপ্টেন হুদার সহিত তাঁহার ফ্ল্যাটে যোগাযোগ করি। আমি বৃহস্পতিবার দিন আমার জবানবন্দীতে বলিয়াছি যে, উক্ত ফ্ল্যাটেই আমরা ক্যাপেটন আলিমের সাক্ষাৎ পাই এবং আমার ফ্ল্যাটে একটি সভার তারিখ ধার্য হয়। নির্ধারিত তারিখে আমার ফ্ল্যাটে যে সভা হইয়াছিল তাহা আমি জানিতে পারি; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সে সভায় আমি যোগদান করিতে পারি নাই।

প্রশ্ন–আপনি কবে এই ফ্ল্যাট পাইয়াছেন?

উত্তর–পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পূর্ত গৃহনির্মাণ এবং পুনর্বাসন দফতরের কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করিয়া (মোহাম্মদপুরের) এই ফ্ল্যাট আমি পাইয়াছি।

সাক্ষীকে কমিশনারের নিকট প্রদত্ত আবেদনপত্র দেখান হয় এবং তিনি ইহা সনাক্ত করেন।

সাক্ষীকে ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে উক্ত কমিশনার অফিস হইতে তাহার কাছে প্রেরিত একটি কারণ দর্শাইবার নোটিশ প্রদান করা হইলে সাক্ষী উহা সনাক্ত করেন। নোটিশে সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে সরকার প্রদত্ত তাঁহার ফ্ল্যাটে (মোহাম্মদপুর) অননুমোদিত ব্যক্তি বসবাস করিবার অভিযোগে কেন তাঁহার নামে মঞ্জুরীকৃত ফ্ল্যাট বাতিল করা হইবে না তাহার কারণ ৭ দিনের মধ্যে দর্শাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

প্রশ্ন–কোন অননুমোদিত ব্যক্তি আপনার ফ্ল্যাটে বসবাস করিতেন?

উত্তর–আমার অনুমতি নিয়া কোন কোন সময় ক্যাপ্টেন মোত্তালিবের পরিবার এবং তাহার পিতা আমার ফ্ল্যাটে বসবাস করিয়াছিল। ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান এবং জনৈক লুৎফুল হুদাও আমার অনুমতিক্রমে উক্ত ফ্ল্যাটে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিল।

প্রশ্ন–আপনি কি শামসুর রহমান সি, এস, পি'কে চিনেন?

উত্তর–জী হ্যাঁ।

প্রশ্ন–আপনি কিভাবে তাহার সহিত পরিচিত হন?

উত্তর–১৯৬৬ সালের জুন-জুলাই মাসে জনাব শামসুর রহমান চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ছিলেন। বিভিন্ন পার্টিতে আমাদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হইত এবং একে অপরের গৃহেও গমন করিতাম।

প্রশ্ন–বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে কি তাঁহার সহিত আপনার কোন আলোচনা হইয়াছিল?

উত্তর–সেসময়ে একদিন তিনি আমার আবাসে আগমন করিলে তাহার সহিত আমার আলোচনা হয়। সেসময়ে আমি তাঁহার নিকট আমাদের বিপ্লবী সংস্থার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করি। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, পূর্ব পাকিস্তান যদি স্বাধীন হয় তাহা হইলে ইহা টিকিয়া থাকতে পারিবে কিনা। তিনি টিকিয়া থাকিতে পারিবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন–আপনি কি তাঁহাকে আর কিছু বলিয়াছিলেন?

উত্তর–আমি এই আন্দোলন গড়িয়া তোলার ব্যাপারে তাঁহার সাহায্য কামনা করি এবং তিনি দয়া করিয়া স্বীকৃত হন। (সাক্ষী মীর্জা রমিজ অভিযুক্ত জনাব শামসুর রহমানকে সনাক্ত করেন)।

প্রশ্ন–লেঃ মোয়াজ্জেমের সহিত কি আপনার পুনরায় দেখা হইয়াছিল?

উত্তর–জী হ্যাঁ। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে চট্টগ্রামে পুনরায় তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎকার তাঁহার গৃহে না আমার অফিসে হইয়াছিল তাহা আমার মনে পড়িতেছে না।

প্রশ্ন–কি আলোচনা হইয়াছিল?
উত্তর–লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে এই উপলক্ষে বলেন যে, তিনি ক্যাপ্টেন আলিম এবং ক্যাপ্টেন হুদার মত নূতন সদস্যদিগকে সংস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত করিবার জন্য ঢাকায় একটি সভা আহ্বান করিতে চাহেন।
প্রশ্ন–সভার তারিখ কি নির্ধারিত হইয়াছিল?
উত্তর–সেপ্টেম্বরে সে সভার জন্য তারিখ নির্ধারিত হইয়াছিল; কিন্তু সঠিক তারিখ এখন আমার মনে পড়িতেছে না।
প্রশ্ন–সভার জায়গা কি নির্দিষ্ট হইয়াছিল?
উত্তর–জী হ্যাঁ। আমার ঢাকা ফ্ল্যাটে।
প্রশ্ন–সে তারিখের সভায় কি আপনি যোগদান করিয়াছিলেন?
উত্তর–জী হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আপনি ছাড়া আর কোন ব্যক্তি সে সভায় যোগদান করিয়াছিল?
উত্তর–জনাব শামসুর রহমান, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ক্যাপ্টেন আলম, ক্যাপ্টেন আলিম, ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন মুত্তালিব, এল, এস, সুলতানউদ্দিন এবং ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান।
(সাক্ষীকে এই সময় অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় এল, এস, সুলতানউদ্দিনকে সনাক্ত করিতে বলা হয়। সাক্ষী অভিযুক্ত নূর মোহাম্মদকে এল, এস সুলতানউদ্দিন বলিয়া সনাক্ত করেন)।
প্রশ্ন–সভায় কি আলোচনা হইয়াছিল?
উত্তর–লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন সভার উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন যে, আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র এবং গোলাবারুদ প্রদান করিতে ভারত সরকার স্বীকৃত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, শুধুমাত্র কথা এবং আলোচনা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।
প্রশ্ন–ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন আলিম এবং ক্যাপ্টেন আলম কি কিছু বলিয়াছিল?
উত্তর–জী হ্যাঁ। এই তিনজন আন্দোলনের নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তাহারা আন্দোলনের নেতৃত্ব সিনিয়র সামরিক অফিসারের উপর ন্যস্ত করা উচিত বলিয়া প্রস্তাব করেন।
প্রশ্ন–ইহাতে কি হইয়াছিল?
উত্তর–জনাব কে,এম, এস, রহমান (শামসুর রহমান সি, এস, পি) এই পর্যায়ে বলেন যে, এই ব্যাপারে তিনি কর্ণেল ওসমানীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী। জনাব রহমান আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভারত এবং তাহার

সমর্থক রাষ্ট্রসমূহ আমাদের নূতন রাষ্ট্রকে অনতিবিলম্বে স্বীকৃতি দান করিবে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, আন্তর্জাতিক নানাবিধ কারণে ভারত আমাদের সীমানায় অনুপ্রবেশ করিবে না। লেঃ মোয়াজ্জেম বলেন যে, ক্যাপ্টেন মুত্তালিব বিভিন্ন গ্রুপে সাবেক সামরিক কর্মচারীদের সংগঠিত করিবেন এবং তাহাদিগকে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে ব্যাপারে শিক্ষাদান করিবেন।
প্রশ্ন– কোন নাস্তা কি সভায় সরবরাহ করা হইয়াছিল?
উত্তর– আমি সভায় যোগদানকারীদের জন্য চা-নাস্তার ব্যবস্থা করি। আমার ফ্ল্যাটে বসবাসকারী আমার বন্ধু লুৎফুল হুদাকে তাহাদের জন্য কিছু নাস্তা আনয়নের জন্য বলি। সভা এক ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াছিল।
প্রশ্ন–সভায় অন্য কিছু সম্পর্কে কি আলোচনা হইয়াছিল?
উত্তর–সভায় উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি এই সভা সম্পর্কে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রাখিবার ব্যাপারে আহ্বায়ক লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে নিশ্চয়তা দান করেন এবং আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেন।
প্রশ্ন–জনাব কে, এম, এস, রহমান কর্ণেল ওসমানির সহিত যোগাযোগের কথা বলিয়াছিলেন। সে ব্যাপারে কিছু হইয়াছিল?
উত্তর–জনাব শামসুর রহমান পরবর্তীকালে কর্ণেল ওসমানীর সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন। তিনিই আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। জনাব রহমান বলেন যে, কর্ণেল ওসমানীকে চট্টগ্রামে আমাদের পরবর্তী সভায় যোগদানের ব্যাপারে তিনি স্বীকার করাইয়াছেন। আমার ফ্ল্যাটে অনুষ্ঠিত সভার প্রায় একপক্ষ কাল পরে এই সংবাদ আমাকে জানান হইয়াছিল।

রাজসাক্ষী মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ বাদী-কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদিরের নিকট জবানবন্দীতে বলেন, ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসের কোন একসময়ে কর্ণেল ওসমানী চট্টগ্রাম যান এবং চট্টগ্রামস্থ ই,বি, আর, সি সেন্টারের কম্যাণ্ডান্ট কর্ণেল শেখের অফিস হইতে আমাকে টেলিফোন করেন। প্রথমে প্রকৃতপক্ষে কর্ণেল শেখ টেলিফোনে আমার সহিত কথা বলেন এবং আমাকে জানান যে,কর্ণেল ওসমানী আমার সহিত কথা বলিতে চাহেন। কর্ণেল ওসমানীর আমার সহিত আলাপের কারণ জানিতাম বলিয়া আমি তাহার সহিত টেলিফোন কথা বলিবার ব্যাপারে ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। কর্ণেল শেখ অবশ্য আমাকে চাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, তিনি (কর্ণেল ওসমানী) একজন সিনিয়র অফিসার এবং তাঁহার সহিত আমার আলোচনা করা উচিত। তারপর আমি কর্ণেল ওসমানীর সহিত টেলিফোনে আলাপ করি। আমি তাঁহাকে বলি যে, ক্যান্টনমেন্টে উক্ত দিন অপরাহ্ন সাড়ে চারটার দিকে তাহার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিব।

রাজসাক্ষী মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন যে, সেই দিন বিকালে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমার অফিসে আসেন। তারপর আমরা দুইজন জনাব কে, এম, এস, রহমানের বাসভবনে গমন করিয়া কর্ণেল ওসমানীও শহরে উপস্থিত আছেন বলিয়া তাঁহাকে (জনাব শামসুর রহমান) লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের গৃহে এক মিলন-অনুষ্ঠানে যোগদানের অনুরোধ জানাই। প্রায় বিকাল চারটার দিকে আমি এবং লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁহার মোটর গাড়ীতে করিয়া ক্যান্টেনমেন্ট গমন করি। এই মোটর গাড়ীটির নাম হইতেছে 'মসকোভীচ'। আমরা সেখানে পৌঁছিয়া কর্ণেল শেখ ও কর্ণেল ওসমানীকে কর্ণেল শেখের বাড়ী ও ইপিআরসি মেসের মাঝখানে হাঁটাহাঁটি করিতে দেখিতে পাই। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া কর্ণেল শেখের সহিত কথাবার্তা বলিতে শুরু করি ও লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন কর্ণেল ওসমানীকে একটু দূরে লইয়া গিয়া তাঁহার (মোয়াজ্জেম) গৃহে আসিয়া চা-নাশতা করার আমন্ত্রণ জানান। তারপর আমরা ফিরিয়া আসি।

তারপর লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের গৃহে লেঃ মোয়াজ্জেম, আমি, শামসুর রহমান এবং কর্ণেল ওসমানী মিলিত হই। আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করাই আমাদের এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যটি গোপন রাখিতে হইবে বলিয়া আমরা এই বৈঠকে কর্ণেল ওসমানীর মত একজন মাত্র সামরিক অফিসারকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন বৈঠকের উদ্বোধন করিয়া সংস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহিত তাহার এই মর্মে একটি ভদ্রলোকের চুক্তি হইয়াছে যে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে ভারত পশ্চিম পাকিস্তানকে বিমান ও জলপথে হস্তক্ষেপ করিতে বাধা প্রদান করিবে।

তিনি পুনরায় বলেন যে, ভারত অতি সত্বর ঋণদানেও সম্মত হইয়াছে। আমার মনে হইতেছে যে, কর্ণেল ওসমানী এবং কে, এম, এস, রহমান এই অলোচনা ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করেন এবং তাহারা ইহার সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। কর্ণেল ওসমানীর কোন মোটরগাড়ী ছিল না বলিয়া আমি তাহাকে গাড়ীতে করিয়া পাঠাইয়া দেই। আমি আমার গাড়ীর ড্রাইভার আলী আহমদকে তাঁহাকে (ওসমানী) ক্যান্টনমেন্টে নামাইয়া দিয়া আসিতে নির্দেশ প্রদান করি।

১৯৬৭ সালের সম্ভবতঃ মার্চ মাসে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আভ্যন্তররীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষের নিয়োগপত্র লাভ করেন এবং তাঁহাকে বরিশালে যোগদান করিতে বলা হয়। আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষের সদর দফতর ঢাকায় অবস্থিত। ইহার পর লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন কম্যাণ্ডার পদে উন্নীত হন।

১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান এবং আমি আমার ঢাকাস্থ বাড়ীতে মিলিত হই। তখন হইতেই আমি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের আস্থা লাভ করি। লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন সেই দিন আমাকে বলেন যে, সংস্থা পরিচালনার জন্য তাঁহার নিকট পর্যাপ্ত অর্থ রহিয়াছে।

অর্থ পাওয়ার উৎস সম্পর্কে তিনি বলেন যে, অর্থ লাভের প্রধান উৎস হইতেছে ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের মিঃ ওঝা। তিনি আমাকে জানান যে, তিনি মানিক চৌধুরী নামক একজনের মারফতে অর্থ পাইতেছেন।

তিনি আরও জানান যে, জনাব রহুল কুদ্দুস এবং জনাব ফজলুর রহমান এই দুইজন সি, এস, পি, অফিসারের নিকট হইতেও তিনি টাকা পাইয়াছেন। এই বৈঠকে ঢাকায় পার্টির বৈঠক অনুষ্ঠান ও সার্বক্ষণিক কর্ম্মীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে একটি বাড়ী যোগাড় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বৈঠকে পার্টির অর্থের উৎস সম্প্রসারণের জন্য একটি ব্যবসা পরিচালনা করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সর্বক্ষণিক কর্মিগণ যাহাতে ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচয়দান করিতে পারে এই উদ্দেশ্যও প্রস্তাবিত ব্যবসা চালানোর পশ্চাতে নিহিত ছিল। আমি চট্টগ্রামের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী জনাব লুৎফুল হুদাকে ঢাকায় একটি ব্যবসা সংগঠন কার্যে সাহায্য করার অনুরোধ করিতে পরামর্শ দান করি।

বিজ্ঞ কৌসুলী সাক্ষীর হাতে খামসহ একটি তারবার্তা প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, ইহা কি? সাক্ষী বলেন, "ইহা একটি তারবার্তা, আমি উহা লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট হইতে পাই। এই তারবার্তায় বলা হয় যে, তিনি (মোয়াজ্জেম) বৃহস্পতিবারে ঢাকা আসিবেন। আমি তারবার্তায় ইহাও দেখেতেছি যে, ১৯৬৭ সালের ১৯শে মার্চ আমি ইহা লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের নিকট হইতে লাভ করি। পরের দিন অথবা তার পরদিন আমার ফ্ল্যাটে যে প্রস্তাবিত বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা ছিল সেই প্রসংগে এই তারবার্তাটি প্রেরণ করা হয়। তারবার্তায় আমার স্বাক্ষর ও তারিখ রহিয়াছে। ইহা আমার নিজের হস্তাক্ষর। তারবার্তায় বুঝানো হয় যে, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আগামী বৃহস্পতিবার বরিশাল হইতে ঢাকা আসিতেছেন এবং আমারও ঢাকা আসা উচিত। ৩০ তারিখ অথবা ইহার পরদিন এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

আমার ফ্ল্যাটে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে জনাব কে, এম, এস, রহমান, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ক্যাপ্টেন মোতালেব, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, সাবেক কর্পোরাল সামাদ এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। আমরা এই বৈঠকে ভারত হইতে একটি ওয়ারলেস সেট সংগ্রহ এবং এতদুদ্দেশ্যে ভারতে গমন করিয়া

ওয়ারলেস সেট পরিচালনায় ট্রেনিং গ্রহণের জন্য সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে ভারতে প্রেরণের বিষয়টি আলোচনা করা হয়। বৈঠকে সংস্থার পক্ষে একটি ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য আমার হাতে পর্যাপ্ত টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়। (সাক্ষী কাঠগড়ায় উপবিষ্ট সামাদকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।)

এই বৈঠকে দুই কি তিনদিন পর আমি ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে ব্যবসায়ের জন্য লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট হইতে টাকা সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিলাম। তিনি নগদ ২৫ হাজার টাকা আনেন এবং আমার ফ্ল্যাটেই লুৎফুল হুদার উপস্থিতিতে উহা আমার নিকট হস্তান্তরিত করেন।

১৯৬৭ সালের এপ্রিলে ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারের বাড়ীটি পার্টির জন্য ভাড়া করা হয় এবং ১লা মে বাড়ীর দখল লওয়া হয়। ১৯৬৭ সালের মে মাসে ঐ বাড়ীতে পার্টির কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এইসব বৈঠকে প্রধানতঃ নয় সদস্য তালিকাভুক্তকরণ এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের প্রশ্ন আলোচনা করা হইত। ঐ মাসে ঐ বাড়ীতে অর্ধ ডজনেরও বেশী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নায়েব সুবেদার জে, ইউ, আহমদ, সাবেক কর্পোরাল সামাদ, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও হাবিলদার জলিলউদ্দিন ঐ বাড়ীতে বাস করিত। ইহারা ছাড়াও এইসব বৈঠকে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, ক্যাপ্টেন মুত্তালিব এবং আমি স্বয়ং হাজির থাকিতাম। লুৎফুল হুদাও ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারের ঐ একই বাড়ীতে অবস্থান করিতেন এবং বাড়ীটা তাহার নামেই ভাড়া করা হইয়াছিল। (সাক্ষী অভিযুক্ত হাবিলদার দলিলুদ্দিনকে কাঠগড়ায় নির্ভুলভাবে সনাক্ত করেন)।

রাজসাক্ষী বলেন, এইসব বৈঠকের এক বৈঠকে ক্যাপ্টেন মুত্তালিব আলী রেজা নামক এক ব্যক্তিকে আনয়ন করেন। লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন পূর্ব হইতেই তাঁহাকে জানিতেন এবং তিনি এই ভদ্রলোককে আমাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। (সাক্ষী অভিযুক্ত আলী রেজাকে কাঠগড়ায় নির্ভুলভাবে সনাক্ত করেন)।

১৯৬৭ সালের জুন মাসে ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারে পার্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আহ্বান করা হয়। এই বৈঠকে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, রিসালদার শামসুল হক, নায়েব সুবেদার জে, ইউ, আহমদ, হাবিলদার দলিলুদ্দীন, লীডিং সীম্যান সুলতানউদ্দিন, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, জনাব আলী রেজা, সাবেক কর্পোরাল সামাদ, পি আই এ'র জনাব আনোয়ার হোসেন ও আমি নিজে যোগদান করি। জনাব আনোয়ার হোসেন চট্টগ্রাম হইতে আমার সহিত আসিয়াছিলেন। এবং ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারের বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিদের সহিত তাঁহাকে পরিচয় করিয়া দেওয়ার পর বিদায় করা হয়। কারণ আমাদিগকে কতিপয় গোপন বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। ঐ

বৈঠকে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন প্রকাশ করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সংস্থা দুই কি তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি টীমকে অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তি এবং আর্থিক সাহায্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্য ভারতে প্রেরণ করা হইবে। তিনি টিমের সদস্যদের উপযুক্ততা সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

মীর্জা রমিজ বলেন, অধিকন্তু তিনি আক্রমণ অভিযান চালনার দিনে কুমিল্লা, যশোর ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের লক্ষ্যসমূহ দখল করার বিষয়ও আলোচনা করেন। ভারতে প্রেরিতব্য প্রতিনিধিদলের সদস্য বাছাই চূড়ান্তকরণের জন্য এই বৈঠকের পর আরও ২/৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আমরা পেশোয়ারে ক্যাপ্টেন মুত্তালিব ও জাকার্তায় জনাব কে, এম, এস, রহমানকে ফিরিয়া আসার জন্য টেলিগ্রাম প্রেরণ করি। লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব লইয়া আমাকে ভারতে যাওয়ার জন্য বলেন কিন্তু আমি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করি। শেষমেষ জনাব আলী রেজা ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে আমাদের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতে যাওয়ার জন্য মনোনীত করা হয়। ঐসব বৈঠকের সময় ১৩, গ্রীন স্কোয়ারের বাড়ীর একটি রুমে আমাদের একটি নিয়ন্ত্রিত বৈঠক (রেসইট্রক্টেড কনফারেন্স) হয় এবং ঐ বৈঠকে জনাব আলী রেজা, ক্যাপ্টেন মুত্তালিব, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, সাবেক কর্পোরাল সামাদ, সাবেক নায়েব সুবেদার জে, ইউ, আহমদ এবং আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। এই বৈঠকে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন প্রকাশ করেন যে, আমাদের প্রতিনিধিদল ফেনী সীমান্ত হইয়া ভারতের আগরতলায় যাইবে। তিনি বলেন যে, আগরতলা বৈঠকের সঠিক তারিখ শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে। ১৯৬৭ সালের ১১ই জুলাই ফেনী হইতে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের একটি টেলিফোন কল পাই। আমার বাসভবনস্থ ৫১৫২নং টেলিফোনে উক্ত কল পাই। টেলিফোনে তিনি আমাকে ফেনী যাইতে বলেন। পূর্বেই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, আমাদের প্রতিনিধিরা ফেনীর হোটেলে ডেনোফাতে অবস্থান করবেন। আমি আমার পি আই এ ষ্টাফ কার ডজ-ডার্ট যোগে ফেনীর উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ত্যাগ করি। ফেনী হইতে ফিরিতে রাত্রি হইবে মনে করিয়া আমি পি, আই, এ'র আনোয়ার হোসেনকে আমার সাথে লইয়াছিলাম।

পূর্বাহ্নেই লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন কর্তৃক আমাদের প্রতিনিধিদলকে আমার মোটরে করিয়া আগরতলার উদ্দেশ্যে ফেনী হইতে বিলোনিয়া সীমান্তে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য আমি আদিষ্ট হই।

রাজসাক্ষী মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ জবানবন্দীতে বলেন, সন্ধ্যা ৬টায় আমার গাড়ীতে করিয়া ফেনী পৌঁছি। হোটেলের বাইরে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে দেখিতে পাই। ঐ হোটেলে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ব্যতীত নায়েব সুবেদার জে, ইউ, আহমদ, আলী রেজা,

সাবেক কর্পোরাল সামাদ এবং হাবিলদার দলিলউদ্দীনকেও দেখিতে পাই। আমি, আনোয়ার হোসেন ও এই সকল ব্যক্তি হোটেলে নৈশভোজ গ্রহণ করি। ইহার পর বিশ্রামের জন্য আমি নিকটবর্তী সি এ্যাণ্ড বি ডাক বাংলায় গমন করি। পূর্বাহ্নেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল যে, আমাদের দলের প্রতিনিধিগণ রাত্রি ২-৩০ হইতে ৪-৩০-এর মধ্যে সীমান্ত অতিক্রম করিবে। আনোয়ার হোসেন ডাক বাংলোয়ও আমার সহিত গমন করিয়াছিলেন। জে, ইউ, আহমদও ডাক বাংলো পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাকে সেখানে পৌছাইয়া দিয়া আনোয়ার হোসেন ও জে, ইউ, আহমদ হোটেলে ফিরিয়া আসেন।

রাজসাক্ষী আরও বলেন যে, নির্ধারিত সময়ে আমি জনাব আলী রেজা, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, নায়েব সুবেদার জে, ইউ, আহমদ, সাবেক কর্পোরাল সামাদ এবং আনোয়ার হোসেনকে আমার গাড়ীতে করিয়া ফেনী হইতে ১৩ মাইল দূরে বিলোনিয়ায় লইয়া যাই।

এই স্থানটি ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত। আমি সীমান্তের নিকট প্রধান সড়কের উপর নায়েব সুবেদার জে, ইউ, আহমদ, সাবেক কর্পোরাল সামাদ, আলী রেজা এবং ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দেই। তাহারা সীমান্তের দিকে গমন করিতে থাকে এবং আমার দৃষ্টির বাহিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি সেখানে অপেক্ষা করি।

ভারতীয় সীমান্ত হইতে বিলোনিয়ার প্রধান সড়ক দুইশত হইতে তিনশত গজ দূরে। নায়েব সুবেদার জে, ইউ, আহমদ সীমান্ত অতিক্রম তত্ত্বাবধান করিবেন এ বিষয়ে পূর্বাহ্নে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। বিলোনিয়ার নিকটবর্তী ফাঁড়ির ইপিআর-এর লোকদের উপর ও তাহাকে (জে,ইউ,আহমদ) প্রভাব খাটাইতে হইবে এরূপ কথা ছিল। প্রতিনিধিদের সীমান্ত অতিক্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনবোধে ইপিআর জোয়ানদের ঘুষ প্রদানের জন্যও লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন তাহাকে জে, ইউ, আহমদকে) নির্দেশ দিয়াছিলেন। আমি ফেনী হইতে বিলোনিয়া পর্যন্ত কে এ ই ৩১৯৪ নম্বর ডজ-ডার্ট মোটরগাড়ীতে করিয়া গমন করি। ফেনী ও চট্টগ্রামের মধ্যে একখানি পুল আছে। এখানে মোটরগাড়ীর জন্য শুল্ক দিতে হয়। ঐসময় আমি গাড়ীর জন্য শুল্ক দিয়াছিলাম। আমার হাতে যে রেজিষ্টার দেওয়া হইয়াছে তাহাতে আদালতের দলিল হিসাবে পি,ডব্লু ৫/৫ চিহ্নিত এন্ট্রি আমি দেখিতে পাইতেছি। ইহা ঐ সময় আমার গাড়ীর জন্য যে শুল্ক দিয়াছিলাম সে সম্পর্কিত। এই এন্ট্রিতে গাড়ীর নম্বর কে এ ই ৩১৯ নম্বর বলিয়া দেখিতে পাইতেছি। ৯-এর পর আরও একটি সংখ্যা রহিয়াছে মনে হইতেছে এবং উহা ৪ অথবা ৯ হইতে পারে। এন্ট্রিতে ১১-৭ তারিখ লিখিত রহিয়াছে; কিন্তু

সন অস্পষ্ট। রাজসাক্ষী আরও বলেন যে, জনৈক ক্যাপ্টেন খুরশীদকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তিনি ১৩ নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে আমাদের মধ্যকার সীমাবদ্ধ বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁহাকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন এবং তিনি আমাদের দলের একজন সক্রিয় কর্মীও। তিনি সম্প্রতি পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ঢাকা বদলী হইয়া আসিয়াছেন বলিয়া আমাকে বলা হয়। সেই সময় আমরা আগরতলা গমনের জন্য সীমান্ত অতিক্রমের বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম। তিনি এই আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। (কাঠগড়ায় ক্যাপ্টেন খুরশীদকে সনাক্ত করিতে বলা হইলে সাক্ষী বলেন যে, আমি মাত্র একবার কয়েক মিনিটের জন্য তাহাকে দেখিয়াছিলাম। কাজেই এখন আমি তাহাকে সনাক্ত করিতে পারি না)। রাজসাক্ষী বলেন, ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসের কোন একসময় আমি চট্টগ্রাম হইতে ঢাকা আসি এবং জনাব আলী রেজার সহিত ধানমণ্ডীর ল্যাবরেটরি রোডে তাঁহার গৃহে তাঁহার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাহাদের আগরতলা সফর ও তাঁহাদের সেখানকার আলোচনা সম্পর্কে জানার জন্য আমি তাহার নিকট গিয়াছিলাম।

রাজসাক্ষী জবানবন্দীতে আরও বলেন, আমার স্মরণ হইতেছে জনাব আলী রেজা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, সীমান্তে ভারতীয় ক্যাপ্টেন তাহাকে এবং ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান। পরে তাহাদের মোটরগাড়ীতে করিয়া আগরতলা লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহারা সেখানে একজন কর্ণেল ও একজন মেজরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকারে কর্ণেল এবং মেজর ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁহাকে (রেজা) সেখানে এই মর্মে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং আর্থিক সাহায্যের দাবী যথাযথভাবে বিবেচনা করা হইবে এবং ইহার ফলাফল ঢাকাস্থ ডেপুটি হাইকমিশনের মাধ্যমে জানাইয়া দেওয়া হইবে। আমার এখন মনে পড়িতেছে যে, একটি অন্যতম নিয়ন্ত্রিত বৈঠকে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, জনাব আলী রেজার হস্তে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের একটি তালিকা প্রদান করেন। এই তালিকায় মেশিনগান, সাবমেশিনগান, হাতবোমা ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ ছিল। আমি উক্ত তালিকা পাঠ করি। আমি সেই বৈঠকে জনাব আলী রেজাকে ইহাও জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি আগরতলা হইতে প্রস্তাবিত দুই লক্ষ টাকা আনয়ন করিয়াছেন কি না। লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মচারিগণ ওয়াদা করিয়াছেন যে, আগরতলায় প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত হওয়া মাত্রই তাদের দুই লক্ষ টাকা প্রদান করা হইবে।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদিরের প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন, জনাব আলী রেজা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের মাধ্যমে এই অর্থ প্রদান করা হইবে বলিয়া ভারতীয় দল তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন।

(এই পর্যায়ে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান প্রতিবাদ করেন যে, জনাব আলী রেজা ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নিকট হইতে যে উত্তর পাইয়াছিলেন উহা গুজব ছিল বলিয়া গ্রহণযোগ্য নয়। বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদির বলেন যে, যে উত্তর দেওয়া হইয়াছিল উহা 'এভিডেন্স' এ্যাক্টের ১০ম ধারা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য।কারণ, ভারতীয়রা পাকিস্তান সীমান্তের পরপারে এবং এই আদালতের আয়ত্তের বাহিরে হইলেও তাহারাও ষড়যন্ত্রকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে অনুসারে তাঁহাদের উক্তি গ্রহণযোগ্য হইবে)।

প্রায় এক অথবা দুইদিন পর আমি ঢাকায় ১৩ নম্বর গ্রীন স্কোয়ারে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম এবং আমি তাঁহাকে ভারতের নিকট হইতে তিনি প্রতিশ্রুত দুই লক্ষ টাকা পাইয়াছেন কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। এই অর্থপ্রাপ্তির বিষয় জানার ব্যাপারে আমার 'অনুসন্ধিৎসা' সাক্ষী (অনুসন্ধিৎসা শব্দটি ব্যবহার করেন) তাঁহাকে বিরক্ত করে এবং ইহার ফলে আমাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট হইতে আমি যে ২৫ হাজার টাকা পাইয়াছিলাম উহা হইতে ৫ হাজার টাকা লুৎফুল হুদাকে তাঁহার ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে দেওয়ার জন্য আমি ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে দিয়াছিলাম।

লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট হইতে টাকা পাওয়ার এক অথবা দুইদিন পর আমি ইহা করিয়াছিলাম। ইহার এক মাস অথবা অনুরূপ সময়ের পর আমি ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের উপর আমার নামের ২ হাজার টাকার একখানি চেক ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে দিয়াছিলাম। (বাদীপক্ষের কৌসুলী তাঁহার হাতে ২৬-৫-৬৭ তারিখের ৫ হাজার টাকার একখানি চেক প্রদান করার পর সাক্ষী বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে চেকখানি ৫ হাজার টাকার ছিল)। এই চেকখানিই আমি দিয়াছিলাম এবং ইহাতে আমার স্বাক্ষর রহিয়াছে। এই চেকখানি প্রদানের প্রায় দুই মাস পর আমি রিসালদার শামসুল হককে একখানি স্কুটার ক্রয় করার জন্য নগদ দুই হাজার টাকা দিয়াছিলাম। ইহার পূর্বে ক্যাপ্টেন মুতালিব যখন ঢাকার সি, এম হাসপাতালে ভর্তি হইয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে এক হাজার টাকা দিয়াছিলাম। কুমিল্লার সি, এম, হাসপাতালে তিনি যখন ভর্তি হইয়াছিলেন, তখন পুনরায়

আমি আনোয়ার হোসেনের মাধ্যমে ক্যাপ্টেন মুতালিবকে ৫ শত টাকা দিয়াছিলাম। সাবেক সুবেদার জে, ইউ, আহমদ তাঁহার কন্যার মৃত্যুর পর যখন চট্টগ্রামে আমার নিকট গিয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে নগদ একশত টাকা দিয়াছিলাম। হাবিলদার আজিজকে আমি ৫০ টাকা দিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসের কোন একসময় এই টাকা প্রদান করা হইয়াছিল। দলের পক্ষে তিনি যে ব্যয় বহন করিয়াছিলেন তাহা পূরণের জন্যই তাঁহাকে এই টাকা দেওয়া হইয়াছিল। আমার এবং আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সদস্যের যাতায়াত ও অপরাপর খরচ বাবদ আমি প্রায় ৩ হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলাম। দলের কাজের জন্য আমার এবং অন্যান্য সদস্যদের যাতায়াত বাবদ এই তিন হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। আমি জনাব আলী রেজাকে ঢাকা হইতে লাহোর গমন ও ঢাকা প্রত্যাবর্তনের জন্য পি আই এ'র একখানি টিকেট দিয়াছিলাম।

রাজসাক্ষী জনাব রমিজ আরও বলেন যে, জনাব আলী রেজা আগরতলা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট তাঁহার কাছে যে অর্থ ছিল তাহার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানিতে চাহিলে তিনি (আলী রেজা) তাহার সুনজর হইতে বঞ্চিত হন। তিনি লাহোরে জনাব রুহুল কুদ্দুস সি, এস, পি'র সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন কর্তৃক তহবিল তছরুপের বিষয় জানাইতে চাহিয়াছিলেন। বিমানের টিকেট বাবদ এই খরচের বিষয় আমিও তাঁহার সহিত ছিলাম এইভাবে তহবিলের হিসাবে দেখানোর কথা ছিল। আমি বাকীতে ক্যাপ্টেন মোতালিব এবং তাঁহার পরিবারের সদস্যদের জন্যও বিমানের একটি দিয়েছিলাম এবং এই টিকেটের মূল্যের মোট পরিমাণ ১২শত টাকা ছিল। কথা ছিল যে, আমার কাছে দলের যে টাকা আছে উহা হইতে এই টাকা প্রদান করা হইবে। পঁচিশ হাজার টাকার অবশিষ্টাংশ আমি আমার ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করিয়াছিলাম। ১৯৬৬ সালের আগষ্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসের কোন একসময় লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন চট্টগ্রামে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, দলীয় কাজের জন্য দলীয় তহবিল হতে আমাকে একখানি প্রাইভেট মোটরগাড়ী দেওয়া হইবে। চট্টগ্রামের পাকিস্তান মোটর কর্পোরেশনের নিকট হইতে আমি একখানি ফিয়াট-১১০০-ডি মোটরগাড়ী ক্রয় করিয়াছিলাম। রাজসাক্ষী আরও বলেন যে, মোটরগাড়ী ক্রয়ের দিন লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আমার সহিত চট্টগ্রামের পাকিস্তান মোটর কর্পোরেশনের অফিসে গমন করিয়াছিলেন এবং উক্ত ফার্মের ম্যানেজার জনাব ইফতিখার আহমদের হাতে নগদ ৫ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। গাড়ীর মূল্যের অবশিষ্ট টাকা দেওয়ার জন্য আমি হাবিব ব্যাঙ্ক হইতে ১১ হাজার

টাকার ওভারডাফ্‌ট গ্রহণ করিয়া ফিয়াট গাড়ীখানি ক্রয় করিয়াছিলাম। লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ওভারড্রাফ্‌টের এই অর্থ দলীয় তহবিল হইতে দেওয়া হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি উহা দেন নাই। বাদীপক্ষের কৌসুলী আমার হাতে যে চেকখানি দিয়াছেন ইহা গাড়ীর মূল্য বাবদ যে ১১ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছিল তাহারই চেক।

ইহাতে আমার স্বাক্ষর রহিয়াছে। আমি মোটরকার ক্রয় বাবদ নগদ ৫ হাজার টাকার একটি রসিদ দেখিতেছি (ইহা আদালতের পি ডব্লু ৬/৮ দলিলরূপে চিহ্নিত হইয়াছে)। অপর একটি রসিদ সম্পর্কে সাক্ষী বলেন যে, ইহা কার ক্রয়ের ১১ হাজার টাকার একটি রসিদ (ইহা আদালতের পি ডব্লু ৬/৯ দলিলরূপে চিহ্নিত হইয়াছে)। রসিদের এই অপর অংশটি কার ক্রয়ের ৫ হাজার টাকা বাবদ (ইহা আদালতের পি ডব্লু ৬/১০ দলিলরূপে চিহ্নিত হইয়াছে)। যখন আমি এই ফিয়াট কারটি ক্রয় করি, সেই সময় লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট একটি হিলম্যান ইম্পকার ছিল। উক্ত হিলম্যান ইম্পটিও পার্টির টাকায় ক্রয় করা হইয়াছিল। আমার হাতে যে দলিলটি প্রদান করা হইয়াছে তাহা লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন কর্তৃক মেসার্স এলাহী বক্স এণ্ড কোং এর নিকট লিখিত একটি মস্কোভিচ কার-এর টায়ার বদল সম্পর্কিত একটি চিঠির নকল। তিনি পার্টির টাকায় আমাকে জানাইয়া ইতিপূর্বে উহা ক্রয় করিয়াছিলেন। এই চিঠিতে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের স্বাক্ষর রহিয়াছে এবং উহা আমি চিনি। উহা ১৯৬৭ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে লিখিত। ১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসে আমি পি আই এ-এর আনোয়ার হোসেনকে ক্যাপ্টেন মোত্তালিবের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া তাঁহাকে আগরতলা বৈঠক সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলার জন্য এবং তিনি কবে বদলী হইয়া পূর্ব পাকিস্তান আসিবেন তাহা অবগত হওয়ার জন্য পেশোয়ার প্রেরণ করি। উক্ত যাত্রাপথের জন্য আমি জনাব আনোয়ার হোসেনকে ১২৫ টাকা প্রদান করি। উক্ত টাকা পার্টি তহবিলের ছিল। আনোয়ার হোসেন পি আইএ-এর একজন কর্মচারী বলিয়া তিনি শতকরা ৭৫ ভাগ হ্রাসকৃত মূল্যে যাতায়াত করিতে পারেন। একসময়ে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে মানিক চৌধুরীর নামে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে যাতায়াতের জন্য একটি বাকী টিকেট কিনিয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। উক্ত টাকাও পার্টি তহবিল হইতে প্রদান করার কথা ছিল। আমার মনে নাই উহা কত টাকার ব্যাপার ছিল। ইহা ১৯৬৭ সালের কোন একসময়ের ঘটনা।

সাক্ষী বলেন, আমি জানি ঢাকা ও বরিশালের মধ্যে গোয়ালন্দে একটি বড় ফেরী রহিয়াছে। সেখানে গাড়ীর যাওয়া আসা এন্ট্রি করা হইয়া থাকে। কুমিল্লা

ও ঢাকার মধ্যে ৩টি ফেরী রহিয়াছে। প্রথমটি দাউদকান্দিতে, দ্বিতীয়টি মেঘনা নদীর উপর এবং তৃতীয়টি শীতলক্ষ্যা নদীর উপর। কুমিল্লা হইতে আগমনকারীকে দাউদকান্দি ফেরীঘাটে টিকিট ক্রয় করিতে হয় এবং উহা অন্যান্য ফেরীতে দেখাইতে হয় ও উহা সর্বশেষ ফেরিতে জমা দিতে হয়।

চট্টগ্রাম হইতে এইসব বৈঠকে যোগদানের জন্য আমি বেশীর ভাগ সময়ই বিমানযোগে আগমন করি।তবে কোন কোন সময় আমি কারযোগেও আগমন করি। আমি যে কারটি ব্যবহার করিয়াছি তাহা হইতেছে ইবিসি ৯১০০ নম্বরের ফিয়াট কার। ইহাই সেই কার যাহার কথা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের একটি হিলম্যান ইম্প ছিল এবং তিনি পরে একটি মস্কোভিচ কার খরিদ করেন। যখন আমরা পার্টির কাজের জন্য গ্রীন স্কোয়ারের ১৩ নম্বর বাড়ী ভাড়া করি লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন পার্টির কাজ করার জন্য উক্ত হিলম্যান ইম্পটি ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের নিকট হস্তান্তর করেন। লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন চট্টগ্রাম হইতে ঢাকা যাতায়াতের জন্য মস্কোভিচ কারটি ব্যবহার করিতেছিলেন। (সাক্ষীকে একটি রেজিষ্টার প্রদান করা হয় এবং উহাতে তাঁহার স্বাক্ষর রহিয়াছে কিনা জানাইতে বলা হয়। তিনি বলেন যে, ২৯১৭ নম্বর এন্ট্রির পার্শ্বে স্বাক্ষরগুলি তাঁহার।)

ক্যাপ্টেন আলমের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন প্রকাশ করেন যে, ক্যাপ্টেন আলম কুমিল্লায় সেক্টর কম্যাণ্ডার হিসাবে কাজ করিবেন। আমি একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়াছি। ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন। আমি উহা গ্রহণ করি। বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের জেরার জওয়াবে ৬নং সাক্ষী মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ বলেন, যতদূর মনে পড়ে লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন পার্টির কাজে ব্যয়ের জন্য আমাকে মোট ২৫ হাজার টাকা প্রদান করেন।

এক প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে বদলী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে (অভিযুক্ত) ক্যাপ্টেন মুত্তালিব পশ্চিম পাকিস্তানে গমন করিয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের জুলাই অথবা আগষ্ট মাসে রিসালদার শামসুল হককে অর্থ প্রদান করা হয়। একটি স্কুটার ক্রয় করা হইয়াছিল এবং উহা আমি দেখিয়াছি। অর্থ প্রদানের পর ক্রয়লব্ধ নয়া স্কুটার আমি দেখিয়াছি। অর্থ প্রদানের প্রায় এক সপ্তাহ পরে আমি স্কুটারটি দেখিয়াছিলাম। এই ২৫ হাজার টাকা হইতে আমি আমার ব্যক্তিগত খরচপাতির জন্য সম্ভবতঃ ৬ হাজার ব্যয় করিয়াছি।

এই ৬ হাজার টাকা ছাড়াও আমি পার্টির সদস্যদের রাহাখরচ ও অন্যান্য খরচের জন্য ৩ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছি। ঢাকায় আমার বাড়ীর "বাউণ্ডারী ওয়াল" নির্মাণের কাজে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান আমাকে সাহায্য করিয়াছে, ইহা সত্য নয়। ঢাকার মোহাম্মদপুরে আমার একখণ্ড ভূমি রহিয়াছে। উহা হইতেছে ব্লক 'বি', প্লটনং ২২/৮। কোন্ সালে এই প্লটটি আমাকে বরাদ্দ করা হইয়াছিল, আমি সঠিকভাবে মনে করিতে পারিতেছি না। ঐ প্লটে আমি শুধু "বাউণ্ডারী ওয়াল" তুলিয়াছি, কোন বাড়ী নির্মাণ করি নাই। ঐ ভূমিখণ্ডের উপর বাড়ী নির্মাণ সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি কোন নোটিশ পাই নাই। প্রায় ৫/৬ বৎসর পূর্বে প্লটটি আমাকে বরাদ্দ করা হইয়াছে। প্লটে কোন গ্যারেজ নির্মাণ করা হয় নাই। ১৯৬৭ সালের প্রথমদিকে 'বাউণ্ডারী ওয়াল' নির্মাণ করা হয়। চেক এক্সিহিবিট পি ডব্লিউ ৬/৬ একটি ক্রস চেক। একটি ক্রস চেক একটি গোপন কার্যক্রমের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে। আনোয়ার হোসেন ও লুৎফুল হুদা এই সংস্থার সদস্য ছিল না। আমার বিবৃতির সহিত সঙ্গতি রাখার জন্য মিছামিছি লুৎফুল হুদা ও আনোয়ার হোসেনের নাম উল্লেখ করিয়াছি, উহা সত্য নহে।

দৈনিক পয়গাম

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

মীর্জা মোহাম্মদ রমিজের জেরা অব্যাহত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

দুইদিন বিরতির পর গতকল্য (সোমবার) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৬ নম্বর রাজসাক্ষী ফ্লাইট লেঃ মীর্জা মোহাম্মদ রমিজের জেরা অব্যাহত থাকে।

সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমানকে চেয়ারম্যান, ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম, আর, খান এবং বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিমকে সদস্য করিয়া বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছে।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান রাজসাক্ষী ফ্লাইট লেঃ এম, এম, রমিজকে জেরা করেন।

জনাব সালাম খান ৬নং রাজসাক্ষীকে কথিত ষড়যন্ত্রকারীদের সহিত তাহার (৬নং সাক্ষীর) সম্পর্ক, এই সংক্রান্ত বৈঠক, তহবিলের হিসাবপত্র, মোহাম্মদপুরস্থ তাহার (৬নং সাক্ষীর) বাসভবনে আগরতলা মিশনের সদস্যদের বিদায় জানাইবার জন্য তাহার ফেনী গমনের বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন।

প্রশ্ন: আপনি কি এখনও বেতন পান?

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন: কত টাকা পান?

উত্তর: ১২ শত টাকা। অবশ্য রাজসাক্ষী বলেন যে, তাহার (সাক্ষীর) জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে বেতন কিছুকাল আটক রাখা হয়; কিন্তু পরে উহা তাহাকে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন: গ্রেফতারের পর আপনার বিরুদ্ধে কি কোন বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর: না, আমার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কোন তদন্ত হয় নাই।

প্রশ্ন: আপনার 'সার্ভিস বুক', আছে?

উত্তর: আমার একটি ব্যক্তিগত ফাইল আছে এবং ইহা করাচী পি, আই, এ সদর দফতরে থাকে।

এই ফাইলে তাহার (সাক্ষী) চাকুরী, বদলী এবং তাহার সম্পর্কিত গোপন মন্তব্য ইত্যাদি তথ্য রেকর্ড করা হইত বলিয়া রাজসাক্ষী জানান।

রাজসাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৭ সালের মে বা জুন মাসে অনুষ্ঠিত বিপ্লবী দলের সভাগুলির তারিখ তিনি বলিতে পারেন না।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজ বলেন মে, ১৯৬৭ সালের মে মাসের সভাগুলি কখনও একটানাভাবে এবং কখনও ৭ দিন বা দশ দিন অন্তর অনুষ্ঠিত হইত।

প্রশ্ন: বিমানে আসা-যাওয়া করিতে আপনি কি কোন কনসেশন পাইতেন?

উত্তর: ডিউটিতে থাকাকালীন বিনাভাড়ায় ও ছুটিতে থাকাকালীন শতকরা ৯০ ভাগ হ্রাসকৃত ভাড়ার সুবিধা পাইতাম।

প্রশ্ন: ১৯৬৭ সালের মে মাসে বিভিন্ন বৈঠকে যোগদানের জন্য ঢাকায় আপনি কিভাবে আসিতেন?

উত্তর: কোন কোন সময় বিমানে আর কোন কোন সময় মোটরগাড়ীতে ঢাকা আসিয়াছিলাম।

প্রশ্ন: চট্টগ্রাম হইতে মোটরে ঢাকায় আসিতে গাড়ীর নাম্বার রেকর্ড করা হয়?

উত্তর: দুই জায়গায় গাড়ীর নাম্বার রেকর্ড করা হয়। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম হইতে ফেনীর মধ্যে একবার ও দাউদকান্দিতে একবার।

প্রশ্ন: আপনার গাড়ীর নাম্বারও কি রেকর্ড করা হইয়াছিল?

উত্তর: আমি আমার এক বন্ধুর "অনটেষ্ট" চিহ্ন দেওয়া গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়াছিলাম এবং হয়ত ফেরীতে "অনটেষ্ট" রেকর্ড করা থাকিতে পারে।

বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে ৬নং রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজ বলেন যে, তিনি তাহার স্বীকারোক্তিতে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই কথা বলিয়াছিলেন যে, ১৯৬৭ সালের জুন মাসে ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারে পার্টি হাউসে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি বলেন যে, ১৯৬৭ সালের মে মাসে সভা অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে তিনি ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে যাহা বলিয়াছেন উহাও সত্য।

প্রশ্ন: ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে ক্যাপ্টেন মোতালেব কি হাসপাতালে ছিলেন?

উত্তর: সম্ভবতঃ তিনি হাসপাতালে ছিলেন।

প্রশ্ন: তিনি কি ১৯৬৭ সালের ৩১শে মে পর্যন্ত ঢাকা সি এম, এইচ, এ ছিলেন?

উত্তর: আমি সঠিকভাবে বলিতে পারি না।

প্রশ্ন: ১৯৬৭ সালের জুন মাসে এল, এস, সুলতানউদ্দিন করাচী ছিলেন কি?

উত্তর: সুলতানউদ্দিন করাচী ছিলেন কিনা আমি জানি না।

তবে জুন মাসে ঢাকায় একটি সভায় সুলতানউদ্দিন তাহার সহিত (৬নং রাজসাক্ষী) যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি জানান।

প্রশ্ন–লুৎফুল হুদা কি আপনার বন্ধু?

উত্তর–হ্যাঁ। তিনি আমার বন্ধু।

প্রশ্ন–তিনি কিসের ব্যবসা করেন?

উত্তর–আমি জানি না। তবে চট্টগ্রামের পি, আই এ'র ম্যানেজার হিসাবে আমি তাহাকে মেরামত ও আসবাবপত্র রং করার কন্ট্রাক্ট দিয়াছিলাম।

প্রশ্ন–তাহার (লুৎফুল হুদার) কি কোন অফিস ছিল?

উত্তর–আমি জানি না।

প্রশ্ন–তাঁহার কত মূলধন ছিল আপনি জানেন কি?

উত্তর–না, আমি জানি না।

প্রশ্ন–কি পরিমাণ অর্থের কাজ দিয়াছিলেন?

উত্তর–২শত হইতে ৭ শত টাকা হইতে পারে।

প্রশ্ন–লিখিত না মৌখিক অর্ডারের কাজ দিতেন?

উত্তর–আমি বলিতে পারি না।

প্রশ্ন–আপনার বন্ধুর বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে কোন প্রতারণা মামলা হইয়াছিল কি?

উত্তর–না, আমি জানি না।

প্রশ্ন–পি, আই, এ'র ম্যানেজারের চাকুরী ছাড়া চট্টগ্রামে আপনার অন্য কোন কাজ বা ব্যবসা ছিল কি?

উত্তর–না।

প্রশ্ন–আনোয়ার হোসেন কে?

উত্তর–পি, আই, এ'র টেলিফোন অপারেটর।

প্রশ্ন–পি, আই, এ তাহাকে কোন বাসা দিয়াছিল কি?

উত্তর–পি, আই, এ তাহাকে কোন বাসা এলট করে নাই।

প্রশ্ন–তাহার বেতন কত ছিল?

উত্তর–ভাতাসহ মাসিক প্রায় ৪ শত টাকা। বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলীর প্রশ্নের জবাবে ৬নং রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজ বলেন যে, ঢাকা ট্রাঙ্ক রোডে আনোয়ার হোসেন তখন ভাড়াটে বাসায় থাকিত এবং আমি সে বাসা চিনিতাম।

প্রশ্ন–চট্টগ্রামে পি, আই, এ'র কতজন অপারেটর ছিল?

উত্তর– ৫ জন।

প্রশ্ন–আনোয়ার হোসেন একজন টেলিফোন অপারেটর। তাহার সাথে আপনার সম্পর্ক কিভাবে হয়?

উত্তর–আনোয়ার হোসেন পি, আই, এ কর্মচারী ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী ছিল এবং সে সূত্রেই তাহার সহিত আমার সম্পর্ক ছিল।

প্রশ্ন–আনোয়ার হোসেন এখন কোথায় আছে?

উত্তর–আমি জানি না বা এ সম্পর্কে আমি খোঁজ-খবরও নেই নাই।

প্রশ্ন–চট্টগ্রাম পি, আই, এ-তে কতটি বাস ছিল?

উত্তর–৩টি ষ্টাফ কার এবং এই ৩টি গাড়ী ২জন অফিসারের ব্যবহারের জন্য ও অন্যান্য ষ্টাফের ৬/৭টি মাইক্রোবাস ছিল।

প্রশ্ন–গাড়ীর পেট্রোল কোথা হইতে দেওয়া হইত?

উত্তর–পি, আই, এ সরবরাহ করিত।

প্রশ্ন–গাড়ীর জন্য কি কোন 'লগ' বুক ব্যবহৃত হইত?

উ–হ্যাঁ। চট্টগ্রামের বাহিরে গেলে 'লগ' বুকে এন্ট্রি করা হইত।

প্রশ্ন–গাড়ীর ড্রাইভার ছিল কি?

উত্তর–আমার গাড়ীর জন্য একজন ড্রাইভার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু অপর দুইটি গাড়ী অফিসারগণ নিজেরা চালাইত।

প্রশ্ন–আলী আহমদ কে?

উত্তর–আলী আহমদ একসময় আমার ড্রাইভার ছিল। যখন আমি বিমান বাহিনীতে ছিলাম তখন আলী আহমদ আমার বাসার ভৃত্য ছিল।

প্রশ্ন–মোহাম্মদপুরে আপনার ফ্ল্যাট কোন তলায় ছিল?

উত্তর–৩ তলা ভবনের নীচের তলায়।

প্রশ্ন–ঐখানে কয়টি ফ্ল্যাট ছিল?

উত্তর–১২টি ফ্ল্যাট।

প্রশ্ন–আপনার অতি নিকটবর্তী ফ্ল্যাটের বাসিন্দা কে ছিলেন?

উত্তর–তাঁহাদের নাম আমি জানি না, দেখিলে চিনিতাম। তবে ঐ বিল্ডিং-এর দোতলা ওয়াপদার একজন ইঞ্জিনীয়ার ছিল বলিয়া রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজ জানান।

প্রশ্ন–১৩নং গ্রীন স্কোয়ার ছাড়া পার্টির জন্য আরও কোন বাড়ীভাড়া করা হইয়াছিল কি?

উত্তর–আমি জানি না। ৬নং রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজ জানান যে, তিনি আহমদ ফজলুর রহমানের নাম শুনিয়াছিলেন এবং ঢাকার ধানমণ্ডিতে তাঁহার (আহমদ ফজলুর রহমানের) একটি বাড়ী আছে বলিয়া শুনিয়াছিলেন। তবে জনাব রুহুল কুদ্দুসের ঢাকায় কোন বাড়ী আছে কিনা তাহা তিনি (৬নং সাক্ষী) জানেন না বলিয়া উল্লেখ করেন। রাজসাক্ষী রমিজ বলেন, শেষ পর্যন্ত সম্ভবত ১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসে তাহার (রমিজের) মোহাম্মদপুরস্থ ফ্ল্যাট বাতিল হইয়া যায়। তিনি বলেন, তাঁহার ফ্ল্যাট বাতিল হইয়াছে একথা তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলেন নাই। রাজসাক্ষী রমিজ বলেন যে, তিনি যখন তাঁহার ঢাকার বাহিরে থাকিতেন তখন তাহার আত্মীয় মোহাম্মদ ইয়াহিয়া তাহার (রমিজের) মোহাম্মদপুরের ফ্ল্যাটে থাকিতেন। তিনি বলেন, জনাব ইয়াহিয়া তাহার বিবাহের পর তথায় বাস করিতেন কিন্তু ইয়াহিয়া বৈঠকগুলির আগে না পরে বিবাহ করেন, তাহা সাক্ষী বলিতে পারে না। রাজসাক্ষী রমিজ জানান যে, মোহাম্মদ ইয়াহিয়া কুমিল্লা জেলার অধিবাসী এবং তিনি বার্মা ইষ্টার্নের কর্মচারী।

প্রশ্ন– আপনারা ফ্ল্যাটে গুণ্ডামি এবং নৈতিকতাবিরোধী কার্যকলাপ চলিত বলিয়া আপনার প্রতিবেশিগণ অভিযোগ করিয়াছিল কি?

উত্তর–কখনও না।

রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজ বলেন যে, ক্যাপ্টেন মোতালেব ও তাহার পিতা আমার মোহাম্মদপুরের ফ্ল্যাটে এক মাস ছিল উহা আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বলিয়াছি কিনা আমার স্মরণ নাই। (অনুরূপ রেকর্ড করা হয় নাই)

তিনি বলেন, ষ্টুয়ার্ড মুজিব আমার ফ্ল্যাটে থাকতেন এই মর্মে আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বলিয়াছি কিনা, তাহা আমার মনে নেই (অনুরূপ রেকর্ড করা হয় নাই)

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে ৬নং রাজসাক্ষী ফ্লাইট লেঃ মীর্জা রমিজ বলেনঃ আলী রেজাকে আগরতলা গমনকারী প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে মনোনীত করার পূর্বে আমি তাঁহাকে চিনিতাম। কারণ আগের এক সভায় আমার সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ফিরিয়া আসিলে ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে আমি তাঁহার গৃহে ছিলাম। প্রতিনিধি মনোনীত হওয়ার পূর্বে শুধু ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারে তাঁহার সহিত আমি সাক্ষাৎ করি। এই একই বৈঠকে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য প্রতিনিধির নামও ঘোষণা করা হয়। ওয়ার্ডরুম নামে নৌ অফিসারদের এক মেসে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান কাজ করিতেন। তিনি সেখানে কি কাজ

করিতেন তাহা আমি জানি না। বিমান বাহিনীর ষ্টুয়ার্ডগণ খাদ্য পরিবেশন করিয়া থাকেন। ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। তিনি প্রতিনিধি মনোনীত হওয়ার পূর্বে শিক্ষাগত ব্যাপারে তাঁহার সাধারণ যোগ্যতা সম্পর্কে আমি কোন সন্ধান লই নাই। উক্ত বৈঠকে আলোচনাকালে এ-কথা উল্লেখ করা হয় যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ সম্পর্কে জ্ঞান রহিয়াছে। সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এবং ক্যাপ্টেনরাও ছিলেন। পেশাগত কারণে তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের চাইতে বেশি জানিতেন। অস্ত্রশস্ত্র অথবা সামরিক ব্যাপারে আমি ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে কোন ট্রেনিং দেই নাই। অভিযুক্তদের মধ্যে প্রায় সকল ক্যাপ্টেনই অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যবহার জানিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে সামরিক ব্যাপারে শিক্ষা দিয়াছেন কি-না, তাহা আমি জানি না।

আমি যতদূর জানি, জনাব আলী রেজা কখনও সশস্ত্র বাহিনীতে ছিলেন না। আগরতলা প্রেরণের জন্য যে বৈঠকে প্রতিনিধিদের নাম চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট করা হয়, উক্ত বৈঠকে অভিযুক্তদের মধ্যকার কোন ক্যাপ্টেন উপস্থিত ছিলেন না। ক্যাপ্টেন মোতালেবের নিকট এ ব্যাপারে তাঁহাকে ঢাকা আসার কথা জানাইয়া একখানি তারবার্তা প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি আসেন নাই। উক্ত বৈঠকে প্রতিনিধি হিসাবে মাত্র দুইজন অফিসারের যোগ্যতার বিষয় আলোচিত হয়। ইহারা হইলেন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন মোতালেব এবং নৌ-বাহিনীর লেঃ রহমান। ক্যাপ্টেন মোতালেব উক্ত বৈঠকে আসেন নাই, তবে লেঃ রহমান আসিয়াছিলেন এবং প্রতিনিধি হিসাবে আগরতলা যাইতে তিনি অস্বীকৃতি জানাইয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন মোতালেবের নিকট তারবার্তা পাঠাইয়া তাঁহাকে আসিতে বলা হয়। আগরতলা প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহাকে যাহাতে মনোনীত করা যায় সেইজন্যই তাঁহাকে আসিতে বলা হয়। ষ্টুয়ার্ড মুজিবের চাইতে আমি ইংরেজী ভাল বলি। ষ্টুয়ার্ড মুজিব নন-ম্যাট্রিকুলেট কিনা, তাহা আমি জানি না। আমি সামান্য উর্দু বলিতে পারি। আমি ষ্টুয়ার্ড মুজিবুরের চাইতে ভাল উর্দু বলিতে পারি কিনা তাহা বলিতে পারি না। ১৯৬৭ সালের জুনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আগরতলা প্রেরণের জন্য প্রতিনিধিদের নাম নির্দিষ্ট করা হয়। জুনের শেষভাগে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যে-সব লোক সীমান্ত অতিক্রম করিবেন বলিয়া ঠিক করা হইয়াছিল, সেখানে তাহাদের কিছু ঘটিলে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁহাদের আর্থিক নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়াছিলেন। তাঁহার এই অর্থ হইতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবর্তমানে তাঁহাদের উপর নির্ভরশীল লোকজনের খরচপত্র চালান হইবে বলিয়া ঠিক হইয়াছিল। (সাক্ষী বলেন যে, এই অর্থ ভারতীয়গণ কর্তৃক আগরতলায়ই দেওয়া হইবে

বলিয়া ঠিক হইয়াছিল।) তিনি আবার বলেন যে, ভারতীয়গণ কর্তৃক দেয় এই টাকার পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ টাকা এবং এই অর্থ লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন এখানে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রদান করিবেন বলিয়া কথা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি অর্থ প্রদান করেন নাই। সিকিউরিটির অর্থ না দেওয়ার কারণেই আমি সেখানে যাইতে মত দেই নাই। আগরতলা না যাওয়ার ব্যাপারে লেঃ রহমান কি কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা আমার মনে নাই। আমি যে বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছি, সেই একই কারণ দেখাইয়া সুলতানউদ্দিনও সেখানে যাইতে অস্বীকার করেন। সীমান্ত অতিক্রমকারীদের চোরাচালানী মনে করিয়া আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাহাদিগকে গুলী করিতে পারে, এইরূপ ঝুঁকিও ছিল। উক্ত বৈঠকে আগরতলা যাইতে অস্বীকৃতি জানান বলিয়া আমি মিথ্যাই লেঃ রহমানের নাম উল্লেখ করিয়াছি, একথা ঠিক নহে। আলী রেজা বাসাভাড়া করিয়া ঢাকা থাকিতেন। আলী রেজা এবং ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান যে বৈঠকে প্রতিনিধি মনোনীত হন, সেই বৈঠকে তাঁহারাও উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে ভারতের নিকট হইতে ২ লক্ষ টাকা পাওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়। এই বৈঠকে আলী রেজা এবং ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান তাহাদের আগরতলা মিশন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি-না, তাহা আমার মনে নাই। জুন মাসের পরবর্তী এক বৈঠকেই তাহাদের আগরতলা যাওয়ার তারিখ নির্দিষ্ট হয়। এই বৈঠকও গ্রীন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, আলী রেজা, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, জে, ইউ, আহমদ, কর্পোরাল সামাদ এবং আমি ইহাতে যোগ দিয়াছিলাম। জুনের শেষভাগে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আগরতলা যাত্রার তারিখ ঘোষিত হয়,তবে এ বিষয়ে কোন আলোচনা হয় নাই। বৈঠকে সীমান্ত অতিক্রমের পন্থা সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং অস্ত্রশস্ত্রের তালিকাও রেজার হাতে দেওয়া হয়। বৈঠকে যোগদানকারী অন্যান্য সদস্য সীমান্ত অতিক্রম এবং অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা সম্পর্কে কি বলিয়াছিলেন তাহা আমার মনে নাই। এই দুটি বৈঠকের ব্যবধান ছিল ২০ দিনের মত। প্রথম বৈঠকের পর আমি চট্টগ্রাম ফিরিয়া যাই এবং দ্বিতীয় বৈঠকে যোগদানের জন্য আবার ঢাকায় আসি। তবে কোন্ তারিখে আমি ঢাকা ফিরিয়া আসিয়াছিলাম, বৈঠকের দিনেই অথবা উহার পূর্বেই আসিয়াছিলাম কিনা তাহা আমার মনে নাই। প্রতিনিধি মনোনয়নের বৈঠকটি ১৯৬৭ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত হয় নাই। ১৯৬৭ সালের মে মাসে পার্টির কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ সালের মে মাসে গ্রীন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন শীঘ্রই পার্টির ২/৩ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি দল অস্ত্রশস্ত্র আনয়ন এবং আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার জন্য ভারতে পাঠান হইবে

বলিয়া যে কথা বলিয়াছিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে একথা আমি উল্লেখ করিয়াছি কিনা, তাহা আমার মনে নাই (এইভাবে রেকর্ড করা হইয়াছে)। আমি এই বিপ্লবী সংগঠনের একজন সদস্য হই। আমার সাধ্য অনুযায়ী ইহার জন্য সবকিছু করার ব্যাপারে আমি প্রস্তুত ছিলাম। এমনকি পার্টির জন্য আমি জীবন বিসর্জন দিতেও তৈরী ছিলাম। প্রতিনিধিদল সফল হইয়াছে বলিয়া আমাকে জানানো হয়। আমি একথা শুনি নাই এবং কেহ আমাকে বলেও নাই যে, প্রতিনিধিদল ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই। আমার যতদূর মনে হয়, আগরতলা যাত্রার তারিখ যে বৈঠকে নির্দিষ্ট করা হয়, উক্ত বৈঠকে আমি প্রতিনিধিদলের সহিত সীমান্ত পর্যন্ত যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম আগরতলা যাওয়ার পথে অন্যান্য প্রতিনিধি কিভাবে ফেনী পৌঁছিবেন সে বিষয়ে বৈঠকে কোন আলোচনা হইয়াছিল কিনা তাহা আমার মনে নাই। সেসময় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল যে, টেলিফোন কল পাইয়াই আমি ফেনী পৌঁছিব। চট্টগ্রাম হইতে আমি কিভাবে ফেনী পৌঁছিব, বৈঠকে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পি আই এ ষ্টাফ কারে আমি ফেনী পৌঁছিব বলিয়া ঠিক হয়। এই মর্মে আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আমি রাত্রেই যাইব এবং রাত্রেই ফিরিব। ফেনী এবং বিলোনিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা ছিল, কারণ ফেনী হইয়া এই পথে আমি বহুবার ঢাকা আসিয়াছি। ইহার আগে আমি বিলোনিয়া কখনও যাই নাই। ফেনী হইতে বিলোনিয়া পর্যন্ত রেল লাইন আছে কিনা, তাহা আমি জানি না। ফেনী যাত্রার পূর্বে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের নিকট হইতে টেলিফোন কল পাওয়া সম্পর্কে আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উল্লেখ করিয়াছি কিনা, তাহা আমার মনে নাই।

দৈনিক পাকিস্তান

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

একরারী সাক্ষী মীর্জা রমিজের জেরা অব্যাহত

(স্টাফ রিপোর্টার)

দুই দিন বিরতির পর গতকাল সোমবার "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার" শুনানী শুরু হয়। পাঁচ নম্বর একরারী সাক্ষী জনাব রমিজের জেরা গতকাল অব্যাহত থাকে। এই দিন বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান তাঁর জেরা অব্যাহত রাখেন।

আবদুস সালাম খান

প্র–আপনি মাসিক বেতন পান কত?

উ–১২০০ টাকা।

প্র–আপনার গ্রেফতারের পর কি বেতন কোন সময় বন্ধ করে দেওয়া হয়?
উ–প্রথমে মাস দুয়েক বেতন পাইনি, তবে পরে সেটা দেওয়া হয়েছে।
প্র–আপনি তো ৯ই ডিসেম্বর.... গ্রেফতার হন, তাই না?
উ–হ্যাঁ।
প্র–তার মানে, আপনি জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের বেতন পাননি?
উ–তখন পাইনি, পরে পেয়েছি।
প্র–আপনার বিরুদ্ধে আপনার ডিপার্টমেন্টে কোন কারণ অনুসন্ধান যা আপনার বিরুদ্ধে প্রসিডিংস ড্র করা হয়নি?
উ–না।
প্র–আপনার সার্ভিস বুক আছে?
উ–আমার সম্পর্কে হেড অফিসে ব্যক্তিগত ফাইল আছে।
প্র–এতে কি থাকে?
উ–সার্ভিস রিপোর্ট, ব্যক্তিগত রেকর্ড, গোপনীয় রেকর্ড, মন্তব্য ইত্যাদি থাকে।
প্র–আপনার ছুটির কোন রেকর্ড আছে?
উ–একটি ভিন্ন ফাইলে ছুটির রেকর্ড রাখা হয়।
প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আপনার স্বীকারোক্তি কবে রেকর্ড করা হয়?
উ–১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮।
প্র–বিমান ভ্রমণকালে আপনি কত ভাগ রিবেট পান?
উ–অফিসের কাজে ভ্রমণ করলে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে টিকেট দেওয়া হয় এবং চান্স-প্যাসেঞ্জার অপেক্ষা বেশী অধিকার থাকে।
প্র-যখন অফিসের কাজে ভ্রমণ করেন না তখন?
উ–ব্যক্তিগত কাজে যাতায়াতের সময় শতকরা ৯০ ভাগ রিবেট পাওয়া যায়।
প্র-এসবের তো রেকর্ড থাকে তাই না?
উ–হ্যাঁ, করাচীর সদর দফতরে সব সংরক্ষণ করা হয়। ঢাকা অফিসে কিছু রেকর্ড আছে।
প্র–আপনাকে এখন রেকর্ড আনতে বলা হলে কোথেকে আনবেন?
উ–ঢাকা অফিস থেকে।
প্র–ঢাকা-চট্টগ্রামের মধ্যে যাতায়াতের রেকর্ড কোথায় আছে?
উ–ঢাকাস্থ এরিয়া ম্যানেজারের সেক্রেটারিয়েটে পাওয়া যাবে।
প্র–আপনি বলেছেন যে, ১৯৬৭ সালের মে মাসে দলের অর্ধ ডজনের বেশী সংখ্যক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আপনি তো বেশীর ভাগ সময়ে এই বৈঠকের জন্য বিমানে আগমন করেছেন?
উ–বিমানেও এসেছি আবার মোটরেও এসেছি।

প্র–মোটরে আগমন করলে চার জায়গায় মোটরের নম্বর রেকর্ড করা হয়, তাই না?
উ–না, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসতে হলে দু'বার নম্বর রেকর্ড করতে হয়। প্রথমঃ চট্টগ্রাম-ফেনী রোডের উপর, দ্বিতীয়বার দাউদকান্দি ফেরীর কাছে।
প্র–ফেরার সময়েও আবার এইসব জায়গায় নম্বর রেকর্ড করতে হবে তো?
উ–হ্যাঁ।
প্র–অর্থাৎ আপনি বিমানেই আসুন অথবা মোটরেই আসুন, তার রেকর্ড রয়েছে তাই না?
উ–হ্যাঁ। তবে আমি যদি কোন বন্ধুর নতুন আনরেজিস্টার্ড মোটরে ঢাকা আসি তবে সেক্ষেত্রে গাড়ীর নম্বরের বদলে "অন টেস্ট" লেখা রয়েছে। কোন নম্বর লেখা হয়নি।
প্রশ্ন– নতুন মোটরের জন্য একটা গ্যারেজ নম্বর থাকে তো?
উ–থাকলেও আমি তা ব্যবহার করিনি।
প্র–আপনি ঢাকা আসার সময় কি?
প্র–আপনি ঢাকা আসার সময় ছুটি নিয়ে আসতেন? চট্টগ্রাম ত্যাগ করার সময় অফিসের অনুমতি নিতেন কি?
উ–কখনও টেলিফোনে আবার কখনও টেলিপ্রিন্টারে খবর দিয়ে অনুমতি চেয়ে নিতাম। এরিয়া ম্যানেজারকে বলেই আসতাম,তার সব রেকর্ড রয়েছে।
প্র–আপনি তো আদালতে বলেছেন যে, ১৯৬৭ সালের মে মাসে অর্ধ ডজনের বেশী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপনার স্বীকারোক্তিতে দেখা যায় আপনি বলেছেন, ১৯৬৭ সালের জুন মাসে অর্ধ ডজনের বেশী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোনটি সত্য?
উ–হ্যাঁ। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যা বলছি তাও সত্য আবার আদালতে যা বলেছি সেটাও সত্য।
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছেন যে, জুন মাসের অর্ধ ডজন বৈঠক ১৩, গ্রীন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হয়েছে?
উ–আমার মনে নেই (রেকর্ড করা হয়নি)।
প্র–এইসব বৈঠকে যোগদানের জন্য মিঃ মোয়াজ্জমও কি ছুটি নিয়েছিলেন?
উ–আমি জানি না।
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছেন যে, লেঃ মোয়াজ্জম ১৯৬৭ সালের মে মাসে ১৩, গ্রীন স্কোয়ারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্টি মিটিং আহ্বান করেন?
উ–আমার মনে নেই। (অনুরূপ লিপিবদ্ধ আছে)।
প্র–আপনি বলেছেন, ক্যাপ্টেন মোতালিব হাসপাতালে ছিলেন। তিনি কতদিন ও কবে হাসপাতালে ছিলেন?

উ–সম্ভবতঃ মার্চ মাসের শেষে অথবা এপ্রিল মাসের প্রথমে তিনি ... এবং এপ্রিল মাসে কুমিল্লার সামরিক হাসপাতালে ভর্তি হন।
প্র–আমার মনে হয়, ক্যাপ্টেন মোতালিব ঢাকার সামরিক হাসপাতালে ৩১শে মে পর্যন্ত ছিলেন?
উ–আমি ঠিক বলতে পারবো না।
প্র–আপনি বলেছেন যে, ১৩, গ্রীন স্কোয়ারে ১৯৬৭ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্টি মিটিং-এ এল এস সুলতানউদ্দীন উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুলতানউদ্দীন ১৯৬৭ সালের জুন মাসে করাচীতে ছিলেন, তা জানেন কি?
উ–না, আমার জানা নেই।
প্র–আমার মনে হয়, সুলতানউদ্দীন ১৯৬৭ সালের পুরো জুন মাস করাচীর হাসপাতালে ছিলেন।
উ–আমার মনে নেই।
প্র–মে ও জুন মাসে (১৯৬৭) যেসব বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার একটা মোটামুটি তারিখ দিতে পারেন?
উ–না, পারবো না।
প্র–১৯৬৭ সালের মে-জুন মাসে ২/৩ দিনের ব্যবধানে বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত হয় কি?
উ–মে মাসে একাধিক বৈঠক পরপর অনুষ্ঠিত হয়েছে; আবার কখনও কখনও সাত থেকে ১০ দিনের ব্যবধানেও অনুষ্ঠিত হয়েছে।
প্র–জনাব লুতফুল হুদা কি আপনার বন্ধু?
উ–হ্যাঁ।
প্র–কতদিন থেকে আপনি তাকে চেনেন?
উ–১৯৬৬ সাল থেকে।
প্র–তিনি কি ব্যবসায়ী?
উ–হ্যাঁ।
প্র–কি ধরনের ব্যবসা করতেন তিনি?
এই প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী বলেন যে, ইনডেনটিং করত। (পরে ইনডেনটিং বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে বললে সাক্ষী তা ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হন)। এরপর বলেন যে, তিনি নিজে তাকে পিআইএ'র কিছু কিছু কাজ দিয়েছিলেন। দালান মেরামত, পালিশ করা ও ফার্নিচার সংক্রান্ত কন্ট্রাক্ট কাজ দেওয়া হয়েছিল।
প্র–জনাব হুদার কি কোন অফিস আছে চট্টগ্রামে?
উ–আমার জানা নেই।

প্র–তিনি ব্যবসায়ে কত টাকার পুঁজি বিনিয়োগ করেছেন জানেন কি?
উ–না।
প্র–আপনি আপনার বন্ধুকে কত টাকার কাজ দিয়েছিলেন?
উ–কাজের ধরন অনুযায়ী কোন কোন বিল ২০০ টাকা অথবা ৭০০ পর্যন্ত হয়েছে।
প্র–কাজ দেওয়ার সময় কি টেন্ডার আহ্বান করা হত?
উ–সব কাজের জন্য কোটেশন গ্রহণ করা হত।
প্র–পিআইএ থেকে মোট কত টাকার বিল গ্রহণ করেছেন?
প্র–আমার মনে নেই।
প্র–হাজার দুয়েক হবে কি?
উ–আমি ঠিক বলতে পারি না।
প্র–কোন বছরে এসব কাজ দেওয়া হয়?
উ–১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে।
প্র–আপনি কি জানেন, লুতফুল হুদার নামে চট্টগ্রামে প্রতারণার অভিযোগে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে?
উ–আমার জানা নেই।
প্র–লুতফুল হুদার ব্যবসার সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত কোন সম্পর্ক ছিল কি?
উ–না।
প্র–চট্টগ্রামে পিআইএ'র ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার থাকা ছাড়া আপনি কি অন্য কোন ব্যবসা করতেন?
উ–না।
প্র–আপনার কি ঢাকায় চালু একটি বা দুটি ট্রাকের ব্যবসা আছে?
উ–না।
প্র–পিআইএ-তে আনোয়ার হোসেন কি পদে চাকুরী করেন?
উ–টেলিফোন অপারেটার।
প্র–চট্টগ্রামে কি আনোয়ার হোসেনকে পিআইএ কোয়ার্টার দিয়েছেন?
উ–না।
প্র–তার মাইনে ছিল কত?
উ–প্রায় ৪০০ টাকা। এ্যালাউন্স সমেত।
প্র–আনোয়ার হোসেন চট্টগ্রামে কোথায় থাকতো?
উ–ঢাকা ট্রাঙ্ক রোডের ওপরে একটি বাড়ীতে সে থাকতো। আমি রাস্তার ওপর থেকে সেই বাড়ীটা দেখেছি।
প্র–তার সঙ্গে আপনার সরাসরি কি ধরনের যোগাযোগ ছিল? ক'জন টেলিফোন অপারেটর ছিল চট্টগ্রামে?
উ–পাঁচজন।

প্র–আপনার সঙ্গে তার সরাসরি কোন যোগাযোগ ছিল কি?
উ–আনোয়ার হোসেন পিআইএ'র চট্টগ্রাম কর্মচারী ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী ছিল এবং সেই সুবাদে তাকে আমি চিনতাম।
প্র–এখন আনোয়ার হোসেন কোথায়?
উ–জানি না।
প্র–আপনি কি জানেন যে, আনোয়ার হোসেন একজন সাক্ষী ?
উ–হ্যাঁ। তাই বলা হয়েছে আমাকে।
প্র–আনোয়ার হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে কি?
উ–আমার জানা নেই।
প্র–চট্টগ্রামে পিআইএ-এর অফিসে ক'টা গাড়ী আছে?
উ–অফিসারদের জন্য ৩টি স্টাফ কার আর কর্মচারীদের ৬/৭টি মাইক্রোবাস। এর মধ্যে একটা স্টাফ কার আমার হেফাজতে থাকতো।
প্র–এই গাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ ও পেট্রোল কেনার যাবতীয় খরচ পিআইএ দিতো?
উ–হ্যাঁ।
প্র–তাহলে কোথায় যেতেন, বিশেষ করে চট্টগ্রামের বাইরে গেলে সেটা কি লগবুকে লেখা থাকতো?
উ–হ্যাঁ। চট্টগ্রামের বাইরে গেলে কোথায় যাচ্ছি, তা লেখা থাকতো।
প্র–অফিসারদের মোটর কারা চালাতো? অফিসাররা না, ড্রাইভার ?
উ–আমার একজন ড্রাইভার ছিল। অন্য দু'জন অফিসার নিজেরাই চালাতেন।
প্র–জুন-জুলাই (১৯৬৭) সালে কে আপনার ড্রাইভার ছিল?
উ–আমার মনে নেই। তবে, আলী আহমদ কিছুদিন আমার ড্রাইভার ছিল।
প্র–আলী আহমদ ঢাকায় আপনার গৃহভৃত্য ছিল, তাই না?
উ–যখন আমি বিমান বাহিনীতে ছিলাম, সেসময় সে আমার গৃহভৃত্য ছিল।
প্র–আপনি যখন তেজগাঁও থেকে ঢাকার ফ্ল্যাটে চলে যান, তখনও কি আলী আহমদ আপনার ভৃত্য ছিল?
উ–হ্যাঁ।
প্র-মোহাম্মদপুরের ফ্ল্যাটটা কি তিনতলা বাড়ীতে?
উ–হ্যাঁ।
প্র–কতগুলো ফ্ল্যাট আছে সেই বাড়ীতে?
এর উত্তরে সাক্ষী প্রথমে বারটা বলেন। পরে কৌসুলী বাড়ীতে ১৮টা ফ্ল্যাট থাকার কথা বললে সাক্ষী তা স্বীকার করেন।
প্র–আপনি বাড়ীর কোনদিকের সিঁড়ি ব্যবহার করতেন?
উ–আমার ফ্ল্যাটটা একতলায় ছিল, কাজেই সিঁড়ি ব্যবহার করতে হত না।

প্র–যে সময়ে ফ্ল্যাটটা আপনার অধিকারে ছিল, সেই সময়ে আপনার উভয় দিকের সংলগ্ন ফ্ল্যাটের প্রতিবেশী কারা ছিলেন?
উ–আমি তাঁদের দেখেছি কিন্তু তাঁদের নাম জানিনে।
প্র–তাদের সঙ্গে আলাপ করেননি কেন? তারা কি নীচু র‍্যাঙ্কের লোক?
উ– তা আমি বলতে পারি না। কারণ আমি কখনও তাঁদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর করিনি।
প্র–ওয়াপদার জনৈক ডেপুটি ডিরেক্টর আপনার বাড়ীর অন্য ফ্ল্যাটে থাকতেন তা জানেন কি?
উ–দোতলায় একজন ওয়াপদার অফিসার থাকতেন জানি।
প্র–প্রাদেশিক পরিষদের প্রাইভেট এসিস্ট্যান্ট একটা ফ্ল্যাটে থাকতেন কি?
উ–হ্যাঁ।
প্র–সাংবাদিকরা থাকতেন কি সেখানে?
উ–হ্যাঁ, কয়েকজন সাংবাদিকও থাকতেন সেখানে।
প্র–আপনার ফ্ল্যাটে পার্টির কতগুলি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়?
উ–এক ডজনেরও বেশী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
প্র–এই সময়ে ১৩, গ্রীন স্কোয়ার ব্যতীত অন্য কোন বাড়ী দলের কাজের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়েছিল কি?
উ–আমার জানা নেই।
প্র–আপনার ফ্ল্যাটে অনুষ্ঠিত বৈঠকসমূহের মধ্যে আপনি তো একটা কক্ষে সব বৈঠকেই যোগদান করেন তাই না?
উ–না, একাধিক বৈঠকে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি।
প্র–আপনি আহমদ ফজলুর রহমানকে চেনেন?
উ–নাম শুনেছি।
প্র–তাঁর যে ধানমণ্ডিতে একটা বাড়ী আছে, তা জানেন?
উ–শুনেছি।
প্র–জনাব রুহুল কুদ্দুসেরও একটা বাড়ী আছে ঢাকায় জানেন?
উ–জানি না।
প্র–লেঃ মোয়াজ্জেমের পিতা ঢাকায় সিদ্ধেশ্বরীতে তাঁর নিজের বাড়ীতে থাকতেন তা জানেন কি?
উ–জানি না।
প্র–আপনার মোহাম্মদপুরের ফ্ল্যাটটা তো পরে বাতিল করে দেওয়া হয়?
উ–হ্যাঁ।
প্র–কখন?
উ–১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে।

প্র–আপনার ফ্ল্যাটের এ্যালটমেন্ট বাতিলের কথা কি আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছেন?
উ–না।
প্র–পুলিশের কাছে প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেছেন কি?
উ– মনে নেই (রেকর্ড করা নেই)।
প্র–আপনার অবর্তমানে এই ফ্ল্যাটে কে থাকতেন?
উ–আমি যখন ঢাকায় থাকতাম তখন নিজেই থাকতাম। অন্য সময় আমার এক আত্মীয় থাকতেন।
প্র–কে তিনি?
উ–নাম মোঃ এহিয়া।
প্র–পরিবারসহ তিনি থাকতেন কি?
উ–তিনি বিয়ে করার পর পরিবারসহ থাকতেন। পার্টির বৈঠকগুলির পরে তিনি বিবাহ করেন।
(আবার বলেন, বৈঠকগুলির আগে কি পরে বিয়ে হয়েছিল তার মনে নেই)
প্র–তার বাড়ী কোথায়? কি করেন তিনি?
উ–বাড়ী কুমিল্লা জেলায়। তিনি বর্মা ইস্টার্ন-এ কাজ করতেন।
প্র–একথা কি সত্য যে, আপনার ফ্ল্যাটে গুণ্ডাপাণ্ডা ধরনের লোকেরা থাকতো এবং নৈতিকতাবিরোধী কাজকর্ম করতো, সেজন্যই প্রতিবেশীরা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন?
উ–একথা সত্য নয়।
প্র–আপনি আদালতে বলেছিলেন যে, ক্যাপ্টেন মোতালিব ও তাঁর পিতা আপনার বাসায় ছিলেন কিছুদিন–একথা কি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়েছিলেন?
উ–মনে নেই (রেকর্ড করা নেই)।
প্র–পুলিশকে জানিয়েছিলেন?
উ–আমার মনে নেই (রেকর্ড করা নেই)।
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছেন যে, স্টুয়ার্ড মুজিব আপনার ফ্ল্যাটে ছিলেন কিছুদিন?
উ–মনে নেই (রেকর্ড করা নেই)।
প্র–পুলিশের কাছে জানিয়েছিলেন কি?
উ–মনে নেই (রেকর্ড করা নেই)।
প্র–আগরতলার প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে আলী রেজাকে মনোনীত করার আগে কি আপনি কখনও তাকে দেখেছেন?
উ–একবার, ১৩, গ্রীন স্কোয়ারের বৈঠকে তাকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

প্র–এই বৈঠকেই কি স্টুয়ার্ড মুজিবের নামও মনোনীত হয়?
উ–হ্যাঁ।
প্র–জানেন কি স্টুয়ার্ড মুজিব নেভীতে কাজ করতেন?
উ–ন্যাভাল অফিসার্স মেসে কাজ করতেন।
প্র–কি ধরনের কাজ?
উ–আমি জানি না।
প্র–বিমান বাহিনীতে কি স্টুয়ার্ড রয়েছে? তারা কি করে?
উ-খাবার পরিবেশন করে।
প্র–স্টুয়ার্ড মুজিবের শিক্ষাগত যোগ্যতা কি জানেন?
উ–না।
প্র-তাঁকে আগরতলা প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে মনোনীত করার আগে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে কোন অনুসন্ধান করেননি?
উ–না।
প্র–কেন স্টুয়ার্ড মুজিবকে নির্বাচন করা হয়েছে? অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান কতটুকু সে সম্বন্ধে আপনারা বৈঠকে আলোচনা করেছিলেন?
উ–হ্যাঁ, বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। স্টুয়ার্ড মুজিবের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ছিল।
প্র–এই প্রতিষ্ঠানে তো অনেক ক্যাপ্টেন, লেফটেন্যান্ট, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার প্রভৃতি রয়েছেন,তাই না?
উ–হ্যাঁ।
প্র– তাঁদের চাকুরীর জন্যেই অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হয়?
উ–হ্যাঁ।
প্র–আপনি কি স্টুয়ার্ড মুজিবকে অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে কোন ট্রেনিং দিয়েছেন?
উ–না, আমি কোন ট্রেনিং দেইনি।
প্র–অন্য কেউ কোন ক্যাপ্টেন তাঁকে কি কোন সময়ে ট্রেনিং দিয়েছেন?
উ–আমার জানা নেই।
প্র–আলী রেজা কি কোন সময়ে সামরিক বাহিনীতে ছিলেন?
উ–আমি যতদূর জানি, তিনি কখনও সামরিক বাহিনীতে ছিলেন না।
প্র–বৈঠকে উপস্থিত কোন ক্যাপ্টেন বা লেফটেন্যান্ট আগরতলা যেতে স্বীকৃত হলেন না?
উ–কোন ক্যাপ্টেন সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না।
প্র–এ ব্যাপারে কোন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি?
উ–হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন মোতালিবকে আসার জন্য টেলিগ্রাম করা হয়েছিল; কিন্তু তিনি আসেননি।

প্র–আপনার জানা মতে, একথা কি কখনো আলোচনা করা হয়েছিল যে, একজন ক্যাপ্টেনকে প্রেরণ করা উচিত?
উ–না। কেবলমাত্র ক্যাপ্টেন মোতালিব ও লেঃ এম এম রহমানের নাম আলোচনা করা হয়েছে। ক্যাপ্টেন মোতালিব বৈঠকে আসেননি আর লেঃ রহমান বৈঠকে যোগ দিলেও আগরতলা যেতে অস্বীকার করেন।
অপর এক প্রশ্নের জওয়াবে সাক্ষী জানান যে, ক্যাপ্টেন মোতালিবকে যাতে আগরতলা প্রেরণের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে করা যায়, সেজন্যই তাঁকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল।
প্র–আপনি নিশ্চয় স্টুয়ার্ড মুজিবের চেয়ে ভালো ইংরেজী জানেন?
উ–আমার তাই মনে হয়।
প্র–স্টুয়ার্ড মুজিব ম্যাট্রিকও পাস করেনি?
উ–জানি না।
প্র–আপনি কি স্টুয়ার্ড মুজিবের চেয়ে ভালো উর্দু বলতে পারেন?
উ–আমি উর্দু কিছু বলতে পারি তবে স্টুয়ার্ড মুজিবের চেয়ে ভালো কিনা বলতে পারি না।
প্র–কোন বৈঠকে আগরতলার প্রতিনিধিদের সদস্য নির্বাচন করা হয়?
উ–১৯৬৭ সালের জুন মাসে।
প্র–কোন সময়ে এই বৈঠকটা অনুষ্ঠিত হয়?
উ–জুন মাসের শেষদিকে।
প্র–কিন্তু অন্যেরা কেন আগরতলা যেতে অস্বীকার করেন?
উ–সীমান্ত পার হওয়ার সময় যদি কোন বিপদ ঘটে সেজন্য। লেঃ মোয়াজ্জম সদস্যদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দানের প্রতিশ্রুতি দেন।
সাক্ষী প্রথমে বলেন, এই টাকা আগরতলায় ভারতীয়দের দেবার কথা ছিল। আবার পরে বলেন, ভারত দেবে ২ লাখ টাকা। লেঃ মোয়াজ্জম এখানে ক্ষতিপূণের টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু পরে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় তাঁরা কেউ যেতে স্বীকৃত হয় না। সেজন্য আমিও যেতে অস্বীকার করি।
কৌসুলীর অপর এক প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বলেন যে, লেঃ রহমান না যাওয়ার জন্য কি কারণ দেখিয়েছেন, তা তিনি জানেন না। সুলতানুদ্দিন এই সিকিউরিটির টাকার জন্যই যেতে অস্বীকার করে।
প্র–বৈঠকে কি আলোচনা হয় যে, জালালউদ্দিন আহমদ সীমান্ত পার অভিযানের তদারক করবে এবং প্রয়োজনবোধে সীমান্ত প্রহরীদের উৎকোচ প্রদান করবে?
উ–হ্যাঁ।

প্র–আমার মনে হয়, আজ আপনি বানোয়াট গল্প বলছেন এবং তার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য লেঃ রহমানের নাম জড়িয়েছেন এবং বলছেন যে, তিনি আগরতলা যেতে অস্বীকার করেন।
উ–না, একথা সত্য নয়।

বিরতির পর

সাময়িক বিরতির পর গতকাল মামলার শুনানী পুনরায় শুরু হলে আগরতলা মামলার ৪নং একরারী সাক্ষী ডাঃ সাইদুর রহমানের প্রদত্ত সাক্ষ্যের সামান্য সংশোধনী গৃহীত হয় এবং তিনি সাক্ষ্যে দস্তখত করেন।
এরপর বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা পুনরায় শুরু হয়।
প্র–আলী রেজা কোথায় থাকতেন?
উ–তিনি ঢাকায় একটি ভাড়াটে বাড়ীতে থাকতেন।
প্র–আগরতলা প্রেরণের জন্যে প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পর্কিত আন্দোলনের বৈঠকে কি আলী রেজা ও স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান উপস্থিত ছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ। সে বৈঠকে তাঁরা দু'জনেই উপস্থিত ছিলেন।
প্র–সে বৈঠকে ভারতের প্রতিশ্রুত ২ লাখ টাকা সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়েছিল কি?
উ–জী হ্যাঁ। হয়েছিল।
প্র–বৈঠকে আলী রেজা আর স্টুয়ার্ড মুজিব তাদের আগরতলা যাওয়ার প্রশ্নে কি কোন আলোচনা করেছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–আগরতলা যাওয়ার তারিখ কোথায় ঠিক করা হয়েছিল?
উ–প্রতিনিধি নির্বাচনের পর ১৯৬৭ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত দলের পরবর্তী এক বৈঠকে আগরতলা যাওয়ার তারিখ ঠিক করা হয়।
প্র–সে বৈঠক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উ–গ্রীন স্কোয়ারে।
প্র–বৈঠকে কে কে উপস্থিত ছিলেন?
উ–লেঃ মোয়াজ্জম হোসেন, আলী রেজা, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, কর্পোরাল সামাদ ও আমি স্বয়ং।
প্র–জুন মাসের কোন তারিখে সে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উ–জুন মাসের শেষের দিকে।
প্র–সে বৈঠকে কি আগরতলা যাওয়ার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছিল?
উ–জী হ্যাঁ।

প্র–বৈঠকে কি সীমান্ত অতিক্রম করার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছিল?
উ–জী হ্যাঁ। বৈঠকে কিভাবে সীমান্ত অতিক্রম করা হবে তা আলোচনা করা হয়। এছাড়া সে বৈঠকেই লেঃ মোয়াজ্জম হোসেন আলী রেজার হাতে অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা দিয়েছিলেন।
প্র–সে বৈঠকে সীমান্ত অতিক্রম ও অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা নিয়ে অন্য কেউ কি আলোচনা করেছিলেন?
উ–আমার তা মনে নেই।
প্র–প্রতিনিধি নির্বাচন ও তারিখ নির্ধারণের জন্যে অনুষ্ঠিত দুটি বৈঠকের মধ্যে কত দিনের ব্যবধান ছিল?
উ–প্রায় ২০ দিনের ব্যবধানে দুটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
এক প্রশ্নের জবাবে একরারী সাক্ষী মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ বলেন যে, প্রথম বৈঠকের পর তিনি চট্টগ্রাম ফিরে যান এবং দ্বিতীয় বৈঠকে যোগদানের জন্যে পুনরায় ঢাকা আসেন।
প্র–দ্বিতীয় বৈঠকের জন্যে কবে আপনি ঢাকা এসেছিলেন?
উ–ঠিক বৈঠকের দিন না, তার আগে আমি ঢাকা এসেছিলাম, তা আমার স্মরণ নেই।
প্র–আগরতলা যাওয়ার প্রতিনিধি নির্বাচনের বৈঠক কি ১৯৬৭ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উ–জী না।
প্র-মে মাসে কি কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উ–জী হ্যাঁ। মে মাসে আন্দোলনের কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দীতে আপনি কি বলেছিলেন যে, মে মাসের ৭ তারিখে প্রতিনিধি নির্বাচনের লেঃ মোয়াজ্জম অদূর ভবিষ্যতে আন্দোলনের পক্ষ থেকে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে আলোচনার জন্যে আগরতলা যাওয়ার কথা বলেছিলেন?
উ–আমার তা স্মরণ নেই।
প্র–আন্দোলনের জন্যে আপনি কি কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ। আমি আন্দোলনের সদস্য হই এবং এজন্যে অর্থ এমনকি জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলাম।
প্র–প্রতিনিধিদলের সফলতা সম্পর্কে আপনি কি কিছু জেনেছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ। আমি শুনেছি প্রতিনিধিদল সফল হয়েছে।
প্র–আপনি কি শুনেছিলেন যে, প্রতিনিধিদল ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে?
উ–জী না। আমি তা শুনিনি। আর কেউ আমাকে প্রতিনিধিদলের ব্যর্থতা সম্পর্কে বলেননি।

প্র–সে বৈঠকে প্রতিনিধিদদের সীমান্ত অতিক্রম করার ব্যাপারে আপনি কি সাহায্য করতে রাজী হয়েছিলেন?
উ–আমার যদ্দুর মনে পড়ে আমি রাজী হয়েছিলাম।
প্র–আপনারা কিভাবে এবং কোথায় মিলিত হবেন সেটা বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল কি?
উ–আগরতলা যাওয়ার জন্যে প্রতিনিধি দু'জন কি করে ফেনী পৌঁছবেন সেটা বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল কিনা তা আমার স্মরণ নেই। তবে এটা সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে, ফেনী থেকে আমাকে চট্টগ্রাম ট্রাঙ্কল করলে আমি ফেনী এসে পৌঁছব।
প্র–আপনি কিভাবে ফেনী আসবেন তা বৈঠকে ঠিক করা হয়েছিল কি?
উ–জী হ্যাঁ। বৈঠকে ঠিক করা হয়েছিল যে, আমি পিআইএ-র স্টাফ কারে আসবো।
প্র–আপনার আসার সময় নির্ধারিত ছিল কি?
উ–জী হ্যাঁ। আমার রাত্রে আসার কথা সভায় ঠিক হয়েছিল।
প্র–ফেনী ও বিলনিয়া সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে কি ?
উ- জী হ্যাঁ । ফেনী ও বিলনিয়া এলাকা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা আছে। কারণ বহুদিন ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডে আমি যাতায়াত করেছি।
প্র–প্রতিনিধিদের বিলনিয়া সীমান্তে নেওয়ার আগে আপনি কখনও বিলনিয়া গিয়েছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-ফেনী থেকে বিলনিয়া পর্যন্ত কোন রেল লাইন আছে কি?
উ-আমি তা জানি না ।
প্র-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দীতে আপনি কি বলেছিলেন যে, ফেনী রওয়ানা হওয়ার আগে লেঃ মোয়াজ্জম অথবা স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান আপনাকে টেলিফোন করেছিলেন?
উ–জী না। তা আমার স্মরণ নাই। (তা রেকর্ড আছে)।
প্র–এরপর আপনাকে কি হোটেলের বিল পরিশোধের রশীদ দেখানো হয়েছিল?
উ–জী না।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি সংশ্লিষ্ট দিনে বিকেল ৩টায় ট্রাঙ্কল পান এবং এর অল্প কিছুক্ষণ পরেই চট্টগ্রাম থেকে ফেনী রওয়ানা হন। বিকেল ছ'টায় তিনি ফেনী পৌঁছেন।
প্র–একটা ডজ গাড়ী ঘণ্টায় ক'মাইল চলে?
উ–৫০ থেকে ৬০ মাইল।

প্র–চট্টগ্রাম থেকে ফেনীর দূরত্ব কত?
উ–প্রায় ৬৫ মাইল।
প্র–এটা কি সত্য যে, সেদিন বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত আপনি কোন ট্রাঙ্কল পাননি?
উ–এ কথা সত্য নয়।
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, ১৯৬৭ সালের ১২ই জুলাই সকাল ২টা থেকে ৪টার মধ্যে আপনি প্রতিনিধিদের সীমান্ত অতিক্রম করে দিয়েছিলেন?
উ–তা আমার স্মরণ নেই।
(রেকর্ডে তা আছে)।
প্র–ফেনী এসে আপনি কোথায় উঠেছিলেন?
উ–দিনফা হোটেল।
প্র–এই হোটেলটি কি ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডের পার্শ্বে অবস্থিত?
উ–তা আমার জানা নেই।
প্র–এই হোটেলটির আশেপাশে অন্য কোন হোটেল, দোকান বা আবাসিক বাড়ীঘর আছে?
উ–তা আমার স্মরণ নেই।
প্র–এই হোটেলে কি থাকার কামরা আছে?
উ–জী হ্যাঁ। দু'তিনটি থাকার কামরা আছে।
প্র–হোটেলটি কি টিনের ঘর?
উ–জী না। দিনফা হোটেল পাকা।
প্র–চট্টগ্রাম ফেরার পথে আপনি কি শুভপুর পুলে টোল দিয়েছিলেন?
উ–জী না। টোল না দিয়ে পারা যায় কিনা আমি তা পরীক্ষা করেছিলাম।
প্র–শুভপুর পুলে কি আড়াআড়িভাবে বাঁশ দিয়ে গাড়ী আটকিয়ে টোল আদায় করা হয়?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–চট্টগ্রাম থেকে ফেনী আসার আগে আপনি কি দলের প্রথম সারির বা অন্য যে কোন সদস্যের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন?
উ– জী, না। এছাড়া এর আগেও দলের কারও সাথে যোগাযোগ করিনি।
প্র–বিলনিয়া কি পাকিস্তান?
উ-জী, হ্যাঁ।
প্র–বিলনিয়া কোথায় অবস্থিত?
উ–ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডের উপর বিলনিয়া অবস্থিত।

প্র–পঁচিশ হাজার টাকা আপনি ক'মাসে খরচ করেছিলেন?
উ–১৯৬৭ সালের মার্চ থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত চার থেকে ছয় মাসের মধ্যে।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের এক প্রশ্নের জবাবে একরারী সাক্ষী বলেন যে, উক্ত পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে ছয় হাজার টাকা তিনি ইন্টারকন্টিনেন্টালে তার থাকার বিল পরিশোধ করেছেন। ১৯৬৭ সালের মে অথবা জুন মাসে তিনি ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের দশতলায় একটি রুমে ছিলেন। পিআইএ'র কর্মচারী হিসাবে তিনি হোটেল ভাড়ার শতকরা ৫০ ভাগ কনসেশন পেতেন। ফলে তাঁকে মাত্র দৈনিক ৩৫ টাকা হোটেল ভাড়া দিতে হয়েছিল। খোরাকী এর অন্তর্ভুক্ত নয়।
প্র–ইন্টারকন্টিনেন্টাল ও সাহবাগ হোটেলে আপনি কি টাকা দেনা আছেন?
উ–জী না।
প্র–ইন্টারকন্টিনেন্টালে কত দিনে আপনার কত টাকা খরচ হয়েছিল?
উ–তিন দিনে খোরাকীসহ দু'তিনশ' টাকা খরচ হয়েছিল।
প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দীতে আপনি কি বলেছিলেন যে, আপনি প্রায় ছয় হাজার তিনশ' টাকা খরচ করেছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ, বলেছিলাম।
প্র–ছ'হাজার টাকা থেকে আপনি আর কোন কাজে খরচ করেছিলেন?
উ–এই টাকা থেকে আমি বন্ধুদের (যারা এখন ডকে আছেন) ইন্টারকন্টিনেন্টাল ও সলিমার হোটেলে আপ্যায়ন করেছি।
প্র–এই ৬ হাজার টাকা থেকে আর অন্য কোন খরচের কথা আপনার স্মরণ আছে কি?
উ–জী না।
প্র–আপনি নিজে কি ২৫ হাজার টাকার জন্যে লেঃ মোয়াজ্জমের নিকট গিয়েছিলেন?
উ–না।
প্র–লেঃ মোয়াজ্জম আপনাকে ২৫ হাজার টাকা দিয়েছেন এটা কি আপনার দলের বন্ধুরা জানতেন?
উ–জী হ্যাঁ। টাকা দেওয়ার পরে সবাই জেনেছেন।
এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তাঁর থেকে পঁচিশ হাজার টাকার হিসাব নেওয়ার জন্যে দলের কোন বৈঠক হয়নি। এছাড়া দলের কাজে এই টাকা কিভাবে ব্যয় হয়েছে সে সম্পর্কেও তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করেনি।
প্র–দলের কোন বৈঠকে এই টাকা খরচের বিষয় আলোচনা হয়েছিল কি?
উ–জী না।

প্র–১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে লেঃ মোয়াজ্জমের নিকট কত টাকা ছিল আপনি জানেন কি?
উ–এ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন। তবে কত টাকার কথা বলেছিলেন তা আমার স্মরণ নেই। এই সময়ে তিনি আমাকে তাঁর আয়ের উপায় সম্পর্কেও বলেছিলেন।
প্র–লেঃ মোয়াজ্জম কত টাকা খরচ করেছিলেন আপনি কি তা জিজ্ঞেস করেছিলেন?
উ–জী না। এছাড়া তিনিও আমাকে তা বলেননি।
প্র–টাকা খরচের হিসাব নিকাসের জন্যে দলের মধ্যে কোন ক্ষুদ্র কমিটি ছিল কি?
উ–জী না।
প্র–লেঃ মোয়াজ্জম কত টাকা নিয়েছেন এবং কত টাকা খরচ করেছিলেন সে সম্পর্কে দলের কোন বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছিল কি?
উ–জী না।
প্র–১৯৬৭ সালের ১২ই জুলাই কতদিন পর আপনি লেঃ মোয়াজ্জমকে দু'লাখ টাকা ভারত থেকে পেয়েছে কিনা সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন?
উ–প্রায় এক সপ্তাহ পরে।
প্র–কোথায় জিজ্ঞেস করেছিলেন?
উ–১৩, গ্রীন স্কোয়ারে।
প্র-তিনি কি বলেছিলেন?
উ–তিনি বলেছিলেন যে,তিনি কোন টাকা পাননি।
প্র–আন্দোলন থেকে কখন সম্পর্ক ছিন্ন করলেন?
উ–১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে।
প্র–কোন সময় পর্যন্ত আপনি আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন?
উ–আমার গ্রেফতার হওয়ার আগ পর্যন্ত।
প্র–সেসময়ে কি লেঃ মোয়াজ্জম আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–১৯৬৭ সালের জুলাই মাসের পর আপনি ঢাকায় দলের কোন বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন কি?
উ–না।
প্র– দলের কোন বৈঠকে ভারত থেকে পাওয়া দু' লাখ টাকা সম্পর্কে আলোচনা করার কোন ইচ্ছা আপনার মনে ছিল কি?
উ–হ্যাঁ, ছিল।
প্র–১৯৬৭ সালের জুলাইর পর এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য দলের কোন বৈঠক হয়েছিল কি?
উ–জী না।

প্র–লেঃ মোয়াজ্জমের সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার পর আপনি তার সাথে আর আন্দোলন সম্পর্কে কথা বলেছিলেন কি?
উ–জী না।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেমের সাথে সম্পর্ক তিক্ত হওয়ার পরই তিনি আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন–একথা তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন কি না তাঁর স্মরণ নেই। (জবানবন্দীতে তা আছে।)
প্র–১৯৬৭ সালের জুলাই মাসের পর আপনি দলের কাজ করেছিলেন কি?
উ–জী হ্যাঁ। আমি দলের কাজ করেছি এবং এর জন্যে টাকাও ব্যয় করেছি। তবে দলের জন্যে কোন অর্থ সংগ্রহ করিনি।
প্র–আপনি কি আন্দোলনের ব্যাপারে বিমানবাহিনীর চাকুরীরত অথবা প্রাক্তন কর্মচারীর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন?
উ–জী না।
প্র–আপনি ব্যক্তিগতভাবে পঁচিশ হাজার টাকার খরচের হিসাব রেখেছিলেন?
উ–জী না।
প্র–কর্নেল শেখ কে ছিলেন?
উ–আমি জানি না। তবে তিনি বাংলা ভাষাভাষী এক ভদ্রলোক। তিনি উর্দু ভাষাও জানেন। তিনি এখন কোথায় আছেন আমি জানি না।

এখানেই গতকাল জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা অসমাপ্ত থাকে। আজ পুনরায় তাঁর অসমাপ্ত জেরা শুরু হবে।

সংবাদ

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

৩য় দিবসেও রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজের জেরা অব্যাহত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

জেরার তৃতীয় দিবসে 'ষড়যন্ত্র মামলা'র রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজউদ্দিন বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি জনাব আবদুস সালাম খানের এক প্রশ্নের উত্তরে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের নিকট বলেন যে,পাকিস্তানের সবুজ ও সাদা রং বিশিষ্ট জাতীয় পতাকার সাদা অংশটি হইতেছে সংখ্যালঘুদের প্রতীক এবং সবুজ হইতেছে রাষ্ট্রের প্রতীক।

সাক্ষী অপর এক প্রশ্নের জবাবে কথিত সভায় প্রদর্শিত পরিকল্পিত রাষ্ট্রের সোনালী ও সবুজ রঙ্গের পতাকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেম তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, সবুজ পূর্ব পাকিস্তানের সবুজাভ প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতীক এবং সোনালী হইতেছে পাটের প্রতীক।

"রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের" ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের গতকল্যকার অধিবেশনে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব সালাম খান রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজকে পূর্বদিনের জের টানিয়া জেরা অব্যাহত রাখেন। জনাব সালাম খান আজও জেরা করিবেন।

বিচারপতি জনাব এস,এ, রহমান (চেয়ারম্যান), বিচারপতি জনাব এম আর খান ও বিচারপতি জনাব মুকসুমুল হাকিম সমবায়ে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল "ভারতীয় অর্থ ও অস্ত্রের সাহায্যে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে কেন্দ্র হইতে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের" অভিযোগে কতিপয় সামরিক ও বেসামরিক অফিসার এবং রাজনৈতিক নেতাসহ ৩৫ ব্যক্তির বিচার করিতেছেন।

গতকাল ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে 'সংবাদ'-এর পক্ষ হইতে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান 'সংবাদ' সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনালের অভিমত আদালতের কার্যবিবরণীর মধ্যে লিপিবদ্ধ করার আবেদন জানাইলে চেয়ারম্যান জনাব এস, এ-রহমান উহা লিপিবদ্ধ করেন।

জেরার বিবরণ

অতঃপর জনাব সালাম খান রাজসাক্ষী রমিজউদ্দীনকে জেরা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন যে, '৬৬ সালের মে মাসের আগে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এ, বি, খুরশীদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি না। উত্তরে সাক্ষী জানান যে, এপ্রিল মাসে তাঁহারা তাঁহার বাসায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

প্রঃ তাঁরা কি কাজ করতেন?

উঃ দুইজনেই নৌ-বাহিনীর কর্মচারী ছিলেন।

প্রঃ বিমান বাহিনী বা পি, আই, এ'র কোন লোক কি তাঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেয়?

উঃ জ্বী না।

অপর প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী জানান যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও এ, বি, খুরশীদ চট্টগ্রামের নৌ-ঘাঁটিতে নিয়োজিত আছেন ও সেখানে বাস করেন বলিয়া তাঁহাকে জানান।

প্রঃ আপনার অফিস থেকে চট্টগ্রামের নৌ-ঘাঁটি কতদূর?

উঃ প্রায় সাত মাইল হবে। কতিপয় প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ পাকিস্তান বিমান বাহিনী থেকে অব্যাহতি লাভের পর এবং পি, আই, এ-তে যোগদানের আগে ১৯৬২ সালে আমি পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনে যোগ দিই।এই দু'জন লোক যখন আমার ঘরে এসেছিলো তখন আমাকে বলা হয়েছিলো যে, লেঃ মোয়াজ্জেমকেও আমার ঘরে ডাকা হবে। তাঁরা যখন প্রথম আসেন এবং আমার সাথে দেখা করেন তখন ষ্টুয়ার্ড মুজিব ও এ,বি,

খুরশীদ আমাকে এই বিপ্লবী সংগঠনের কথা বলেননি। আমি বিমান বাহিনীর কর্মচারীদের কল্যাণ সংক্রান্ত একটি প্রতিষ্ঠানের কথা শুনেছিলাম; কিন্তু নৌ-বাহিনীর কর্মচারীদের এ ধরনের কোন সংগঠনের কথা আমি শুনিনি। বিমান বাহিনীর কর্মচারীদের কল্যাণ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানটির বিভাগীয় অনুমোদন ছিল।

প্রঃ আপনি কি জানেন যে, সরকারী অথবা বিভাগীয় অনুমোদন ছাড়া সশস্ত্র বাহিনীর কর্মচারীদের কোন কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানই গঠিত হতে পারে না?

উঃ আমি তা জানি না।

প্রঃ আপনি কি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত জবানবন্দীতে বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেম যখন আপনার ঘরে যান তখন তিনি আপনাকে তাঁর সাথে তাঁর ঘরে সাক্ষাৎ করতে বলেছিলেন?

উঃ আমার মনে নেই।

প্রঃ আপনি পুনরায় যখন সাক্ষাৎ করেন তখন লেঃ মোয়াজ্জেম কোথায় থাকতেন?

উঃ নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটিতে।

প্রঃ সেই সময়টি কখন?

উঃ ১৯৬৩ সালের মে মাস।

প্রঃ পূর্ব পাকিস্তানের অর্থ গত ২৭শে আগষ্ট 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীর বিবরণে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন জনাব সালাম খানের আবেদনক্রমে গতকাল আদালতের কার্যবিবরণীতে উহা লিপিবদ্ধ করা হয়।

নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে লেঃ মোয়াজ্জেমের সাথে আলাপ-আলোচনার আগে আপনি অন্য কারো সঙ্গে এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন কি?

উঃ না।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলির জেরার জবাবে সাক্ষী বলেনঃ লেঃ মোয়াজ্জেমের সাথে আলাপ-আলোচনার সময় এমনকি তারো আগে পূর্ব পাকিস্তানে বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে আমার ধারণা লেঃ মোয়াজ্জেমের মতই ছিল। আমার মনে এই ধারণা ছিল যে, পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে এবং একইভাবে চাকুরীর ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানীদের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানীর প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত কম। লেঃ মোয়াজ্জেমের সাথে আমার বৈঠকে কেবলমাত্র এ কথাই আলোচনা হত যে, কোন অনিয়মতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া এই বৈষম্য দূর করা যাবে না, বৈঠকে অন্য কোন বিকল্পপন্থা আলোচিত হয়নি। আমি ইতিমধ্যেই এই লাইনে ভাবতে শুরু করি এবং লেঃ মোয়াজ্জেম যখন আমাকে এ-

সম্পর্কে বলেন তখন আমি তাঁর সাথে একমত হই। লেঃ মোয়াজ্জেমের সাথে প্রথম বৈঠকে এই বিপ্লবী আন্দোলন কিভাবে এর লক্ষ্য অর্জন করবে সে সম্পর্কে কোন বাস্তব পরিকল্পনা বা পদক্ষেপ সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামো কিরূপ হবে প্রথম বৈঠকে তাও আলোচিত হয়নি। লেঃ মোয়াজ্জেমের ঘরে পরবর্তী বৈঠকে সরকারের কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

সাক্ষী বলেনঃ আমার কাছ থেকে কোন প্রশ্ন না পেয়েই লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে এ ধরনের একটি সরকারের কাঠামো ব্যাখ্যা করা কতিপয় দলিল দেখান। আমাকে যে মোটা ফাইলটি দেখানো হয় তাতে সাইক্লোষ্টাইল ও টাইপ করা কাগজপত্র ছিল। যে ডাইরীটি আমাকে দেখানো হয়েছিল তা' হাতের লেখা। এক্সারসাইজ বইটিও ছিল তেমনি। ডাইরীটি বার্ষিক ছিল। ডাইরীটিতে শনিবার ও রবিবারের জন্য এক পৃষ্ঠ এবং বাকী পৃষ্ঠাগুলো প্রত্যেক সপ্তায় একদিন করে ছিল।

প্রঃ ডাইরীটি কোন্ সালের বলতে পারেন?

উঃ আমার মনে নেই।

প্রঃ ডাইরীর কত পাতা লেখা ছিল?

উঃ অর্দ্ধেকের বেশী।

সাক্ষী বলেন যে, ফোল্ডারে প্রায় ৫০টি সাইক্লোষ্টাইল করা ফুলস্ক্যাপ পাতা ছিল। লেখা ছিল ডবল স্পেসে। আমি বৈঠকেই ডাইরী ও ফোল্ডারের কাগজপত্র পড়ে ফেলি; কিন্তু পরে পড়ব বলে কেবল এক্সারসাইজ বইটি সাথে নিয়ে যাই। এক্সারসাইজ বইটির শক্ত মলাট ছিল। বইটি প্রায় আধা ইঞ্চি পুরো ছিল। এর সবটাই লেখা হয়ে গিয়েছিল। ডাইরী, ফোল্ডার অথবা এক্সারসাইজ বুক পড়ে আমি কোন নোট তৈরী করিনি।

প্রঃ ঐ কাগজপত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কাউকে কিছু বলেছিলেন?

উঃ জী হ্যাঁ, আমি কে, এম, শামসুর রহমান সাহেবের সঙ্গে তা নিয়ে আলাপ করেছিলাম।

প্রঃ কিভাবে আলাপ করেছিলেন?

উঃ যতটুকু স্মরণ ছিল তাই বলেছিলাম।

প্রঃ আর কারো সঙ্গে এ সম্পর্কে কথা বলেছিলেন?

উঃ জী না, তিনি ছাড়া আর কারো সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করিনি।

প্রঃ আপনি কি জানেন যে, খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান সি, এস, পি, একজন অতীব মেধাবী ছাত্র ছিলেন?

উঃ জী হ্যাঁ, জানি।

প্রঃ আপনি কি শুনেছেন যে, তিনি সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিসের লিখিত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন?

উঃ জী হ্যাঁ, শুনেছি।

প্রঃ অফিসার হিসেবে তিনি কি খুবই দক্ষ ও মেধাবী বলে পরিচিত ছিলেন?

উঃ হ্যাঁ ছিলেন।

প্রঃ এজন্যে সহকর্মীরা তাঁকে খুব সম্মান করতেন, তা জানেন?

উঃ জী হ্যাঁ, জানি।

প্রঃ লেঃ মোয়াজ্জেমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কিভাবে হলো?

আপনি কি লেঃ মোয়াজ্জেমের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে বলেছিলেন?

উঃ আমি শামসুর রহমান সাহেবকে বলি যে, এ বিষয়ে আরও আলাপ-আলোচনার জন্য তাঁর সঙ্গে লেঃ মোয়াজ্জেমের পরিচয় করিয়ে দেব।

কৌঁসুলির অন্যান্য প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী আরও বলেনঃ "খান মোহাম্মদ শামসুর রহমানও ওই সময় চট্টগ্রামে থাকতেন। ১৯৬৬-এর জুলাইয়ের দিকে একসময় আমি লেঃ মোয়াজ্জেমকে শামসুর রহমান সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। আমার ঘরেই সে সাক্ষাৎ হয়। জনাব শামসুর রহমান লেঃ মোয়াজ্জেমের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ধরন কেমন হবে তা' নিয়ে আলোচনা করেন। বিপ্লবী দলের সব লক্ষ্য সম্পর্কেই সেখানে কথাবার্তা হয়। জনাব শামসুর রহমান সি এস পি'র সহিত লেঃ মোয়াজ্জেমের এই কথিত সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি রাজসাক্ষীকে তখন জিজ্ঞাসা করেন যে, ১৯৬৬ সালের জুলাইয়ে তাঁর ঘরে অনুষ্ঠিত এই সভার কথাটি তিনি আদালতে ইতিপূর্বে কেন উল্লেখ করেন নাই?

উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তিনি উহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

প্রঃ আপনি পুলিস কিম্বা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তা' কি বলেছিলেন?

উঃ না, তাও বলিনি।

প্রঃ আপনি কি এই আদালতে বাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলির সওয়াল-জওয়াবের সময়ও সে কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলেন?

উঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি, তাই বলিনি।

অতঃপর সাক্ষী অপর এক প্রশ্নের জবাবে জানান যে, কয়েকটি খাতাপত্র তিনি ৭ দিন যাবৎ তাঁর বাসায় রাখার পর লেঃ মোয়াজ্জেমকে ফেরত দেন।

সাক্ষী বলেনঃ "ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত জবানবন্দীতে আমি ডাইরী ও ফোল্ডার ছাড়া খাতাপত্র সম্পর্কে বলেছি কিনা মনে নেই। লেঃ মোয়াজ্জেমের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ '৬৬-এর জুনের কোন্ সপ্তাহে হয়েছে তা আমার মনে নেই।"

ইহার পর সাক্ষী বলেন যে, ঐ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় নহে–তৃতীয় সাক্ষাৎ।
প্রঃ লেঃ মোয়াজ্জেমের সঙ্গে পরিকল্পিত পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে আলোচনার সময় অন্য কোন রাষ্ট্রের তুলনা করা হয়?
উঃ না।
প্রঃ আপনি বলেছেন যে, প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের সমুদয় সম্পত্তি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হবে, পৃথিবীর আর কোন দেশ সম্পত্তি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করেছে বলে আপনি জানেন?
উঃ সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন।
প্রঃ মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তে কুপন ব্যবস্থার কথা আগে কোথাও শুনেছেন?
উঃ ঐ দিনই ঐ লেখা পড়ে প্রথম শুনি।
প্রঃ সে পতাকাটি আপনি দেখেছেন তা কিসের তৈরী?
উঃ কাপড়ের।
এই প্রসঙ্গে সাক্ষী জানান যে, প্রদর্শিত পতাকার সবুজ রঙ পূর্ব পাকিস্তানের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সোনালী রঙ পাটের প্রতীক বলিয়া লেঃ মোয়াজ্জেম তাঁহাকে জানাইয়াছেন।
প্রঃ বলুন ত পাকিস্তানী পতাকার রঙ কি?
উঃ সাদা ও সবুজ।
প্রঃ এ রঙ দু'টো কিসের প্রতীক?
উঃ সাদা হলো সংখ্যালঘুদের আর সবুজ হলো রাষ্ট্রের প্রতীক।
প্রঃ যদি কেউ বলেন, কথিত সভায় প্রদর্শিত পতাকায় একটি নৌকা ও প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকা রয়েছে?
উঃ না, তা ঠিক নয়।
প্রঃ আপনি কি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে বলেছেন যে, পতাকায় পাটের ছবি আঁকা রয়েছে?
উঃ তা' মনে নেই।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলির প্রশ্নের উত্তরে রাজসাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৬ সনের জুন মাসে তাঁহার বাড়ীতে কর্মীদের সভা তিনি সার্ভিস বই ফিরাইয়া দেওয়ার পরে হইয়াছিল কিনা স্মরণ করিতে পারেন না। তিনি বলেন যে, ঐ সভার তারিখ তাঁহার মনে নাই। সভায় পতাকা, ডাইরী ইত্যাদি দেখান হইলে পরবর্তী বৈঠক তাঁহার বাড়ীতে অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন। সাক্ষী বলেন যে, প্রস্তাবিত সভা ৮/১০ দিন পর অনুষ্ঠিত হয়।
প্রঃ পাঁচলাইশে আপনার বাড়ীটা কি ধরনের এলাকায় অবস্থিত?
উঃ আবাসিক এলাকায়।

প্রঃ আপনার বাড়ীর দু'দিকে কোন বাড়ী আছে?
উঃ জী, দু'দিকেই বাড়ী আছে।
প্রঃ রিসালদার শামসুল হকের সাথে আপনার প্রথম কোথায় পরিচয় হয়?
উঃ আমার বাড়ীতে কর্মীসভায় আমার সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেখা হয়।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী বলেন যে, প্রস্তাবিত কুমিল্লা সফর সম্পর্কে সফরের ২/১ দিন আগে ক্যাপ্টেন আলমের বাড়ীতে তাঁহাকে অবহিত করা হয়। সাক্ষী বলেন যে, কুমিল্লা গমনের পথে শোভাপূর ব্রীজে গাড়ীর জন্য তাঁহাদের কুদ দিতে হয় এবং গাড়ীর নম্বরও নোট করা হয়।
প্রঃ মাসের কোন সপ্তাহে আপনারা কুমিল্লা যান?
উঃ বলতে পারি না।
প্রঃ তখন কোন সনের কি মাস ছিল?
উঃ ১৯৬৬ সনের জুন অথবা জুলাই।
প্রঃ কুমিল্লা যাবার আগে টেলিফোনে কোন খবর পেয়েছিলেন?
উঃ জী না।
প্রঃ আপনারা কোন খবর পাঠিয়েছিলেন?
উঃ জী না।
প্রঃ আপনারা যখন কুমিল্লা যান তখন লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আপনাদের সাথে সপরিবারে গিয়েছিলেন না?
উঃ এটা ঠিক নয়।
প্রঃ ক্ষমতা দখলের দিনের (ডি-ডে) জন্য তারিখ ঠিক করা হয়েছিল না?
উঃ জী না, কোন তারিখ ঠিক করা হয়নি।
প্রঃ কোন মাস ঠিক করা হয়েছিল?
উঃ না।
প্রঃ বৎসর?
উঃ না।
প্রঃ ক্ষমতা দখলের দিন সম্পর্কে কুমিল্লায় ক্যাপ্টেন আলমের বাড়ীতে আলোচনা করা হয়েছিল বলে ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলেছিলেন না?
(এভাবেই রেকর্ড করা হয়)।
উঃ আমার স্মরণ নেই।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলির প্রশ্নের উত্তরে রাজসাক্ষী বলেন যে, ক্যাপ্টেন আলমের বাড়ীতে আলোচনাকালে কম্যাণ্ডো ষ্টাইলে পূর্ব পাকিস্তানের ক্যান্টনমেন্টসমূহ দখলের পর কি হইবে এবং উহার পর তাঁহারা কি করিবেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নাই। ক্যাপ্টেন আলমের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত

সভায় সেনাবাহিনীর লোকদের সহিত যোগাযোগের ব্যাপারে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া সাক্ষী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বলিয়াছেন কিনা তা তাঁহার মনে নাই (রেকর্ড করা হয় নাই)। পুলিসের কাছে তিনি তাহা বলিয়াছেন কিনা তাহাও মনে নাই বলিয়া সাক্ষী জানান (রেকর্ড করা হয় নাই)। তিনি বলেন যে, ক্যাপ্টেন আলমের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত সভার পূর্বে আন্দোলনের ব্যাপারে তিনি কুমিল্লা সফর করেন নাই।

প্রঃ যদি বলি, ১৯৬৬ সনের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে আপনি কুমিল্লা গিয়েছিলেন?

উঃ এটা ঠিক নয়।

প্রঃ ক্যাপ্টেন শওকত আন্দোলনের জন্যে নয়া লোক রিক্রুটের আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া আপনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বলেছেন না?

উঃ (রেকর্ড করা হয় নাই)

উঃ আমার মনে নেই।

প্রঃ ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামানের কথামত আপনি গ্রীন রোডের ক্যাপ্টেন হুদার ফ্ল্যাটে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন–এ কথা কি আপনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলেছেন?

উঃ আমার মনে নেই।

প্রঃ ক্যাপ্টেন হুদার সঙ্গে কখন আপনার দেখা হয়?

উঃ '৬৬-এর জুলাই কিম্বা আগষ্ট মাসে।

প্রঃ আরও একটু স্পষ্ট করে বলুন?

উঃ জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে কিম্বা আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে।

প্রঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে কি আপনি একথা বলেননি যে, ক্যাপ্টেন হুদার ফ্ল্যাটে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, লেঃ মোয়াজ্জেম ও ক্যাপ্টেন আলীম উপস্থিত ছিলেন এবং আপনি ও লেঃ মোয়াজ্জেম, ক্যাপ্টেন হুদা ও ক্যাপ্টেন আলীমকে আন্দোলনে টানার চেষ্টা করেছিলেন?

উঃ না, আমি তা বলিনি।

প্রঃ পুলিসকেও কি সে কথা বলেননি?

উঃ মনে নেই।

অতঃপর সাক্ষী কৌসুলির অন্যান্য প্রশ্নের জবাবে জানান যে, ক্যাপ্টেন শওকত আন্দোলনে নূতন লোককে রিক্রুট করার ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া তাহাদের বলিয়াছিলেন–

ইহা তিনি পুলিসকে জানান কিনা তাহা সাক্ষীর মনে নাই।

প্রঃ সাক্ষী ক্যাপ্টেন আলীমের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যে আপনি সর্বপ্রথম এ আদালতে এ কথা উত্থাপন করেছেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেমের

হীলম্যান গাড়ীতে করে আপনি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসেন ও ক্যাপ্টেন হুদার ফ্ল্যাটে ক্যাপ্টেন হুদা ও আলীমের সঙ্গে দেখা করেন। এ কথা কি ঠিক?

উঃ না, ঠিক নয়।

সাক্ষী বলেন যে, '৬৬-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে লেঃ মোয়াজ্জেম ঢাকায় নতুন সদস্যদেরকে বোঝানোর জন্য ঢাকায় একটা সভা আহ্বানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সেই সভার জন্য তাঁহার মোহাম্মদপুরের ফ্ল্যাট ব্যবহার করিতে দিতে চাহেন বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বলিয়াছিলেন।

প্রঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে কি একথা আপনি বলেননি যে, কুমিল্লা থেকে ফিরে আসা এক সপ্তাহ পরেই আপনার ফ্ল্যাটে মিটিং হয়েছিল?

উঃ না, বলিনি।

প্রঃ পুলিসের কাছে কি বলেছিলেন?

উঃ মনে নেই।

প্রঃ কোন্ সময় আপনি পার্টি মিটিংয়ের জন্য ফ্ল্যাট দিতে রাজী হন?

উঃ সম্ভবতঃ '৬৬-এর জুলাই-আগষ্ট মাসে।

প্রঃ কেন?

উঃ কারণ আর কোন জায়গা ছিল না।

প্রঃ আপনি কি ম্যাজিষ্ট্রেটকে এ কথা বলেন নি যে, '৬৬-এর জুন-জুলাই মাসে জনাব শামসুর রহমান সি এস পি আপনার বাসায় এসে দেখা করেন এবং আপনি আপনাদের দলের কথা তাঁকে বলেন?

উঃ না, আমি তা বলিনি।

প্রঃ পুলিসকে কি বলেছিলেন?

উঃ না।

প্রঃ '৬৬-এর সেপ্টেম্বরের কোন সপ্তাহে আপনার ফ্লাটে সভা হয়েছিল বলতে পারেন?

উঃ না, বলতে পারি না।

অতঃপর কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানান যে, তাঁহার কোন ব্যক্তিগত ডাইরী নাই। তবে পি, আই, এ, অফিসে তাঁহার একটি অফিস ডাইরী রহিয়াছে। উহাতে সাক্ষীর এনগেজমেন্ট ও আসা-যাওয়ার রেকর্ড লেখা আছে। সাক্ষী আরও বলেন যে, সেপ্টেম্বরের মিটিংয়ের কথা ঐ মাসেই তিনি জানিতে পারেন।

প্রঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আপনি কি একথা বলেননি যে, সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের কোন একসময় লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ঢাকায় দলের একটি মিটিং ডাকার কথা আপনাকে বলেছিলেন?

উঃ তা আমার মনে নেই।

প্রঃ জনাব শামসুর রহমান সি,এস,পি, কতদিন যাবৎ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ছিলেন?
উঃ আমি ঠিক বলতে পারি না।
প্রঃ মিটিংয়ের তারিখ ও স্থানের কথা অন্যান্য সদস্যকে কে বলেছিলেন?
উঃ লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে বলেন যে, তিনি জানিয়েছেন।
প্রঃ কিভাবে জানালেন?
উঃ তা বলতে পারি না।
প্রঃ আপনি কিভাবে শুনলেন?
উঃ মৌখিকভাবে।
প্রঃ কোথায় শুনলেন?
উঃ আমার ঘরে কিম্বা অফিসে।
প্রঃ '৬৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রামে আপনাদের দলের কোন কর্মী ছিল জানতেন?
উঃ জানতাম।
প্রঃ ক্যাপ্টেন আলীম ও ক্যাপ্টেন হুদা সেপ্টেম্বর মাসে কোথায় ছিলেন?
উঃ ঢাকায়।
প্রঃ কতদিন থেকে ক্যাপ্টেন হুদা ঢাকায় ছিলেন?
উঃ '৬৬-এর জুলাই-আগষ্টে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তার কতদিন আগে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন, জানি না।
প্রঃ ক্যাপ্টেন মোতালিব কোথা থেকে এসেছিলেন?
উঃ তা জানি না। তবে তিনি মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন।
প্রঃ মিটিংয়ের স্থান ও তারিখ সম্পর্কে আপনি কবে জানতে পারলেন?
উঃ লেঃ মোয়াজ্জেম মিটিং হবার তিন-চারদিন আগে আমাকে জানান।
প্রঃ আপনি কি লেঃ মোয়াজ্জেমের সঙ্গে মিটিংয়ে যোগদানের জন্য আসেন?
উঃ জী না।
প্রঃ বিমানে না গাড়ীতে করে এসেছিলেন?
উঃ তা মনে নেই।
প্রঃ '৬৬-এর সেপ্টেম্বরের কদ্দিন আগে থেকে আপনার মোহাম্মদপুর ফ্ল্যাটে লুৎফুল হুদা বাস করছিলেন?
উঃ তা আমি সঠিক বলতে পারি না।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলির প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সনের সেপ্টেম্বরে ষ্টুয়ার্ড মুজিব তাঁহার ফ্ল্যাটে অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহার মনে পড়ে। সভায় যোগদানের জন্য এল, এস, সুলতানউদ্দিনকে করাচী হইতে ডাকা হয়।

প্রঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিব তখন কি করতেন?
উঃ আমার যদ্দুর মনে পড়ে তিনি তখন চট্টগ্রামে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীতে চাকুরী করতেন।
প্রঃ এ সভায় যাঁরা যোগদান করেন তাঁদের সবাইকে কি লুৎফুল হুদার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়?
উঃ আমার স্মরণ নেই।
প্রঃ ১৯৬৬ সনের সেপ্টেম্বরের সভা কতক্ষণ চলে?
উঃ এক ঘণ্টা।
প্রঃ কটায় শুরু হয়?
উঃ বেলা ২টা থেকে সাড়ে ৩ টার মধ্যে।
প্রঃ সেদিন কি বার ছিল?
উঃ আমার মনে নেই।
প্রঃ আপনি কবে ঢাকা আসেন?
উঃ যদ্দুর মনে পড়ে যেদিন সভা হয়েছিল সেদিনই।
প্রঃ কটার সময় ঢাকা আসলেন?
উঃ সভা শুরুর আগেই ঢাকা এসেছি; তবে সঠিক সময়টা মনে পড়ছে না।
প্রঃ সভায় যোগদানকারীদের জন্যে আপনি নাস্তার ব্যবস্থা করেছিলেন না?
উঃ জী, করেছিলাম।
প্রঃ নাস্তা কোথেকে কিনে ছিলেন?
উঃ এয়ার পোর্ট রোডের সালামার হোটেল থেকে।
প্রঃ নাস্তার ব্যবস্থা করতে আপনি কি নিজেই গিয়েছিলেন, নাকি অন্য কাউকে পাঠিয়েছিলেন?
উঃ আমি নিজে যাইনি, নাস্তা কিনে আনার জন্যে লুৎফুল হুদাকে পাঠিয়েছিলাম।
প্রঃ কি কি নাস্তা কেনা হয়েছিল?
উঃ সালামার হোটেল থেকে নানরুটি আর কাবাব কেনা হয়েছিল।
প্রঃ কয়জনের জন্যে নাস্তা কেনা হয়েছিল?
উঃ ১২/১৪ জনের জন্যে।
প্রঃ নাস্তা কোথায় পরিবেশন করা হয়?
উঃ যে বৈঠকখানায় সভা হয় তাতেই নাস্তা পরিবেশন করা হয়।
প্রঃ সভার কত আগে ঢাকা এসেছিলেন?
উঃ আমি সঠিকভাবে বলতে পারব না। তবে সভা শুরুর আগেই এসেছিলাম।

প্রঃ নির্ধারিত দিনে ঢাকায় পৌঁছে উল্লিখিত ব্যক্তিদের সভায় উপস্থিত দেখতে পান বলে আপনি পুলিসের কাছে বলেছিলেন না? (এভাবেই রেকর্ড করা হয়)।
উঃ আমার মনে নেই।
প্রঃ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কি বলেছিলেন?
উঃ নির্ধারিত দিনে ঢাকা এসে আমি জনাব কে, এম, এস, রহমান, ক্যাপ্টেন আলম ও অন্যান্যকে সভায় দেখতে পেয়েছি বলেছিলাম।
বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলির প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসের সভায় যোগদানের পূর্বে তিনি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ছাড়া সভার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অপর কাহারও সাথে আলাপ করেন নাই।
প্রঃ জনাব কে এম এস রহমান ১৯৬৬ সনের সেপ্টেম্বরে কি চট্টগ্রামে চাকুরীতে ছিলেন?
উঃ আমি সঠিক জানি না।
প্রঃ সভার দিন শামসুর রহমান কি ঢাকায় ছিলেন? তিনি কি সভায় যোগদান করেছিলেন?
উঃ আমার মনে পড়ে তিনি ঢাকায় ছিলেন এবং সভায় যোগ দিয়েছিলেন।
প্রঃ সভায় যোগদানের জন্যে তিনি কোথেকে ঢাকা এসেছিলেন?
উঃ আমি বলতে পারি না।
প্রঃ সভায় যোগদানের জন্যে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন কিভাবে এবং কবে ঢাকা এসেছিলেন?
উঃ আমি বলতে পারি না।
প্রঃ তখন তিনি কোথায় চাকরী করতেন?
উঃ চট্টগ্রামে।
কৌঁসুলির প্রশ্নের উত্তরে রাজসাক্ষী বলেন যে, সভায় সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতি আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত প্রায় সকলেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সাক্ষী বলেন, সংস্থার লক্ষ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন মতানৈক্য হয় নাই। লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কেও কোন মতানৈক্য হয় নাই। বেসামরিক সিনিয়র কর্মচারীদেরও সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সাক্ষী লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে পরামর্শ দিয়াছিলেন বলিয়া জানান।
প্রঃ দলে রিক্রুট করার জন্যে আপনি ব্যক্তিগতভাবে কার কার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন?
উঃ জনাব কে, এম, শামসুর রহমান ছাড়া আর কারো সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করিনি।

প্রঃ পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত কয়জন বাঙ্গালী সিনিয়র সামরিক অফিসারকে চেনেন?
উঃ আমি কয়েকজনকে চিনি।
সাক্ষী জানান যে, তিনি কর্ণেল রব, কর্ণেল জব্বার, কর্ণেল রহমান, লেঃ কঃ মাশকুরুল হক ও কয়েকজন মেজর ও ক্যাপ্টেনকে চেনেন।
প্রঃ দলে রিক্রুট করার জন্য তাঁদের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করেছিলেন?
উঃ জী না।
সাক্ষী আরও জানান যে, চট্টগ্রাম এ্যাংকরেজ ও ক্যান্টনমেন্টে কর্ণেল ওসমানীর সঙ্গে প্রথম দেখা। উহার আগে তাঁহার সঙ্গে কোন যোগাযোগ হয় নাই।
প্রঃ সেসময় কর্ণেল রব ও কর্ণেল জব্বার কোথায় ছিলেন?
উঃ চট্টগ্রামে।
প্রঃ কর্ণেল রব '৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে কোথায় ছিলেন? এখনবা কোথায় আছেন?
উঃ তিনি এখন চট্টগ্রামে, তবে '৬৬-এর সেপ্টেম্বরে তিনি চট্টগ্রামে ছিলেন কি না আমি মনে করতে পারছি না । তবে সেসময় জব্বার চট্টগ্রামে ছিলেন।
কৌঁসুলির অপরাপর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, '৬৬-এর সেপ্টেম্বরের সভায় কয়েকজন সদস্য লক্ষ্যের ব্যাপারে ভারতের মনোভাব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এ প্রসঙ্গ আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে এর আগে আলোচনা করেছিলাম কি না আমার মনে পড়ছে না। আমি যেসব সভার কথা বলেছি তার কোনটাতেই আনুষ্ঠানিকভাবে সভায় সভাপতি নির্বাচন করে আলোচনা শুরু হয়নি। সভায় উপস্থিত সকল সদস্য এইরূপ আশ্বাস দিতেন যে, পরিকল্পনা ও আলোচনার বিষয়বস্তু গোপন রাখা হবে?
প্রঃ এ আশ্বাস আপনিও কি দিয়েছিলেন?
উঃ জী না।
প্রঃ আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একথা কি বলেছিলেন যে, আপনাদের সংগঠনের ব্যাপারে কর্ণেল ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এ কথা জনাব কে, এম, এস, রহমান আপনাকে বলেন?
উঃ আমার স্মরণ নেই।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, "কর্ণেল শেখ আমাকে টেলিফোন করলে আমি তাঁর কাছ থেকে জানতে চাই যে, কর্ণেল ওসমানী আমার সঙ্গে কথা বলতে চান কেন?"
তাঁর সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে আমি ইতস্ততঃ প্রকাশ করি।
প্রঃ কর্ণেল শেখের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ ও তাঁর সম্পর্কে কোন কিছু আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন?
উঃ না, বলিনি।

প্রঃ আপনি কি একথা বলেছিলেন যে, সেদিন অপরাহ্নে আপনি ও লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন জনাব কে, এম, এস রহমানের বাসভবনে গমন করে লেঃ মোয়াজ্জেমের বাড়ীতে এক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগদান করতে বলেছিলেন?
উঃ না, বলিনি।
প্রঃ পুলিসের কাছে বলেছিলেন?
উঃ জী না।
প্রঃ সেসময় জনাব কে,এম, এস রহমান কোথায় থাকতেন?
উঃ সেসময় তিনি চট্টগ্রামের মোহাম্মদ আলী রোডে থাকতেন।
প্রঃ সে বাড়ী কার?
উঃ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের বাড়ী।
কৌঁসুলির অপরাপর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাঁহারা লেঃ মোয়াজ্জেমের 'মস্কোভিচ' গাড়ীতে করে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল কেন্দ্রে গমন করেন।
সাক্ষী বলেন, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে বাড়ী হতে তাঁর গাড়ীতে তুলে নেন।
ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারে যাবার সময় প্রতিবারই গেটে গাড়ী থামিয়ে গাড়ীর নাম্বার লেখা হত না। আমাদের সে গেটে থামান হয়নি বলে 'মস্কোভিচ' গাড়ীর নাম্বার লেখা হয়নি। ক্যান্টনমেন্টে ঢোকার মুখে একটি বাঁশের ফাঁড়ি, একজন সেন্ট্রি ও একটি সাইন বোর্ড আছে"।
কৌঁসুলির প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, ঐ ফাঁড়িতে কোন গাড়ী থামানো হয় কি না এবং গাড়ীর নাম্বার রেকর্ড করা হয় কি না তাহা তিনি দেখেন নাই।
প্রঃ আপনাদের মধ্যে কি কেউ তখন ইউনিফরম পরিহিত ছিলেন?
উঃ কেউ না।
প্রঃ আপনার ড্রাইভার কর্ণেল ওসমানীকে কোথেকে তুলে কোথায় নিয়ে যায়?
উঃ ক্যান্টনমেন্ট থেকে তুলে এ্যাংকরেজে নিয়ে যায়।
প্রঃ ফেরার পথেও কি আপনার ড্রাইভার তাঁকে আপনার গাড়ীতে তুলি নেয়?
উঃ জী হ্যাঁ।
প্রঃ আপনার ড্রাইভার কর্ণেল ওসমানীকে ই, বি, আর, সি মেস হতে তুলে এ্যাংকরেজে নিয়ে যায় বলে আপনি কি ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের কাছে বলেননি?
উঃ আমি ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিসের কাছে একথা বলিনি।
কৌঁসুলির প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, বেসামরিক অফিসার নয়–শুধুমাত্র সিনিয়র আর্মি অফিসারদের প্রতিক্রিয়া বুঝার জন্যই এই সভা ডাকা হয়।
কৌঁসুলির এতদসংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, তাঁহাদের

আন্দোলনের প্রতি সামরিক ও বেসামরিক উভয় শ্রেণীর সিনিয়র অফিসারদের সাড়া ও প্রতিক্রিয়া জানার জন্য এই সভা ডাকা হইয়াছিল বলিয়া সাক্ষী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বলিয়াছেন কি না তাহা তাঁহার মনে নাই (এই ভাবেই রেকর্ড করা হয়)। সাক্ষী আরও বলেন যে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ও সাক্ষী ছাড়া মাত্র অপর দুইজন অফিসার কর্ণেল ওসমানী ও জনাব কে, এম, শামসুর রহমানকে ঐ সভায় আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল বলিয়া সাক্ষী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বলিয়াছেন কিনা তাহা তাহার মনে নাই (এইভাবেই রেকর্ড করা হয়)।
তখন কৌঁসুলি সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেনঃ যদি বলি, পূর্ব পাকিস্তানী সিনিয়র অফিসারদের এ মামলায় জড়ানোর উদ্দেশ্যেই আপনাকে এ সভার কথা বলতে বাধ্য করা হয়েছে?
উঃ এটা ঠিক নয়।
লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বরিশালে বদলির নির্দেশ লাভের পর আন্দোলন পরিচালনা ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব কে পালন করবে এ নিয়ে কি কোন আলোচনা হয়নি?
উঃ আমার স্মরণ নেই।
কৌঁসুলির প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন টাকা সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁহার সাথে আলোচনা করেন; কিন্তু টাকার হিসাব সংরক্ষণ ও টাকা ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করেন নাই।
প্রঃ চট্টগ্রামের ইষ্টার্ণ মার্কেনটাইল ব্যাঙ্কে কত টাকা রেখেছিলেন?
উঃ ২৫ হাজার টাকার মধ্যে ১৫ হাজার টাকা রেখেছিলাম।
প্রঃ বাকী ১০ হাজার টাকা কি করলেন?
উঃ ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে ৫ হাজার এবং আমার নিজের কাছে ৫ হাজার টাকা রেখেছি।

অতঃপর ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন গতকল্যকার মত সমাপ্ত হয়। অদ্য সকাল ৯ টায় যথারীতি ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইবে।

দৈনিক পয়গাম
৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৬৮
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
তৃতীয় দিনেও রাজসাক্ষী ফ্লাইট লেঃ মীর্জা রমিজের জেরা অব্যাহত
(ষ্টাফ রিপোর্টার)
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৫নং রাজসাক্ষী ফ্লাইট লেঃ মীর্জা মোহাম্মদ রমিজের জেরা গতকল্য (মঙ্গলবার) তৃতীয় দিবসেও অব্যাহত থাকে।

সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমানকে চেয়ারম্যান, ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম, আর, খান এবং বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিমকে সদস্য করিয়া গঠিত এই বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন ঢাকা কেন্টনমেন্টে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান রাজসাক্ষী রমিজকে জেরা করেন।

প্রশ্ন: ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে কবে হইতে চিনেন?

উত্তর: ১৯৬৬ সনে তিনি আমার বাসায় আসার পর। বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজ বলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিব ও এ, আর খুরশীদ উভয়েই নৌবাহিনীর কর্মচারী।

প্রশ্ন: তাহারা কোথায় থাকতেন?

উত্তর: নৌ-ঘাঁটিতে থাকতেন বলিয়া তাহারা আমাকে বলিয়াছিলেন।

প্রশ্ন:আপনার বাসা বা অফিস হইতে নৌ-ঘাঁটি কতদূর?

উত্তর: প্রায় ৭ মাইল।

প্রশ্ন: আপনি কি কোন সময় পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনে চাকুরী করিয়াছিলেন?

উত্তর: হ্যাঁ। ১৯৬২ সনে বিমান বাহিনী হইতে অব্যাহতি লাভের পর।

প্রশ্ন: সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য কোন সমিতি সম্পর্কে আপনি কি অবহিত আছেন?

উত্তর: বিমান বাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারীদের একটি সমিতি সম্পর্কে আমি অবহিত আছি।

প্রশ্ন: ইহা কি সত্য যে, কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত এই ধরনের কোন সমিতি গঠন করা যায় না?

উত্তর: কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত এই ধরনের কোন সমিতি গঠন করা যায় কিনা আমি জানি না।

প্রশ্ন: লেঃ মোয়াজ্জেমের সহিত আলোচনার পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আপনি কি অন্য কাহারও সহিত আলাপ করিয়াছিলেন?

উত্তর: না।

প্রশ্ন: পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা ও বৈষম্য প্রভৃতি সম্পর্কে আপনার কি কোন ব্যক্তিগত অনভূতি ছিল?

উত্তর: আমার অনুভূতি ছিল।

প্রশ্ন: কি ধরনের অনুভূতি ছিল?

উত্তর: আমি অনুভব করিতাম যে, পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অত্যন্ত শ্লথ।

প্রশ্ন: সমস্যার কোন সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আপনারা আলোচনা করিয়াছিলেন কি?

উত্তর: লেঃ মোয়াজ্জেমের সহিত আলোচনা হইয়াছিল যে, বৈপ্লবিক আন্দোলন ব্যতীত বৈষম্য দূর করা সম্ভব নহে।

প্রশ্ন: লেঃ মোয়াজ্জেমের সহিত বৈঠকে 'বৈপ্লবিক' আন্দোলনের পরিকল্পনা ও কর্তব্য সম্পর্কে কোন আলোচনা করিয়াছিলেন কি?

উত্তর: না। লেঃ মোয়াজ্জেমের সহিত প্রথম বৈঠকে বাস্তব পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন আলোচনা হয় নাই।

প্রশ্ন: ঐ বৈঠকে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান কি ধরনের রাষ্ট্র হইবে সে সম্পর্কে কোন আলোচনা হইয়াছিল কি?

উত্তর: না।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের প্রশ্নের জবাবে ৫নং রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজ বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেমের গৃহে অনুষ্ঠিত পরবর্তী সভায় লেঃ মোয়াজ্জেম তাহাকে কি ধরনের সরকার হইবে সে সম্পর্কিত কতিপয় দলিলপত্র দেখান।

প্রশ্ন: কি ধরনের কাগজপত্র ছিল?

উত্তর: সাইক্লোষ্টাইল ও টাইপ করা কাগজপত্রসহ একটি ফোল্ডার, একটি ডায়েরী ও একটি বাঁধান খাতা।

প্রশ্ন: ডায়েরীর প্রতিদিনের জন্য কি এক পাতা নির্দিষ্ট ছিল?

উত্তর: শনি ও রবিবার ব্যতীত অন্যান্য দিনের জন্য পৃথক পৃষ্ঠা ছিল।

প্রশ্ন: খাতাটি কত বড় ছিল?

উত্তর: শক্ত মলাটে বাঁধাই এক্সারসাইজ বুক প্রায় অর্ধ ইঞ্চি পুরু হইবে।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজ জানান যে, ফোল্ডারে প্রায় ৫০টি ফুলস্কেপ কাগজ সাইক্লোষ্টাইল করা ছিল।

প্রশ্ন: আপনি কি ডায়েরী, ফোল্ডার এবং খাতা বৈঠকেই পাঠ করিয়াছিলেন?

উত্তর: ডায়েরী ও ফোল্ডার আমি বৈঠকে পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে পড়ার জন্য খাতাটি বাসায় নিয়াছিলাম।

প্রশ্ন: আপনি কি ডায়েরী, ফোল্ডার বা খাতা হইতে কোন 'নোট' পাইয়াছিলেন?

উত্তর: না।

প্রশ্ন: আপনি কি এইসব দলিলের বিষয় সম্পর্কে জনাব কে, এম, এস, রহমানের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন?

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন: কিভাবে?

উত্তর: স্মৃতিচারণ করিয়া।

প্রশ্ন: কে, এম, এস, রহমান যে একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন তাহা আপনি জানিতেন কি?
উত্তর: হ্যাঁ। আমি শুনিয়াছিলাম যে, তিনি সি, এস, এস লিখিত পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন।
প্রশ্ন: তাহার সহকর্মিগণও তাহাকে সম্মান করিত তাহা জানিতেন?
উত্তর: হ্যাঁ।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী ফ্লাইট লেঃ রমিজ বলেন যে, ঐ সময় জনাব কে, এম, এস, রহমান চট্টগ্রাম উন্নয়ন সংস্থার (সি, ডি, এ) চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত ছিলেন।
প্রশ্ন: কখন আপনি লেঃ মোয়াজ্জেমের সহিত জনাব কে, এম, এস, রহমানের পরিচয় করাইয়া দেন?
উত্তর: ১৯৬৬ সনের জুলাই মাসের কোন একসময়।
প্রশ্ন: কোথায় বৈঠক হইয়াছিল?
উত্তর: আমার বাসায়।
প্রশ্ন: এই সভায় কি কোন আলোচনা হইয়াছিল?
উত্তর: হ্যাঁ। জনাব কে, এম, এস, রহমান, লেঃ মোয়াজ্জেমের সহিত পূর্ব পাকিস্তান সরকার গঠন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন।
প্রশ্ন: এই সভার কথা আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলিয়াছিলেন?
উত্তর: ১৯৬৬ সালে জুলাই মাসের এই সভার কথা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি পুলিশের নিকটও উহার উল্লেখ করি নাই।
প্রশ্ন: এক্সারসাইজ খাতাটি আপনি কতদিন রাখিয়াছিলেন?
উত্তর: ৭ দিন রাখিয়াছিলাম। পরে লেঃ মোয়াজ্জেমের নিকট ফেরত দেই।
প্রশ্ন: এক্সারসাইজ বুক সম্পর্কে আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলিয়াছিলেন?
উত্তর: এক্সারসাইজ বুক সম্পর্কে আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলিয়াছিলাম কি-না তাহা আমার স্মরণ নাই। (অনুরূপ রেকর্ড করা হয় নাই)।
প্রশ্ন: ১৯৬৬ সালের জুন মাসের শেষ তারিখে লেঃ মোয়াজ্জেমের সহিত আপনার দ্বিতীয় বৈঠক হইয়াছিল?
উত্তর: জুন মাসের কোন দিন বা সপ্তাহে বৈঠক হইয়াছিল তাহা আমি বলিতে পারি না।
প্রশ্ন: আপনাকে কি কোন পতাকা দেখান হইয়াছিল?
উত্তর: হ্যাঁ, এক টুকরা কাপড়ে এই পতাকা দেখান হইয়াছিল।
প্রশ্ন:পতাকার কি রং ছিল?
উত্তর: সবুজ ও সোনালী।

প্রশ্ন: এই রং-এর তাৎপর্য জানেন কি?
উত্তর: হ্যাঁ, সবুজ, পূর্ব পাকিস্তানের শ্যামলিমার চিহ্ন ও পাটের রং-এর প্রতীক হিসাবে সোনালী।
প্রশ্ন–পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকায় আপনার বাসা?
উত্তর: হ্যাঁ।
প্রশ্ন: আপনি রিসালদার শামসুল হককে কি চেনেন?
উত্তর: আমার বাসায় কর্মীদের একটি সভায় রিসালদার শামসুল হকের সহিত প্রথম আমার পরিচয় হয়।
প্রশ্ন: কুমিল্লায় ক্যাপ্টেন আলিমের বাসায় যাওয়ার সম্পর্কে পূর্বাহ্নে জানতেন কি?
উত্তর: দুই-একদিন পূর্বে আমাকে জানান হইয়াছিল।
প্রশ্ন: কুমিল্লা গমনের সময় শোভাপুর ব্রীজে কি ট্যাক্স আদায় ও গাড়ীর নম্বর রেকর্ড করা হইয়াছিল?
উত্তর: হ্যাঁ, শোভাপুর ব্রীজে ট্যাক্স আদায় ও গাড়ীর নম্বর রেকর্ড করা হইয়াছিল।
প্রশ্ন: মাসের কোন সপ্তাহে আপনারা কুমিল্লায় গিয়াছিলেন?
উত্তর: আমি বলিতে পারি না। তবে ইহা ১৯৬৬ সালের জুন বা জুলাই মাস হইতে পারে।
প্রশ্ন: কুমিল্লা যাওয়ার পূর্বে কুমিল্লা হইতে কোন টেলিফোন পাইয়াছিলেন কি?
উত্তর: না।
প্রশ্ন: "ডি-ডের" জন্য কোন তারিখ নির্ধারিত হইয়াছিল কি?
উত্তর: না।
প্রশ্ন: কোন মাস নির্ধারিত হইয়াছিল?
উত্তর: না।
প্রশ্ন: কুমিল্লায় ক্যাপ্টেন আলমের সহিত 'ডি-ডে' সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন এই মর্মে আপনি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলিয়াছিলেন কি?
উত্তর: ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলিয়াছিলাম কিনা আমার স্মরণ নাই।
প্রশ্ন: এই আন্দোলন সম্পর্ক ছাড়া পূর্বে আপনি কুমিল্লা গিয়াছিলেন কি?
উত্তর: না।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে, রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজ বলেন যে, পার্টির কাজে নয়া লোক নিয়োগের ব্যাপারে ক্যাপ্টেন সওকত যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাইতেছেন বলিয়া আমাদের বলিয়াছিলেন ইহা আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উল্লেখ করিয়াছি কিনা, স্মরণ করিতে পারিতেছি না (রেকর্ড করা হয় নাই)।

ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামানের কথা মোতাবেক আমি গ্রীন রোডস্থিত ক্যাপ্টেন হুদার ফ্ল্যাটে গমন করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম বলিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম কিনা, তাহাও আমি স্মরণ করিতে পারিতেছি না। ১৯৬৬ সালের জুলাই অথবা আগষ্টে ক্যাপটেন হুদার সহিত আমার এই সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। তাহা সাধারণতঃ জুলাই-এর শেষ সপ্তাহ অথবা আগষ্টের প্রথম সপ্তাহ হইতে পারে। আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উল্লেখ করি নাই যে, ক্যাপ্টেন হুদার ফ্ল্যাটে সে সময়ে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ও ক্যাপ্টেন আলমও উপস্থিত ছিল এবং মোয়াজ্জেম হোসেন ও আমি স্বয়ং ক্যাপ্টেন হুদা ও ক্যাপ্টেন আলীমকে পার্টিতে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাইয়া ছিলাম। পুলিশের নিকটও উক্ত বিষয়টি আমি প্রকাশ করিয়াছিলাম কিনা তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। (রেকর্ড করা হয় নাই) প্রকৃত ব্যাপারটি হইল এই যে, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং আমি উভয়েই গ্রীন রোডস্থিত ক্যাপ্টেন হুদার ফ্ল্যাটে আমাদের পার্টিতে যোগদানের জন্য ক্যাপ্টেন হুদা ও ক্যাপ্টেন আলিমকে রাজী করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। ঢাকায় ক্যাপ্টেন হুদা এবং চট্টগ্রামে ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামানের সহিত ইহার পূর্বেই আমি যোগাযোগ করিয়াছিলাম এবং আমাদের পার্টিতে যোগদানের জন্য তাহাদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছিলাম, এ-ধরনের কোন তথ্য আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রকাশ করিয়াছি কিনা, তাহা মনে করিতে পারিতেছি না (অনুরূপ রেকর্ড করা হয়)। এইরূপ বিবৃতি আমি পুলিশের নিকটও প্রদান করিয়াছিলাম কিনা, তাহাও আমি মনে করিতে পারিতেছি না। (অনুরূপ রেকর্ড করা হয়)। পার্টির জন্য নয়া লোকজন সংগ্রহের ব্যাপারে ক্যাপ্টেন শওকত প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাইতেছেন বলিয়া আমাদের বলিয়াছিলেন, এরূপ কোন কথা পুলিশের নিকট বলিয়াছিলাম কিনা, তাহা আমি স্মরণ করিতে পারিতেছি না (রেকর্ড করা হয় নাই)।

চট্টগ্রামস্থ আমার বাড়ীতে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামানকে নৈশভোজের দাওয়াত দিয়াছিলাম, এরূপ কোন বিষয় আমি ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের নিকট উল্লেখ করি নাই। প্রকৃতপক্ষে আমি কুমিল্লা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আমার বাড়ীতে নৈশভোজ ও বৈঠকের কথা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে এমনকি পুলিশের নিকটও উল্লেখ করি নাই।

আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর/অক্টোবরের কোন একসময়ে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, সংস্থার বিস্তারিত তথ্য নয়া সদস্যবর্গ ক্যাপ্টেন আলিম ও ক্যাপ্টেন হুদাকে অবহিত করার জন্য ঢাকায় পার্টির বৈঠক আহ্বান করার মনস্থ করিয়াছেন এবং ইহার পর মোহাম্মদপুরস্থ আমার ফ্ল্যাটে বৈঠক

অনুষ্ঠানের জন্যও আমি প্রস্তাব দিয়াছিলাম। পুলিশের নিকটও অনুরূপ বিবৃতি আমি প্রদান করিয়াছিলাম কিনা, তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না। (অনুরূপ রেকর্ড করা হয়)।

কুমিল্লা হইতে প্রত্যাবর্তনের এক সপ্তাহ পর আমার ফ্ল্যাটে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতেও তাহা আমি উল্লেখ করি নাই। পুলিশের নিকটও অনুরূপ আমি কিছু প্রকাশ করিয়াছি কিনা, তাহাও স্মরণ করিতে পারিতেছি না। (রেকর্ড করা হয় নাই)।

সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের জুলাই-আগষ্টেই প্রথম পার্টির বৈঠকের জন্য আমার ফ্ল্যাট ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়াছিলাম। পার্টির অন্য কোন স্থান ছিল না বলিয়াই পার্টির বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য আমার ফ্ল্যাট ব্যবহারের প্রস্তাব করিয়াছিলাম।

১৯৬৬ সালের জুন-জুলাই-এ জনাব শামসুর রহমান আমার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন এবং পার্টির বিষয়াবলী তাহাকে অবহিত করিয়াছিলাম, এরূপ কোন কথা আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রকাশ করি নাই। পুলিশের নিকটও অনুরূপ আমি বলি নাই। আমার ফ্ল্যাটে উক্ত বৈঠক ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে কোন সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও আমি বলি নাই। পি আই এ অফিসে আমার একটি অফিস ডাইরী ছিল। আমার অফিস ডাইরীতে আমার দৈনন্দিন কর্মসূচী অথবা অফিসে উপস্থিতি অথবা অফিস ত্যাগের ব্যাপারটি উল্লেখ থাকিত না। আমার ব্যক্তিগত কোন ডাইরী ছিল না। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে পার্টির বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে মে মাসে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, উক্ত মাসেই আমাকে জানানো হইয়াছিল।

১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের কোন একসময়ে ঢাকায় পার্টির বৈঠক আহ্বানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে বলিয়াছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আমি এরূপ প্রকাশ করিয়াছিলাম কিনা, স্মরণ করিতে পারিতেছি না। (অনুরূপ রেকর্ড করা হইয়াছে)। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানরূপে জনাব শামসুর রহমান কখন দায়িত্ব পালন করিতেছিলেন, তাহা আমি সঠিকভাবে বলিতে পারিব না। এই বৈঠকের তারিখ ও স্থান সম্পর্কে বৈঠকে যোগদানকারী সদস্যদের লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন অবহিত করিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে আছে। তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন যে, এই বৈঠক সম্পর্কে তিনি সদস্যদের অবহিত করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে তাহাদের অবহিত করা হইয়াছে, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। মৌখিকভাবে তিনি আমাকে তাহা বলিয়াছিলেন। হয়ত তিনি আমার বাড়ী অথবা আমার অফিসে তাহা আমাকে বলিয়াছিলেন। আমি ইহা জানিতাম যে, ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে চট্টগ্রামে আমাদের সংস্থার কয়েকজন কর্মী ছিলেন।

১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে ক্যাপ্টেন আলিম ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন। অনুরূপভাবে ক্যাপ্টেন হুদাও। ১৯৬৬ সালের জুলাই-আগষ্টে ঢাকায় আমি ক্যাপটেন হুদার সহিত সাক্ষাৎ করি। কিন্তু ইহার কত পূর্বে তিনি ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতাম না। ক্যাপ্টেন মুত্তালিব উক্ত বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন; কিন্তু আলোচ্য সময়ে তিনি কোথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা আমার জানা ছিল না। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন বৈঠকের তারিখের প্রায় তিন হইতে চারিদিন পূর্বে আমাকে বৈঠকের স্থান ও তারিখ জানাইয়াছিলেন। আমি উক্ত বৈঠকেই যোগদানের জন্য লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সহিত ঢাকায় আগমন করি নাই। বিমান অথবা কারে আমি আগমন করিয়াছিলাম কিনা, তাহা আমি মনে করিতে পারিতেছি না। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরের কত পূর্বে ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ আমার ফ্ল্যাটে লুৎফুল হুদা অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা আমি সঠিক বলিতে পারিব না। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে আমার ফ্ল্যাটে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান যে অবস্থান করিতেছিলেন তাহা আমার স্মরণ আছে। উক্ত বৈঠকে যোগদানের জন্য এল, এস, সুলতানউদ্দিনকে করাচী হইতে ডাকিয়া আনা হইয়াছিল। আমার যতদূর স্মরণ আছে, তাহাতে বলা যায় যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান সেসময়ে চট্টগ্রাম পাকিস্তান নৌ-বাহিনীতে কার্যরত ছিলেন। উক্ত বৈঠকে যোগদানকারী ব্যক্তিদের সকলকেই লুৎফুল হুদার সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল কিনা তাহা আমি মনে করিতে পারিতেছি না। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরের বৈঠকটি এক ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াছিল। অপরাহ্নে উক্ত বৈঠক শুরু হইয়াছিল। কোন্ দিনে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় তাহা আমার স্মরণ নাই।

যতদূর আমার মনে পড়ে, যেদিন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, সেদিনেই আমি ঢাকা আগমন করিয়াছিলাম। তবে বৈঠক অনুষ্ঠানের সময়ের পূর্বেই আমি ঢাকা আসিয়াছিলাম। কিন্তু সময়টা তখন কি ছিল, তাহা আমার সঠিক মনে পড়িতেছে না। আমি উক্ত বৈঠকে পরিবেশনের জন্য নাস্তার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এয়ারপোর্ট রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত হোটেল সালামার হইতে উক্ত নাস্তা খরিদ করা হইয়াছিল। নাস্তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি স্বয়ং গমন করি নাই। আমি লুৎফুল হুদাকে নাস্তা খরিদের জন্য হোটেল সালমারে প্রেরণ করিয়াছিলাম। নানরুটি ও কাবাব হোটেল সালামার হইতে খরিদ করা হইয়াছিল। ১২/১৪ ব্যক্তির জন্য নাস্তা আনয়ন করা হইয়াছিল। যেস্থানে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেখানেই তাহাদের নাস্তা পরিবেশন করা হইয়াছিল। বৈঠকের কতক্ষণ পূর্বে আমি ঢাকা আগমন করিয়াছিলাম, তাহা আমি সঠিকভাবে বলিতে পারিব না। তবে, বৈঠক শুরুর পূর্বেই আমি পৌছিয়াছিলাম।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী মীর্জা রমিজ বলেন, নির্দিষ্ট তারিখে আমি ঢাকা পৌছি এবং এইসব লোককে বৈঠকে দেখিতে পাই বলিয়া পুলিশের নিকট উল্লেখ করিয়াছি কিনা তাহা আমার মনে নাই। (এইভাবে রেকর্ড করা হইয়াছে)। আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বলিয়াছিলাম যে, নির্ধারিত তারিখে আমি ঢাকা পৌছি এবং বৈঠকে আমি জনাব কে, এম, এস, রহমান, ক্যাপ্টেন আলম এবং অন্যান্যকে দেখিতে পাই। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরের এই বৈঠকের পূর্বে বৈঠকের আলোচ্যসূচী সম্পর্কে লেঃ মোয়াজ্জেমের সহিত আমার আলোচনা হয়; অন্য কাহারও সহিত আলোচনা হয় নাই। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে জনাব কে, এম, এস, রহমান চট্টগ্রামে কর্তব্যরত ছিলেন কি-না তাহা আমার ঠিক জানা নাই। আমার মনে আছে বৈঠকের দিন শামসুর রহমান ঢাকা ছিলেন এবং বৈঠকে যোগ দিয়াছিলেন। বৈঠকে যোগদানের জন্য কোথা হইতে তিনি ঢাকা আসেন তাহা আমি বলিতে পারিব না। এই বৈঠকে যোগদানের জন্য লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনও কিভাবে এবং কখন ঢাকা আসেন, তাহাও আমি বলিতে পারিব না। তিনি এই সময়ে চট্টগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন। এই বৈঠকে আমাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই লক্ষ্য অর্জনের পন্থা সম্পর্কেও আলোচনা হয়। বৈঠকে যোগদানকারী প্রায় সকলেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আমাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বৈঠকের সকলেই একমত প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য হাসিলের ব্যাপারে যেসব পন্থা গৃহীত হইবে বলিয়া উল্লেখ করা হয় সেসব ব্যাপারেও কোন মতভেদ ছিল না। আমি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে পরামর্শ দেই যে, সিনিয়র সিভিল সার্ভেন্টদিগকেও সংস্থায় গ্রহণ করা উচিত। পার্টিতে লোক সংগ্রহের ব্যাপারে জনাব কে, এম, এস, রহমান ছাড়া অন্য কাহারও সহিত আমি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ স্থাপন করি নাই। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙ্গালী সিনিয়র মিলিটারী অফিসারদের কয়েকজনকে আমি চিনি। কর্ণেল রব, কর্ণেল জব্বার, কর্ণেল রহমান, লেঃ কর্ণেল মাসহুরুল হক এবং কয়েকজন মেজর এবং ক্যাপ্টেনকে আমি চিনি। আমাদের সংগঠনে সংগ্রহের ব্যাপারে এইসব অফিসারের কাহারও সহিত আমি যোগাযোগ করি নাই। চট্টগ্রাম অ্যাংকোরেজে এবং ক্যান্টনমেন্টে কর্ণেল ওসমানীর সহিত আমার বৈঠকের আগে তাঁহার সহিত আমি কোন যোগাযোগ করি নাই। এই সময়ে কর্ণেল রব এবং কর্ণেল জব্বার চট্টগ্রামে ছিলেন এবং অন্যরা ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন। কর্ণেল রব এখনও চট্টগ্রামে আছেন, তবে ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর তিনি চট্টগ্রামে ছিলেন কিনা, তাহা আমার মনে নাই। তবে কর্ণেল জব্বার এই সময়ে চট্টগ্রামে ছিলেন।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরের বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভারতের কি মনোভাব রহিয়াছে সে বিষয়ে প্রশ্ন করেন। এ বিষয়ে উক্ত বৈঠকের পূর্বে আমি লেঃ মোয়াজ্জেমের সহিত কোন আলোচনা করিয়াছিলাম কি-না তাহা আমার মনে নাই। আমি যেসব বৈঠকের কথা বলিলাম ঐগুলির কোনটিতেই আনুষ্ঠানিকভাবে কোন সভাপতি নির্বাচন করা হয় নাই। এই বৈঠকে যোগদানকারী সকল সদস্যই আমাদের পরিকল্পনা, আলোচনার বিষয়বস্তু এবং কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হইবে সেসব সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন বলিয়া নিশ্চয়তা দেন। আমি নিজেও এই নিশ্চয়তা দেই। জনাব কে, এম, এস, রহমান আমাদের সংগঠনের ব্যপারে কর্ণেল ওসমানীর সহিত যোগাযোগ করিয়াছেন বলিয়া আমার নিকট পরে উল্লেখ করিয়াছেন একথা আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বলিয়াছি কিনা, তাহা আমার মনে নাই। (রেকর্ড করা হয় নাই)।

সাক্ষী উল্লেখ করেন, কর্ণেল ওসমানীর প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁহার লিফ্‌ট দেওয়া ছাড়া তাঁহার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি আর কিছু করি নাই। কর্ণেল শেখের নিকট হইতে টেলিফোন কল পাইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, কর্ণেল ওসমানী কেন আমার সহিত কথা বলিতে চায় এবং আমি তাঁহার (কর্ণেল ওসমানীর) সহিত কথা বলিতে ইতস্ততঃ করি।

কর্ণেল শেখের সহিত আমার টেলিফোনের আলাপ এবং তাঁহার সম্পর্কিত অন্য কিছু আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উল্লেখ করি নাই। পুলিশের নিকটও আমি এ বিষয়ে কিছু বলি নাই। আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এ-কথা বলি নাই যে, আমি কর্ণেল ওসমানীর সহিত টেলিফোনে আলাপ করিয়াছিলাম। এরূপ কথা আমি পুলিশের নিকট বলি নাই।

আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একথা বলি নাই যে, ঐদিন বিকালে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং আমি জনাব কে, এম, এস, রহমানের বাসভবনে যাই এবং লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসায় এক সম্মেলনে যোগদানের জন্য তাহাকে বলি। পুলিশের নিকটও আমি ইহা বলি নাই। জনাব কে, এম, এস, রহমান এই সময়ে চট্টগ্রামের মোহাম্মদ আলী রোডে থাকিতেন। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের বাসা এটি। এই আই, সি, আই বিল্ডিংটি চেয়াম্যানের বাসভবন হিসাবে রিকুইজিশন করা হয়।

সাক্ষী রমিজ বলেন, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের মস্কোভিচ গাড়ীতে করিয়া আমরা ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে যাই। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন যাওয়ার সময় আমার গৃহ হইতে আমাকে তাহার গাড়ীতে তুলিয়া নেন। ই, বি, আর, সেন্টারে যাওয়ার সময় প্রত্যেক গাড়ীকেই গেটে দাঁড় করান এবং

গেটম্যান কর্তৃক প্রত্যেক গাড়ীর নম্বরই টুকিয়া লওয়ার ব্যাপারে তেমন কোন নিয়মিত ব্যবস্থা নাই। আমরা যে মস্কোভিচ গাড়ীতে করিয়া গিয়াছিলাম তাহার নম্বরও গেটে টুকিয়া রাখা হয় নাই। কারণ সেখানে আমাদিগকে কেহ থামায় নাই। ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশের পথে একটি বাঁশের পোষ্ট আড়াআড়ি করিয়া রাখা আছে। সেখানে একজন সেন্ট্রী এবং একখানা সাইনবোর্ডও আছে। আমি এই পোষ্টের নিকট কোন গাড়ী দাঁড় করাইতে এবং ইহার নম্বর টুকিয়া লইতে দেখি নাই। এই সময়ে আমরা কেহ ইউনিফর্ম পরিহিত ছিলাম না। আমার ড্রাইভার ক্যান্টনমেন্ট হইতে কর্ণেল ওসমানীকে তুলিয়া লয় এবং তাঁহাকে অ্যাংকোরেজে লইয়া যায়। ফেরার পথেও আমার ড্রাইভার তাঁহাকে আমার গাড়ীতে তুলিয়া লয়। আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একথা বলি নাই যে, আমার ড্রাইভার ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার মেস হইতে কর্ণেল ওসমানীকে তুলিয়া লয় এবং তাঁহাকে অ্যাংকোরেজে লইয়া যায়। পুলিশের নিকটও আমি এরূপ কথা বলি নাই। শুধু সিনিয়র আর্মী অফিসারদের প্রতিক্রিয়া যাচাই করার জন্যই এই বৈঠক আহ্বান করা হয়, বেসামরিক অফিসারদের ব্যাপারে নহে। আমাদের এই আন্দোলন সম্পর্কে সামরিক এবং বেসামরিক উভয় দলের সিনিয়র অফিসারদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্যই এই বৈঠকের আয়োজন করা হইয়াছিল বলিয়া আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উল্লেখ করিয়াছি কিনা তাহা আমার মনে নাই। (এইভাবে রেকর্ড করা হইয়াছে)। যথারীতি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং আমাকে ছাড়া কর্ণেল ওসমানী এবং জনাব কে, এম, এস, রহমান শুধু এই দুইজন অফিসারকে উক্ত বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয় বলিয়া আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উল্লেখ করিয়াছি কিনা, তাহা আমার মনে নাই। (এইভাবে রেকর্ড করা হইয়াছে)। ইহা সত্য নহে যে, পূর্ব পাকিস্তানী সিনিয়র অফিসারদের জড়িত করার জন্যই এই বৈঠকের বিষয়েও আমাকে দিয়া বলান হইয়াছে। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে বরিশালে বদলি হওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পর কে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিবে এবং এ বিষয়ে সমন্বয় সাধন করিবে সে সম্পর্কে কোন আলোচনা হইয়াছিল কিনা, তাহা আমার মনে নাই।

সাক্ষী জানান, অর্থ সংগ্রহ সম্পর্কে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার একাউন্ট রাখা এবং অর্থ খরচপত্রের ব্যাপারে তিনি আমার সহিত কোন আলোচনা করেন নাই।

মীর্জা রমিজ বলেন, আমার নিকট প্রদত্ত ২৫ হাজার টাকার মধ্যে ১৫ হাজার টাকা চট্টগ্রাম ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংকে জমা রাখি। বাকী ১০ হাজারের মধ্যে নগদ ৫ হাজার টাকা আমি ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে দেই এবং অন্য ৫ হাজার টাকা আমি নিজের কাছে রাখি।

দৈনিক পাকিস্তান

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

একরারী সাক্ষী মীর্জা রমিজের জেরা অব্যাহত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল মঙ্গলবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পাঁচ নম্বর একরারী সাক্ষী মীর্জা মোহাম্মদ রমীজের জেরা অব্যাহত থাকে। বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌঁসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীকে জেরা করছেন। আজ বুধবার জনাব আবদুস সালাম খান পুনরায় তাঁর অসমাপ্ত জেরা শুরু করবেন।

প্র–আপনি বলেছেন যে, ১৯৬৬ সালের মে মাসে স্টুয়ার্ড মুজিব ও এ, বি, খোরশেদের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়। মে মাসের আগে কি কখনও তাদের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?

উ–১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে স্টুয়ার্ড মুজিব ও খোরশেদ যখন আমার সাথে দেখা করেন তখন থেকেই তাদের আমি চিনি।

প্র–তারা উভয়েই নৌবাহিনীর লোক তাই না?

উ–হ্যাঁ।

প্র–পিআইএ'র কোন কর্মচারী কি তাদেরকে আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে?

উ–না।

জেরার উত্তরে সাক্ষী আরও বলেন, তারা আমাকে জানিয়েছিল যে, তারা নৌবাহিনীর ঘাঁটিতে বসবাস করে।

প্র–এই ঘাঁটি চট্টগ্রামস্থ আপনার অফিস হতে কত দূরে অবস্থিত?

উ–প্রায় ৭ মাইল হবে।

প্র–পিআইএ'তে যোগদানের পূর্বে আপনি কি ইপসিতে কাজ করেছিলেন?

উ–হ্যাঁ।

প্র–লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন যে আপনার সাথে দেখা করতে চায় একথা কি স্টুয়ার্ড মুজিব বা খোরশেদ আপনাকে আগে জানিয়েছিলেন?

উ–তারা উভয়েই আমাকে জানান যে, লেঃ মোয়াজ্জেম আমার বাসায় আগমন করবেন।

জেরার জবাবে সাক্ষী আরও বলেন, তারা যখন প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করে তখন খোরশেদ আমাকে এই বিপ্লবী সংগঠন সম্পর্কে কিছু বলেননি।

প্র–আপনি নৌ-বাহিনীর কোন ওয়েলফেয়ার সংস্থা সম্পর্কে অবহিত আছেন?

উ–আমি বিমান বাহিনীর কর্মচারীদের ওয়েলফেয়ার সংস্থা সম্পর্কে অবগত আছি।

প্র–আপনি কি জানেন যে, দেশরক্ষা বাহিনীর কার্যরত বা প্রাক্তন কর্মচারীদের কোন সংস্থা সরকারের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত গঠন করা যায় না?

উ–আমি জানি না।

প্র–আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিতে একথা বলেছিলেন যে, মোয়াজ্জম যখন আপনার বাসায় আগমন করেন তখন তিনি আপনাকে তার বাসায় যেতে বলেছিলেন?

উ–আমার মনে পড়ে না।

প্র–লেঃ মোয়াজ্জেম আপনার বাসায় আগমনের পর আপনি যখন আবার তার বাসায় গমন করেন তখন পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল বলে আপনি উল্লেখ করেছেন। লেঃ মোয়াজ্জেমের সাথে এই আলোচনার পূর্বে আপনি কি কখনও পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন?

উ–এ ব্যাপারে আমি কারুর সঙ্গে আলোচনা করিনি।

প্র–সামরিক বাহিনীর লোকজন বা বাড়ীতে অন্য কারুর সাথে এ ব্যাপারে আপনি কোন সময় আলোচনা করেছিলেন কি?

উ–না।

জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ব্যক্তিগতভাবে লেঃ মোয়াজ্জমের মত পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে আমিও অনুভব করতাম।

প্র–পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং অবহেলা সম্পর্কে আপনার কি অনুভূতি ছিল?

উ–আমি মনে করতাম যে, পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেক পশ্চাতে পড়ে আছে। অনুরূপভাবে নৌবাহিনীতেও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্ব খুবই নগণ্য।

প্র–এই অবস্থার প্রতিকার কল্পে আপনারা কি কি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আলোচনা করেছিলেন?

উ–বিপ্লব ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থার কথা আলোচিত হয়নি।

সাক্ষী আরও বলেন, লেঃ মোয়াজ্জেম যখন আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের এই অবস্থার কথা বলেন এই ধরনের চিন্তাধারা ইতিমধ্যেই আমার মনে দানা বেঁধে উঠেছিল।

প্র–এই বিপ্লব সম্পর্কে কি কি অবস্থা গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কে আপনারা কি আলোচনা করেছিলেন?

উ–মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি।

প্র–পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হলে কি ধরনের রাষ্ট্র হবে এ ব্যাপারে আপনাদের মধ্যে কি আলোচনা হয়?

উ–প্রস্তাবিত স্বাধীন রাষ্ট্রের গতি প্রকৃতি কি হবে প্রথম সাক্ষাৎকারে একথা আলোচিত হয়নি। মোয়াজ্জেমের বাসায় পরবর্তী সাক্ষাৎকারে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়।
প্র–এ সম্পর্কে কে প্রশ্ন করেছিলেন?
উ–কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকেই লেঃ মোয়াজ্জম আমাকে এই আন্দোলনের দলিলপত্র, পরিকল্পনা ও কর্মচারী দেখান। তিনি একটা মোটা কাগজের ফোল্ডারে সাইক্লোস্টাইলড কাগজপত্র প্রদান করেন।
প্র–আপনাকে যে ডায়েরী দেয়া হয়েছিল সেটা কি বার্ষিক ডায়েরী?
উ–হ্যাঁ।
প্র–ডায়েরীর এক একটি পৃষ্ঠা এক একটি দিনের জন্য নির্ধারিত ছিল কি?
উ–শনি ও রোববার ব্যতীত প্রত্যেক দিনের জন্য এক একটি পৃষ্ঠা নির্ধারিত ছিল।
প্র–ওটা কোন সালের ডায়েরী?
উ–আমার মনে নেই।
প্র–ডায়েরীর নাম আপনার মনে আছে?
উ–না।
প্র–ডায়েরীর কত পাতা লেখা ছিল?
উ–অর্ধেকেরও বেশী পৃষ্ঠা লিখিত ছিল।
প্র- ফোল্ডারে কত সিট কাগজ ছিল সেগুলো–কি পূর্ণ সিট না অর্ধ সিট?
উ–পূর্ণ সিট–প্রায় ৫০টি সাইক্লোস্টাইলড সিট ছিল।
প্র–স্পেসিং কি আপনি জানেন?
উ-ডবল স্পেসে লেখা।
সাক্ষী আরও বলেন, আমি ঐ কাগজপত্রগুলো পড়েছি এবং এক একটি এক্সাসাইজ খাতা বাড়ীতে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। ওটা বাঁধাই করা ছিল না।
প্র–ঐ এক্সাসাইজ খাতায় আনুমানিক কত পৃষ্ঠা রয়েছে?
উ–ওটা প্রায় আধইঞ্চি পুরু ছিল। এর সবটাই লিখিত ছিল।
সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, আমি নিজে ডায়েরীতে বা এক্সাসাইজ খাতায় কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিনি। আমি এই দলিল সম্পর্কে একমাত্র খান শামসুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করি।
প্র–মিঃ শামসুর রহমান কি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র–তিনি সিএসএস পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন একথা আপনি জানেন কি?
উ–হ্যাঁ।
প্র–অফিসার হিসেবে তিনি অত্যন্ত দক্ষ অফিসার বলে পরিচিত ছিলেন কি?
উ–হ্যাঁ।

প্র–তার সহকর্মীরা তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন তাই না?
উ–হ্যাঁ।
প্র–লেঃ মোয়াজ্জেমের নিকট হতে আপনি যে দলিলপত্র নিয়েছেন তার ব্যাখ্যার জন্য শামসুর রহমান শাহেব আপনাকে মোয়াজ্জম হোসেনের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন কি?
উ–আমি নিজেই এই প্রস্তাব করেছিলাম।
প্র–জনাব শামসুর রহমান কি তখন চট্টগ্রাম ছিলেন?
উ–হ্যাঁ।
প্র–সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জনাব শামসুর রহমান ও লেঃ মোয়াজ্জমের মধ্যে কোন সাক্ষাৎকার ঘটেনি তাই না?
উ–জুলাই মাসে তাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটে। এদের উভয়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আমার বাসায় পরিচয় হয়। জনাব শামসুর রহমান লেঃ মোয়াজ্জমের সঙ্গে কি ধরনের সরকার কায়েম হবে সে সম্পর্কে এবং দলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন।
প্র–আপনি কি এই বৈঠকের কথা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের নিকট বলতে ভুলে গিয়েছিলেন?
উ– ১৯৬৬ সালে আমার বাসায় অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের কথা উল্লেখ করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম।
প্র–আদালতে সাক্ষ্যদানকালেও কি আপনি এর উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলেন?
উ–আমাকে তখন এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়নি।
প্র–এক্সারসাইজ খাতা আপনি কি করেছেন?
উ–ওটা পড়ে আমি ৭ দিন আমার কাছে আমার বাসায় রেখেছিলাম। তারপর আমি তা লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে ফেরত দিই।
প্র-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিতে আপনি কোথাও এক্সারসাইজ খাতার কথা উল্লেখ করেননি।
উ–ফোল্ডার ও ডায়েরী ব্যতীত এক্সারসাইজ খাতার কথা আমি উল্লেখ করেছি কিনা তা আমার মনে পড়ে না। (এরূপ লিপিবদ্ধ নেই)।
প্র–কোন তারিখের বৈঠকে আপনাকে লেঃ মোয়াজ্জম এই ডায়েরী, ফোল্ডার ইত্যাদি প্রদান করেছিলেন?
উ–এই তৃতীয় বৈঠক কোন তারিখে কোন সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা আমি বলতে পারব না। তবে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
প্র–আপনি বলেছেন, প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের রূপরেখা সম্পর্কে আপনাকে বলা হয়েছে যে, সকল সম্পত্তির মালিক হবে রাষ্ট্র শিল্প জাতীয়করণ করা হবে। এসব কথা বলার সময় বিদেশী কোন রাষ্ট্রের নজীর উল্লেখ করা হয়েছিল কি?
উ–কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নজীর উল্লেখ করা হয়নি।

প্র–এরূপ কোন বিদেশী রাষ্ট্রের কথা আপনি জানেন, যেখানে সম্পত্তির মালিকানা সরকারের এবং সকল শিল্প জাতীয়করণ করা হয়েছে?
উ– সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনে এই ব্যবস্থা রয়েছে।
প্র–কুপন ব্যবস্থার কথা জানেন কি?
উ–আমাকে যেসব লেখা দেওয়া হয়েছিল তাতেই আমি প্রথম কুপন প্রথার কথা জানতে পারি।
প্র–আপনাকে নয়া রাষ্ট্রের যে পতাকা দেখান হয়েছিল তা কিসের তৈরী?
উ–তা কাপড়ের তৈরী।
প্র–আপনি বলেছেন, ঐ নিশান সবুজ ও সোনালী রংয়ের ছিল। সবুজ ও সোনালী রংয়ের তাৎপর্য কি?
উ–সবুজ রং স্যামল পূর্ব পাকিস্তানের প্রতীক আর সোনালী হচ্ছে পাটের রং।
প্র–পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার কয়টি রং আছে এবং তার তাৎপর্য কি?
উ–সবুজ ও সাদা। সাদা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কথা নির্দেশ করে এবং সবুজ হচ্ছে রাষ্ট্রের রং।
প্র–প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের পতাকার কোন পরিচয় চিহ্ন ছিল?
উ–শুধুমাত্র পাটের পরিচয় চিহ্ন ছিল।
প্র–প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের পতাকা নৌকা এবং শস্যভাণ্ডারের কোন পরিচয় চিহ্ন ছিল? একথা কি সত্য?
উ–না, সত্য নয়।
প্র–আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিতে পতাকায় পাটের পরিচয় চিহ্নের কথা বলেছিলেন?
উ–আমি একথা উল্লেখ করেছিলাম কিনা আমার মনে পড়ে না।
প্র–আপনি বলেছেন যে, আপনার অনুরোধে আপনার বাসায় কর্মীদের একটি সভা হয়েছিল। সেটা কি এক্সারসাইজ খাতা ফেরৎ দেবার পর অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উ–আমার মনে নেই।
প্র–ঐ সভার একটা আনুমানিক তারিখ বলতে পারেন?
উ–আমার মনে পড়ছে না।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, ১৯৬৬ সালের জুন মাসে এক বৈঠকে পতাকা দেখান হয়। তারপর আমি একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করি। এর দশ দিন পর প্রস্তাবিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমার পাঁচলাইসের বাসা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। আমার বাসার দু'পাশে অন্যান্য বাসা রয়েছে।
প্র–আপনি রিসালদার শামসুল হককে কেমন করে চেনেন?
উ–আমার বাড়ীতে কর্মিসভায় তাকে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

প্র–আপনার কুমিল্লা গমন সম্পর্কে আপনাকে কখন জানান হয়?
উ–কুমিল্লা গমনের ২/১ দিন আগে আমাকে জানান হয়।
প্র–কুমিল্লা গমনের সময় কি আপনারা গাড়ীর জন্য টোল দিয়েছিলেন?
উ–আমরা সোডাপত্রর ব্রীজে গাড়ীর জন্য টোল দিয়েছি এবং গাড়ীর নম্বর রেকর্ড করা হয়েছিল।
প্র–মাসের কোন সপ্তাহে আপনারা কুমিল্লা গিয়েছিলেন?
উ–সপ্তাহ ঠিক বলতে পারব না। তবে জুন মাস বা জুলাই মাস হবে।
প্র–কুমিল্লা যাওয়ার আগে আপনি কুমিল্লা হতে টেলিফোনযোগে কোন বার্তা পেয়েছিলেন?
উ–কুমিল্লা হতে আমি টেলিফোনে কোন বার্তা পাইনি এবং কুমিল্লায়ও কোন বার্তা পাঠাইনি।
প্র–কেউ যদি বলেন যে, ঐ একই সপ্তাহে লেঃ মোয়াজ্জম তার হিলম্যান গাড়ী করে পরিবারপরিজন নিয়ে কুমিল্লা গিয়েছিলেন?
আপনি কি তা সত্য বলে স্বীকার করবেন?
উ–না, একথা সত্য নয়।
প্র–আপনি 'ডি ডে'র কথা বলেছেন। এই ডি ডে'র জন্য কোন তারিখ বা মাস নির্ধারিত হয়েছিল কি?
উ–না, কোন তারিখ বা মাস নির্ধারিত হয়নি।
প্র–কোন বৎসর নির্ধারিত হয়েছিল কি?
উ–না।
প্র-আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিতে একথা উল্লেখ করেছিলেন কি যে, ক্যাপ্টেন আলমের বাসার বৈঠকে ডি ডে সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল?
উ–আমার মনে পড়ছে না (এরূপ লেখা নেই)।
এই সময় বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মনজুর কাদের বলেন যে, সাক্ষী তার স্বীকারোক্তিতে ডি ডে'র বর্ণনা দিয়েছেন তবে 'ডি ডে' সম্পর্কে শুধু মোটামুটি বলা হয়েছিল তবে ডি ডে বলে উল্লেখ করা হয়নি।
প্র–ক্যাপ্টেন আলমের গৃহে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমান্ডো পদ্ধতিতে পূর্ব পাকিস্তানের ক্যান্টনমেন্টগুলো দখলের পরও আপনারা ক্ষমতা দখল করার পর কি হবে তা আলোচনা করেছিলেন কি?
উ–তা আলোচনা করিনি।
প্র–আপনি বলেছেন যে, নতুন লোক দলে আসার জন্য ক্যাপ্টেন আলম সকল প্রকার চেষ্টা চালাবেন বলে বলেছেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আপনি একথা উল্লেখ করেননি (একথা লিপিবদ্ধ নেই)।
উ–আমার মনে পড়ছে না।
প্র–পুলিশের নিকটও আপনি এর উল্লেখ করেননি (এরূপ লিপিবদ্ধ নেই)।
উ–আমার মনে পড়ছে না।

প্র–জুলাই মাসের পূর্বে আপনি এই আন্দোলনের ব্যাপারে কখনও কুমিল্লা গিয়েছিলেন কি?
উ–না।
প্র–একথা কি ঠিক যে, আপনি ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে দলের কাজের জন্য কুমিল্লা গমন করেছিলেন?
উ–একথা ঠিক নয়।
প্র–আদালতে আপনি বলেছেন যে, ক্যাপ্টেন শওকত নতুন লোক দলভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করবেন বলে আপনাকে জানিয়েছেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আপনি একথা বলেননি?
উ–আমার মনে পড়ছে না।
প্র–আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কি একথা বলেছেন যে, ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামানের উল্লেখক্রমে আপনি ক্যাপ্টেন হুদার সাথে তার গ্রীন রোডের বাসায় দেখা করেছিলেন?
উ–আমার মনে পড়ছে না।
প্র–ক্যাপ্টেন হুদার সাথে আপনার কোন মাসে এবং মাসের কোন সপ্তাহে সাক্ষাৎ হয়?
উ–১৯৬৬ সালের জুলাই অথবা আগস্টে। সম্ভবত জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে অথবা আগস্টের প্রথম সপ্তাহে।
জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন, একথা সত্য যে, ক্যাপ্টেন হুদার গ্রীন রোডের ফ্ল্যাটে আমি ও মোয়াজ্জেম, ক্যাপ্টেন হুদা এবং আলিমকে আন্দোলনে যোগদানে উৎসাহ প্রদান করি।
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একথা বলেছিলেন যে, আপনি আগেই ঢাকায় হুদার সাথে ও চট্টগ্রামে নূরুজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাদের আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করেন?
উ–এরূপ বলেছি কিনা সেকথা আমার মনে নেই (এরূপ লিপিবদ্ধ আছে)।
প্র–আপনি কি পুলিশের নিকটও একথা বলেছিলেন?
উ–আমার মনে নেই (এরূপ লিপিবদ্ধ আছে)।
প্র–আপনি পুলিশের নিকট একথা উল্লেখ করেননি যে, ক্যাপ্টেন শওকত দলে নতুন লোক সংগ্রহের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন বলে আপনাকে জানিয়েছেন?
উ–আমার মনে নেই।
প্র–আপনি বলেছেন যে, কুমিল্লা হতে ফিরে গিয়ে আপনি আপনার চট্টগ্রামের বাসায় ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান ও লেফট্যানেন্ট কম্যান্ডার মোয়াজ্জেমকে এক নৈশভোজের দাওয়াত দিয়েছিলেন কিন্তু আপনি ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশের নিকট একথা উল্লেখ করেননি।
উ–আমার মনে নেই আমি একথা উল্লেখ করেছি কি না।

সাক্ষী আরও বলেন, ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশের নিকট কুমিল্লা থেকে ফেরার পর আমার বাসায় এই নৈশভোজের কথা আমি উল্লেখ করিনি।
প্র–একথা কি সত্য যে, আদালতে থাকতে অন্য সাক্ষীর জবানবন্দীর সাথে মিল রাখার জন্য আপনি এইসব নতুন কাহিনী বলছেন?
উ–একথা সত্য নয়।
প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিতে আপনি বলেছেন যে, ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে পার্টির বৈঠক আহ্বানের জন্য আপনি লেঃ মোয়াজ্জমকে আপনার ফ্ল্যাট ব্যবহার করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, একথা কি সত্য?
উ–হ্যাঁ, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আমি মোহাম্মদপুরের ফ্ল্যাট ব্যবহারের প্রস্তাবের কথা বলেছি।
প্র–আপনি কি একথা বলেছেন যে, ক্যাপ্টেন আলম ও ক্যাপ্টেন হুদাকে দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত করাবার উদ্দেশ্যে জুন-জুলাইয়ের এক সপ্তাহ পর আপনি একটি বৈঠক অনুষ্ঠান করতে চান?
উ–সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের কোন এক সময়ে চট্টগ্রামে মোয়াজ্জম আমাকে ঢাকায় একটি সভা ডেকে আলম ও হুদাকে প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত করতে বলেছিলেন তখন আমি আমার ফ্ল্যাট ব্যবহারের প্রস্তাব দেই।
প্র–আপনি কি পুলিশের নিকট একথার উল্লেখ করেছিলেন?
উ–আমার মনে পড়ে না।
প্র–লেঃ মোয়াজ্জম যে সময় তার হিলম্যান গাড়ী করে এসেছিলেন তখন আপনার ফ্ল্যাটে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তা উল্লেখ করেননি?
উ–কুমিল্লা হতে প্রত্যাবর্তনের এক সপ্তাহ পরে আমার ফ্ল্যাটে যে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশের নিকট আমি তার উল্লেখ করিনি।
প্র–আপনি সভা অনুষ্ঠানের জন্য আপনার ফ্ল্যাট ব্যবহারের প্রস্তাব কখন দিয়েছিলেন?
উ–সম্ভবত জুলাই-আগস্ট মাসে।
প্র–১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর/অক্টোবরে কি কাজের জন্যে আপনার বাড়ী গিয়েছিলেন?
উ–আন্দোলনের একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্যে। কারণ বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য কোন জায়গা ছিল না।
প্র-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দীতে আপনি কি বলেছিলেন যে, ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে খান শামসুর রহমান আপনার বাসায় গিয়েছিলেন এবং আপনি তাঁকে সংগঠন সম্পর্কে বলেছেন?
উ-জী না। এছাড়া পুলিশের নিকটও আমি একথা বলিনি।

প্র–১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কোন সপ্তাহে লেঃ মোয়াজ্জম আপনার বাসায় বৈঠক আহ্বান করেছিলেন?
উ–আমি তা বলতে পারি না।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত কোন ডায়েরী নেই। তাঁর একটি অফিস ডায়রী আছে। তবে তাতে তাঁর বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত এবং যাওয়া ও আসার সময় লেখা হয় নাই।
প্র–১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের বৈঠকের তারিখ কখন ঠিক করা হয়েছিল?
উ–সে মাসেই ঠিক করা হয়েছিল।
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসে লেঃ মোয়াজ্জম আপনাকে বলেছিলেন যে, ঢাকায় আন্দোলনের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে?
উ–আমার তা স্মরণ নেই।
(রেকর্ডে তা আছে।)
প্র–কোন সময় পর্যন্ত খান শামসুর রহমান সি ডি-এ'র চেয়ারম্যান ছিলেন?
উ–তা আমি নির্দিষ্ট করে বলতে পারি না।
প্র–খান শামসুর রহমানকে কিভাবে বৈঠক অনুষ্ঠানের সংবাদ দেয়া হয়েছিল?
উ–আমার মনে পড়ে লেঃ মোয়াজ্জম আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি দলের সদস্যদের বৈঠক অনুষ্ঠানের সংবাদ দেবেন। তবে কিভাবে তা জানাবেন তা তিনি আমাকে বলেননি।
প্র–আপনাকে কিভাবে বৈঠকের সংবাদ জানানো হয়েছিল?
উ–লেঃ মোয়াজ্জম আমার অফিস অথবা বাড়ীতে গিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন।
প্র–১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রামে আন্দোলনের কর্মী আছে বলে আপনি কি জানতেন?
উ–জী হ্যাঁ। জানতাম।
প্র–ক্যাপ্টেন আলীম তখন কোথায় ছিলেন?
উ–ক্যাপ্টেন আলীম ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় ছিলেন। ক্যাপ্টেন হুদাও তখন ঢাকায় ছিলেন।
প্র– ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরের কতদিন আগে আপনি ক্যাপ্টেন হুদাকে ঢাকায় দেখেছিলেন?
উ–১৯৬৬ সালের জুলাই অথবা আগস্ট মাসে ক্যাপ্টেন হুদাকে আমি ঢাকায় দেখেছি। তবে সঠিক তারিখ আমি বলতে পাচ্ছি না।
প্র–ক্যাপ্টেন মোতালিব কি এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ।

প্র–বৈঠকের কতদিন আগে আপনাকে খবর দেয়া হয়েছিল?
উ–তিন/চার দিন আগে লেঃ মোয়াজ্জম আমাকে খবর দিয়েছিলেন।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, বৈঠকে যোগদানের জন্যে তিনি লেঃ মোয়াজ্জমের সাথে একত্রে আসেননি। এছাড়া তিনি বিমানে না তাঁর 'কারে' ঢাকায় এসেছিলেন তাও তাঁর স্মরণ নেই।
প্র–১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কতদিন পূর্ব থেকে লুৎফুল হুদা আপনার বাড়ীতে ছিলেন?
উ–আমি তা সঠিকভাবে বলতে পারছি না।
প্র–তখন এল এস সুলতানউদ্দিন ও স্টুয়ার্ড মুজিব কোথায় থাকতেন?
উ–এল এস সুলতানউদ্দিন ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে করাচী ছিলেন এবং স্টুয়ার্ড মুজিব আমার ফ্ল্যাটে ছিলেন বলে আমার স্মরণ আছে।
প্র–স্টুয়ার্ড মুজিব কি তখন চাকুরীতে ছিলেন?
উ–আমার যদ্দুর মনে পড়ে তিনি তখন চট্টগ্রামে নৌবাহিনীতে চাকুরীরত ছিলেন।
প্র–বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্যে তিনি কি ছুটি নিয়েছিলেন?
উ–কেউ চাকুরীতে নিয়োজিত থাকলে তাঁকে ছুটি নিতে হয় অথবা কাজ উপলক্ষে আসতে হয়।
প্র–বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাদের সবাইকে কি লুৎফুল হুদার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছিল?
উ–আমার তা মনে নেই।
প্র–সেই বৈঠক কখন শুরু হয়েছিল এবং কতক্ষণ পর্যন্ত চলেছিল?
উ–দুপুর ২টা থেকে ৩টার মধ্যে শুরু হয়ে এক ঘণ্টা পর্যন্ত বৈঠকের কাজ চলেছিল।
প্র–১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরের বৈঠকে যোগ দেবার জন্যে আপনি কখন ঢাকা এসেছিলেন?
উ–আমার যতদূর মনে পড়ে আমি বৈঠকের দিনই ঢাকা এসেছিলাম।
প্র–আপনার আগমনের সময়টা কখন ছিল?
উ–সঠিক সময় আমার জানা নেই। তবে বৈঠক হওয়ার আগেই আমি এসে পৌঁছেছিলাম।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, বৈঠকে যোগদানকারী সদস্যদের জন্যে আমি সামান্য আহারের ব্যবস্থা করেছিলাম। এয়ারপোর্ট রোডের জবালিমার হোটেল থেকে আমি খাবার এনেছিলাম এবং তাঁদেরকে পরিবেশন করেছিলাম।
প্র–বৈঠকের সদস্যদের জন্যে আপনি নিজে কি হোটেল থেকে খাবার এনেছিলেন?
উ–জী না। লুৎফুল হুদাকে পাঠিয়ে এনেছি।

প্র–কি কি খাবার পরিবেশন করেছিলেন?
উ–কাবাব আর নানরুটি।
প্র–কত লোকের জন্যে খাবারের আয়োজন করতে হবে তা কি আপনি আগে অনুমান করেছিলেন?
উ–আমি ১২/১৪জন লোকের খাবারের ব্যবস্থা করেছিলাম। এছাড়া যে কামরায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানেই খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল।
প্র–বৈঠক শুরুর কতক্ষণ আগে আপনি এসে পৌঁছেছিলেন?
উ–তা আমি সঠিক করে বলতে পারছি না।
প্র–পুলিশের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দীতে আপনি কি বলেছিলেন যে, ঢাকা পৌঁছে আপনি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের বৈঠকে দেখেছেন?
উ–তা আমার স্মরণ নেই।
(রেকর্ডে তা আছে।)
প্র–ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দীতে আপনি কি বলেছিলেন যে, নির্দিষ্ট তারিখে আপনি ঢাকা আসেন এবং ক্যাপ্টেন আলম ও অন্যান্য ব্যক্তিদের বৈঠকে দেখেন।
উ–জী হ্যাঁ, বলেছিলাম।
প্র–বৈঠকের আগে দলের কারও সঙ্গে আপনি কি বৈঠকের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কোন আলোচনা করেছিলেন?
উ–লেঃ মোয়াজ্জমের সাথে আমি আলোচনা করেছি। কিন্তু অন্য কারও সাথে করিনি।
প্র–১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কোন সময়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উ–আমি তা জানি না।
প্র–১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খান শামসুর রহমান কি চট্টগ্রামে ছিলেন?
উ–তাও আমার জানা নেই।
উ–সেসময়ে তিনি ঢাকা ছিলেন বলে আমার স্মরণ আছে।
প্র–আপনি কি বলতে পারেন খান শামসুর রহমান কিভাবে ঢাকা এসেছিলেন?
প্র–তিনি কোথা থেকে ঢাকা এসেছিলেন?
উ–আমি তা বলতে পারছি না।
প্র–লেঃ মোয়াজ্জম কখন এবং কিভাবে এসেছিলেন?
উ–আমি তা জানি না। তবে সেসময়ে তিনি চট্টগ্রামে চাকুরীরত ছিলেন।
প্র–সেই বৈঠকে কি আলোচনা করা হয়েছিল?
উ– বৈঠকে সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য এবং তা বাস্তবায়িত করার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
প্র–বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাদের সবাই কি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ। প্রায় সবাই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্র–সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন মতভেদ দেখা দিয়েছিল কি?
উ-আমার যতদূর মনে আছে সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য এবং তা বাস্তবায়িত করার পদ্ধতি নিয়ে বৈঠকে কোন মতভেদ হয়নি।
প্র–লেঃ মোয়াজ্জমকে আপনি কখনও কি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, অধিক সংখ্যক সিনিয়র সিভিল সার্ভেন্টদের সংগঠনে টেনে আনতে হবে?
উ–জী হ্যাঁ, বলেছিলাম।
প্র–আপনি নিজে কি কোন সি, এস, পি'র সাথে আলোচনা করেছিলেন?
উ–খান শামসুর রহমান ছাড়া অন্য কোন সি এস পি'র সাথে আমি সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করিনি।
প্র–আপনি কি পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী কোন বাঙ্গালী সিনিয়র সামরিক অফিসারকে চেনেন?
উ– জী হ্যাঁ। আমি তাঁদের বেশ কয়েকজনকে চিনি।
প্র–তাঁদের নাম বলুন।
উ–কর্নেল রব, কর্নেল রহমান, কর্নেল জব্বার, লেঃ কর্নেল মাসকুরুল হক ও আরও কয়েকজন মেজর ও ক্যাপ্টেনকে আমি চিনি।
প্র–আপনাদের সংগঠনে তাদের আনার জন্যে আপনি কি তাঁদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন?
উ–না।
প্র–চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে সাক্ষাতের আগে কর্নেল ওসমানীর সাথে আপনার যোগাযোগ ছিল কি?
উ–জী না।
প্র–আপনার পরিচিত সামরিক বাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানী সিনিয়র অফিসাররা তখন কোথায় ছিলেন?
উ–কর্নেল রব ও কর্নেল জব্বার চট্টগ্রাম ছিলেন আর অন্যান্যরা ঢাকায় ছিলেন। কর্নেল রব এখন চট্টগ্রাম আছেন তবে ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি চট্টগ্রাম ছিলেন কিনা আমি জানি না। তবে কর্নেল জব্বার তখন চট্টগ্রাম ছিলেন।
প্র–১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরের বৈঠকে আন্দোলনের কোন সদস্য আপনাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করেছিলেন কি?
উ–সংগঠনের কোন কোন সদস্য প্রশ্ন করেছিলেন।
প্র–বৈঠকের আগে লেঃ মোয়াজ্জমের সাথে এ ব্যাপারে আপনি আলোচনা করেছিলেন কি?
উ–তা আমার স্মরণ নেই।
প্র–বৈঠকে সংগঠনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতির গোপনীয়তা রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা ছিল কি?
উ–জী হ্যাঁ। বৈঠকে যোগদানকারী সকলেই গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমি নিজেও তা দিয়েছি।

প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, পরবর্তী কোন একসময় খান শামসুর রহমান, কর্নেল ওসমানীর সাথে যোগাযোগ করবেন বলে আপনাকে জানিয়েছিলেন?
উ–আমার তা মনে নেই।
প্র–কর্নেল ওসমানীকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফেরার পথে লিফট দেয়া ছাড়া তাঁর জন্যে আপনি আর কি করেছিলেন?
উ–জী না। তাঁর জন্যে আমি আর কিছু করিনি।
প্র–কর্নেল শেখকে টেলিফোনে আপনি কি বলেছিলেন?
উ–টেলিফোন পাওয়ার পর আমি কর্নেল শেখকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন কর্নেল ওসমানী আমার সাথে আলোচনা করতে চান। এছাড়া তাঁর সাথে কথা বলতে আমি ইতস্ততঃ করছিলাম।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, টেলিফোনে কল ও কর্নেল ওসমানীর সম্পর্কে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশের নিকট জবানবন্দীতে কিছুই বলেননি। এছাড়া কর্নেল ওসমানীর সাথে টেলিফোনে কথা বলেছিলেন একথাও তিনি ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশকে বলেননি।
প্র–আপনি কি পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, বিকেলে লেঃ মোয়াজ্জম ও আপনি খান শামসুর রহমানের বাড়ীতে যান এবং তাঁকে লেঃ মোয়াজ্জমের বাড়ীতে বৈঠকে যোগদানের জন্যে অনুরোধ করেন?
উ–জী না।
প্র– সেসময় খান শামসুর রহমান কোথায় ছিলেন?
উ–চট্টগ্রামের মোহাম্মদ আলী রোডে একটি বাড়ীতে।
প্র–সেটা কার বাড়ী?
উ–সি, ডি, এ, চেয়ারম্যানের বাড়ী। আগে ছিল আই,সি,আই কোম্পানীর বাড়ী। কিন্তু পরে সিডিএ'র চেয়ারম্যানের জন্যে বাড়ীটি রিকুইজিশন করা হয়।
প্র–কিভাবে আপনারা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারে গিয়েছিলেন?
উ–লেঃ মোয়াজ্জমের মস্কোভিচ গাড়ী যোগে।
প্র–কোথা থেকে আপনারা রওয়ানা হয়েছিলেন?
উ–আমার বাসা থেকে লেঃ মোয়াজ্জম আমাকে তুলে নেন।
প্র–ইপিআর সেন্টারে যেতে কি গাড়ী থামিয়ে গাড়ীর নম্বর রেকর্ড করা হয়?
উ- গাড়ীর নম্বর রেকর্ড করার নিয়ম আছে। তবে সবসময় তা করা হয় না।
প্র–আপনাদের মস্কোভিচ 'কার নম্বর' কি গেটে রেকর্ড করা হয়েছিল?
উ– জী না। আমাদের গাড়ী থামান হয়নি।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ইপি আর সেন্টারে প্রবেশ দ্বারে আড়াআড়িভাবে বাঁশ ফেলা আছে। এবং সেখানে লোক পাহারা আছে। তবে সেখানে কোন গাড়ী থামিয়ে নম্বর রেকর্ড করতে তিনি দেখেননি। এছাড়া তাঁরা কোন সামরিক পোশাকেও ছিলেন না।

প্র–ক্যান্টনমেন্ট থেকে কর্নেল ওসমানী কোথায় গেলেন?
উ–আমার পি, আই, এ গাড়ীর ড্রাইভার তাঁকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে এক্কোরেজ-এর বৈঠকে নিয়ে নামিয়ে দেয়।
প্র–একথা কি আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বা পুলিশের নিকট বলেছিলেন যে, আপনার ড্রাইভার তাকে ইপিআরসি মেস থেকে তুলে এনে এক্কোরেজে নামিয়ে দিয়েছিল?
উ–জী না।
প্র–সিনিয়র সামরিক অফিসারদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে কি এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, সিনিয়র সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে এই বৈঠক হয়েছিল?
উ–তা আমার স্মরণ নেই।
(রেকর্ডে তা আছে)
প্র–আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, শুধু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে লেঃ মোয়াজ্জম ও আপনি ছাড়া আর মাত্র কর্নেল ওসমানী ও জনাব শামসুর রহমানকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল?
উ–তা আমার মনে নেই।
(রেকর্ডে তা আছে।)
প্র–একথা কি সত্য যে, সিনিয়র পূর্ব পাকিস্তানী অফিসারদের জড়ানোর জন্যে আপনাকে এ বৈঠকের কথা বলতে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে?
উ–জী না। একথা সত্য নয়।
প্র–লেঃ মোয়াজ্জম বরিশাল বদলী হওয়ার পর আন্দোলনের নেতৃত্ব কে করবে–সে সম্পর্কে আপনি কোন আলোচনা করেছিলেন?
উ–তা আমার স্মরণ নেই।
প্র–আন্দোলনের তহবিলের আয়-ব্যয় সম্পর্কে লেঃ মোয়াজ্জম আপনার সাথে কোন আলোচনা করেছিলেন কি?
উ–লেঃ মোয়াজ্জম টাকা আদায় সম্পর্কে আমার সাথে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু টাকার হিসাব ও ব্যয় সম্পর্কে তিনি কোন আলোচনা করেননি।
প্র–পঁচিশ হাজার টাকা আপনি কোথায় রেখেছিলেন?
উ–পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে আমি পনের হাজার টাকা ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের চট্টগ্রাম শাখায় জমা রেখেছিলাম। বাকী দশ হাজার থেকে স্টুয়ার্ড মুজিবকে ৫ হাজার টাকা দিয়েছি এবং আমার কাছে নগদ ৫ হাজার টাকা রেখেছিলাম।
এখানেই গতকাল সাক্ষীর জেরা অসমাপ্ত থাকে। আজ পুনরায় জেরা শুরু হবে।

দৈনিক পয়গাম

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

ফ্লাইট লেঃ মীর্জা রমিজের জেরার ৪র্থ দিবস

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ৫নং রাজসাক্ষী পি, আই, এ'র চট্টগ্রাম জেলার ম্যানেজার ফ্লাইট লেঃ মীর্জা মোহাম্মদ রমিজের জেরা গতকল্য (বুধবার) চতুর্থ দিবসেও অব্যাহত থাকে।

প্রাদেশিক পরিষদের স্পীকার জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরীর মৃত্যুতে শোক প্রদর্শনের জন্য সকাল ৯টা হইতে ১১টা পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন বন্ধ থাকে।

গতকল্য (বুধবার) সকাল এগারটায় অধিবেশন শুরু হইলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান ৫নং রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজকে জেরা করেন।

প্রশ্ন–ইহা কি ঠিক যে, জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও মিঃ মানিক চৌধুরীকে জড়িত করার উদ্দেশ্যে আপনি বলিয়াছেন যে, অর্থের সূত্র পাইয়াছে বলিয়া লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আপনাকে বলিয়াছে?

উত্তর–না, ইহা ঠিক নহে।

প্রশ্ন–টেলিগ্রাম পাইয়া লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন কখন ঢাকায় পৌঁছিয়াছিলেন?

উত্তর–তিনি কখন ঢাকা পৌঁছিয়াছিলেন তাহা আমি সঠিকভাবে জানি না।

প্রশ্ন–আপনি কখনও বরিশাল গিয়াছিলেন কি?

উত্তর–হ্যাঁ।

প্রশ্ন–কিভাবে?

উত্তর–হেলিকপ্টারে।

প্রশ্ন–'রকেট' সার্ভিসের নাম শুনিয়াছেন কি?

উত্তর–বরিশাল হইয়া খুলনা-ঢাকায় চলাচলকারী 'রকেট' নামে ষ্টীমার সার্ভিস আছে তাহা জানি।

প্রশ্ন–সভায় যোগদানের জন্য আপনি কোন্ তারিখে ঢাকায় আসিয়াছিলেন?

উত্তর–সভায় যোগদানের জন্য আমি ২৯শে বা ৩০শে মার্চ ঢাকা আসিয়াছিলাম।

প্রশ্ন–আপনি কি ছুটি লইয়া বা ডিউটি থাকাকালে আসিয়াছিলেন?

উত্তর–আমি এখন স্মরণ করিতে পারিতেছি না। তবে আমি সম্ভবতঃ ছুটিতে বা ডিউটিরত অবস্থায় ঢাকা আসিয়াছিলাম।

প্রশ্ন–ডিউটিরত অবস্থায় আসিলে পি আই এ অফিসে রেকর্ড করা হইত কি?

উত্তর–হ্যাঁ।

প্রশ্ন–সেই রেকর্ড কোথায় পাওয়া যাইবে?

উত্তর–আগমনের রেকর্ড পি, আই, এ'র এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার কর্তৃক রক্ষিত অফিসার্স টেম্পোরারী ডিউটি ফাইলে পাওয়া যাইবে।

প্রশ্ন–আলোচ্য সভা ৩০শে মার্চ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কি?

উত্তর– উক্ত সভা ৩০শে মার্চ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিতে পারে। অথবা ৩১শে মার্চ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিতে পারে।

প্রশ্ন–সঠিক কোন্ তারিখে হইয়াছিল?

উত্তর–এই দুই তারিখে কোন দিন সভা হইয়াছিল তাহা আমি সঠিকভাবে বলিতে পারি না।

এই পর্যায়ে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান ৫নং রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজের হাতে ভ্রমণব্যয় সংক্রান্ত একটি বিল (পি, আই, এ) প্রদান করেন।

উক্ত রিপোর্টে ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে তাঁহার কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বরিশাল ঘুরিয়া চট্টগ্রাম হইতে ঢাকা আসিয়া ভ্রমণভাতা বিল সন্নিবেশিত হইয়াছে। রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজ ভ্রমণের বিলটি আদালতে পড়িয়া শোনান।

উক্ত বিলে দেখা যায় যে, ১৯৬৭ সালের ২৯শে মার্চ বেলা ১০টায় তিনি (মীর্জা রমিজ) মোটরগাড়ীতে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন এবং বেলা ৩টায় কুমিল্লা পৌঁছেন। তিনি ৩০শে মার্চ অপরাহ্ন ১টায় মোটরগাড়ীতে কুমিল্লা ত্যাগ করেন এবং অপরাহ্ন ৫টায় চাঁদপুর পৌঁছেন। ৩০শে মার্চ রাত ১০টায় তিনি চাঁদপুর ত্যাগ করেন এবং ৩১শে মার্চ ভোররাত্র সাড়ে ৩টায় বরিশাল পৌঁছেন। ৩১শে মার্চ অপরাহ্ন ৪টায় তিনি বরিশাল ত্যাগ করেন ও রাত ১১টায় ঢাকা পৌঁছেন। বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে মীর্জা রমিজ বলেন, টি, এ, বিল হইতে দেখা যায় যে, ৩১শে মার্চ অপরাহ্ন ৪টায় আমি বরিশাল ত্যাগ করি ও রাত ১১টায় ঢাকা পৌঁছি। মীর্জা রমিজ এই পর্যায়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে বলেন যে, সভায় বিপ্লবীদের যোগদানের জন্য তিনি কখনও কখনও "বানোয়াট টিএ বিল" দাখিল করিতেন।

প্রশ্ন–যদি এই বিলটি সত্য বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে ৩১শে তারিখে ঢাকায় সভা করা সম্ভব নয়–তাই নয় কি?

উত্তর–হ্যাঁ।

প্রশ্ন–বিলে কুমিল্লা ও বরিশাল সফরের উদ্দেশ্য কি দেখান হইয়াছিল?

উত্তর–কুমিল্লা রুরাল একাডেমীতে পি, আই, এ 'সেলস প্রমোশন' ও বরিশালে পি, আই, এ'র স্থানীয় এজেন্ট নিয়োগ। এই পর্যায়ে রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজ বলেন যে, পি, আই, এ'র চট্টগ্রাম জেলা ম্যানেজার হিসাবে তিনি কুমিল্লা ও চাঁদপুর সফর করিতে পারেন না। কারণ কুমিল্লা ও চাঁদপুর

পি, আই, এ ঢাকা জেলার অধীন। তবে বরিশাল পি, আই, এ চট্টগ্রাম জেলার অধীন বলিয়া তিনি (রমিজ) বরিশাল সফর করিতে পারিতেন বলিয়া উল্লেখ করেন।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের প্রশ্নের জবাবে মীর্জা রমিজ বলেন যে, ডিউটিরত অবস্থায় কুমিল্লা ও চাঁদপুর সফর করার জন্য হয়ত তিনি (মীর্জা রমিজ) পি আই এ'র এরিয়া ম্যানেজারের অনুমতি লইয়াছিলেন।

প্রশ্ন–ভ্রমণভাতা বিল দেখার পরও কি আপনি ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসের সভায় নির্দিষ্ট তারিখ বলিতে পারেন না?

উত্তর–সভা ৩০শে বা ৩১শে হইয়াছিল কিনা, এই বিল দেখার পরও আমি সঠিকভাবে বলিতে পারি না। তবে আলোচ্য সভা রাত ৯টায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ও প্রায় ১ ঘণ্টাকাল চলিয়াছিল বলিয়া রাজসাক্ষী উল্লেখ করেন।

প্রশ্ন: প্রফেসার খালেক (প্যাথলজিষ্ট) ও ডাঃ কে, এস, আলম কি কোন সময় আপনাকে পরীক্ষা করিয়াছিল?

উত্তর: হ্যাঁ।

এই পর্যায়ে মীর্জা রমিজ বলেন, তিনি কোন বিশেষ রোগে ভুগিতে থাকায় পি, আই এ'র মেডিক্যাল অফিসারকে দেখান এবং মেডিক্যাল অফিসার তাঁহাকে (মীর্জা রমিজকে) আলোচ্য দুইজন চিকিৎসককে দেখাইতে বলেন।

প্রশ্ন: কোন সময় এই ঘটনা ঘটে?

উত্তর: ১৯৬৬ সালে।

পরে আবার বলেন যে, ইহা ১৯৬৭ সালে–১৯৬৬ সালে নহে।

প্রশ্ন: কোন মাসে?

উত্তর: মার্চ হতে মে মাসের মধ্যে আমি উক্ত চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়াছিলাম।

প্রশ্ন: আপনি কি জানেন যে, প্যাথলজি প্রফেসার ডাঃ খালেক লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের ভায়রা?

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন: ডাঃ কে, এস, আলমও যে লেঃ মোয়াজ্জেমের বৈবাহিক সূত্রে ভাই হয় তাহা জানেন কি?

উত্তর: না, আমি জানি না।

প্রশ্ন: ডাঃ খালেক ও ডাঃ কে, এস, আলমের নিকট লইয়া যাওয়ার জন্য আপনি কি লেঃ মোয়াজ্জেমকে অনুরোধ করিয়াছিলেন?

উত্তর: না। বরং লেঃ মোয়াজ্জেম স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ডাঃ খালেকের সহিত দেখা করার জন্য আমাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

প্রশ্ন: আপনি জানেন কি যে, ডাঃ খালেক চলতি সালে প্রেসিডেন্টের "প্রাইড অব পারফরমেন্স" পুরস্কার পাইয়াছিলেন?

উত্তর: আমি জানি না।

প্রশ্ন: ডাঃ খালেকের দ্বারা চিকিৎসার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য ঢাকায় আসিতে আপনি লেঃ মোয়াজ্জেমের নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন (আদালতে চিহ্নিত ৬/৩নং)।

উত্তর–ইহা সত্য নহে।

প্রশ্ন–আপনি বলিয়াছেন যে, ৩০শে বা ৩১শে মার্চের সভায় ভারত হইতে "অয়ারলেস সেট" আনয়ন করা সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল?

উত্তর–হ্যাঁ।

প্রশ্ন–"অয়ারলেস সেট" বলিতে কি বুঝায়?

উত্তর–যে সেটে 'তার' ব্যবহার করা হয় না।

প্রশ্ন–যন্ত্রটি কত বড়?

উত্তর–২ ফুট × ১ ফুট হইবে।

প্রশ্ন–এই অয়ারলেস সেটের পাল্লা কত দূর?

উত্তর–আমি বলিতে পারি না।

প্রশ্ন–রেডিও সেট ট্রান্সমিটার সেটে পরিবর্তন করা যায় কি?

উত্তর–কতিপয় যন্ত্র পরিবর্তন করিয়া রেডিও সেটকে ট্রান্সমিটার সেটে পরিবর্তন করা যায়।

প্রশ্ন–একটি অয়ারলেস সেটের মূল্য কত?

উত্তর–আমি বলিতে পারি না।

প্রশ্ন–কতটি 'সেট' আনয়ন করার জন্য ঠিক হইয়াছিল?

উত্তর–৫টি 'সেলভ' সেট ও একটি 'মাষ্টার' সেট আনার জন্য সভায় আলোচ্য হইয়াছিল।

প্রশ্ন–আপনি অয়ারলেস সেট দেখিয়াছেন কি?

উত্তর–আমি বিমানবাহিনীতে থাকাকালীন অয়ারলেস সেট দেখিয়াছি।

প্রশ্ন–পশ্চিম পাকিস্তানের হরিপুরে অয়ারলেস সেট নির্মাণ হয় কি?

উত্তর–আমি বলিতে পারি না।

প্রশ্ন–আপনি অয়ারলেস সেট ব্যবহার করিতে জানেন?

উত্তর–না।

প্রশ্ন–কথিত বিপ্লবী দলের কোন সদস্য অয়ারলেস সেট চালাইতে জানিত কি?

উত্তর–যতদূর আমি জানি, বিপ্লবী দলের কেহই সেট চালাইতে জানিত না।

প্রশ্ন–ট্রান্সিষ্টরাইজড ট্রান্সমিটার ও অয়ারলেস সেটের পার্থক্য জানেন কি?

উত্তর–আমি জানি না।

প্রশ্ন–ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান ও ক্যাপটেন মোতালেব অয়ারলেস সেট ব্যবহারের ট্রেনিং পাইয়াছিলেন?

উত্তর–তাহারা অয়ারসেল সেট চালাইতে পারিত কিনা, আমি জানি না।

প্রশ্ন–কর্পোরাল সামাদ অয়ারলেস ট্রেনিং ইন্সট্রাক্টর ছিলেন?

উত্তর–আমি জানি না।

প্রশ্ন–পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে আপনি কোন বিভাগে ছিলেন?
উত্তর–আমি এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ শাখায় ছিলাম।
প্রশ্ন–জনাব শামসুর রহমান বলেন যে, ১৯৬৭ সালের ৩০শে বা ৩১শে মার্চ তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন না, ঐ সময় তিনি রাওয়ালপিণ্ডিতে ডিউটিরত ছিলেন।
উত্তর–ঐসময় শামসুর রহমান 'পিণ্ডিতে' ছিলেন কিনা আমি জানি না।
প্রশ্ন–১৯৬৭ সালের ৩০ ও ৩১শে মার্চ ক্যাপ্টেন মোতালেব হাসপাতালে ছিলেন?
উত্তর–৩০শে বা ৩১শে মার্চ (১৯৬৭) ক্যাপ্টেন মোতালেব কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতাল (সি, এম, এইচ) এ ছিলেন কিনা আমি বলিতে পারি না।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে মীর্জা রমিজ বলেন, ১৯৬৭ সালের ২৯শে, ৩০শে এবং ৩১শে মার্চ আমি সরকারী কাজে অথবা ছুটিতে অথবা সপ্তাহান্ত কাটানোর জন্য ঢাকা আসিয়াছিলাম কিনা, দলিলপত্র না দেখিয়া তাহা আমি বলিতে পারিব না। সপ্তাহান্তে চট্টগ্রাম ত্যাগের জন্য আমি সম্ভবতঃ এরিয়া ম্যানেজারের নিকট হইতে মৌখিক অনুমতি লইয়াছিলাম। পি, আই, এ-তে সপ্তাহান্ত বলিতে আমরা শুক্রবারের কার্যকালের পরবর্তী সময়কেই বুঝি। কখন হইতে পি, আই, এ-তে শুক্রবারের অপরাহ্ন সপ্তাহান্তের প্রারম্ভ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, তাহা আমি বলিতে পারি না। শুক্রবারের অপরাহ্ন হইতে রবিবারের সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়কে সপ্তাহান্ত বলা হয়। অফিসের অফিসাররা শনিবার কাজ করেন না, তবে অপারেশনাল এবং সিফ্‌ট ডিউটির ষ্টাফের জন্য ইহা কার্যদিবস। শুক্রবারও কার্যদিবস। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর হইতে শুক্রবারের অপরাহ্নকে সপ্তাহান্তের অংশ হিসাবে ধরার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে কিনা তাহা আমার মনে নাই। বৈঠকের পর এখানে এরিয়া ম্যানেজারের সাথে আলোচনা করার জন্য আমি হয়ত দুই/তিন দিন ঢাকা ছিলাম। সরকারী কাজেই যে আমি ঢাকা অবস্থান করি উহা দেখানোর জন্য হয়ত কোন রেকর্ড থাকিতে পারে। ঢাকার অফিসার মুভমেন্ট রেকর্ডে হয়ত ইহা দেখান হইয়াছে।

মীর্জা রমিজ উল্লেখ করেন, আমি আলী রেজাকে নগদে ৫০০ টাকা দেই নাই, তবে তাঁহার লাহোরে যাওয়া এবং সেখান হইতে আসার জন্য একখানি বাকী টিকিট আমি ইস্যু করি এবং এই টিকিটের অর্থ আমার নামে কাটা হয়। যখন আমি এই বাকী টিকিট ইস্যু করি তখন এই টাকা আমার কাছে ছিল। ইহা ছিল পার্টি তহবিলের টাকা। বাকী টিকিটের জন্য কোন লোককে যে সকল সময়েই আবেদন করিতে হয় তাহার কোন নিয়ম নাই।

বাকী টিকিট অনুমোদন করা কিংবা প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি সকল স্থানেই ডিষ্ট্রিক্ট প্রধানের ইচ্ছাধীন। এই সময়ে জনাব ইয়াজদানী ঢাকা ডিষ্ট্রিক্ট প্রধান ছিলেন। চট্টগ্রাম হইতে আলী রেজা নামের বাকী টিকিটখানা ইস্যু করা

হয়। টিকিটখানি ছিল ঢাকা হইতে লাহোর যাওয়ার এবং সেখান হইতে প্রত্যাবর্তনের। কোন বাকী টিকিটের সহিত ব্যাংক গ্যারান্টি থাকিলেও ডিষ্ট্রিক্ট মানেজার এই আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।

ব্যক্তিগত টিকিটের বেলায় বাকীর আবেদনের জন্য কোন ফর্ম নাই। তবে কোন ট্রাভেলিং এজেন্সীকে একটি নির্দিষ্ট ফর্মে এজন্য আবেদন করিতে হয়। ডিষ্ট্রীক্ট ম্যানেজার যে কোন সময় কোন কারণ না দর্শাইয়াই বাকী টিকিটের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন। কোন বাকী টিকিটের যাত্রী যদি টিকিটের টাকা পরিশোধ না করেন তাহা হইলে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানেজারকে তাহার বেতনের টাকা হইতে ইহা পরিশোধ করিতে হয়। কোন ট্রাভেল এজেন্সিও তাহাদের নিজ দায়িত্বে বাকী টিকিট ইস্যু করিতে পারেন। আমি যতদূর জানি পি, আই, এ-র পক্ষ হইতে কখনও 'এখন' ভ্রমণ করুন, পরে ভাড়া দিবেন– এই শ্লোগানটি প্রচার করা হয় নাই। আলী রেজা যখন লাহোর যান তখন তিনি ধানমণ্ডীর কোন একস্থানে থাকিতেন। সেই সময় জনাব রুহুল কুদ্দুস কোথায় থাকিতেন,তাহা আমি জানি না। আলী রেজাকে যখন আমি লাহোর যাওয়ার টিকিট দেই তখন তিনি ধানমণ্ডীর যে রোডে থাকিতেন, সেই একই রোডে জনাব রুহুল কুদ্দুসও থাকিতেন কিনা, তাহা আমি জানি না। নিজের কাজেই আলী রেজা লাহোর যাইতে চান এবং তাহার সহিত আমার আলোচনা হয়। ১৯৬৭ সালের অক্টোবরের কোন একসময়ে আমি বাকী টিকিটখানি ইস্যু করি। সঠিক তারিখটি আমি বলিতে পারিতেছি না। যে দলিলখানি আমার হাতে দেওয়া হইয়াছে উহাতে দেখান হইয়াছে যে, ১৯৬৬ সালের ২৪শে অক্টোবর আলী রেজার বাকী টিকিটখানি ইস্যু করা হয় (ইহা আদালতে ডি/২নং দলিল হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে)। ঢাকার হোটেল শাহবাগে আমার সহিত আলী রেজার এক আলোচনাকালে তাহার লাহোর যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আমাদের হেড অফিসের একাউন্ট সেকশনে বাকী টিকেটসমূহ ইস্যুর রেকর্ডপত্র পাওয়া যাইবে। উক্ত বাকী টিকেটের অর্থ পরিশোধ সম্পর্কিত চালানখানিই আদালতে ডি-ই/২নং দলিল হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজ আরও বলেন, চট্টগ্রাম হইতে ঢাকা যাওয়ার বিমান ভাড়া সম্ভবতঃ ৪৫ টাকা এবং যাওয়া ও আসার ভাড়া ৯০ টাকার কিছু কম হইবে। ১৯৬৭ সালে ভাড়া এইরূপই ছিল। একথা ঠিক নহে যে, মানিক চৌধুরীর নামে বাকী টিকেট ইস্যুর ব্যাপারে আমি যাহা বলিয়াছি উহা মিথ্যা এবং এই মামলার অন্যান্যের সহিত তাহাকে জড়ানোর জন্যই ইহা আমি বলিয়াছি। তাহার বাকী টিকিটের অর্থ পরিশোধের জন্য ক্যাপ্টেন মোতালেবের নিকট রিমাইন্ডার দেয়। আমার গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত এই অর্থ পরিশোধের বিষয়টির মীমাংসা হয় নাই।

দৈনিক পাকিস্তান

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

একরারী সাক্ষী মীর্জা রমীজের জেরা অব্যাহত

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বাদীপক্ষের ৫নং একরারী সাক্ষী এম এম রমিজের জেরা গতকাল বুধবারও অব্যাহত থাকে। বিবাদী পক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান গতকালও তাকে জেরা করেন। জেরা অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় এই দিনের শুনানী শেষ হয়।

গতকাল নির্ধারিত সময়ের দু'ঘণ্টা পর মামলার শুনানী শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের স্পীকার জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরীর মৃত্যুতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শুনানী দু'ঘণ্টা বন্ধ রাখা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় পুনরায় শুনানী শুরু হবে।

জনাব এ সালাম খান

প্র–আপনি দলীয় অর্থের উৎস হিসেবে জনাব এ এফ রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও মানিক চৌধুরী প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন। আপনি বলেছেন যে, লেঃ মোয়াজ্জম আপনাকে জানিয়েছেন যে, উক্ত ব্যক্তিগণ অর্থ সরবরাহ করছেন। তাদের মামলায় জড়িত করার উদ্দেশ্যেই কি আপনি এই ধরনের উক্তি করেছেন?

উ–এ কথা সত্য নয়।

প্র–দলীয় অর্থ দ্বারা ব্যবসায় শুরু করা হলে কি পরিমাণ মুনাফা হবে সে সম্পর্কে আপনারা আলোচনা করেছিলেন কি?

উ–আলোচনা করেছি কিনা মনে পড়ছে না।

এই পর্যায়ে কৌসুলী সাক্ষীর হাতে একটা টেলিগ্রাম প্রদান করেন। সাক্ষী তা দেখে বলেন, উক্ত তারবার্তা অনুসারে লেঃ মোয়াজ্জম বৈঠকে যোগদানের জন্য ঢাকা এসেছিলেন। ১৯৬৭ সালের ৩০শে অথবা ৩১শে মার্চ ঐ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে মোয়াজ্জম হোসেন কোন তারিখে ঢাকা এসেছিলেন তা আমার মনে নেই।

প্র–আপনি কিভাবে বরিশাল গিয়েছিলেন?

উ–হেলিকপ্টারযোগে।

প্র–আপনি কি জানেন যে, খুলনা হতে বরিশাল হয়ে রকেট নামক স্টীমার সার্ভিসে ঢাকা আসা যায়?

উ–হ্যাঁ, জানি।

প্র–উক্ত স্টীমার রাত সাড়ে ৭টা অথবা ৮টায় নারায়ণগঞ্জ পৌঁছে। একথা কি আপনি জানেন?

উ–আমি জানি না।

প্র–বৈঠকে যোগদানের জন্য লেঃ মোয়াজ্জম রকেটযোগে আসতে পারত কি?

উ–রকেটে আসতে হবে এমন কোন কথা নেই। মোটর গাড়ী করেও আসতে পারে।

প্র–আপনি যেদিন মোয়াজ্জমের নিকট হতে তারবার্তা পেয়েছিলেন, বৈঠক ঐদিনই অনুষ্ঠিত হয়েছিল নাকি তারপরের দিন অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উ–আমার মনে নেই।

প্র–ঐ বৈঠক কি ৩০শে মার্চ না ৩১শে মার্চ কোন দিন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সঠিকভাবে আপনি বলতে পারবেন?

উ– আমার মনে নেই।

প্র–আপনি কোন তারিখে ঢাকা এসেছিলেন?

উ–আমি ২৯শে অথবা ৩০শে মার্চ ঢাকা এসেছিলাম।

প্র–আপনি কি ছুটি নিয়ে এসেছিলেন?

উ–তা এখন আমার মনে পড়ছে না। আমি সম্ভবতঃ অফিসের কাজে এসেছিলাম অথবা ছুটি নিয়ে এসেছিলাম।

প্র–অফিসের কাজে আপনার ঢাকা গমনের কোন রেকর্ড আছে ?

উ–আমি যদি অফিসের কাজে এসে থাকি তবে অফিসারদের টেম্পোরারী ডিউটি ফাইলে তার রেকর্ড আছে। ইস্টার্ন ডিভিশনের এ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার ঐ ফাইল দেখেন।

প্র–ঢাকা আপনি কিভাবে এসেছিলেন?

উ–চট্টগ্রাম হতে আমি কিভাবে ঢাকা এসেছি সেকথা মনে নেই।

কৌসুলী তখন সাক্ষীর হাতে তার...বাবদ অর্থ ব্যয়ের রিপোর্ট প্রদান করেন। এই রিপোর্টে ৬৭ সালের মার্চ মাসে তার চট্টগ্রাম হতে ঢাকা গমনের ভ্রমণ ভাতা বিল রয়েছে। সাক্ষী উক্ত রিপোর্ট দেখে বলেন এতে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৬৭ সালের ২৯শে মার্চ আমি মোটরগাড়ী করে সকাল ১০টায় চট্টগ্রাম ত্যাগ করেছি এবং বিকেল ৩টায় কুমিল্লা পৌঁছেছি। ৩০শে মার্চ দুপুর একটায় কুমিল্লা ত্যাগ করে ঐদিনই বিকেল ৫টায় দুপুরে পৌঁছেছি। রাত দশটায়.... ত্যাগ করে রাত সাড়ে ৩টায় বরিশাল পৌঁছেছি। ৩১শে মার্চ বিকেল ৪টায় বরিশাল ত্যাগ করে রাত ১১টায় ঢাকা পৌঁছেছি। সাক্ষী এরপর নিজ থেকে বলেন যে, আমি দলীয় বৈঠকে যোগদানের জন্য কখনও কখনও ভূয়া বিল তৈরী করেছি। এটাও ঐরূপ একটি ভূয়া বিল হয়ে থাকবে। তবে চট্টগ্রাম হতে কুমিল্লা পর্যন্ত আগমন ঠিকমতোই বিলে দেখান হয়েছে। কুমিল্লা হতে

বরিশাল গমনের যে বিবরণ আছে তা ভূয়া। আমি ২৯শে মার্চ কুমিল্লা হতে ঢাকা রওয়ানা হই।

সাক্ষী আরও বলেন, কুমিল্লা ভ্রমণের যে কারণ এই বিলে রয়েছে তাতে দেখান হয়েছে যে, সেলস প্রমোশনের উদ্দেশ্যে আমি কুমিল্লা পল্লী একাডেমীতে গমন করেছি এবং একটি ডোমেস্টিক এজেন্সি পুনরায় স্থাপন সম্পর্কে আলোচনার জন্য বরিশাল গমন করেছি।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, এই বিল পেশ করে আমি অফিস হতে টাকা নিয়েছি।

প্র–উক্ত রিপোর্ট যদি সত্য হয় তবে ১৯৬৭ সালের ৩০শে মার্চ ঢাকায় কোন বৈঠক অনুষ্ঠান সম্ভব হতে পারে না, এটা ঠিক ত?

উ–হ্যাঁ।

প্র–রিপোর্ট সত্য হলে ৩১শে মার্চও ঢাকার বৈঠক অনুষ্ঠান সম্ভব নয় একথা আপনি স্বীকার করেন?

উ–হ্যাঁ।

প্র–আপনি অফিসিয়াল ক্ষমতাবলে কুমিল্লা হতে চাঁদপুর গমন করেছেন একথা কি সত্য?

উ–অফিসিয়াল ক্ষমতাবলে আমি কুমিল্লা বা চাঁদপুর পরিদর্শনে যেতে পারি না। ঐ দুটি স্টেশন পিআইএ'র ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট-এর অধীন। তবে বরিশাল আমি যেতে পারি। কারণ বরিশাল পিআইএ'র চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট-এর অধীনে রয়েছে। সেলস প্রমোশনের জন্য কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী পরিদর্শনও আমার আওতাধীন নহে।

আদালতের এক প্রশ্নের জবাবে জনাব রমিজ বলেন, পিআইএ'র এরিয়া ম্যানেজারের অনুমতি নিয়ে আমি হয়ত সরকারীভাবে কুমিল্লা ও চাঁদপুর পরিদর্শনে গমন করে থাকতে পারি।

সাক্ষী বলেন, ভ্রমণের ব্যয়ের এই রিপোর্ট দেখার পরও আমি সঠিকভাবে বলতে পারব না যে, ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসের বৈঠক ঢাকায় ৩০ তারিখে হয়েছিল না ৩১ তারিখে হয়েছিল। তবে ঐ বৈঠক রাত ৯টার পর অনুষ্ঠিত হয় এবং এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়।

প্র–আপনাকে প্যাথলজির প্রফেসর খালেক এবং সার্জারীর প্রফেসর ডাঃ কে এস আলম কখনও পরীক্ষা করেছিলেন?

উ–পিআইএ'তে চাকুরীর সময় প্রফেসর খালেক ও ডাঃ আলম আমাকে পরীক্ষা করেছিলেন। সাক্ষী বলেন, আমি একটা বিশেষ রোগে ভুগছিলাম। তখন আমি পিআইএ মেডিক্যাল অফিসারকে একথা জানাই। তিনি উক্ত দু'জন ডাক্তারের নিকট পরীক্ষার জন্য আমাকে পাঠান।

প্র–কখন আপনাকে ঐ দু'জন ডাক্তারের নিকট পাঠান হয়?

উত্তরে সাক্ষী প্রথমে বলেন যে, ১৯৬৬ সালের পরে আবার বলেন যে,এসব ১৯৬৬ সালের নহে ১৯৬৭ সালের ঘটনা। আমাকে ১৯৬৭ সালের মার্চ হতে মে মাসের মধ্যে পাঠান হয়েছিল।

প্র–আপনি কি জানেন যে, ডাঃ খালেক লেঃ মোয়াজ্জমের ভায়রা ভাই হন?

উ– হ্যাঁ, জানি।

প্র–ডাঃ আলমও যে মোয়াজ্জমের বৈবাহিক সূত্রে ভাই হয় একথা কি আপনি জানেন?

উ–না।

প্র–একথা কি সত্য যে, আপনি লেঃ মোয়াজ্জমকে অনুরোধ করেছিলেন তার আত্মীয় ডাঃ খালেকের নিকট আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য?

উ–না বরং মোয়াজ্জম নিজেই আমাকে বলেছিলেন যে, ডাঃ খালেকের নিকট গিয়ে পরীক্ষা করবার জন্য। ডাঃ খালেক প্যাথলজিতে একজন বিশেষজ্ঞ বলেও মোয়াজ্জম আমাকে জানিয়েছিলেন।

প্র–একথা সত্য যে, আপনাকে প্যাথলজি দ্বারা পরীক্ষা করার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যই মোয়াজ্জম ঢাকা আসার কথা টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলেন?

প্র–আপনি কি জানেন যে, ডাঃ খালেক কৃতিত্বের জন্য এবছর প্রেসিডেন্টের নিকট হতে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছেন?

উ– আমি জানি না।

সাক্ষী জেরার জবাবে আরো বলেন একথা সত্য নয় যে, মোয়াজ্জমের তারবার্তায় আমি পরে স্বাক্ষর করেছি ও তারিখ দিয়েছি।

প্র-অয়্যারলেস সেট জিনিসটা কি?

উ-বিনা তারে যা কাজ করে তাকে 'অয়্যারলেসসেট' বলে।

প্র–'অয়্যারলেস সেট' দিয়ে কি কাজ হয়?

উ–এটা দিয়ে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করা হয়।

প্র–একটি অয়্যারলেস সেটের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কত?

উ–দৈর্ঘ্য-প্রস্থ যথাক্রমে ২ ফুট ও ১ ফুট। এছাড়া আবার এর চেয়ে ছোটও হতে পারে।

প্র–দুই ফুট×এক ফুট যন্ত্র দিয়ে কত দূরত্বের ব্যবধানে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়?

উ–তা আমার জানা নেই।

প্র–সাধারণ রেডিওকে ট্রান্সমিটার হিসাবে রূপান্তরিত করা যায় কি?

উ–কিছু যন্ত্রপাতি সেট করে রেডিওকে ট্রান্সমিটারে রূপান্তরিত করা যায়।

প্র–একটা অয়্যারলেস সেটের দাম কত?

উ–এ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই।

প্র–অয়্যারলেস সেটের দাম সম্পর্কে আপনাদের আন্দোলনের বৈঠকে কোন আলোচনা হয়েছিল কি?
উ–জী না, হয়নি।
প্র–ট্রান্সমিশন সেট কি পাকিস্তানে কেনা-বেচার জন্যে পাওয়া যায়?
উ–আমি যতদূর জানি তা পাওয়া যায় না।
প্র–কতটি সেট আনার কথা বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছিল?
উ–বৈঠকে পাঁচটি প্লেড সেট ও একটি মাস্টার সেট আনার কথা আলোচনা করা হয়েছিল।
প্র–আপনি কখনও অয়্যারলেস সেট দেখেছেন কি?
উ–জী হ্যাঁ। বিমানবাহিনীতে চাকুরী করা কালে দেখেছি।
প্র–অয়্যারলেস সেট কিভাবে কাজ করে?
উ–এটা কণ্ঠস্বরের সাহায্যে কাজ করে।
প্র–এই ধরনের অয়্যারলেস সেট কি পাকিস্তানের হরিপুরে তৈরী হয়?
উ–আমি জানি না।
প্র–আপনি কি অয়্যারলেস সেট চালাতে পারেন?
উ–জী না।
প্র–আপনাদের বিপ্লবী দলের কেউ কি অয়্যারলেস সেট অপারেট করতে জানতেন?
উ–আমার যতদূর জানা আছে তাঁদের কেউ-ই জানতেন না।
প্র–ট্রান্সমিটারাইজড ট্রান্সমিটার ও অয়্যারলেস সেটের মধ্যে পার্থক্য কি?
উ–এই দুটি যন্ত্রের পার্থক্য নির্ণয় করতে আমি পারব না।
প্র–সার্ভিস ইউনিটে ক্যাপ্টেন মোতালিব ও ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামানকে কি অয়্যারলেস অপারেটিং শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল?
উ–আমার জানা নেই।
প্র–কর্পোরাল সামাদ কি অয়্যারলেস অপারেটিং এর ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন?
উ–আমি জানি না।
প্র–পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে আপনি কি কাজ করতেন?
উ–বিমান বাহিনীতে আমি প্রশাসনিক বিভাগে ছিলাম; অপারেটিং বিভাগে নয়।
প্র–১৯৬৭ সালের ৩০শে ও ৩১শে মার্চ খান শামসুর রহমান কি সরকারী কাজ উপলক্ষে রাওয়ালপিণ্ডিতে ছিলেন না?
উ–আমি তা বলতে পারি না।
প্র–ক্যাপ্টেন মোতালিব অসুস্থ হয়ে ১৯৬৭ সালের ৩০শে ও ৩১শে মার্চ কি ঢাকা কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতালে ছিলেন না?
উ–তাও আমি বলতে পারি না।

প্র–পঁচিশ হাজার টাকা নেয়ার সময় আপনি কি ঢাকা ছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ। বৈঠকে যোগদানের জন্যে আমি ঢাকা আসি এবং বৈঠক শেষে ২৫ হাজার টাকা পাওয়া পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করি।
প্র–এই সময়ে আপনি কি ডিউটিতে ছিলেন?
উ–অফিসের ফাইল না দেখে আমি বলতে পারছি না যে, আমি ছুটি কি উইক এন্ড ছুটিতে বা ডিউটিতে ছিলাম।
প্র–উইক এন্ড ছুটির জন্যে আপনি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়েছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ।
প্র–পিআইএ'র উইক এন্ড ছুটি কখন হয়?
উ– প্রতি শুক্রবার অফিসের কাজ শেষে।
প্র–পিআইএ'র উইক এন্ড ছুটি শুক্রবার করা হয়েছে কবে থেকে?
উ–আমি তা জানি না। তবে শুক্রবার বিকেল থেকে শনিবার সন্ধ্যে পর্যন্ত পিআইএ'র উইক এন্ড ছুটি থাকে।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, পিআইএ'র অফিসারদের জন্যে শনিবার ওয়ার্কিং ডে নয়। কিন্তু অপারেটিং স্টাফদের জন্যে শনিবার ওয়ার্কিং ডে। এছাড়া অফিসারদের জন্যে শুক্রবার ওয়ার্কিং ডে।
প্র–১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে জনাব আসগর খান কি এই নিয়ম চালু করেছিলেন?
উ–তা আমি জানি না।
প্র–১৯৬৭ সালের ৩০শে ও ৩১শে মার্চের বৈঠকের পর ২/৩ দিন ঢাকা থাকার জন্যে আপনি অফিসে কি কারণ দেখিয়েছিলেন?
উ– সম্ভবত এরিয়া ম্যানেজারের সাথে পিআইএ-র চট্টগ্রাম জেলা সম্পর্কে আলোচনার কারণ দেখিয়ে থাকব।
প্র–এই সম্পর্কে আপনার অফিসে কোন রেকর্ড আছে?
উ–অফিসে 'অফিসার্স মুভমেন্ট রেকর্ড বুকে' থাকতে পারে।
প্র–পঁচিশ হাজার টাকা থেকে আলী রেজাকে কখন পাঁচশ' টাকা দিয়েছিলেন?
উ–আলী রেজাকে আমি নগদ পাঁচশ' টাকা দেইনি। বাকীতে তাঁকে পিআইএ'র একখানা টিকিট দিয়েছিলাম এবং সে টাকা আমার বেতন থেকে কাটা হয়েছিল।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে,আলী রেজাকে পিআইএ'র টিকিট বাকীতে দেওয়ার সময় সাক্ষীর কাছে দলের তহবিলের টাকা ছিল।
প্র–বাকীতে টিকিট কিনতে হলে কি দরখাস্ত করতে হয়?
উ–জী না। দরখাস্তের প্রয়োজন হয় না। কারণ বাকীতে টিকিট বিক্রয় করা ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের নিজস্ব এখতিয়ার।
প্র–সেই সময়ে পিআইএ'র ঢাকা ডিস্ট্রিক্টের ম্যানেজার কে ছিলেন?
উ–জনাব ইয়াজদানী।

প্র–বাকীতে টিকিটটি কোথায় ইস্যু করা হয়েছিল?
উ–টিকিটটি চট্টগ্রামে ইস্যু করা হয়েছিল। টিকিটটি ছিল ঢাকা থেকে লাহোর যাতায়াতের।

বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দিয়ে বাকীতে পিআইএ'র টিকিট চাওয়া হলেও ম্যানেজার তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। কারণ বাকীতে টিকিট বিক্রয়টা তাঁর নিজস্ব এখতিয়ার। বাকীতে টিকিট কেনার কোন ফরম নেই। তবে ট্রাভেল এজেন্সীগুলোর নিকট থেকে টিকিট কিনতে হলে নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত করতে হয়।

প্র–ম্যানেজারের নিজস্ব এখতিয়ার ক্ষমতা কিভাবে ব্যবহার করা হয়?
উ–ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার কোন কারণ না দেখিয়ে বাকীতে টিকিট বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। কারণ বাকীতে বিক্রয় করা টিকিটের টাকা পরিশোধ করা না হলে ম্যানেজারের বেতন থেকে সে টাকা কাটা হয়।
প্র–ট্রাভেল এজেন্টরা কি বাকীতে টিকিট বিক্রয় করতে পারেন?
উ–জী হ্যাঁ। তাঁদের নিজেদের দায়িত্বে পারেন।
প্র–'ফ্লাই নাউ, পে লেটার' এই শ্লোগান দিয়ে কি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল?
উ–আমার যতদূর স্মরণ আছে পিআইএ'র পক্ষ থেকে এইরূপ কোন বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে ছাপা হয়নি।
প্র–লাহোর যাওয়ার প্রাক্কালে আলী রেজা কোথায় থাকতেন?
উ–তখন তিনি ধানমন্ডির কোথাও থাকতেন।
প্র–সেই সময়ে জনাব রুহুল কুদ্দুস কোথায় থাকতেন?
উ–আমি তা জানি না।
প্র-তখন আলী রেজা যেখানে থাকতেন সেই একই রোডে কি রুহুল কুদ্দুস থাকতেন?
উ-আমার তা জানা নেই।
প্র–জনাব রুহুল কুদ্দুস কি তখন ঢাকা ছিলেন?
উ–বাকীতে আলী রেজার নিকট পিআইএ'র টিকিট বিক্রয় করার সময় জনাব রুহুল কুদ্দুস ঢাকা ছিলেন কিনা আমি জানি না।
প্র-আপনি কি তাকে লাহোর পাঠিয়েছিলেন, না তিনি লাহোর যেতে চেয়েছিলেন?
উ–তিনি নিজেই জনাব রুহুল কুদ্দুসের সাথে আলোচনার জন্যে লাহোর যেতে চেয়েছিলেন এবং এ সম্পর্কে তার সাথে আমার আলোচনা হয়।
প্র–কোন তারিখে আপনি আলী রেজার নিকট বাকীতে পিআইএ'র টিকিট বিক্রয় করেছিলেন?
উ–১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসের কোন এক সময়ে।

এই পর্যায়ে জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীর হাতে একখানা দলিল দিয়ে প্রশ্ন করেনঃ
প্র–এই দলিল আপনি কি দেখছেন?
উ–আমি এতে দেখছি যে, আমি ২৪শে অক্টোবর আলী রেজার নিকট পিআইএ'র একটি টিকিট বিক্রয় করেছি।
প্র–আলী রেজার লাহোর যাত্রার সিদ্ধান্ত কোথায় নেয়া হয়?
উ–শাহবাগ হোটেলে আলী রেজা ও আমার মধ্যে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
প্র–মানিক চৌধুরীকে বাকীতে আপনি টিকিট বিক্রয় করেছিলেন তার হদিস কোথায় পাওয়া যাবে?
উ–পিআইএ'র হেড অফিসের একাউন্টস বিভাগে।
প্র-ঢাকা-চট্টগ্রামের বিমান ভাড়া তখন কত ছিল?
উ–১৯৬৭ সালে ঢাকা-চট্টগ্রামের বিমান ভাড়া সম্ভবতঃ ৪৫ টাকা ছিল। রিটার্ন টিকিটের দাম ৯০ টাকার কিছু কম হবে।
প্র–একথা কি সত্য যে, মানিক চৌধুরীকে এই মামলায় জড়ানোর জন্যে আপনি তাঁর নিকট বাকীতে মিথ্যা টিকিট বিক্রয়ের কথা বলছেন?
উ–জী না। একথা সত্য নয়।
প্র–ক্যাপ্টেন মোতালিবকে বাকীতে বিক্রয় পিআইএ'র টিকিটের টাকার জন্যে তাগিদ দিয়েছিলেন?
উ–জী হ্যাঁ। অফিস থেকে টাকা পরিশোধের তাগিদ দেয়া হয়েছে।
প্র–এই ব্যাপারটি কি নিষ্পত্তি হয়েছিল?
উ-আমার গ্রেফতারে আগ পর্যন্ত তা পরিশোধ হয়নি।

এখানে জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা অসমাপ্ত থাকে। আজ বৃহস্পতিবার তিনি সাক্ষীকে পুনরায় তাঁর অসমাপ্ত জেরা শুরু করবেন।

দৈনিক পয়গাম
৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
ফ্লাইট লেঃ মীর্জা রমিজের জেরার ৫ম দিবসের বিবরণ
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ৫নং রাজসাক্ষী পি, আই, এ'র চট্টগ্রাম জেলা ম্যানেজার সাবেক ফ্লাইট লেঃ মীর্জা মোহাম্মদ রমিজের জেরা গতকল্য (বৃহস্পতিবার) পঞ্চম দিবসেও অব্যাহত থাকে। বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান গতকল্য (বৃহস্পতিবার) রমিজকে তাঁহার জেরা শেষ করিলে বিবাদীপক্ষের আর

কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব নাজিরউদ্দিন এবং মোহাম্মদ ইসমাইল জেরা শুরু করেন।

বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান পূর্বদিনের জেরার জের টানিয়া ৫নং রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজকে পি, আই, এ'র জেলা ম্যানেজার হিসাবে তৎকর্তৃক (মীর্জা রমিজ) সংঘটিত বলিয়া কথিত কতিপয় অনিয়মতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন।

প্রশ্ন– আপনি কি আজ সুস্থ আছেন?

যদি সুস্থ থাকেন তাহা হইলে কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া জবাব দেন।

উত্তর–আমি ব্যথা অনুভব করি। এই পর্যায়ে আদালত বলেন যে, সাক্ষীর শরীরে ব্যথা আছে। কাজেই তাহাকে বসিতে দেওয়া হউক।

উল্লেখযোগ্য যে, অসুস্থতার দরুন ৫নং রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজ গত কয়েকদিন যাবত ডকে উপবিষ্ঠ অবস্থায় জেরার জবাবদান করিতেছিলেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী পি, আই, এ, অডিট রিপোর্ট হইতে মীর্জা রমিজকৃত বিভিন্ন অনিয়মতার উদ্ধৃতি দিয়া সেই সম্পর্কে প্রশ্ন করেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী অডিট রিপোর্টে উল্লিখিত কিছু কিছু 'বিভাগীয় অনিয়মতা' এবং তৎসম্পর্কে অডিট কর্তৃপক্ষের আপত্তির দিকে সাক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উহা তাহাকে (মীর্জা রমিজকে) ব্যাখ্যা করিতে বলেন।

সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৭ সালের অডিট রিপোর্টে তিনি দেখিতে পাইতেছেন যে, ৩ হাজার ২৪ টাকায় ২১টি ইনভয়েস সম্পর্কে আপত্তি তোলা হয়। কিন্তু ইনভয়েসগুলিতে ক্রেতাদের নাম দিয়া প্রাক্তন জেলা ম্যানেজারের (মীর্জা রমিজের) মাধ্যমে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৫নং রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজ ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে বলেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে (অডিট রিপোর্ট প্রসঙ্গে) তিনি তাঁহাদের ব্যক্তিগতভাবে চিনিতেন বলিয়াই হয়তো ক্রেতাদের ঠিকানা রাখেন নাই। অবশ্য বাকীতে যাঁহারা টিকেট কিনিয়াছিলেন, তাহারা পি, আই, এ'র নিকট টাকা জমা দিয়াছেন কিনা তাহা তিনি (সাক্ষী) বলিতে পারেন না।

প্রশ্ন–আপনি পি, আই, এ হইতে বাসাভাড়া পাইয়া থাকেন?

উত্তর–আমার বাড়ী ভাড়া পি, আই, এ সরাসরি বাড়ীওয়ালাকে পাঠাইতেন।

প্রশ্ন–ভাড়া কত ছিল?

উত্তর–৭শত ৫০ টাকা।

প্রশ্ন–অডিট রিপোর্টে দেখা যায় যে, আপনার বাড়ীভাড়া ৫শত ৫০ টাকা?

উত্তর–ইহা পূর্বে ছিল।

প্রশ্ন–বাড়ী ভাড়ার রসিদ কোথায় পাওয়া যাইবে?

উত্তর–পি, আই, এ অফিসে।

প্রশ্ন–আপনার বাড়ীওয়ালার নাম কি?

উত্তর–জনাব সালাহউদ্দিন চৌধুরী।

প্রশ্ন–তাঁহার ঠিকানা কি?

উত্তর–তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সরবরাহ বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর।

প্রশ্ন–পি, আই, এ'র জেলা ম্যানেজারের অফিস রক্ষণাবেক্ষণের বরাদ্দসীমা ৫শত টাকা?

উত্তর–না। ইহা ঠিক নহে।

প্রশ্ন–আপনি কি মাঝে মাঝে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়সীমা অতিক্রম করিতেন?

উত্তর–আমি স্মরণ করিতে পারিতেছি না।

সাক্ষী এই পর্যায়ে বলেন, ইহা সম্পূর্ণ অসত্য যে, আমি আলোচ্য ইনভয়েসের টাকা সংগ্রহ করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছি।

প্রশ্ন–আপনি আলোচ্য ইনভয়েসের জন্য পি, আই, এ'র পক্ষে ৬ হাজার টাকার একটি চেক প্রদান করিয়াছিলেন?

উত্তর–না, ইহা সঠিক নহে।

প্রশ্ন–ইহা কি সত্য যে, আলোচ্য চেকটি 'ডিস্অনার' হইয়াছিল এবং ইহা পি, আই, এ'র একাউন্ট সেকশনে আছে?

উত্তর–না, ইহাও ঠিক নহে।

প্রশ্ন–ক্যাপ্টেন মোতালিবকে যে বাকী টিকেট দিয়াছিলেন উহাতে নাম ছিল কি?

উত্তর–টিকিটের দলিলে "ক্যাপ্টেন মোতালিব এণ্ড ফ্যামেলি" লেখা ছিল।

প্রশ্ন–অডিট রিপোর্ট দৃষ্টে দেখা যাইতেছে যে, জাপানী ও ফ্রান্স ট্রেড মিশনকে আপ্যায়নের ব্যাপারে ৩ হাজার ৩ শত টাকার একটি হিসাবে আপত্তি হইয়াছে।

উত্তর–১৯৬৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আপ্যায়নের খরচের হিসাব-নিকাশ দেখান হয় নাই।

প্রশ্ন–আপনি লুৎফুল হুদাকে ধার দিয়াছিলেন?

উত্তর–হয়ত আমি তাহাকে ধার দিয়া থাকিতে পারি।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজ বলেন যে, তাহার ব্যক্তিগত ব্যবহারের একটি ফিয়াট গাড়ী ক্রয় করিতে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন তাহাকে নগদ ৫ হাজার টাকা দিয়াছিলেন।

সাক্ষী আরও বলেন যে, নগদ অর্থে এই গাড়ীটি খরিদ করা হয় এবং এইদিনই সম্ভবতঃ ১১ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়।

প্রশ্ন–লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন তাহার হিলম্যান ইম্প গাড়ীটি কাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন?

উত্তর–আমি জানি না।

প্রশ্ন–কোথা হইতে খরিদ করিয়াছিলেন?
উত্তর–তাহাও জানি না।
প্রশ্ন–আপনি কখন এই গাড়ীটি দেখিয়াছিলেন?
উত্তর– ১৯৬৬ সালের জুন-জুলাই মাসে।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী বলেন, মস্কোভিচ গাড়ীখানি লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আমার সামনে চট্টগ্রাম হইতে এক পারমিটে ইলাহী বখশ এ্যাণ্ড কোম্পানীর নিকট হইতে কিনিয়াছিলেন। আমি উক্ত কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে চিনি।

আমি যতদূর জানি, মস্কোভিচ গাড়ীখানি কেনার পর হিলম্যান ইম্প কারখানি বিক্রি করিয়া দেওয়া হয় নাই। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে হিলম্যান ইম্প গাড়ীখানি আমি ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারে দেখিয়াছি এবং ইহা দলের কাজে তখন ব্যবহার করা হইত। ইহার পূর্বেই এই গাড়িখানি বিক্রি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল কিনা, তাহা আমি জানি না। পার্টির সকল রকম কাজের জন্য গাড়ীখানি ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের হেফাজতে ছিল। লোকজনের সাথে যোগাযোগ করা, জয়দেবপুর ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট প্রভৃতি স্থানে যাওয়ার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল হইতে জুলাই পর্যন্ত এই গাড়ীখানি জয়দেবপুর যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইত; কিন্তু আমি কখনও ইহাতে যাই নাই। আমি হিলম্যান গাড়ীতে করিয়া কখনও জয়দেবপুর যাই নাই। ইহা বলা ঠিক নহে যে, আদালতে পি, ডব্লিউ ৬/১১নং দলিল হিসাবে চিহ্নিত চিঠিখানির কপি আমার নিকট পাঠান হইয়াছিল। কারণ, আমিই লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে মস্কোভিচ গাড়ীখানি কেনার সময় ইলাহী বখশ এ্যাণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলাম এবং গাড়ীর টায়ারগুলি ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া দেখা গিয়াছিল। গাড়ীর মূল্য তাড়াতাড়ি পরিশোধ করা হইবে এই আশায় উক্ত চিঠির একটি কপি আমাকে দেওয়া হয়।

সাক্ষী বলেন, ১৯৬৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম পুলিশ তাঁহাকে গ্রেফতার করে। ১০ই ডিসেম্বর তাঁহাকে ঢাকা আনা হয়। ৯ই কিংবা ১০ই ডিসেম্বর তাঁহাকে বিবৃতি দিতে বলা হয় নাই। পুলিশী নির্যাতনের ফলেই তিনি বিবৃতি দিয়াছেন বলিয়া যে কথা বলা হয়, উহা তিনি অস্বীকার করেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব নাজিরুদ্দীন আহমদের প্রশ্নের জবাবে মীর্জা রমিজ বলেন, তিনি ইহা জানেন যে, বর্তমান সরকার ১৯৫৮ সাল হইতে দেশে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ শুরু করিয়াছেন।

সরকার বহুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এগুলির মধ্যে মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। বর্তমান সরকার

পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের কিছু ব্যবস্থাও গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়নের জন্য সরকার উন্নতমানের বীজ, সার এবং কৃষিপাম্প সরবরাহের ব্যাপারেও পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছেন। ১৯৫৮ সাল হইতে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য দূরীকরণে সরকার কিছু পরিমাণে সফল হইয়াছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী স্বীকার করেন যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য হ্রাস করার ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মোহাম্মদ ইসমাইলের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, খুব সম্ভব গত ১২ই ডিসেম্বর হইতে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি রাজারবাগ পুলিশ সেন্টারে আটক ছিলেন। রাজারবাগে থাকার এই দিনগুলিতে দৈনিক তিন হইতে চার ঘণ্টা তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইত। দিবাভাগেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হইত। সেন্ট্রাল জেল হইতে ১৭ই জানুয়ারী রাত্রে তিনি মুক্তি পান। কিন্তু সামরিক আইন অনুসারে তাহাকে পুনরায় গ্রেফতার করিয়া ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে লইয়া যাওয়া হয়। ইহার আগে চট্টগ্রামে তিনি দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার হইয়াছিলেন। তিনি যখন সামরিক হেফাজতে ছিলেন তখনই তিনি স্বীকারোক্তি করার জন্য মনস্থির করেন। তাঁহার স্বীকারোক্তি প্রদানের ৮/১০ দিন আগেই তিনি এইরূপ মনস্থির করেন। স্বীকারোক্তি প্রদানের প্রায় দেড়মাস পর মেজর নাসের তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি রাজসাক্ষী হইতে রাজী আছেন কিনা। তাঁহাকে ক্ষমা প্রদর্শনের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে মেজর নাসের তাঁহাকে রাজসাক্ষী হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল ৫নং রাজসাক্ষী পি, আই, এ'র চট্টগ্রাম ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানেজার সাবেক ফ্লাইট লেঃ মীর্জা মোহাম্মদ রমিজকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–গ্রেফতারের পর আপনাকে কোথায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হইয়াছিল?
উত্তর–রাজারবাগ পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে।
প্রশ্ন–কতদিন সেখানে রাখিয়াছিল?
উত্তর–সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সনের ১২ই ডিসেম্বর হইতে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাকে সেখানে রাখিয়াছিল।
প্রশ্ন–রাজারবাগ পুলিশ ইন্টারোগেশন সেন্টারে নেওয়ার পূর্বে আপনি কোথায় ছিলেন?
উত্তর–ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে।

প্রশ্ন–কতদিন আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইয়াছিল?
উত্তর–তিন দিন।
প্রশ্ন–প্রতিদিন কয় ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হইত?
উত্তর–তিন-চার ঘণ্টা।
প্রশ্ন–দিনে না রাত্রে?
উত্তর–দিনের বেলায়।
প্রশ্ন–মেজর মোস্তাফিজুর রহমান কি রাজারবাগ পুলিশ ইন্টারোগেশন সেন্টারে আপনার সহিত দেখা করিয়াছিল?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–তিনি ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে কি আপনার সাথে দেখা করিয়াছিলেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–রাজারবাগ পুলিশ ইন্টারোগেশন সেন্টার হইতে আপনাকে কোথায় নেওয়া হয়?
উত্তর–ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে।
প্রশ্ন–কতদিন পর?
উত্তর–৩/৪ দিন পর।
প্রশ্ন–সেন্ট্রাল জেলে কতদিন ছিলেন?
উত্তর–১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী রাত্রে আমাকে সেন্ট্রাল জেল হতে মুক্তি দেওয়া হয় এবং জেলগেটে সামরিক আইনে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়।
প্রশ্ন– গ্রেফতারের পর কোথায় রাখা হয়?
উত্তর–ক্যান্টনমেন্টে সিগন্যাল মেসে।
প্রশ্ন–সামরিক আইনে গ্রেফতারের পূর্বে আপনাকে কি ডি, পি, আর-এ গ্রেফতার করা হয়েছিল?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আপনাকে কেন সামরিক আইনে গ্রেফতার করা হইয়াছিল?
উত্তর–সামরিক আইনে কেন গ্রেফতার করা হইয়াছিল তাহা আমি জানি না।
প্রশ্ন–মেজর মোস্তাফিজুর রহমান কি আপনাকে গ্রেফতার করিয়াছিল?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–কে গ্রেফতার করিয়াছিলেন?
উত্তর–সামরিক বাহিনীর একজন অফিসার; কিন্তু আমি তাহার নাম জানি না।
প্রশ্ন–আপনি কখন জানিতে পারেন যে, ষড়যন্ত্র মামলায় আপনাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে?
উত্তর–রাজারবাগ পুলিশ ইন্টারোগেশন সেন্টারে আমি জানিতে পারি যে, আমাকে ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপারে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

প্রশ্ন–আপনি কখন স্বীকারোক্তি করেন?
উত্তর–আমি কান্টোডিতে থাকাকালীন আমি স্বীকারোক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।
প্রশ্ন–কখন?
উত্তর–স্বীকারোক্তি করার ৮/১০ দিন পূর্বে আমি স্বীকারোক্তির সিদ্ধান্ত নেই।
প্রশ্ন–কাহার মারফত আপনি স্বীকারোক্তি করিবেন বলিয়া কর্তৃপক্ষকে জানান?
উত্তর–মেজর নাসেরকে আমি জানাই।
প্রশ্ন–রাজসাক্ষী কখন হন?
উত্তর–আমার স্বীকারোক্তির প্রায় দেড় মাস পর মেজর এ, বি, নাসের আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি রাজসাক্ষী হইতে ইচ্ছুক কিনা।
প্রশ্ন–ইহা কি আপনাকে ক্ষমা করার পর?
উত্তর–আমাকে ক্ষমা করার এক সপ্তাহ পূর্বে মেজর নাসের আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি রাজসাক্ষী হইতে ইচ্ছুক কিনা।
প্রশ্ন– জনাব রুহুল কুদ্দস যে লাহোর এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ষ্টাফ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন তাহা আপনি জানিতেন কি?
উত্তর–সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে শুনিয়াছি যে, জনাব রুহুল কুদ্দুস লাহোর এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ষ্টাফ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল পদে নিযুক্ত আছেন।
প্রশ্ন–জনাব রুহুল কুদ্দুস ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসের ২২ তারিখ হইতে ২৯ তারিখ পর্যন্ত ছুটিতে আসিয়াছিলেন তাহা আপনি জানেন কি?
উত্তর–অক্টোবর মাসের ঐসময় জনাব রুহুল কুদ্দুস ঢাকায় আসিয়াছিলেন কিনা, আমি জানি না।
প্রশ্ন–ধানমণ্ডিতে আলী রেজার বাড়ী কতনং রাস্তায়?
উত্তর–আমি আলী রেজার ধানমণ্ডির বাড়ী চিনি। তবে সেই রাস্তার নম্বর আমি জানি না।
প্রশ্ন–আপনি কি জানেন যে, জনাব রুহুল কুদ্দুস ২৯শে অক্টোবর (১৯৬৭) পি, আই, এ'র ১টা ১৫ মিনিটের (দুপুরের) ফ্লাইটে লাহোর যাত্রা করিয়াছিলেন?
উত্তর–আমি জানি না।
ইহার পর জনাব আতাউর রহমান খান ৫নং রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজকে জেরা শুরু করেন।
প্রশ্ন–আপনার নাম রমিজ উদ্দিন?
উত্তর–আমার নাম মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ।
প্রশ্ন–আপনার নাম কি রমিজউদ্দিন মোল্লা ছিল না?
উত্তর–প্রথমে আমার নাম রমিজউদ্দিন মোল্লা ছিল।

প্রশ্ন–কখন উহা পরিবর্তন করেন?
উত্তর–সম্ভবতঃ ১৯৫৩ সালে যখন আমি বিমানবাহিনীতে চাকুরীরত ছিলাম।
প্রশ্ন–'মীর্জা' শব্দের অর্থ কি?
উত্তর–আমি বলিতে পারি না।
প্রশ্ন–দেশরক্ষা দফতরের তৎকালীন সেক্রেটারী জনাব ইসকান্দার মীর্জার নামের অনুকরণের জন্য কি আপনি আপনার নামের পূর্বে "মীর্জা" শব্দ যোগ করিয়াছিলেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনার গ্রামের নাম কি?
উত্তর–ধানুট।
প্রশ্ন–কোন স্কুলে লেখাপড়া করেন?
উত্তর–নাগরি মিশন হাইস্কুলে।
প্রশ্ন–আপনার প্রপিতামহের নাম কি বুধাই মণ্ডল ছিল?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আপনার দাদার নাম "আওয়ালী শেখ?"
উত্তর–আমার দাদার নাম আলিমুদ্দিন শেখ আওয়ালী শেখ নহে।
প্রশ্ন–আপনার দাদার ৪ পুত্র আকালী শেখ, সুকুর শেখ, ফকিরা শেখ ও "সেরু শেখ" এবং আপনি "সেরু শেখের" পুত্র।
উত্তর–আমার চাচাদের নাম সুকুর মাহমুদ, আক্কেল মাহমুদ ও ফকির মাহমুদ।
প্রশ্ন–আপনার পিতাকে গ্রামের লোকে "সেরু শেখ" বলিয়া ডাকিত কি?
উত্তর–আমার পিতাকে "সেরু শেখ" বলিয়া ডাকিত কিনা আমি জানি না।
প্রশ্ন–ছেলেবেলায় আপনার পিতা মারা যান?
উত্তর–আমার বয়স যখন ২ বছর তখন আমার পিতার মৃত্যু হয়।
প্রশ্ন–পিতার মৃত্যুর পর আপনার দুই চাচা সুকুর মাহমুদ ও আক্কেল মাহমুদ আপনাকে লালনপালন করিয়াছিল?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন– আপনার চাচা সুকুর মাহমুদ "কয়াল" (পাট ওজনদার) ছিল?
উত্তর–তিনি পাট ক্রয়ের এজেন্ট ছিলেন।
প্রশ্ন–এইজন্য গ্রামের লোকে তাহাকে "মোল্লা" বলিত?
উত্তর–ইহা ঠিক নহে যে, এইজন্য তাহাকে 'মোল্লা' পদবী দেওয়া হইয়াছিল।
প্রশ্ন–আপনার নামের শেষে 'মোল্লা'-কে রাখিয়াছিল?
উত্তর–সম্ভবতঃ আমার চাচা স্কুলে ভর্তির সময় আমার নাম "রমিজ উদ্দিন মোল্লা" রাখিয়াছিল।

প্রশ্ন–রজিয়া বিবিকে জানেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনার ফুফু হয় কি?
উত্তর–জানি না।
প্রশ্ন–সলিম ভুঁইয়া আপনার আত্মীয়?
উত্তর–সলিম ভুইয়া আমার আত্মীয়।
প্রশ্নঃ কেমন আত্মীয়?
উত্তরঃ আমার ফুফুকে বিবাহ করিয়াছিলেন।
প্রশ্নঃ তাহার ছেলের নাম আবদুল ওয়াহাব?
উত্তরঃ হ্যাঁ।
প্রশ্ন–১৯৫৭ সালে রজিয়া বিবি তাহার সমস্ত সম্পত্তি (৮ বিঘা জমি) তাহার ছেলে আবদুল ওয়াহাবকে দলিল করিয়া দিয়াছিল জানেন কি?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্নঃ আপনি বিমান বাহিনীতে থাকাকালীন তথা হইতে চিঠি দিয়া পুলিশের সাহায্যে জোরপূর্বক উক্ত সম্পত্তি দখল করিয়াছিলেন?
উত্তরঃ ইহা সত্য নহে। এই সময় আদালত আগামী সোমবার সকাল ৯টা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

দৈনিক পাকিস্তান

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

একরারী সাক্ষী মীর্জা রমীজের জেরা অব্যাহত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বৃহস্পতিবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পাঁচ নম্বর একরারী সাক্ষী মীর্জা মোহাম্মদ রমীজের জেরা অসমাপ্ত থাকে। জেরার পঞ্চম দিবসে গতকাল বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা শেষ হয়। অতঃপর গতকাল খান বাহাদুর নাজির উদ্দিন, খান বাহাদুর ইসমাইল ও জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীকে জেরা করেন। জনাব আতাউর রহমান খানের জেরা অসমাপ্ত থাকা অবস্থায়ই গতকাল ট্রাইব্যুনালের কার্যকাল তিন দিনের জন্য স্থগিত থাকে।

আগামী সোমবার পুনরায় ট্রাইব্যুনালে আগরতলা মামলার শুনানী শুরু হবে।

গতকাল জেরার শুরুতে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান পিআইএ-র চট্টগ্রাম অফিসের অডিট রিপোর্ট সাক্ষী এম এম রমিজের হাতে দিয়ে অডিট পার্টির কতিপয় আপত্তি সম্পর্কে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সাক্ষী জনাব রমিজ বলেন, এটা ১৯৬৭ সালের অডিট রিপোর্ট। এখানে ২১টি পার্টির নিকট ধারে টিকেট বিক্রয় বাবদ ৩ হাজার ২৪ টাকা অনাদায় রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে এই আপত্তি দেখান হয়েছে যে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার ধারে টিকেট বিক্রয়ের ইনভয়েস তৈরী করেছেন কিন্তু তাদের কোন ঠিকানা সংগ্রহ করেননি।

সাক্ষী বলেন,এখানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার বলতে আমাকে বুঝান হয়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে এই অডিট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, ধারে টিকেট বিক্রয়ের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা পার্টির ঠিকানা রাখি না।

প্র-এই বাকী টাকা কি তারা পরিশোধ করেছে?

উ-তারা উক্ত টাকা পরিশোধ করেছে কিনা তা আমি বলতে পারব না।

প্র-তারা যদি টাকা পরিশোধ না করে তার জন্য কে দায়ী হবেন?

উ-আমি।

প্র-আপনি কি যাদের ধারে টিকেট দিয়েছেন তাদের নাম বলতে পারেন?

উ-তার তালিকা ব্যতীত আমি নাম বলতে পারব না।

প্র-যদি কোন টাকা শোধ করা হয়ে থাকে তবে তার প্রমাণ কোথায় পাওয়া যাবে?

উ-করাচীতে সদর দফতরে এই সম্পর্কিত কাগজপত্র পাওয়া যাবে। যে অফিস হতে এই টিকেট ইস্যু করা হয়েছে সেখানেও এই সম্পর্কিত দলিলপত্র পাওয়া যাবে।

প্র-আপনি কি পিআইএ-র নিকট হতে বাড়ী ভাড়া পেতেন?

উ-আমার বাড়ীর ভাড়া পিআইএ সরাসরি মালিককে প্রদান করত।

প্র-আপনার বাড়ীর ভাড়া কত ছিল?

উ-মাসিক ৭৫০ টাকা।

প্র-অডিট রিপোর্টে বলা হয়েছে যে,চট্টগ্রামের ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের জন্য বাড়ী ভাড়া বাবদ সর্বোচ্চ ৫৫০ টাকা নির্ধারিত রয়েছে।

উ-আগে উক্ত টাকা বরাদ্দ ছিল।

প্র-আপনি বলেছেন যে, পিআইএ সরাসরি বাড়ী ভাড়া মালিককে দিতেন। এই ভাড়ার কোন রসিদ আছে?

উ-বাড়ীওয়ালার রসিদ পিআইএ অফিসে পাওয়া যাবে।

প্র-আপনি যে বাড়ীতে ভাড়া থাকতেন তার মালিক কে?

উ-জনাব সালাহউদ্দীন চৌধুরী।

প্র-তিনি কি কাজ করেন?

উ-তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সাপ্লাই ডিরেক্টরেটের একজন ডেপুটি ডিরেক্টর।

প্র-বাড়ী ভাড়ার রসিদ কোথায় পাওয়া যাবে?

উ- পিআইএ-র চট্টগ্রাম অফিসে এবং ঢাকা অফিসের এরিয়া সেক্রেটারীয়েটেও পাওয়া যেতে পারে।

প্র-এই বাড়ী কে ভাড়া করেছিল?

উ-পিআইএ।

প্র-এ কথা কি সত্য যে, পিআইএ অফিস রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাসে ৫০০ টাকার বেশী ব্যয় করা যায় না?

উ-আসবাবপত্রসহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের মাসিক অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা হচ্ছে ৫০০ টাকা।

প্র-আপনি কি কখনও ব্যয়ের বেলায় এই অর্থের সীমা অতিক্রম করেছেন?

উ-আমি এই সীমা কখনও অতিক্রম করেছি কিনা মনে পড়ে না।

প্র-এ কথা কি সত্য যে, আপনি ধারে টিকেট বিক্রয়ের ব্যাপারে ইনভয়েসের টাকা জমা দিয়েছেন কিন্তু তা পার্টির নিকট হতে আদায় করেননি?

উ- এ কথা সত্য নয়।

প্র-অডিট রিপোর্টে আপত্তি দেখান হয়েছে যে, ১৯৬৭ সালের জুন মাসে ৯৯০ টাকা এবং জুলাই মাসে ৫২১ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, এই অভিযোগ কি সত্য?

উ-এটা সত্য কিনা আমি বলতে পারব না।

প্র-কি কি কাগজপত্র দেওয়া হলে আপনি এ ব্যাপারে প্রকৃত জবাব দিতে পারবেন?

উ-এর জন্য ওয়ার্ক অর্ডার, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও কাজ সমাপ্তির সার্টিফিকেট ইত্যাদির প্রয়োজন।

প্র-এই অর্থ ব্যয়ের জন্য এরিয়া ম্যানেজারের মঞ্জুরী নেওয়া হয়েছিল কি?

উ-কাগজপত্র না দেখে আমি তা বলতে পারব না।

এই পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস এ রহমান বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর নিকট হতে জানতে চান যে, মামলার সাথে এইসব প্রশ্নের কোন সম্পর্ক আছে কিনা। জনাব আবদুস সালাম খান বলেন যে, এগুলো অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন। বাদী পক্ষের কৌসুলী জনাব মনজুর কাদির সাক্ষ্যদান আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার উল্লেখ করে বলেন, সাক্ষীকে বর্তমানে যেসব বিষয়ে জেরা করা হচ্ছে এগুলোর সাথে মামলার কোন যোগাযোগ নেই। বিচারপতি এস এ রহমান বলেন যে, অডিটের ব্যাপারে এগুলো কতকগুলো টেকনিক্যাল আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই প্রশ্নগুলো সম্পর্কহীন।

প্র-আপনি ঐসব ঠিকানাবিহীন ব্যক্তির নিকট ধারে বিক্রয়ের টিকেটের মূল্য বাবদ পিআইএ'কে ৬ হাজার টাকার কোন চেক প্রদান করেছিলেন কি?
উ-না।
প্র-এ কথা কি সত্য যে, আপনি এরূপ একটি চেক প্রদান করেছিলেন,সে চেকখানা ব্যাঙ্ক হতে ফেরত পাঠান হয়েছে এবং বর্তমানে পিআইএ'র ঢাকা অফিসে তা রক্ষিত আছে?
উ-আমি এ ধরনের কোন চেকের কথা বলতে পারব না।
প্র-এ কথা কি সত্য যে, চট্টগ্রামে শুল্ক বিভাগ হতে মাসখানেকের জন্য পিআইএ আপনাকে ৬ হাজার টাকা দিয়েছিল। কিন্তু আপনি মাল খালাস করেননি। পিআইএ'কে আপনি ৬ হাজার টাকার একখানা চেক প্রদান করেন এবং এটাও ব্যাঙ্ক হতে ফেরত আসে?
উ-এ কথা মোটেও সত্য নয়।
প্র-মোতালেবের ও তার পরিবার-পরিজনের জন্য যদি আপনি ধারে টিকেট বিক্রয় করে থাকেন তাহলে রেকর্ডে তার উল্লেখ পাওয়া যাবে কি?
উ-বাকীতে টিকেট দিয়ে থাকলে "মোতালেব এ্যান্ড ফ্যামিলি" কথা রেকর্ডে পাওয়া যাবে।
প্র-আলী রেজাকে ধারে যে টিকেট দিয়েছিলেন সে টাকা কি পরিশোধ করা হয়েছে?
উ-না।
প্র-আপনি পার্টির তহবিল হতে সে টাকার খরচ দেখিয়েছেন তাই নয় কি?
উ-হ্যাঁ।
প্র-টিকেটের টাকা পরিশোধের জন্য মোতালেবের নিকট সর্বশেষ পত্র কোন তারিখে পাঠান হয়েছে?
উ-১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরের ৮/৯ তারিখে।
এই সময় আদালত সাক্ষীর নিকট হতে জানতে চান যে, তিনি দলীয় তহবিল হতে টিকেটের টাকা গ্রহণ করে খরচ দেখিয়েছেন কিন্তু ঐ টাকা পরিশোধ করেননি কেন?
সাক্ষী আদালতের এই প্রশ্নের জবাবে কোন কারণ প্রদর্শন করতে পারেনি।
প্র-এ কথা কি সত্য যে, ক্যাপ্টেন মোতালেব ও আলী রেজা উভয়েই আপনাকে টিকেটের টাকা প্রদান করেছিলেন?
উ-না, সত্য নয়।
প্র-এ কথা কি সত্য যে, আপনি একটি জাপানী প্রতিনিধিদলকে আপ্যায়ন করার জন্য অফিস হতে টাকা নিয়েছেন কিন্তু তার হিসেব দেননি?
উ-১৯৬৭ সালের অডিট রিপোর্টে এরূপ আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে যে, একটি জাপানী ও একটি ফরাসী প্রতিনিধিদলকে আপ্যায়নের জন্য আমি ৩

হাজার ৩শ' টাকা নিয়েছি কিন্তু কিভাবে তার ব্যয় দেখানো হবে আমি তার কোন সুরাহা করিনি। এ কাজের জন্য আমি সময় পাইনি বলে তা করতে পারিনি।
প্র-আপনি কি লুৎফুল হুদাকে ধারে টিকেট দিতেন?
উ-হয়ত দিয়েছি।
প্র-আপনি নিজ হতে এবং আনোয়ার হোসেনের স্লিপ পেলেও বাকী দিতেন?
উ-আমার অনুমোদনপ্রাপ্ত আনোয়ার হোসেনের স্লিপেও ধারে টিকেট দেওয়া হতো।
প্র-আনোয়ার এই মামলার একজন সাক্ষী তা আপনি জানেন?
উ-হ্যাঁ, জানি।
প্র-কতবার আপনি এভাবে তাকে ধারে টিকেট দিয়েছেন?
উ-বোধহয় ৩ বার দিয়েছি।
প্র-আপনি ১৯৬৭ সালে একখানা ফিয়াট গাড়ী ক্রয় করেছিলেন এবং তার জন্য লেঃ মোয়াজ্জম হোসেন আপনাকে কিছু টাকা ধার দিয়েছিলেন এ কথা কি সত্য?
উ-হ্যাঁ, লেঃ মোয়াজ্জম হোসেন আমাকে ৫ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। উক্ত টাকার রসিদও আমার নামে লেখা হয়।
প্র-লেঃ মোয়াজ্জম আপনাকে যে টাকা গাড়ী ক্রয়ের জন্য দিয়েছেন তার কোন রেকর্ড আছে?
উ-তা আমি জানি না।
প্র-ইফতেখারের সঙ্গে আপনার কি ধরনের পরিচয়?
উ-তার সাথে আমার বন্ধুত্ব আছে।
প্র-তিনি আপনাকে কি বলে সম্বোধন করতেন?
উ-মিঃ রসিদ বলে।
প্র-আপনি কি তাকেও ধারে টিকেট দিয়েছিলেন?
উ-হয়তবা দিয়েছি।
প্র-লেঃ মোয়াজ্জম আপনাকে গাড়ি ক্রয়ের জন্য যে ৫ হাজার টাকা দিয়েছেন এই টাকা প্রদানের বিষয় কখন স্থির হয়?
উ-গাড়ী ক্রয়ের আগের দিন।
সাক্ষী জেরার জবাবে আরো বলেন, এই গাড়ী ক্রয়ের জন্য কিছু টাকা অন্য এক ব্যক্তি দিয়েছেন এটা যে প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে গাড়ী ক্রয় করেছি তাদের দেখাবার কোন ইচ্ছা আমার ছিল না।
প্র-আপনাকে গাড়ীর মূল্য পরিশোধের ১৬ হাজার টাকার রসিদ উক্ত সংস্থা প্রদান করেছিল?
উ-আমার মনে নেই।

প্র-লেঃ মোয়াজ্জম তার হিলম্যান গাড়ী কার নিকট হতে ও কোথা হতে ক্রয় করেছে তা আপনি জানেন?
উ- না, আমি জানি না।
প্র-ওটা কি পুরাতন গাড়ী না নতুন গাড়ী?
উ-ওটা একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ী।
প্র-কোন সময় তিনি ঐ গাড়ীখানা ক্রয় করেছেন?
উ-১৯৬৭ সালের জুন বা জুলাই মাসে আমি গাড়ীখানা দেখেছি।
প্র-আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিতে বলেছিলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জম চট্টগ্রাম হতে হিলম্যান গাড়ীখানা খরিদ করেছেন?
উ-আমি এ কথা বলেছি কিনা মনে নেই।
সাক্ষী জেরার জবাবে বলেন, লেঃ মোয়াজ্জম হোসেন মেসার্স এলাহি বখশের নিকট হতে মস্কোভিচ গাড়ীটি খরিদ করেন। আমি যতদূর জানি যে, মস্কোভিচ ক্রয়ের পর হিলম্যান তিনি বিক্রয় করেননি।
সাক্ষী বলেন, আমি গ্রীন স্কোয়ারে ১৯৬৭ সালের এপ্রিল ও মে মাসে হিলম্যান গাড়ীটি দেখেছি। দলীয় কাজের জন্য এটা ব্যবহৃত হত। এই গাড়ী বিক্রয়ের খবর আমি জানি না।
প্র-দলীয় কাজ বলতে আপনি কি বুঝাতে চান?
উ-স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এই গাড়ী করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও জয়দেবপুরে যেতেন।
প্র-আপনি কি কখনও এই হিলম্যান গাড়ী চড়ে জয়দেবপুর গিয়েছিলেন?
উ-না ।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীর হাতে পিআইএ-র অডিট রিপোর্ট প্রদান করে টাকা-পয়সা সম্পর্কিত কতিপয় অনিয়মের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সাক্ষী বলেন, অডিট রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, ১২ হাজার টাকার মধ্যে আমি ৭ হাজার টাকার হিসেব দিয়েছি মাত্র। কিন্তু এখন আমি ঐ বাকী টাকার ভাউচার দিতে পারব।
প্র-অডিট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধারে টিকেট বিক্রয়ের ব্যাপারে সদর দফতর যে নিয়ম ও বিধি অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছিল তা পালিত হয়নি।
এ প্রসঙ্গে কৌসুলী লিখিত আবেদনপত্র ব্যতীত ধারে টিকেট দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন।
সাক্ষী বলেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে লিখিত আবেদনপত্র ব্যতীতই ধারে টিকেট দেওয়া হয়ে থাকে।
প্র-আপনি কি জানেন যে, আনোয়ার হোসেন একজন শুকনা ফলের ব্যবসায়ী এবং পশ্চিম পাকিস্তান হতে শুকনা ফল আমদানী করে পূর্ব পাকিস্তানে তা বিক্রয় করেন?
উ-আমি জানি না।

প্র-লুৎফুল হুদা যাকে আপনি ধারে টিকেট দিতেন তিনিও যে এই মামলার একজন সাক্ষী এ কথা আপনি জানেন?
উ-হ্যাঁ, জানি।
প্র-একথা কি সত্য যে, ১৯৬৭ সালে মে/জুন মাসে লেঃ মোয়াজ্জম হোসেন ঢাকা ছিলেন না এবং এই সময়ে অনুষ্ঠিত আন্দোলনের অর্ধ ডজন বৈঠকে তিনি যোগদান করেননি?
উ-একথা সত্য নয়। বস্তুতঃ তিনি ঢাকা ছিলেন এবং আন্দোলনের সকল বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন ।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ছুটি ছাড়াও তিনি ঢাকা এসেছিলেন এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্দোলনের এসব বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর অফিসের অফিসার্স মুভমেন্ট রেকর্ডে তাঁর ঢাকা আসার কথা উল্লেখ থাকতে পারে।
প্র-এসব রেকর্ড কোথায় পাওয়া যেতে পারে?
উ-ভ্রমণ শেষ হলে এসব রেকর্ড প্রথমে পিআইএ'র ঢাকা অফিসে এবং পরে করাচী অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হয়।
প্র-১৯৬৭ সালের মে/জুন মাসে ঢাকা আসার জন্যে আপনি কি যাতায়াত খরচের বিল দিয়েছিলেন?
উ-আমি অনেক সময় ভ্রমণের জন্যে অগ্রিম টাকা নিয়েছি।
প্র- কোথা থেকে অগ্রিম টাকা নিয়েছিলেন?
উ-ভ্রমণের আগে একাউন্টস বিভাগে শ্লিপ দিয়ে অগ্রিম টাকা নিতাম এবং পরে বিল দাখিল করতাম। এই পর্যায়ে সাক্ষীর হাতে একটি টি, এ, বিল দিয়ে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী তাঁকে প্রশ্ন করেন–
প্র-এই বিলে আপনি কি দেখছেন?
উ-এই টি, এ বিলে আমি দেখছি যে ১৯৬৭ সালের ১১ই জুলাই আমি ভ্রমণের জন্যে ১৫ টাকা অগ্রিম নিয়েছি।
প্র-আপনাকে কে গ্রেফতার করেছিল?
উ-১৯৬৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর চট্টগ্রামে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে।
প্র-গ্রেফতারের পর পুলিশ কি আপনার জবানবন্দী নিতে বলেছিল?
উ-জী না। ৯ই বা ১০ই ডিসেম্বর আমাকে পুলিশ জবানবন্দী দিতে বলেনি।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি যেদিন ফিয়াট কার কিনেছিলেন লেঃ মোয়াজ্জম সেদিন চট্টগ্রাম ছিলেন না?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-সেসময়ে লেঃ মোয়াজ্জম কি দু'মাসের ছুটিতে ছিলেন না?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-এই মামলায় আপনার সাক্ষ্য কি পুলিশের শিখিয়ে দেওয়া নয়?
উ-জী না, এটা সত্য নয়।

প্র-আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, আগরতলায় প্রেরণের জন্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের বৈঠকে যোগদানের জন্যে খান শামসুর রহমান ও ক্যাপ্টেন মোতালিবের নিকট টেলিগ্রাম করা হয়েছিল?
উ-তা আমার স্মরণ নেই।
প্র-আপনি কি জানেন যে, খান শামসুর রহমান জনাব আতাউর রহমান খানের ভাই?
উ-হ্যাঁ জানি।
প্র-আপনি কি জনাব আতাউর রহমান খানের বাড়ী চেনেন?
উ-তাঁর বাড়ী ধানমন্ডিতে এবং বাড়ীটি দোতলা।
এখানেই বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা সমাপ্ত হয় এবং বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী খান বাহাদুর নাজির উদ্দিন সাক্ষীকে জেরা করেন।

খান বাহাদুর নাজির উদ্দিন

প্র-দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা কি ১৯৫৮ সালে শুরু হয়েছিল?
উ-আমি তা নিশ্চিতভাবে জানি না।
প্র-তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা ১৯৬৩ সালে শুরু করা হয়েছিল কি?
উ-আমি তা জানি না।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৫৮ সাল থেকে বর্তমান সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ শুরু করেছেন এবং কারিগরি ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। এছাড়া সরকার পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের কিছু কিছু ব্যবস্থাও করেছেন। সরকার উন্নত বীজ, সার ও পাম্পিং মেশিন সরবরাহ করে পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি উন্নয়নেরও ব্যবস্থা করেছেন। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে সরকার কিছুটা সফল হয়েছেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমেই কমে আসছে।
প্র-পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন না?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-গ্রেফতারের পর আপনি পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি করেছিলেন?
উ-জী না। আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করেছি।
প্র-এটা কি সত্য যে, আপনাকে ও ডাঃ সাইদুর রহমানকে ১৯৬৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর গ্রেফতার করা হয়েছিল?
উ-হ্যাঁ। একথা সত্য।

প্র-আপনার স্বীকারোক্তির আগে আরও অনেকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করেছে বলে আপনি কি জানতেন?
উ-না। আমি তা জানতাম না।
প্র-একথা কি সত্য যে, এই মামলায় যারা স্বীকারোক্তি করেছিলেন তা আপনাকে জানানো হয়েছিল?
উ-না। একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনার স্বীকারোক্তির আগে অন্যান্যদের স্বীকারোক্তি আপনাকে পড়ে শুনানো হয়েছিল?
উ-না। একথা সত্য নয়।
প্র-ক্যাপ্টেন আলমকে কি আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকে চিনতেন?
উ-আমার তা মনে পড়ছে না।
প্র-আপনি কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউওটিসি-তে ট্রেনিং নিয়েছিলেন?
উ-জী, হ্যাঁ।
প্র-ক্যাপ্টেন এস এ খানসুর কি তখন ইউওটিসি'র এডজুটেন্ট ছিলেন?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-একথা কি ঠিক যে, আপনি ও ক্যাপ্টেন আলম একত্রে দু'সপ্তাহের ইউওটিস ট্রেনিং নিয়েছিলেন?
উ-আমার তা স্মরণ নেই।
প্র-একথা কি সত্য যে, ১৯৬৫ সালে আপনার একজন বন্ধুকে ঢাকাস্থ কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতালে ভর্তি করার জন্যে আপনি ক্যাপ্টেন আলমের নিকট গিয়েছিলেন?
উ-না। একথা সত্য নয়।
প্র-আপনি কি আপনার মাতৃভাষায় সবচেয়ে ভাল করে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন?
উ-হ্যাঁ। এবং আমার মাতৃভাষা বাংলা।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ইউওটিসি-তে থাকাকালে সিলেটের শামশের নগরে তাঁদের একটি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছিল তবে ক্যাপ্টেন আলম সে ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিলেন কিনা তাঁর জানা নেই।
প্র-মাতৃভাষায় মনের ভাব ভাল করে প্রকাশ করতে পারলে আপনি কেন ইংরেজী ভাষায় পুলিশের নিকট জবানবন্দী করেছিলেন?
উ- ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম বলে।
প্র-একথা কি সত্য যে, তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের তৈরী টেক্সট থেকে আপনি স্বীকারোক্তি করেছিলেন?
উ-না। একথা সত্য নয়।

জনাব ইসমাইল

খান বাহাদুর নাজিরউদ্দীনের জেরা শেষ হলে খান বাহাদুর ইসমাইল একরারী সাক্ষী মীর্জা মোহাম্মদ রমীজকে জেরা করেন।

প্র-রাজারবাগ জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে মেজর মোস্তাফিজুর রহমান কি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন?

উ-জী না।

প্র-তিনি কি ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আপনার সাথে দেখা করেছিলেন?

উ- জী না।

প্র-কোথেকে আপনাকে রাজারবাগ জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে নেওয়া হয়?

উ-ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৭ সালের ১৭ই জানুয়ারী রাত্রে তাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আবার আর্মি অ্যাক্টে গ্রেফতার করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্র-প্রথমে আপনাকে কোন আইনে গ্রেফতার করা হয়েছিল?

উ-পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে।

প্র-আর্মি এ্যাক্টে আপনাকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছিল?

উ-আমি তা জানি না।

প্র-আপনাকে কি মেজর মোস্তাফিজুর রহমান গ্রেফতার করেছিলেন?

উ-জী না।

প্র-তবে আপনাকে কে গ্রেফতার করেছেন?

উ-একজন সামরিক অফিসার আমাকে গ্রেফতার করেছিলেন। তাঁর নাম আমি জানি না।

প্র-ষড়যন্ত্র মামলায় আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এ কথা আপনি কখন জানলেন?

উ-রাজারবাগে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময়।

প্র-স্বীকারোক্তি করবেন বলে প্রথম কাকে জানিয়েছিলেন?

উ-মেজর এ বি নাসেরকে।

তাকে জানানোর ৭ থেকে ১০ দিন পর আমাকে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নেয়া হয়।

প্র-কখন আপনাকে একরারী সাক্ষী হতে বলা হয়েছিল?

উ-স্বীকারোক্তির দেড় মাস পর আমি একরারী সাক্ষী হতে রাজী আছে কি না মেজর নাসের তা জানতে চেয়েছিলেন।

প্র-আপনাকে ক্ষমা প্রদর্শনের কতদিন আগে একরারী সাক্ষী হতে বলা হয়েছিল?

উ-এক সপ্তাহ আগে একরারী সাক্ষী হতে মেজর নাসের আমাকে বলেছিলেন।

প্র-স্বীকারোক্তির আগে ম্যাজিস্ট্রেট কি আপনার কাছে স্বীকারোক্তির বিষয়বস্তু জানতে চেয়েছিলেন?

উ-জী না।

প্র-আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলেছিলেন যে, আগরতলা থেকে ফেরার পর আলী রেজা আপনাকে বলেছিলেন যে তিনি লেঃ মোয়াজ্জমের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, কেননা তিনি দলের টাকার হিসাব জানতে চেয়েছিলেন?

উ-আমার তা স্মরণ নেই। (রেকর্ডে তা আছে)

প্র-এ কথা কি আপনি পুলিশের নিকট বলেছিলেন?

উ-তাও আমার মনে নেই।

(রেকর্ডে তা নেই)।

প্র-১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে জনাব রুহুল কুদ্দুস কি লাহোর এডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন?

উ-আমি তা শুনেছি।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৭ সালের ২২ শে অক্টোবর থেকে ২৯ শে অক্টোবর পর্যন্ত জনাব রুহুল কুদ্দুস ছুটি নিয়ে ঢাকা ছিলেন কিনা তিনি জানেন না। এছাড়া এই সময়ে তিনি তাঁর ধানমন্ডির ২৮নং রোডস্থ বাড়ীতে ছিলেন বলেও তাঁর জানা নেই।

প্র-আপনি কি ১৯নং ধানমন্ডী রোডস্থ আলী রেজার বাড়ী চেনেন?

উ-জনাব আলী রেজার বাড়ী আমি চিনি। তবে তা ধানমন্ডির ১৯নং রোডে কিনা আমার জানা নেই।

প্র-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী দেওয়ার সময় আপনি কি বিভিন্ন ঘটনা কোন রেকর্ড থেকে বলেছেন?

উ-জী না। আমি ঘটনার কোন রেকর্ড রাখি নাই।

প্র-এ কথা কি সত্য যে, জনাব রুহুল কুদ্দুস এই মামলার সাক্ষী হতে অস্বীকার করলে পুলিশের নির্দেশে আপনি তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছেন?

উ-এ কথা সত্য নয়।

জনাব আতাউর রহমান খান

খান বাহাদুর ইসমাইলের জেরা শেষ হলে বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খান একরারী সাক্ষী মীর্জা মোহাম্মদ রমিজকে জেরা করেন।

প্র-আপনার পুরা নাম কি?

উ-মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ।

প্র-এর আগে আপনার নাম কি ছিল?

উ-প্রথমে আমার নাম ছিল রমিজউদ্দীন মোল্লা। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে চাকুরী করার সময় আমি নাম পরিবর্তন করি।

প্র-মীর্জা শব্দের অর্থ কি?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-দেশরক্ষা বিভাগের তৎকালীন সেক্রেটারী মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মীর্জার নামের অপমান করার জন্যে কি আপনি নামের সাথে মীর্জা যোগ করেছিলেন?
উ-জী না।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাঁর বাড়ী ধানরুল গ্রামে। নাগরিক মিশন হাইস্কুলে তিনি লেখাপড়া করেন।
প্র-আপনি কি ভোদাই মণ্ডলকে চেনেন?
উ-ভোদাই মণ্ডল আমার প্রপিতামহের নাম।
প্র-আপনার পিতামহের নাম কি আওয়ামী শেখ?
উ-জী না। আমার পিতামহের নাম আলীমুদ্দিন শেখ।
প্র-আকালী শেখ, শুকুর শেখ, ফকির শেখ ও সেরা শেখ নামে কি আওয়ালী শেখের ৪ পুত্র ছিল?
উ-আলীমুদ্দিন শেখের ৪ পুত্র। তাঁদের নাম হচ্ছে আক্কেল শেখ, শুকুর মোহাম্মদ, ফকির মোহাম্মদ ও শের মোহাম্মদ। এদের মধ্যে শের মোহাম্মদ আমার পিতা।
প্র-আপনার পিতা কি সেরা শেখ নামে পরিচিতি?
উ-তা আমার জানা নেই।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাঁর বয়স যখন দু'বছর তখন তাঁর পিতা মারা যান এবং তার কাকা আক্কেল মোহাম্মদ ও শুকুর মোহাম্মদ তাঁকে লালনপালন করেন।
প্র-আপনার কাকা শুকুর মোহাম্মদ কি পাটের কয়ালী ছিলেন?
উ-জী না। তিনি পাটের সাব এজেন্ট ছিলেন।
প্র-আপনার নামের সাথে মোল্লা উপাধি কে দিয়েছিলেন?
উ-স্কুলে পড়ার সময় সম্ভবতঃ আমার কাকা আমার নামের সাথে 'মোল্লা' শব্দ জুড়ে দিয়েছিলেন।
প্র-আপনি কি রোজা বিবিকে চেনেন?
উ-জী না।

পরে এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, রোজা বিবি তাঁর ফুফু। সলিম ভূঁইয়া নামক এক ব্যক্তির সাথে তাঁর বিয়ে হয়। আবদুল ওহাব নামে রোজা বিবি ও সলিম ভুঁইয়ার এক পুত্র আছে। তবে রোজা বিবি আবদুল ওহাবের নামে তাঁর ৮ বিঘা সম্পত্তি হস্তান্তর করেছেন বলে তিনি জানেন না।
প্র-একথা কি সত্য যে, বিমান বাহিনীতে চাকুরী করার সময় আপনি আপনার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট দরখাস্ত করে এবং পুলিশের সহায়তায় আবদুল ওহাবের ৮ বিঘা জমি জবর দখল করেছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়।

এই পর্যায়ে জনাব আতাউর রহমান খানের জেরা অসমাপ্ত থাকে। তিনদিন বিরতির পর আগামী সোমবার পুনরায় ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন বসলে জনাব আতাউর রহমান খানের অসমাপ্ত জেরা শুরু হবে।

দৈনিক পয়গাম
১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
ফ্লাইট লেঃ মীর্জা রমিজের জেরার ৬ষ্ঠ দিবস
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

তিনদিন বিরতির পর গতকল্য (সোমবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হইলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খান ৫নং রাজসাক্ষী সাবেক ফ্লাইট লেঃ ও পি, আই এ, চট্টগ্রাম ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানেজার মীর্জা মোহাম্মদ রমিজকে পুনরায় জেরা করেন। জনাব আতাউর রহমানের জেরা শেষ হইলে বিবাদীপক্ষের অপর কৌসুলী মীর্জা গোলাম হাফিজ, জনাব ফজলুল করিম ও জনাব বদরুল হায়দার চৌধুরী রাজসাক্ষীকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–'রথ' উৎসব কি আপনি জানেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–উদর গ্রামে একটি রথ উৎসব হয়–জানেন কি?
উত্তর–আমি জানি।
প্রশ্ন–এই রথ কি ভাওয়ালের রাজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–জনৈক শিবচরণ মণ্ডলের উপর এই 'রথ' উৎসবের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–আপনি আফছার উদ্দিনকে চিনেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–তাহাকে কি আপনার সম্পত্তি দেখাশুনার ভার দিয়াছিলেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আফসার উদ্দিন কি আপনার পক্ষে রাজিয়া বিবির পুত্র আবদুল ওহাবের সম্পত্তি জবর দখল করিয়াছিল?
উত্তর–ইহা সত্য নহে।
প্রশ্ন–এই সম্পর্কে কোন সালিস হইয়াছিল কি?
উত্তর–এই ধরনের কোন সালিস সম্পর্কে আমি জানি না।

প্রশ্ন–আপনি কি আবদুল ওহাবকে ৪ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়াছিলেন?
উত্তর–ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ এই ধরনের কোন বিবাদই ছিল না।
প্রশ্ন–আপনি খুলনায় পি, আই-এ'র ম্যানেজার ছিলেন? কখন?
উত্তর–১৯৬৪ সনের ডিসেম্বর হইতে ১৯৬৫ সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনমাস আমি খুলনায় পি, আই, এ'র ম্যানেজার পদে নিযুক্ত ছিলাম।
প্রশ্ন–খুলনায় অবস্থানকালে আপনি কোথায় থাকতেন?
উত্তর– আমি বরাবরই খুলনা সার্কিট হাউসে ছিলাম।
প্রশ্ন–খুলনা সার্কিট হাউসের রেজিষ্ট্রারে আপনি "রমিজউদ্দিন" নাম লিখিয়াছিলেন?
উত্তর–না, আমি রমিজউদ্দিন নাম লেখি নাই।
প্রশ্ন–সার্কিট হাউসের বকেয়া পাওনা সম্পর্কে খুলনার ডেপুটি কমিশনারের কোন চিঠি পাইয়াছিলেন কি?
উত্তর–ডেপুটি কমিশনারের কোন চিঠি পাইয়াছিলাম কিনা আমার মনে নাই।

এই পর্যায়ে জনাব আতাউর রহমান খান সাক্ষীর হাতে ২৯-৪-৬৫ তারিখে লিখিত খুলনার ডেপুটি কমিশনারের একটি চিঠি প্রদান করেন।

চিঠিটি দেখিয়া রাজসাক্ষী রমিজ বলেন, হ্যাঁ, এই চিঠি আমি পাইয়াছিলাম। এই চিঠিতে ১২ দিনের ভাড়ার (সার্কিট হাউসের রুম) দাবী ছিল। রাজসাক্ষী বলেন, তিনি এই প্রাপ্ত ভাড়া মিটাইয়া দিয়াছিলেন।

প্রশ্ন–ডেপুটি কমিশনার চিঠিতে আপনাকে কি নামে সম্বোধন করিয়াছেন?
উত্তর–চিঠিতে দেখিতে পাইতেছি যে, ডেপুটি কমিশনার আমাকে "রমিজউদ্দিন" নামে সম্বোধন করিয়াছেন।
প্রশ্ন–পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনে কতদিন চাকুরী করেন?
উত্তর–প্রায় এক পক্ষকাল। সহকারী ডিরেক্টর হিসাবে।
প্রশ্ন–কত টাকা বেতনে?
উত্তর–মাসিক ৫ শত ৩০ টাকা।
প্রশ্ন–"শেলটার" নামে কোন বাড়ী চেনেন কি?
উত্তর–হ্যাঁ, মিরপুরে শেলটার নামে বাড়ীটি আমার শ্বশুরের।
প্রশ্ন–খুলনা সার্কিট হাউসের চৌকিদার শমশের আলীর নিকট হইতে আপনার খাওয়া-দাওয়ার পাওনা ৮৩ টাকা ৭৫ পয়সার বকেয়া পরিশোধের জন্য কোন চিঠি পাইয়াছিলেন কি?
উত্তর–আমি চিঠি পাইয়াছিলাম ও বকেয়া পরিশোধ করিয়াছিলাম। (চিঠিটি আদালতে ডি-ই/৪ চিহ্নিত দলিল)
প্রশ্ন–চট্টগ্রাম বদলীর পরও মোহাম্মদপুরের ফ্ল্যাট রাখিয়াছিলেন?
উত্তর–হ্যাঁ।

প্রশ্ন–কেন?
উত্তর–যাহাতে ঢাকায় আসিলে থাকিতে পারি।
প্রশ্ন–আপনার স্ত্রী চট্টগ্রামে আপনার সহিত থাকে নাই?
উত্তর–ইহা সম্পূর্ণ অসত্য।
প্রশ্ন–আপনার স্ত্রী কি ২বছর আপনার শ্বশুর বাড়ীতে ছিল?
উত্তর–ইহা ঠিক নহে।
প্রশ্ন–আপনার স্ত্রী তখন কোথায় বসবাস করিতেছিল?
উত্তর–চট্টগ্রাম হইতে আসার পর গত এক সপ্তাহ যাবৎ আমার স্ত্রী আমার শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতেছে।
প্রশ্ন–ইয়াহিয়া ওরফে দুলালের পিতার নাম কি?
উত্তর–ইয়াহিয়া ওরফে দুলালের পিতার নাম ডাঃ মোহাম্মদ ইউনুস।
প্রশ্ন–তাহার সহিত আপনার আত্মীয়তার কি সম্পর্ক?
উত্তর–তাহার বড় ভাই আমার ভাগিনীকে বিবাহ করিয়াছিল।
প্রশ্ন– ইয়াহিয়ার বড় ভাইয়ের নাম কি?
উত্তর–আমি ভুলিয়া গিয়াছি।
প্রশ্ন–বিবাহ ছাড়া অন্য কোন আত্মীয়তা ছিল কি?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–দুলাল যে মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে সে পূর্বে আপনার চট্টগ্রাম বাসায় থাকিত?
উত্তর–ইহা সত্য নহে।
প্রশ্ন–মেয়ে কি উর্দু ভাষী?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–এই মেয়েকে বিবাহ করার জন্য আপনি ইয়াহিয়াকে চাপ দিয়াছিলেন?
উত্তর–ইহা ঠিক নহে।
প্রশ্ন–ইয়াহিয়া কি "ইয়াহিয়া রমিজ" হিসাবে পরিচিত ছিল?
উত্তর–আমি জানি না।

এই পর্যায়ে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীর হাতে একটি চিঠি প্রদান করেন এবং ইহা তাহার লেখা কিনা জিজ্ঞাসা করেন। চিঠিটি দেখিয়া রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজ জানান যে, ইয়াহিয়াকে তিনি "ইয়াহিয়া রমিজ" সম্বোধন করিয়াছিলেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খানের প্রশ্নের জবাবে ৫ নম্বর রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজ বলেন, ধারে টিকিট দেওয়ার জন্য আমি তাহাকে আমার ভাই বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম কিনা, সে কথা আমি স্মরণ করিতে পারিতেছি না। সম্ভবতঃ আমি তাহাই করিয়াছি। আমি তাহাকে বার্মা ইষ্টার্ণে নিয়োগ করিয়াছিলাম, এ কথা সত্য নয়। সে প্রতিযোগিতামূলক

পরীক্ষা দিয়া নির্বাচিত হইয়াছিল। আমার ফ্ল্যাটে যদি কেহ কথা বলে তাহা হইলে সে কথা পরবর্তী ফ্ল্যাটেশোনা যাইবে একথা ঠিক নয়। শুধুমাত্র সূর্যাস্তের পর নয়, কোন লোক যে-কোন সময় সালমার হোটেলে "নান" ও "কাবাব" পাইতে পারে। সাক্ষী বলেন যে, আমার ড্রাইভার আলী আহমেদ ন্যাশনাল এণ্ড গ্রীণ্ডলেস ব্যাঙ্ক হইতে ধার লইয়াছিল কিনা, সে কথা আমার স্মরণ নাই। তিনি পুনরায় বলেন যে, আলী আহমদ ধার লইয়াছিল একথা সত্য নয়। আমি অপর একজন আলী আহমদের জন্য গ্রীণ্ডলেস ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে জামিন হইয়াছিলাম। সেই আলী আহমদ পি, আই, এ'র একজন সেলস্ প্রতিনিধি ছিলেন। সম্ভবতঃ আমি মিস ডলি হলের জন্য ধারে টিকিট ইস্যু করিয়াছিলাম। ১৯৬৬-'৬৭ সালে মিস ডলি হল ও তাহার ভগ্নী পি, আই, এ'র বিমানবালা বেলা হলের জন্য আমি ১৯ নম্বর ইন্দিরা রোডে একটি বাড়ী নিয়াছিলাম একথা সত্য নয়। বেলা হলকে সমাজে আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম এ কথাও সত্য নয়।

সাক্ষী আরও বলেন, অভিযুক্ত আলী রেজা একজন পশুপাখী রফতানীকারক কিনা, তাহা আমি জানি না। আলী রেজা রফতানী ব্যবসায়ী ব্যাপারে লাহোর গিয়াছিলেন, এ কথা ঠিক নয়। জসনে খাইবারে যোগদানের জন্য আলী রেজা পেশোয়ার গিয়াছিলেন এ কথা সত্য নয়। তিনি ক্যাপ্টেন মোতালেবের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য সেখানে গিয়াছিলেন। এ কথা সত্য নয় যে, তিনি তাঁহার টিকেটের মূল্য আমাকে নগদ দিয়াছিলেন এবং আমি সে টাকা আত্মসাৎ করিয়া টিকেটটি বাকীতে বিক্রয় দেখাইয়াছি। আমি ঢাকার ল্যাবরেটরি রোডে আলী রেজার বাসায় গিয়া সেখানে তাহার ছোট ভাইকে ছাড়া আর কাহাকেও দেখি নাই। তাহার অসুস্থ পিতা এবং তাহার পরিবারের অন্য সদস্যদের সেখানে দেখি নাই। তাঁহাদের কেহই ড্রইং রুমে আসেন নাই। আমি দ্বিপ্রহরে সে বাসায় গিয়াছিলাম এবং প্রায় অর্ধঘণ্টা সেখানে ছিলাম। পরে ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানও সেখানে আমার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর জেরার জবাবে সাক্ষী আরও বলেন, আমি মদ্যপান করিতাম। গ্রেফতার হওয়ার পরে আমি উহা ছাড়িয়া দিয়াছি। আমার আটক থাকাকালে আমাকে কোন মদ্য সরবরাহ করা হয় নাই। চট্টগ্রাম ক্লাবে আমার নামে ২ হাজার ৬শত টাকার একটি বিল বাকী থাকিতে পারে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে ফ্লাইট সংখ্যা বৃদ্ধি উপলক্ষে আমি একটি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। সেই বিলটি এখনও পরিশোধ করা হয় নাই। এই অনুষ্ঠান সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে হইয়াছিল। সেখানে ক্লাবে আমার আরও কিছু বিল বাকী থাকিতে পারে। শাহবাগ হোটেলে ৪ হাজার টাকার কোন বিল আমার নামে বাকী আছে একথা আমার জানা নাই।

প্রতি মাসে ক্লাবে আমার ১ হাজার টাকার মত বিল হইত। আমি আমার সামর্থ্যের বাহিরে কখনও ব্যয় করি নাই।

সাক্ষী আরও বলেন, ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনে আমার কোন একাউন্ট নাই। কমার্স ব্যাঙ্কে আমার একাউন্ট হইতে ৫ হাজার টাকা এবং ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কে আমার একাউন্ট হইতে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত আমি ওভারড্রাফট নিয়াছিলাম।

আমি মনে করি না যে, ন্যাশনাল এণ্ড গ্রীণ্ডলেস ব্যাঙ্ক আমার একাউন্টে কোন ওভারড্রাফট আছে। হাবিব ব্যাঙ্কে ওভারড্রাফটের নিরাপত্তার জন্য আমি আমার ফিয়াট ১১০০ নম্বর গাড়ীখানি ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক দিয়াছিলাম। হইতে পারে এই ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ওভারড্রফাটের ব্যাপারে আমি উকিল নোটিশ পাইয়াছিলাম। কিছু পত্র বিনিময়ের পর ওভারড্রাফটের নিরাপত্তার জন্য আমি আমার গাড়ী বন্ধ দিয়াছিলাম। ১৯৬৫ সালের ন্যাশনাল এণ্ড গ্রীণ্ডলেস ব্যাঙ্কে আমার একটি ওভারড্রাফট ছিল এবং প্রায় দুই বৎসর পূর্বে সে ব্যাপারে মীমাংসা হইয়া যায়। আমার খাতকদের এড়ানোর জন্যই আমি আমার নাম পরিবর্তন করিয়া মীর্জা রমিজ নাম লইয়াছিলাম একথা সত্য নয়।

রাজসাক্ষী আরও বলেন, আমি যখন জেলে ছিলাম সেসময় এয়ার মার্শাল আসগর খান আসিয়া আমাকে দেখিয়া গিয়াছেন, এ কথা সত্য নয়। আমার গ্রেফতারে পর তিনি চট্টগ্রামে আমার বালা পরিদর্শন করেন কিনা সে কথা আমার জানা নাই। একথা সত্য নয় যে, গ্রেফতার হওয়ার পর আমি পি, আই, এ কর্তৃক আমার চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইয়াছি।

বরখাস্ত হওয়া সম্পর্কে আমি কোন চিঠি পাই নাই। কাজেই অনুরূপ কোন পত্র প্রত্যাহারের প্রশ্ন উঠে না।

সাক্ষী আরও বলেন, সাবেক বিমান কর্ম্মচারীদের লইয়া চট্টগ্রামে 'হুইলার্স ক্লাব' নামে এক ক্লাব চালু করিয়াছিলাম একথা সত্য নয়। মাত্র একবার ১৫/২০ জন সাবেক কর্মচারী আমার বাসায় আসিয়াছিলেন এবং আমরা একত্রে চা পান করিয়াছিলাম। কিন্তু কোন সমিতি ছিল না। ইহাতে মোটর কর্পোরেশনের ম্যানেজার জনাব ইফতেখার আহমদও আমাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। তিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একজন সাবেক কর্মচারী।

সাক্ষী বলেন, একথা সত্য নয় যে, মামলার বাদীপক্ষের নির্দেশে অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন খুরশীদ ষড়যন্ত্রের একজন সদস্য ছিলেন। একথা আমি মিথ্যা বলিয়াছি। এক্করেজ, আমার ফ্ল্যাট অথবা আমার গৃহে যে সকল সভা হইয়াছিল বলিয়া আমি উল্লেখ করিয়াছিলাম, সেই সকল স্থানে সভা হয় নাই এ কথা বলা সত্য নয়। এ কথাও সত্য নয় যে, বাদীপক্ষকে ষড়যন্ত্রের জন্য অভিযুক্ত কিছুসংখ্যক লোকের সহিত যোগাযোগ করার সুবিধাদানের জন্যই আমি সভাসমূহের অস্পষ্ট সময় বলিয়াছি।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খান জেরা শেষ করিলে বিবাদীপক্ষের অপর কৌসুলী মীর্জা গোলাম হাফিজ ৬নং রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজকে জেরা শুরু করেন।
প্রশ্ন–আপনি কতদূর পড়াশুনা করিয়াছেন?
উত্তর–আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ, পাশ করিয়াছি।
প্রশ্ন–আপনার ছেলেমেয়ে কতজন?
উত্তর–চারজন।
প্রশ্ন–ছেলে কতজন?
উত্তর–৩ জন।
প্রশ্ন–ঢাকার মোহাম্মদপুর হাউজিং এষ্টেটে কি আপনার নিজস্ব কোন বাড়ী আছে?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–ঢাকা শহরের মধ্যে আপনার বা আপনার স্ত্রীর নামে কোন বাড়ী আছে?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–বাড়ী নির্মাণের জন্য ১৯৬৭ সনে আপনি কি পি, আই, এ'র নিকট ঋণ চাহিয়াছিলেন?
উত্তর–সম্ভবতঃ আমি মোহাম্মদপুরের বাসা সংস্কারের জন্য ঋণের আবেদন করিয়াছিলাম।
প্রশ্ন–আবেদনপত্রে আপনাকেই কি সুপারিশ (রিকমেণ্ডশন) করিতে হইত?
উত্তর–হ্যাঁ, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানেজার হিসাবে আবেদনপত্র সুপারিশ করার দায়িত্ব আমার ছিল।
প্রশ্ন–ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানেজার হিসাবে কখন আপনি চট্টগ্রামে কাজে যোগদান করেন?
উত্তর–১৯৬৫ সনের মার্চ মাসে।
প্রশ্ন–কাজে যোগদানের জন্য চট্টগ্রাম পৌঁছিয়া প্রথম আপনি কোথায় ছিলেন?
উত্তর–যতটুকু আমার স্মরণ হয় চট্টগ্রাম পৌঁছিয়া আমি সোজা ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে ছিলাম।
প্রশ্ন–ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের অফিসার্স মেসের সেক্রেটারী কে ছিলেন?
উত্তর–আমি স্মরণ করিতে পারিতেছি না।
প্রশ্ন–কোন তারিখ হইতে কোন তারিখ পর্যন্ত আপনি ঐ মেসে ছিলেন?
উত্তর–সঠিক তারিখ আমার মনে নাই তবে আমি দুই সপ্তাহ তথায় ছিলাম।
প্রশ্ন–রেজিমেন্টাল সেন্টারে থাকাকালীন প্রতিদিন দুইবার করিয়া ক্যান্টেন নূরুজ্জামানের সহিত আপনার দেখা হইত কি?
উত্তর–ইহা সঠিক নহে।

প্রশ্ন–ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান কি মেস সেক্রেটারী ছিলেন?
উত্তর–আমি স্মরণ করিতে পারিতেছি না।
প্রশ্নঃ আপনি কি মেসের মেম্বার হইয়াছিলেন?
উত্তর– আমি মেসের মেম্বার ছিলাম না কিন্তু আমি আমার খাওয়া-দাওয়ার বিল পরিশোধ করিতাম।
প্রশ্নঃ বিলে কে দস্তখত করিত?
উত্তর–আমি ২/৩টি বিল পরিশোধ করিয়াছি তবে বিলে কে দস্তখত করিয়াছেন তাহা আমার স্মরণ নাই।
প্রশ্ন–আপনি আলী আহমদকে কখন হইতে চিনেন?
উত্তর–১৯৬৫ সন হইতে আমি চট্টগ্রামে কাজে যোগদান করার পর।
প্রশ্ন–ঐসময় আলী আহমদ কি অবিবাহিত ছিল?
উত্তর– হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আলী আহমদ কখন বিবাহ করে?
উত্তর– ১৯৬৫ সনের নভেম্বরে চট্টগ্রামে।
প্রশ্নঃ এই বিবাহ ৬০নং পাঁচলাইশে আপনার অফিসিয়েল রেসিডেন্সে হইয়াছিল কি?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–ক্যাপ্টেন হুদা কি এই বিবাহে একজন সাক্ষী ছিলেন?
উত্তর–আমার স্মরণ নাই।
প্রশ্ন–বিবাহে ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান ও ওয়াহেদ উদ্দিনকে কি 'উকিল' নিযুক্ত করা হইয়াছিল?
উত্তর–আমার মনে নাই।
প্রশ্ন–আপনি কি কাবিননামায় দস্তখত করিয়াছিলেন?
উত্তর–সাক্ষী হইয়া থাকিলে আমি হয়ত দস্তখত করিতে পারি।
প্রশ্নঃ কাপ্টেন হুদা কি বিবাহে কোন সাক্ষী হইয়াছিলেন বা কাবিননামায় দস্তখত করিয়াছিলেন?
উঃ কাপ্টেন হুদা বিবাহে সাক্ষী ছিলেন না বা কাবিননামায় দস্তখত করেন নাই।
এই পর্যায়ে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী মীর্জা গোলাম হাফিজ আদালতে আলী আহমদের বিবাহের কাবিননামার একটি ফটোষ্টেট কপি দাখিল করেন।
প্রশ্নঃ আপনি অনুগ্রহপূর্বক কাবিননামায় ২০নং অনুচ্ছেদটি (কলাম) দেখেন এবং উহাতে কি লেখা আছে?
উত্তরঃ এই দলিলে দেখা যাইতেছে যে, আলী আহমদের বিবাহ ১৯৬৫ সালের ২০শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।
প্রশ্নঃ আপনি কি দয়া করিয়া দেখিবেন দলিলের ডানদিকে কাহার দস্তখত আছে?
উত্তরঃ হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামানের দস্তখত দেখা যাইতেছে।

প্রশ্নঃ আপনি কাবিন নামায় ১১নং কলামটি দেখিবেন কি? ইহাতে কি লেখা আছে?
উত্তরঃ এখানে দেখা যাইতেছে যে, ক্যাপ্টেন হুদা ও আমি সাক্ষী হিসাবে কাবিন নামায় দস্তখত করিয়াছি।
প্রশ্নঃ মিঃ রমিজ, এখন দেখা যাইতেছে যে, আপনি ক্যাপ্টেন হুদাকে ১৯৬৬ সালের জুলাই-আগষ্ট-এ ঢাকায় কথিত বৈঠকের পূর্বেই চিনিতেন?
উত্তরঃ এই দলিল (কাবিননামা) অনুযায়ী দেখা যায় যে, আমি ১৯৬৬ সনের জুলাই-আগষ্টের পূর্বেই ক্যাপ্টেন হুদাকে চিনিতাম।
প্রশ্নঃ আপনি ১৯৬৫ সনের ডিসেম্বরে একবার রেজিমেন্টাল সেন্টারের মেসে মদ কিনিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু আপনি মেসের সদস্য নহেন বলিয়া মেসের সেক্রেটারী (ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান) আপনাকে ফিরাইয়া দিয়াছিল?
উত্তরঃ না, ইহা ঠিক নহে।
প্রশ্নঃ ইহা কি সত্য যে, মেসে অবস্থানকালে (এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে) ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন হুদা আপনাকে মেয়েসহ দেখিয়াছিল?
উত্তরঃ না, ইহাও ঠিক নয়।
প্রশ্নঃ আপনাকে কি ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে যুদ্ধে রিজার্ভ হিসাবে পুনরায় ডাকিয়াছিল?
উত্তরঃ না।
প্রশ্নঃ কেন?
উত্তরঃ প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীদের সকলকেই ডাকা হয় নাই। তবে আমাকে কেন ডাকা হয় নাই আমি জানি না।
প্রশ্ন: দুর্ব্যবহারের দরুন বিমান বাহিনী হইতে আপনাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল কি?
উত্তর: না, ইহা ঠিক নয়।
প্রশ্ন: বিমান বাহিনীতে আপনি কি পূর্ণ "টার্ম" শেষ করিয়াছিলেন?
উত্তর: হ্যাঁ।
প্রশ্ন: বিমান বাহিনী ত্যাগ করার পূর্বে আপনাকে কোথায় বদলী করা হয়?
উত্তর: ঢাকায়।
প্রশ্ন: ঐসময় ঢাকায় ষ্টেশন কম্যাণ্ডার কে ছিলেন?
উত্তর: গ্রুপ ক্যাপ্টেন ডোগার।
প্রশ্ন: ঐসময় গ্রুপ ক্যাপ্টেন ডোগারের নিকট আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল কি?
উত্তর: আমি যতটুকু জানি গ্রুপ ক্যাপ্টেন ডোগারের নিকট আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনয়ন করা হয় নাই।

প্রশ্ন: আপনি কি কোন সময় কোহাট রিক্রুটমেন্ট ট্রেনিং স্কুলে ছিলেন?
উত্তর: আমি কখনও তথায় নিয়োজিত ছিলাম না।
প্রশ্ন: আপনি কোন মেন্টেন্যান্স সেন্টারে নিযুক্ত ছিলেন?
উত্তর: আমি ড্রিগ রোড মেন্টেন্যান্স সেন্টারে নিয়োজিত ছিলাম।
প্রশ্ন: ঐ সময় ইউনিটের অফিসার কম্যাণ্ডিং কে ছিলেন?
উত্তর: উইং কম্যাণ্ডার উইলিয়ামস ঐসময় ইউনিটের অফিসার কম্যাণ্ডিং ছিলেন।
প্রশ্ন: আপনার ছেলে কি ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য টেষ্ট দিয়াছিল?
উত্তর: হ্যাঁ।
প্রশ্ন: সে কি পাস করিয়াছিল?
উত্তর: সম্ভবতঃ হয় নাই।
প্রশ্ন: ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের এডজুটেন্টকে অনুরোধ করার জন্য আপনি কি ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামানকে অনুরোধ করিয়াছিলেন?
উত্তর: না, উহা ঠিক নহে।

'আমাকে প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব হয় নাই'

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব ফজলুল করিমের জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তাহাদেরকে দলের কর্মকর্তার দায়িত্ব দেওয়া হয় না। কাজেই তিনি দলে কোন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহা বলিতে পারেন না।

সাক্ষী আরও বলেন যে, তাঁহাকে প্রস্তাবিত স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব করা হয় নাই।

সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৬ সালের মে হইতে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস তাঁহার জীবনে স্মরণীয় ছিল। তিনি এজন্য গর্ববোধ করিতেন।

সাক্ষী আরও বলেন যে, প্রস্তাবিত স্বাধীন রাষ্ট্রের দ্রব্যমূল্যের ভিত্তি কি হইবে, সে সম্পর্কে তাহাদের বৈঠকে কোন আলোচনা হয় নাই। কাজের ভিত্তি, না মর্যাদার ভিত্তিতে কুপন বিতরণ করা হইবে সে সম্পর্কেও বৈঠকে কোন আলোচনা হয় নাই।

সাক্ষী আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের দারিদ্র্য বা অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিরসনের জন্য সমাজতন্ত্র একমাত্র পন্থা–এ সম্পর্কেও কোন আলোচনা হয় নাই।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী জানান যে, তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের "প্রভু নয়, বন্ধু" পুস্তক পাঠ করিয়াছেন।

সাক্ষী বলেন যে, প্রস্তাবিত স্বাধীন রাষ্ট্রটি চীনা কম্যুনিজম ও কম্যুনিজম প্রতিরোধের মার্কিন সংকল্পের এক সংঘাত কেন্দ্রে পরিণত হইবে, এ সম্পর্কে বৈঠকে কোন আলোচনা হয় নাই বা কেহ একথা উল্লেখও করেন নাই।

ব্যাংকক সফর জনাব বদরুল হায়দার চৌধুরীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৭ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে– সম্ভবতঃ ১৮ই হইতে ২৩শে জুন তিনি দুই-তিনদিনের জন্য দেশের বাহিরে যান। তিনি ব্যাংকক গমন করেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৭ সালের জুলাই-এর পর তিনি দলীয় কাজ করিতে থাকেন। দলীয় কাজের অর্থ আন্দোলনের জন্য নয়া নেতৃত্বের সন্ধান। অবশ্য এই উদ্দেশ্যে সেসময়ে তিনি কাহারও সংগে যোগাযোগ করেন নাই।

জনাব আবদুল্লাহর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, বিমান বাহিনী হইতে তাঁহার চাকুরী ছাড়ানোর পর বিমান বাহিনী কর্তৃপক্ষ পি, আই, এ'তে তাঁহার চাকুরীর জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই।

অদ্য (মঙ্গলবার) সকালে ট্রাইব্যুনালের শুনানী পুনরায় আরম্ভ হইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

একরারী সাক্ষী রমীজের জেরা অব্যাহত

(স্টাফ রিপোর্টার)

তিনদিন বিরতির পর গতকাল সোমবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী পুনরায় শুরু হয়। বিচারপতি জনাব এস এ রহমানকে চেয়ারম্যান করে এবং ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম আর খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিমকে নিয়ে এই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে।

গতকালও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পাঁচ নম্বর একরারী সাক্ষী মীর্জা মোহাম্মদ রমিজের ছয় দিনব্যাপী জেরা অব্যাহত থাকে।

গতকাল বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খান তাঁর গত বৃহস্পতিবারের অসমাপ্ত জেরা সমাপ্ত করেন। এরপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী মীর্জা গোলাম হাফিজ, জনাব ফজলুল করিম, জনাব বদরুল হায়দার চৌধুরী ও জনাব আবদুল্লাহ সাক্ষীকে জেরা করেন। জনাব আবদুল্লার জেরা অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী রাখা হয়। আজ মঙ্গলবার ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন বসবে এবং জনাব আবদুল্লাহ সাক্ষীকে তাঁর অসমাপ্ত জেরা শুরু করবেন।

গতকাল মামলার শুনানীর শুরুতে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খান ৫নং একরারী সাক্ষী মীর্জা মোহাম্মদ রমিজকে পুনরায় জেরা শুরু করেন।

প্র-উদুর নামক গ্রামে একটা রথের মেলা বসত– এটা কি আপনি জানেন?

উ-হ্যাঁ।

প্র-ভওয়ালরাজ এই মেলা চালু করেছেন একথা কি আপনি জানেন?

উ-না।

প্র-জনৈক শিবচরণ মণ্ডল এই মেলার তত্ত্বাবধান করতেন একথা কি আপনি জানেন?

উ-না।

প্র-আপনার চাচাত ভগ্নিপতি আফসারউদ্দিন কি আপনার সম্পত্তি দেখাশোনা করেন?

উ-হ্যাঁ।

প্র-এটা কি সেই সম্পত্তি যা রোজিয়া বিবি তার ছেলে আবদুল ওহাবকে দান করেছিল এবং পরে আপনি তা দখল করে নিয়েছেন?

উ-একথা সত্য নয়।

প্র-এই সম্পত্তির ব্যাপারে কি কোন সালিশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উ-না।

প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি সম্পত্তি নিয়ে উক্ত বিবাদের ব্যাপারে আবদুল ওহাবকে ৪ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছেন?

উ-এ ব্যাপারে কোন বিবাদই ছিল না। কাজেই টাকা প্রদানের প্রশ্নই উঠে না।

প্র-আপনি কি খুলনায় পিআইএ'র ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার ছিলেন?

উ-১৯৬৪ সালে আমি খুলনায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হই।

প্র-আপনি কি খুলনা সার্কিট হাউসে ছিলেন ?

উ-হ্যাঁ, আমি সেখানে থাকাকালে সার্কিট হাউসেই ছিলাম।

প্র-সেখানে আপনি আপনার নাম রমিজউদ্দিন লিখেছিলেন কি?

উ-না।

প্র-একথা কি ঠিক যে, আপনি সার্কিট হাউসের ভাড়া পরিশোধ করেননি বলে খুলনার ডেপুটি কমিশনার আপনাকে সার্কিট হাউসের ভাড়া শোধ করার জন্য পত্র লিখেছিলেন?

উ-খুলনার ডিসির নিকট হতে আমি কোন পত্র পেয়েছি বলে আমার মনে পড়ে না।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলী সাক্ষীর হাতে খুলনার ডিসি লিখিত ২৯-৪-৬৫ সালের একখানা পত্র প্রদান করেন। পিআইএ'র চট্টগ্রামস্থ ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারকে সম্বোধন করে এই পত্রটি লেখা হয়েছে।

সাক্ষী উক্ত পত্র দেখে বলেন, আমি এই পত্রখানা পেয়েছি। ১২ দিনের ভাড়া বাকী ছিল এবং আমি তা পরিশোধ করে দিয়েছি।

প্র-এই পত্রে ডিসি আপনাকে রমিজুদ্দিন বলে সম্বোধন করেছেন তাই না?
উ-হ্যাঁ, আমি তাই দেখতে পাচ্ছি।
প্র-আপনি ইপসিতে কতদিন চাকুরী করেছিলেন?
উ-আমি সরকারী ডিরেক্টর হিসেবে একপক্ষকাল ইপসিতে চাকুরী করি। আমার বেতন ছিল তখন মাসিক ৫৩০ টাকা।
প্র-আপনি বিমান বাহিনী ত্যাগ করার পূর্বে কিভাবে ইপসিকের সহকারী ম্যানেজার বলে নিজেকে উল্লেখ করে মোহাম্মদপুরে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন?
উ-বিমান বাহিনী ত্যাগের প্রস্তুতি হিসেবে ১৯৬২ সালে আমি যখন তিন মাসের ছুটিতে ছিলাম তখন আমাকে ইপসিকে যোগ দেয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।
প্র-আপনি আপনার স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে "শেল্টার"-এর উল্লেখ করেছেন। এই শেল্টার কি?
উ-শ্বশুরের যে বাড়ীতে আমি থাকতাম এটা তার নাম।
প্র-খুলনায় থাকাকালে সার্কিট হাউসের চৌকিদার আপনাকে খানা সরবরাহ করেছিল। সে বাবদ সার্কিট হাউসের চৌকিদার শমসের আলী আপনার নিকট ৮৩ টাকা ৭৫ পয়সা পাওনা ছিল এবং উক্ত টাকা পরিশোধের জন্য আপনাকে ১৯৬৫ সালের ১৯শে মে পত্র লিখেছিল একথা কি সত্য?
উ-আমি উক্ত টাকা পরিশোধ করে দিয়েছি। এ টাকা পরিশোধের মানি অর্ডার রসিদও ফাইলে আমি দেখতে পাচ্ছি।
সাক্ষী নিজ হতে বলেন, আমাকে এ ব্যাপারে আগে বিল দেওয়া হয়নি।
প্র-চট্টগ্রাম বদলী হওয়ার পরও আপনি ঢাকার ফ্ল্যাট ছেড়ে দেননি কেন?
উ-ঢাকা এলে আমি যেন ওখানে থাকতে পারি তার জন্যই এই ফ্ল্যাট রেখেছিলাম। তাছাড়া আমার স্ত্রী ঐ ফ্ল্যাটে থাকতেন।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি আপনার স্ত্রীকে কখনও চট্টগ্রাম নিয়ে যাননি?
উ-না, সত্য নয়।
সাক্ষী অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমার স্ত্রী বর্তমানে আমার চট্টগ্রামস্থ পিআইএ প্রদত্ত বাসভবনে বসবাস করছেন।
প্র-আপনার গ্রেফতারের পর আপনার স্ত্রীকে কি ঐ বাড়ী ত্যাগ করতে বলা হয়েছে?
উ-না।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনার গ্রেফতারের পর আপনার চট্টগ্রামের বাসভবনের সকল বাসিন্দাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং পরে তাদের পুনরায় থাকতে দেওয়া হয়?
উ-একথা সত্য নয়।

প্র-আপনার ঢাকার ফ্ল্যাটের ড্রইং রুমের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১১ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৭ফুট ৪ ইঞ্চি–একথা কি সত্য?
উ-উক্ত মাপও হতে পারে বা তার বেশীও হতে পারে।
প্র-আপনার বেড রুমের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১৩ ফুট এবং প্রস্থ ১১ ফুট একথা কি ঠিক?
উ-আমি বলতে পারব না।
প্র-আপনার ফ্ল্যাটের প্রধান কক্ষের সঙ্গে যে বারান্দা আছে তার মাপ কত?
উ-আমি তা বলতে পারব না।
প্র-আপনার শয়নকক্ষে কয়টি বেড আছে?
উ-দুটি।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনার শয়নকক্ষের একটি বিছানায় ইয়াহিয়া (দুলাল) এবং অপরটিতে আপনি শয়ন করতেন?
উ-আমি যখন চট্টগ্রাম হতে ঢাকা আগমন করতাম তখন ইয়াহিয়া এক বিছানায় এবং আমি অপর বিছানায় শয়ন করতাম।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনার স্ত্রী বারান্দায় সাজান অনেকগুলো ট্রাঙ্কের ওপর বিছানা করে শয়ন করতেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-ইয়াহিয়ার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?
উ-তার বড় ভাই আমার ভাইঝিকে বিয়ে করেছে।
প্র-কখন এই বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উ-আমার মনে নেই।
প্র-ইয়াহিয়ার সেই ভাইয়ের নাম কি?
উ-আমি ভুলে গেছি।
প্র-এর আগে কি ইয়াহিয়ার সাথে আপনার কোন সম্পর্ক ছিল না, বিয়ের সূত্র ধরে আপনাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠে?
উ-বিয়ের সূত্র ধরে এই সম্পর্ক গড়ে উঠে।
প্র-এই ইয়াহিয়া বা দুলালকে আপনি কতদিন হতে চেনেন?
উ-বিগত ৪ বছর হতে।
প্র-একথা কি সত্য যে, ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রামে ইয়াহিয়ার বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উ-হ্যাঁ।
প্র-তাঁর স্ত্রী কি বাঙ্গালী?
উ-তার স্ত্রীর ভাষা উর্দু।

প্র-একথা কি সত্য যে, ইয়াহিয়াকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই মেয়েকে বিয়ে করতে আপনি বাধ্য করেছেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-আপনি কি আপনার নামের একটা অংশ ইয়াহিয়াকে তার নামের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন?
উ-আমি বলতে পারব না।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আতাউর রহমান খান এই সময় সাক্ষীর ব্যক্তিগত ফাইল হতে একখানা পত্র তার হাতে দিয়ে জানতে চান যে, এই পত্র তিনি লিখেছেন কিনা?
সাক্ষী বলেন যে, তিনি উক্ত পত্র লিখেছেন ঐ পত্রে তিনি ইয়াহিয়াকে 'ইয়াহিয়া রমিজ' বলে সম্বোধন করেছেন।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি আপনার ফ্ল্যাটের ঠিকানায় ইয়াহিয়া রমিজের নামে ধারে বহু পিআইএ টিকিট ইস্যু করেছেন?
উ-আমি তার নামে ধারে টিকেট ইস্যু করেছি।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি তার জন্য কনসেশন টিকেট লাভের উদ্দেশ্যে তাকে আপনার ভাই বলে বর্ণনা করেছেন?
উ-আমার মনে পড়ছে না।
প্র-আপনি কি তাকে বার্মা ইস্টার্ন লিঃ এ চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন?
উ-একথা সত্য নয়। সে পরীক্ষা দিয়ে নির্বাচিত হয়ে চাকুরী পেয়েছে।
প্র-আপনার ফ্ল্যাটের মধ্যে যে দেয়াল রয়েছে তা ৫ ইঞ্চি পুরু তাই না?
উ-আমি জানি না।
প্র-আপনার কক্ষে আলোচনার সময় কণ্ঠস্বর অন্যান্য ফ্ল্যাট হতে শোনা যায় তা ঠিক কিনা?
উ-একথা ঠিক নয়।
প্র-আপনি এই আদালতে বলেছেন যে, ১৯৬৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আপনার ফ্ল্যাটে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠক চলাকালে বেলা ২টা-আড়াইটার সময় শালামার হোটেল হতে আপনি নানরুটি ও কাবাব কিনে এনে সকলকে খাইয়েছেন। কিন্তু আপনি কি জানেন যে, সন্ধ্যার পূর্বে এই হোটেলটি খোলা হয় না এবং কাবাব ও নানরুটি তার আগে পাওয়া যায় না।
উ-এই হোটেল সবসময়ই খোলা থাকে।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনার ড্রাইভার আলী আহমদ ব্যাঙ্ক হতে ঋণ গ্রহণ করেছে এবং উক্ত ঋণের জন্য আপনি গ্যারান্টি দিয়েছেন।
উ-পিআইএ'র চট্টগ্রাম অফিসের সিনিয়ার সেলস অফিসার আলী আহমদের ঋণের জন্য আমি গ্যারান্টি দিয়েছি।

প্র-ডলি হলকে কি আপনি চেনেন? তিনি একজন খৃষ্টান মহিলা এবং আপনি তাকে ধারে পিআইএ'র টিকেট দিয়েছেন একথা কি সত্য?
উ-হ্যাঁ... আমি তাকে ধারে টিকেট দিয়েছি।
প্র-ডলি হলের ভগিনী বেলা হল পিআইএ'র একজন এয়ার হোস্টেস তাই না?
উ-হ্যাঁ।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি ১৯৬৬/৬৭ সালে ঢাকায় ইন্দিরা রোডে বেলা হলের জন্য একটি বাড়ী ভাড়া করেছেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি বেলা হলকে আপনার দ্বিতীয় স্ত্রী বলে পরিচয় দিতেন?
উ-একথা ঠিক নয়।
প্র-আপনি কি জানেন যে, আলী রেজা একজন পশু ও পাখি রফতানীকারক?
উ-আমি জানি না।
প্র-একথা কি সত্য যে, তিনি ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে লাহোর গমন করেছিলেন?
উ-না–সত্য নয়।
প্র-এই ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারেই তিনি লাহোর হতে পেশোয়ারে যশনে খাইবার মেলায় গিয়েছিলেন একথা ঠিক কিনা?
উ-তিনি ক্যাপ্টেন মোতালেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে পেশোয়ার গিয়েছিলেন।
প্র-আলী রেজা আপনাকে টিকিটের জন্য টাকা দিয়েছিলেন কিন্তু আপনি সেই টাকা আত্মসাৎ করে তার নামে বাকী টিকেট ইস্যু করা হয়েছে বলে দেখিয়েছেন–একথা কি সত্য?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-আপনি লেবোরেটরী রোডে আলী রেজার বাড়ী যখন গিয়েছিলেন তখন সেখানে কাকে কাকে দেখেছিলেন?
উ-আমি তার ছোট ভাই, অসুস্থ পিতাকে দেখেছি। তার পরিবারের অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখিনি।
প্র-আপনি সেখানে কতক্ষণ ছিলেন?
উ-আমি সেখানে আধ ঘণ্টা ছিলাম, পরে স্টুয়ার্ড মুজিব সেখানে আগমন করেন।
প্র-আপনি কি প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করেন?
উ-আমি মদ্য পানে অভ্যস্ত। তবে গ্রেফতারের পর আমি মদ্য পান ত্যাগ করেছি।

প্র-গ্রেফতারের পর কি আপনাকে মদ সরবরাহ করা হত?
উ-না।
প্র-চট্টগ্রাম ক্লাবে আপনি কি ২/৩ হাজার টাকা দেনা রয়েছেন?
উ-ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে ফ্লাইট সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ১৯৬৭ সনের নবেম্বর মাসে আমি একটি পার্টির আয়োজন করেছিলাম। সেই পার্টির বিলের টাকা অপরিশোধিত রয়েছে।
প্র-এছাড়া কি আপনার নিকট অন্য কোন বিল পাওনা নেই?
উ-আমার ক্লাব বিল অপরিশোধিত থাকতে পারে।
প্র-শাহবাগ হোটেলেও কি আপনার নামে ৪ হাজার টাকার বিল বাকী রয়েছে?
উ-এরূপ কোন বিল সম্পর্কে আমার জানা নেই।
প্র-ক্লাবে প্রতি মাসে আপনার বিল হয় প্রায় এক হাজার টাকা তাই না?
উ-হ্যাঁ।
প্র-আপনি কি আপনার ক্ষমতার বাইরে ব্যয় করেন না?
উ-না।
প্র-বিভিন্ন ব্যাঙ্কে কি আপনার ঋণ আছে যেমন হাবিব ব্যাঙ্ক, ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক, ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ইত্যাদি।
উ-কমার্স ব্যাঙ্কে আমার ৫ হাজার টাকা ঋণ আছে এবং ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কে ২ হাজার টাকা ঋণ আছে।
প্র-ন্যাশনাল এ্যান্ড গ্রিন্ডলেঞ্জ ব্যাঙ্কে কি আপনার কোন ঋণ আছে?
উ-না।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি হাবিব ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করতে না পেরে আপনার ফিয়াট গাড়ীটি ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক রেখেছেন?
উ-হ্যাঁ।
প্র-ন্যাশনাল এ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক হতেও দেনা শোধের জন্য আপনাকে পত্র লেখা হয়েছে?
উ-আমি উক্ত ব্যাঙ্ক হতে ওভারড্রাফট নিয়েছিলাম। দু'বছর আগে তা শোধ করেছি।
প্র-আপনি দেনা পরিশোধের হাত হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য নাম পরিবর্তন করে মীর্জা রমিজ রেখেছেন একথা সত্য কিনা?
উ-সত্য নয়।
প্র-জেলখানায় এয়ার মার্শাল আসগর খান কি আপনার সাথে দেখা করেছিলেন?
উ-না।

প্র-একথা কি সত্য যে, গ্রেফতারের পর আপনাকে পিআইএ'র চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং পিআইএ'র আইন উপদেষ্টা এ ব্যাপারে আপনাকে পত্র প্রেরণ করেছেন?
উ-আমি এরূপ কোন পত্র পাইনি এবং আমাকে বরখাস্তও করা হয়নি।

আবদুল্লাহ

জনাব বদরুল হায়দার চৌধুরীর জেরা শেষ হলে জনাব আবদুল্লাহ সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র-পাকিস্তান বিমান বাহিনীর পক্ষ থেকে কি আপনার পিআইএ'র চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল?
উ-জী না।
প্র-প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কি ১৯৬৭ সালের নবেম্বর মাসে কতিপয় সরকারী অনুষ্ঠানের জন্য চট্টগ্রাম সফর করেছিলেন?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-তিনি কি তখন তাঁর পূর্ব পাকিস্তান সফরসূচী কেটে সংক্ষিপ্ত করেছিলেন?
উ-তাও আমার জানা নেই।
প্র-চট্টগ্রাম সফরকালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়েছিল এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে এই মর্মে কোন সংবাদ আপনি কোন পত্রিকায় পড়েছেন?
উ-এ সংবাদ আমি শুনিনি বা কোন সংবাদপত্রেও পাঠ করিনি।
প্র-সত্য গোপন করার জন্য কি আপনি জেরার জবাবে বলে থাকেন যে, 'আপনার স্মরণ নেই?'
উ-জী না।
প্র-১৯৬৬ সালের জুন-জুলাই মাসে কোথায় ক্যাপ্টেন আলমের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল?
উ-আমি তাঁর কুমিল্লাস্থ বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে তাঁর বাড়ীর বারান্দায় দেখেছি।
প্র-আপনাকে কি ক্যাপ্টেন আলমের পরিবারের সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছিল?
উ-জী না। শুধু ক্যাপ্টেন আলমের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।
প্র-ক্যাপ্টেন আলমের বাসায় বৈঠকের কোন আলোচ্যসূচী ছিল কি?
উ-জী না।

এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ক্যাপ্টেন আলমের বাসা থেকে মোটরযোগে তাঁরা ক্যাপ্টেন শওকতের বাসায় যান। এই দু'বাসার মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায় ৬ মাইল। তারা তাঁর বাসায় পৌঁছলে ক্যাপ্টেন শওকত বাড়ীর আঙ্গিনায় বেরিয়ে আসেন এবং সেখানেই তাঁর সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়।

ক্যাপ্টেন আলমের বাসা থেকে তাঁরা সাড়ে তিনটায় রওয়ানা হন এবং বিকেল সাড়ে চারটায় ক্যাপ্টেন শওকতের বাড়ী পৌঁছেন।

প্র-ক্যাপ্টেন আলীম ও ক্যাপ্টেন হুদা তখন কোথায় ছিলেন?

উ-ক্যাপ্টেন শওকত আমাকে বলেছিলেন যে, ক্যাপ্টেন আলীম ও ক্যাপ্টেন হুদা তখন ঢাকায় ছিলেন।

প্র-একথা কি সত্য যে, ক্যাপ্টেন হুদা তখন ঢাকায় ছিলেন না এবং ক্যাপ্টেন শওকত আপনাকে তা বলতে পারেন না?

উ-একথা সত্য নয় ।

প্র-একথা কি সত্য যে, ক্যাপ্টেন আলম ও ক্যাপ্টেন শওকতের বাসায় আপনার যাওয়ার ঘটনা মিথ্যা?

উ-জী না। একথা সত্য নয়।

প্র-কখন থেকে আপনি চট্টগ্রাম ক্লাবের সদস্য হন?

উ-১৯৬৫ সাল থেকে।

প্র-আপনি কি কখনও নাট্যমঞ্চে অভিনয় করেছিলেন?

উ-জী না।

এখানেই জনাব আবদুল্লার জেরা অসমাপ্ত থাকে এবং আজ মঙ্গলবার তিনি পুনরায় সাক্ষীকে তাঁর অসমাপ্ত জেরা শুরু করবেন।

সংবাদ

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজের ৮ দিনব্যাপী জেরা সমাপ্তঃ ৬ষ্ঠ রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আলীমের জবানবন্দীর পর সওয়াল-জবাব শুরু

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে গতকাল (মঙ্গলবার) ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীকালে ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস,এ,রহমান বেলোনিয়া সম্পর্কে প্রধান সরকারী কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদেরের একটি প্রশ্ন নাকচ করিয়া দেন। জনাব মঞ্জুর কাদের রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজকে প্রশ্ন করিতে চেষ্টা করেন যে, ইতিপূর্বে বেলোনিয়া ঢাকা-চট্টগ্রাম পথে অবস্থিত বলিতে তিনি কি আসলে ঐ পথে বেলোনিয়ার কাছাকাছি কোন স্থানকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই।

বিবাদীপক্ষীয় প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুল সালাম খান মঞ্জুর কাদেরের এই প্রশ্নে আপত্তি তোলেন। তিনি বলেন যে, সওয়াল জওয়াব ও জেরার সময় রাজসাক্ষী রমিজ পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, বেলোনিয়া ঢাকা-চট্টগ্রাম পথে অবস্থিত।

এই পর্যায়ে ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান জনাব এস,এ রহমান জনাব মঞ্জুর কাদেরের প্রশ্নটি নাকচ করিয়া দিয়া বলেন যে, সাক্ষী রমিজ ইতিপূর্বে যাহা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন সে সম্পর্কে তিনি আবার কোন প্রশ্ন উত্থাপন করার অবকাশ দিতে পারেন না।

গতকাল ৬নং সাক্ষী ও ৫নং রাজসাক্ষী মীর্জা রমিজের ৮ দিনব্যাপী সওয়াল-জওয়াব সমাপ্ত হয়। অতঃপর ৭নং সাক্ষী ও ৬নং রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভুঁইয়ার জবানবন্দী গ্রহণ ও সওয়াল-জওয়াব শুরু হয়।

মীর্জা রমিজকে তাঁহার জেরার সমাপ্তি দিবসে ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে তাঁহার রাঙ্গামাটি সফর সংক্রান্ত বিল প্রসঙ্গে গতকল্য (মঙ্গলবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদেরের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে ষড়যন্ত্র মামলার সপ্তম সরকারী সাক্ষী ও ষষ্ঠ রাজসাক্ষী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন এম, আবদুল আলীম ভুঁইয়া তাঁহার জবানবন্দী পেশ করেন।

কুমিল্লা জেলার অধিবাসী ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম (৩০) প্রকাশ করেন যে, তিনি ১৯৬০ সনে পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে যোগদান করেন এবং তাঁহার ট্রেনিং শেষে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীতে তিনি কমিশণ্ড হন এবং চাকলালা সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট ষ্টোর্স ডিপোতে চাকুরিতে নিযুক্ত হন।

সাক্ষী বলেনঃ "আমার কলেজ জীবন হইতেই ক্যাপ্টেন নজমুল হুদাকে চিনি। ১৯৬৫ সনে আমি গোলরা সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট ষ্টোর্স ডিপোতে নিযুক্ত হই। ঐ সময় ক্যাপ্টেন হুদা 'চেক আপ'-এর জন্য রাওয়ালপিণ্ডি কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতালে ভর্তি হন। ঐ সময় তাঁহার সহিত প্রায়শঃ দেখা করিতাম এবং আমরা পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা, দেশের উভয় অংশের জীবনযাত্রার মান এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা করিতাম। বৈষম্যের বিষয়টি আমাদেরকে নাড়া দিত। আমরা সংকল্পবদ্ধ হই যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কিছু করা না হইলে ভবিষ্যতে কোন আশা নাই।

আমাদের এই বিশ্বাস জন্মে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদরাজি ব্যবহার করার একটা সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকারের আছে।"

জবানবন্দী পেশ করিতে গিয়া মীর্জা রমিজকে তাঁহার জেরার সমাপ্তি দিবসে ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে তাঁহার রাঙ্গামাটি সফর সংক্রান্ত বিল প্রসঙ্গে সরকারপক্ষীয় কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের প্রশ্ন করেন এবং বিবাদীপক্ষীয় কৌসুলি জনাব সালাম খান জেরা করেন।

প্রথমোক্ত প্রশ্নের জবাবে মীর্জা রমিজ বলেন যে, রাঙ্গামাটি সফর সংক্রান্ত বিলটি ভুয়া। তাহার মিশনকে গোপন রাখার উদ্দেশ্যেই তিনি এই ভুয়া বিল দাখিল করেন। আসলে তিনি রাঙ্গামাটি যান নাই, ফেনী গিয়াছিলেন।

সালাম খানের জেরার জবাবে মীর্জা রমিজ বলেন যে, রাঙ্গামাটি সফর সংক্রান্ত বিলটি যে ভুয়া, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে কিন্তু তিনি উহা স্বীকার করেন নাই।

তিনি মদ চালু রাখার পক্ষে ছিলেন। তিনি অবশ্য বলেন যে, সংশ্লিষ্ট দলিলসমূহ মূলত এ সম্পর্কে কোন বক্তব্য ছিল না। তবে এই প্রশ্নে লেঃ মোয়াজ্জেমের সহিত তাঁহার মতানৈক্য ছিল।

সাক্ষী রমিজকে প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের ধরন সম্পর্কে পেশোয়ারে অবস্থানকালে জনৈক নর্ত্তকের সহিত তাঁহার পরিচয় ও সম্পর্ক এবং মোহাম্মদপুরে নিজস্ব ফ্লাট থাকা সত্ত্বেও ১৯৬৭ সালের মে-জুন মাসে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে তাঁহার অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। নর্তক সেলিম সম্পর্কিত প্রশ্ন ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান নাকচ করেন।

প্রস্তাবিত রাষ্ট্রে প্রকৃতি সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে মীর্জা রমিজ বলেন যে, স্বাধীনতার পর প্রায় ৫ বৎসর ধরিয়া সামরিক শাসন বলবৎ রাখা হইত। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আনার পরই একটি কাউন্সিল ও বিশেষজ্ঞ পরিষদ নির্বাচনের জন্য গণভোট (রেফারেণ্ডাম) অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইত, নির্বাচিত সরকারই রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ধারণ করিত।

বিপ্লবী সংগঠনের দলিলসমূহে (ডাইরী, ফোল্ডার, এক্সারসাইজ বুক) "জনগণের, জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্য" এইরূপ একটি রাষ্ট্রীয় আদর্শের কল্পনা করা হইয়াছিল।

আমি এমন এক আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করিয়াছিলাম যেখানে প্রতিটি মানুষের থাকার জন্য ঘর থাকিবে, প্রত্যেকেরই পেটে ভাত থাকিবে, প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিঃ খরচায় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে আর রাজনৈতিক ভেল্‌কি-বাজির হইবে অবসান।

বিবাদীপক্ষীয় কৌসুলির অপর এক প্রশ্নের উত্তরে রাজসাক্ষী বলেন যে, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে আগরতলা প্রতিনিধিদলের ফেনীর হোষ্টেলে থাকার কথা ছিল। তিনি উহার নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন কিনা স্মরণ করিতে পারিতেছেন না।

১৯৬৭-এর মে-জুনে তিনি কেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে উঠিয়াছিলেন ঐ প্রশ্নের উত্তরে মীর্জা রমিজ বলেন, "আরামের জন্য।"

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সামরিক হেফাজতে থাকাকালীন তাঁহার কোন ছবি তোলা হয় নাই। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকাকালেই শুধু তাঁহার ছবি লওয়া হইয়াছে। এই পর্যায়ে মীর্জা রমিজের সওয়াল-জওয়াব শেষ হয়।

অতঃপর সরকারী কৌসুলি তাঁহার পুনঃপরীক্ষা শুরু করেন।সাক্ষী রমিজ সরকারী কৌসুলির প্রশ্নের জবাবে রাঙ্গামাটি সফর সংক্রান্ত বিলটিকে ভুয়া

বলিয়া অভিহিত করেন। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, ই-এক্স-টি পি ডবলিউ– ৬/১৩ চিহ্নিত দলিল অনুযায়ী তিনি ১৯৬৭ সালের ১৮ই জুন হইতে ২০শে জুন পর্যন্ত ব্যাংককে ছিলেন। তৎপরবর্তী তারিখে তিনি ঢাকায় আগমন করেন। তিনি আরও বলেন, সওয়াল-জওয়াবের সময় চট্টগ্রাম হইতে ঢাকায় আসিবার সময় এরিয়া ম্যানেজারের অনুমতির তৎক্ষণাৎ অথবা পরবর্তী সময়ে রেকর্ডভুক্তি বলিতে তিনি ইহাই বুঝাতে চাহিয়াছেন যে, মৌখিক অনুমতি লইয়া প্রস্থানের ব্যাপার হইলে উহা তৎক্ষণাৎ অথবা পরবর্তী সময়ে রেকর্ডভুক্ত হইবে।

জুলমত আলী খান

প্রঃ পি এ এফ রিলিজ হওয়ার সময় আপনি কত টাকা বেতন পেতেন?

উঃ আমার মনে নেই।

প্রঃ পি এ এফ-এ চাকরির জন্য আপনি কোন পেন্সন পাচ্ছেন?

উঃ হ্যাঁ, পাচ্ছি।

প্রঃ কত টাকা?

উঃ প্রতি মাসে ১৬৬ টাকা।

প্রঃ পি এ এফ-এ আপনার স্কেল কী ছিল?

উঃ আমি মনে করতে পারছি না।

প্রঃ আপনি যে পেন্সন পাচ্ছেন, তা আপনার বেতনের এক-তৃতীয়াংশ না এক-চতুর্থাংশ না এক-পঞ্চমাংশ?

উঃ তা আমি বলতে পারছি না।

প্রঃ পি এ এফ-এ প্রথম দফা সর্ট কমিশনের মেয়াদ কদ্দিন?

উঃ প্রথম দফা সর্ট কমিশনের মেয়াদ ৫ বছর। এই মেয়াদ আরও ৫ বছর সম্প্রসারণযোগ্য এবং এই মেয়াদও শেষ হলে আরও এর সম্প্রসারণ হতে পারে।

প্রঃ আপনি কীসে যোগদান করেন?

উ ঃ সর্ট সার্ভিস কমিশনে।

প্রঃ পি এ এফ-এ ১০ বছর চাকরি করার পর আপনি কোন এক্সটেনশন পেয়েছিলেন?

উঃ না।

প্রঃ আপনি অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছিলেন বলেই কী আপনাকে এক্সটেনশন দেওয়া হয়নি?

উঃ না, তা ঠিক নয়।

কৌসুলির অন্যান্য প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ দলের টাকা-পয়সা কোথেকে পাওয়া যায় এ তথ্য লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে যে সময় বলেন, সেসময়ে তিনি বরিশালে নিযুক্ত ছিলেন। এই তথ্য আমাকে ১৯৬৭

সনের মার্চের কোন একসময় জানান হয়; কিন্তু আমি তারিখ বা দিন স্মরণ করতে পারছি না। এটা সত্য নয় যে, আমার অবশিষ্ট জবানবন্দী অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে পড়বে বলে আমি এই তারিখ প্রকাশ করছি না। এটা ঠিক নয় যে, লেঃ মোয়াজ্জেম কর্তৃক টাকাপয়সার উৎস সম্পর্কিত যে বক্তব্য আমি পেশ করেছি তা মিথ্যা।

সাক্ষী আরও বলেনঃ সত্যিকারের গ্রেফতারের আগে আমি গ্রেফতার হওয়ার কোন ধারণা করিনি। আমার ১৯৬২ সনের ৩১শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৬ সনের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়কার ছুটি সম্পর্কিত ছুটির কার্ডটি আমার হাতে দেয়া হয়েছে। এখন আমি দেখছি যে, এই ছুটির কার্ডে ১৯৬৭ সনের ২৯শে জুলাই পর্যন্ত সময়ের ছুটির হিসেব রয়েছে।

কৌসুলির অন্যান্য প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেনঃ আমি স্মরণ করতে পারছি না, আমার গ্রেফতারের আগে আমি পি আই এ'র ১৯৬৫-৬৬ সনের অডিট রিপোর্ট দেখেছিলাম কি না। আমার অফিস প্রতি বছরেই অডিট করা হয়। হতে পারে যে, অডিট শেষে আমার মন্তব্যের জন্য রিপোর্টটি আমার কাছে পাঠান হয়েছিল।

রাজসাক্ষী বলেনঃ রাজবাড়ী সেন্টারে আমাকে একটি পৃথক কক্ষে রাখা হয়। এটা ঠিক নয় যে, অব্যাহত জিজ্ঞাসাবাদ ও হাই পাওয়ারের বাল্‌ব আমার কক্ষে জ্বালিয়ে রেখে আমার উপর নির্যাতন করা হয়।

তাঁদের ইচ্ছেমত পুলিসের কাছে জবানবন্দী দিতে বাধ্য করার জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আমার উপর নির্যাতন করা হয়েছিল–এটাও ঠিক নয়। এটা সত্য নয় যে, আটক থাকাকালে ক্যান্টনমেন্টে আমাকে ১৯৬৫-৬৬ সনের অডিট রিপোর্ট দেখানো হয় এবং জবানবন্দী করার জন্য শাসানো হয়। আমি জানি না, ১৯৬৭ সনের অডিট রিপোর্টটি ১৯৬৮ সনের ১৩ই ফেবরুয়ারী প্রস্তুত করা হয়েছিল কিনা। কারণ, আমি তখন আটক ছিলাম। ক্যান্টনমেন্টে আটক থাকাকালে কর্ণেল শের আলী বাজ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেননি।

কৌসুলির জেরার জবাবে সাক্ষী বলেনঃ ১৯৫৯ সনের শেষ অথবা ১৯৬০ সনের প্রথমদিকে আমি পেশোয়ার থেকে বদলি হয়ে ঢাকায় আসি। কিছুদিনের জন্য আমি পেশোয়ার পি-এ-এফ ড্রাম্যাটিক ক্লাবের ইনচার্জ ছিলাম। আমি স্মরণ করতে পারছি না, সলিম নামে কোন নর্তক ঐ ক্লাবে আসতেন কি না। সলিম নামে আমার কোন ব্যক্তিগত ভৃত্য ছিল না। আমি সলিম নামে কোন বুট বয়কে স্মরণ করতে পারছি না। আমার অধীনে পেশোয়ারে কাজ করতে পারেন মিঃ মীর্জা নামে এমন কোন এয়ারম্যানের কথা আমি স্মরণ করতে পারছি না।

জনাব জুলমত আলী খান এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতে চান যে, সলিম নামে জনৈক নর্তকের সহিত সাক্ষীর কলঙ্কজনক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মক্কেলের

নির্দেশ ছাড়া এই প্রশ্নের সপক্ষে অন্য কোন ভিত্তি হাজির করিতে না পারায় প্রশ্নটি নাকচ হইয়া যায়।

ইহার পর কৌসুলির এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, আদালতে পেশকৃত তাঁহার পিতার নাম এম,এম, সিরাজ বলিতে মীর্জা মোহাম্মদ সিরাজ বুঝায়। তিনি শের মোহাম্মদ নামেও পরিচিত ছিলেন।

দৈনিক পয়গাম

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

সাবেক ফ্লাইট লেঃ মীর্জা রমিজের জেরা সমাপ্ত :

রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আলীমের জবানবন্দী শেষ : জেরা শুরু

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য মঙ্গলবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৫নং রাজসাক্ষী সাবেক ফ্লাইট লেঃ মীর্জা মোহাম্মদ রমিজের জেরা সমাপ্ত হয় ও ৬নং রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভুইয়ার জবানবন্দী সমাপ্ত ও জেরা শুরু হয়। বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মঞ্জুর কাদিরের পক্ষে অন্যতম কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খান সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন: আপনার নাম কি?

উত্তর: ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভূইয়া।

প্রশ্ন: পিতার নাম কি?

উত্তর: আলহাজ নাজিমূদ্দিন ভুইয়া।

প্রশ্ন: ঠিকানা?

উত্তর: গ্রাম: পারামাতলা, পো: বৃন্দারামপুর, থানা- মুরাদনগর, জিলা- কুমিল্লা।

প্রশ্ন: আপনার বয়স কত?

উত্তর: ৩০ বৎসর।

প্রশ্ন: কখন আপনি সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন?

উত্তর: ১৯৬০ সালের মে মাসে আমি পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীতে যোগদান করি এবং কমিশন পাওয়ার পর সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট হিসাবে চাকলালা সি, এম, টি, এস, ডি'তে নিযুক্ত হই।

প্রশ্ন–আপনি ক্যাপ্টেন নজমুল হুদাকে চেনেন?

উত্তর–ক্যাপ্টেন নজমুল হুদাকে আমি কলেজ জীবন হইতেই চিনি। এই পর্যায়ে ক্যাপ্টেন আলীম বলেন যে, ১৯৬৫ সালে তাঁহাকে 'গোলরা' সি এম টি এস ডি'তে বদলী করা হয় এবং ঐ সময় ক্যাপ্টেন হুদা রাওয়ালপিণ্ডি সি, এম, এইচ-এ (কম্বাইণ্ড মিলিটারী হাসপাতাল) ভর্তি হয়। (৬নং রাজসাক্ষী ডকে সঠিকভাবে ক্যাপ্টেন হুদাকে সনাক্ত করেন।)

প্রশ্ন–এই সময় কি ক্যাপ্টেন হুদার সহিত আপনার দেখা হইত?
উত্তর–এই সময় ক্যাপ্টেন হুদার সহিত আমি প্রায়ই সাক্ষাৎ করিতাম এবং পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং পাকিস্তানের উভয় অংশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে আলোচনা করিতাম।

এই পর্যায়ে ক্যাপ্টেন আলীম বলেন, আমাদের নিকট উভয় প্রদেশের মধ্যকার বৈষম্য অসহনীয় মনে হইত।

আমরা দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলাম যে, বিশেষ কোন কিছু করা না হইলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের কোন উন্নতি হইবে না। আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে,পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ ব্যবহার করিতেছে। কাজেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়াছিলাম যে, যখনই সুযোগ আসিবে, তখনই পশ্চিম পাকিস্তানের বন্ধন হইতে পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিব।
প্রশ্ন–আপনি কখন ঢাকায় বদলী হন?
উত্তর–১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি।
সাক্ষী বলেন, ঢাকায় আমাকে ১৪ ডিভিশনের অধীন ৮ম ডিভিশন অর্ডিন্যাস কোম্পানীতে নিযুক্ত করা হয়।
প্রশ্ন–ক্যাপ্টেন হুদা কখন বদলী হন?
উত্তর–সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে ক্যাপ্টেন হুদা ঢাকায় ১৪ ডিভিশনের অধীন ৩৬ এস এণ্ড টি ব্যাটেলিয়নে বদলী হইয়া আসেন।
প্রশ্ন–'এস এণ্ড টি' অর্থ কি?
উত্তর: সাপ্লাই এণ্ড ট্রান্সপোর্ট।
সাক্ষী বলেন, যেহেতু আমরা একই অভিমত পোষণ করিতাম সেহেতু প্রায়ই আমার ও ক্যাপ্টেন হুদার মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হইত।
প্রশ্ন: ক্যাপ্টেন হুদা কোথায় বসবাস করিতেন?
উত্তর: ঢাকার গ্রীন রোডে।
প্রশ্ন: আপনি জনাব এম, এম, রমিজকে চিনেন?
উত্তর: হ্যাঁ।
প্রশ্ন: কিভাবে?
উত্তর: ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসের প্রথম বা শেষদিকে একদিন ক্যাপ্টেন হুদা তাঁহার বাসায় আমাকে দাওয়াত করেন। দাওয়াত অনুযায়ী আমি ক্যাপ্টেন হুদার বাসায় যাই এবং তাহার কক্ষে একজন ভদ্রলোককে উপবিষ্ট দেখি। তখন ক্যাপ্টেন হুদা আমাকে তাহার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন যে, তিনি চট্টগ্রাম পিআইএ'র মিঃ এম, এম, রমিজ।

মিঃ রমিজ তখন বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন করেন এবং আমরা আলোচনায় যোগদান করি। ঐসময় বাসায় অপর এক ভদ্রলোক আসেন

এবং পাকিস্তান নেভীর লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন বলিয়া আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়।
(এই পর্যায়ে সাক্ষী ডকে সঠিকভাবে লেঃ মোয়াজ্জেমকে সনাক্ত করেন)।

মিঃ রমিজ তখন বৈষম্য সম্পর্ক আলোচনা করেন এবং বলেন, "পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জীবনযাত্রায় কোন উন্নতি হইবে না।"

এই পর্যায়ে "পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমরা পেছনেই পড়িয়া থাকিব।" আমি এই অভিমত প্রকাশ করিলে মীর্জা রমিজ উৎসাহিত হন এবং ঘোষণা করেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা লইয়া ইতিমধ্যে আমরা একটি সংগঠন করিয়াছি।

এই কথা বলিয়া মিঃ রমিজ লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনসহ ক্যাপ্টেন হুদার বাসা ত্যাগ করেন।

তাহারা চলিয়া গেলে ক্যাপ্টেন হুদা ও আমি তথায় অবস্থান করি। সাক্ষী বলেন, বৈষম্য সম্পর্কে ইতিমধ্যেই আমি অবহিত ছিলাম; কিন্তু তখনই সরাসরি বিপ্লবী সংস্থায় যোগদান করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। এই সময় ক্যাপ্টেন হুদা আমাকে রাওয়ালপিণ্ডিতে আমার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দেন এবং এই সংস্থায় যোগদানের জন্য ক্যাপ্টেন হুদার কথায় রাজী হই।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর ক্যাপ্টেন হুদা একদিন আমার মেসে আসেন এবং বলেন যে, আমরা সংস্থার পার্টির সভায় যোগদান করিব। ক্যাপ্টেন হুদা আমাকে জানান যে, এই বৈঠক মিঃ রমিজের মোহাম্মদপুরস্থ ফ্ল্যাটে অনুষ্ঠিত হইবে। তিনি আরও জানান যে, আমি তাহার (ক্যাপ্টেন হুদার) বাসায় যাইব ও সেখান হইতে তিনি আমাকে মিঃ রমিজের ফ্ল্যাটে লইয়া যাইবেন। এই কথা অনুসারে আমি সন্ধ্যা অনুমান ৮টার সময় ক্যাপ্টেন হুদার বাসায় যাই।

আমরা তখন ক্যাপ্টেন হুদার 'হ্যারাল্ড ট্রায়াম্ফ' গাড়ীতে বৈঠকের স্থানে যাত্রা করি।

এই পর্যায়ে ৬নং রাজসাক্ষী বলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান আমাদের গাইড ছিল।

(সাক্ষী ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানকে সঠিকভাবে ডকে সনাক্ত করেন)।

সাক্ষী ক্যাপ্টেন আলীম বলেন, আমরা ফ্ল্যাটে যাওয়ার পর লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন তথায় আগমন করেন এবং আমরা তাহাকে অভ্যর্থনা জানাই। রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আলীম বলেন, যতদূর আমার মনে হয় এই সভায় ক্যাপ্টেন হুদা, লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন এই বলিয়া বৈঠকে আলোচনা শুরু করেন যে, "পূর্ব পাকিস্তানের যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরাজমান রহিয়াছে উহা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক।" তিনি বৈষম্যের বিস্তারিত বর্ণনা দান করেন।

তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, রাজনীতিকদের বক্তৃতা কোন কাজে আসিবে না। একমাত্র পথ সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করা।

লেঃ মোয়াজ্জেম প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী ও পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের সামরিক কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত মিলিট্যান্ট গ্রুপ সংগঠনের প্রস্তাব করেন। সর্বশেষে লেঃ মোয়াজ্জেম সামরিক বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে এই আদর্শ প্রচারের জন্য অনুরোধ জানান। ৬নং রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আলীম বলেন যে, কমিশন লাভের পর হইতেই তিনি ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়াকে চিনেন। এ সময় ক্যাপ্টেন শওকত 'পিণ্ডিতে কর্মরত ছিলেন ও পরে ঢাকায় বদলী হয়।' (সাক্ষী অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়াকে 'ডকে' সঠিকভাবে সমাক্ত করেন)।

৬নং রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভূঁইয়া তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন, শনিবারের এক সন্ধ্যায়, বোধহয় ১৯৬৬ সালের আগষ্টের দ্বিতীয় পক্ষকালে অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন শওকত আলী কুমিল্লা হইতে ঢাকায় আসিয়া অর্ডন্যান্স অফিসারদের মেসে আমার সংগে অবস্থান করেন। ঘটনাচক্রে ঐদিন সন্ধ্যায় আমার কক্ষে ক্যাপ্টেন হুদা, লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের আগমন ঘটে। শুনিলাম যে, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম পূর্ব হইতেই ক্যাপ্টেন শওকত আলীকে চেনেন। চা পান করিতে করিতে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম বলেন যে, ক্যাপ্টেন শওকতও যখন এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তখন পরদিন সকালে মোহাম্মদপুরে জনাব রমিজের ফ্ল্যাটে (৫নং রাজসাক্ষী) একটি দলীয় বৈঠক হওয়া উচিত। তদনুযায়ী পরদিন সকাল ১০টায় আমরা মোহাম্মদপুরে জনাব রমিজের ফ্ল্যাটে গমন করি। আমার যতদূর মনে আছে, তাহাতে এই সভায় ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়া, ক্যাপ্টেন হুদা, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম, ষ্টুয়ার্ড মুজিব এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম পাকিস্তানের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং উহাতে পূর্ব পাকিস্তানীদের দুর্গতির কথা পুনরায় বিবৃত করেন। যত শীঘ্র সম্ভব একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

চট্টগ্রাম নৌঘাঁটি সম্পর্কে কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম অতঃপর লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম একে একে পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেকটি ক্যান্টনমেন্ট এবং যেখানে যতটুকু সমর্থন পাওয়া যাইবে উহার কথা উল্লেখ করেন। প্রথমে তিনি চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের কথা উল্লেখ করেন। সেসময়ে তিনি ক্যাপ্টেন এ, এন, এম, নূরুজ্জামানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান ও চট্টগ্রামস্থ নৌঘাঁটির লোকজন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবেন। ঐসময়ে ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান চট্টগ্রামে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এডজুট্যান্ট হিসাবে কাজ করিতে ছিলেন।

অতঃপর লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ক্যাপ্টেন আলম, ক্যাপ্টেন শওকত ও ক্যাপ্টেন মোতালেবের সাংগঠনিক কাজের প্রশংসা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই আমি ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামানকে চিনিতাম। ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তাঁহার সংগে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই তবে আমার নিকট তাঁহার নামোল্লেখ করা হয়।

অতঃপর তিনি পঞ্চম ও ষষ্ঠ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে আন্দোলনের প্রচারকার্য করার জন্য ক্যাপ্টেন শওকতকে নির্দেশ দেন। ক্যাপ্টেন শওকত আশ্বাস দেন যে, তিনি ৫ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর মালিক এবং ষষ্ঠ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন ওয়াহেদের সংগে যোগাযোগ করিবেন।

যশোরে গিয়া প্রথম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দীনের সংগে যোগাযোগ করার জন্য তিনি পরিশেষে ক্যাপ্টেন হুদা ও আমাকে নির্দেশ দেন। অতঃপর সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

ক্যাপ্টেন হুদাসহ সাক্ষীর যশোর সফর

লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাপ্টেন হুদা ও আমি ৫/৬ দিন পর শনিবারের এক সন্ধ্যায় যশোর গমন করি। আমরা যশোরস্থ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেসে পৌঁছি সেখানে আমরা ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দীনের সংগে সাক্ষাৎ করিয়া সম্ভাব্য সর্বপ্রকার যুক্তি দেখাইয়া তাহাকে আন্দোলনে টানার জন্য চেষ্টা করি। মেজর সাদেকুর রহমান চৌধুরীও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তবে উভয়েই আমাদের আন্দোলনে যোগদানে ইচ্ছুক ছিলেন না। তারপর আমরা যশোর হইতে প্রত্যাবর্তন করি।

যশোর হইতে ফিরিয়া আসার পর আমরা আন্দোলনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করি। আমরা কোথায় মিলিত হইয়াছিলাম সেকথা আমার সঠিক মনে নাই। তবে আমরা প্রায়ই তাহার বাসা ও আমাদের অফিসে মিলিত হইতাম। আমরা আন্দোলনের ঝুঁকিও খতাইয়া দেখিয়াছিলাম। আমি অফিসারদের সমর্থনের অভাবে আন্দোলনের অগ্রগতি হইতেছিল না। এছাড়া, আন্দোলনটি বিশৃংখলভাবে অগ্রসর হইতেছিল। কাজেই আমরা স্থির করি যে, আমরা চারজন আর্মী অফিসার যথা ক্যাপ্টেন আলম, ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন শওকত আলী ও আমি আন্দোলনের সংগে জড়িত থাকিব কিনা, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোন স্থানে আমাদের মিলিত হওয়া উচিত। তদনুযায়ী আমরা চট্টগ্রামের পথে অবস্থিত দাউদকান্দির বাংলোতে মিলিত হই। সেখানে আমাদের চারজনই উপস্থিত ছিলেন। আমরা অপর দুইজন অফিসারকে জানাই যে, যশোর হইতে আমাদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন পাওয়া যাইতেছে না। ক্যাপ্টেন শওকতও এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, কুমিল্লাতেও আন্দোলনের প্রতি কোন সমর্থন পাওয়া যাইতেছে না। কাজেই আমরা স্থির

করি যে, ঢাকায় যখন পরবর্তী বৈঠক অনষ্ঠিত হইবে সেসময় আমরা লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমকে নেতৃত্বের প্রশ্ন, আর্থিক সমর্থন এবং এ ব্যাপারে জড়িত ব্যক্তিদের নিরাপত্তার প্রশ্ন ব্যাখ্যা করিতে বলিব। ১৯৬৬ সালের আগষ্টের শেষ সপ্তাহে দাউদকান্দি বাংলোতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। (এই পর্যায়ে সাক্ষী নির্ভুলভাবে কাঠগড়ায় উপবিষ্ট মেজর আলমকে সনাক্ত করেন।)

কয়েকদিন পর ক্যাপ্টেন হুদা আমাকে মোহাম্মদপুরে জনাব রমিজের ফ্ল্যাটে আয়োজিত বৈঠক সম্পর্কে অবহিত করেন। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জনাব শামসুর রহমান সিএসপি, পি, আই এ'র জনাব এম,এম, রমিজ, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম, ক্যাপ্টেন আলম, ক্যাপ্টেন হুদা, ষ্টুয়ার্ড মুজিব, জনৈক সুলতানউদ্দীন আহমদ এবং আমি এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। এই পর্যায়ে সাক্ষী সঠিকভাবে কাঠগড়ায় উপবিষ্ট জনাব কে, এম, এস, রহমানকে সনাক্ত করেন। তাহাকে সুলতানউদ্দীনকে সনাক্ত করিতে বলা হইলে সাক্ষী জানান যে, সংগঠনের ব্যাপারে শুধু একবার তাহার সংগে তিনি সাক্ষাৎ করেন বলিয়া তিনি সুলতানকে সনাক্ত করিতে সক্ষম নন।

সাক্ষী আরও বলেন, উক্ত সভায় কে আমার সংগে সুলতানের পরিচয় করাইয়া দেন, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। তবে আমার ধারণা, জনাব রমিজই পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন।

লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম এই বলিয়া আলোচনার সূত্রপাত করেন যে, ভারত সরকার আন্দোলনের জন্য আমাদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিতে রাজী হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, আমাদের রাজনীতিকরা যে সকল বক্তৃতা করিয়া বেড়ান, তাহা অন্তঃসারশূন্য।

তিনি আরও বলেন যে, ভারত হইতে আমরা যে সকল অস্ত্রশস্ত্র পাইব, উহা ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কে ট্রেনিং দানের দায়িত্ব কুমিল্লাস্থ ইপিআর এর ক্যাপ্টেন মোতালেবকে দেওয়া হইবে। যেসব বিষয়ে আমরা মানসিক অশান্তিতে ছিলাম উহার প্রতি আমরা লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম এর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ফলে তিনি উক্ত বৈঠকে সেক্টর কম্যাণ্ডার নিয়োগ করিতে পারেন না। তিনি আর্থিক সাহায্য লাভের সূত্র প্রকাশ করিতেও অসম্মত হন। নেতৃত্বের প্রশ্নে আমি কর্ণেল ওসমানীর নাম প্রস্তাব করি। জনাব শামসুর রহমান কর্ণেল ওসমানীর সঙ্গে এব্যাপারে যোগাযোগ করার আশ্বাস দেন।

বৈদেশিক সম্পর্কের প্রশ্নে আলোচনা প্রসঙ্গে জনাব কে, এম, এস, রহমান বলেন যে, ভারত ও তাহার সমর্থক জোট পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতিদান করিতে প্রস্তুত। তিনি আরও বলেন যে, নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রে হামলা চালানো ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী হইবে। লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম বৈঠকে আরও বলেন যে, স্বাধীনতা অর্জনের পর পাকিস্তানে

সামরিক আইন জারি করা হইবে। অতঃপর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, সভায় উপস্থিত কেহ, সম্ভবতঃ লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে যে সকল পশ্চিম পাকিস্তানীকে বন্দী করা হইবে তাহাদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তান প্রবাসী পূর্ব পাকিস্তানীদের বিনিময় করা হইবে। জনাব রমিজ এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, যোগাযোগ ও পরিবহনের জন্য পি আই এ এবং পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বিধানসমূহ এবং রেডিও সেট ব্যবহার করা হইবে। বিপ্লবী সংস্থায় থাকাকালে এই সভাই ছিল আমার সর্বশেষ সভা।

অর্ডন্যান্স মেসে থাকাকালে ক্যাপ্টেন শওকত আমার মেহমান হিসাবে খাইতেন। ক্যাপ্টেন শওকত যেদিন কুমিল্লা হইতে আসেন সেদিন লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম অর্ডন্যান্স মেসে আমার সংগে খাওয়া-দাওয়া করেন এবং আমার সংগেই অবস্থান করেন। ক্যাপ্টেন আলম যখন কুমিল্লা হইতে আসেন তখন অর্ডন্যান্স মেসে আমার সঙ্গে অবস্থান করেন।

এই পর্যায়ে কৌসুলী সাক্ষীকে একটি রেজিষ্টার দিয়া এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। ইহাতে সাক্ষী জানান যে, ইহা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অর্ডন্যান্স অফিসারদের মেসের রেজিষ্টার। ইহাতে ২৮-৬-৬৬ তারিখের ১৩নং এনট্রি আমার ব্যাপারে লেখা হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, ঐদিন আমার নামে দুইটি অতিরিক্ত নৈশ খাবার লেখা হয়। রেজিষ্টারের যে পৃষ্ঠাটি বর্তমানে পি ডব্লু ৭/৩ বলিয়া চিহ্নিত উহার ক্রমিকনং ১৮-তে একটি এন্ট্রি রহিয়াছে। ৩/৯/৬৬ তারিখের উক্ত এন্ট্রিতে আমার নামে একটি অতিরিক্ত নৈশ খাবার লেখা হয়।

আন্দোলনের তথ্য ফাঁস

১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরের শেষভাগে ক্যাপ্টেন হুদা তাহার অফিসে আমাদের সাক্ষাৎ দান করেন। তিনি আমাকে জানান যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে আমাদের কাজ-কর্মের তথ্য ফাঁস হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কিভাবে ইহা জানিতে পারিয়াছেন। ইহাতে তিনি বলেন যে, আগের দিনের রাত্রে ঢাকাস্থ ইন্টার সার্ভিসেস গোয়েন্দা ডিরেক্টরেটের মেজর রউফ ও ক্যাপ্টেন জমিল তাঁহার বাড়ীতে গিয়া জানান যে, আন্দোলন ও উহাতে ক্যাপ্টেন হুদা এবং এই মামলায় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অফিসারদের জড়িত থাকার খবর ফাঁস হইয়া গিয়াছে।

এই পর্যায়ে আদালত জানান যে, এই মামলায় মেজর রউফ ও ক্যাপ্টেন জমিলকে সাক্ষী হিসাবে জেরা করা হইলেই শুধু এই সাক্ষ্যগ্রহণ করা যাইতে পারে।

আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একটি স্বীকারোক্তি করি। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি এই স্বীকারোক্তি করিয়াছিলাম। ১৯৬৮ সালের ২৩শে মে আমাকে ক্ষমা করা হয় এবং আমি তাহা গ্রহণ করি। জবানবন্দীর সমাপ্তির

পর বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান ৬নং রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভুঁইয়াকে জেরা শুরু করেন।
প্রশ্ন–আপনাকে ঢাকায় গ্রেফতার করা হয়?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আপনাকে কোন্ আইনে গ্রেফতার করা হয়?
উত্তর–আমাকে কোন্ আইনে গ্রেফতার করা হয় তাহা আমি জানি না বা আমাকে বলা হয় নাই।
প্রশ্ন–আপনাকে কাহারা গ্রেফতার করিয়াছিল?
উত্তর–সামরিক বিভাগের লোকেরা আমাকে গ্রেফতার করে।
প্রশ্ন–আপনি গ্রেফতারের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?
উত্তর–আমি গ্রেফতারের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা আমাকে জানান যে, রাওয়ালপিণ্ডি জেনারেল হেড কোয়ার্টারের নির্দেশে আমাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।
প্রশ্ন–কোন্ তারিখে আপনাকে গ্রেফতার করা হয়?
উত্তর–১৯৬৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী।
প্রশ্ন–গ্রেফতারের পরে কখন আপনাকে রাওয়ালপিণ্ডি পাঠান হয়?
উত্তর–গ্রেফতারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে রাওয়ালপিণ্ডি পাঠান হয়।
প্রশ্ন–রাওয়ালপিণ্ডির কোন স্থানে আপনাকে নেওয়া হয়?
উত্তর–সাব-এরিয়া রাওয়ালপিণ্ডি এবং ৮ম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অফিসার্স মেসে আমাকে রাখা হয়।
প্রশ্ন–কোন অফিসার আপনার সাথে দেখা করিয়াছিল কি?
উত্তর–অফিসার্স মেসে মেজর মঞ্জুর আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।
প্রশ্ন–আপনাকে কি কোন কক্ষে আটক রাখা হইয়াছিল?
উত্তর–আমাকে মেসের একটি কক্ষে রাখিয়াছিল।
প্রশ্ন– উক্ত কক্ষের জানালার কাচ কি রং দ্বারা আবৃত ছিল?
উত্তর–জানালায় কাচ ছিল। কিন্তু উহা রং দিয়া ঢাকা ছিল না।
প্রশ্ন–আপনাকে কখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়?
উত্তর–পরবর্তী দিবস আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে লইয়া যাওয়া হয়।
প্রশ্ন–কতজন অফিসার আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন?
উত্তর–বেশ কয়েকজন–আমি তাহাদের সংখ্যা মনে করিতে পারিতেছি না। তবে ৫/৬ জন হইবে।
প্রশ্ন–তাঁহারা কি একত্রে আসিতেন?
উত্তর–কোন কোন সময় একত্রে প্রশ্ন করিতেন, কোন কোন সময় একজন একজন করিয়া প্রশ্ন করিতেন।

প্রশ্ন–কতদিন এই জিজ্ঞাসাবাদ চলিয়াছিল?
উত্তর–এক সপ্তাহ হইবে।
প্রশ্ন–কখন আপনাকে ঢাকায় আনয়ন করা হয়?
উত্তর–১৯৬৮ সালের ২৩শে জানুয়ারী আমাকে ঢাকা আনয়ন করা হয়।
প্রশ্ন–আপনি কোন তারিখে রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছিয়াছিলেন?
উত্তর–৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৬৮ সাল।
প্রশ্ন–আপনাকে যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইত তাহা কি রেকর্ড করা হইত?
উত্তর–কখনও কখনও রেকর্ড করা হইত।
প্রশ্ন–তাঁহারা যাহা লিখিত উহা আপনাকে বলিত কি?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–রাওয়ালপিণ্ডি থাকাকালে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি সম্পর্কে কোন কিছু আলোচনা হইয়াছিল কি?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে– তাহা আপনাকে বলা হইয়াছিল কি?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–ঐসময় এই মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন অফিসারকে রাওয়ালপিণ্ডি নেওয়া হইয়াছিল কি?
উত্তর–জানি না।
প্রশ্ন–ক্যাপ্টেন আলম ও ক্যাপ্টেন হুদার গ্রেফতারের খবর কখন জানিতে পারেন?
উত্তর–সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর।
প্রশ্ন–মামলার সাক্ষী হওয়ার জন্য রাওয়ালপিণ্ডিতেই কি আপনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন?
উত্তর–না। ১৯৬৮ সালের মে মাসের প্রথমদিকে এই মামলার সাক্ষী হওয়ার জন্য আমি সিদ্ধান্ত করি।
প্রশ্ন–ঢাকায় আসার পর আপনাকে কোথায় রাখা হয়?
উত্তর–ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ১৪ ডিভিশন অফিসার্স মেসে।
প্রশ্ন–আপনাকে কি আলাদা রুমে রাখা হয়?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইয়াছিল?
উত্তর-ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে কেবলমাত্র পুলিশই আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।
প্রশ্ন–পুলিশ অফিসার কতবার আসিয়াছিল?
উত্তর–দুইবার।

প্রশ্ন–ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কোথায় স্বীকারোক্তি করেন?
উত্তর–ঢাকায়।
প্রশ্ন–ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তির পূর্বে কোন পুলিশ অফিসার দেখা করিয়াছিল কি?
উত্তর–স্বীকারোক্তির পূর্বে কোন পুলিশ অফিসার আমার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই।
প্রশ্ন–স্বীকারোক্তি সম্পর্কে আপনি কাহাকে প্রথম জানাইয়াছিলেন?
উত্তর–পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেঃ শরীফের নিকট আমি প্রথম ইহা প্রকাশ করি।
প্রশ্ন–লেঃ শরীফ আপনাকে কি বলিয়াছিল?
উত্তর–"স্বীকারোক্তির জন্য আপনাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নেওয়া হইবে।"
প্রশ্ন–লেঃ শরীফ কি আপনার সহিত প্রায়শই দেখা করিত?
উত্তর–লেঃ শরীফ মাঝে মাঝে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিত।
প্রশ্ন–ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আপনি লিখিত স্বীকারোক্তি দিয়াছিলেন?
উত্তর–আমি মৌখিকভাবে আমার বক্তব্য পেশ করি এবং উহা রেকর্ড করা হয় এবং পরে রেকর্ড ঠিক হইয়াছে দেখিয়া আমি উহাতে স্বাক্ষর করি।
প্রশ্ন–আপনি কোন তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন?
উত্তর–১৯৬৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী।
প্রশ্ন–ইহা কি সত্য যে, মীর্জা রমিজ ও আপনাকে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং আপনারা একই লিখিত বিবৃতি অনুযায়ী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন?
উত্তর–উহা সত্য নহে।

৫নং রাজসাক্ষীর জেরার বিবরণ

পূর্বাহ্নে বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব জুলমত আলী ৫নং রাজসাক্ষী মীর্জা মোহাম্মদ রমিজকে প্রথম জেরা করেন।
প্রশ্ন: আপনি কি এখনও অসুস্থ?
উত্তর: হ্যাঁ।
প্রশ্ন–পাকিস্তান বিমান বাহিনীর চাকুরী হইতে অব্যাহতি লাভের সময় আপনার বেতন কত ছিল?
উত্তর–আমার মনে নাই।
প্রশ্ন–আপনি কোন পেন্সন পান?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–কত টাকা?
উত্তর–মাসে ১৬৬ টাকা।

প্রশ্ন–ফ্লাইট লেফটেন্যান্টের বেতনের স্কেল কত?
উত্তর–আমার মনে নাই।
প্রশ্ন–পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে তিন প্রকারের কমিশন পদ আছে। ১০ বৎসরের চাকুরীর পর সাধারণতঃ বিমান বাহিনীর চাকুরীর মেয়াদ তাঁহারা বৃদ্ধি করিতে চাহেন কিনা, সেই মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়–ইহা কি সত্য?
উত্তর–পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে প্রথমে ৫ বৎসরের চাকুরী করিতে হয়, পরে ৫ বৎসর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।
প্রশ্ন-আপনি কি শর্ট সার্ভিস কমিশনে ছিলেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–১০ বৎসর চাকুরী পূর্ণ হইবার পর আপনার চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব পাইয়াছিলেন কি?
উত্তর–না।
অপর এক প্রশ্নের জবাবে রাজসাক্ষী রমিজ বলেন যে, তিনি উপযুক্ত ছিলেন না বলিয়া তাঁহার চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় নাই–একথা সঠিক নহে।
প্রশ্ন–পার্টি তহবিলের কথা যখন প্রকাশ করা হয়, তখন লেঃ মোয়াজ্জেম কোথায় চাকুরী করিতেন?
উত্তর–বরিশালে।
প্রশ্ন–কোন্ তারিখে উহা প্রকাশ করা হয়?
উত্তর–১৯৬৭ সালের মার্চ মাসের কোন একসময়ে সঠিক তারিখ মনে নাই।
বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর অপর এক প্রশ্নের জবাবে মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ বলেন যে, ইতিপূর্বে তিনি যে সমস্ত তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সহিত সামিল হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি তারিখ বলিতেছেন না–একথা সত্য নহে।
প্রশ্ন–গ্রেফতারের পূর্বে আপনি কি গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা করিয়াছিলেন?
উত্তর–গ্রেফতারের পূর্বে আমি কোন আশঙ্কা করি নাই। এই পর্যায়ে সাক্ষীর হাতে একটি 'লিভকার্ড' প্রদান করা হয়। কার্ড দেখিয়া তিনি বলেন যে, উহাতে ২৯/৭/৬৭ সাল পর্যন্ত ছুটির হিসাব দেখান হইয়াছে।
প্রশ্ন–প্রতি বছর কি অডিট করা হয়?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–অডিটরদের মন্তব্য কি আপনার নিকট পাঠান হইত? ইহা কি সত্য যে, ১৯৬৫-'৬৬ সালের মন্তব্যও আপনার নিকট পাঠান হয়?
উত্তর–সম্ভবতঃ।
প্রশ্ন–ইহা কি সত্য যে, রাজারবাগ পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বাল্ব জ্বালাইয়া আপনার উপর শারীরিক নির্যাতন করা হয় এবং অবিরাম আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়?
উত্তর–ইহা সত্য নহে।

প্রশ্ন–ক্যান্টনমেন্টে?
উত্তর–ক্যান্টনমেন্টেও আমার উপর কোন নির্যাতন করা হয় নাই।
প্রশ্ন–আপনি যখন ক্যান্টনমেন্টে আটক ছিলেন, তখন ১৩/২/৬৮ তারিখে কি ১৯৬৭ সালের আটক রিপোর্ট তৈরী করা হয়?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–ক্যান্টনমেন্টে আটক থাকাকালীন কর্ণেল শের আলী বাজ আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনি বলিয়াছেন যে, ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার পরে না আগে পার্টি তহবিলের উল্লেখ করা হয়?
উত্তর–লেঃ মোয়াজ্জেম উক্ত সভায় পার্টি তহবিল প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করে।
প্রশ্ন–১৯৬০ সালে আপনি পেশোয়ারে নিযুক্ত ছিলেন, তখন আপনি ঢাকায় আসেন?
উত্তর–১৯৫৯ সালের শেষদিকে বা ১৯৬০ সালের প্রথমদিকে আমি পেশোয়ার হইতে ঢাকায় নিযুক্ত হই।
প্রশ্ন–আপনি যখন পেশোয়ার ছিলেন, তখন কি তথায় বিমান বাহিনীর কোন নাট্য ক্লাব ছিল?
আপনি কি উহার দায়িত্বে ছিলেন?
উত্তর–কিছুদিনের জন্য আমি উহার দায়িত্বে ছিলাম।
প্রশ্ন–আপনি সেলিম নামে কাহাকেও চেনেন, যে নর্তক হিসাবে ক্লাবে আসিত?
উত্তর–আমার মনে নাই।
প্রশ্ন–সেলিম নামে আপনার কোন ব্যক্তিগত চাকর ছিল?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–'মীর্জা' নামে কোন 'এয়ারম্যান'কে আপনি চিনিতেন?
উত্তর–মীর্জা নামে কোন এয়ারম্যান আমার অধীনে ছিল কিনা, আমার মনে নাই।
এই পর্যায়ে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী ব্যক্তিগত নিন্দা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করিলে মাননীয় ট্রাইব্যুনাল বিবাদীপক্ষের কৌসুলীর নিকট জানিতে চাহেন যে, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ভিত্তি এবং ইহা সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্যই বা কি জানা আছে। বিবাদীপক্ষের কৌসুলী বলেন যে, তাঁহার মক্কেল তাঁহাকে তথ্য জানাইয়াছেন। অতঃপর মাননীয় আদালত উক্ত প্রশ্ন অগ্রাহ্য করিয়া দেন।
প্রশ্ন-আপনার পিতার নাম এম, এম, সিরাজ। এই 'এম, এম', কি মীর্জা মোহাম্মদ?
উত্তর–না, মোহাম্মদ মাহমুদ শিরাজ ওরফে শের মাহমুদ। বিবাদীপক্ষের অপর কৌসুলী জনাব আবদুল মালেক ৫নং রাজসাক্ষীকে প্রশ্ন করেন।
প্রশ্ন–আপনি চট্টগ্রাম থাকাকালীন কি চট্টগ্রাম নৌ-ঘাঁটিতে যাইতেন?
উত্তর–আমি দুই-একবার নৌঘাঁটিতে গিয়াছিলাম।

প্রশ্ন–কেন গিয়াছিলেন?
উত্তর–দুই-একটি অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য তাহাদের আমন্ত্রণক্রমে।
প্রশ্ন–সেপ্টেম্বর যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য রিসালদার শামসুল হক তমসা-ই-জুরাত পাইয়াছিল তাহা আপনি জানিতেন?
উত্তরঃ রিসালদার শামসুল হক আমাকে এ সম্পর্কে বলিয়াছিল।
বিবাদীপক্ষের অপর কৌসুলী জনাব নূরুল আলম রাজসাক্ষীকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–আপনাদের প্রস্তাবিত স্বাধীন রাষ্ট্রের কাঠামো কি হইত?
উত্তর–প্রথম ৫ বছর সামরিক শাসন বলবৎ থাকার পর দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে গণভোট গ্রহণ করা হইত ও একটি বিশেষজ্ঞ পরিষদ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কাঠামো নির্ণয় করিবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই পর্যায়ে অপর এক প্রশ্নের জবাবে মীর্জা রমিজ বলেন যে, প্রস্তাবিত স্বাধীন সরকার গঠিত হইলে তাহা "জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার ও জনগণের জন্য সরকার" হইত এবং দেশ হইতে রাজনৈতিক ভেল্কি সম্পূর্ণরূপে দূর করা হইত।
প্রশ্ন–লেঃ মোয়াজ্জেম আপনাকে যেসব দলিলপত্র দেখাইয়াছিল, সেই দলিলপত্রে প্রস্তাবিত মদ চালু থাকা সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ ছিল কি?
উত্তর–দলিলপত্রের মধ্যে উহার কোন উল্লেখ ছিল না। তবে লেঃ মোয়াজ্জেম ও আমার মধ্যে এই প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা হয়। আমার অভিমত ছিল যে, মদ চালু রাখা উচিত।
প্রশ্ন–'আগরতলা প্রতিনিধি' দল ফেনীর 'ডিনোফা' হোটেলে ছিল। আপনি কি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উক্ত হোটেলের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন?
উত্তর–আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হোটেলের নাম উল্লেখ করি নাই।
প্রশ্ন–ঢাকায় ফ্ল্যাট থাকা সত্বেও ১৯৬৭ সনের মে/জুন মাসে আপনি হোটেল ইন্টারকন্টিন্যান্টালে থাকিতেন কেন?
উত্তর–আরও আরামের জন্য।
প্রশ্ন–রাজারবাগে বা ক্যান্টনমেন্টে আপনার কি কোন ফটো তোলা হয়?
উত্তর–সেন্ট্রাল জেলে আমার ফটো তোলা হয়।

দৈনিক পাকিস্তান
১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
ক্যাপ্টেন আলিমের সাক্ষ্য সমাপ্ত ও জেরা শুরু
(স্টাফ রিপোর্টার)
গতকাল মঙ্গলবার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৬ নম্বর একরারী সাক্ষী ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভূইয়ার জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়।

বাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব টি এইচ খান সাক্ষ্য গ্রহণ পরিচালনা করেন। ক্যাপ্টেন আলীমের জবানবন্দী গ্রহণ শেষ হলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান তাঁকে জেরা করেন। সাক্ষী বলেন যে, তাঁর নাম ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল আলীম ভূইয়া। তাঁর পৈত্রিক নিবাস কুমিল্লা জেলার বৃন্দারামপুর থানার পরমতলা গ্রামে। তাঁর বর্তমান বয়স ৩০ বছর।

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করে ক্যাপ্টেন আলীম বলেনঃ ১৯৬০ সালে আমি পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে ভর্তি হই। ট্রেনিং শেষে আমাকে সামরিক বাহিনীর কমিশন পদে নিয়োগ করা হয় এবং চাকলালাস্থ সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট স্টোর ডিপোতে মোতায়েন করা হয়।

এই পর্যায়ে বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খান সাক্ষীকে প্রশ্ন করেনঃ আপনি কি ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদাকে চেনেন?

ক্যাপ্টেন আলীম বলেনঃ আমার কলেজ জীবন থেকে ক্যাপ্টেন নজমুল হুদাকে আমি চিনি। ১৯৬৫ সালে গোলরাতে সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট স্টোর ডিপোতে আমাকে বদলী করা হয়। সেসময়ে শারীরিক পরীক্ষার জন্যে ক্যাপ্টেন হুদা রাওয়ালপিন্ডিস্থ কম্বাইন্ড মিলিটারী হসপিটালে ভর্তি হন । এই পর্যায়ে সাক্ষী ক্যাপ্টেন হুদাকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন আমি তখন ক্যাপ্টেন হুদার সাথে প্রায় দেখা সাক্ষাৎ করতাম। এসব সাক্ষাতের সময় আমরা পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা, দেশের উভয় অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা করতাম। বৈষম্যের ব্যাপারটা ছিল উদ্বেগজনক এবং আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে কিছু করা না হলে এর ভবিষ্যতের কোন আশা নেই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্যে ইচ্ছাকৃতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ শোষণ করছেন। আমরা মনস্থ করেছিলাম যে, সুযোগ পেলেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের দাসত্ব থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করব।

জনাব টি এইচ খানঃ তারপর কি হল মহামান্য আদালতকে বলুন।

অতঃপর ক্যাপ্টেন আলীম বলেনঃ ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমাকে ঢাকায় চর্তুদশ ডিভিশনের অর্ডানান্স কোম্পানীতে বদলী করা হয়। ১৯৬৬ সালের ১লা জুন আমি এই ইউনিটে যোগদান করি।

জনাব টি, এইচ, খানঃ ক্যাপ্টেন হুদা কখন চর্তুদশ ডিভিশনে যোগদান করেন?

ক্যাপ্টেন আলীমঃ ক্যাপ্টেন হুদা সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে ঢাকা চর্তুদশ ডিভিশনের সাপ্লাই ও ট্রান্সপোর্ট ব্যাটেলিয়ানে যোগদান করেন। সেসময়েও আমরা পূর্বের একই মত পোষণ করতাম এবং অফিসে, মেসে

প্রায় দেখা-সাক্ষাৎ করতাম। এই সময়ে ক্যাপ্টেন হুদা গ্রীন রোডের একটি বাড়ীতে বসবাস করতেন।

জনাব টি এইচ খানঃ আপনি কি মীর্জা মোহাম্মদ রমীজকে চেনেন?

ক্যাপ্টেন আলীমঃ জী হ্যাঁ, আমি মীর্জা মোহাম্মদ রমীজকে চিনি।

সাক্ষী তখন আদালতে উপবিষ্ট মামলার পাঁচ নম্বর একরারী সাক্ষী রমীজকে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।

জনাব টি, এইচ, খানঃ আপনি কিভাবে মীর্জা রমীজকে চিনেন মহামান্য আদালতে তার বর্ণনা করুন।

ক্যাপ্টেন আলীম বলেনঃ একদিন ক্যাপ্টেন হুদা আমাকে তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার জন্যে নিমন্ত্রণ করেন। সময়টা ছিল ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসের শেষ অথবা আগস্ট মাসের প্রথমদিক। আমি নির্দিষ্ট দিনে ক্যাপ্টেন হুদার বাড়ীতে যাই এবং সেখানে একজন মেহমানকে বসে থাকতে দেখি। সেই অতিথিকে পিআইএ'র মীর্জা রমীজ বলে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

এরপর মীর্জা রমীজ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেন। সেই সময়ে আরও এক ব্যক্তি ক্যাপ্টেন হুদার বাড়ীতে আসেন এবং তাঁকে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর লেঃ মোয়াজ্জম বলে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

সাক্ষী এই পর্যায়ে অভিযুক্তদের মধ্য হতে লেঃ মোয়াজ্জমকে সনাক্ত করেন।

ক্যাপ্টেন আলীম তাঁর সাক্ষ্যে আরও বলেনঃ বৈষম্যের উপর বলতে গিয়ে মীর্জা রমীজ বলেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা ছাড়া আমরা জীবনের কোন ক্ষেত্রেই উন্নতি করতে পারব না। আমিও এই মত পোষণ করতাম যে, পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করতে না পারলে আমরা অনুন্নত অবস্থায় থেকে যাব। এই পর্যায়ে মীর্জা রমীজ প্রকাশ করেন যে, তাঁদের একটি সংগঠন আছে এবং এই সংগঠন সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করছে। মীর্জা রমীজ বিদায় নেওয়ার আগে আমাদেরকে তাঁদের সংগঠনের এক বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। এরপর মীর্জা রমীজ ও লেঃ মোয়াজ্জম চলে যান এবং আমি ও ক্যাপ্টেন হুদা তাঁর বাড়ীতে থাকি।

জনাব টি, এইচ, খানঃ সেখানে আপনারা কিছু আলোচনা করেছিলেন কি?

ক্যাপ্টেন আলীমঃ আমি তাঁদের সাথে একমত পোষণ করলেও আন্দোলনে সরাসরি যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলাম না। তখন ক্যাপ্টেন হুদা রাওয়ালপিন্ডিতে বসে আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেকথা স্মরণ করিয়ে দিলে আমি শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার আন্দোলনে যোগদান করতে সম্মত হই।

জনাব টি, এইচ, খানঃ তারপর কি হল বলুন?

ক্যাপ্টেন আলীম বলেনঃ এর কিছুদিন পর ক্যাপ্টেন হুদা একদিন আমার মেসে আসেন এবং বলেন যে, তাদের সংগঠনের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন হুদা বলেছিলেন যে, উক্ত বৈঠক মীর্জা রমীজের মোহাম্মদপুরস্থ ফ্ল্যাটে অনুষ্ঠিত হবে। আমি ক্যাপ্টেন হুদার বাড়ীতে গেলে তিনি আমাকে সেখান থেকে বৈঠকের জায়গায় নিয়ে যাবেন বলে জানান। ক্যাপ্টেন হুদার কথা মত রাত ৮টায় আমি তাঁর বাড়ীতে যাই এবং তাঁর হেরাল্ড ট্রামফ্ গাড়ীতে করে বৈঠকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। মীর্জা রমীজের বাড়ীর অবস্থান আমার স্মরণ নেই। তবে পথে একজন পদ প্রদর্শক আমাদের সাথে মিলিত হন। তিনি হচ্ছেন স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান। তিনি আমাদের গাড়ীতে উঠে পড়লে, আমার মনে হল আমি তাঁকে আগে কোথাও দেখেছি। কিছুক্ষণ পরে আমি স্মরণ করতে পেরেছি যে, ক্যাপ্টেন হুদার বাড়ীতে মীর্জা রমীজের সাথে সাক্ষাৎকালে আমি স্টুয়ার্ড মুজিবকে তাঁর গ্যারেজের সামনে দাঁড়ানো দেখেছি।

একরারী সাক্ষী ক্যাপ্টেন আলীম এই পর্যায়ে অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে সনাক্ত করেন। তারপর সাক্ষী বলেনঃ মীর্জা রমীজের বাড়ীতে পৌঁছলে লেঃ মোয়াজ্জম বেরিয়ে আসেন এবং আমাদের সাদর-সম্ভাষণ জানান।। আমার যতদূর স্মরণ আছে সে বৈঠকে ক্যাপ্টেন হুদা, লেঃ মোয়াজ্জম, স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান এবং আমি নিজে যোগদান করি।

জনাব টি, এইচ, খানঃ বৈঠকের আলোচ্য বিষয় মহামান্য আদালতের সামনে বলুন।

ক্যাপ্টেন আলীম বলেনঃ লেঃ মোয়াজ্জম সে বৈঠক উদ্বোধন করে বলেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানে দুঃখজনক বৈষম্য বিরাজ করছে। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের একটি নিখুত চিত্র তুলে ধরেন। লেঃ মোয়াজ্জম এই মত পোষণ করতেন যে, রাজনীতিবিদদের বক্তৃতায় কোন কাজ হবে না। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র করাই একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা। তিনি আরও বলেছিলেন যে, সামরিক বাহিনীর বর্তমান ও সাবেক কর্মচারীদের সংগঠিত করে পূর্ব পাকিস্তানের ক্যান্টনমেন্টের ইউনিটগুলোকে অকেজো করে দিতে হবে। এছাড়া লেঃ মোয়াজ্জম অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে আন্দোলনের আদর্শ ছড়িয়ে দিতে আমাদেরকে অনুরোধ জানান। তিনি উৎসাহী ব্যক্তিদের আন্দোলনে তালিকাভুক্ত করার জন্যেও অনুরোধ করেন। সে বৈঠকে আর কিছু হয়নি।

টি এইচ খান

আপনি কি ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়াকে চেনেন?

ক্যাপ্টেন আলীম বলেনঃ সামরিক বাহিনীতে কমিশন পদে যোগদানের পর থেকে আমি ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়াকে চিনি। সেই সময়ে তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে ছিলেন এবং পরে তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানে বদলী করা হয়।

সাক্ষ্যদানের এই পর্যায়ে ক্যাপ্টেন আলীম অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়াকে সনাক্ত করেন।

এরপর তিনি বলেনঃ ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের শেষের দিকে এক শনিবারে ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়া কুমিল্লা থেকে ঢাকা আসেন এবং আমার সাথে অর্ডন্যান্স অফিসার্স মেসে থাকেন। এই সময়ে লেঃ মোয়াজ্জম, ক্যাপ্টেন হুদা ও স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমানও ঘটনাচক্রে আমার কামরায় আসেন। তখন আমি জানতে পারলাম ক্যাপ্টেন শওকতও লেঃ মোয়াজ্জমের সাথে পরিচিত আছেন। চা খেতে খেতে লেঃ মোয়াজ্জম বলেছিলেন যে, ক্যাপ্টেন শওকত আন্দোলনের সদস্য এবং তিনি যখন ঢাকা এসেছেন তখন মীর্জা রমীজের বাসায় আমাদের একটা বৈঠক হওয়া উচিত। পরদিন সকালে মীর্জা রমীজের বাসায় এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সকাল দশটায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ক্যাপ্টেন শওকত, ক্যাপ্টেন হুদা, লেঃ মোয়াজ্জম, স্টুয়ার্ড মুজিব এবং আমি এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম।

টি এইচ খান

এই বৈঠকে কি আলোচনা করা হয়?

ক্যাপ্টেন আলীমঃ বৈঠকে লেঃ মোয়াজ্জেম বৈষম্যের পুনরুক্তি করেন এবং এজন্য পূর্ব পাকিস্তানীদের দুর্দশার কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি যতশীঘ্র সম্ভব একটি বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। লেঃ মোয়াজ্জেম পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের বর্ণনা দেন এবং এসব জায়গায় আন্দোলনের সমর্থনের কথাও বলেন। লেঃ মোয়াজ্জেম চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট থেকে বলা শুরু করেন এবং এই প্রসঙ্গে ক্যাপেটন নুরুজ্জামানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান চট্টগ্রাম নৌবাহিনীর দফতরের কর্মচারীদের নিয়ে আন্দোলন সংগঠন করবেন। ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের এডজুটেন্ট বলে লেঃ মোয়াজ্জেম জানান।

এই পর্যায়ে ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামানকে সনাক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হলে একরারী সাক্ষী বলেনঃ ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামানের সাথে আমি একত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি। তবে আন্দোলনে কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। বৈঠকে আমি তাঁর নাম শুনেছি।

ক্যাপ্টেন আলীম অতঃপর বলেনঃ লেঃ মোয়াজ্জম এবার কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে আন্দোলনে সংগঠনে ক্যাপ্টেন শওকত, ক্যাপ্টেন আলম ও ক্যাপ্টেন মোতালিবের কাজের প্রশংসা করেন। তারপর লেঃ মোয়াজ্জম পঞ্চম ও ষষ্ঠ ইবি রেজিমেন্টে আন্দোলনের আদর্শ প্রচার জোরদার করার জন্য ক্যাপ্টেন শওকতকে অনুরোধ করেন। তখন ক্যাপ্টেন শওকত পঞ্চম ইবি রেজিমেন্টের মেজর মানিক ও ষষ্ঠ ইবি রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন ওয়াহিদকে যোগাযোগ করার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর লেঃ মোয়াজ্জম আমাকে ও ক্যাপ্টেন হুদাকে যশোর গিয়ে ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দীনের সাথে যোগাযোগ করার জন্যে অনুরোধ করেন।

তদনুযায়ী ৫/৬ দিন পর এক শনিবার বিকালে ক্যাপ্টেন হুদা ও আমি যশোর গমন করি। আমরা যশোর ক্যান্টনমেন্ট ইবিআর মেসে যাই এবং ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিনের সাথে সাক্ষাৎ করি। কিন্তু আমরা সব রকমের যুক্তি প্রদর্শন করেও ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দীনকে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্যে রাজী করাতে পারিনি। সে আলোচনায় ক্যাপ্টেন সাদেকুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা উভয়েই আন্দোলনে যোগ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

টিএইচ খান

তারপর কি হল বলুন।

ক্যাপ্টেন আলীম বলেনঃ যশোর থেকে ফিরে আসার পর আমি ও ক্যাপ্টেন হুদা আন্দোলনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করি। আমরা প্রায়ই একত্রিত হয়ে আলোচনা করতাম। পরে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলাম যে, সামরিক অফিসারদের সমর্থনের অভাবে আন্দোলন জোরদার হচ্ছে না। এছাড়া আন্দোলন এলোমেলোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এরপর ক্যাপ্টেন আলম, ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন শওকত ও আমি–এই চারজন এক বৈঠকে মিলিত হয়ে আন্দোলনে থাকা না থাকার সিদ্ধান্ত করার প্রস্তাব করি। আমরা দাউদকান্দি, ডাকবাংলোতে বৈঠক করি এবং আমরা চারজনই সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। আমরা বৈঠকে বলেছি যে, যশোরে আন্দোলনের পক্ষে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ক্যাপ্টেন শওকতও বলেছেন যে, কুমিল্লাতেও আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়নি। আমরা তখন লেঃ মোয়াজ্জমকে নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক সমর্থন ও আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রশ্ন করার সিদ্ধান্ত করি। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের শেষের দিকে দাউদকান্দি ডাক বাংলোতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এবার সাক্ষী ক্যাপ্টেন আলমকে সনাক্ত করেন।

জনাব টি এইচ খান–আপনারা কি ঢাকায় কোন বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন?

ক্যাপ্টেন আলীম–কিছু দিন পর ক্যাপ্টেন হুদা আমাকে জানান যে, মীর্জা রমীজের বাসভবনে দলের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৬৬ সালের

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে খান শামসুর রহমান, মীর্জা রমীজ, লেঃ মোয়াজ্জম হোসেন, ক্যাপ্টেন আলম, ক্যাপ্টেন হুদা, স্টুয়ার্ড মজিবুর রহমান, সুলতানউদ্দিন নামক এক ব্যক্তি ও আমি নিজে বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম।

সাক্ষী অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় খান শামসুর রহমানকে সনাক্ত করেন। কিন্তু সুলতানউদ্দিনকে সনাক্ত করতে বলা হলে তিনি বলেন যে, সুলতানউদ্দিনের সাথে তাঁর মাত্র একবার সাক্ষাৎ হয়েছে। কাজেই তাঁকে তিনি সনাক্ত করতে পারবেন না।

জনাব টি এইচ খান–সে বৈঠকে কি আলোচনা হয়েছিল?

একরারী সাক্ষী ক্যাপ্টেন আলীম– সে বৈঠকে সম্ভবতঃ মীর্জা রমীজ আমাকে সুলতানউদ্দিনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। লেঃ মোয়াজ্জম আলোচনার সূত্রপাত করে বলেন যে, আন্দোলনের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে ভারত সরকার রাজী হয়েছে। তিনি বলেন যে, রাজনীতিবিদদের বক্তৃতা সফল হয়েছে।

লেঃ মোয়াজ্জম বলেছিলেন যে, ভারত থেকে সরবরাহকৃত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা ট্রেনিং দেয়ার জন্যে ক্যাপ্টেন মোতালিবের উপর দায়িত্ব দেওয়া হবে এবং তিনি নিয়মিত ও সাবেক সামরিক কর্মচারীদের এ ব্যাপারে ট্রেনিং দিবেন। সে বৈঠকে লেঃ মোয়াজ্জেম কোন সেক্টর কমেন্ডার নিয়োগ করতে পারেননি। কারণ তাঁরা তিনজন সামরিক অফিসার তাদের মনের সংশয়ের প্রশ্ন উত্থাপন করে আলোচনার গতি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেন। এছাড়া তিনি অর্থ লাভের সূত্র প্রকাশেও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমি কর্নেল ওসমানীকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে প্রস্তাব করি। তখন জনাব শামসুর রহমান কর্নেল ওসমানীর সাথে যোগাযোগ করার দায়িত্ব নেন। বৈদেশিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে খান শামসুর রহমান বলেছিলেন যে, ভারত ও ভারতের সমর্থক রাষ্ট্র জোট সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দেবে। লেঃ মোয়াজ্জম বৈঠকে বলেছিলেন যে, স্বাধীনতা অর্জনের পর পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করা হবে এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে সাধারণ নির্বাচন দেওয়া হবে। বৈঠকে কেউ একজন সম্ভবত লেঃ মোয়াজ্জম বলেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকারী পশ্চিম পাকিস্তানীদের আটক করা হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকারী পূর্ব পাকিস্তানীদের সাথে বিনিময় করা হবে। মীর্জা রমীজ বলেছিলেন যে, ক্ষমতা নেওয়ার সময় পিআইএ'র বিমান পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বিমান ও রেডিও সেটকে পরিবহণ ও প্রচার মাধ্যমের কাজে ব্যবহার করা হবে। বিপ্লবী সংগঠনে থাকার সময় এইটাই আমার শেষ বৈঠকে যোগদান।

ক্যাপ্টেন আলীম আরও বলেন, অর্ডন্যান্স মেসে থাকার সময় ক্যাপ্টেন সাওকত আলী আমার অতিথি হিসাবে মেসে খেয়েছেন। লেঃ মোয়াজ্জমও ক্যাপ্টেন শওকতের সাথে কুমিল্লায় যেদিন এসেছিলেন সেদিন অর্ডন্যান্স মেসে আমার সাথে খেয়েছিল। এবং আমার সাথে ছিলেন। ক্যাপ্টেন আলমও কুমিল্লা থেকে এসে অর্ডন্যান্স মেসে আমার সঙ্গে ছিলেন।

এই পর্যায়ে বাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব টি এইচ খান সাক্ষীর হাতে একটি রেজিস্টার দিয়ে প্রশ্ন করেনঃ এখানে আপনি কি দেখছেন বলুন, ক্যাপ্টেন আলীম তখন বলেন এটা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অর্ডন্যান্স অফিসার্স মেসের রেজিস্ট্রার। এ রেজিস্ট্রারের ১৯৬৬ সালের ২৮শে জুন তারিখে ১৩ ক্রমিক নম্বরে আমার কথা উল্লেখ আছে এবং আমি নৈশভোজ খাইয়েছি বলে উল্লেখ আছে। এছাড়া ১৯৬৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বরও আমি অতিথি আপ্যায়ন করেছি বলে রেজিস্ট্রারের ১৮ ক্রমিক নম্বরে উল্লেখ আছে।

ক্যাপ্টেন আলীম অতঃপর বলেনঃ ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে ক্যাপ্টেন হুদা একদিন আমার অফিসে আসেন এবং বলেন যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট আমাদের কার্যকলাপ ফাঁস হয়ে গেছে। তিনি কি করে তা জানলেন জিজ্ঞাসা করা হলে ক্যাপ্টেন হুদা আমাকে বলেন যে, গতরাত্রে ইন্টার সার্ভিস ইনটেলিজেন্স ডিরেক্টরেটের মেজর রউফ ও ক্যাপ্টেন জামিল তাঁর বাসায় এসেছিলেন এবং আন্দোলনের কথা ফাঁস হয়েছে বলে জানিয়েছেন। এছাড়া তারা ক্যাপ্টেন হুদাকে ও অন্যান্য অফিসারদের আন্দোলনে যোগদানের কথাও বলেছেন বলে তিনি আমাকে জানিয়েছেন।

এই পর্যায়ে বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীর জবানবন্দীর এই অংশগ্রহণ করা সম্পর্কে আপত্তি করলে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস এ রহমান জানান যে, এই মামলায় মেজর রউফ ও ক্যাপ্টেন জামিলকে সাক্ষ্য দানে হাজির করা না হলে সাক্ষীর এই অংশগ্রহণ যোগ্য হবে না।

একরারী সাক্ষী ক্যাপ্টেন আলীম বলেনঃ আমি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করেছি। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাঝামাঝি সময়ে আমি স্বীকারোক্তি করি, ১৯৬৮ সালের ২৩শে মে আমাকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয় এবং আমি তাতে রাজী হই।

আবদুস সালাম খান

ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভুইয়ার জবানবন্দী গ্রহণ শেষ হলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী জনাব আবদুস সালাম খান তাঁকে জেরা করতে শুরু করেন।

প্র-আপনাকে কোথায় গ্রেফতার করা হয়েছিল?

উ-ঢাকাতে।

প্র-আপনাকে কোন আইনে গ্রেফতার করা হয়েছিল?

উ-আমি তা জানি না।

এ সম্পর্কে আমাকে কেউ কিছু বলেননি। একজন সামরিক অফিসার আমাকে গ্রেফতার করেছিলেন।

প্র-আপনি কি গ্রেফতারের কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন?

উ-জী হ্যাঁ, করেছিলাম। আমাকে বলা হয় যে, রাওয়ালপিন্ডিস্থ সামরিক সদর দফতরের নির্দেশে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্র-আপনাকে কখন গ্রেফতার করা হয়?

উ-১৯৬৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী জেরার জবাবে একরারী সাক্ষী ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভুইয়া বলেন যে, গ্রেফতারের কয়েক ঘণ্টা পর তাঁকে রাওয়ালপিন্ডি নিয়ে যাওয়া হয়। পিন্ডির একটি সাব এরিয়াতে তাঁকে রাখা হয়। এরপর তাঁকে অষ্টম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অফিসার্স মেসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সামরিক পাহাড়ায় আমাকে রাখা হয়।

প্র-আপনাকে কি মেসে বন্দী করে রাখা হয়েছিল?

উ-আমাকে কড়া পাহাড়ায় রাখা হয়েছিল এবং একজন সামরিক অফিসার সবসময়ে সেখানে থাকতেন।

প্র-মেসের কোন একটি কামরায় কি আপনি ছিলেন?

উ-জী হ্যাঁ। মেসের একটি কামরায় ছিলাম এবং আমার সাথে একজন সামরিক অফিসারও সেখানে বাস করতেন।

প্র-সে কামরায় কি কাচের জানালা এবং জানালার খিলান কি রং করা ছিল?

উ-কামরায় জানালা কাচের ছিল। কিন্তু জানালার খিলান রং করা ছিল না।

প্র-রাওয়ালপিন্ডি নেওয়ার পর আপনাকে কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল?

উ-রাওয়ালপিন্ডি নেওয়ার পরদিনই আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে নেওয়া হয় এবং বেশ কয়েকজন অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাদের সংখ্যা কতজন মনে নেই। হয়ত ৫/৬ জন হবে। কোন কোন সময় একজন আবার কোন কোন সময়ে তারা সবকজন একত্রে এসে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।

প্র-কদিন ধরে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ?

উ-এক সপ্তাহব্যাপী আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ চলে।

প্র-আপনাকে কখন পুনরায় ঢাকা আনা হয়?

উ-১৯৬৮ সালের ২৩ শে জানুয়ারী।

প্র-কোন তারিখে আপনাকে রাওয়ালপিন্ডি নেওয়া হয়েছিল?

উ-১৯৬৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী।

প্র-আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় সংশ্লিষ্ট অফিসারগণ কি কিছু নোট করেছিলেন?

উ-কোন কোন সময় তারা নোট করেছিলেন। আবার কোন কোন সময় করেননি।

প্র-তাঁরা কি লিখেছিলেন সেটা আপনাকে বলেছিলেন কি?
উ-জী না।
জানতেন কি?
উ-সংবাদপত্রে মামলার বিবরণ ছাপা হলে আমি জানতে পারি।
প্র-সেখানে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি করার জন্য তারা আপনার সাথে কোন আলোচনা করেছিলেন কি?
উ-জী না।
প্র-সেসময়ে কি আপনি সংবাদপত্র পাঠ করতেন?
উ-আমাকে সংবাদপত্র দেওয়া হত।
পরে সাক্ষী তাঁর বক্তব্য সংশোধন করে বলেন যে, রাওয়ালপিন্ডিতে যাওয়ার প্রথম অবস্থায় আমি মানসিক দিক দিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম বলে সংবাদপত্র পাঠ করতাম না। শেষের দিকে আমি সংবাদপত্র পাঠ করতাম।
প্র-সেসময় আপনার বিরুদ্ধে কি কোন অভিযোগ করা হয়েছিল?
উ-জী না।
প্র-আপনাকে কি ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল?
উ-হ্যাঁ।
প্র-আপনাকে রাওয়ালপিন্ডি নেওয়ার সময় অন্য কোন সামরিক অফিসারকে কি সেখানে নেওয়া হয়েছিল?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-ক্যাপ্টেন আলম ও ক্যাপ্টেন হুদার গ্রেফতারের সংবাদ আপনি...
প্র–পিন্ডি থাকাকালে কি আপনি এই মামলার সাক্ষী হতে সিদ্ধান্ত করেছিলেন?
উ-জী না। তখন আমি সাক্ষী হওয়ার সিদ্ধান্ত করিনি।
প্র-কখন সাক্ষী হওয়ার সিদ্ধান্ত করেছিলেন?
উ-১৯৬৮ সালের মে মাসের প্রথম দিকে।
এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৬৮ সালের ২৩ শে জানুয়ারী তাঁকে ঢাকা আনা হয় এবং চর্তুদশ ডিভিশনের অফিসার্স মেসে রাখা হয়। এখানেও তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়।
প্র-চর্তুদশ ডিভিশনের অফিসার্স মেসেও কি আপনার সাথে কেউ থাকতেন?
উ-জী হ্যাঁ। একজন সামরিক অফিসার সর্বক্ষণ আমার সাথে থাকতেন।
প্র-রাওয়ালপিন্ডিতে যেসব অফিসার আপনার সাথে ছিলেন তাঁরা কি পূর্ব পাকিস্তানী?
উ-জী না । তবে ঢাকায় কোন কোন সময় পূর্ব পাকিস্তানী অফিসার পাহাড়া দিতেন।
প্র-ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে যেসব পূর্ব পাকিস্তানী অফিসার আপনাকে গার্ড দিতেন তাদের নাম বলতে পারেন কি?
উ-জী না। আমি তাদের নাম জানি না।

প্র-তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা থেকে আপনি কি বলতে পারেন না তারা পূর্ব পাকিস্তানী কি পশ্চিম পাকিস্তানী?
উ-আমি তাঁদের সাথে আলাপ করেছি। তবে তাঁদের বাড়ীঘর কোথায় আমি তা জিজ্ঞেস করিনি।
প্র-পিন্ডি ও ঢাকায় তাঁদের সাথে আপনি কোন ভাষায় কথা বলেছিলেন?
উ- ইংরেজী ভাষায়।
প্র-ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের যে রুমে আপনি ছিলেন তার জানালার কাচ ও খিলন কি রং করা?
উ-কোন কোন জানালার কাচ ও খিলন রং করা। কিন্তু সবগুলো রং করা নয়।
প্র-ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে কোন সামরিক অফিসার আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কি?
উ-জী না। একজন পুলিশ অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন।
প্র-সেই পুলিশ অফিসার ক'বার এসেছিলেন?
উ-দুবার।
প্র-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করার আগে কি কোন পুলিশ অফিসার আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন?
উ-জী না।
প্র-স্বীকারোক্তির কথা প্রথম আপনি কাকে বলেছিলেন?
উ-স্বীকারোক্তির এক সপ্তাহ আগে আমি স্বীকারোক্তি করব বলে নৌবাহিনীর কর্নেল শরীফকে তা জানাই।
প্র-এর আগে আপনি কি কখনও আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন অথবা মামলা-মোকদ্দমায় জড়ীয়েছিলেন?
উ-জী না।
প্র-স্বীকারোক্তি করার জন্যে আপনাকে কে বলেছিলেন?
উ-কেউ বলেননি।
আমি কর্নেল শরীফের নিকট স্বীকারোক্তির কথা বলতে তিনি আমাকে জানান যে, ম্যাজিস্ট্রেট স্বীকারোক্তির জবানবন্দী রেকর্ড করবেন।
প্র-কর্নেল শরীফ কি প্রায়ই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতেন?
উ-জী হ্যাঁ।
প্র-আপনি কিভাবে জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন?
উ-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আমি মুখে বলেছি এবং তিনি আমার জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেছিলেন।
প্র-আপনি কি তাতে দস্তখত করেছিলেন?
উ-জী হ্যাঁ।

প্র-এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে যা কিছু বলেছিলেন তা রেকর্ড করা হয় এবং তাঁকে পড়ে শোনান হলে তিনি দস্তখত করেন।
প্র-রেকর্ড করা জবানবন্দী শব্দ কি আপনার?
উ-মুখে আমি ঘটনা বিবৃত করেছি এবং ম্যাজিস্ট্রেট তা রেকর্ড করেছেন। তবে এর মধ্যে শব্দের পার্থক্য থাকতে পারে।
প্র-আপনি কবে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দী রেকর্ড করেছিলেন?
উ-১৯৬৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী।
প্র-মীর্জা মোহাম্মদ রমীজ কি ১৯৬৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী জবানবন্দী রেকর্ড করিয়েছিলেন?
উ-আমি তা জানি না।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনাকে ও মীর্জা রমীজকে একই শব্দের কতিপয় বক্তব্য শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল?
উ-একথা সত্য নয়।

এখানেই জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা অসমাপ্ত থাকে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার তিনি সাক্ষীকে তাঁর অসমাপ্ত জেরা করবেন।

দৈনিক পয়গাম
১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
৬নং রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আলীমের জেরা অব্যাহত
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৬নং রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভূঁইয়ার জেরা অব্যাহত থাকে।

উল্লেখযোগ্য যে, গত মঙ্গলবার ৬নং রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আলীমের জেরা শুরু হয়।

কায়েদে আজমের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একদিন বিরতির পর গতকল্য (বৃহস্পতিবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইলে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান ৬নং রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আলীমকে জেরা শুরু করেন।

পূর্বাহ্নে এক পর্য্যায়ে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস, এ, রহমান বলেন যে, বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের বাস্তব ঘটনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশ্ন করা উচিত। তিনি মন্তব্য করেন যে, কোন কোন সময় এমন প্রশ্নও করা হয় যাহা আসলে রেকর্ডের কলেবর বৃদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন কাজে আসে না।

প্রশ্ন–ম্যাজিষ্ট্রেট আপনার স্বীকারোক্তি পাঠ করিয়া শোনাইলে আপনি উহাতে দস্তখত করেন?
উত্তর–স্বীকারোক্তি লেখা শেষ হওয়ার পর উহা পাঠ করিয়া শোনাইলে আমি বিবৃতিতে দস্তখত করি।
প্রশ্ন–বিবৃতি রেকর্ড করার পর আপনি রেকর্ডে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন কি?
উত্তর–কোন শব্দ পরিবর্তন ছিল কিনা, আমি মনে করিতে পারিতেছি না।
প্রশ্ন–স্বীকারোক্তিটি পাঠ করার জন্য আপনাকে দেওয়া হইয়াছিল কি?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–কোর্টে আসার পূর্বে পাঠ করার জন্য বিবৃতির কোন কপি আপনাকে দেওয়া হইয়াছিল কি?
উত্তর–না।
এক পর্যায়ে বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী ৬নং রাজসাক্ষীকে "Invoked our patience" শব্দগুলির তরজমা করিতে বলেন। রাজসাক্ষী বলেন, ইহার অর্থ হইল "আমাদের যে অনুভূতি ছিল তাহা পুনরায় জাগরিত হইয়াছে।"
প্রশ্ন–'Patience' এর অর্থ কি "ধৈর্য"?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আপনি কি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট "Passions" কে "Patience" উচ্চারণ করিয়াছিলেন?
উত্তর–আমি নিশ্চিত নই।
জনাব সালাম খান রাজসাক্ষীকে কয়েকটি ছত্র বাংলা লেখা দেন এবং ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে বলেন।
রাজসাক্ষী বলেন যে, আমি ইহানংরাজিতে অনুবাদ করিতে পারিব না।
প্রশ্ন–ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আটক থাকাকালীন ক্যাপ্টেন শওকতের সহিত আপনার দেখা হইত?
উত্তর–হ্যাঁ, ১৪ ডিভিশন মেসে ক্যাপ্টেন শওকতের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।
প্রশ্ন–ঐসময় ক্যাপ্টেন হুদা কোথায় ছিলেন?
উত্তর–ক্যাপ্টেন হুদা কোথায় ছিলেন তাহা আমি জানিতাম না।
প্রশ্ন–ক্যাপ্টেন শওকতকে কোথায় রাখা হইয়াছিল?
উত্তর–আমার সহিত একই কক্ষে।
প্রশ্ন–ক্যাপ্টেন শওকত ও আপনি যে বিল্ডিং-এ ছিলেন সেই বিল্ডিংয়েই ক্যাপ্টেন হুদাকে রাখা হইয়াছিল তাহা জানিতেন কি?
উত্তর–না।

প্রশ্ন–আপনি কি বিবাহিত?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–কখন বিবাহ করেন?
উত্তর–১৯৬৬ সালের ২৩শে অক্টোবর।
প্রশ্ন–সন্তান প্রসবের জন্য আপনার স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়?
উত্তর–১৯৬৮ সনের মার্চ মাসের প্রথমদিকে সন্তান প্রসবের জন্য আমার স্ত্রীকে সি, এম, এইচ-এ ভর্তি করা হয়।
প্রশ্ন–আটক থাকাকালীন আপনি স্ত্রীকে চিঠি লিখিতেন?
উত্তর–হ্যাঁ এবং জবাবও পাইতাম।
প্রশ্ন–কাহার মারফৎ চিঠি দিতেন?
উত্তর–মেজর নাসেরের মারফৎ।
প্রশ্ন–আপনার 'পিণ্ডি' থাকাকালীন ক্যাপ্টেন মোতালেবও যে 'পিণ্ডিতে' ছিলেন উহা জানিতেন কি?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–ইহা কি সত্য যে, মেজর হাসান আপনাকে বলিয়াছিল যে, যদি আপনি তাহাদের কথামত স্বীকারোক্তি করেন তাহা হইলে আপনাকে সাক্ষী করা হইবে ও ক্ষমা করা হইবে?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–ইহা কি সত্য যে, আপনাকে বৈদ্যুতিক শকের দ্বারা নির্যাতন করা হইত?
উত্তর–ইহা সত্য নহে।
প্রশ্ন–১৯৬৮ সালের ৫ই জানুয়ারী রাত্রে শুধুমাত্র আণ্ডারওয়ার পরিধান করিয়া আপনাকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছিল কি?
উত্তর–ইহা সত্য নহে।
প্রশ্ন–অনুরূপ অবস্থায় ক্যাপ্টেন হুদা ও ক্যাপ্টেন মোতালেবকে আপনি দেখিয়াছিলেন, উহা কি সত্য?
উত্তর–উহাও সঠিক নহে।

বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান জেরার জবাবে ৬নং রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আলীম বলেন, আমি ঢাকাস্থ গ্রীন রোডে ক্যাপ্টেন হুদার নিকট গিয়া দেখি যে, জনাব রমিজও তাঁহার সংগে আছেন এবং লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম সেখানে আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন–ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একথা আমি জানাই কি-না তাহা আমার মনে নাই (এইরূপ রেকর্ড করা হয় নাই)। একথা আমি পুলিশের নিকট জানাইয়াছিলাম কিনা উহাও আমার স্মরণ নাই (এইরূপ রেকর্ড করা হয় নাই)। জনৈক পুলিশ অফিসার যে দুইবার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, একথা সত্য। পুলিশের নিকট প্রদত্ত

আমার দ্বিতীয় জবানবন্দীতে এ ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করিয়াছিলাম কি-না তাহা আমার মনে নাই (এইরূপ রেকর্ড করা হয় নাই)। রাজসাক্ষী জনাব রমিজের জবানবন্দীর সত্যতা সমর্থনের জন্যই এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই আদালতে সর্বপ্রথম লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের নাম উল্লেখ করিয়াছি–একথা সত্য নয়। ইদানীং আমি রোজই খবরের কাগজ পড়ি। কাগজে এই আদালতের কার্যক্রম আমি পড়িয়া থাকি। ক্যাপ্টেন হুদার বাসভবনে জনাব রমিজ আলোচনা প্রসঙ্গে সংখ্যা-সাম্যের প্রশ্ন উত্থাপন করেন– এ কথা আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করি কি-না তাহা আমার মনে নাই (এইরূপ রেকর্ড করা হইয়াছে)। ক্যাপ্টেন হুদার বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই সভার আনুমানিক তারিখও আমার মনে পড়িতেছে না। সময়টা ছিল ১৯৬৫ সালের জুলাই-আগষ্ট মাস। প্রধানতঃ ইংরেজীতেই আলোচনা হয়। তবে দুই-একটি কথা বাংলোতেও হয়। আমার স্ত্রী দর্শক হিসাবে আদালতে উপস্থিত আছেন কি-না তাহা আমার জানা নাই। তবে আমি তাহাকে উপস্থিত থাকিতে দেখি নাই।

আমি কখনও ব্যক্তিগত ডাইরী রাখি না। এই প্রতিষ্ঠানে আমার কার্যকলাপ সম্পর্কেও আমি কোন নোট রাখি নাই। জনাব রমিজের ফ্ল্যাটে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে আমাকে সভার তারিখ, সময় বা স্থান জানানো হয় নাই। সন্ধ্যা ৮টা হইতে ৯টা পর্যন্ত বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভবতঃ বৈঠক শুরু হওয়ার আগেই সাড়ে ৭টা বা ৮টায় আমি ক্যাপ্টেন হুদার বাসভবনে পৌঁছি। বিকালেই আমি তাহার বাসভবনে গমন করি–একথা আমি পুলিশের নিকট জানাই কিনা, তাহা আমার মনে নাই (এইরূপ রেকর্ড করা হয় নাই)। সভার পথে যে গাইডটি আমাদের দেখিতে পায়, তাহাকে আমি ইতিপূর্বে ক্যাপ্টেন হুদার গ্যারেজের সামনে দেখিয়াছিলাম– এ কথা আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আমার জবানবন্দীতে উল্লেখ করি কিনা তাহা আমার মনে নাই (এইরূপ রেকর্ড করা হয় নাই)। পুলিশের নিকট একথা আমি উল্লেখ করি কিনা, তাহাও আমার স্মরণ নাই (এরূপ রেকর্ড করা হয় নাই)। পথে কোন গাইডকে দেখিয়াছিলাম কিনা সে সম্পর্কে পুলিশের নিকট জবানবন্দীতে কিছু উল্লেখ করি কিনা তাহাও আমার মনে নাই (এইরূপ রেকর্ড করা হয় নাই)। সেখানে পৌঁছিয়া আমরা অন্যান্যের মধ্যে ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে দেখি– একথা আমি পুলিশের নিকট জানাই কিনা, তাহাও আমার স্মরণ নাই (এইরূপ রেকর্ড করা হইয়াছে)।

ক্যাপ্টেন শওকত, ক্যাপ্টেন হুদা, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম এবং ষ্টুয়ার্ড মুজিবের মধ্যে শুধু ক্যাপ্টেন শওকত ও লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম মেসে আমার সংগে দেখা করার পর আমার সংগে রাতের খাবার খান। সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন

হুদা, লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবও আমার কক্ষে আসেন এবং আমরা সকলে মেসে রাতের খাবার খাই–একথা আমি পুলিশকে জানাই কিনা তাহা আমার মনে নাই (এইরূপ রেকর্ড করা হইয়াছে)।

১৯৬৬ সালের আগষ্ট মাসের কোন এক রবিবারের সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন শওকত কুমিল্লা হইতে আগমন করেন–একথা আমি পুলিশকে জানাই কিনা তাহাও আমার স্মরণ নাই(এইরূপ রেকর্ড করা হইয়াছে)। জনাব রমিজের ফ্ল্যাটে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ক্যাপ্টেন হুদা আমার সঙ্গে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম ও ষ্টুয়ার্ড মুজিবের পরিচয় করাইয়া দেন, একথা আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করি কিনা, তাহা আমার স্মরণ নাই (এইরূপ রেকর্ড করা হইয়াছে)। মেসে কোন মেহমানকে চা-টা খাওয়াইয়া থাকিলে উহা মেসের খাতায় উল্লেখ করা হইত। বাদীপক্ষের কৌসুলীর পিছনের ব্লকে আমি দুইজন ভদ্রলোককে উপবিষ্ট দেখিতে পাইতেছি। ইহারা উভয়েই অর্ডন্যান্স কোরের লোক। দুইজনই অর্ডন্যান্স কোরের কর্ণেল।

এই পর্যায়ে সাক্ষীকে অর্ডন্যান্স মেসের খাতা দিয়া ১৯৬৬ সালের ১৯শে ও ২০শে আগষ্ট মেহমানদের চা পরিবেশন সম্পর্কিত এন্ট্রি দেখাইতে বলা হয়। ইহাতে সাক্ষী বলেন, এধরনের কোন এন্ট্রি দেখিতে পাইতেছি না।

সাক্ষী আরও বলেন, যে সকল মেহমান আমার সঙ্গে সম্ভবতঃ খাবার গ্রহণ করেন, তাহাদের নাম মেসের খাতায় উল্লেখ করা হয় নাই। ১৯৬৬ সালের আগষ্ট মাসে মেসের খাতায় আমার কয়েকজন মেহমানের নামে যে–অতিরিক্ত 'মিল' (খাবার) লেখা হয়–একথা সত্য।

ক্যাপ্টেন শওকত বিকাল ৪টা হইতে ৫টার মধ্যে আমার সংগে দেখা করেন। আমার কক্ষের ঠিক বাহিরে অবস্থিত লনে চা পরিবেশন করা হয়।

আমি নিজের কক্ষে একাই থাকিতাম। ২১শে আগষ্ট যাহারা উক্ত কক্ষে আমার সংগে সাক্ষাৎ করেন, তাহারা জনাব রমিজের ফ্ল্যাটে অনুষ্ঠিত বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য জনাব রমিজ উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না।

অতঃপর ক্যাপ্টেন শওকত উক্ত মেসে আগমন করেন এবং একরাত আমার সঙ্গে থাকেন। পরদিন সকালে বৈঠক উপলক্ষে আমরা প্রায় ১০টায় জনাব রমিজের বাসভবনে গমন করি। বৈঠকে যোগদানের জন্য রওয়ানা হওয়ার আগে আমি প্রাতঃরাশ করিয়াছিলাম। ক্যাপ্টেন শওকত ঐদিন সকালে তাহার কয়েকজন আত্মীয়ের বাড়ীতে যান। কাজেই তিনি কোথায়ও কখন প্রাতঃরাশ গ্রহণ করেন, তাহা আমার জানা নাই। ক্যাপ্টেন শওকত পুনরায় সকাল ১০টার আগে মেসে আসেন। জনাব রমিজের ফ্ল্যাটে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কোন কিছু পরিবেশন করা হয় কিনা, তাহা আমার মনে নাই। সভাটি প্রায় এক ঘণ্টাকাল অব্যাহত ছিল। একটি কক্ষের ভিতরেই সভাটি অনুষ্ঠিত

হয়। ঐ বাড়ীর অন্য কেহ সভায় উপস্থিত ছিলেন কিনা, উহা আমার স্মরণ নাই। আমার যতদূর মনে আছে, যে বাড়ীটায় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়, উহা ছিল তিনতলা। জনাব রমিজের বাসভবনের উক্ত কক্ষটি পরীক্ষা করার জন্য পুলিশ আমাকে সেখানে নিয়া যায় নাই। বাসভবন যেরাস্তায় অবস্থিত, উহার নাম আমি জানি না। তবে উহা মোহাম্মদপুর কলোনীর অন্তর্ভুক্ত সেখানে আমি তিনবার গিয়াছিলাম। উক্ত ভবনটিতে কয়টি ফ্ল্যাট আছে, সে সম্পর্কে আমার ধারণা নাই। তবে উহা বেশ বৃহৎ ভবন। ভবনের অন্যান্য অংশেও বহু লোকের বাস।

আমি মরহুম বিচারপতি ইব্রাহিমের নাম শুনিয়াছি। আমি সোনার বাংলার নামও শুনিয়াছি। ১৯৬৬ সালে জনাব রমিজের ফ্ল্যাটে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৈঠকে মূল বক্তা ছিলেন লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম। অন্য কেহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কিনা, উহা আমার স্মরণ নাই। দ্বিতীয় বৈঠকের আলোচনায় আমি অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম কিনা উহাও আমার মনে নাই। লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের বক্তৃতা ছাড়া সভায় অন্য কিছু করা হয় নাই। দ্বিতীয় বৈঠক পর্যন্ত আমাদের আন্দোলনের সম্ভাবনা বা সাফল্য সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ ছিল না–একথা ঠিক নয়। পূর্বে পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিক্ষোভে আমি কখনও অংশগ্রহণ করি নাই। চাকুরীতে যোগদানের পূর্বে আমি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিতাম কিনা তাহা আমার স্মরণ নাই। ১৯৬৫ সালে ক্যাপ্টেন হুদার সংগে সাক্ষাতের আগে এই প্রশ্নে আমি কাহারও সংগে আলোচনা করি নাই। তবে আমি পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের বৈষম্যের প্রশ্ন সম্পর্কে অবহিত ছিলাম।

এই পর্যায়ে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে তাহার মনে কি ধারণা ছিল। ইহাতে সাক্ষী বলেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং রূপপুর আণবিক প্রকল্প শুরু করার প্রশ্ন উল্লেখ করা যায়। বি, এ, পড়ার সময় আমি অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করি। দ্বিতীয় বৈঠকে বৈষম্য সম্পর্কে বক্তৃতা করার সময় লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম এই দুইটি প্রশ্নের কথা উল্লেখ করেন কিনা, উহা আমার স্মরণ নাই।

প্রশ্নঃ কোন্ তারিখে আপনারা দাউদকান্দি ডাকবাংলোতে মিলিত হইয়াছিলেন?

উত্তরঃ সঠিক তারিখ আমি বলিতে পারিব না।

প্রশ্নঃ কোন সময় আপনারা মিলিত হইয়াছিলেন?

উত্তরঃ সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৭টার মধ্যে।

প্রশ্নঃ আপনার বিবাহ কোথায় ও কোন্ তারিখে হইয়াছিল?

উত্তরঃ ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে কুমিল্লায়।

প্রশ্ন: আপনার শ্বশুরের দেশ কোথায়?
উত্তর: ফেনী।
প্রশ্ন: আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কি বিবাহ হইয়াছে?
উত্তর: হ্যাঁ।
প্রশ্ন: ক্যাপ্টেন শওকত কি বিবাহের আলাপ-আলোচনায় শরীক হইয়াছিলেন?
উত্তর: হ্যাঁ।
প্রশ্ন: ক্যাপ্টেন শওকত কি বিবাহের আলোচনার জন্য কুমিল্লা শহরে গিয়াছিলেন?
উত্তর: তিনি কুমিল্লা সেনানিবাস হইতে কুমিল্লা শহরে গিয়াছিলেন।
প্রশ্ন: ক্যাপ্টেন শওকত কি বিবাহ অনুষ্ঠানেও যোগদান করিয়াছিলেন?
উত্তর: হ্যাঁ, তিনি বিবাহ অনুষ্ঠানেও যোগদান করিয়াছিলেন।
প্রশ্ন: যশোর গমনের পূর্বে আপনারা কি যশোরে খবর পাঠাইয়াছিলেন?
উত্তর: আমি বলতে পারি না।
প্রশ্ন: কখন আপনারা যশোর গিয়াছিলেন?
উত্তর: কোন এক শনিবারের অপরাহ্নে।
প্রশ্ন: কখন ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন?
উত্তর: পরবর্তী দিবস সন্ধ্যায়।
প্রশ্ন: যশোর কোথায় ছিলেন?
উত্তর: ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টর অফিসার্স মেসে।
প্রশ্ন: কোথায় আলোচনা হইয়াছিল?
উত্তর: মেসের 'লনে'।
প্রশ্ন: আপনারা কাহার মেহমান হইয়াছিলেন?
উত্তর: ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিনের।
প্রশ্ন: আলোচ্য সময়ে যশোর সেনানিবাসের ষ্টেশন কম্যাণ্ডার কে ছিলেন?
উত্তর: আমার মনে নাই?
প্রশ্ন: প্রদেশের সকল সেনানিবাসের সহিত কি সড়ক যোগাযোগ রহিয়াছে?
উত্তর: সকল সেনানিবাস যথা কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর এবং ঢাকা সেনানিবাসের মধ্যে সড়কপথে যোগাযোগ রহিয়াছে।
প্রশ্ন: রাস্তাগুলি কি পাকা?
উত্তর: যদিও সড়কপথে আমি ভ্রমণ করি নাই তবু জানি যে, সড়কগুলি পাকা।
প্রশ্ন: রাজসাক্ষী এম, এম, রমিজের ফ্ল্যাটে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কতদিন পর আপনারা যশোর গিয়াছিলেন?
উত্তর: আমার স্মরণ নাই।

প্রশ্ন: যশোর হইতে প্রত্যাবর্তনের কতদিন পর আপনারা দাউদকান্দি ডাকবাংলোতে মিলিত হইয়াছিলেন?
উত্তর: সম্ভবতঃ ২/৩ দিন পর।
প্রশ্ন: সেপ্টেম্বরের বৈঠকের খবর কখন পাইয়াছিলেন?
উত্তর: দাউদকান্দি হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আমাকে জানান হয় যে, এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।
প্রশ্ন: বৈঠকে ক্যাপ্টেন আলম উপস্থিত থাকিলে তাহা আপনি পূর্বাহ্নেই জানিতেন কি?
উত্তর: ক্যাপ্টেন আলম বৈঠকে আসিতে পারেন এই মর্মে আমি পূর্বাহ্নেই জ্ঞাত ছিলাম।
প্রশ্ন: ক্যাপ্টেন আলম কোন তারিখে আপনার মেসে আসিয়াছিলেন?
উত্তর: আমার স্মরণ নাই।
প্রশ্ন: আপনি মেসের যে কক্ষে থাকিতেন সে কক্ষের দুই পার্শ্বের কক্ষে কাহারা থাকিতেন?
উত্তর: লেঃ জামান ও লেঃ মনোয়ার (পশ্চিম পাকিস্তানের) ও লেঃ সাকলাইন (পূর্ব পাকিস্তানের)।
প্রশ্ন: লেঃ সাকলাইনের পুরা নাম কি?
উত্তর: আমি "সাকলাইন" বলিয়াই জানিতাম।
প্রশ্ন: আপনি কতদিন এই মেসে ছিলেন?
উত্তর: এক মাস হইবে।
প্রশ্ন: ক্যাপ্টেন মোতালেব সামরিক ও প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীদের সংগঠন করিবে–এই মর্মে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন উল্লেখ করিয়াছেন–ইহা কি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আপনার বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন?
উত্তর: যতদূর আমার স্মরণ হয় আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উহার উল্লেখ করিয়াছিলাম।
প্রশ্ন: পুলিশের নিকট বলিয়াছিলেন?
উত্তর: পুলিশের নিকট বলিয়াছিলাম কি-না তাহা আমার মনে নাই।
প্রশ্ন: আপনি লুৎফুল হুদাকে চেনেন?
উত্তর: না।
প্রশ্ন: আপনি আলী আহমদকে চেনেন?
উত্তর: না।
প্রশ্ন: মীর্জা রমিজের ফ্ল্যাটে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত বৈঠক কখন হইয়াছিল?
উত্তর: রাত্রি প্রায় ১০টা হইবে।

প্রশ্ন: কতক্ষণ বৈঠক চলিয়াছিল?
উত্তর: প্রায় ১ ঘণ্টা চলিয়াছিল।
প্রশ্ন: অভিযুক্ত কে, এম, শামসুর রহমানের সহিত কে আপনাকে পরিচয় করাইয়া দেন?
উত্তর: মীর্জা রমিজ।
প্রশ্ন: আপনি মীর্জা রমিজের ফ্ল্যাটে পৌঁছিয়াই কি কে, এস, রহমানকে দেখিয়াছিলেন?
উত্তর: না, আমি যাওয়ার পরে অভিযুক্ত কে, এস, রহমান সভায় আসেন।
প্রশ্ন: 'স্বাভাবিক অবস্থা' (normality) শব্দটি জানেন?
আপনি কি (normality) শব্দটি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উল্লেখ করিয়াছেন?
উত্তর: 'normality' শব্দটি আমি জানি কিন্তু আমি 'normality' উল্লেখ করি নাই (অনুরূপ রেকর্ড রহিয়াছে)।
প্রশ্ন: আপনাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনারা পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত সকল পশ্চিম পাকিস্তানী আটক করিতে চাহিয়াছিলেন, না কেবল ক্যান্টনমেন্টে বসবাসরত পশ্চিম পাকিস্তানীদের আটক করার পরিকল্পনা ছিল?
উত্তর: ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত পশ্চিম পাকিস্তানীদের।
প্রশ্ন: ইহা কি সত্য নয় যে, পূর্ব পাকিস্তানীদের ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানীদের শত্রুভাবাপন্ন করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের আটক করা বিষয়টি বলিতে আপনাকে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে?
উত্তর: ইহা সত্য নয়।
প্রশ্ন: এই আন্দোলনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারে এই মর্মে ক্যাপ্টেন হুদা কোন আভাস দিয়াছিলেন কি?
উত্তর: সেপ্টেম্বর মাসের সভায় ক্যাপ্টেন হুদা আমাকে এই ধরনের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন; কিন্তু সরাসরি কিছু বলেন নাই।
প্রশ্ন: বৈঠকের পর ক্যাপ্টেন আলমের সহিত আপনার আলোচনা হইয়াছিল কি?
উত্তর: হ্যাঁ।
প্রশ্ন: ক্যাপ্টেন আলম কি ঐদিনও আপনার সহিত ছিলেন?
উত্তর: ক্যাপ্টেন আলম আমার সহিত আমার মেসে ছিলেন।
প্রশ্ন: সেপ্টেম্বর মাসে মীর্জা রমিজের ফ্ল্যাটে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর লেঃ মোয়াজ্জেমের সহিত কি সাক্ষাৎ হইয়াছিল?
উত্তর: বৈঠকের পর লেঃ মোয়াজ্জেমের সহিত দেখা হয় নাই।

মোহাম্মদ ইসমাইল

অতঃপর বিবাদীপক্ষের অপর কৌসুলী খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল ৬নং রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আলীমকে জেরা করেন।

প্রশ্ন: মেজর মঞ্জুর কি রাওয়ালপিণ্ডিতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল?
উত্তর: হ্যাঁ, ৫/১০ মিনিট তিনি আমার সহিত ছিলেন।
প্রশ্ন: ইহার পরও কি মেজর মঞ্জুরের সহিত আপনার দেখা হইয়াছিল?
উত্তর: হ্যাঁ, জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে দেখা হইয়াছিল।
প্রশ্ন: রাওয়ালপিণ্ডি জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে কতদিন ছিলেন?
উত্তর: জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে আমাকে রাখা হইত না। মেস হইতে আমাকে কেন্দ্রে নেওয়া হইত।
প্রশ্ন: ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তির কতদিন পূর্বে স্বীকারোক্তি করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন?
উত্তর: ১০/১২ দিন পূর্বে।
প্রশ্ন: কে আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নিয়াছিল?
উত্তর: লেঃ শরীফ একটি জীপে করিয়া আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লইয়া যান।
প্রশ্ন: কখন আপনি রাজসাক্ষী হওয়ার সিদ্ধান্ত করেন?
উত্তর: ১৯৬৮ সালের ৯ই মে।

মীর্জা গোলাম হাফিজ

বিবাদীপক্ষের অপর কৌসুলী মীর্জা গোলাম হাফিজও ৬নং রাজসাক্ষীকে জেরা করেন।

দৈনিক পাকিস্তান
১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
ক্যাপ্টেন আলিমের জেরা অব্যাহত
(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বৃহস্পতিবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৬নং একরারী সাক্ষী ক্যাপ্টেন আবদুল আলিম ভুইয়াকে বিবাদীপক্ষের তিনজন কৌসুলী জেরা করেন। জনাব আবদুস সালাম খানের জেরা সমাপ্ত হলে খান বাহাদুর ইসমাইল ও মীর্জা গোলাম হাফিজ তাকে জেরা শেষ করেন।

আজ শুক্রবার বিবাদীপক্ষের অন্যান্য কৌসুলীগণ তাদের জেরা শেষ করবেন। আজকের শুনানীর পর এই মামলার শুনানী এক মাস বন্ধ রাখা হবে।

গতকাল মামলার শুনানী শুরু হলে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান ৬নং একরারী সাক্ষী ক্যাপ্টেন আবদুল আলিম ভুইয়াকে পুনরায় জেরা শুরু করেন।

প্র-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আপনি যে স্বীকারোক্তি করেছেন তা ম্যাজিস্ট্রেট আপনাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন না আপনি নিজে তা পড়েছেন?
উ-ম্যাজিস্ট্রেট তা আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন ও তখন আমি দস্তখত করি।
প্র-এতে কোন শব্দ পরিবর্তিত হয়েছে বলে আপনার মনে পড়ে কিনা?
উ-আমার মনে পড়ে না।
প্র-আপনি যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন তা আংশিকভাবে কোথাও রদবদল হয়েছে বলে আপনার মনে হচ্ছে কিনা?
উ-আমি বিবৃতিতে এরূপ কোন কিছু দেখতে পাচ্ছি না।
প্র-আজ আদালতে আসার আগে আপনার স্বীকারোক্তির কোন কপি আপনাকে পড়তে দেয়া হয়েছে কি?
উ-না।
কৌসুলী সাক্ষীর হাতে তার স্বীকারোক্তির কপি প্রদান করে তার অংশবিশেষ সাক্ষীকে পড়তে বলেন। সাক্ষী তা পাঠ করলে কৌসুলী প্রশ্ন করেন যে, তার বিবৃতির এই অংশটি নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা।
উত্তরে সাক্ষী জানান যে, এটা নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।
প্র-এ কথা কি সত্য যে,আপনি আপনার বিবৃতি নির্ভুলভাবে পড়তে পারেননি বলে ম্যাজিস্ট্রেট তা শুদ্ধ করে দিয়েছেন?
উ-আমি এক্ষণে বিবৃতির যে অংশটুকু পাঠ করেছি এটা আমি তখন নির্ভুলভাবে পড়তে পারিনি একথা ঠিক নয়।
প্র-'হিজ রিমার্কস ইনভোকড আওয়ার পেশেন্স' এ কথার অর্থ কি?
উ-এই প্রশ্নে আমাদের যে অনুভূতি ছিল তা আমাদের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে।
প্র-'পেশেন্স' শব্দের বাংলা অর্থ কি?
উ-ধৈর্য্য।
প্র-পি, এ এস, এস আই, ও, এন-এস, এর ইংরেজী শব্দের কি উচ্চারণ হবে?
উ-প্যাসন।
প্র-এ কথা কি সত্য যে, আপনি প্যাসান উচ্চারণ করেছেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট পেসেন্স রেকর্ড করেছেন?
উ-এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারব না।
প্র- প্যাসান-এর বাংলা অর্থ কি?
উ-গভীর ভালবাসা বা কোন কিছুর প্রতি ঘৃণা।
প্র-পি ই আর এম আই এ টি ই ডি-এর উচ্চারণ কি হবে?
উ-পারমিয়েটেড।

প্র-আপনি পারমিয়েটেড-এর পরিবর্তে প্রিমড বলেছেন তাই না?
উ-আমি প্রিমড বলেছি এবং আমার বিবৃতিতে তাই লিপিবদ্ধ দেখতে পাচ্ছি।
কৌসুলী জনাব আবদুস সালাম খান সাক্ষীর হাতে বাংলা প্যাসেজ প্রদান করে ইংরেজীতে তা অনুবাদ করার জন্য বলেন। সাক্ষী বলেন, এটা খুবই শক্ত আমি পারব না।
প্র-পরের প্যাসেজটা অনুবাদ করুন।
উ-এটাও আমি পারব না।
প্র-আপনি কি একথা বলেছেন যে, এখানে আটক থাকাকালে ক্যাপ্টেন হুদা ও শওকতের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়নি?
উ-চর্তুদশ ডিভিশন মেসে আটক থাকাকালে ক্যাপ্টেন শওকতের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু ক্যাপ্টেন হুদা কোথায় ছিল তা আমি জানতাম না।
সাক্ষী অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ক্যাপ্টেন শওকতকে আমার সঙ্গে একই কক্ষে রাখা হয়েছিল।
প্র-সেও যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতি দিয়েছে একথা কি আপনি জানতেন?
উ-একথা আমি জেনেছি। সে আমাকে এ কথা বলেছিল।
প্র-ক্যাপ্টেন হুদাকেও আটক রাখা হয়েছে একথা কি আপনি জানতেন?
উ-না।
প্র-আটক থাকাকালে ক্যাপ্টেন হুদার সাথে আপনার দেখা সাক্ষাৎ হত তাই না?
উ-তার সাথে আমার কোন সময়ই দেখা হয়নি।
কৌসুলী এই সময় সাক্ষীর হাতে 'মকসুদুল মোমেনীন' নামে একটি ধর্মীয় পুস্তক প্রদান করে জিজ্ঞেস করেন যে, এই বইটি কি ক্যান্টনমেন্ট লাইব্রেরী হতে আপনার নামে ইস্যু করা হয়েছিল?
উ-হ্যাঁ, আমি যখন আটক ছিলাম তখন এই বইটি ক্যান্টনমেন্ট লাইব্রেরী হতে আমার নামে ইস্যু করা হয়।
প্র-এই বইটি আপনি ক্যাপ্টেন হুদাকে পড়তে দিয়েছিলেন তাই না?
উ-একদিন প্রহরী আমাকে বলল যে, জনৈক অফিসার পড়ার জন্য একটি বই চায়। আপনার নিকট যদি কোন বই থাকে তবে তা দিন। তখন আমি বইটি প্রহরীকে দেই।
প্র-আপনি কি বিবাহিত?
উ-হ্যাঁ।
প্র-কখন বিয়ে করেছেন?
উ-১৯৬৬ সালের ২৩ শে আগস্ট। আমার স্ত্রী কোয়ার্টারে আমার সাথে বাস করেন না।

প্র-সন্তান প্রসবের সময় আপনার স্ত্রীকে এখানে সি এম এইচ-এ ভর্তি করা হয়েছিল তা ঠিক কিনা?
উ-হ্যাঁ–১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে তাকে সি এম এইচে ভর্তি করা হয়।
প্র-আপনার স্ত্রীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আপনাকে হাসপাতালে গিয়ে দেখবার অনুমতি দেয়া হয়েছিল তা ঠিক কিনা?
উ-হ্যাঁ।
প্র-আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার চিঠিপত্র আদান-প্রদান চলত কিনা?
উ-হ্যাঁ।
প্র-কার মারফত এইসব পত্র আদান-প্রদান হত?
উ-মেজর হাসানের মারফত।
প্র-একথা কি সত্য যে, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত আপনার বিবৃতি মেজর হাসান তৈরী করে দিয়েছেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-আপনি মেজর হাসানকে পিন্ডিতেও দেখেছেন এবং এখানেও দেখেছেন?
উ-শুধুমাত্র ঢাকায় তার সাথে আমার দেখা হয়েছে। তিনি আমাকে বলেছেন যে, আমাদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত রয়েছে। তিনি সামরিক বাহিনীতে জজ এডভোকেট জেনারেল ডিপার্টমেন্টের অন্তর্ভুক্ত।
অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, মেজর হাসান আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি চর্তুদশ ডিভিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসার। তবে তার আগে তার পোস্টিং কোথায় ছিল তা আমি জানি না। জজ এডভোকেট জেনারেলের সদর দফতর পিন্ডিতে।
প্র-আপনি যখন পিন্ডিতে ছিলেন তখন ক্যাপ্টেন মোতালেবও সেখানে ছিলেন কি?
উ-আমি জানি না।
প্র-ক্যাপ্টেন আলম এবং ক্যাপ্টেন হুদাও তখন পিন্ডিতে ছিলেন তাই না?
উ-আমি জানি না।
প্র-আপনাকে মেজর হাসান বলেছিলেন যে, আপনি যদি তার কথামত স্বীকারোক্তি করেন তবে আপনাকে ক্ষমা করা হবে একথা সত্য কিনা?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-আপনি বলেছেন যে, আপনার কক্ষে অন্য একজন অফিসার থাকতেন। তার র‍্যাঙ্ক কি এবং নাম কি?
উ-প্রথমদিকে আমার কক্ষে কোন সময় লেফটেন্যান্ট, কোন সময় সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আবার কোন সময় একজন ক্যাপ্টেন থাকতেন। পরে কক্ষের বাইরে একজন সশস্ত্র প্রহরী থাকতেন। কক্ষের ভেতরে যারা থাকতেন তারা

হচ্ছেন লেফটেন্যান্ট ও সেকেন্ড লেফটেন্যান্টের পদের অফিসার। আর কক্ষের বাইরে প্রহরায় যিনি থাকতেন তিনি হচ্ছেন জে সিও পদের লোক।
প্র-একথা কি সত্য যে, কক্ষের বাইরে নিযুক্ত প্রহরী আপনার কক্ষে প্রবেশ করে আপনার সম্মুখে চেয়ারে বসতেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-আপনার কক্ষের সামনে নাচের আসর ও অন্যান্য বড় বড় পার্টি হত একথা সত্য কিনা?
উ-লনের এক পাশে ডিনার ও লাঞ্চ পার্টি হত। কোন কোন সময় অনুষ্ঠানও হত। অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, কয়েকটি ব্যতীত সকল জানালার কাচই রং করা ছিল। আমি কখনও এইসব পার্টির দিকে তাকাতাম না।
প্র-অফিসাররা আপনার কক্ষের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার সময় আপনাকে নাচ-গানের এইসব অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানাতেন একথা ঠিক কিনা?
উ-একথা ঠিক নয়।
প্র-ওখানে আপনার কি কোন মশারীর প্রয়োজন হয়?
উ-না। তখন শীতকাল ছিল বলে মশারীর দরকার ছিল না।
প্র-আপনি প্রথমদিকে মশারী চেয়েছিলেন কিন্তু তা দেয়া হয়নি একথা সত্য কিনা?
উ-না–সত্য নয়।
প্র-আপনাকে বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার ভয় দেখান হয়েছিল কি?
উ-না।
প্র-একথা কি সত্য যে, ১৯৬৮ সালের ৫ই জানুয়ারী রাওয়ালপিন্ডিতে বসে তীব্র শীতের রাতে একটি আন্ডারওয়্যার পরিয়ে আপনাকে ঘরের বাইরে রাখা হয়েছিল?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-ক্যাপ্টেন হুদা এবং ক্যাপ্টেন মোতালেবকেও আপনি এ রাতে এই অবস্থায় দেখেছেন সত্য কিনা?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-আপনাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করান হবে একথা কি কেউ আপনাকে বলেছিল?
উ-না।
প্র-১৯৬৫ সালের এপ্রিল-মে মাসে ক্যাপ্টেন হুদা পিন্ডিতে কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল একথা আপনি জানেন?
উ-১৯৬৫ সালের এপ্রিল/মে মাসে ক্যাপ্টেন হুদা রাওয়ালপিন্ডি সিএমএইচ-এ ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন।

প্র-কিভাবে তিনি আহত হয়েছিলেন?
উ-তিনি অস্ত্র চালনা শিখবার কালে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি অনেক আগেই এই আঘাত পেয়েছিলেন। সম্ভবতঃ ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর অথবা ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি এই দুর্ঘটনায় পতিত হন।
প্র-আপনি পুলিশের নিকট যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে কি ক্যাপ্টেন হুদার এই দুর্ঘটনা তাকে হাসপাতালে ভর্তি এবং তার সাথে আপনার সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেছিলেন?
উ-আমার মনে নেই (এরূপ লিপিবদ্ধ রয়েছে)।
প্র-হাসপাতালে হুদা কোথায় ছিলেন? কেবিনে না ওয়ার্ডে ছিলেন?
উ-অফিসারদের ওয়ার্ড।
প্র-ঐ ওয়ার্ডে কতগুলো বেড আছে?
উ-আমার মনে নেই, তবে এটা একটা লম্বা ওয়ার্ড।
অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, ওয়ার্ডে ক্যাপ্টেন হুদার সাথে আমার কোন কথা হয়নি।
প্র-আপনি বলেছেন যে, ১৯৬৬ সালে জুলাই মাসে ঢাকায় গ্রীনরোডে হুদার বাসায় যখন আপনি গমন করেন তখন লেঃ মোয়াজ্জমও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কি আপনি একথা উল্লেখ করেছিলেন?
উ-আমার মনে পড়ছে না।
প্র-পুলিশের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতেও কি আপনি একথা উল্লেখ করেছিলেন?
উ-আমার মনে পড়ছে না।
প্র-পুলিশ একবার আপনাকে জিজ্ঞাসাদি করেছিল না দু'বার করেছিল?
উ-দু'বার।
এরপর সাক্ষী বলেন, এখন আমার মনে পড়ছে যে, আমি হুদার গ্রীন রোডের বাসায় লেঃ মোয়াজ্জমের উপস্থিতির কথা পুলিশের নিকট বলেছি (এরূপ কোন রেকর্ড নেই)।
প্র-এম এস রমীজ যে কথা বলেছেন তার সমর্থনে আপনি প্রথমবারের মত আদালতে লেঃ মোয়াজ্জমের উপস্থিতির কথা বলেছেন একথা সত্য কিনা?
উ-সত্য নয়।
প্র-আপনি কি প্রতিদিন সংবাদপত্র পাঠ করেন?
উ-হ্যাঁ।
প্র-আপনি সংবাদপত্রে এই মামলার বিবরণও পাঠ করেন?
উ-হ্যাঁ।
অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, ক্যাপ্টেন হুদার বাড়ীতে জনাব রমীজ সংখ্যাসাম্য না বৈষম্যের কথা বলেছেন তা আমার মনে পড়ছে না।

প্র-হুদার বাড়ীতে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার সঠিক তারিখ আপনার মনে আছে?
উ-সঠিক তারিখ আমার মনে নেই। তবে ১৯৬৬ সালের জুলাই অথবা আগস্ট মাসে এই বৈঠক হয়েছে।
প্র-এই বৈঠকে আলোচনা ইংরেজীতে হয়েছে না বাংলায় হয়েছে?
উ-আলোচনা ইংরেজীতেই হয়েছে তবে মাঝে মাঝে দু'একটি বাংলা শব্দ উচ্চারিত হয়েছে।
প্র-আপনার স্ত্রী এই আদালতে উপস্থিত আছেন?
উ-আমি জানি না।
প্র-দর্শকদের গ্যালারীর দিকে একবার তাকান তারপর বলুন।
উ-(গ্যালারীর দিকে তাকিয়ে) সেখানে আমার স্ত্রীকে আমি দেখতে পাচ্ছি না।
প্র-আপনার বক্তিগত কোন ডায়েরী আছে?
উ-আমি কখনও ব্যক্তিগত ডায়েরী রাখি না।
প্র- দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে আপনি কি কোন নোট রাখতেন?
উ-না।
প্র-আপনি মোহাম্মদপুরে প্রথম যে বৈঠকে যোগদান করেন উক্ত বৈঠকের তারিখ কি আপনাকে পূর্বেই জানান হয়েছিল?
উ-বৈঠক অনুষ্ঠানের পূর্বে আমাকে সময়, স্থান ও তারিখ জানান হয়েছিল।
প্র-ঐ বৈঠক কখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উ-রাত ৮টা হতে ৯টার মধ্যে।
প্র-আপনি কি পুলিশের নিকট একথা বলেছেন যে, আপনি অপরাহ্নে হুদার বাড়ী গিয়েছিলেন?
উ-সম্ভবতঃ সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় আমি হুদার বাড়ী গিয়েছিলাম।

সংবাদ

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

ষড়যন্ত্র মামলা

১৪ই অক্টোবর সকাল নয়টা পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন মুলতবী :

রাজসাক্ষী আলীমের জেরা সমাপ্ত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ষড়যন্ত্র মামলার ৬ষ্ঠ রাজসাক্ষী ও সপ্তম সরকারী সাক্ষী ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভুঁইয়ার সওয়াল-জবাব গতকাল (শুক্রবার) সমাপ্ত হইবার পর বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বর্তমান অধিবেশন আগামী ১৪ই অক্টোবর, সোমবার পর্যন্ত এক

মাসের জন্য মুলতবী ঘোষণা করা হইয়াছে। বিশেষ ট্রাইব্যুনালের এই অধিবেশনে ষড়যন্ত্র মামলার মোট ৩৩ দিনের শুনানীকালে বাদীপক্ষের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন (হোষ্টাইল) বলিয়া ঘোষিত সরকারী সাক্ষী জনাব কামালুদ্দীন এবং লেঃ মোজাম্মেল হোসেন, প্রাক্তন করপোরাল মোহাম্মদ আমীর হোসেন মিয়া, সার্জেন্ট শামসুদ্দীন আহমদ,ডাঃ সাঈদুর রহমান, প্রাক্তন ফ্লাইট লেঃ মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ ও ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল আলীম ভুঁইয়াসহ মোট ৬ জন রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ ও জেরা সমাপ্ত হয়।

পরবর্তীকালে বাদীপক্ষের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন সাক্ষী জনাব কামালুদ্দীনকে ট্রাইব্যুনাল সামরিক হেফাজত হইতে মুক্তি দেন। আগামী অধিবেশনে আরও ৫ জন রাজসাক্ষী এবং মোট ২ শত ২০ জন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।

উল্লেখযোগ্য যে, "ভারতীয় অস্ত্র ও অর্থের সাহায্যে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পাকিস্তানকে উহার একটি অংশ—পূর্ব পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করার" অভিযোগে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান এবং ৩জন সি-এস-পি অফিসার, নৌ-বাহিনীর একজন লেঃ কম্যাণ্ডার, সেনাবাহিনীর ৫জন ক্যাপটেন ও একজন মেজরসহ মোট ৩৫জন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়।

'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যে'র বিরুদ্ধে আনীত ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৮ সনের ৫ নম্বর অর্ডিন্যান্স জারীর মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান (চেয়ারম্যান), বিচারপতি জনাব এম, আর, খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিম সমবায়ে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন। সংশ্লিষ্ট অর্ডিন্যান্সের বিধান অনুযায়ী ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল মেসে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বিগত ১৯শে জুন ট্রাইব্যুনালে আলোচ্য মামলার শুনানী শুরু হইয়া ৩দিন চলার পর ২৯শে জুলাই পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়। দ্বিতীয় অধিবেশন ২৯শে জুলাই হইতে গতকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

ষড়যন্ত্র মামলায় বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি হইতেছেন প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মঞ্জুর কাদের এবং তাঁহাকে সহায়তা করেন জনাব টি, এইচ, খান, গ্রুপ ক্যাপটেন সৈয়দ আসলাম, জনাব আলীম ও জনাব খাকন বাবর। অপরদিকে বিবাদীপক্ষে মামলা পরিচালনা করিতেছেন প্রবীণ আইনজীবী জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব নাজিরউদ্দীন, জনাব ইসমাইল, পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান, মীর্জা গোলাম হাফিজ, জনাব আবদুল্লাহ এবং আরও প্রায় ৪০ জন

আইনজীবী। বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক দলীয় সদস্য, প্রখ্যাত আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়ামস কিউ, সি বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ সমর্থন করেন।

মিঃ টমাস উইলিয়ামস কিউ সি গত ৫ই আগষ্ট ঢাকা হাইকোর্টে এক রীট আবেদন প্রসঙ্গে ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সমুদয় কার্যক্রমকে শাসতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং শাসনতন্ত্রের প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের খেলাপ বলিয়া বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিলে ও শেখ মুজিবসহ ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত সকল আটক ব্যক্তির অবিলম্বে মুক্তির আবেদন জানাইলে ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বি,এ, সিদ্দিকী ও বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম সমবায়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এক নম্বর প্রতিবাদী পাকিস্তান সরকার ও তিন নম্বর প্রতিবাদী মেজর এ,বি, এম, নাসের (অভিযুক্তদের সামরিক কাষ্টোডিয়ান)-এর উপর এক রুলনিশি জারীর মাধ্যমে ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বর্ত্তমান কার্যক্রমকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হইবে না উহার কারণ দর্শাইবার নির্দেশ দেন। আগামী ৩০শে অক্টোবর ঢাকা হাইকোর্টে এই রীটের শুনানীর দিন ধার্য করিবার তারিখ নির্ধারিত হইয়াছে।

বর্তমান অধিবেশন চলাকালে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদেরের আবেদনক্রমে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সঠিক ও বাস্তবভিত্তিক রিপোর্ট প্রকাশ করার ব্যাপারে সাধারণভাবে সকল সংবাদপত্রকে একবার নির্দেশ দেন এবং পরবর্তীকালে ঢাকার সান্ধ্য দৈনিক 'আওয়াজ'-এর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার জন্য 'শোকজ' নোটিশ ও দৈনিক 'সংবাদ'-এর প্রতি সতর্কবাণী জারী করেন।

'সংবাদ'-এর পক্ষ হইতে কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান বাদীপক্ষের অভিযোগকে 'ভিত্তিহীন' বলিয়া ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন জানাইলে ট্রাইব্যুনাল উক্ত হুঁশিয়ারি প্রত্যাহার করিয়া 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত রিপোর্টকে 'অত্যন্ত সন্তোষজনক' বলিয়া রায় দেন। অপরপক্ষে, 'আওয়াজ'-এর মুদ্রাকর, প্রকাশক ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের পক্ষ হইতে কৌসুলি মীর্জা গোলাম হাফিজ প্রকাশিত রিপোর্টের জন্য 'শর্তহীন ক্ষমা প্রার্থনা করিলে' বিশেষ ট্রাইব্যুনাল 'আওয়াজ'কে আদালত অবমাননার অভিযোগ হইতে ক্ষমা প্রদর্শন করেন।

গতকাল (শুক্রবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বর্ত্তমান অধিবেশন মুলতবী ঘোষণার পূর্বে আদালতকে সহায়তা করার জন্য বাদী ও বিবাদীপক্ষের কৌসুলিদেরকে ধন্যবাদ জানান।

দৈনিক পয়গাম

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

৬নং রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আলীমের জেরা সমাপ্ত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (শুক্রবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৬নং রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভুঁইয়ার জেরা সমাপ্ত হয়।

ট্রাইব্যুনালে গতকল্যকার শুনানী সমাপ্তির পূর্ব মুহূর্তে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস, এ রহমান আগামী ১৪ই অক্টোবর সোমবার সকাল ৯টা পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করেন।

এই পর্যায়ে চেয়ারম্যান বিচারপতি এস, এ রহমান তাঁহাকে সহযোগিতাদানের জন্য বাদী ও বিবাদীপক্ষের কৌসুলী-বৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, 'আমরা আশা করিতেছি যে, আমরা ১৪ই অক্টোবর আবার মিলিত হইব।'

গতকল্য শুনানী পুনরারম্ভ হইলে বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী মীর্জা গোলাম হাফিজ ৬নং রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভুঁইয়াকে জেরা করেন। মীর্জা হাফিজের পর জনাব ফজলুল করিম, জনাব আবদুল্লাহ, জনাব জুলমত আলী খান, জনাব নূরুল আলম ও জনাব বদরুল হায়দর চৌধুরী রাজসাক্ষীকে জেরা করেন।

প্রশ্ন: আপনি কি জানেন যে, ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান সিভিল সার্ভিসে যোগদানের জন্য সিলেকশন বোর্ডের সম্মুখীন হইয়াছিলেন?

উত্তর: আমি শুনিয়াছি।

প্রশ্ন: বেশকিছু সংখ্যক সামরিক অফিসার সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত রহিয়াছেন কিনা, জানেন কি?

উত্তর: আমি জানি না।

প্রশ্ন: ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান সিলেকশন বোর্ডের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন–কিন্তু পরে সামরিক বাহিনীর নীতির পরিবর্তন হওয়ায় তাহাকে সিভিল সার্ভিসে নেওয়া হয় নাই– জানেন কি?

উত্তর: আমি জানি না।

প্রশ্ন: ১৯৬৭ সনে যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ ট্রেনিং-এর জন্য ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান মনোনীত হইয়াছিলেন– জানেন কি?

উত্তর: আমি শুনিয়াছি যে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেনিং কোর্সে যোগদান করিতেছেন। তবে ইহা ১৯৬৭ সনে কিনা তাহা আমি জানি না।

প্রশ্ন–বিশেষ ট্রেনিং-এর জন্য কেবলমাত্র প্রতিভাবান অফিসারদেরই মনোনীত করা হয় কি?

উত্তর–কেবলমাত্র প্রতিভাবান অফিসারদেরই নেওয়া হয় কিনা আমি জানি না।

প্রশ্ন–আপনি জানেন যে, ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীতে বর্শা নিক্ষেপে (জেভিলিন থ্রো) নয়া রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন?

উত্তর– আমি জানি।

প্রশ্ন–আপনি কি কখনও সিভিল সার্ভিসে যোগদানের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন?

উত্তর– ব্যর্থ হই নাই। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদাসম্পন্ন চাকুরী পাইয়াছিলাম, তাই যোগদান করি নাই। এক পর্যায়ে ট্রাইব্যুনাল মীর্জা হাফিজের কতিপয় প্রশ্নের ভিত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন এবং কতিপয় প্রশ্ন বাতিল করিয়া দেন।

প্রশ্ন– ইসলামাবাদে আপনার নামে কোন আবাসিক প্লট বরাদ্দ করা হইয়াছে?

উত্তর–হ্যাঁ, ইসলামাবাদে আমার নামে একখণ্ড আবাসিক প্লট বরাদ্দ করা হইয়াছে।

প্রশ্ন–পূর্ব পাকিস্তানে আপনার এরকম কোন আবাসিক প্লট আছে?

উত্তর–না।

প্রশ্ন–কখন আপনার নামে প্লট বরাদ্দ করা হয়?

উত্তর–সঠিক তারিখ মনে নাই, তবে ১৯৬৪-'৬৫ সালে হইবে।

প্রশ্ন–ঢাকায় বদলী হওয়ার পর আপনি কখনো চট্টগ্রাম সফর করিয়াছেন?

উত্তর–হ্যাঁ, করিয়াছি।

প্রশ্ন–চট্টগ্রামে ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন কি?

উত্তর–হ্যাঁ, করিয়াছিলাম।

প্রশ্ন–ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান কখন গ্রেফতার হন, তাহা আপনি জানেন?

উত্তর–ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান কখন গ্রেফতার হন তাহা আমি জানি না।

প্রশ্ন–সেই সময় চট্টগ্রাম ষ্টেশন কম্যান্ডার কে ছিলেন?

উত্তর–কর্ণেল নাজির।

প্রশ্ন–রাওয়ালপিণ্ডিতে জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্র কোথায় ছিল?

উত্তর–সি, এম, এইচ, কম্বাইণ্ড মিলিটারী হাসপাতালে।

প্রশ্ন–আপনাকে গ্রেফতারের পর রাওয়ালপিণ্ডি প্রেরণের সময় আপনার সাথে কে ছিলেন?

উত্তর–পাঞ্জাব রেজিমেন্টের মেজর নাজির।

প্রশ্ন–রাওয়ালপিণ্ডি সাব-এরিয়ায় পৌঁছার পর আপনাকে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের কোন তালিকা দেখান হইয়াছিল কি?

উত্তর–না।

প্রশ্ন–গ্রেফতারে পর লেঃ কর্ণেল হাসান, লেঃ কর্ণেল আমীন, মেজর নাসের, মেজর হক নেওয়াজ, মেজর মঞ্জুর, মেজর মুজা, মেজর হাসান ও মেজর নিয়াজী কি আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিল?
উত্তর–আমি কেবল মেজর নাসের ও মেজর মঞ্জুরকে চিনি।
প্রশ্ন–রাওয়ালপিণ্ডিতে যে ভবনে আপনি আটক ছিলেন সেই ভবনেই ক্যাপ্টেন হুদা ছিল কি?
উত্তর–ক্যাপ্টেন হুদা ছিল কিনা আমি জানি না।

ফজলুল করিমের জেরা

বিবাদপক্ষের কৌসুলী মীর্জা গোলাম হাফিজের জেরা শেষ হইলে বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব ফজলুল করিম ৬নং রাজসাক্ষীকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–ভারত বা ভারতের সাহায্যকারী দেশসমূহ কোন প্রস্তাবিত স্বাধীন রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ করিবে না উহার কারণ বৈঠকে আলোচিত হইয়াছিল কি?
উত্তর–না, উহার কারণ আলোচিত হয় নাই।
প্রশ্ন– আপনি কি জানেন ভারত কোন্ ব্লকে রহিয়াছে?
উত্তর–হ্যাঁ, ভারত নিরপেক্ষ ব্লকে রহিয়াছে।

এডভোকেট আবদুল্লাহ

ইহার পর জনাব আবদুল্লাহ ৬নং রাজসাক্ষীকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের সম্মুখে আপনি কি হলফনামা পাঠ করিয়াছেন বা কোন বিবৃতি দিয়াছেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–ক্যাপ্টেন শওকত ও আপনি সামরিক বিভাগের একই শাখায় নিযুক্ত ছিলেন কি?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–ক্যাপ্টেন শওকতের সুনাম ছিল বলিয়াই কি তিনি অর্ডন্যান্স কোরে ইন্সট্রাক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–আটক থাকাকালে আপনাকে যে কক্ষে রাখা হয় উহার নম্বর কত?
উত্তর–৭-ক।
প্রশ্ন–রুম নম্বর ৭ক ও ৭-এর মধ্যে কোন আভ্যন্তরীণ দরজা আছে?
উত্তর–দরজা আছে–কিন্তু উহা উভয় দিক হইতে বন্ধ।
প্রশ্ন–আপনার কক্ষের পার্শ্ববর্তী ৭নং কক্ষে কে থাকিত?
উত্তর–ইঞ্জিনিয়ার্স কোরের ক্যাপ্টেন নুজলাত হোসেন থাকিতেন।
প্রশ্ন–ইহা কি ঠিক যে, ঐ কক্ষে মেজর হাসান থাকিতেন?
উত্তর–আমি জানি না।

প্রশ্ন–কর্ণেল শের আলী বাজ কি ৮ নম্বর কক্ষে থাকিতেন?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–আপনি ও ক্যাপ্টেন শওকত কি একই কক্ষে ছিলেন?
উত্তর–১৪ ডিভিশনে আমি ও ক্যাপ্টেন শওকত একই কক্ষে ছিলাম।
প্রশ্ন–কতদিন ছিলেন?
উত্তর–এক মাসের উপর।
প্রশ্ন–একবারই কি ছিলেন?
উত্তর–দ্বিতীয়বার দিন সাতেক আমি ও শওকত একই কক্ষে ছিলাম।
প্রশ্ন–ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিবৃতিদানের কালে ক্যাপ্টেন শওকত কি আপনার সহিত একই কক্ষে ছিলেন?
উত্তর–আমি জানি না।
এই পর্যায়ে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী ক্যাপ্টেন আলীমের হাতে একটি দলিল প্রদান করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে, এক কক্ষে থাকাকালীন ক্যাপ্টেন শওকতের নিকট তিনি (রাজসাক্ষী) উহা দেখিয়াছেন কিনা? ৬নং রাজসাক্ষী 'না' বোধক জবাবদান করেন।
প্রশ্ন–আপনি কি জানেন যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের ক্যান্টনমেন্টে আনয়ন করার পর রাজসাক্ষীকে ১৪ ডিভিশন মেসে ও অভিযুক্তদের ৩য় পাঞ্জাব মেসে আটক রাখা হয়?
উত্তর–আমি জানি না।
প্রশ্ন–এই মামলায় ক্যাপ্টেন শওকতকে সাক্ষী হিসাবে ঠিক করা হইয়াছিল কি?
উত্তর–না, আমি জানি না।
প্রশ্ন–ইহা কি সত্য যে, মেজর হাসান প্রায়শঃই আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিত ও তৎকর্তৃক লিখিত বিবৃতি অনুযায়ী স্বীকারোক্তি করার জন্য ভীতি প্রদর্শন করিত এবং সেমতে ক্যাপ্টেন শওকত ও আপনি রাজী হইয়াছিলেন?
উত্তর–ইহা সত্য নহে।
প্রশ্ন–ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিবৃতিদানের পূর্বেই ইহা ঠিক করিয়াছিলেন কি?
উত্তর–পূর্বাহ্নে বিবৃতি তৈয়ারী করি নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রশ্ন করিলে আমি বিবৃতি প্রদান করি।

জুলমত আলী খান

ইহার পর বিবাদীপক্ষের অপর কৌসুলী জনাব জুলমত আলী খান ৬নং রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আলীমকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–আপনার কি মনে আছে স্বীকারোক্তির জন্য কোন সময় আপনাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নেওয়া হয়?
উত্তর–মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্বে।

প্রশ্ন–আপনি ঐদিন কখন মধ্যাহ্ন ভোজ গ্রহণ করিয়াছিলেন?
উত্তর–মেসে প্রত্যাবর্তনের পর।
প্রশ্ন–সাধারণতঃ কখন মধ্যাহ্ন ভোজ দেওয়া হয়?
উত্তর–দুপুর সাড়ে ১২টা হইতে ২টা পর্যন্ত। তবে কেহ ইচ্ছা করিলে এই সময়ের পরও মধ্যাহ্ন ভোজ গ্রহণ করিতে পারে।
প্রশ্ন–ঐদিন আপনি কখন মধ্যাহ্ন ভোজ গ্রহণ করিয়াছিলেন?
উত্তর–দুপুর ২টায়।
প্রশ্ন–আপনাকে কে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লইয়া যান?
উত্তর–লেঃ শরীফ একটি জীপে করিয়া আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নেন।
প্রশ্ন–ম্যাজিস্ট্রেটের কক্ষে অন্য কেহ ছিল কি?
উত্তর–লেঃ শরীফ, ম্যাজিস্ট্রেট ও আমি ভিন্ন ঐ কক্ষে অন্য কেহ ছিল না।
প্রশ্ন-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পৌঁছিয়াই কি বিবৃতি প্রদান করেন?
উত্তর–কক্ষে পৌঁছার ১০/১৫ মিনিট পর।
প্রশ্ন–গ্রেফতারের পূর্বে আপনি কি গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা করিয়াছিলেন?
উত্তর–আমি আশঙ্কা করি নাই।

নূরুল আলম

ইহার পর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব নূরুল আলম ৬নং রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আলীমকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–স্বীকারোক্তি করার জন্য আপনাকে নির্যাতন করা হইয়াছিল কি?
উত্তর–ইহা সত্য নহে।

বদরুল হায়দর চৌধুরী

সর্বশেষে বিবাদীপক্ষের অপর কৌসুলী বদরুল হায়দর চৌধুরী রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আলীমকে জেরা করেন।
প্রশ্ন–'কমান্ডো অপারেশন' কি?
উত্তর–চাতুর্যপূর্ণ অতর্কিত আক্রমণ।
প্রশ্ন–ইহার জন্য বিশেষ ট্রেনিং প্রয়োজন?
উত্তর–হ্যাঁ।
প্রশ্ন–সকল সামরিক জওয়ান ও অফিসারগণ কি কমাণ্ডো অপারেশনে অভিজ্ঞ?
উত্তর–না।
প্রশ্ন–আপনি কি জানেন যে, ক্যাপ্টেন শওকত ১৯৬৬ সালে আইন (প্রিলিমিনারী) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল?
উত্তর–হ্যাঁ। আমি জানি।
প্রশ্ন–আপনি কি জানেন যে, ক্যাপ্টেন শওকতের মেজর পদে উন্নীত হওয়ার কথা ছিল?
উত্তর–হ্যাঁ, আমি জানিতাম।

প্রশ্ন–আপনার উপস্থিতিতে সামরিক গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ আপনার ইউনিটের কোন হাবিলদারকে গ্রেফতার করিয়াছিল কি?
উত্তর–আমার ইউনিটের কোন হাবিলদার, এন সি ও বা জে সি ও-কে গ্রেফতার করা হয় নাই।
এই পর্যায়ে মাননীয় আদালত বলেন যে, ১৯৬৭ সালের শেষদিকে ক্যাপ্টেন আলম মেজর পদে উন্নীত হয়।

টি, এইচ, খান

বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খান রাজসাক্ষীকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।
প্রশ্ন–ক্যাপ্টেন হুদার ক্যাটাগরি পরে পরিবর্তন করা হইয়াছিল কি?
উত্তর–সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালে ক্যাপ্টেন হুদার ক্যাটাগরি পুনরায় পরিবর্তন করিয়া "এ" ক্যাটাগরি করা হয়।

এই পর্যায়ে ৬নং রাজসাক্ষী ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভূঁইয়ার জেরা সমাপ্ত হইলে বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি, এইচ, খান ট্রাইব্যুনালে এক আবেদন পেশ করিয়া বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেমের নিকট হইতে ক্যাপ্টেন খুরশীদের লেখা বলিয়া কথিত আর একখানি পত্র উদ্ধার করা হইয়াছে।

আবেদনে বলা হয় যে, ক্যাপ্টেন খুরশীদের স্বাক্ষরিত এই পত্রের শেষভাগে 'DOC' কথাটি লেখা রহিয়াছে।

আবেদনে তিনি বলেন যে, এই চিঠিখানা হস্তলিপি বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ করা আবশ্যক। কিন্তু বাদীপক্ষের হাতে ক্যাপ্টেন খুরশীদের হস্তাক্ষর না থাকায় তিনি আদালতে ক্যাপ্টেন খুরশীদের হস্তলিপি গ্রহণের অনুমতি দানের প্রার্থনা করেন। অতঃপর আদালতের নির্দেশে ক্যাপ্টেন খুরশীদ একটি অনুচ্ছেদ লেখিয়া দেন। পরে জনাব টি, এইচ, খানের অনুরোধে ক্যাপ্টেন খুরশীদ 'My dear chief: Please', 'ভাবী', 'aborstion', "fantom baby" প্রভৃতি কথাগুলিও লিখিয়া দেন।

দৈনিক পাকিস্তান
১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
অধিবেশন ১৪ই অক্টোবর পর্যন্ত মুলতবী

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শুক্রবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আগামী ১৪ই অক্টোবর সোমবার পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

গতকাল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৬ নম্বর একরারী সাক্ষী ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভূইয়ার জেরা শেষ হলে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস এ রহমান মামলার শুনানীর মূলতবী ঘোষণা করেন।

গতকাল বিবাদীপক্ষের কৌসুলী মীর্জা গোলাম হাফিজ তাঁর অসমাপ্ত জেরা শেষ করেন। অতঃপর বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব এম আবদুল্লাহ, জনাব জুলমত আলী খান, জনাব বদরুল হায়দার চৌধুরী ও জনাব এম এম নুরুল আলম, সাক্ষী ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভূইয়াকে জেরা করেন।বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের জেরা শেষ হলে গতকাল বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি এইচ খানের আবেদনক্রমে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে দু'একটি প্রশ্নে পুনরায় একরারী সাক্ষী ক্যাপ্টেন আলীমের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বিচারপতি জনাব এস এ রহমানকে চেয়ারম্যান এবং ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব এম আর খান ও জনাব মকসুমুল হাকিমকে নিয়ে গঠিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এযাবৎ মোট ৬জন একরারী সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা সমাপ্ত হয়। এর মধ্যে রয়েছেন লেঃ মোজাম্মেল, জনাব আমীর হোসেন মিয়া, সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদ, ডাঃ সাইদুর রহমান, মীর্জা মোহাম্মদ রমীজ ও ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভূইয়া। এছাড়া বাদীপক্ষ একরারী সাক্ষী কামালউদ্দিনকে বিরূপ সাক্ষী ঘোষণা করেন।

গতকাল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরুতে বিবাদীপক্ষের কৌসুলী মীর্জা গোলাম হাফিজ ৬নং একরারী সাক্ষী ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভূইয়াকে জেরা শুরু করেন।

প্র-আপনি কি জানেন যে, ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের আগে সি এস এস সিলেকশন বোর্ড সমীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য পিন্ডি গিয়েছিলেন?

উ-আমি সে কথা জানি।

প্র-আপনি কি জানেন যে, বহু সংখ্যক সেনাবাহিনীর অফিসার সি এস এস'র জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন?

উ-আমি জানি না।

প্র-পূর্ব পাকিস্তানী কোন সামরিক অফিসার সি এস এস জন্য যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছেন বলে আপনার জানা আছে কি?

উ-না।

প্র-আপনি কি একথা জানেন যে, ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান সি এস এস, পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছিলেন কিন্তু পরে সামরিক বাহিনীর নীতি পরিবর্তিত হওয়ায় তাকে সিভিল সার্ভিসে নেয়া হয়নি?

উ-আমি জানি না।

প্র-আপনি কি জানেন যে, নুরুজ্জামান ১৯৬৭ সালে যুক্তরাজ্যে একটা বিশেষ কোর্সে যোগ দিয়েছিলেন?

উ-হ্যাঁ– জানি।

প্র-তিনি ঐ সালের অক্টোবর বা নবেম্বর কোন মাসে বিশেষ কোর্সে যোগ দিয়েছিলেন?

উ-আমি বলতে পারব না।

প্র-আপনি কি জানেন যে, সামরিক বাহিনীর মেধাবী অফিসারদেরই শুধু বিদেশী বৃত্তির জন্য নির্বাচন করা হয়?

উ-আমি জানি না।

প্র-আপনি কি জানেন যে, ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান সেনাবাহিনীর ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বর্শা নিক্ষেপের রেকর্ড আপনি করেছিলেন?

উ- হ্যাঁ।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, ১৯৬৩ সালে আমি সি এস এস পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়েছিলাম এবং আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকুরী দেয়া হয়েছিল।

প্র-চট্টগ্রামে ইবি আর সি'র এ্যাডজুটেন্টের কাজ কি?

উ-আমি জানি না।

প্র-আপনি কি জানেন যে, ১৯৬৬ সালের ৯ তারিখ হতে ১৬ তারিখ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন হুদা ক্যাজুয়েল লীভ নিয়ে বরিশাল গমন করেন?

উ-আমি জানি না।

প্র-আপনি কি জানেন যে, ১৯৬৫ সালের সমগ্র এপ্রিল মাস হুদা চট্টগ্রামে ইবিআরসি অফিসারদের মেসে অবস্থান করেছিলেন?

উ-আমি জানি না।

প্র-ক্যাপ্টেন হুদা ১৯৬৫ সালের ২১ শে মে পর্যন্ত চট্টগ্রামে অবস্থান করেছিলেন একথা কি সত্য?

উ-আমি জানি না।

প্র-ইসলামাবাদে আপনার কোন জমি আছে কি?

উ-হ্যাঁ–বাড়ী তৈরীর জন্য আমাকে একখণ্ড জমি বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্র-পূর্ব পাকিস্তানে আপনার এরূপ কোন জমি আছে?

উ-না।

প্র-আপনি কি পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাস করার সিদ্ধান্ত করেছেন?

উ-না।

প্র-ইসলামাবাদে কবে আপনাকে জমি বরাদ্দ করা হয়?

উ-ইসলামাবাদে একখণ্ড জমি ১৯৬৪ অথবা ১৯৬৫ সালে বরাদ্দ করা হয়েছিল।

প্র-১৯৬৬ সালে ঢাকায় বদলী হওয়ার পর আপনি কি চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন?

উ-হ্যাঁ।

প্র-কোন তারিখে?

উ-সম্ভবতঃ জুলাই মাসে।

প্র-চট্টগ্রামে ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামানের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল কি?
উ-হ্যাঁ।
প্র-ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান কখন গ্রেফতার হয়েছেন?
উ-আমি বলতে পারব না।
প্র-ঢাকা হতে আপনাকে যখন পিন্ডি নিয়ে যাওয়া হয় তখন কোন অফিসার আপনার সাথে ছিলেন?
উ-পাঞ্জাব রেজিমেন্টের মেজর নাজির। ১৯৬৮ সালের ৮ই জানুয়ারী।
প্র-পিন্ডিতে জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
উ-সি এম এইচ-এর নিকট।
প্র-আপনাকে যে কক্ষে রাখা হয়েছিল তার দেয়াল কাঠের না সিমেন্টের?
উ-সিমেন্টের তৈরী।
প্র-আপনাকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখন একই কেন্দ্রে একই সময়ে অন্য একটি কক্ষে ক্যাপ্টেন হুদাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল একথা সত্য কিনা?
উ-আমি জানি না।
প্র-রাওয়ালপিন্ডি সাব-এরিয়ায় পৌঁছার পর আপনাকে গ্রেফতারকৃত অফিসারদের একটি তালিকা দেখান হয়েছিল কি?
উ-না।
প্র-রাওয়ালপিন্ডিতে মেজর নাসের আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?
উ-হ্যাঁ। এম আই ডিরেক্টরেটের মেজর মঞ্জুরও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।
প্র-আপনাকে লেঃ কর্নেল হাসান, আই এম আই-এর লেঃ কর্নেল আমিন, মেজর হক নেওয়াজ, মেজর মোক্তার, জজ এ্যাডভোকেট মেজর হাসান এবং এম আই ডিরেক্টরেটের মেজর নিয়াজি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কি?
উ-না।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনি ক্যাপ্টেন হুদা এবং ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামানকে মিথ্যা অভিযোগে এই মামলায় জড়িত করেছেন?
উ-একথা সত্য নয়।

ফজলুল করিম

এরপর বিবাদীপক্ষের অন্যতম কৌসুলী জনাব ফজলুল করিম সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র-ক্ষমতা দখলের পর কয়েক বছরের জন্য কেন সামরিক আইন জারী করা হবে এ বিষয়ে আপনাদের কোন বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল কি?
উ-না। আলোচনা হয়নি।
প্র-স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েমের পর কিভাবে জনসাধারণকে শাসনতন্ত্র প্রদান করা হবে এ বিষয়ে আপনাদের কোন বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল কি?
উ-না। হয়নি।

প্র-সিন্ধু অববাহিকা বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যেরূপ জোর দিয়েছেন তুলনামূলকভাবে ফারাক্কা বাঁধ সমস্যা সম্পর্কে সেরূপ নজর প্রদান সম্পর্কে আপনাদের কোন বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল কি?
উ-জী না।
প্র-আপনাদের পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্রের ব্যাপারে ভারত সরকার ও ভারতকে সমর্থনকারী ব্লক কেন হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে সে সম্পর্কে বৈঠকে কোন কারণ উল্লেখ করা হয়েছিল কি?
উ-না।
প্র-ভারত একটি নিরপেক্ষ জোটভুক্ত রাষ্ট্র একথা আপনি জানেন কি?
উ-হ্যাঁ।
প্র-আপনি কি জানেন যে, লন্ডন টাইমস পত্রিকায় এই মর্মে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল যে, প্রেসিডেন্টের বিমানের উপর হামলা সংক্রান্ত একটি ব্যাপারে ২৭২ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আপনিও ঐ ২৭২ জনের অন্যতম একথা কি ঠিক?
উ-একথা ঠিক নয়।

জনাব আবদুল্লাহ্

জনাব ফজলুল করিমের পর বিবাদীপক্ষের অপর কৌসুলী জনাব আবদুল্লাহ্ সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র-আপনি কি অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের নিকট শপথ নিয়ে আদালতে স্বীকারোক্তি করেছিলেন?
উ-হ্যাঁ।
অপর এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, আমি যে স্বীকারোক্তি করেছি তা থেকে আমি নড়চড় হতে পারব না, কারণ তাহলে আমি সত্য হতে ভ্রষ্ট হব।
প্র-আপনি ও ক্যাপ্টেন শওকত উভয়েই কি অর্ডিন্যান্স ডিপার্টমেন্টে ছিলেন?
উ- হ্যাঁ।
প্র-একথা কি সত্য যে, তিনি যোগ্য অফিসার হওয়ায় এবং তার রেকর্ড ভাল হওয়ায় তিনি ইন্সট্রাক্টর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন?
উ-একথা ঠিক।
প্র-ক্যান্টনমেন্টে চর্তুদশ ডিভিশন আটক থাকাকালে আপনি কি ৭/এ, নম্বর কক্ষে ছিলেন?
উ-হ্যাঁ।
প্র-আপনার কক্ষ ও ৬ নম্বর কক্ষের মধ্যে আসা-যাওয়ার দরজা আছে কি?
উ-হ্যাঁ, তবে তা উভয় দিক হতে বন্ধ রাখা হয়েছে।
প্র-৭ নম্বর রুমে কে থাকতেন?
উ-ইঞ্জিনিয়ার কোরের মেজর নুজহাত হোসেন থাকতেন।

প্র-মেজর হাসান ঐ রুমে থাকতেন একথা কি সত্য?
উ-আমি অবগত নই।
প্র-আপনার পাশে ৮নং কক্ষে কর্নেল শের আলীবাজ থাকতেন কি?
উ-হ্যাঁ।
প্র-আপনি ও ক্যাপ্টেন শওকত একই রুমে ছিলেন কি?
উ-হ্যাঁ।
প্র-কতদিন ছিলেন?
উ-প্রায় এক মাসেরও বেশী।
অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, দ্বিতীয় আরেকবার ক্যাপ্টেন শওকতের সাথে প্রায় ৭ দিনের মত একই কক্ষে ছিলাম। তবে কোন তারিখ আমার মনে নেই।
প্র-শওকত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করার পর আপনার সঙ্গে একত্রে ছিলেন একথা কি সত্য?
উ-আমি বলতে পারি না।
এরপর কৌসুলী সাক্ষীর হাতে একটি দলিল দিয়ে বলেন যে, ক্যাপ্টেন শওকতের সাথে একই রুমে বসবাস করার সময় তিনি ঐ দলিলটি দেখেছেন কি না। সাক্ষী বলেন যে, তিনি তা দেখেননি।
প্র-আপনি কি জানেন যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের ক্যান্টনমেন্টে আনয়নের পর একরারী সাক্ষীদের ১৪শ ডিভিশন মেসে এবং অভিযুক্তদের থার্ড পাঞ্জাব মেসে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।
উ-আমি জানি না।
প্র-আপনি কি জানেন যে, ক্যাপ্টেন শওকতকে প্রথমে একজন সাক্ষী করা হয়েছিল?
উ-আমি জানি না।
প্র-একথা কি সত্য যে, মেজর হাসান আপনাদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা করে স্বীকারোক্তি করার জন্য হুমকি দিয়েছেন এবং সাময়িক লাভের লোভ দেখিয়েছেন যার ফলে আপনি ও ক্যাপ্টেন শওকত স্বীকারোক্তি করেছেন?
উ-একথা সত্য নয়।
প্র-আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করার আগে সেজন্য নাকি প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিলেন?
উ-আমি কোন প্রকার প্রস্তুতি নেইনি।
কৌসুলী সাক্ষীর হাতে সাইক্লোস্টাইল্ড একটি দলিল দিয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি এতে ক্যাপ্টেন শওকতের স্বাক্ষর দেখতে পাচ্ছেন কিনা। সাক্ষী বলেন যে, তিনি ক্যাপ্টেন শওকতের সাইক্লোস্টাইল্ড স্বাক্ষর দেখছেন।

জুলমত আলী
এরপর বিবাদীপক্ষের অপর কৌসুলী জনাব জুলমত আলী খান সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র-আপনাকে স্বীকারোক্তির জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কখন নিয়ে আসা হয়?
উ-দুপুরে।
প্র-মধ্যাহ্নভোজের আগে না পরে?
উ-আগে।
প্র-আপনি সেখান থেকে মেসে ফিরে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজ গ্রহণ করেছেন তাই না?
উ-হ্যাঁ।
প্র-আপনাদের মধ্যাহ্নভোজ গ্রহণের সময় হচ্ছে সাড়ে ১২টা হতে বেলা একটা একথা কি ঠিক?
উ-বেলা দুটা পর্যন্ত আমাদের মধ্যাহ্নভোজের সময়। তবে এরপরেও খাওয়া যায়। ঐদিন আমি বেলা দু'টার পর দুপুরের আহার সমাধা করি।
প্র-আপনাকে যখন আদালতে আনয়ন করা হয় তখন সেখানে আর কে, কে ছিলেন?
উ-লেঃ শরীফ, ম্যাজিস্ট্রেট ও আমি ব্যতীত আর কাউকে আমি দেখিনি ।
প্র-আপনি কি আপনার স্বীকারোক্তি একটানা বলেছিলেন?
উ-হ্যাঁ।
প্র-আপনি আদালতে আগমনের কতক্ষণ পর ম্যাজিস্ট্রেট আপনার বিবৃতি রেকর্ড করতে শুরু করেন?
উ-দশ হতে পনর মিনিট পর।
প্র-গ্রেফতারের পূর্বে আপনি কি গ্রেফতার হবেন বলে আশঙ্কা করেছিলেন?
উ-না।

নূরুল আলম
এরপর বিবাদীপক্ষের অপর কৌসুলী জনাব এস, এম, নূরুল আলম সাক্ষীকে জেরা করেন।
প্র-স্বীকারোক্তি করার ব্যাপারে আপনাকে রাজী করাবার জন্য লেঃ শরীফ কি প্রায়ই আপনার সঙ্গে দেখা করতেন?
উ-না।
প্র-একথা কি সত্য যে, আপনাকে যেসব কথা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই স্বীকারোক্তি করেছেন?
উ-একথা সত্য নয়।

বদরুল হায়দার চৌধুরী

এরপর জনাব বদরুল হায়দার চৌধুরী সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্র-কমান্ডোস্টাইল অপারেশন কি?

উ-আকস্মিক ও প্রতারণাপূর্ণ উপায়ে হামলা।

প্র-এ কাজের জন্য বিশেষ ট্রেনিং-এর প্রয়োজন আছে কি?

উ-হ্যাঁ।

প্র-সকল অফিসার ও জওয়ান কমান্ডো অপারেশন জানেন না তাই কি?

উ-হ্যাঁ।

প্র-আপনি কি জানেন যে, ক্যাপ্টেন শওকত ১৯৬৬ সালে এলএলবি প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন?

উ-হ্যাঁ, জানি।

প্র-একথা কি সত্য যে, ক্যাপ্টেন শওকতের মেজর পদে উন্নীত হওয়ার সময় হয়েছিল?

উ-হ্যাঁ।

প্র-আপনার ইউনিট হতে আপনার উপস্থিতিতে কোন হাবিলদারকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কি?

উ-না।

প্র-আপনার ইউনিটের কোন এনসিও বা জে, সি, ও'কে গ্রেফতার করা হয়েছিল কি?

উ-না।

আদালতের এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, ১৯৬৭ সালের শেষভাগে ক্যাপ্টেন আলম মেজর পদে উন্নত হন।

এরপর বাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব টি, এইচ,খান একটি বিষয়ে পুনরায় সাক্ষীর জবানবন্দী নেন। সাক্ষী জানান যে, ১৯৬৬ সালে ক্যাপ্টেন হুদা যখন ঢাকায় ছিলেন তখন তার চাকুরীর ক্যাটাগরী পরিবর্তন করে এ ক্যাটেগরী করা হয়।

এরপর সাক্ষীকে তার সাক্ষ্য ও জেরার কপি দেওয়া হলে তিনি তা পড়ে কয়েকটি বিষয় সংশোধন করে তাতে স্বাক্ষর দেন।

এরপর জনাব টি, এইচ খান ট্রাইব্যুনালের নিকট একটি লিখিত আবেদন পেশ করে বলেন যে, লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট হতে যে সমস্ত দলিলপত্র উদ্ধার করা হয়েছিল তার মধ্যে 'লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে' সম্বোধন করে 'খুরশীদ' স্বাক্ষরিত একটি পত্র রয়েছে।

'খুরশীদ' শব্দের পর "ডক" শব্দটি রয়েছে।

এই পত্রখানি হস্তলিপি বিশেষজ্ঞদের নিকট প্রেরণ করা হোচ্ছে। তার সঙ্গে ৩৪নং অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন খুরশীদউদ্দীন আহমদ এএমসি'র নমুনা স্বাক্ষর

এই ট্রাইব্যুনাল সমক্ষে নিয়ে হাতের লেখা তুলনামূলকভাবে যাচাই করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তদন্তের সময় তার হাতের লেখার কোন নমুনা নেয়া হয়নি।

আদালত জনাব টি,এইচ খানের এই আবেদন মঞ্জুর করলে অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন খুরশীদউদ্দীন আহমদ অভিযুক্তদের কাঠগড়া হতে নেমে আসেন। তিনি কাঠগড়ার কাঠের বেষ্টনী ডিঙ্গিয়ে বিবাদীপক্ষের কৌসুলীদের পাশে নেমে এলে একখানি বই হতে একটি প্যাসেজ লিখিয়ে নেওয়া হয়। এছাড়া জনাব টি,এইচ খানও কিছু বাক্য লিখিয়ে নেন।

ক্যাপ্টেন খুরশীদউদ্দীন তার নমুনা হাতের লেখা প্রদান করে অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় ফিরে গেলে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস এ রহমান আগামী ১৪ই অক্টোবর পর্যন্ত শুনানী মুলতবী ঘোষণা করেন। তিনি আদালতের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের ব্যাপারে সহায়তার জন্য বিবাদী ও বাদীপক্ষের কৌসুলীদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

Morning News

20th September 1968

Prosecution alleges

Mujib attended '64 meeting :

Assured India's reaction 'was his concern'

According to the complaint by the prosecution, some of the allegations were ঃ- Sheikh Mujibur Rahman attended the first main meeting of the conspirators in Karachi in the third week of September, 1964, reports APP.

–At this meeting Sheikh Mujibur Rahman endorsed the plan to use force to make East Pakistan an independent state.

–Sheikh Mujibur Rahman assured the meeting that India's reaction to an armed revolt in East Pakistan "was his concern".

–Several meetings of the conspirators were held at Karachi, Dacca, Chittagong and other places.

–Code names were adopted and used for the leading members of the conspiratorial group.

–The Green View Petrol Pump in Dacca was used as a cover for providing a liaison between officials of the Indian High Commission and the conspirator's group.

–Sheikh Mujibur Rahman gave the group several large sums of money directly or through Mr. Bhupati Bhushan Choudhury and others to finance their activities and for the purchase of small arms.

–After the arrest of Sheikh Mujibur Rahman under the Defence of Pakistan Rules (for activities not connected with the conspiracy) on May 6,1966, meetings of the conspirators continued.

–The meeting at Agartala was arranged by Mr. P.N.Ojha because the Indian Government felt that prior to the supply of arms and ammunition some of their officials should meet representatives of the conspiratorial group.

–Mr.P.N.Ojha held six meetings with Lt-Commander Muazzam Hussain and handed over large sums of money on several occasions to the conspirators.

–In October,1967 doubts began to develop among some of the conspirators that Lt. Commander Muazzam Hussain was misappropriating the conspiracy funds.

–Arrests of the members of the conspiracy began in December,1967 bringing their activities to an end.

Morning News

20th September 1968

LIST OF ACCUSED

Following is the list of the accused persons.

1. Mr.Sheikh Mujibur Rahman, s/o Maulvi Sheikh Lutfur Rahman, (1) Vill. Tongipara, P.S. Gopalganj, Distt. Faridpur, (2) No. 677, Dhanmandi, Residential Area, Road No. 32, Dacca.
2. P.No. 574, Lt. Commander Muazzam Hussain, s/o Maulvi Mofazzal Ali, Vill. Dhunurital, P.S. Perojpur, District. Barisal.
3. O. No. 66508, Steward Mujibur Rahman, s/o Munshi Abdul Latif, vill. Ghatmajhi, P.S. Madaripur, District Faridpur.
4. Ex-L/S. Sultanuddin Ahmed, s/o Maulvi Shamsuddin Ahmed, Vill. Uttar Khamar, P. S. Kapasia, Distt. Dacca.
5. O.No. 64672. L/S. C.D.I. Noor Muhammad, s/o Mr. Tumizuddin Akhond, Vill. Kumar Bough, P.S. Lauhajang, P.O. Lauhajang, Tehsil Halidia, Distt. Dacca.
6. Mr. Ahmed Fazlur Rahman, C.S.P. s/o Mr. Imamuddin Ahmed, (1) Vill. Kachishar, P.S. Debidwar, Comilla (2) No. 708, Dhandmandi, Residential Area, Road No. 30, Dacca.
7. Pak/51301, F/Sgt. Mahfizullah, s/o Haji Muhammad Ismail, Vill. Muradpur, P. O. Naya Hat, P.S. Begumganj, Distt. Noakhali.
8. Ex-Corporal Abul Bashar Muhammad Abdus Samad, s/o Mr. Ente Ali Mridha, Vill. Mithakhali, P.S. Mathbaria, District Barisal.
9. Ex-Hav. Daliluddin, s/o Mr. Afizuddin, Vill. and P.O. Shyampur, P.S. Bakerganj, Distt. Barisal.

10. Mr. Ruhul Quddus, C.S.P. s/o Mr. Raisuddin Ahmed. (1) Vill. Panchrkhi, P.O. Kakdanga. P.S Satkhira, Distt. Khulna (2) No. 618-A, Dhanmandi, Residential Area, Road No. 18, Dacca.
11. Pak/72870, F/Sgt, Muhammad Fazlul Haq, s/o Maulvi Syed Ali Talukdar, Vill and P.O. Shaistabad, P.S. Kotwali, District. Barisal.
12. Mr. Bhupati Bhushan Chaudhury alias Manik Chaudhury, S/O Mr. Dhirandra lal Chaudhuri, Vill. Habilashdwip, P.O. Boalkhali, P.S. Patiya, Tehsil and District Chittagong and of 41, Ramjay Mohajan Lane, Chittagong Town, P.S. Kotwali.
13. Mr. Bidhan Krishna Sen, s/o Mr. Rajendra Narayan Sen, Vill. Saroatala, P.S Boalkhali, Distt. Chittagong.
14. P.O.-2068, Sub: Abdur Razzaque, s/o Mr. Situ Sarkar, (1) Vill and P.O South Baroshacher, P.S. Motib Jang Teh Chandpur, Distt. Commilla. (2) A/P Chota Gobindapur, P.S. Kotwali, Dist. Jessore.
15. Ex-Hav/Clk. Mujibur Rehman, EPRTC, s/o Mr. Abdur Rehman, Vill and P.O. Gopalpur, P.S. Nabinagar, Dist. Comilla.
16. Ex-FSgt. Muhammad Abdur Razzaque, s/o Mr. Munshi Askar Ali, Vill. Bandarampur, P.O. Daudkandi, P.S. Daundkandi, District. Commilla.
17. Pak/72324, Sgt. Zahoorul Haq, s/o Mr. Kazi Mujibul Haq, Vill. Sonapur, P.O. Sonapur, P.S. Shudharam, District. Noakhali.
18. Ex-A/B Muhammad Khurshid, s/o Abdul Jabbar, Vill. Saber Cottage, P.O. Faridpur Town, P.S. Kotwali, District. Faridpur.
19. Mr. Khan M. Shamsur Rahman, C.S.P, s/o Mr. Emteazuddin Khan, Vill. And P.O. Lamubari, P.S. Manikganj, Teh. Manikganj, District. Dacca.
20. PJO 768, Ris. A.K.M. Shamsul Haq, A.C. S/o, Mr. Abdul Samad, Vill. Putal, P.O. Lamubari. P.S. Manikganj, Teh. Manikganj, District. Dacca.
21. No. 3031018 Hav, Azizul Haq, S.S.G, S/o Mr. Serajul Haq, Vill. Kachia, P.O. and P.S. Baranadi, District. Barisal.
22. Pak/73040, S.A.C.Mahfuzul Bari, S/o Maulana A.K. Momazzad, Vill. Charlakshmi, P.O. Ramgati Hat, P.S. Ramgati, District. Noakhali.
23. Pak/70415, Sgt. Shamsul Haq, S/o Haji Sadiq Ali, Vill. Nairajpur, P.O.K.M. Hat, P.S. Feni, District Noakhali.
24. PSS-100520, Major Shamsul Alam, A.M.C. S/o Mr.Shamsuz Zoha, No.16, Khajedewan, Second Lane, Dacca.

25. PSS-6100,Captain Muhammad Abdul Mutalib, S/o Mr. Hafizuddin, Vill. Darumbai Rati, P.S. Purbadhala, P.O. Samganj, Tehsil Netrokona, Distt. Mymensigh.
26. PTC-5727,Captain M. Shawkat Ali Mian, S/o Munshi Mubarik Ali, Vill. Chakdha, P.O. Lonsing, P.S. Naria, District. Faridpur.
27. PA-6561,Captain Khondkar Najmul Huda, ASC, S/o Late Mr. Khondkar Muazzam Hussain, Vill. Barisal Town, West Bogra Road, District Barisal.
28. Captain A.N.M. Nuruzzaman E.B.R. s/o Maulvi Abu Ahmed, Vill. and P.O. Saidabad, P.S. Raipura, District. Dacca.
29. Pak 70704. Sgt. Abdul jalil, s/o maulvi Abdul kadir, Vill. Sarrabad (Haji Bari), P.O. Narayanpur, District. Dacca.
30. Mr. Muhammad Mahboobuddin Chaudhury, S/o Alhaj Maulvi Azizuddin Muhammad Chaudhury, Vill. Pyaim, P.O. Chaitian, District Sylhet.
31. P. No. 958, ILt. M.M.M. Rahman, S/o Mr.Molla Muhammad Sulaiman, Vill. and P.O. Makrail, P.S. Lohagara, District. Jessore.
32. EX-Sub. A.K.M Tajul Islam, S/o Maulvi Daliluddin Ahamad, Vill. Sreepur, P.S.Bhandaria, district. Barisal
33. Mr. Muhammad Ali Reza, s/o Maulivi Zahur Ali Ahmed, Vill. Lahini, P.O. Kustia, P.S. kotwali, District. Kustia.
34. PSS-200471, Captain Khurshiduddin Ahmad, AMC, s/o Maulvi Abdul Rahman, Vill. and P.O. Banshia, P.S. Gaffargaon, District. Mymensingh.
35. P. No. 944, ILt, Abdur Rauf, s/o Alhaj Abdul Latif, Pakistan House, P.O. and P.S. Bhairab, District. Mymensingh.

নির্ঘণ্ট

অপরাধ আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অর্ডিন্যান্স ১৭০, ১৮২, ১৮৩।
আহমদ ফজলুর রহমান ১৭, ৫২, ৫৫, ৫৬, ৬৪, ৮০, ৮২, ৮৪, ৮৮, ১১৮, ১২৯, ১৬৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৮৪, ১৯৬, ২২৯, ২৩৭, ২৩৮, ২৪১, ২৪৩, ২৪৪, ২৫২, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৭, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৮১, ২৮৯, ৩৪৩, ৩৪৯, ৩৫৫, ৩৬০, ৩৭১, ৪১৯, ৪৩০, ৭২৬, ৭৭৫।
আনোয়ার হোসেন ৪৫, ৪৬, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৩৬৭, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৭, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭১১, ৭১৩, ৭১৫, ৭১৬, ৭২৪, ৭২৫, ৮০১।
আতাউর রহমান খান ৫২, ৫৬, ৫৯, ৬৪, ৮০, ৮১, ১১৬, ১৩৮, ১৪৭, ১৮৪, ২০০, ৩৮৮, ৩৯৩, ৩৯৫, ৩৯৭, ৪০০, ৪০৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৬৭, ৪৮৫, ৪৮৮, ৪৯৬, ৫০৬, ৬৪২, ৬৪৬, ৬৬৬, ৬৭৪, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৮৯, ৭৯৪, ৭৯৬, ৮০৬, ৮০৮, ৮০৯, ৮১৩, ৮১৭, ৮২১, ৮৬৯।
আমিরুল ইসলাম ৫২, ৬০, ৬৪, ৭৯, ৮০, ৮১, ১৪৩, ১৭১, ১৮৮, ১৯৯, ৩৯৬।
আলো ৫৪, ২০৫, ২১২, ২২০, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৯, ২৪৭, ২৫০, ২৫২, ২৫৩, ২৫৮, ২৬১, ২৬৭, ৩১৪, ৪৪৬।
আবু হোসেন সরকার ৫৬।
আখলাক হোসেন ৬২, ৬৫।
আবুল বাসার মোহাম্মদ ইউসুফ ৬৬।
আসাদুজ্জামান খান ৮০, ৪৮৮, ৫০৬, ৫১৬, ৫১৯, ৫২০, ৫৩০, ৫৩৩, ৫৪১।
আলেয়া ৩১, ১৬৩, ১৭৪, ২৩৯, ২৪৫, ২৫৩, ২৬১, ২৬৬, ৩২২, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৪২১, ৪৯১, ৪৯৭, ৫০৮, ৬৪৯, ৬৬৮, ৬৮০।
আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ১৮২।
আনোয়ার জাহিদ ১৬৯, ৩৪৪, ৩৫৫।
আজাদী দিবস ৩৫৯।
আরজু হোটেল ২৭২, ৩৪৪।
আবদুল মোনায়েম খান ৪৯৭।
আওয়ামী লীগ ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৮, ৯১, ৯২, ১৩৮, ১৬৯, ১৭১, ১৮১, ১৮৩, ২১৪, ২৪০, ২৪৯, ২৬১, ২৭০, ৩৯৬, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪৯৪, ৪৯৬, ৫০২, ৫৩০, ৫৪০, ৫৫৭, ৫৭০, ৫৭৫, ৫৮০, ৫৮৯, ৫৯০, ৫৯৬, ৬০৩, ৬০৯, ৬১১, ৬১৪, ৬২৭, ৬২৮, ৬৩০, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫, ৬৫০, ৬৬৫, ৬৬৮, ৬৯৮, ৮৬৯।

আমার সোনার বাংলা ৫২৩, ৫৩৫, ৫৪৪।
আমির হোসেন ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৫৪, ৬৯, ১৬১, ১৬৬, ১৮৯, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২২০, ২২১, ২২২, ২৩২, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫৮, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৬, ২৮০, ২৮১, ২৮৭, ২৮৮, ২৯০, ২৯১, ৩০১, ৩০৫, ৩৫৬, ৩৫৯, ৩৬৮, ৩৮১, ৩৮২, ৪৪৫, ৪৭৫, ৫৫১, ৫৫৩, ৫৫৫, ৫৫৬, ৬৭০।
আবদুল মান্নান ৭৯, ১১০।
অ্যাঙ্করেজ ৩৯।
ইলাকো হাউস ২৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৭৮, ৩১০।
ইনায়েত হোসেন মার্কেট ৩১।
ইন্দিরা গান্ধী ৫৫৫, ৫৬২, ৫৮৬, ৬৮৫।
ইন্টারকন্টিনেন্টাল ১১০, ৭৩৪, ৮২৭।
ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক ৭০৯, ৭৬০।
ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্ট্রাল অফিসার্স মেস ৬৭৪।
ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ৬৫৯, ৭৪৯, ৭৫৯, ৭৬০, ৮১৩, ৮৫৯।
ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ৮২৩।
ইউবিএল ৩৬৯।
ইপিআইডিসি ১৩১।
ইন্সপেক্টর আহসানউল্লাহ ৩৯০।
ইনসাফ আলী ৬২, ৬৫।
উলকা ২০৫, ২১২, ২২০, ২৫৫।
উইং কম্যান্ডার এ এম খাজা ৪৫৭।
একরারী সাক্ষী ৮৯, ৯০, ৯৪, ৯৫, ১২৭, ১৩৬, ১৪৯, ১৫৩, ১৭২, ১৭৮, ১৭৯, ২২৩, ২৩২, ২৫৮, ২৬০, ২৬৭, ২৯৫, ৩০১, ৩০৪, ৩০৫, ৩৩০, ৩৪৭, ৩৫৯, ৩৬৪, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪২৮, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৬৭, ৪৬৯, ৪৭৫, ৪৭৭, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৫০৬, ৫১৩, ৫১৬, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫২, ৫৫৫, ৫৬৫, ৫৬৮, ৫৭১, ৫৭২, ৫৯৫, ৬০৫, ৬২৫, ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৭৯, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৭, ৭২০, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩৪, ৭৬১, ৭৮১, ৭৯৬, ৮০৫, ৮০৬, ৮১৭, ৮৪২, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৬২, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৮১।
এম এ আজিজ ৫৭০।
এস এ রহমান ৫৫, ৬০, ৮৯, ১২৯, ১৩১, ১৩৫, ১৪৯, ১৭৩, ১৯৫, ২৯৫, ৩০৫, ৪৩৩, ৫৪৯, ৫৭২, ৬৭৩, ৬৮৮, ৭৯৮, ৮১৭, ৮৪৯, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৮৪।

এম আর খান ৬০, ৬৮, ৮৯, ১৩৫, ৬৭৩, ৬৮৮, ৭৩৭, ৮১৭, ৮৭৭।
এপিপি ১৭, ৫৩, ৬০, ৬৮, ৭৪, ৭৫, ৭৬।
এ আলিম ৫২, ৭৯৫।
এম এ রাজ্জাক ৪০, ৫০।
এম এম রমীজ ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৫, ৪৬, ১৪১, ৬৪০, ৬৭৪, ৬৮৩, ৮০৫, ৮৪৪, ৮৪৮, ৮৫৩, ৮৬৭, ৮৭৭।
এম আলী রেজা ৪৫, ৫৩, ৫৮, ৬৪, ৫৬৪, ৫৮৭, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৬৮, ৬৮১, ৬৮৮, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৬, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১০, ৭১৭, ৭১৮, ৭১৯, ৭২৭, ৭২৮, ৭৩০, ৭৩১, ৭৭৯, ৭৮০, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৮, ৭৯৪, ৭৯৯, ৮০৬, ৮১১, ৮২২।
এস এ সি মাহফুজুল বারী ৫৩, ৫৮।
এয়ার মার্শাল আসগর খান ৮১২, ৮২৩।
এ সবুর খান ২০৮, ২৩০।
এন এইচ খান গিয়াসউদ্দিন ৩৬৭।
এভিডেন্স এ্যাক্ট ১৪৭, ১৮১, ১৮৭।
এম আর সিদ্দিকী ৫৬৯।
এস এ সি বারী ৫৩, ৫৮, ৪৭১।
এ বি খুরশীদ ১৭৯, ২৩৩, ৪৩৬, ৪৬৮, ৫৫১, ৫৫৪, ৫৫৬, ৫৫৮, ৬৭৪, ৬৭৮, ৬৮৭।
এফ করিম ৭০।
ওয়ারেন্ট অফিসার মোশাররফ এইচ শেখ ২৫, ৬৯।
ঔষধ ১৬৮, ১৯০, ২০২, ২১৭, ২২৫, ২৩৭, ২৫৯, ২৯১, ৩৩৬, ৩৪৭, ৪৭৩, ৫৭০, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৮৬, ৬৮৭।
'ঔষধপত্র' ২৩৭, ৩২১, ৩৩৬, ৩৪৯।
করাচী বিশ্ববিদ্যালয় ২৯০, ৩০৩, ৩৯৯, ৫৪১।
কর্পোরাল জামালুদ্দীন আহম্মদ ৬৬।
কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম ৬৬, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৯১, ৪৯৮, ৫০৮, ৫০৯, ৫২৫, ৫২৬, ৫৩৪, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৬।
কর্পোরাল জামালুদ্দীন আহম্মদ ৬৬।
কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম ৬৬।
কর্পোরাল আবুল বাসার আবদুস সামাদ ৫২।
কমল ৫৪, ২০৫, ২৩৪, ২৩৯, ২৫০, ২৫৩, ২৫৯, ২৬১।
কর্পোরাল আমীর হোসেন মিয়া ৬৬।
কামাল উদ্দিন আহমদ ২১।

কায়েদে আজম ৩৯২, ৪০৩।
কাজী গিয়াসউদ্দীন ২২৮।
কাজি শামসুল হক ৭০।
কাজী জালালউদ্দিন আহমদ সিএসপি ৩৬৪, ৩৬৫, ৭২৯।
কাজী আলাউদ্দিন ৩৬৭।
কামাল উদ্দিন আহমদ ২১।
কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ৭৮৩।
কে জি আহমদ ৬৬, ৬৯, ১৫৩, ১৫৪, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ২০৬, ২২৮, ২২৯, ৩১০, ৩১১, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৯৭, ৪২৯।
কে এম শামসুর রহমান ১৭, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪২, ৫৩, ৫৫, ৫৮, ৬৪, ৮০, ৮২, ১৮৪, ৬৮৯, ৬৯২, ৭০০, ৭০১, ৭০২, ৭০৩, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৭, ৭৫০, ৭৫৬, ৭৫৮, ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৮, ৭৬৯, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৩, ৭৭৪, ৭৭৯, ৭৮৫, ৮০৩, ৮৩৫, ৮৪৮।
ক্যাপটেন মোহাম্মদ শওকত আলী মিঞা ৩৫।
ক্যাপটেন মোহাম্মদ আবদুল আলিম ভুঞা ৩৫।
ক্যাপটেন খোন্দকার নাজমুল হুদা ৩৫।
কর্ণেল এম এ জি ওসমানী ৫০।
ক্যাপটেন খুরশীদুদ্দিন আহমদ ৪৫, ৫৩।
ক্যাপটেন মোহাম্মদ আবদুল মোতালেব ৫৩।
ক্যাপটেন এম শওকত আলী মিয়া ৫৩, ৬৯, ৮৩৩, ৮৪৬।
ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল আলিম ভুইয়া ৬৬, ৬৯।
ক্যাপ্টেন খন্দকার এ নাজমূল হুদা ১৪৯।
ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান ৩৭, ২৩৩, ৬৪২, ৬৬৩, ৬৮৮, ৬৯৯, ৮৪৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯।
ক্যাপ্টেন এ এন এম নূরুজ্জামান ৫৮, ৬৯৯, ৭৫৫, ৭৬৭, ৭৭৮, ৭৮৫, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৬, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৭১, ৮৭২।
ক্যাপটেন খোন্দকার নজমুল হুদা ৫৩, ৫৮, ৬৪।
খাকান বাবর ১৮, ৫২, ৬০, ৮১।
খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল ৫২, ৬৪, ৮১, ১৮৪, ৩৮৮, ৩৯৭, ৮৬১।
খান শামসুর রহমান ৫৫, ৫৮, ৭৬৮, ৭৬৯, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৩, ৭৮৫, ৮৪৮।
খাজা শাহাবুদ্দীন ৪০১।
গোলাম মোহাম্মদ ১৯০, ২০০, ২১৫, ২২৪, ৪২৩, ৪৩২, ৪৭৭, ৪৭৮।
গ্রীন ভিউ পেট্রোল পাম্প ২৭।
গ্রীন স্কোয়ার ৬২৩, ৬৪৯, ৬৭৬, ৬৮০, ৬৯৬, ৭১৭, ৭২৬।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আসলাম ১৮।
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৭৪৯।
চৌধুরী জয়নুল আবেদীন ৪৭, ৪৮।
জর্জ বল ৩৬১, ৩৭৬।
জহুর আহমদ চৌধুরী ৫৬৯, ৬৫০, ৬৫১, ৬৬৯।
জহীরুদ্দীন ৫২।
জাতিপুঞ্জ ১১১।
জাকের আহমদ ৬৭, ৬৯, ৪৭৩, ৪৮২, ৫০৭।
"জিনিসপত্র" ১৪৪, ১৯০, ২০১, ২১৬, ২৪৩, ২৪৪, ২৫৬, ২৬২, ২৯৪,
টমাস উইলিয়ামস ৭৫, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৯, ১২৭, ১৩২, ১৩৫, ১৮৮,
২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৬, ২৭৭, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৯, ৩০১, ৩০৬,
৩২১, ৩৫১, ৩৯৬, ৮৭০।
জুলমত আলী খান ৬০, ১০৯, ৪৩৮, ৪৪২, ৪৪৫, ৪৫৩, ৪৫৫, ৪৬২,
৪৬৭, ৪৬৯, ৪৯৭, ৫১৯, ৫২৫, ৫৩০, ৫৩৭, ৫৪১, ৫৪৫, ৬৪২, ৬৭৪,
৬৮৬, ৮২৮, ৮২৯, ৮৭১, ৮৭৪, ৮৭৭, ৮৮২।
জেড এইচ চৌধুরী ৪০৬, ৪০৭।
জেনারেল আজম খান ১৫৫।
টি এইচ খান ৫২, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৪৯।
ডঃ কামাল হোসেন ৮০।
ডঃ সায়েদুর রহমান ১৭, ২৪৫।
ডাঃ সায়ফুর রহমান ৩৬৫।
ডাঃ নূরুল ইসলাম ৫৭৭, ৫৯৯।
ডাঃ ওয়াকিল আহমদ ৫৭৭, ৫৯৩।
ঢাকা হাইকোর্ট ১৫৬।
ঢাকা সেন্ট্রাল জেল ১৩৪, ৫৬৭, ৫৭২, ৮০৫।
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ১২১, ১২২, ১৮৬, ২৪৭, ৫৮৮, ৬৪৮, ৮২৭।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৮১৩।
ঢাকা হোটেল ১৭৫, ৩২৯, ৪৬৯।
তুহিন ৫৪, ২০৫, ২২০।
তুহীন ২১২, ২৩৪।
তুষার ৩০, ৫৪, ২০৫, ২১২, ২২১, ২৩৪, ২৪৫, ২৫৭, ২৬৫।
তাসখন্দ চুক্তি ১০৪, ৪৪৪।
তাজুদ্দিন আহমদ ২৬২, ৪২১, ৫৮৮, ৫৯৫।
থার্ড পাঞ্জাব ব্যারাক ৪৯০।

দলিলুদ্দিন ৪২, ৪৫, ৪৬, ২৪৯, ৭০৫।
'দ্রব্যাদি' ৬০, ১৬৮, ২২৫, ২৬৪, ২৬৫, ২৯০, ৩৪৯, ৫৭৪, ৫৮৯।
দৈনিক 'আওয়াজ' ৬৯৮, ৮৭০।
দিনফা হোটেল ৭৩৩।
দীননাথ সেন রোড ২৪৫, ২৬৪, ২৭২।
দেশরক্ষা আইন ২৭৪।
নায়েব সুবেদার আশরাফ আলী খান ২৭, ৬৯।
নাজমুল হুদা ৩৭, ৩৮, ৬৯, ৮৪৩।
নূর মোহাম্মদ ২১, ২২, ২৪, ২৯, ৩৪, ৫২, ৫৪, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮৮,
৯০, ৯১, ১১৭, ১১৮, ১২৮, ১২৯, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫১,
১৫২, ১৬২, ১৬৫, ১৬৬, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৭, ১৭৮, ১৯০, ১৯১, ২০৩,
২০৪, ২০৫, ২১২, ২১৫, ২১৯, ২২১, ২২৪, ২২৬, ২২৭, ২৩৪, ২৩৭,
২৩৯, ২৫১, ২৫৩, ২৬১, ২৮৬, ৩২৪, ৩২৫, ৩৪৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮,
৩৫৯, ৩৭৫, ৬৮৮, ৬৯০, ৭০১।
নুরুল ইসলাম সিএসপি ৩৬৫।
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ২৪১, ২৫৪, ২৬৩, ৩৮৩।
ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশন ১৯১, ২০৬, ২২৮, ২২৯।
পরশ ৫৪, ১৯৬, ২০৫, ২১২, ২২১, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৭, ২৫১, ২৫৯,
৪০০।
পথিকাবাস ১৪৭, ১৪৮, ১৫১, ১৫২।
পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন ২৯৩, ৫৮১।
পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্ট ৪০১।
পি এন ওঝা ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৫৪, ৫৫৫, ৫৫৭, ৫৬০, ৫৬১,
৫৬২, ৫৬৫, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৯৮, ৬১৯, ৬২৫, ৬৩৪, ৬৩৫,
৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৮৫, ৬৯২।
পিআইএ ৪৬, ৪৯, ৬২, ৯০, ১৬২, ১৭৩, ২৮৫, ২৮৬, ২৯৪, ২৯৯, ৩০২,
৩২৫, ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৯৪, ৬৯৬, ৬৯৭, ৭০৫, ৭০৬, ৭১০, ৭১১, ৭২০,
৭২৩, ৭২৪, ৭২৫, ৭৩২, ৭৩৪, ৭৫৬, ৭৬১, ৭৭৫, ৭৭৭, ৭৮৩, ৭৮৬,
৭৮৭, ৭৮৮, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০১, ৮০২, ৮১৮, ৮১৯, ৮২১,
৮২২, ৮২৪, ৮২৯, ৭৩১, ৮৩৬, ৮৪৪, ৮৪৮।
পিডিএম ৪০১।
পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন ৭৩৭, ৭৫১, ৮০৯।
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ১৯, ২০।
ফজলুল কাদের চৌধুরী ১৪১, ১৫৫।

ফজলুল করিম ১০০, ৪৪৫, ৪৫১, ৪৫৫, ৪৫৯, ৫৩৬, ৫৩৮, ৫৪১, ৫৪৭, ৬৪২, ৬৭৪, ৬৮৫, ৮০৮, ৮১৭, ৮৭১, ৮৭৩, ৮৭৯।
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ ৬৬, ৬৪১, ৬৫৯, ৬৮৩, ৬৮৮, ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৫, ৭০২, ৭০৩, ৭০৬, ৭০৯, ৭১২, ৭৩১, ৭৯২, ৭৯৪, ৮০৬, ৮০৮, ৮১৭, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৬৯।
ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট এম, এম, এম, রহমান ৫৩।
ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ ৫৩, ৫৮।
ফৌজদারী আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অর্ডিন্যান্স ১৮৭।
ফ্লাইট সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হক ২৫।
ফ্লাইট সার্জেন্ট মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক ২৬।
বদরুল হায়দার চৌধুরী ৫২, ৬০, ১০০, ১০৯, ৪৩৮, ৪৬৩, ৫১৯, ৫২৪, ৫৪১, ৫৪৪, ৫৪৫, ৮০৮, ৮১৭, ৮২৪, ৮৭৭, ৮৮৩।
বড় ভাই ১১৭, ১২৮, ১৩৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৮০, ১৮১, ১৯০, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৪, ২১৪, ২১৬, ২১৭, ২১৯, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ৩৪৭, ৩৫৮, ৩৯৯, ৪২০, ৮১০, ৮২০।
বাংলা দেশ ৩৪।
বার্মা ইস্টার্ন লিঃ ৮২১।
বিধান কৃষ্ণ সেন ১৭, ২৬, ৫২, ১৯৫, ২১১, ৫১৯, ৫২০, ৫২৮, ৫৩৩, ৫৫১, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৮০, ৫৯৩, ৫৯৪, ৬০০, ৬০১, ৬০৪, ৬৭০।
বি কে সেন ৫৫২, ৫৭১, ৬২৬।
বেঙ্গল লিবারেশন আর্মি ৪৯৩, ৪৯৪, ৫০১, ৫১৩।
ভারতীয় হাই কমিশন ৫৮২, ৬০৯।
ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার ১৭, ২৭, ৩৫, ৩৬, ৫৫৪, ৫৫৭, ৫৯২, ৬০৯, ৬১৭, ৬৩৩, ৬৯২, ৬৯৫, ৭০৪।
ভিখারুল ইসলাম ৫২, ৬০, ৬৪, ৮১, ১৮৪, ৫৪১, ৫৪৭।
ভূপতি ভুষণ চৌধুরী ১৭।
মকসুমুল হাকিম ১৭, ৫১, ৫৭, ৬০, ৬১, ৬৮, ৮০, ১৭১, ১৮৩, ২১৪, ২৪৯, ২৮১, ৩৩৪, ৩৮২, ৪৪৫, ৪৯৬, ৫৮৮, ৬৭৩, ৬৮৮, ৬৯৮, ৭১৩, ৮১৭, ৮৬৯, ৮৭৭।
মনজুর কাদির ১৮, ৫৭, ৬৩, ৮৬, ৪৭৬, ৫৫৫, ৬৯৯, ৭৯৮।
মইনুল হোসেন ৫৬, ৬০, ১৮৮।
মওদুদ আহমদ ৬০, ১১০, ১৮৮, ১৯৯, ৩৯৬।
মসিউর রহমান ৫৬, ৬০, ৬৩, ৮১, ১৮৪।
মফিজুল্লাহ ২২, ২৫, ৩৪, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৪৮, ৫২, ৮৮, ৯২, ১০৫, ৪৭২, ৫০২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৪২, ৫৪৩।

ময়েজউদ্দিন ১১০।
মহাখালী যক্ষ্মা হাসপাতাল ৪০৬।
মতিউল ইসলাম সিএসপি ৩৬৫, ৩৭৪, ৩৭৯।
মানিক চৌধুরী ২৬, ২৭, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৪০, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫২, ৬৭, ৬৯, ১৯৫, ১৯৬, ২১১, ২১৩, ২১৪, ২৩৩, ২৪৩, ২৫৬, ২৬৪, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭৬, ৩৮৪, ৩৮৫, ৪১৯, ৪৩০, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৫, ৪৫৪, ৪৬৩, ৫১৯, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৯৩, ৫৯৯, ৬০০, ৬০১, ৬০২, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৫, ৬০৯, ৬১০, ৬১১, ৬১২, ৬১৯, ৬২০, ৬২১, ৬২২, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৬, ৬২৭, ৬২৮, ৬৩৫, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৫৬, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৭১, ৬৭৫, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৮১, ৬৮২, ৬৮৩, ৬৮৫, ৬৯৭, ৭০৪, ৭১১, ৭৭৫, ৭৮০, ৭৮১, ৭৮৮।
মাহবুবউদ্দীন চৌধুরী ৪৭১।
“মায়ের অসুখ” ২৩৭, ২৫৯।
মিজানুর রহমান চৌধুরী ১১০।
মিসকা হোটেল ২৩২, ২৩৩, ৩৬২, ৩৭০, ৩৭৭, ৩৮৪, ৪২৭, ৪৩৬, ৪৪৩, ৪৫৪, ৫২৮, ৫৫১, ৬০৪, ৬০৬, ৬০৮।
মিঃ নোবল ২৮০।
মীর্জা গোলাম হাফিজ ৭৯, ৮০, ৮১, ১৪৯, ১৮৪, ৪২৭, ৪২৮, ৪৩৮, ৪৪৫, ৪৪৮, ৪৫৫, ৪৮৮, ৪৯৮, ৫০৬, ৫০৯, ৫১০, ৬৪২, ৬৭০, ৬৭৪, ৬৮২, ৮০৮, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৭, ৮৬২, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭৭।
মুরাদ ২৭, ২২০, ২৩৭, ২৩৯, ২৫০, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৯, ২৬১।
মেজর শামসুল আলম ৫৩, ৫৮, ৬৭, ৬৯।
মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মীর্জা ৮০৭।
মোয়াজ্জম হোসেন ২০, ৫২, ৫৪, ৯২, ১৩২, ১৫০, ১৭৬, ১৭৯, ১৮০, ২৩১, ২৪৯, ৬০৪, ৬০৫, ৭৩০, ৭৩১, ৭৮১, ৮০০, ৮০১, ৮০২, ৮৪৮।
মোহাম্মদ আইয়ুব খান ৫৭৫।
মোহাম্মদ গোলাম আহমদ ৪২, ৬৬, ৬৯।
মোহাম্মদ মাহবুবুদ্দিন চৌধুরী ৪৩।
মোহাম্মদ খূরশীদ ৫৩।
মোল্লা জালালুদ্দিন আহমদ ৫৬।
মোহাম্মদ মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী ৫৩।

মোহাম্মদ আলী রেজা ৫৩, ৫৮।
ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউট ৪৪০, ৪৪১, ৪৫৩, ৪৬১।
'যন্ত্রপাতি' ২৪১, ২৫৪, ৩৩৬, ৩৪৯, ৭৮৪।
রয়টার ৫১, ৭৫।
রক্সী হোটেল ১৩৯, ১৫৩।
রাজসাক্ষী ৬৩, ৬৬, ৬৯, ৮২, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৪, ১৪৭, ১৬০, ১৬১, ১৬৯, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২২২, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৮, ২৩৯, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫৭, ২৫৮, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ৩০৬, ৩০৭, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৬, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯১, ৩৯৪, ৪১৬, ৪১৭, ৪২০, ৪২৭, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪২, ৪৪৫, ৪৪৮, ৪৫১, ৪৫৩, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯২, ৪৯৬, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫১৯, ৫২০, ৫২৪, ৫২৭, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩৩, ৫৩৬, ৫৩৮, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৮১, ৫৮৮, ৬০৯, ৬১২, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৮, ৬৫৬, ৬৫৮, ৬৫৯, ৬৬১, ৬৬৩, ৬৬৭, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭৩, ৬৮৮, ৬৯৭, ৬৯৮, ৭০২, ৭০৩, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১০, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭১৭, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৭, ৭৫০, ৭৫১, ৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৪, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৭৮০, ৭৮৮, ৭৮৯, ৭৯০, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৪, ৮০৮, ৮০৯, ৮১০, ৮১২, ৮১৩, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৭, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৯, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭১, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬।
রাজারবাগ পুলিস কেন্দ্র ২৪৬, ২৮৩, ২৮৪, ২৯৪, ২৯৫, ৩৮৯, ৫৭৭, ৬০৯, ৬১০, ৬২৬, ৬৪৭, ৬৭৩, ৬৭৮, ৮৪০।
রাজারবাগ পুলিশ ইন্টারোগেশন সেন্টার ৭৯২, ৭৯৩।
রিসালদার সামসুল হক ৪৫।
রিসালদার শামসুল হক ৩৩, ৩৪, ৫৩, ৫৮, ৭৯, ৬৪২, ৬৬১, ৬৯৩, ৬৯৬, ৭০৫, ৭০৯, ৭১২, ৭৫৪, ৭৬৫, ৮৪২।
রুহুল কুদ্দুস ১৭, ২৩, ২৮, ৪১, ৪৯, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৬৪, ৮০, ৮২, ১০৭, ১১৮, ১১৯, ১২৫, ১২৯, ১৩২, ১৬৩, ১৬৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৮৪, ২০৫, ২২১, ২৪০, ২৪৩, ২৫৩, ২৫৬, ২৬১, ২৬৪, ৩৯১, ৪৩০, ৪৪৫, ৬৯২, ৬৯৬, ৭১০, ৭৭৫, ৭৮০, ৭৮১, ৭৮৭, ৭৯৪, ৮০৬।

'রোগী' ১৯০, ২০২, ২২২, ২২৫, ৩৪৯।
লাহোর এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ষ্টাফ কলেজ ৭৯৪, ৮০৬।
লিডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদ ২১, ৮৩।
লেঃ মোজাম্মেল হোসেন ২১, ২২, ৮২, ৮৪, ৮৬, ৯৩, ৯৯, ১১০, ১১৭, ১৮৩, ৮৬৯।
লেফটন্যান্ট মুজাম্মিল হোসেন ৬৬।
লেঃ কমাণ্ডার মোহাম্মদ শহীদুল হক ২৬।
লুৎফুল হুদা ৪১, ৬২৪, ৬৪০, ৬৮৯, ৬৯২, ৬৯৩, ৭০০, ৭০২, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৯, ৭১৩, ৭১৫, ৭৪৬, ৭৫৭, ৭৭০, ৭৯০, ৮০০, ৮০২, ৮৬০।
ল্যান্স নায়েক এ বি এম ইউসুফ ২৭।
শামসুল আলম ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৫৩, ৫৮, ৬৭, ৬৯।
শাহবাগ হোটেল ৭৮৮, ৮১১, ৮২৩।
শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক ৩৮১।
শেখর ৫৪, ২০৫, ২১২, ২২১, ২৩৪।
ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ২১, ৫৪, ৮২, ৮৩, ৮৬, ১০০, ১০১, ১০৪, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২৫, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৯, ২০০, ২০১, ২০৪, ২০৭, ২০৯, ২১০, ২১১, ২৩৭, ২৩৯, ২৪০, ২৪২, ২৪৬, ২৭২, ২৭৮, ৩১০, ৩১৪, ৩১৬, ৩১৮, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৭, ৩৩০, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৬, ৩৭৭, ৩৯১, ৪১৯, ৪২১, ৪৪২, ৪৪৩, ৫১৯, ৫২৮, ৫২৯, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৫, ৬২০, ৬৮৯, ৬৯০, ৬৯২, ৬৯৩, ৭৩৭, ৭৪৩, ৭৫০।
সবুজ ৩৩, ৫৪, ২০৫, ২১২, ২২১, ২৩৪, ২৩৭, ২৫৯, ৩৬১, ৩৭৭, ৪০০, ৬৬১, ৭৩৬, ৭৪১, ৭৫৩, ৭৫৪, ৭৬৫।
সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমেদ ২৫।
সাক্ষী সায়িদুর রহমান ৩২, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০।
সার্জেন্ট জহুরুল হক ২৮, ৫৩, ৫৮, ১২৯।
সার্জেন্ট শামসুল হক ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৭, ৫৩, ৫৮, ২৩৮, ২৫২, ৪৪১, ৪৫৩, ৪৬১, ৫৩৯।
সার্জেন্ট আবদুল জলিল ৪৩, ৫৩, ৫৮।
সার্জেন শামসুদ্দীন আহমদ ৬৬।
সাইদুর রহমান ৬৬, ৬৯, ২১১, ২১৪, ২৫৮, ৩৭৯, ৪২৫, ৪৩২, ৪৩৩, ৫১৯, ৫২০, ৫২৯, ৫৩০, ৫৪১, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৮, ৫৭১, ৫৭৩, ৫৭৫, ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৯৫, ৬০৫, ৬০৮, ৬০৯, ৬৪২, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৬৩, ৬৬৭, ৬৭০, ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৮১, ৬৮৭, ৬৯৮, ৮০৩, ৮৭৭।

সালাম খান ৫২, ৫৫, ৫৬, ৫৯, ৬২, ৬৩, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭৯, ৮১, ৯০, ৯৩, ৯৯, ১০০, ১০৩, ১০৬, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৬, ১১৮, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৪১, ১৪৪, ১৪৯, ১৫৬, ১৬০, ১৭৩, ১৮৪, ১৮৯, ১৯৫, ২০০, ২১৩, ২৩৫, ২৭১, ২৮০, ২৯১, ২৯৫, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৬, ৩১৯, ৩২১, ৩২৩, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৫৬, ৩৫৯, ৩৭০, ৩৭৫, ৩৮২, ৩৮৮, ৩৯৭, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪২৭, ৭২৮, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৭, ৪৪৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭৩, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৮৪, ৫২০, ৫৪৯, ৫৫৫, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮৮, ৫৮৯, ৫৯৫, ৬০৮, ৬০৯, ৬১০, ৬১৩, ৬১৬, ৬২৫, ৬৩৫, ৬৩৮, ৬৪০, ৬৪২, ৬৪৪, ৬৪৬, ৬৫৮, ৬৬৩, ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৮৭, ৬৮৮, ৭০৯, ৭১৩, ৭২০, ৭৩৭, ৭৫১, ৭৬১, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৮১, ৭৮৮, ৭৮৯, ৭৯৬, ৭৯৮, ৮২৫, ৮২৬, ৮৩৭, ৮৪৩, ৮৪৯, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৬২, ৮৬৪, ৮৬৯, ৮৭০।
সালাহউদ্দীন সিএসপি ৩৬৫, ৩৭৫, ৩৭৯, ৩৮০।
সানাউল হক সিএসপি ৩৬৫, ৩৭৪, ৩৭৯।
সার্ভে অফিসার সিদ্দিকুর রহমান ৪৭৫।
সার্জেন্ট সামসুদ্দিন আহমদ ৪৮৪।
সাকুরা রেস্তোরাঁ ৫৬০, ৫৬১, ৫৮২, ৬১৭।
সুবেদার আবদুর রাজ্জাক ২৬, ৫২, ১৯৫, ২১১, ২৩৩।
সুবেদার জালালুদ্দিন আহমদ ৪২।
সুলতান আহমদ ৫২, ৯৭, ১২৮, ১৩৪, ৪৭২, ৬৪৩, ৬৬৪।
সুলতানউদ্দীন আহমদ ৫৪, ৭০, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৯০, ৯১, ১১৭, ১১৯, ১২৮, ১৩০, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৮, ২১১, ২২৪, ২৩৯, ২৪০, ২৪৫, ২৪৯, ২৫০, ২৫৩, ২৫৮, ২৬৫, ২৮৭, ৩১৪, ৩১৮, ৩২১, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৬, ৫১৯, ৫২৮, ৫৫১, ৬৭৫, ৬৯০, ৮৩৫।
সুবেদার এ কে এম তাজুল ইসলাম ৫৩, ৫৮।
সুলতানউদ্দীন ৭০, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯১, ৯২, ১০২, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২৫, ১৩৬, ১৩৯, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ২০২, ২০৪, ২০৭, ২১১, ২১২, ২১৭, ২১৮, ২২৪, ২২৭, ২২৯, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৯, ২৪০, ২৫০, ২৫৩, ২৫৮, ২৫৯, ২৬১, ২৬২,

২৬৫, ২৭৯, ৩১০, ৩১৪, ৩১৬, ৩১৮, ৩২১, ৩২২, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৬, ৩৫২, ৩৫৪, ৩৫৮, ৪১৯, ৪২২, ৪২৪, ৪৩৩, ৪৬৬, ৪৭৮, ৫১৯, ৫২৮, ৫৫১, ৫৫৬, ৫৫৮, ৫৮১, ৬৭৮, ৬৯০, ৭২৩, ৮৩৫।
সুভাষ চন্দ্র বোস ৫২৬।
সেন্ট্রাল স্টাটিসটিক্স অফিস ৯৬, ১৪৯, ২১০, ২৩২, ২৪৬, ২৬৬, ৩৯৫।
সৈয়দ আজিজুল হক ৫২, ৫৯, ৬৪, ৮১।
সৈয়দ নজরুল ইসলাম ৫৬, ৬০, ৬৪, ৮১, ১১০।
স্বাধীন বাংলা ৩৮, ৪৪০, ৪৫২।
হাবিলদার ক্লার্ক মুজিবুর রহমান ৫২।
হাবিলদার আজিজুল হক ৩৩, ৫৩, ৫৮।
হাবিবুর রহমান ৫৬, ৬০, ৬৩।
হামিদুল হক চৌধুরী ৫৬, ৮২।
হাবিলদার নওয়াব আলী ৬২।
হারুনর রশীদ ৬২।
হাবিলদার দলিল উদ্দিন ২২, ৬৯৩।
হাবিব ব্যাঙ্ক ৭১০, ৮২৩।
হিমালয় ৮২, ৮৬, ৯০, ১০০, ১০২, ১৬১, ৩২৪।
হুইলার্স ক্লাব ৮১২।
হোটেল ডেনোফা ৪৬, ৬৯৪, ৭০৬।
হোটেল নিস্কা ১৯৫।
হোটেল মিশকা ২১০, ২১৪, ৫৮০।
হোটেল আরজু ২১১, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৭, ২৫০, ২৫১, ২৫৯, ২৬০, ২৯৬, ৩২০, ৩২২, ৩২৭, ৪৬৮, ৫৫৭, ৬০৯, ৬১০, ৬১১, ৬১৬, ৬২৭, ৬২৮, ৬৩২।
৩৩৬, ৩৪৯, ৪১৮, ৪৮৭।
হোটেল গ্রীন ৬১১, ৬২২, ৬২৭।
হোটেল ক্যাসরিনা ৫৬৪।
৬ দফা ১৮৭, ৪০৩, ৪১৮, ৪৩০, ৪৯৪, ৪৯৫, ৫১২, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৮২, ৫৮৯, ৫৯৫, ৫৯৬, ৬৭৮।

নোট

নোট